এই লেখকের অন্যান্য বই

মন্দ মেয়ের উপাখ্যান
দুই দিগন্ত
আলোছায়াময়
দায়দায়িত্ব
হৃদয়ের ঘ্রাণ
বিন্দুমাত্র
আলোয় ফেরা
অন্ধকারে ফুলের গন্ধ
মানুষের জন্য
আকাশের নীচে মানুষ
দায়বদ্ধ
শ্রেষ্ঠ গল্প
চতুর্দিক
রামচরিত্র
ধর্মান্তর
সত্যমিথ্যা
মাটি আর নেই
মোহানার দিকে
নোনা জল মিঠে মাটি
বাঘবন্দী
স্বর্গের ছবি
একাকী অরণ্যে

সম্পর্ক
জন্মভূমি
শীর্ষবিন্দু
সুখের পাখি অনেক দূরে
রৌদ্রঝলক
আক্রমণ
শঙ্খিনী
আমার নাম বকুল
নয়না
নিজের সঙ্গে দেখা
এক নায়িকার উপাখ্যান
পর্বপার্বতী
মহাযুদ্ধের ঘোড়া
(১ম / ২য় পর্ব)
সিন্ধুপারের পাখি
যুদ্ধযাত্রা
স্বনির্বাচিত গল্প
শান্তিপর্ব
সাধ আহ্লাদ
তিন মূর্তির কীর্তি
সেনাপতি নিরুদ্দেশ
পাগল মামার চার ছেলে
হীরের টুকরো

ষাটের দশকের বেশ কয়েকটা বছর আমার বোম্বাইতে কেটেছে। থাকতাম মূল শহর থেকে অনেকটা দূরে— জুহু তারা রোডের এক সস্তা গুজরাতি হোটেলে। সামনেই জুহুর ভুবন বিখ্যাত সমুদ্র সৈকত। বত্রিশ বছর আগে শহরতলির এই অংশটা ছিল ভারি নির্জন। আদিগন্ত আরব সাগর, মাইলের পর মাইল জুড়ে সোনালি বালুকাবেলা, অজস্র সি-গাল পাখি, সমুন্নত নারকেল গাছের অফুরন্ত লাইন— এই নিয়ে ছিল সেদিনের নয়ন ভুলানো জুহু। এখনকার মতো অগুনতি ফাইভ-স্টার হোটেল আর হাই-রাইজে জায়গাটা ছয়লাপ হয়ে যায় নি।

রোজ সূর্যোদয়ের অনেক আগে জুহু বিচে বেড়াতে যাওয়াটা ছিল আমার এক প্রিয় অভ্যাস। আমি সেখানে পৌঁছতে না পৌঁছতেই স্বাস্থ্যান্বেষীরা টাটকা দূষণমুক্ত বাতাসের সন্ধানে হাজির হয়ে যেত। তার আগেই এসে গেছে ঘোড়াওলারা, বায়ুসেবীদের জয়-রাইডের জন্য তারা তাদের ঘোড়াগুলোকে লাইন দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখত। খোলা আকাশের নিচে ওই সাত সকালেই বসে যেত 'নারিয়েল পানি', ভেলপুরি, বাটাটাপুরি আর চায়ের অস্থায়ী দোকান।

বোম্বাই দেশের পশ্চিম প্রান্তে, তাই সূর্যোদয়টা হয় অনেক দেরিতে। সমুদ্র তীরে ঘণ্টাদেড়েক হাঁটাহাঁটির পর রোদ উঠত। আমার চেনা জানা একটা চা-ওলা ছিল। তার কাছে লেমন-টি পাওয়া যেত। রোজ প্রাতঃভ্রমণের পর সেখানে কাগজের গেলাসে চা খেয়ে হোটেলে ফিরতাম। এই চায়ের দোকানেই ডি-সিলভার সঙ্গে আমার আলাপ। লোকটা গোয়াঞ্চি পিদ্রু অর্থাৎ গোয়ার কৃশ্চান। বয়স পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ, দুর্দান্ত চেহারা, পেটানো স্বাস্থ্য। তার চোখেমুখে সর্বক্ষণ কথার খই ফুটত। নেচে কুঁদে এমন অঙ্গভঙ্গি করত যে হাসতে হাসতে পেটে খেল ধরে যাবার জোগাড়। সিনেমায় নামলে নাম-করা কমেডিয়ানদের সে নাক কেটে দিতে পারত। যতদিন যাচ্ছিল সে আমাকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করছিল। পরিচয়টা একটু গাঢ় হলে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'তুমি কী কর?'

ডি-সিলভা বলেছে, 'আমি হোল-টাইম ফোরটোয়েন্টি।'

এমন একটা প্রফেশন কারো হতে পারে তা যেন ভাবাই যায় না। বিমূঢ়ের মতো বলেছি, 'তার মানে?'

'মানে আবার কী, ভেরি সিম্পল। যা বললাম সেটা পাঁচ বছরের বাচ্চাও বুঝতে পারে।' বলেই অদ্ভুত একটা প্রশ্ন করেছে ডি-সিলভা, 'বোম্বাই সিটিতে কত লোক থাকে বলতে পার?'

সেই তেষট্টি চৌষট্টিতে বোম্বাইতে জনসংখ্যা ছিল ষাট লাখের মতো। তাই বললাম।

ডি-সিলভা এবার বলেছে, 'এই ষাট লাখের ভেতর চল্লিশ লাখ গাধা নেই?'

তার এই প্রশ্নটির অন্তর্নিহিত ইঙ্গিতটা বুঝতে অসুবিধা হয় নি। বলেছি, 'তা আছে।'

'রোজ এদের একেক জনের মাথায় একটা করে টুপি পরালে আমার লাইফটা ফাইন কেটে যাবে, বুঝলে?' বলে চোখ টিপেছে ডি-সিলভা। পরক্ষণে কী ভেবে শশব্যস্তে বলে উঠেছে, 'তবে আমি গরিবদের কখনও পথে বসাই না।'

এরপর থেকে ডি-সিলভার কর্মপদ্ধতি ভাল করে লক্ষ করতে থাকি। লোকটা যে সত্যিই অতি ধূর্ত ফেরেববাজ, সেটা টের পাওয়া গেল। কোনোদিন দেখতাম কারো চোখে ধুলো দিয়ে ডজনখানেক নতুন শার্ট নিয়ে এসেছে সে, কোনোদিন এক বাক্স কেক বা এক গোছা কারেন্সি নোট। সবই সে অকাতরে হাসিমুখে বিলিয়ে দিত।

জিজ্ঞেস করতাম, 'দিয়ে যে দিলে, নিজের জন্যে তো কিছুই রাখলে না!'

ডি-সিলভা বলত, 'নো সেভিং বিজনেস মিস্টার। রোজ নতুন নতুন প্ল্যান বার করে নতুন নতুন লোকের ঘাড় ভাঙব। যেদিন পারব না সেদিন স্রিফ ফাস্টিং।'

আমার মনে হয়েছিল এই শঠ, প্রবঞ্চক, দুর্ধর্ষ ফোর-টোয়েন্টি আসলে একজন মুক্তপুরুষ। তার মধ্যে রয়েছে নিরাসক্ত এক দার্শনিক। বম্বে থেকে কলকাতায় ফিরে আসার পর অনেক বার ওকে নিয়ে একটা উপন্যাস লেখার পরিকল্পনা করেছি কিন্তু লেখাটা হয়ে উঠছিল না। আসলে ডি-সিলভা চরিত্রটি সম্বন্ধে ভাবতে গিয়ে বারংবার মনে হয়েছে গতানুগতিক পদ্ধতিতে লিখলে চলবে না। এর জন্য একটা অন্যরকম চমকপ্রদ স্টাইল উদ্ভাবন করতে হবে। ভাবতে ভাবতে একদিন সেটা মাথায় এসে গেল।

স্টাইল তো পাওয়া গেল কিন্তু ডি-সিলভাকে উপন্যাসের চরিত্র করে তুলব কী করে? একদিন তার ছকও তৈরি করে ফেলি। ডি-সিলভা একজন ছোট মাপের প্রবঞ্চক। কিন্তু শিল্প-বাণিজ্য, ধর্ম, রাজনীতি, পারিপার্শ্বিক সমাজ, সব কিছুর মধ্যে বিরাট বিরাট ফেরেববাজেরা বিরাজ করছেন। ডি-সিলভার চোখ দিয়ে এদের স্বরূপ উন্মোচন করতে চেষ্টা করেছি। অবশ্য নানা কারণে ডি-সিলভা নামটি রাখা যায় নি, পরিবর্তিত হয়ে সে হয়েছে পিটার স্বয়ম্ভু হোড়।

আমার এই উপন্যাস 'আমাকে দেখুন' বছর সাতেক ধরে চার পর্বে লিখেছি। এবারের বইমেলা উপলক্ষে পর্বগুলি একত্র করে প্রকাশ করা হল। আশা করি সুমুদ্রিত অখণ্ড এই সংস্করণটি পাঠকদের কাছে আগের মতোই প্রিয় হবে।

আমাকে দেখুন
প্রথম পর্ব



এই যে মহাশয়গণ, আমি এখানে বসে আছি। অনুগ্রহ করে আমার দিকে একটু তাকান।

আপনারা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, দেখতে শুনতে আমি ভালই। শুদ্ধ ভাষায় যাকে সুপুরুষ বলে আমাকে তা-ই বলতে পারেন! বঙ্গসন্তানদের মধ্যে এ রকম চেহারা আপনারা খুব বেশি দেখেন নি।

হে-হে, আপনারা হয়ত ভাবছেন নিজের ঢাক আমি নিজেই পিটিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু কথাটা হানড্রেড পারসেন্ট সত্যি।

আমার বয়েস কত মনে হয়? জানি, বলবেন বত্রিশ তেত্রিশ। না মহাশয়রা, আপনাদেব অনুমান সঠিক নয়। বছর চারেক আগেই আমি চল্লিশ পেরিয়েছি।

দেখতেই পাচ্ছেন সাধারণ বাঙালির তুলনায় আমি অনেক বেশি লম্বা, পাক্কা ছ'ফুট দেড় ইঞ্চি হাইট। মেরুদণ্ড শক্ত এবং টান-টান। নাক-মুখ-থুতনি কাটা কাটা। নিষ্পাপ শিশুর মতো বড় বড় চোখ আমার, জোড়া ভুরু, চওড়া কাঁধ এবং ঈষৎ পুরু ঠোঁট। গায়ের রং পালিশ-করা ব্রোঞ্জের মতো। একটু লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন আমার চোখেব তলায়, ঘাড়ে, গলায় এবং পেটে কিছু চর্বি জমেছে। হে-হে মহাশয়গণ, বুঝতেই পারছেন এটা অতিরিক্ত মদ্যপানের ফল। মদটা—মানে কালীমার্কা বাংলা মাল অর্থাৎ ধান্যেশ্বরী, সোজা কথায় ধেনো আর কি—আমি একটু বেশি পরিমাণেই সেবন করে থাকি।

আরো একটা ব্যাপার নিশ্চয়ই আপনাদের নজরে পড়েছে। আমার চোখের তারায়, ঠোঁট আর থুতনির খাঁজে আবছাভাবে একটা হাসি আটকানো। হাসিটা কৌতুকের, নাকি নষ্টামির? এটা কিন্তু এত সহজে বোঝা যাবে না। তার জন্যে আপনাদের কিঞ্চিৎ ধৈর্যধারণ করতে হবে। সে যাক, আপনাদের চোখমুখ দেখে মনে হচ্ছে, আমাকে আপনাদের ভালই লাগছে। লাগবারই কথা। মহাশয়গণ, নিজেকে আমাব নিজেরই ভাল লাগে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে একেক দিন আমি আর চোখ ফেরাতে পাবি না। নিজের অজান্তেই তখন নার্সিসাস না কী যেন, হে-হে, তা-ই হয়ে যাই।

এই যে আমার চেহারাখানা দেখছেন—এটা আমার ক্যাপিটাল, মানে মূলধন। দরকার হলেই এটাকে আমি কাজে লাগিয়ে থাকি।

আচ্ছা, আমাকে দেখে আপনাদের কী ধারণা হচ্ছে? এর উত্তর কী হতে পারে, আমি জানি। আপনারা হয়ত বলবেন, একবার দেখেই কারো সম্বন্ধে কোনরকম ধারণা করা যায় নাকি? তবু জানি মহাশয়গণ, আমার মদ্যপানের স্বীকারোক্তি শোনার পরও আপনাবা আমাকে অ্যাঞ্জেল-ট্যাঞ্জেল ঠাউরে নিয়েছেন। ঝামেলাটা এইখানেই। বাইরে থেকে আচমকা দেখলে আমার মতো সরল নিষ্পাপ পবিত্র মানুষ আর হয় না। কিন্তু একবার যদি আমার ভেতরটা দেখতে পেতেন! কিন্তু বলামাত্রই কি আর তা দেখা যায়?

মহাশয়রা, আমার চেহারা দেখে ভুলবেন না। আগেভাগেই জানিয়ে রাখছি, আমার সম্বন্ধে আপনাদের চোখ-কান খুলে রাখা উচিত। শাস্ত্রকারদের সেই কথাটা মনে আছে তো? নখী-শৃঙ্গী ইত্যাদি প্রাণীদের থেকে তাঁরা দূরে থাকতে পরামর্শ দিয়েছেন। আরে আরে, চমকে উঠলেন যে! না-না, আমি ঠিক অতটা বিপজ্জনক নই। আমি একজন অতি সাধারণ চিট, মানে প্রতারক। সোজা কথায় আমাকে ফোর টেয়েন্টি বলতে পারেন। তবে অত্যন্ত নিরীহ টাইপের ফোর টোয়েন্টি। মানুষের খুব বেশি ক্ষতি আমি করতে পারি না। আসলে ক্ষতি করার ক্ষমতাটাই আমার সীমাবদ্ধ।

নিজের পরিচয় দিয়ে রাখলাম। পরে আমাকে দোষারোপ করতে পারবেন না।

আমার নাম পিটার স্বয়ম্ভু হোড়। উঁহু উঁহু, ভুরু কোঁচকাবেন না। আপনাদের মনোভাব আমি বুঝতে পারছি। হয়ত ভাবছেন এ রকম কিম্ভুত নাম আবার হয় নাকি? খুব সম্ভব হয় না। এমন নাম আর কারো আছে কি না আমার অন্ততঃ জানা নেই। তবু এই নামটাকেই সগৌরবে কাঁধে ঝুলিয়ে চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশটা বছর তো কাটিয়ে দিলাম।

মহাশয়গণ, এই নামকরণের পেছনে একটা মজার ব্যাপার আছে, হয়ত কিঞ্চিৎ দুঃখেরও। কতটা মজার আর কতটা দুঃখের, সব শুনে আপনারাই ভেবে দেখবেন। কিন্তু সে কথা পরে।

ঐ দেখুন, আমি কোথায় বসে আছি, সেটাই এখনও আপনাদের জানানো হয় নি। এটা শহরতলির একটা মাঝারি হোটেল। নাম 'দি গ্রেট হিমালয়ান বোর্ডিং হাউস'।

শহরতলি তো কলকাতার চারদিকেই—পুবে-পশ্চিমে-উত্তরে-দক্ষিণে। এ শহর তো থেমে নেই, ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। আজ যেখানে মনে হয় সে থমকে গেছে, কালই দেখা যায়, কি আশ্চর্য, শহরটা ইতির পর পুনশ্চর মতো সামনের দিকে আবার ছুট লাগিয়েছে।

যা বলছিলাম—এই হোটেলটা, মানে 'দি গ্রেট হিমালয়ান বোর্ডিং হাউস' ক্যালকাটা কর্পোরেশনের উত্তর সীমান্ত থেকে দু-তিন মাইলের মধ্যে, ঠিক বি. টি. রোডের ওপর।

হোটেল-বাড়িটা তিন তলা। এক তলায় রেস্তোরাঁ, সেলস কাউন্টার, ম্যানেজারের ঘর, কিচেন ইত্যাদি। দোতলা এবং তিন তলায় বোর্ডারদের সারি সারি কামরা। আমি —পিটার স্বয়ম্ভু হোড়—এই হোটেলের তিন তলার দক্ষিণ কোণে শেষ ঘরখানায় আপাতত বসে আছি। ঠিক বসে আছি কি?

আমার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে ঝট করে ঘরটা একবার দেখে নিন। আপনাদের আর কষ্ট করতে হবে না, ঘরের মাপটা আমিই বলে দিচ্ছি—আট ফুট বাই সাত ফুট। তার মানে ছাপান্ন স্কোয়ার ফুট।

ইউনেস্কোর কে এক সোসিওলজিস্ট কলকাতার পপুলেশন এবং তার আয়তনের হিসেব-টিসেব কষে দেখিয়েছেন এ শহরের বাসিন্দাদের ভাগে গড়ে পঁচিশ বর্গফুটের বেশি জায়গা নেই। ওইটুকু জায়গায় একটা লোক ভাল করে হাত-পা ছড়িয়ে শুতেও পারে না। সোসিওলজিস্ট ভদ্রলোক আরো জানিয়েছেন, ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর বাবুরা যতই রাস্তার

ক্রসিংয়ে ক্রসিংয়ে হোর্ডিং ঝোলাক আর রেডিওতে 'দো আউর তিন বাচ্চে'র স্লোগান দিয়ে দিয়ে গলায় রক্ত তুলে ফেলুক, জনসংখ্যা যেভাবে হুড় হুড় করে বেড়ে যাচ্ছে তাতে পঁচিশ বর্গফুট পনেরো বর্গফুট হতে তিনটে বছরও লাগবে না।

হে-হে মহাশয়গণ, পঁচিশের তুলনায় ছাপ্পান্ন নিশ্চয়ই হেভেন, না কি বলেন! 'দি গ্রেট হিমালয়ান বোর্ডিং হাউস'-এর এই ঘরখানায় ছাপান্ন স্কোয়ার ফুটে তিন তিনটে মাস বেশ আরামেই আছি। তবে অদ্যই শেষ রজনী। গোটা রজনী অবশ্য নয়। এখন রাত সাড়ে আটটার মতো বাজে। আর আধ ঘন্টার মধ্যেই—না, পরের কথা আগে বলার মানে হয় না।

দেখুন, এই ঘরটার একধারে ইটের দেওয়াল, আরেক ধারে কাঠের পার্টিসান। পর্টিসানের ওপাশে অন্য বোর্ডারের ঘর। ইটের দেওয়াল ঘেঁষে তক্তাপোষে বিছানা পাতা, আমি সেখানেই বসে আছি। বিছানার উল্টোদিকে কাঠের পার্টিশানের গায়ে একটা ব্র্যাকেট আটকানো। ব্র্যাকেটটা থেকে দু-তিনটে আধময়লা তোয়ালে, পাজামা আর শার্ট ঝুলছে। তার পাশে একটা কাঠের টেবলে শেভিং বক্স, টুথ পেস্ট, ব্রাশ, সিগারেটের প্যাকেট, লাইটার ইত্যাদি সাজানো।

ঘর তো দেখা হল। আবার আমার দিকে তাকান।

মহাশয়গণ, আপনারা অনেকেই ছেলেবেলায় বায়োস্কোপের বাক্সে চোখ রেখেছেন। নিশ্চয়ই মনে আছে, কলের গান চালিয়ে ফিল্মের হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বায়োস্কোপওলা সমানে বলে যেত, 'আগ্রাকা তাজমহল দেখো, দিল্লি দেখো, বোম্বে দেখো, কলকাত্তাকা হাজারো তামাশা দেখো—'

তাকিয়ে থাকুন মহাশয়রা, তাকিয়ে থাকুন। আমাকে দেখতে দেখতে হয়ত বায়োস্কোপের বাক্সের মতো হাজার মজা দেখতে পাবেন।

আপনাদের আগেই জানিয়ে দিয়েছি বিছানার ওপর আমি বসে আছি। আমার সামনে ফাইবারের ঢাউস একটা সুটকেশ খোলা পড়ে রয়েছে। আপাতত আমি তার ভেতর পুরনো খবরের কাগজ গাদিয়ে গাদিয়ে পুরছি।

সুটকেশটা ভর্তি হয়ে গেলে একটুকরো সাদা কাগজে লিখে ফেললাম:

'দি গ্রেট হিমালয়ান বোর্ডিং হাউসের ম্যানেজার মহাশয় নিরাপদদীর্ঘজীবেষু, অর্থাভাবহেতু তিন মাসের হোটেল চার্জ চার শো আশি টাকা চোট দিতে বাধ্য হইলাম। নিজগুণে আমাকে ক্ষমা করিবেন। ঐ টাকাটা কস্মিনকালেও দিতে পারিব বলিয়া মনে হয় না। নিজের ওপর তেমন বিশ্বাস আমার নাই। ওই সামান্য কয়টি টাকার শোক ভুলিয়া গেলে আপনার স্বাস্থ্য এবং নিদ্রার পক্ষে মঙ্গলই হইবে। আচ্ছা দাদা, বিদায়। ভবদীয় পিটার স্বয়ম্ভু হোড়।'

কাগজের টুকরোটা খবরের কাগজগুলোর ওপর রেখে সুটকেশটা বন্ধ করে ফেললাম। এখনও অনেক কাজ বাকি। প্রথমে ব্র্যাকেট থেকে ময়লা জামা-টামাগুলো নামিয়ে টেবিলের

ব্রাশ-পেস্ট-শেভিং বক্স ইত্যাদি জড়িয়ে খবরের কাগজ দিয়ে প্যাকেট করে নিলাম। তারপর তক্তাপোষের তলা থেকে ঝকঝকে একটা অ্যাটাচি কেস বার করে খুলে ফেলতেই টুকিটাকি অনাবশ্যক কাগজপত্রের ভেতরে একটা নাম-করা আমেরিকান ব্যাঙ্কের চেক বই চোখে পড়ল। কোন একসময়, আচমকা কিছু টাকা হাতে এসে যাওয়ায় ওই ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলেছিলাম। চেক বইটা আমার সেই ঐতিহাসিক সুদিনের স্মৃতিচিহ্ন। মেমোরি অফ দা গোল্ডেন পাস্ট।

হে-হে মহাশয়গণ, ভালো করে লক্ষ্য করুন, চেক বইয়ের একটা পাতাও কাটা হয় নি। এই না-কাটার পেছনে আমার দারুণ একটা প্ল্যান আছে। ব্যাপারটা পাঁচ অথবা দশ-সালা পরিকল্পনার মতো। ক্রমশ সেটা প্রকাশ্য।

আপনারা ভাবতে পারেন, একদা ব্যাঙ্কে যে টাকাটা জমা দিয়েছিলাম এখনও নিশ্চয়ই সেটা মজুদ রয়েছে। না মহাশয়রা, কিছুই নেই। পে-ইন স্লিপ দিয়ে প্রায় সবটাই কবে তুলে ফেলেছি। আমার ধারণা, দশ বারো টাকার মতো তলানি পড়ে থাকলেও থাকতে পারে। তবে তা-ও আছে কি না সন্দেহ।

যে চেক বইটার দাম কানাকড়িও নয়, দামি সম্পত্তির মতো সেটা আগলে রাখার কারণ কী? এর মধ্যে আমার সেই প্ল্যানটা রয়েছে মহাশয়রা। কিঞ্চিৎ ধৈর্য ধরুন, নিজের চোখেই সব দেখতে পাবেন।

হোটেলের বিছানায় যে ধবধবে চাদরটা ছিল সেটা তুলে ভাঁজ করলাম। আমার একটা হাওয়া-বালিশ আছে টেবলের ওপর। সে দুটো অ্যাটাচি কেসে পুরে কেসটা বন্ধ করে এক সময় উঠে পড়লাম। তারপর সেটা এবং জামা-কাপড়ের প্যাকেটটা নিয়ে ঘরের বাইরে এসে তালা লাগালাম। তারও পর টুই টুই করে শিস দিতে দিতে সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে নিচে নেমে এলাম।

একতলায় নামলেই বাঁ দিকে ম্যানেজারের ঘর। ডান ধারে রেস্তোরাঁ, তার ওপাশে রেস্তোরাঁর ক্যাশ-কাউন্টার।

ম্যানেজারের ঘরের পাশ দিয়ে যে প্যাসেজটা গেছে, অন্য দিন নিচে নেমে পারতপক্ষে সেদিকে পা বাড়াই না। হে-হে মহাশয়রা, ওই জায়গাটাআমার পক্ষে খুবই বিপজ্জনক। অদৃশ্য একটা রেড সিগন্যাল সব সময় যেন ওখানে জ্বলতে থাকে। আসলে 'গ্রেট হিমালয়ান বোর্ডিং হাউস'-এর ম্যানেজার তারকনাথ হালদারের সঙ্গে চোখাচোখি হোক, এটা আমি চাই না। ব্যাপারটা আমার পক্ষে খুব সুখের নয় কিনা।

ম্যানেজারের ঘরের পাশ দিয়ে গেলে সামনেই বাইরে বেরুবার গেট, তারপরেই বি. টি, রোড। বি. টি, রোডে যাবার আরো একটা রাস্তা আছে। রেস্তোরাঁর ক্যাশ কাউন্টারের পেছন দিকে একটা ছোট্ট দরজা, সেখান দিয়ে যাওয়া যায়। তবে এটা প্রাইভেট প্যাসেজ, হোটেলের বয়-টয়রা এই প্যাসেজটা দিয়ে যাতায়াত করে।

অন্য দিন আমি করি কি, তেতলা থেকে নিচে নেমেই সট করে ডাইনে ঘুরে ক্যাশ কাউন্টারের পেছনের দরজা গলে বি. টি, রোডে চলে যাই। ক্যাশে যে ছোকরাটা বসে

থাকে, বাংলা মাল খাইয়ে খাইয়ে তার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছি। আমি জানি ম্যানেজার ক্যাশের ছোকরাকে বলে রেখেছে আমাকে দেখলেই যেন তাকে খবর দেয়। কিন্তু আমি যখন তার পেছন দিয়ে ইঁদুরের মতো সুড়ুৎ করে চলে যাই, সে দেখতেই পায় না। কালীমার্কা বাংলা মালের কি মহিমা দেখুন, ছ' ফুট দেড় ইঞ্চি হাইটের একটা লোক চোখের সামনে ঘুরলেও দেখা যায় না। সে যাক আমি কিন্তু আজ ডাইনে গেলাম না।

এই মুহূর্তে রেস্তোরাঁ বেশ জমজমাট। টেবলে টেবলে কাস্টমাররা থোকায় থোকায় বসে আছে। তাদের টুকরো টুকরো কথাবার্তা, কাঁটা-চামচের শব্দ, বয়দের ছোটাছুটি, সব মিলিয়ে চারদিকে রীতিমত ব্যস্ততা।

আমি করলাম কি, ডাইনে না ঘুরে সোজা ম্যানেজারের ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ঘাড় না ফিরিয়েও টের পাচ্ছি পেছনে ক্যাশ-কাউণ্টারের ছোকরাটা আমার কাণ্ড দেখে চমকে উঠেছে।

ম্যানেজার তার ঘরে একলাই ছিল, টেবলে ঝুঁকে কি সব হিসেব-পত্তর করছিল। গলার ভেতর শব্দ করে বললাম, 'মে আই কাম ইন?'

ম্যানেজার তারকনাথ হালদার—এবড়ো-খেবড়ো ট্যারা বাঁকা মুখ, ভারি চোয়াল, মাথার মাঝখান দিয়ে সিঁথি, গোল চোখে রোল্ড গোল্ডের চশমা, তেল-চকচকে কাঁচা-পাকা চুল, গায়ে টুইলের হাফ শার্ট, বুক পকেটে রুপোর চেনে বাঁধা ঘড়ি—ঢাউস হিসেবের খাতা থেকে মুখ তুলেই কয়েক সেকেণ্ড স্ট্যাচুর মতো হয়ে রইল। তারপরেই তার চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল।

টের পাচ্ছি আমার ঠোঁটের সেই হাসিটা চোখে, ভুরুতে এবং থুতনিতে ক্রমশ ছড়িয়ে যাচ্ছে। আবার বললাম, 'ভেতরে আসব?'

স্থির চোখে আমার দিকে তাকিয়েই আছে ম্যানেজার, কিছু একটা বুঝতে চেষ্টা করছে যেন। খানিকটা সময় নিয়ে সে বলল, 'আসুন।' তার গলার স্বর রীতিমত রুক্ষ এবং কর্কশ।

ম্যানেজারের দিক থেকে অভ্যর্থনাটা কিরকম হতে পারে আগেই তা আন্দাজ [illegible]ছিলাম। বিনয়ের অবতার হয়ে বললাম, 'বসতে পারি?'

[illegible] মতোই কর্কশ গলায় ম্যানেজার বলল, 'পারেন।'

[illegible] সুস্থে তার মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসলাম। পাশের চেয়ারটায় জামা কাপড়ের [illegible] এবং অ্যাটাচি কেসটা রেখে বললাম, 'অনেক দিন পর আপনার সঙ্গে দেখা হল।'

[illegible]ঠস্বর আরেক পর্দা চড়ল ম্যানেজারের, 'তা হল।'

'কতদিন পর বলুন তো?'

'আপনিই বলুন না—'

চোখ কুঁচকে একটু ভেবে নিয়ে বললাম, 'এক মাস হবে, কি বলেন?'

'না না স্যার, পাক্কা দেড়টি মাস।' ম্যানেজার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল হঠাৎ।

খেপে যাবার কথাই। আমি কিন্তু শান্ত নিরুদ্বেগ মুখে বললাম, 'দেড় মাস? তা হতে পারে।' একটু থেমে আবার বললাম, 'এতদিন পর আপনার সঙ্গে দেখা, দারুণ ভাল লাগছে।'

ম্যানেজারের মুখের চেহারা একটুও নরম হল না। এবার সে প্রায় ভেংচেই উঠল, 'ভাল লাগছে!' তার গোটা তিনেক সোনাবাঁধানো গজদাঁত বেরিয়ে পড়ল একসঙ্গে।

হে-হে মহাশয়গণ, আমার দু কান কাটা। মাথাটা ডানদিকে পুরো কোয়ার্টার মিটার হেলিয়ে কৃতার্থ ভঙ্গিতে বললাম, 'হ্যাঁ।'

ম্যানেজার পলকহীন তাকিয়েই আছে। তার চোখমুখ দেখে মনে হচ্ছিল, যে কোন মুহূর্তে একটা বিস্ফোরণ ঘটে যাবে। কিন্তু উত্তেজনাহীন চাপা গলায় সে বলল, 'দেড় মাস পর আপনার মুখ আমি দেখতে চাই নি।'

উত্তর দিলাম না, কিছুটা সতর্কভাবে ম্যানেজারকে লক্ষ্য করতে লাগলাম।

ম্যানেজার তারকনাথ হালদার আবার বলল, 'অনেক দিন আগেই আপনাকে দেখতে চেয়েছিলুম, বুঝলেন?'

এবারও আমি চুপ, আগের মতোই নিরীক্ষণ করে যাচ্ছি।

ম্যানেজারের গলা ঝট করে আবার চড়ায় উঠল। সমানে সে বলে যেতে লাগল, 'হাজার বার আপনার কাছে লোক পাঠিয়েছি। নিজেও তিরিশ চল্লিশ বার গেছি, বয়গুলোকে নজর রাখতে বলেছি। কিন্তু আপনাকে ধরতে পারি নি। হোটেল চালিয়ে চালিয়ে দাড়ি পাকিয়ে ফেললাম, আপনার মতো বোর্ডার লাইফে দেখি নি।'

মনে মনে ভাবলাম, শালা তুমি আমাকে ধরবে! তুমি তারকনাথ হালদার—বাবা তারকনাথ, আর আমি হলাম পিটার স্বয়ম্ভু হোড়। আমাকে ধরতে হলে তোমায় আটান্ন বার জন্ম নিতে হবে। তুমি তো জানো না, ক্যাশ-কাউন্টারের ওই ছোকরাটার মতো সিগারেট গাঁজা, আর মাঝে মাঝে দু-এক পাঁট বাংলা মাল সাপ্লাই করে বয়গুলোকেও হাতের মুঠোয় পুরে ফেলেছি। ওদের পাঠিয়ে আমাকে ধরতে চেয়েছ—ফুঃ! আর তুমি নিজে এসে যে ধরবে, সেটিও হচ্ছে না। তেতলায় আমার ঘরের দিকে যখন পা বাড়িয়েছ তার আধ ঘন্টা আগে বয়রা তোমার আসার খবর দিয়ে গেছে। অতএব তুমি যাও ডালে ডালে, আমি যাই পাতায় পাতায়—হে-হে। যাই হোক, মুখে বললাম, 'তার মানে চারদিকে বেশ ইঁদুরকল পেতেছিলেন। কিন্তু—'

ম্যানেজার খেঁকিয়ে উঠল, 'কিন্তু কী?'

টেবলের ওপর ঈষৎ ঝুঁকে নিজের বুকে একটা আঙুল রেখে হে
'দিস র‍্যাট ফাঁদে পা দেয় নি। ব্যাপারটা কি জানেন দাদা, আপনার সঙ্গে দে
অসুবিধে ছিল।'

'কিসের অসুবিধে?'

'আপনি মশাই এত এক্সপিরিয়েন্সড মাল—সরি, শাহেনশা, এটা বুঝতে পরছে
তর্জনী আর বুড়ো আঙুলের সাহায্যে টাকা বাজাবার ভঙ্গি করে বললাম, 'পকেটে ক্যাশ ছিল না যে।'

দ্রুত কী চিন্তা করে নিল ম্যানেজার। তারপর মেরুদণ্ড টান করে খাড়া হয়ে বসল। আগ্রহের সুরে বলল, 'এখন ক্যাশ এসেছে নাকি?'

ভুরু নাচাতে নাচাতে এবং টেবলে আঙুলের টোকা দিয়ে তবলার বোল তুলতে তুলতে বললাম, 'না এলে কি আপনার ওই আফ্রিকার ম্যাপের মতো মুখটা দেখতে আসতাম?' বলেই আচমকা তবলা থামিয়ে অ্যাটাচি কেস খুলে আমেরিকান ব্যাঙ্কের সেই ঝকঝকে চেক বইটা এবং একটা পেন বার করে টেবিলের ওপর রাখলাম।

ঈষৎ বিমূঢ়ের মতো মুখ করে ম্যানেজার বলল, 'কী ব্যাপার?'

'বম্বে থেকে আমার একটা ব্যাঙ্ক ড্রাফট আসাব কথা আপনাকে বলেছিলাম, মনে আছে?'

'হুঁ, কী একটা যেন বলেছিলেন—'

'সেই ড্রাফটটা এসে গেছে। ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টও ওপেন করেছি। ভালো কথা, সিগারেট আছে?'

লক্ষ্য করছি, ম্যানেজারের মুখচোখের কোঁচকানো কর্কশ ভাবটা আর নেই। আমেরিকান ব্যাঙ্কের চেক বইটা তাকে অনেকখানি মসৃণ করে ফেলেছে। ব্যস্তভাবে সে বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।' তারপর টেবলের ড্রয়ার টেনে দ্রুত সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার বার করল।

আমার বুকের পাটা আছে, কি বলেন। একটা সিগারেট ধরিয়ে মুখ থেকে পাঁচ-সাতটা ধোঁয়ার আংটি হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে বললাম, 'আপনার যেন কত পাওনা রয়েছে?'

ঘাড় চুলকে তেলতেলে মুখে ম্যানেজার বলল, 'তেমন কিছু নয়, তিন মাসে চারশো আশি। তার থেকে অ্যাডভান্সের কুড়ি টাকা বাদ দিলে চারশো ষাট টাকা।'

পেনেব ক্যাপ খুলতে খুলতে বললাম, 'একটা ঝামেলা হল যে—'

ম্যানেজার বলল, 'কী?'

'এক্ষুনি আপনাকে ক্যাশ দিতে পারছি না। একটা বেয়ারার চেক লিখে দিই, একটু কষ্ট করে কাল কাউকে ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে ভাঙিয়ে নেবেন। প্লিজ—'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। এর মধ্যে আবার ঝামেলার কী?'

আমি করলাম কি, চারশো ষাট না, পুরোপুরি ছ'শো টাকার ফিগার বসিয়ে একটা চেক কেটে ম্যানেজারকে দিলাম।

ম্যানেজার টাকার অঙ্কটা দেখে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'এ কি, এক শো চল্লিশ টাকা বেশি লিখে ফেলেছেন—'

'সজ্ঞানে সুস্থ মস্তিষ্কেই লিখেছি দাদা—' হেসে হেসে বলতে লাগলাম, 'আমার এক্ষুনি এক শো চল্লিশটা টাকা দরকার কিন্তু কালকের আগে চেক ভাঙানো যাবে না। কাইন্ডলি ওই টাকাটা যদি আমাকে দ্যান—কাল ব্যাঙ্কে গেলেই পেয়ে যাচ্ছেন। মানে একটা রাতের জন্যে—'

'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই—'চেকটা সযত্নে ভাঁজ করে ড্রয়ারে রেখে চাবি ঘুরিয়ে বন্ধ করল ম্যানেজার। তারপর বুক পকেট থেকে একখানা এক শো টাকার এবং চারখানা দশ টাকার নোট বার করে আমাকে দিল।

টাকাটা নিতান্ত অবহেলায় পকেটে পুরতে পুরতে মনে মনে বললাম, 'শালা ওই চেক

মাদুলি করে গলায় ঝুলিয়ে রেখো।' তারপর অ্যাটাচি কেস এবং জামা কাপড়ের প্যাকে হাতে ঝুলিয়ে উঠে পড়লাম। মনে মনে স্লোগান দিলাম, 'আমেরিকান ব্যাঙ্ক, জিন্দাবাদ মুখে অবশ্য ম্যানেজারকে বললাম, 'থ্যাঙ্ক ইউ। জয় বাবা তারকনাথের জয়।' বলেই ছ ইগি জিভ কাটলাম, 'অ্যাই মাইরি, কিছু মনে করবেন না। টাকাটা দিয়ে দারুণ উপকার করলেন ফিলিংসের মাথায় কথাটা বেরিয়ে এসেছে।'

ম্যানেজার ঘাড় হেলিয়ে বিগলিত হাসল শুধু, কিছু বলল না।

এবার পকেট থেকে আমার ঘরের চাবিটা বার করে ম্যানেজারকে দিতে দিতে বললাম 'এটা রাখুন—'

কী-বোর্ডে চাবি ঝুলিয়ে রাখতে রাখতে ম্যানেজার জিজ্ঞেস করল, 'বেরুচ্ছেন নাকি?

'হ্যাঁ। একটু ঘুরেটুরে আসি।' আমি মাথা নাড়লাম।

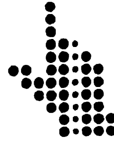
ম্যানেজার চোখ টিপল, 'সেখানেও একবার যাবেন তো?'

ইঙ্গিতটা বুঝলাম। হেসে হেসে বললাম, 'দেখি—'বলেই দরজার দিকে ঘুরলাম।

ম্যানেজার পেছন থেকে বলল, 'দাঁড়ান হোড়বাবু, আমিও বেরুব। একবার শ্যামবাজার যেতে হবে।'

উত্তর দিলাম না। দ্রুত চিন্তা করে নিলাম, লোকটা কোনরকম গন্ধ পেয়েছে কি? পরক্ষণেই মনে হল, আমার আচরণে বা কথাবার্তায় সন্দেহজনক কিছুই ছিল না। নিষ্পাপ শিশুর মতো মুখ করে হাসতে হাসতে লোককে এমনভাবে পথে বসিয়ে দিই যে আগে থেকে তারা টেরই পায় না। যখন পায় তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। অতএব বাবা তারকনাথের সাধ্য নেই আমাকে সামনাসামনি ধরতে পারে। পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হয়ে বললাম, 'আসুন—'

একটু পর আমরা বি. টি. রোডে চলে এলাম।



এখন ন'টার মতো বাজে। সময়টা জুনের মাঝামাঝি অর্থাৎ গরম কালের জের এখনও চলছে। আকাশের কোথাও এক ফোঁটা মেঘ নেই। এই রাত ন'টার সময়ও উল্টোপাল্টা গরম বাতাস হু হু করে বয়ে যাচ্ছে। ধোঁয়ার ধুলোয় চারদিক আবছা। মনে হয় শহরতলির এ দিকটা সারা গায়ে উলঙ্গবাহার শাড়ি জড়িয়ে রয়েছে।

এত রাতেও বি. টি. রোডে মানুষ এবং গাড়িটাড়ির দারুণ ভিড়। কলকাতার দিক থেকে লরির প্রকাণ্ড কনভয় ছুটে আসছে। ওদের কেউ যাবে পাঞ্জাব, কেউ হরিয়ানা, কেউ মহারাষ্ট্র, কেউ বা তামিলনাড়ু। কলকাতার দিকেও বিপরীত একটা স্রোত চলেছে। এগুলো আসছে ইণ্ডিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। এ ছাড়া আছে প্রাইভেট এবং স্টেট বাস, ঠেলা, রিকশা, মিনি বাস ইত্যাদি।

হোটেল থেকে বেরিয়ে বাঁ দিকে একটু গেলেই বাস স্ট্যাণ্ডের গায়ে নটবরের পান-সিগারেটের দোকান। পান-সিগারেট ছাড়াও এখানে সোডা-লেমনেড পাওয়া যায়। দুটো করে পয়সা বেশি দিলে পোস্ট কার্ড আর এনভেলাপও মেলে।

নটবরের দোকানের সামনেও আমার জন্য একটা রেড সিগন্যাল জ্বালা আছে। ওটাও আমার পক্ষে নিষিদ্ধ এলাকা। হে-হে মহাশয়গণ, কারণটা বুঝতে নিশ্চয়ই আপনাদের অসুবিধে হচ্ছে না। নটবর আমার কাছে সিগারেট বাবদ পঞ্চাশ-ষাট টাকার মতো পাবে।

দিন কুড়ি বাইশ আমি ওদিকে যাই নি, আজ কিন্তু গেলাম। ম্যানেজার তারকনাথ হালদার আমার সঙ্গে সঙ্গেই আছে।

আমাকে দেখে মধ্যবয়সী দড়ি-পাকানো চেহারার নটবর প্রায় লাফিয়ে উঠল। গলার শির ছিঁড়ে চেঁচাতে লাগল, 'আপনাকে কদ্দিন ধরে খুঁজছি! রোজ একবার করে আপনার হোটেলে যাচ্ছি, তেতলা পর্যন্ত ওঠানামা করতে করতে পায়ের কব্জা ঢিলে হয়ে গেছে। আমি গরিব মানুষ, এত টাকা বাকি ফেলে রাখলে—'

আমার চোখে মুখে সেই নিষ্পাপ পবিত্র হাসিটা ঝুলেই ছিল। হাত তুলে নটবরকে থামালাম। ব্যাপারটা যেন কিছুই নয় এমনভাবে বললাম, 'তুমি কত পাবে?' আমার কণ্ঠস্বর মাখনে ডোবোনো।

নটবর দ্রুত একবার আমাকে দেখে নিল, কিছু একটা ভাবলও হয়ত। তারপর ব্যস্তভাবে বলল, 'বাহান্ন টাকা চল্লিশ পয়সা।' তার গলায় একটু আগের সেই উত্তেজনাটা নেই।

'হিসেবের খাতাটা দেখি।'

ধারে আমি যা যা নিই তার তালিকা খাতায় টুকে রাখে নটবর। তাড়াতাড়ি খাতা বার করল সে। এতদিন পর টাকাটা পাবে, সেই আশায় তার চোখ চক চক করছে।

নটবরের মুখের দিকে তাকাতে পারছি না। আমার পেটের মধ্যে ফুটন্ত দুধের মতো একটা হাসি উথলে উথলে উঠছে। ওর দিকে তাকালে হাসিটা কিছুতেই চাপতে পারব না। নটবর যদি জানতে পারে কোনদিনই সে তার পাওনা টাকা পাবে না তখন তার আশা-চকচকানো মুখের চেহারাটা কিরকম দাঁড়াবে ভাবতেও সাহস হয় না। হিসেবের খাতায় অনেকখানি ঝুঁকে গম্ভীরভাবে বললাম, 'তিন প্যাকেট গোল্ডফ্লেক দাও তো—' বলেই হাত বাড়িয়ে দিলাম।

না তাকিয়েও টের পাচ্ছি নটবরের মুখটা যেন কিরকম হয়ে গেছে। বিমূঢ়ের মতো সে গোল্ডফ্লেকের প্যাকেটগুলো আমার দিকে বাড়িয়ে দিল।

সিগারেট পকেটে রেখে পেন বার করে হিসেবের খাতায় যেখানে ধারের অঙ্কটা বাহান্ন টাকা চল্লিশ পয়সায় দাঁড়িয়েছে তার তলায় আজকের তারিখ দিয়ে লিখলাম, তিন প্যাকেট গোল্ডফ্লেক দাম তিন টাকা পঁচাত্তর পয়সা। তারপর আগের পাওনাটার সঙ্গে যোগ দিলাম। যোগফল দাঁড়াল ছাপ্পান্ন টাকা পনের পয়সা।

খাতা ফেরত দিলাম। নটবর হিসেবটা একবার দেখেই হঠাৎ খেপে গেল। চিৎকার করে বলল, 'এর মানে কী, অ্যাঁ?' মনে হল তার গলার নলী এখনই ছিঁড়ে যাবে।

হাত তুলে সেই অ্যাঞ্জেলমার্কা হাসিটি হেসে তাকে থামালাম। বললাম, 'কাল বারোটার মধ্যে টু-দি-পাই শোধ করে দেব। এখন ন'টা বাজে। ওনলি পনের ঘন্টা সময় চাইছি—'

নটবর আবার চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল, আমার ঘাড়ের পাশ থেকে ম্যানেজার তারকনাথ হালদার বলে উঠল, 'ভয় নেই নটবর, কালই টাকাটা পেয়ে যাবি। মিস্টার হোড় ব্যাঙ্কে ড্রাফট জমা দিয়েছেন, কাল চেক ভাঙিয়ে তোকে দিয়ে দেবেন।'

ম্যানেজারের সঙ্গে নটবরের ভালোই জানাশোনা আছে। এখান থেকেই হোটেলে বিড়ি-সিগারেট-পান-সোডা-লেমনেড যায়। মনে মনে আবার সেই স্লোগানটা আওড়ালাম, 'আমেরিকান ব্যাঙ্ক জিন্দাবাদ।'

এদিকে ম্যানেজারের কথায় কাজ হল। নটবর বলল, 'ঠিক আছে, আপনি যখন বলছেন—'

নটবরের দোকানের সামনেই বাস-স্টপ। আমাদের কথাবার্তার মধ্যে শ্যামবাজারের বাস এসে গেল। ম্যানেজার সেদিকে ছুটতে ছুটতে বলল, 'আমি চলি—' চোখের পলকে ভিড়ের বাসে উঠে পড়ল সে।

আমিও আর দাঁড়ালাম না। এই এলাকা ছেড়ে যাওয়ার আগে আমার আরো কিছু কাজ আছে। বাঁ দিকে কয়েক পা হেঁটে সোজা 'মলিন মুক্তি'তে চলে এলাম। আসলে এটা একটা লন্ড্রি, কাব্য করে এরকম নাম দেওয়া হয়েছে।

'মলিন মুক্তি'র প্রোপ্রাইটার-কাম-ম্যানেজার ত্রিনাথ পুরকায়স্থ তার লন্ড্রিতেই বসে ছিল। সে ঠিক যুবকও নয় আবার প্রৌঢ়ও নয়, দুইয়ের মাঝামাঝি তার বয়েসটা থমকানো। দারুণ সৌখিন, নিখুঁত কামানো মুখে কার্তিকমার্কা গোঁফ, টকটকে রং, পরনে কুঁচনো ধুতি আর সিল্কের পাঞ্জাবি, গায়ে ভুরভুরে সেন্টের গন্ধ। এ অঞ্চলে এক মাইলের মধ্যে যত ফাংসান হয় সে-সব জায়গায় অর্গানাইজারদের হাতে পায়ে ধরে সে আধুনিক গান গেয়ে থাকে। শালা আর্টিস্ট!

ত্রিনাথের লাইফের তিনটে বড় সাধ। এক নম্বর ঃ রেডিওতে গান গাওয়া। দু নম্বর ঃ রেকর্ড করা। তৃতীয় নম্বরটি হল ঃ হিন্দি ছবিতে প্লে ব্যাক করা । আমি জানি ইহজন্মে শালার একটা সাধও মিটবে না। বুড়ো বয়েসে খোল-কত্তাল বাজিয়ে সেই যে কি একটা যেন গান আছে, 'আমার সাধ না মিটিল আশা না পুরিল—' সেটা গাইতে হবে ত্রিনাথকে।

আমাকে দেখে ত্রিনাথ হেসে হেসে বলল, 'আসুন দাদা, আসুন—'

আমি যেখানেই যাই দু'দিনে জমিয়ে ফেলি। ত্রিনাথের সঙ্গে নিজের দরকারেই যেচে আলাপ-টালাপ করেছিলাম। আলাপ থেকে এক ধরনের ঘনিষ্ঠতাও হয়েছে। মানুষের শরীর বা মনের দুর্বল গ্ল্যান্ড কোনটা, কয়েক ঘন্টা মিশলেই টের পেয়ে যাই এবং প্রয়োজনমতো সেই জায়গাটায় সুড়সুড়ি দিয়ে থাকি। রেডিও আর প্লে-ব্যাক সিঙ্গার হওয়ার ইচ্ছা ত্রিনাথের সেই রকম একটা গ্ল্যান্ড। বললাম, 'কি, গান বাজনা কিরকম চলছে?'

ত্রিনাথ বলল, 'মোটামুটি। আপনার সঙ্গে লাস্ট উইকে দেখা হয়েছিল। তারপর আঠারোটা গানে সুর দিয়েছি।'

'গুড, ভেরি গুড। এক উইকে আঠারোটা গান, বেশ ভালো আউটপুট।'

ত্রিনাথ বিগলিত হেসে বলল, 'আমাদের বাড়ি চলুন না। শুনিয়ে দেব—'

'আজ একটু কাজ আছে। কাল এসে শুনব, কেমন? ডোন্ট মাইণ্ড।'

ত্রিনাথের মুখে ছায়া পড়তে পড়তেই মিলিয়ে গেল। সে বলল, 'আরে না না, মনে করব কেন? কাল কিন্তু আসতেই হবে।'

'সিওর। তারপর রেডিওতে যে অডিসান দিয়েছিলেন তার কিছু খবর এল?'

'না—' হতাশ ভাবে মাথা নাড়ল ত্রিনাথ।

'রেকর্ড কোম্পানির কোন খবব পেলেন?'

'না।'

'বম্বেতে মিউজিক ডাইরেক্টরদের যে চিঠি লিখেছিলেন তার রিপ্লাই পেয়েছেন?'

'ন্ না—'

মনে মনে বললাম, 'শালা কেউ তোমাকে খবর দেবে না। তোমার যা গলা, হাঁ করলে কানে র‍্যাঁদা ঘষে যায়।' মুখে বললাম, 'আপনি তো অনেক চেষ্টা করলেন। যদি বলেন এবার আপনার কেসটা আমি একটু দেখি—'

সামনের দিকে ঝুঁকে ত্রিনাথ বলল, 'আপনার জানাশোনা কেউ আছে নাকি?'

স্বর্গীয় হেসে বললাম, 'রেডিওতে আমার এক বন্ধু আছে, প্রোগ্রাম একজিকিউটিভ। আর—'

উত্তেজনায় চোখের তারা দুটো যেন ছিটকে বেরিয়ে আসবে ত্রিনাথের, 'আর কী।'

'এস-ডি'কে তো এক সময় দাদা বলতাম, সাউথ ক্যালকাটায় পাশাপাশি বাড়িতে তখন থাকতাম আমরা। এখনও যদি চিনতে পারেন—'

'এস-ডি কে?'

'গান বাজনার লাইনে আছেন, এস-ডি'কে চেনেন না?'

'মানে ঠিক—' ত্রিনাথ মুখ কাঁচুমাচু করে বলল।

ত্রিনাথের মুখটা দেখে করুণাই হল। বললাম, 'শচীন কর্তার নাম শোনেন নি?'

'শচীন দেব বর্মণ?'

'এই তো ধরেছেন—'

ত্রিনাথ খাড়া উঠে দাঁড়াল, 'শচীন দেবের সঙ্গে আপনার আলাপ আছে, আমাকে আগে বলেন নি তো!'

বললাম, 'আপনি কি জানতে চেয়েছেন?'

'দাদা যদি শচীন দেবকে ধরে হিন্দি ফিল্মে আমার একটা গতি করে দেন হোল লাইফ আপনার জুতোর ফিতে বেঁধে দেব।'

'আপনার কেসটা যখন হাতে নিয়েছি তখন—'এই পর্যন্ত বলে চোখ টিপে একটা ইঙ্গিত করলাম, আর তাতেই একেবারে বিগলিত হয়ে বেঁকে চুরে গেল ত্রিনাথ।

এই হল সময়। একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'একটা বিপদে পড়েছি ভাই, উদ্ধার

করতে হবে যে—'

ত্রিনাথ আমার মুখের দিকে তাকাল।

বলতে লাগলাম, 'কাল একটা পার্টিতে যেতে হবে, ভালো স্যুট দরকার।'

মাঝে মাঝেই পার্টি-ফার্টির নাম করে ত্রিনাথের লন্ড্রি থেকে দু'একদিনের জন্য ট্রাউজার্স, কোট-টোট ধার করি। এসবের জন্য তাকে অবশ্য ভাড়া দিই। একদিনের জন্য নিলে দু'টাকা, দু'দিনের জন্য তিন টাকা। অবশ্য এই টাকাটা আমি নগদই দিয়ে থাকি। হে-হে মহাশয়গণ, বুঝতেই পারছেন দামী পোশাক-টোশাক গায়ে থাকলে ইম্প্রেসান ভালো হয়। তাতে আমার দারুণ সুবিধা। বাইরেটা দেখে লোকে যখন মুগ্ধ-টুগ্ধ হয় তখনই নিজের অজান্তে সে একটা অদৃশ্য ফাঁদের দিকে পা বাড়াতে থাকে।

ত্রিনাথ বলল, 'এ আবার একটা বিপদ নাকি! আমি যতক্ষণ আছি—' নিজে উঠে গিয়ে সব চাইতে দামী স্যুটটা নামিয়ে কাগজে প্যাকেট করে আমার হাতে দিল সে।

ম্যানেজার তারকনাথ হালদার যে এক শো চল্লিশটা টাকা দিয়েছিল তার থেকে একখানা দশ টাকার নোট বার করে ত্রিনাথকে দিতে গেলাম। বললাম, 'ভাড়াটা নিয়ে নিন।'

হাই ভোল্টেজ ইলেকট্রিক তার দেখার মতো লাফ দিয়ে তিন পা পিছিয়ে গেল ত্রিনাথ। জিভ কেটে বলল, 'না দাদা, ওটা নিতে পারব না। আজ থেকে আপনার স্যুট-টুট যা লাগবে সব ফ্রি।'

শালাকে যা ডোজ দিয়েছি তাতেই ঘাড় ভেঙে কাত হয়ে পড়েছে। বললাম, 'না নিলে আর কী করব!' নোটটা পকেটে পুরতে পুরতে বললাম, 'আচ্ছা ভাই আজ চলি—'

'আসুন। কাল আসছেন কিন্তু—'

রাস্তায় নেমে ভাবলাম, ভাগ্যিস মানুষের দেহে এক-আধটা করে উইক গ্ল্যাণ্ড আছে, নইলে আমার যে কী হত! ত্রিনাথের জন্য কিঞ্চিৎ দুঃখই হচ্ছে। শালার স্যুটটা জন্মের মতো গেল।

বাঁ দিকে খানিকটা যাবার পর ঘাড় ফিরিয়ে একবার তাকালাম। দূরে 'গ্রেট হিমালয়ান বোর্ডিং হাউস'-এর তেতলা বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। সামনের দিকে প্রকাণ্ড টিনের সাইনবোর্ডের ওপর টিউব লাইট জ্বলছে। আস্তে করে বললাম, 'গুড বাই গ্রেট হিমালয়ান বোর্ডিং হাউস—'

কিছুক্ষণ আগেও ওটাই ছিল আমার সর্বশেষ আস্তানা। এর আগে আরো চল্লিশটা হোটেল, [illegible] ধর্মশালা, সতেরটা গেস্ট হাউস, তিন চারটে অনাথ আশ্রম এবং কলকাতার চারপাশে যত রেল স্টেশন আছে সেগুলোর ওয়েটিং রুমে লাইফের এতগুলো বছর কাটিয়ে দিয়েছি। পায়ের তলা থেকে একটু আগে আমার লাস্ট শেলটার তো চলে গেল। এখন আমি কোথায় যাব?

মহাশয়গণ, আপনারা নিশ্চয়ই বুঝে নিয়েছেন আমি হাজার ঘাটের জল খাওয়া মাল, কোনো ব্যাপারেই খুব সহজে ঘাবড়াই না। তবু নতুন একটা আস্তানা তো খুঁজে নিতে হবে। তার জন্য কোথাও একটু বসে ভেবে নেওয়া দরকার। কোথায় বসব সেটা অবশ্য ঠিক করাই

আছে। মহাশয়রা, আমাকে লক্ষ্য করতে থাকুন।

বি. টি. রোড ধরে শ্যামবাজারের দিকে আরো খানিকটা এগিয়ে একটা গলির ভেতর ঢুকে পড়লাম। বেশি দূর যেতে হল না, আমি যেখানে এসে দাঁড়ালাম সেটা কোন পবিত্র স্থান নয়। দেখেই বুঝতে পারছেন, শহরতলির এটা একটা শুঁড়িখানা। কালীমার্কা বাংলা মদ আর গাঁজার লাইসেন্সপ্রাপ্ত দোকান আর কি।

কিছুক্ষণ আগে ম্যানেজার তারকনাথ হালদার চোখ টিপে এখানে আসার ইঙ্গিতই করেছিল।

দোকান ঘরটা বেশ বড়সড়ই। ওপরে টালির চাল। চারধারে ইটের দেওয়াল। রাস্তা থেকে আমি ভেতরে চলে এলাম।

একধারে তক্তাপোষের ওপর পুরু গদি পাতা। সেখানে কোলের কাছে স্টিলের ঢাউস ক্যাশবাক্স নিয়ে দোকানের মধ্যবয়সী প্রোপ্রাইটর বসে আছে। লোকটার মাথার চুল খাড়া-খাড়া, রং চকচকে কালো, চৌকো মুখ, চওড়া চওড়া হাড়ের ফ্রেমে প্রকাণ্ড শরীর, গোল চোখে তীক্ষ্ণ সতর্কতা। পরনে কুঁচানো ধুতি আর কারুকাজ-করা ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি। পাঞ্জাবির তলা থেকে গোলাপি রঙের জালি গেঞ্জি ফুটে বেরুচ্ছে। গলায় সোনার হার, দু'হাতে প্রবাল-গোমেদ-ক্যাটস আই ইত্যাদি মিলিয়ে কম করে ছ'সাতটা আংটি।

লোকটার পেছন দিকের দেয়ালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দেওয়া এই দোকানেব লাইসেন্সখানা বাঁধিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। তার ওপর মনসা, মহাদেব এবং কালীর তিনটে প্রকাণ্ড ছবি।

বাকি তিনটে দেওয়াল ঘেঁষে খেলো কাঠের সারি সারি বেঞ্চ আর টেবল পাতা। এগুলো খদ্দেরদের বসবার জন্য। এই দেওয়ালগুলোর ওপর দিকে আধন্যাটো ফিল্মস্টারদের ছবি ভক্তি সহকারে টাঙিয়ে রাখা হয়েছে।

হোটেল থেকে যখন বেরিয়েছিলাম তখন ন'টা বাজে। তারপর ত্রিনাথের লড্রিতে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মতো কেটেছে। তার মানে এখন বেশ রাত হয়েছে। দোকান ঘরের মাঝমধ্যিখানে, ঠিক মাথার ওপর ধুলোবালি জমা ষাট পাওয়ারের একটা বাল্ব টিমটিম করে জ্বলছিল। তিন মাস এখানে নিয়মিত যাতায়াত করছি, বাল্বটাকে কোনোদিন পরিষ্কার করতে দেখি নি।

শুঁড়িখানায় এই মুহূর্তে দারুণ ভিড়। জায়গাটা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, কাজেই বেশির ভাগ খদ্দেরই লেবার ক্লাসের। বেঞ্চগুলোতে তারা গাদাগাদি করে বসে আছে। দোকানের তিন চারটে ছোকরা ফটাফট বোতল খুলে মাটির খুরিতে খুরিতে বাংলা মদ ঢেলে শালপাতায় চাট সাজিয়ে তাদের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল।

আমাকে দেখে প্রোপ্রাইটর রাধাকান্ত কুণ্ডু সম্ভ্রমের গলায় বলল, 'আসুন হোড় সাহেব, আসুন—'

মহাশয়গণ, আমি এই শুঁড়িখানায় একজন সম্মানিত কাস্টমার, ভি-আই-পি'ই বলতে

পারেন। তিন মাস আগে প্রথম দিন এখানে এসেই রাধাকান্ত কুণ্ডুকে পঞ্চাশ টাকা অ্যাডভান্স করে বলেছিলাম, 'এটা আপনার কাছে থাক, রোজ এসে মাল খাব। শেষ হলে বলবেন, আবার অ্যাডভান্স করব।' রাধাকান্ত সেদিনই ফাঁদে পড়ে গিয়েছিল। টাকা আগাম জমা রেখে মাল খায়, এমন খদ্দের তার ফোরটিন জেনারেশানে আগে কেউ কখনও দেখেনি। তারপর তিন মাস এখানে আসছি, বাংলা মদ খাচ্ছি, সেই পঞ্চাশ টাকা করেই শেষ হয়ে গেছে। আমার ধারণা আমার কাছে রাধাকান্তর দু' আড়াইশো টাকা পাওনা হয়ে গেছে। সে কিন্তু একবারও তাগাদা দেয় না, আমার সততা সম্বন্ধে সে এক্কেবারে নিশ্চিন্ত। আমি অবশ্য মাঝে মাঝে বলি, 'এবার হিসেবটা দেখুন—' ওটা স্রেফ বলার জন্যই বলা। রাধাকান্ত বলে, 'দেখব দেখব। আপনার ওপর বিশ্বাস আছে দাদা, টাকা আমার চোট যাবে না।' শালা ওই বিশ্বাস ধরেই ঝুলে থাকো। কবে যে তোমাকে পথে বসাব তা তো জানো না।

রাধাকান্ত আবার বলল, 'দাঁড়িয়ে কেন, বসুন—বসুন হোড়সাহেব।' যে সব কাস্টমার আগেই এসে বেঞ্চ দখল করে বসেছিল তাদের বলল, 'এই তোমরা একটু সরে সরে বোসো, হোড়সাহেবকে বসতে দাও—'

ডান দিকের একটা বেঞ্চে আমার জন্য কয়েক ইঞ্চি জায়গা হয়ে গেল। বসার সঙ্গে সঙ্গে একটা ছোকরা আমার সামনে খুরিভর্তি ধান্যেশ্বরী আর লাল টকটকে ঘুগনির চাট রেখে গেল।

মহাশয়গণ, জানি আপনারা আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। সামনে দিশি মদ আর চাট নিয়ে আমি কিন্তু আপনাদের দিকে আর তাকাতে পারব না। হে-হে বুঝতেই পারছেন, এই মদের খুরি এবং চাট সম্বন্ধে আমার কিছু মহান কর্তব্য আছে।

এই শুঁড়িখানা, দেওয়ালে দেওয়ালে টাঙানো দেবদেবী এবং ফিল্মস্টারদের ছবি, টিমটিমে আলো, খদ্দেরদের ভিড়—কিছুক্ষণের মধ্যে আমার চোখের সামনে থেকে এ সব ঝাপসা হয়ে গেল। অন্যমনস্কর মতো ভাবতে লাগলাম, গাঁজা মদের এই দোকান থেকে বেরিয়ে কোথায় যাব? আমার পকেটে এই মুহূর্তে ম্যানেজারের সেই এক শো চল্লিশ টাকা তো আছেই, তা ছাড়া আরো কুড়ি বাইশটা টাকাও রয়েছে। দশ পনেরো টাকা অ্যাডভান্স দিয়ে শিয়ালদার কাছে কোন বাজে হোটেলে ওঠা যায়। অবশ্য আরো এক জায়গায় যেতে পারি। পাঁচ সাতটা টাকা খরচ করলে রাতটা কোন শস্তা দামের বেশ্যার ঘরেও কাটানো যায়। এমন অভ্যেস আমার আছে। তারপর কাল সকালে উঠে একটা আস্তানা খুঁজে নেওয়া যাবে।

ভাবতে ভাবতে শেষ পর্যন্ত ঠিক করলাম, নাঃ মহাশয়রা, বেশ্যালয়ে নয়, শিয়ালদার কোনো হোটেলেই উঠব। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

সাত খুরি ধান্যেশ্বরী পাকস্থলীতে চালান করার পর এখন নিজেকে বেশ 'টিপসি' লাগছে। তা ছাড়া কোথায় উঠব, সেই চিন্তাটাও আর নেই। মেজাজটা এখন রীতিমত ঝরঝরে।

রোজ আট খুরি বাংলা মদ আমি খেয়ে থাকি। সাত খুরি হয়ে গেছে, আর এক খুরি হলেই আজকের 'কোটা' শেষ। দোকানের একটা ছোকরাকে শেষ খুরিটা দিতে বলব, সেই সময় বাঁ দিকের বেঞ্চ থেকে কে যেন চেঁচিয়ে উঠল, 'শালা ফোরটুয়েন্টিগিরি করার জায়গা

পাও না—'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকালাম। চোখে পড়ল পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের এক ছোকরা, চোয়াড়ে ভাঙাচোরা মুখ, দু-তিনদিনের না-কামানো গাল, গাঁট পাকানো হাত-পা, চওড়া জুলপি, কাঁধ-পর্যন্ত-নামা হিপি-মার্কা চুল, পরনে ড্রেন পাইপ আর বুক-খোলা খেলো বুশ শার্ট, পায়ে হাওয়াই চপ্পল—ঝুঁকে বাংলা মালের খুরিতে একেক বার চুমুক দিচ্ছে, তারপরেই ঝট করে মুখটা তুলে হাত-পা ছুঁড়ে চেঁচিয়ে উঠছে, 'চোর—খজড়া—'

শুঁড়িখানায় ঢুকে ছোকরাকে লক্ষ করি নি। খুব সম্ভব সে তখন ছিল না, পরে কখন এসে ঢুকেছে টের পাই নি।

ওদিকে প্রোপ্রাইটার রাধাকান্ত কুণ্ডুর চোখের তারা স্থির হয়ে গেছে, চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছে। কড়া গলায় সে বলল, 'কী হয়েছে?'

সেই ছোকরা ভেংচে উঠল, 'কী হয়েছে টের পাচ্ছেন না? এমন ব্যবসা ক'দিন চালাচ্ছেন?'

এবার মনে হল রাধাকান্তর চোখ দুটো রাগে এবং উত্তেজনায় ফেটে যাবে। গলার কাছে একটা শিরা ফুলে উঠে ঘোড়ার মতো লাফাচ্ছে। দাঁতে দাঁত চেপে সে বলল, 'কি রকম ব্যবসা, অ্যাঁ?'

'এই শালা মালে জল দিয়ে বেচছো—'

'মালে জল দিয়ে আমরা বেচি?'

'আলবাৎ। টুয়েন্টি পারসেন্ট ওয়াটার আছে—'

অন্য খদ্দেররা হাঁ করে অবাক তাকিয়ে আছে। আমার কিন্তু দারুণ মজা লাগছিল। ছোকরাকে বললাম, 'কত পারসেন্ট জল আছে বলা যায় নাকি?'

ছোকরা আমার দিকে ঘাড় হেলিয়ে দিল, 'যায় দাদা।' তারপর নিজের বুকে একখানা আঙুল ঠেকিয়ে বলল, 'এই শালা বোদা মাকড়া মালে জিভ ঠেকিয়ে বলে দিতে পারে কত পারসেন্ট ভেজাল চালিয়েছে। এক পারসেন্ট এদিক সেদিক হলে আমার জামা-প্যান্ট খুলে নাগা সন্ন্যাসী সাজিয়ে মনুমেন্টের তলায় বসিয়ে দিয়ে আসবেন।' এ রকম ছেলে আগে আর কখনও দেখিনি। কী বলব যখন ভাবছি, ছোকরা অর্থাৎ বোদা মদের খুরিটা হাতে তুলে আবার বলল, 'পুলিশকে খবর দিন, টেস্ট করে দেখুক। দোকানের লাইসেন্স ঘ্যাচাং হয়ে যাবে।'

রাধাকান্ত আরক্ত চোখে বোদার দিকে তাকিয়েই ছিল। বলল, 'মদের বোতলে ছিপি আটকানো রয়েছে, সবার সামনে ছিপি খুলছি। জলটা ঢুকল কোথা দিয়ে?'

বোদা বলল, 'আমাকে কেন ঘাঁটাচ্ছেন মাইরি! ইঞ্জেকসান দিয়ে—'

বোদার কথা শেষ হবার আগেই রাধাকান্ত দোকানের একটা ছোকরাকে ডেকে আচমকা চেঁচামেচি জুড়ে দিল, 'শালা খদ্দেরকে যখন জিনিস দিস, দেখে দিস না? চোখ নেই? মালে জল পড়ল কি করে? হারামীর বাচ্চা চোদ্দ পুরুষের নাম ভুলিয়ে ছাড়ব।'

ছোকরা কাঁচুমাচু মুখে বলল, 'ঠাণ্ডা রাখবার জন্যে বোতলগুলো চৌবাচ্চায় ডুবিয়ে

রাখি। হয়ত ফুটো টুটো ছিল, জল ঢুকে গেছে।'

'যাও শালা, ভেতর থেকে ভালো দেখে বোতল নিয়ে এসো।'

দোকান ঘরটার পেছন দিকে ঘুপচিমতো আরেকটা ঘর আছে। ছোকরা দৌড়ে সেখান থেকে একটা বোতল নিয়ে এলো এবং তক্ষুনি ছিপি খুলে নতুন খুরিতে ঢেলে বোদাকে দিল। আস্তে করে একটা চুমুক দিয়ে আরামে চোখ বুজল বোদা, 'পিওর জিনিস বেরিয়েছে বাবা—এক্কেবারে আগমার্কা মাল।'

আমার আট নম্বর খুরিটা শেষ হয়ে গিয়েছিল। তবু উঠলাম না, পাশের বেঞ্চে বসে বোদাকে লক্ষ করতে লাগলাম। ছোকরাকে আমার বেশ ভালো লেগে গেছে। বোদা পুরো দেড়টি বোতল ফাঁকা করে এক সময় উঠল। তারপর মুখ মুছতে মুছতে দরজার দিকে যেতে লাগল। যখন সে প্রায় বাইরের গলিতে চলে গেছে সেই সময় রাধাকান্ত বলে উঠল, 'অ্যাই, চলে যাচ্ছ যে—'

বোদা থমকে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর বোঁ করে ঘুরে রাধাকান্তর মুখের দিকে তাকাল।

রাধাকান্ত হাত বাড়িয়ে বলল, 'দামটা দাও—'

সবগুলো দাঁত বার করে বোদা হাসি হাসি মুখ করে চোখ টিপল।

ভুরু কুঁচকে রাধাকান্ত বলল, 'কী হল?'

বুড়ো আঙুল এবং তর্জনীতে টাকা বাজাবার মুদ্রা ফুটিয়ে বোদা বলল, 'এথী নেই।'

'নেই মানে?'

জামা এবং প্যান্টের পকেটগুলো উল্টে দিয়ে বোদা বলল, 'অ্যাই দেখুন, পকেট ফাঁকা—বিলকুল এম্পটি—'

রাধাকান্তর চোখমুখ দেখে এবার মনে হল সে হত্যা করতে পারে। চিৎকার করে বলল, 'মাজাকি করবার জায়গা পাও না!' দোকানের ছোকরাগুলোকে বলল, 'বানচোতকে ধর তো, ভালো করে সার্চ করে দ্যাখ—'

ছোকরাগুলো ওত পেতেই ছিল, বলামাত্র ঝাঁপিয়ে পড়ল। বোদার জামার কলারে প্যান্টের কোমরের কাছের পটিতে, এমন কি পুরুষাঙ্গে পর্যন্ত হাত চালিয়ে খোঁজাখুঁজি করল। তারপর রাধাকান্তর দিকে তাকিয়ে বলল, 'কিচ্ছু নেই।'

রাধাকান্ত তার গদি থেকে এবার নেমে এল। বোদার মা-বাপ তুলে ঝড়ের বেগে কিছুক্ষণ খিস্তি করে বলল, 'মাগনা মাল খেতে এসে শালার লপচপানি কত! টুয়েণ্টি পারসেন্ট জল দিয়ে বেচছি, নাঃ? দাঁড়া হারামী—'

বোদা দাঁত বার করেই ছিল। বলল, 'আহা মাগনাই খাই আর যা-ই খাই, জিনিসটা খাঁটি না হলে বলব না! হেঁ হেঁ মাইরি, মালে ভেজাল দিলে আমার মাথার ঠিক থাকে না।'

রাধাকান্ত বলল, 'বিনে পয়সায় মাল খাওয়া তোমার বার করছি।' তারপর ছোকরাগুলোকে ইশারা করল, 'বানচোতকে ভালো করে রগড়ে দে তো—'

বোদা দু হাত তুলে হল্লা জুড়ে দিল, 'অ্যাই মাইরি, আবার রগড়ানি কেন? অ্যাই—অ্যাই—খেয়েছি তো মোটে দেড় বোতল মাল—'

তার কথা শেষ হল কি হল না, চারদিক থেকে বৃষ্টির মতো কিল, চড়, লাথি বোদার ওপর এসে পড়তে লাগল। রাধাকান্তও চুপচাপ দাঁড়িয়ে নেই। তারও হাত-পা এবং মুখ সমানে চলছে, 'শালা, শুয়োরের বাচ্চা—'

মার খেতে খেতে একসময় মেঝের ওপর শুয়ে পড়েছে বোদা। তবে একটা ব্যাপার দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম। এত যে লাথি-ফাথি কিল-চড় খাচ্ছে ছোকরা, মুখ দিয়ে কিন্তু একটা শব্দও বেরুচ্ছে না।

মিনিট দশেক এভাবে চলবার পর আচমকা চেঁচিয়ে উঠল বোদা, 'আমাকে মেরে ফেললে, শালারা মেরে ফেললে—'

লক্ষ করলাম, বোদার নাক মুখ দিয়ে গল গল করে রক্ত বেরুচ্ছে।

রক্ত দেখেই কিনা কে জানে, রাধাকান্তরা থমকে গেল। মারটা থামল বটে, খিস্তি কিন্তু সমানেই চলতে লাগল, 'হারামীর বাচ্চাকে পুলিশে দেব। তোল শালাকে, চ্যাংদোলা করে থানায় নিয়ে যাই—'

এতক্ষণ চুপচাপ দৃশ্যটা দেখছিলাম। এবার উঠে পড়লাম। বললাম, 'থাক, আর থানায় টানাটানি করে দরকার নেই। মারটা টেরিফিক হয়েছে, ওতেই দেড় বোতল ধেনোর দাম উঠে গেছে।'

রাধাকান্ত বলল, 'ওই মারে কিসসু হয় নি। শালার লাশ ফেলে দেওয়া উচিত।'

বললাম, 'এতে যদি দাম না উঠে থাকে, ঠিক আছে আমিই দিয়ে দিচ্ছি।'

'আপনি দেবেন কেন?'

'এমনি—' পকেট থেকে টাকা বার করে রাধাকান্তকে দিলাম। সে কিছুতেই নেবে না, একরকম জোর করেই টাকাটা গছালাম।

রাধাকান্ত বলল, 'এ রকম খচড়াদের দয়া করার কোনো মানে হয় না।'

উত্তর দিলাম না, অল্প হেসে বোদার কাছে চলে এলাম।

এদিকে বোদা মেঝে থেকে উঠে বসেছে। জামার হাতায় রক্তটক্ত মুছে আমার দিকে তাকিয়ে দাঁত বার করে হাসল. হাসিটা কৃতজ্ঞতার। তাকে বললাম, 'আর বসে থেকে কি হবে, উঠে পড়।'

হাতে ভর দিয়ে অতি কষ্টে উঠে দাঁড়াল বোদা, টলতে টলতে আমার সঙ্গেই বাইরে বেরিয়ে এল। বি. টি. রোডের দিকে যেতে যেতে বলল, 'শালারা আমাকে কিমা বানিয়ে দিয়েছে। আপনি না থাকলে মেরেই ফেলত।'

'এ ভাবে মাল খেতে এসেছিলে কেন?'

কী করব, ক্যাশ ছিল না যে—'

'তা হলে না এলেই পারতে।'

বোদা অবাক হয়ে গেল, 'এটা কি বলছেন দাদা, ক্যাশ নেই বলে মাল খাব না!'

বেশ চমক লাগল। বোদা যেন আমার মনের কথাই বলছে। পৃথিবীতে এত মদ, এত খাবার, আরামের এত উপকরণ, শুধু টাকা নেই বলে তার ভাগ পাব না! তাই কখনও হয়!

বুদ্ধি খাটিয়ে সব কিছু আদায় করে নিতে হবে। কিন্তু এই ছোকরা একেবারে বোকা, ফুল। আদায়ের কৌশল-টৌশল কিছুই জানে না, তাই মার খেয়ে মরছে। আরে বাবা, কাজ গুছিয়ে নিবি কিন্তু কেউ টের পাবে না। মাখনের ভেতর দিয়ে ছুরির মতো মসৃণভাবে চলে যেতে হবে। বললাম, 'ক্যাশ না নিয়ে এর আগেও মালের দোকানে ঢুকেছ নাকি?'

বোদা জড়ানো গলায় বলল, 'ঢুকেছি, মালও খেয়েছি।'

'তারপর?'

'তারপর আর কি, একটু আগে যা দেখলেন তা-ই, টেরিফিক প্যাঁদানি। মার খেয়ে খেয়ে আমার হাড় লুজ হয়ে গেছে।'

'হুঁ—' আস্তে করে মাথা নাড়লাম।

বোদা বলল, 'পেটে খেলে পিঠে সয়, কি বলেন দাদা?' বলেই হাসল।

কিছুক্ষণ চুপ। তারপর বোদা হঠাৎ ডাকল, 'দাদা—'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকালাম, 'কি?'

'একবার তো ওই শালাদের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন, আরেক বার যে বাঁচাতে হবে।'

'কী হল?'

'আমি আর হাঁটতে পারছি না, ওরা এমন রগড়েছে—'

লক্ষ করলাম পা ফেলতে বোদার খুব কষ্ট হচ্ছে। নাক থেকে আবার রক্ত গড়িয়ে আসছিল। বললাম, 'কী করব বল—'

'আমাকে একটু পৌঁছে দিয়ে আসবেন?'

'কোথায়?'

'শোভাবাজারে।'

'ওখানেই থাকো নাকি?'

'হ্যাঁ। রাস্তার মোড়ে ছেড়ে দিলেই চলে যেতে পারব।'

ভেবে দেখলাম আমি তো শিয়ালদার দিকেই যাচ্ছি, না হয় একটু ঘুরে যাব। বললাম, 'আচ্ছা চল—'

কথায় কথায় বি. টি রোডে চলে এসেছিলাম। একটা ট্যাক্সি থামিয়ে বোদাকে নিয়ে উঠে পড়লাম।

বোদা বলল, 'আবার ট্যাক্সি কেন?'

'ঠিক আছে, ও নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।'

'আমার জন্য আপনার অনেক ক্যাশ বেরিয়ে গেল দাদা—'

উত্তর দিলাম না। বোদাও আর কিছু বলল না।

মিনিট পনেরর মধ্যে আমরা শোভাবাজার পৌঁছে গেলাম। ট্রাম রাস্তা থেকে সামান্য ভেতরে একটা গলির মুখে এনে ট্যাক্সিটা থামাতে বলল বোদা, 'হিঁহা রুখনা ড্রাইভার সাব—' ট্যাক্সি থামলে আমাকে বলল, 'এসে গেছি দাদা—'

ভাড়া মিটিয়ে বোদাকে নিয়ে নেমে পড়লাম। বোদা বলল, 'আপনি আবার নামলেন

কেন? ঐ ট্যাক্সিতেই চলে যেতে পারতেন—'

বললাম, 'এতদূর যখন এসেই গেছি তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যাই।' আসলে এই ছোকরাকে দারুণ ইণ্টারেস্টিং লাগছে। ও কোথায় থাকে, কী করে ইত্যাদি জানবার জন্য খুব কৌতূহল হচ্ছিল।

বোদা কি বুঝল সে-ই জানে। বলল, 'আপনার মনটা হেভি সফ্‌ট, একেবারে বাটার—'

'কী করে বুঝলে?'

'আমার জন্যে অতগুলো ক্যাশ খরচা তো করলেনই। এখন ভাবছেন মালের দোকানে যা রগড়ান খেয়েছি তাতে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছুতে পারব না, রাস্তায় লাট খেয়ে পড়ে থাকব। তাই বাড়িতে গিয়ে বিছানায় না শুইয়ে দিয়ে যেতে চাইছেন না। মন বাটার না হলে এত ঝঞ্ঝাট কেউ করে!'

আমি হাসলাম, 'তুমি দেখছি অন্তর্যামী—'

বোদা দাঁত বার করল, 'মানে কি দাদা?'

উত্তর দিলাম না।

বোদা আবার বলল, 'উইকে দু-তিন দিন এরকম ধোলাই আমি খাই কিন্তু আপনাব মতো আমাকে কেউ বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যায় না। আপনার টেরিফিক দয়ামায়া—'

বললাম, ঠিক আছে ঠিক আছে, এখন তোমার বাড়ি নিয়ে চল—'

'আসুন আসুন। ওই যে আমার বাড়ি—' আঙুল বাড়িয়ে একটু দূরে অন্ধকার ভূতুড়ে চেহারার একটা দোতলা বাড়ি দেখিয়ে দিল বোদা।

কাছাকাছি আসতেই মনে হল এটা যেন বাড়ি নয়, এক বিশাল ভগ্নস্তূপ। দেওয়ালের প্ল্যাস্টার কবেই খসে গেছে। ক্ষয়ে-যাওয়া ইটের ফাঁক দিয়ে অশ্বত্থেরা শেকড় চালিয়ে চালিয়ে ধ্বংসের কাজ অনেকখানি এগিয়ে রেখেছে। বাড়িটা কোনোরকমে এখনও খাড়া রয়েছে, হুড়মুড় করে যে কোনোদিন ভেঙে পড়তে পারে। ভেতরে কোনো আলো-টালো জ্বলছিল না। মনুষ্যজাতির কেউ এখানে বসবাস করতে পারে, এযেন ভাবাই যায় না।

বোদা বলল, 'এই গোটা বাড়িটা আমার একলার।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'আর কে থাকে এখানে?'

'কেউ না।'

আমার অদ্ভুত লাগছিল। কী বলব যখন ভাবছি চট করে আমার মনোভাবটা বুঝে নিয়ে বোদা বলল, 'এখানে কোনো [illegible] থাকতে পারে না।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন?'

'এই দেখুন না—' দেওয়ালের গায়ে টিনের পাতের ওপর ক্যালকাটা কর্পোরেশনের একটা নোটিশ আঁটা রয়েছে, সেটা দেখিয়ে দিল বোদা। রাস্তার আলো এসে পড়েছে নোটিশটার ওপর। আমি পড়তে লাগলাম। ইংরেজিতে লেখা নোটিশটার অর্থ হল: 'এই বাড়ি অত্যন্ত বিপজ্জনক অবস্থায় আছে। পনের দিনের মধ্যে ভেঙে ফেলা হবে। কারো পক্ষেই এখানে থাকা নিরাপদ নয়।' তার নিচে কোনো এক অফিসারের স্বাক্ষর এবং তারিখ।

তারিখটা সাত দিন আগের। অর্থাৎ আর আট দিন পর এ বাড়ি ভাঙার কাজ শুরু হবে।

পড়া হয়ে গেলে বোদার দিকে ফিরলাম। বোদা বলল, 'দেখলেন তো, এর ভেতর কোনো মানুষ থাকতে পারে?'

কিন্তু তুমি আছ কী করে?'

'আমি শালা আবার মানুষ! দাদা হাসালেন—' সত্যি সত্যিই বোদা হাসল। তারপর বলল, 'চলুন ভেতরে যাই।'

আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি তার পাশেই ভেতরে যাবার দরজা। দরজাটা খোলাই ছিল। বোদা ভেতরে পা দিয়ে বললে, 'ম্যাচ আছে দাদা?'

'আছে।'

'একটা কাঠি জ্বালান। অন্ধকারে আমি ঠিক যেতে পারব। আপনি নতুন কিনা, ইট ফিটে ঠোক্কর খেলে ঝামেলা হয়ে যাবে।'

একটা না, পর পর অনেকগুলো কাঠিই জ্বালতে হল। অল্প আলোয় যা দেখলাম তাতে চোখের তারা স্থির হয়ে গেল। সারা মেঝেতে ভাঙাচোরা ইট, দেওয়ালের প্ল্যাস্টার এবং বালিটালি ছড়িয়ে আছে। ছাদের বীমগুলো বেঁকে ঝুলে পড়েছে, ফলে দেওয়ালগুলোও হেলে রয়েছে।

আমরা ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে কয়েক হাজার আরশোলা ফর ফর করে উড়ে উড়ে নাকে-মুখে এসে পড়তে লাগল। হাত দিয়ে তাদের তাড়াতে তাড়াতে বোদা বলতে লাগল, 'অ্যাই শালারা, অ্যাই—'

খুব সাবধানে ইটের ফাঁকে ফাঁকে পা ফেলে আরশোলা তাড়াতে তাড়াতে তিন চারটে ঘর পেরিয়ে ফাঁকামতো একটা জায়গায় এলাম। একসময় এখানে দোতলায় যাবার সিঁড়ি ছিল, সিঁড়িগুলো কবেই ভেঙেচুরে গেছে। একটা বাঁশের মই অবশ্য চোখে পড়ল।

বোদা বলল, 'দাদা, এবার মই বেয়ে ওপরে উঠতে হবে। আমি আগে আগে উঠছি, আপনি পেছন থেকে আমাকে ধরে একটু ব্যালান্স রাখবেন। যা কড়কান খেয়েছি, হাঁটুতে আর জোর নেই।'

বোদার কথামতো তাকে ঠেলে ঠেলে দোতলায় নিয়ে গেলাম।

বোদা অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে কোত্থেকে একটা মোমবাতির টুকরো জোগাড় করে আনল। অ্যাটাচি কেস, ত্রিনাথের স্যুটের প্যাকেট, ইত্যাদি মেঝেতে নামিয়ে আমি মোমটা জ্বালিয়ে এক ধারে বসিয়ে দিলাম।

দোতলার এই ঘরটা মোটামুটি পরিষ্কার, নিচের তলার মতো জঞ্জাল-টঞ্জাল নেই, তবে এখানেও ছাদের কড়ি-বরগা ঝুলে আছে, দেওয়ালগুলো কোমর বাঁকানো। পশ্চিম দিকের দেওয়ালটার চার ভাগের তিন ভাগই ধসে গেছে, সেখান দিয়ে আকাশ দেখা যায়।

ঘরটার এক ধারে লম্বা বিছানা পাতা। বিছানা আর কি, ছেঁড়া চাটাইয়ের ওপর চিটচিটে চাদর আর বালিশ রয়েছে। দেখে মনে হল সারা দিনরাত ওটা ওভাবেই পড়ে থাকে। পাশে একটা টিনের বাক্স, আরেক ধারে দড়িতে দু-তিনটে পাজামা আর বুশ শার্ট ঝুলছে। বোঝা

গেল এগুলো বোদার প্রোপার্টি।

বোদা বলল, 'আমি এখানেই থাকি। একেবারে নিজাম প্যালেস, কি বলেন!'

হাসলাম।

বোদা তার বিছানাটা দেখিয়ে এবার বলল, 'এই ডানলোপিলোর গদিতে বসুন দাদা—'

বসলাম। বিছানার আরেক ধারে বোদাও বসল। মোমের আলোয় চোখে পড়ল তার কপাল-ভুরু-গাল এবং মাথার অনেক জায়গায় ঢিবির মতো ফুলে উঠেছে। নাক থেকে এখনও ফোঁটা ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে আসছে। উদ্বেগের গলায় বললাম, 'রক্তটা তো তোমার বন্ধ হচ্ছে না। কাছাকাছি ডাক্তার আছে?'

হাতের চেটো দিয়ে রক্ত মুছতে মুছতে বোদা বলল, 'আমাকে এই ফার্স্ট দেখেছেন কিনা, তাই রক্ত দেখে হেভি ঘাবড়ে গেছেন। ডাক্তার ফাক্তার লাগবে না, রক্ত একটু পরেই বন্ধ হয়ে যাবে।' কিছুক্ষণ থেমে আবার বলল, 'কত প্যাঁদানি খেয়েছি, কত রক্ত পড়েছে। মনে হয়েছে শালা মরে যাব। কিন্তু মরতে মরতে কান্নিক মেরে মেরে ঠিক উঠে পড়েছি।'

মনে হল, বোদা এই সামান্য রক্তপাত গ্রাহ্য করে না। কাজেই ওর জন্য ভেবে আমি আর কি করব। একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'এখানে কদ্দিন আছ?'

'আট দশ দিন।'

'তার আগে কারা ছিল?'

'জানি না।' বোদা বলতে লাগল, 'আমার থাকবার জায়গা ছিল না, কাঁধে টিনের বাক্স আর বিছানা ঝুলিয়ে ঘুরছিলাম, বাড়িটা ফাঁকা পেয়ে সট করে ঢুকে পড়লাম। নিচ তলাটার চেহারা দেখেছেন তো, ইট ফিটে গ্যাঞ্জাম হয়ে আছে। কর্পোরেশনের একটা মই ঝেড়ে এই দোতলায় উঠলাম, তারপর থেকে এখানেই আছি—'

এ যে দেখছি আমারই কেস। আগ্রহের গলায় জিজ্ঞেস করলাম, 'এর আগে কোথায় ছিলে?'

'ফুটপাথে, লোকের বাড়ির রকে, সি-এম-ডি-এর বাহাত্তর ইঞ্চি পাইপের ভেতর। মানে যখন যেখানে জায়গা পেয়েছি—'

'তোমার আর কে আছে?'

'কেউ না।'

এতকাল আমার ধারণা ছিল আমার টাইপের দ্বিতীয় আর কেউ নেই, কলকাতা নামে আশি লক্ষ লোকের এই শহরে আমি একেবারে অদ্বিতীয়। কিন্তু আমারও যে একজন প্রায় কার্বন কপি থাকতে পারে, কে ভাবতে পেরেছিল। বললাম, 'ফার্স্ট ক্লাস, হাত মিলাও দোস্ত—'

অবাক হয়ে হাত বাড়াল বোদা। বলল, 'কী হল দাদা!'

'কিচ্ছু না। তোমার মতোই একজনকে বোধ হয় অনেক দিন ধরে খুঁজছিলাম।'

বোদা কি বুঝল, সে-ই জানে। কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে একসময় ক্লান্ত গলায় বলল, 'মাথাটা হেভি ঘুরছে, আমি আর বসে থাকতে পারছি না।'

'ঠিক আছে। শুয়ে পড় না—'

বোদা টান হয়ে শুয়ে পড়তে বলল, 'অনেক রাত হয়ে গেল দাদা। এরপর কিন্তু ট্রাম-বাস-ট্যাক্সি-ফ্যাক্সি কিচ্ছু পাবেন না।'

নির্বিকার মুখে বললাম, 'দরকার নেই।'

বোদা বিমূঢ়ের মতো তাকাল।

হেসে হেসে বললাম, 'আমি আজ আর যাচ্ছি না। এখানে থেকে যাব।'

বোদা স্প্রিংয়ের মতো ধাঁ করে উঠে বসল, 'থেকে যাবেন!'

'হ্যাঁ—' আস্তে করে মাথা নাড়লাম, 'ব্যাপারটা কি জানো, আমার যাবার মতো তেমন কোনো জায়গা নেই।'

বোদা আমার কথা বিশ্বাস করেছে বলে মনে হল না। আস্তে আস্তে আবার শুয়ে পড়ল। বলল, 'আমি আর কী বলব, আপনার যখন ইচ্ছে থাকুন। তবে এখানে খুব কষ্ট হবে।'

চট করে ট্রাউজার্স-ফাউজার্স বদলে পাজামা আর একটা বুশ শার্ট পরে ফেললাম। তারপর একটা বেড কভার বিছিয়ে, ফুঁ দিয়ে দিয়ে হাওয়া-বালিশটা ফুলিয়ে নিলাম। দু'মিনিটে চমৎকার একখানা বিছানা হয়ে গেল। শালা ফাইভ স্টার হোটেলের বেড এর কাছে কোথায় লাগে!

এখন বেশ খিদে খিদে পাচ্ছে। পাকস্থলীতে অবশ্য আট খুরি ধান্যেশ্বরী আছে, কিন্তু তার তলা থেকে খিদেটা ছুঁচের মতো মাথা তুলেছে। বাংলা মাল তাকে চাপা দিয়ে রাখতে পারেনি। ডাকলাম, 'বোদা—

বোদা চোখের ওপর আড়াআড়ি হাত রেখে শুয়ে ছিল। নির্জীব গলায় সাড়া দিল, 'উঁ—'

'কাছাকাছি হোটেল আছে?'

'আছে। রাস্তার উল্টোদিকে পাঞ্জাবিদের হোটেল পাবেন।'

'আমার দারুণ খিদে পেয়েছে, খেতে যাচ্ছি। তুমি তো যেতে পারবে না?'

'না। ওঠবার মতো গায়ে জোর নেই।'

'তোমার জন্যে কী আনব?'

'কিচ্ছু না। মালের দোকানের শালারা যা রগড়েছে তাতেই পেট ভরে গেছে।'

রাস্তার ওপারের পবিত্র খালসা হোটেল থেকে খেয়ে এসে দেখলাম বোদা এখনও ঘুমোয়নি। তার গলার ভেতর থেকে অস্পষ্ট গোঙানির মতো আওয়াজ বেরিয়ে আসছিল। আমাকে দেখে চোখ মেলে তাকাল। বলল, 'খাওয়া হল?'

'হ্যাঁ—' বোদার মুখের ওপর ঝুঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'খুব কষ্ট হচ্ছে?'

'থোড়েসে—' বোদা একটা হাত তুলে দুই আঙুলের মুদ্রায় কষ্টের পরিমাণটা বোঝাতে চাইল। তারপর দুর্বল গলায় বলল, 'দাদা একটা উপকার করবেন?'

'কী?'

'আমাকে একটু ইস্তিরি করে দেবেন!'

আমার চমক লাগল, 'ইস্তিরি!

বোদা দাঁত বার করে মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ দাদা, যেদিন বেশি রগড়ান খাই, বডিটা একটু ইস্তিরি করে নিই। আজ শালা উঠতে পারছি না।' ঘরের এক কোণে আঙুল বাড়িয়ে বলল, 'ওখানে কাঠকয়লা, মেটে সরা আর ইস্তিরি আছে। কাঠকয়লা ধরিয়ে ইস্তিরিটা তাতিয়ে নিন দাদা—'

বিস্ময় বাড়ছিলই। প্রায় যন্ত্রচালিরে মতো মেটে সরায় কাঠকয়লা ধরিয়ে ইস্তিরি গরম করে নিলাম। তারপর বোদার কথামতো তার কোমরে, পিঠে আর ঘাড়ের কাছে চালাতে লাগলাম। বোদা চোখ বুজে আরামের শব্দ করতে লাগল, 'আঃ! আঃ! বাঁচলাম। মালেব দোকানের হারামীরা বডির ক্রীজ ঢিলে করে দিয়েছিল।'

আস্তে আস্তে একসময় বোদার চোখ বুজে এল। টের পেলাম সে ঘুমিয়ে পড়েছে। ডাকাডাকি করেও যখন আর সাড়া পাওয়া গেল না, ইস্তিরিটা নামিয়ে রেখে শুয়ে পড়লাম।

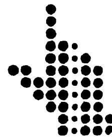
শোওয়ামাত্রই কিন্তু ঘুম এল না। কাল রাত্তিরেও গ্রেট হিমালয়ান বোর্ডিং হাউস-এর দশ ইঞ্চি পুরু নরম গদিতে শুয়ে ঘুমিয়েছি। আর আজ কর্পোরেশনের নোটিশ-আঁটা হেলে পড়া দুশো বছরের পুরনো লঝ্‌ঝড় বাড়িতে ভাঙাচোরা ইট, দু ফুট পুরু ধুলোবালি, কয়েক হাজার আরশোলা এবং ইঁদুরের মধ্যে বিছানা পেতে নিয়েছি।

এখন কত রাত কে জানে। বাঁ হাত তুলতেই রেডিয়াম ডায়ালের ঘড়িতে সময়টা জেনে নেওয়া যায়। কিন্তু তা আর ইচ্ছা করল না।

আচমকা হুড়মুড় করে কিছু ভেঙে পড়ার শব্দে চমকে উঠলাম। চোখে পড়ল পায়ের দিকের দেওয়ালের অর্ধেকটা ধসে যাচ্ছে। মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে ঠাণ্ডা স্রোতের মতো কী নেমে গেল যেন। ইট-কাঠ-চুন-সুরকির তলায় চাপা পড়ে শেষ হয়ে যাব নাকি? আজই কি আমার শেষের সেদিন? পরক্ষণেই একটা কথা ভেবে দারুণ মজা লাগল। আমার জন্য আর কষ্ট করে কবর খুঁড়তে হবে না। চমৎকার একটা সমাধি আপনা থেকেই তৈরি হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু মহাশয়গণ, শেষ পর্যন্ত এমন সমাধিটা তৈরি হয়েও হল না। আচমকা যেমন দেয়ালটা ধসতে শুরু করেছিল, আচমকাই সেটা থেমে গেল। অর্ধেক দেওয়ালের ফাঁক দিয়ে এখন আকাশের অনেকটা অংশ দেখা যাচ্ছে। রুপোর থালার মতো গোল চাঁদটা সেখানে আটকে আছে। আজ পঞ্জিকায় কী তিথি, জানি না। চাঁদের চেহারা দেখে মনে হচ্ছে পূর্ণিমা টুর্ণিমা হবে।

ভাঙা দেওয়ালের ওপর দিয়ে ধবধবে জ্যোৎস্নায় ভেসে-যাওয়া প্রকাণ্ড আকাশ দেখতে দেখতে একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম।



সকালে ঘুম ভাঙতেই চোখে পড়ল ঘরের ভেতর অজস্র রোদ ছড়িয়ে আছে। ভাঙা

দেওয়ালের ফাঁকে কাল যেখানে চাঁদ দেখেছিলাম আজ সেখানে গনগনে সূর্যটা আটকে আছে। প্রথমে চট করে মনে করতে পারলাম না কোথায় আছি। এখানে, এই ভাঙাচোরা ইট আর চুন সুরকির স্তূপের মাঝমধ্যিখানে এলামই বা কি করে? পরমুহূর্তেই বোদার কথা মনে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘাড়টা স্প্রিং-এর মতো ডানদিকে ঘুরল। বোদার বিছানাটা ফাঁকা, সে নেই। চারদিকে তাকিয়ে তাকে কোথাও খুঁজে পেলাম না।

সকালে উঠে কোথায় গেল ছোকরা? কোথায় যেতে পারে? বেশিক্ষণ ভাবতে হল না। মই বেয়ে একটু পর পাতালে ফুঁড়ে ওপরে উঠে এল বোদা। তার দু'হাতে চায়ের ভাঁড়। চোখাচোখি হতেই ছোকরা হাসল, হারমোনিয়মের রীডের মতো তার দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ল। বোদা বলল, 'গুড মর্নিং দাদা—'

হেসে বললাম, 'গুড মর্নিং—'

'কাল কেমন ঘুম হল?'

'ফাইন।'

'সেটা বুঝতে পেরেছি। খানিকক্ষণ আগে উঠে দেখি উরি শালা দাদার নাকে, আঠারোটা তাসা বাজছে। ভাবলাম আরামের ঘুমটা ভাঙিয়ে কিচাইন করে কী হবে, তার চাইতে একটু চা নিয়ে আসি। চা এনে দাদাকে ডাকব—'

ঘুমুলে নাকটা আমার সত্যিই ডাকে এবং তার শব্দ নাকি তিন কিলোমিটার দূর থেকে শোনা যায়। বোদাকে কী আর বলি, হেসেই ফেললাম।

কাছে এসে একটা চায়ের ভাঁড় আমার হাতে দিয়ে বোদা নিজের বিছানায় গিয়ে বসল।

বোদাকে লক্ষ করছিলাম। কালকের সেই যন্ত্রণা বা কষ্টের চিহ্নমাত্র নেই তার মুখে চোখে। চায়ের ভাঁড়ে একটা চুমুক দিয়ে বললাম, 'আজ কেমন আছ?'

বোদা বলল, 'ফাস কেলাস। কাল ইস্তিরি করে দিয়েছিলেন, ব্যথা-ট্যাথা হাওয়া।'

'বডির ক্রীজ তাহলে ঠিক হয়ে গেছে?'

বোদা ঘাড় হেলিয়ে দিল।

চা খেতে খেতে কিছুক্ষণ এলোমেলো গল্প হল। তারপর বোদা একসময় বলল, 'হোল নাইট বিনা নোটিশে এখানে কাটিয়ে দিলেন, আপনার বাড়িতে নিশ্চয়ই খুব ভাবছে।'

দারুণ মজা লাগল। বুকে একটা আঙুল ঠেকিয়ে বললাম, 'আমার বাড়ি!'

'হ্যাঁ—'

'বাড়ি-ফাড়ি আমার নেই।'

হতভম্বের মতো তাকিয়ে রইল বোদা, কিছু বলল না।

আমি আবার বললাম, 'আসলে ব্যাপারটা কী জানো, আমি একজন ওয়ার্ল্ড সিটিজেন। বিশ্ব-নাগরিক আর কি। যখন যেখানে থাকি সেটাই আমার বাড়ি।'

বোদা তাকিয়ে আছে। আমি বলে যেতে নাগলাম, 'রাশিয়ায় থাকলে আমি হাণ্ড্রেড পারসেণ্ট রুশী, ঘানায় গেলে ঘানাইয়ান, স্পেনে গেলে স্প্যানিশ। আপাতত শোভাবাজারের এই লঝ্ঝড় বাড়িতে উড়ে এসে জুড়ে বসা একজন উৎকৃষ্ট রেসিডেণ্ট।'

বোদার চোখ ক্রমশ গোল হয়ে যাচ্ছিল। বিমূঢ়ের মতো সে বলল, 'আপনি মানে—' বলতে বলতে থেমে গেল। আচমকা কাঁধ ঝাঁকিয়ে আবার বলল, 'ধুস মাইরি, আপনাকে ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'পারছ না?' আমি বোদার দিকে অনেকখানি ঝুঁকলাম।

'না—' ডাইনে-বাঁয়ে বার দুই মাথাটা নাড়ল বোদা।

এবার মেরুদণ্ড টান-টান করে খাড়া হয়ে বসলাম। দু'চোখ অর্ধেক বুজে বললাম, 'তোমার সঙ্গে কখন আমার আলাপ হয়েছে বল তো?'

একটু ভেবে নিয়ে বোদা বলল, 'কাল রাত্তিরে, আটটা সাড়ে আটটা হবে।'

'কারেক্ট—' মনে মনে হিসেব টিসেব কষে বললাম, 'এখন হল সকাল আটটা। তার মানে বার ঘণ্টাব মতো আমরা একসঙ্গে কাটাচ্ছি। কিন্তু এত কম সময়ে আমাকে তো ঠিক বোঝা যাবে না।' একটু থেমে চোখ দুটো পুরোপুরি মেলে ভরসা দেবার মতো করে বললাম, 'আস্তে আস্তে আমাকে বুঝতে পারবে।'

কিসের যেন গন্ধ পেল বোদা। মুহূর্তে তার চোখমুখ সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল; তবে কিছু বলল না। তার দৃষ্টি স্থির হয়ে আমার মুখের ওপর আটকে থাকল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর বোদাই শুরু করল। খানিকটা ইতস্তত করে বলে ফেলল, 'এখন কী করবেন দাদা?'

'কি আর করব, সকালেই আমি শেভটা সেরে ফেলি। এ বাড়িতে জল টল পাওয়া যাবে?'

বোদা জানালো বাড়িটা ভাঙাচোরা ধ্বংসস্তূপ হলেও কর্পোরেশন জলের কলের কানেকসানটা কেন যেন এখনও কেটে দেয় নি। প্রচুর জল আছে এ বাড়িতে এবং এই দোতলায় একটা বাথরুমও।

'ফাইন, ফাইন!' প্রায় চেঁচিয়েই উঠলাম, 'বাথরুম ছাড়া আমি আবার স্নান করতে পারি না। হ্যাবিটটা খুব খারাপ করে ফেলেছি। যাক গে, একটু জল নিয়ে এস তো—' বলে অ্যাটাচি কেস খুলে শেভিং বক্স বার করে ফেললাম।

বিমূঢ়ের মতো কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে টিনের কৌটোয় করে জল নিয়ে এল বোদা।

শেভ টেভ হয়ে গেলে বোদা বলল, 'এবার কী করবেন দাদা?'

বোদার উদ্দেশ্যটা বুঝতে পারছিলাম। সোজাসুজি স্পষ্ট করে বলতে পারছে না। তবে কায়দা করে জেনে নিতে চাইছে আমি এ বাড়ি থেকে কখন বিদায় নিচ্ছি। অ্যাটাচি কেস থেকে পাতলা তোয়ালে আর হেয়ার ক্রিম বার করতে করতে বললাম, 'শেভের পর আমি স্নান করি। ভাবছি ওটা সেরে ফেলব।'

ক্রমশ যে এ বাড়ির ভিতে আমি শেকড় ঢুকিয়ে দিচ্ছি, বোদা হয়তো আবছাভাবে বুঝতে পারছিল। কী বলবে সে ভেবে উঠতে পারছিল না। আমার মুখের ওপর দৃষ্টি স্থির করে সে তাকিয়ে আছে, তাকিয়েই আছে।

চোখের কোণ দিয়ে বোদাকে দ্রুত একবার দেখে নিয়ে বাথরুমে চলে গেলাম। ফিরে এসে ভেজা তোয়ালেটা শুকোতে দিয়ে বিছানায় বসে চুলে ব্রাশ লাগালাম। পরনে কালকের বাসি চটকানো ট্রাউজার্সটাই রয়েছে। ওটা খুলে স্নান করেছিলাম, স্নানের পর আবার পরে নিয়েছি।

একই রেকর্ড বার বার বাজবার মতো বোদা আবার বেজে উঠল, 'এবার কী করবেন দাদা?'

ব্রাশটা আস্তে আস্তে চুলের ভেতর থেকে বার করে এনে সোজা বোদার চোখের দিকে তাকালাম। বললাম, 'তুমি যা ভাবছ তা হবে না।'

'আমি কী ভাবছি?' বোদা নড়ে চড়ে বসল।

'বলব?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, বলুন না—'

'এই কখন আমি গুড বাই করব, তাই না?' বলেই ঠোঁট টিপে জিভটা মুখের ভেতর ঘোরাতে লাগলাম। আমার দু চোখ এক ধরনের চাপা কৌতুকে আস্তে আস্তে কুঁচকে যেতে লাগল।

বোদা থতমত খেয়ে গেল, 'না মানে, ধুস শালা—'

আমি বললাম, 'আসল কথাটা হল—'

বোদা জিরাফের মতো গলা বাড়িয়ে রুদ্ধশ্বাসে বলল, 'কি?'

'এখান থেকে আর নড়ছি না। যদ্দিন না কর্পোরেশন বাড়িটা ভাঙছে এখানেই তাঁবু ফেললাম।'

'সত্যি সত্যি এখানে থাকবেন!' বোদাকে বিভ্রান্ত দেখাল।

'হানড্রেড পারসেন্ট সত্যি। তোমাকে তখন বলেছিলাম না, আমি যেখানে থাকি সেখানেই আমার বাড়ি।'

বোদা কী বুঝল সে-ই জানে। বলল, 'আপনি দাদা টেরিফিক!'

আমি হাসলাম।

বোদা আবার কী বলতে যাচ্ছিল, আচমকা কাছাকাছি কোনো উঁচু বাড়ির মাথা থেকে ন'টার সাইরেন বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে শক-খাওয়া জন্তুর মতো প্রায় লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল বোদা, 'উরি ফাদার, আজ আমার বারটা বেজে গেল। আপনি দাদা যখন তাঁবু ফেলেই দিয়েছেন তখন থাকুন, আমি চললাম।'

আমি অবাক। হঠাৎ কি হল ছোকরার। 'বললাম, 'কোথায় যাবে?'

'সিনেমায় লাইন মারতে। আজ একটা ফাটাফাটি হিন্দি পিকচার রিলিজ করছে, ধর্মেন্দর হেমা হিরো হিরো-ইন। পয়লা স্নিন থেকে লাস্ট সিন পর্যন্ত বিলকুল গরম মশালা। আর দাঁড়াচ্ছি না, লাইন এতক্ষণে শ্যামবাজার থেকে শহীদ মিনারে গিয়ে ঠেকেছে। আজ আর শালা কপালে টিকিট নেই।'

'সিনেমা দেখার জন্যে ও রকম খেপে ওঠে! থ্রম্বসিস হয়ে মরে যাবে যে। বোসো বোসো,

লাইন দিতে হবে না, ছবিটা আমিই তোমাকে দেখিয়ে দেব।'

'ধুস, সিনেমা কে দেখতে চায়?'

'তা হলে?'

'লাইন মারতে যাচ্ছিলাম টিকিট ব্ল্যাকে বেচব বলে—'

'ব্ল্যাকে বেচবে!'

'না হলে খাব কী?' ধাঁ করে পকেটে হাত পুরে তক্ষুনি আবার বার করে আনল বোদা। হাতটা সোজা আমার দিকে বাড়িয়ে মেলে ধরল। বলল, 'দেখুন কত আছে?'

লক্ষ করলাম বোদার হাতে মাত্র চারটে টাকা রয়েছে। সে বলতে লাগল, 'এই হল আমার ক্যাপিটাল। চার টাকায় দুটো টিকিট কেটে আট টাকায় ঝাড়ব, নগদ প্রফিট চার টাকা। ওতে আজকের দিনটা চলে যাবে। এখন না বেরুলে ক্যাপিটাল খেয়ে ফেলতে হবে। তা হলে বুঝতেই পারছেন বিজনেস শালা লাটে উঠে যাবে।'

আমার কৌতূহল হচ্ছিল। বললাম, 'তোমার কেসটা তো দারুণ ইণ্টারেস্টিং, খুব জানতে ইচ্ছা করছে। সিট ডাউন, সিট ডাউন—'

'কিন্তু—'

'আজকের কথা তোমার ভাবতে হবে না। আজ তুমি আমার গেস্ট, আমার সঙ্গে খাবে।'

একটু ইতস্তত করে বোদা তার বিছানায় ঝপ করে বসে পড়ল। বলল, 'কাল মালের পয়সা দিলেন, ট্যাক্সি করে নিয়ে এলেন, আজ আবার—'

তাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, 'এবার বল—'

'কী বলব?'

'তোমার কথা। সিনেমার টিকিট ব্ল্যাক করেই চলে নাকি?'

'ওটাই মেন ব্যাপার, তবে সাইড বিজনেসও দুটো রয়েছে।'

'সে দুটো আবার কী?'

বলবে কি বলবে না, বোদা এক মুহূর্ত ভাবল। তারপর চিন্তিত মুখে খুব চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'দাদা পুলিশের লোক নয় তো?'

কৌতূহলও হচ্ছিল, আবার দারুণ আমোদও লাগছিল। বুকে একটা আঙুল ঠেকিয়ে বললাম, 'পুলিশের লোক—আমি! তাই মনে হচ্ছে নাকি?'

বোদা উত্তর দিল না। বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে রইল।

সামনের দিকে ঝুঁকে গোপন কোনো সামরিক তথ্য ফাঁস করার ভঙ্গিতে চারপাশ একবার দেখে নিলাম। তারপর গলার স্বর গভীর খাদে নামিয়ে বললাম, 'যেখানে পুলিশের গন্ধ, আমি তার পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যে থাকি না। গুরুর বারণ।'

বোদা কি বুঝল, সে-ই জানে। আস্তে উঠে গিয়ে এক কোণে ফুল লতাপাতা-আঁকা টিনের একটা সুটকেশ খুলে একটা বড়সড় গোল কৌটো আর মরচে-পড়া কালচে রিভলবার বার করে আনল। কৌটোটার ওপর পয়সা ঢোকাবার মতো ফুটো রয়েছে। গায়ে আঠা দিয়ে সাদা কাগজ সাঁটা। তার ওপর লেখা রয়েছে ঃ 'জয়ন্তী ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানির সংগ্রামী

শ্রমিকদের সাহায্য করুন।'

রীতিমত অবাকই হলাম। বললাম, 'কী ব্যাপার, এগুলো দিয়ে কী হয়?'

'বুঝতে পারলেন না দাদা?'

'না।'

বোদা এবড়ো-খেবড়ো দাঁত বার করে হাসল। কৌটোটা একবার ঝাঁকিয়ে বলল, 'পকেটে যখন ক্যাশ থাকে না বক্স কালেকসানের জন্যে কৌটো নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ি। কখনো 'জয়ন্তী ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানির শ্রমিকদের সাহায্য করুন' লিখি, কখনো লিখি 'বন্যাত্রাণে সাহায্য করুন', কখনো বা পলিটিকসবাবুদের পার্টির নাম-ফাম লিখে নিই। মওকা বুঝে যখন যেটা সুবিধা হয় সেটাই বসাই আর কি। বিজনেসটা কেমন বলুন তো?'

বোদার সম্বন্ধে বেশ শ্রদ্ধা হচ্ছিল। বললাম, 'গ্র্যাণ্ড। তা দিনে কিরকম হয়?'

'আগে ভালই হতো। আজকাল শালা কম্পিটিসন বেড়ে গেছে। অনেক হারামী এ লাইনে নেমে পড়েছে। হোল ডে খাটলে তিন চার টাকা উঠে যায়।' বলতে বলতে বোদা একটু থামল। কি ভেবে পরক্ষণে আবার শুরু করল, 'তবে এই বিজনেসে সুবিধে এই, ক্যাপিটাল ফ্যাপিট্যাল লাগে না। লেবারটা দিলেই হয়।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'আর রিভলবারটা দিয়ে কী হয়?'

বোদা চোখ কুঁচকে হাসল, 'সে শালা আরেক কারবার। যখন সিনেমার টিকিট ব্ল্যাক করতে পারি না তখন হেভি রাত করে কোনো একটা গলির মোড়ে রিভালবারটা নিয়ে দাঁড়িয়ে যাই।' রিভলবারটা উঁচুতে তুলে বলতে লাগল, 'এই যন্তরখানা দেখালেই অন্যের পকেটের মাল সটাসট আমার পকেটে চলে আসে। তবে এতে টেরিফিক ঝামেলা। ধরা পড়লে ঠাকুরদার বিয়ে দেখিয়ে দেবে।'

রিভলবারটার দিকে চোখ রেখে বললাম, 'ভেতরে গুলি ফুলি নেই তো?'

'ধুস, গুলি কোথায় পাব? আর গুলি ঢুকিয়েও কাজ হবে না।'

'কেন?'

'দেখছেন না, যন্তরখানায় জং ধরে গেছে। এ শালা বিলকুল বেকার।'

আমি হাসলাম, 'তা হলে ফল্‌স মেরে লোকের পকেট হাল্‌কা করছ!'

বোদাও হাসল, 'দুনিয়াটাই তো দাদা পুরো ফল্‌সের ওপর চলছে।'

'যা বলেছ।'

'তা ছাড়া—'

'কী?'

'মালটা যদি কাজেরই হতো গুলি ফুলি পুরে চালানো যেত, ও শালা আমি ছুঁতামই না।'

'কেন?'

'পেটের জন্যে ছেনতাই ফেনতাই করি, কিন্তু দাদা গুলি ফুলি দেখলে হেভি ঘাবড়ে যাই। হাঁটু ফাঁটু অ্যায়সা কাঁপে, মনে হয় ফ্ল্যাট হয়ে পড়ে যাব।'

একটু চুপচাপ। রিভলবারটার দিকে আমার চোখ স্থির হয়েই আছে। বললাম, 'যন্তরটা

পেলে কোথায়?'

বোদা বলল, 'কলকাতায় যখন সকাল-বিকাল খুন-ফুন হচ্ছিল সেই সময় একটা ছোকরা আমার কাছে এটা রাখতে দিয়েছিল।'

'তারপর—'

'তারপর আর কি। মালটা আমার কাছে গছিয়ে ছোকরা সেই যে হাওয়া হয়ে গেল, আর পাত্তাই নেই। কি আর করি, ওটা সুটকেশে পুরে কাঁধে ঝুলিয়ে ক'বছর ঘুরে বেড়ালাম। তদ্দিনে মালটার গায়ে জং ধরে গেছে। ঘুরতে ঘুরতে মাথায় একটা প্ল্যান খেলে গেল। যন্তরটা যখন আছেই তখন আর বেকার পড়ে থাকা কেন? সেই থেকে ওটাকে কাজে লাগিয়ে যাচ্ছি।'

'ফাস কেলাস।'

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর আমিই শুরু করলাম, 'তোমার কে কে আছে?'

'আপনাকে তো কালই বলেছি, কেউ না।'

'মা-বাবা-ভাই-বোন, কেউ না?'

'না। আমি দাদা একেবারে নাগা সন্ন্যাসী। এই টিনের সুটকেশ, বিছানা আর নিজের এই বডিটা ছাড়া আমার আর কিচ্ছু নেই।'

'বাঃ বাঃ, ফাইন।'

বোদার দাঁত বেরিয়ে পড়ল অর্থাৎ আরেক বার হাসল সে।

আমি আবার বললাম, 'তোমার সব কথা জানতে ইচ্ছে করছে। মা-বাপটাপ এখন নেই, একদিন তো ছিল। বাড়ি-ফাড়িও নিশ্চয়ই ছিল। জন্মাবার পর থেকে নিশ্চয়ই এরকম রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছ না। সব শোনাও দেখি।'

একটু চিন্তা করে বোদা এবার যা বলল, সংক্ষেপে এইরকম। খুব ছেলেবেলায়, তখন তার বয়েস চার কি পাঁচ, দক্ষিণ ২৪ পরগনার এক গাঁ থেকে কলকাতায় চলে এসেছিল। না এসে উপায় ছিল না, কেননা ওদের গাঁ-টা বন্যায় ভেসে গিয়েছিল।

পৃথিবীতে বাপ ছাড়া আর কেউ ছিল না বোদার। তাকে জন্ম দিয়েই মা মরেছে। তারপর থেকে বাপই তাকে বুকের ভেতর পুরে বড় করে তুলেছে।

বাপের চেহারা ছিল মাঠের মাঝখানে বাজে-পোড়া ঢ্যাঙা তালগাছের মতো। মুখ ভাঙাচোরা, এবড়ো-খেবড়ো। রং জ্বলে কালচে মেরে গিয়েছিল। চামড়া পোড়া ঝামার মতো কর্কশ, রুক্ষ। মুখময় এবং মাথায় ধোঁয়াছে রঙের খাড়া খাড়া চুল-দাড়ি। শিক্‌ড়ে শিক্‌ড়ে হাত-পায়ে শেওলার মতো লোম, ঘোলাটে চোখ, কোঁচকানো কপাল আর গালদুটো তুবড়ে বসে যাওয়া।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সেই গাঁয়ে থাকতে বাপ ছিল ভূমিহীন কৃষাণ। এর-ওর জমিতে আপখোরাকি দু-আড়াই টাকা রোজে চাষ-আবাদের কাজ করত। খাটতে পারলে পয়সা, নইলে ফক্কা। তা ছাড়া সারা বছর তো চাষের কাজ থাকে না। তখন লোকের বাড়ি বাড়ি ঘুরে ঘরামির কাজ করত, কখনো বাজারে গিয়ে মাল-টাল বইত। এইভাবেই চলছিল।

আচমকা বান ডেকে ধানের জমি বরবাদ হয়ে গেল। তখন চাষ-আবাদ উঠল লাটে। চাষ নেই তো রোজগারও নেই। বান-ভাসি গাঁ থেকে এক মুঠো ভাতের আশায় বোদাকে নিয়ে বাপ চলে এল কলকাতায়।

গাঁয়ে থাকতে নিজেদের জমিজমা না থাক, মাথা গোঁজার মতো ছোট একটা গোলপাতার ঘর ছিল কিন্তু এই প্রকান্ড শহরে যেখানে রাস্তাগুলো হাজার হাজার অট্টালিকায় খচিত হয়ে আছে, সেখানে ফুটপাথ ছাড়া ওদের থাকবার জায়গা জোটে নি। ফুটপাথের একধারে অকেজো প্যাকিং বাক্সের কাঠ আর বাতিল চট ফট জুটিয়ে বাপ একটা ছাউনি তৈরি করে নিয়েছিল। প্রথম প্রথম বোদারা ওখানেই থাকত।

গাঁয়ে থাকতে বাপ ছিল কৃষাণ, কলকাতায় এসে প্রথম কিছুদিন এটা-ওটা করতে চেয়েছে। কুলিগিরি থেকে রাস্তায় আনাজ-টানাজ বেচা—এমনি নানা রকম ধান্দায় ঢুকতে চেয়েছিল। কিন্তু কোথাও কিচ্ছু করা যায়নি। চারদিকেই হেভি কম্পিটিশন। আগে থেকে যারা এসব নিয়ে ছিল, গাঁ থেকে উড়ে-আসা একটা লোককে তারা জুড়ে বসতে দেয়নি। অতএব পৃথিবীর সেই আদিম ব্যবসায় নেমে গিয়েছিল বাপ। ভিক্ষে করতে শুরু করেছিল। কলকাতায় এসে কৃষাণ ভিখিরি হয়ে গিয়েছিল। পেট বলে কথা!

গেঁয়ো মানুষ, প্রথম প্রথম কায়দা-টায়দা জানত না বাপ। সাদা সরলভাবেই সে লোকের কাছে হাত পাতত। বলত, 'বাবু দু'দিন খাওয়া হয়নি, দুটো পয়সা দিন।' কেউ দিত, অধিকাংশ লোকই দিত না। সারা দিনে হাজার বার লোকের কাছে হাত পেতে, নাকি সুরে দুঃখের কাঁদুনি গেয়ে যা পাওয়া যেত খাটুনির তুলনায় তা কিছুই নয়।

বাপ বুঝতে পেরেছিল, এভাবে চললে মজুরি পোষাবে না। আস্তে আস্তে সে শহুরে কৌশল রপ্ত করে ফেলেছিল। তখন কোনোদিন বোদাকে ফুটপাথে শুইয়ে আগাপাশ-তলা কাপড়ে ঢেকে বুক চাপড়াত আর লোকের হাতে-পায়ে ধরত আর গলার স্বরে ছোট বড ঢেউ তুলে কাঁদত। হিক্কা তোলার মতো শব্দ করে বলত, 'বাঁচান বাবু, দয়া করুন, ছেলেটার কলেরা হয়েছে।' নগদ নগদ এর ফল পাওয়া যেত। হুড় হুড় করে পয়সা আসত। একটা কৌশল খুব বেশি দিন কাজে লাগাত না বাপ, ধরা পড়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল। তার মাথায় নতুন নতুন ফন্দি গজাত তখন। চার পাঁচ দিন পর পরই কর্মপদ্ধতি বদলে ফেলত সে। আচমকা একদিন হয়ত বোদাকে কোরা থান পরিয়ে, গলায় ধড়া ঝুলিয়ে, হাতে মেটে সরা দিয়ে পুরোপুরি গুরুদশার সাজে রাস্তার মোড়ে দাঁড় করিয়ে দিত। মানুষের শরীরে করুণা করার যে গ্ল্যাণ্ড আছে সেটা খুবই উইক। বাপ তার খোঁজ পেয়ে গিয়েছিল। আসল কথা এই শহর বাপকে একজন উৎকৃষ্ট জোচ্চোর এবং ফেরেববাজ করে তুলেছিল।

মানুষের দয়া দেখানোর গ্ল্যাণ্ডটায় সুড়সুড়ি দিয়ে ক'বছর কেটে গেছে। তারপর দু'দিনের জ্বরে দুম করে বাপটা গেল মরে। তখন বোদার আর বয়েস কত? বড় জোর বার তের।

বাপ মরে যাবার পর তার ঝাণ্ডা কাঁধে তুলে নিয়েছিল বোদা। বাপের যে সব কৌশল এবং ফন্দি-টন্দ উত্তরাধিকার সূত্রে সে পেয়েছিল, কিছুদিন সেগুলো কাজে লাগিয়েছে। কিন্তু সে সব আর ভাল লাগছিল না। প্রথমত বহু ব্যবহারে ওগুলোর ধার নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

দ্বিতীয়ত, একঘেয়ে একটানা গুরুদশার সাজে সেজে কিংবা মালসায় ফুল বেলপাতা আর শনিঠাকুরের ফটো নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে কাঁহাতক আর ইচ্ছে করে! তা ছাড়া কলকাতার ফুটপাথে কাটিয়ে বোদারও চোখ ফুটে গিয়েছিল। তার মাথাতেও নানা রকম নতুন নতুন আইডিয়া আর কর্মপদ্ধতি গজিয়ে উঠতে শুরু করেছিল।

বোদার মধ্যে এক ধরনের আত্মসম্মানবোধও ছিল। ভিক্ষে করতে তার ভাল লাগত না। সে চলে গিয়েছিল অন্য লাইনে। সিনেমার টিকিট ব্ল্যাক করে, ছেনতাই বা বক্স কালেকসন করে এখন তার চলে। বাপের চাইতে তার পদ্ধতিগুলো অনেক বেশি সূক্ষ্ম এবং তাতে শহুরে পালিশ আছে, যাকে বলে সফিস্টিকেটেড। এই কলকাতা শহরে তার নিজস্ব কোনো স্থায়ী ঠিকানা নেই। যখন যেখানে চান্স পাওয়া যায় সেখানেই বডি ফেলে ঘুমোয়। আপাতত এই ভাঙাচোরা বাড়িটায় এসে ঢুকেছে। যে ক'দিন থাকা যায়।

নিজের কথা শেষ করে বোদা বলল, 'এই আমার লাইফ।'

আমি প্রায় চেঁচিয়েই উঠলাম, 'বিউটিফুল। হাত মিলাও—' আমি ডান হাতটা সামনের দিকে বাড়িয়ে দিলাম।

হতভম্বের মতো আস্তে আস্তে একটা হাত এগিয়ে দিয়ে আমার হাতটা ধরল বোদা। বলল, 'কী হল?'

'উই আর মেড ফর ইচ আদার, বুঝলি?' বোদাকে আবেগে তুই-ই বলে ফেললাম।

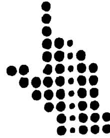
বোদাও ঝটকা মেরে এক সিঁড়ি নেমে এল, 'বলে দাও দাদা ওই ইংরিজিটার মানে কি—'

'খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখিসনি, একটা টেরিফিক ছুঁড়ির পাশে একটা ছোকরাকে দাঁড় করিয়ে লেখে—মেড ফর ইচ আদার। মানে একজনের জন্যে আরেক জন তৈরি হয়েছে। তুইও আমার জন্য তৈরি হয়েছিস।'

বোদা বিমূঢ়ের মতো খানিকক্ষণ তাকিয়ে তাকল। তারপর বলল, 'কি যে বল!' একটু থেমে ব্রীড়াময়ী যুবতীটির মতো সলজ্জ হেসে আবার বলল, 'তোমার জবাব নেই গুরু।'

'বলছিস?'

'পঁচিশ হাজার বার।'



পুবদিকের দেয়ালের সেই বিশাল ফোকর দিয়ে কিছুক্ষণ আগে সূর্যটাকে দেখা যাচ্ছিল। এখন আর সেটা নেই, আকাশের খাড়া পাড় বেয়ে ওপরে উঠে গেছে।

সূর্যটাকে দেখা যাচ্ছে না। তবে জুন মাসের গনগনে রোদ বাইরে ছড়িয়ে আছে। ঘরে বসেই তার আঁচ টের পাওয়া যাচ্ছে।

বোদা বলল, 'আমার কথা তো সব শুনে নিলে। এবার তোমার কথা বল—'

'আমার কথা!' এই পর্যন্ত বলেই চুপ করে গেলাম। আচমকা মনে হল কর্পোরেশনের নোটিশ-মারা এই বাড়ি, চারদিকে ছড়িয়ে থাকা বালি-ইট এবং দেড় ফুট ধুলোর স্তর কিংবা বাইরের ধারাল রোদ, ঝকঝকে আকাশ—সমস্ত কিছুই যেন চোখের সামনে থেকে সিনেমার পর্দার কোনো দৃশ্যের মতো ফেড আউট হয়ে যাচ্ছে। তার জায়গায় ফুটে উঠেছে কার্শিয়াংয়ের ছোট্ট একটা ক্যাথলিক চার্চ। চার্চটার চারপাশে উঁচুনিচু পাহাড়ের ঢেউ। পাহাড়গুলোর গায়ে পাইন আর দেবদারুর বন। শান্ত নির্জন বনভূমির মাথায় ঝাঁক ঝাঁক বুনো পাখি উড়ে বেড়াত। সেখানে আকাশ ছিল বিশাল। যতদূর চোখ যায়, একেবারে দিগন্ত পর্যন্ত তার সীমানা টানা। সব মিলিয়ে জায়গাটা চমৎকার।

সেই চার্চে জীবনের প্রথম ষোল সতেরটা বছর কাটিয়ে এসেছি। আমার সমবয়সী আরো একগাদা ছেলে ছিল সেখানে—শ্যামল, গৌরাঙ্গ, ম্যাথুজ, যোশেফ, বিশু ইত্যাদি ইত্যাদি। মনে পড়ছে আমাদের দেখাশোনার দায়িত্ব ছিল যাঁর ওপর তাঁর নাম রেভারেণ্ড সুধাময় হোড়।

ভাবনাটা আর এগুলো না। আচমকা বোদার গলা শোনা গেল, 'একেবারে ফটো হয়ে গেলে যে! স্পিকটি নট।'

চমকে উঠলাম। পর মুহূর্তে পঁচিশ তিরিশ বছর আগের সেই ক্যাথলিক চার্চটা থেকে উজান টানে শোভাবাজারের এই লঝ্ঝড় বাড়িতে ফিরে এলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী বলছিস?'

'এর মধ্যেই ভুলে গেলে! যাঃ বাবা—'

'ও, আমার কথা জানতে চাইছিলি— 'বলেই থামলাম। বেশ কিছুক্ষণ পর আবার শুরু করলাম, 'দ্যাখ বোদা, বলবার মতো তেমন কোনো কথা আমার নেই।'

বোদা কিছু বলল না, স্থির চোখে আমাকে দেখতে লাগল।

আমি বলতে লাগলাম, 'এই যে তোর একটা বাপ একটা মা ছিল—মানে যেখানে থেকে তোর লাইফটা শুরু হয়েছে, তেমন কোনো শুরুর জায়গাই আমার নেই। আমার অরিজিনটাই টেরিফিক গোলমেলে ব্যাপার—'

বোদার চোখ গোল হয়ে গেল। সে বলল, 'মানে—'

'মানেটা খুব সোজা রে। আমার মা-বাপ নেই, কোনোকালে ছিলও না।'

'ধুস মাইরি, মা-বাপ না থাকলে তুমি এলে কোত্থেকে?'

'সেইটাই তো মজা।' বোদার চোখের ভেতর দৃষ্টি রেখে বললাম, 'আমার নাম জানিস?'

ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো ডাইনে-বাঁয়ে মাথাটা বার দুই হেলিয়ে বোদা বলল, 'জানতে আর পারলাম কোথায়?'

'আমার নাম পিটার স্বয়ম্ভু হোড়।'

'যাঃ বাবা, এরকম নাম হয় নাকি!'

বোদার কথা আমার কানে ঢুকল কি ঢুকল না। বললাম, 'স্বয়ম্ভু মানে জানিস?'

বোদা বলল, 'আমি তো আমি, আমার ফোরটিন জেনারেশনও জানে না। কথাটা লাইফে প্রথম শুনলাম।'

'স্বয়ম্ভু মানে হল—যে নিজেই জন্মায়, যার বাপ-মা লাগে না। আমিও তেমনি একদিন মাটি ফুঁড়ে গজিয়ে উঠেছি। কি বুঝলি?'

'ধুস, তাই কখনো হয় নাকি?'

'বিশ্বাস কর বোদা, সত্যিই আমার বাপ-মা নেই।'

আমার গলার স্বরে এমন কিছু ছিল, যাতে বোদা আর কিছু বলল না। তার চোখে দুটো স্কুলের গ্লোবের মতো বড় হয়ে যেতে লাগল শুধু।

আমি আবার বললাম, 'আমার কোনো কোনো পাস্ট-ফাস্ট নেই। সবটাই প্রেজেন্ট টেন্স। যখন যেখানে থাকি সেখান থেকেই আমার আরম্ভ।'

বোদা এবারও উত্তর দিল না। আর কিছু জিজ্ঞেসও করল না।

এদিকে ধাঁ ধাঁ করে বেলা চড়ে যাচ্ছিল, দেখতে দেখতে দুপুর হয়ে গেল। এর মধ্যে এক ফাঁকে স্নান করে নিল বোদা। তারপর মই বেয়ে নিচে নেমে রাস্তার উল্টোদিকে পবিত্র খালসা হোটেল থেকে ভাত আর চিকেন কারি খেয়ে এসে আবার আমরা যে যার বিছানায় বসলাম। আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে আয়েস করে মাঝে মধ্যে টানছি। একটা সিগারেট বোদাকে দিয়েছিলাম। সে সেটা গাঁজার কলকের মতো বাগিয়ে ধরে ফুক ফুক করে ফুঁকে যাচ্ছে।

বললাম 'খাওয়া-দাওয়া হল, এবার আরাম করে একটা দিবানিদ্রা দেওয়া যাক, কি বলিস?'

'তুমি শুয়ে পড দাদা, আমি একটু ঘুরে টুরে আসি।'

'কোথায় ঘুরতে যাবি?'

'তখন সিনেমায় লাইন মারতে দিলে না। এখন গিয়ে দেখি দু-একটা টিকিট ব্ল্যাক করে যদি টু পাইস হয়ে যায়—'

'টিকিট ব্ল্যাকের ধান্দাটা তোর মাথা থেকে বেরুচ্ছে না দেখছি।'

বোদা বলল, 'কী করব বল, তুমি না হয় আজকের দিনটা চালিয়ে দিলে। কাল—কাল শালা কী খাব?'

বললাম, 'কালকের কথা কাল ভাবা যাবে। এখন শুয়ে পড়—'

'এখান আর শুতে ফুতে বোলো না। ঝট করে একটা চক্কর মেরে চলে আসছি। ওয়ান আওয়ার—অনলি ওয়ান আওয়ার ছুটি করে দাও দাদা—'

'নাঃ, ফুটপাথে থেকে থেকে, বক্স কালেকশন করে আর দু'চার পয়সার জন্যে সিনেমার টিকিট ব্ল্যাকে বেচে তোর নজরটাই ছোট হয়ে গেছে।' নকল হতাশার একটা ভঙ্গি করে বললাম, 'ভেবেছিলাম তোকে নিয়ে ফিউচারের একটা প্ল্যান করব। তা না, উনি চললেন দেড় মাইল লম্বা লাইনের পেছনে দাঁড়িয়ে টিকেট ব্ল্যাক করতে। এভাবে এনার্জি নষ্ট করার মানে হয়!'

চোখের কোণ দিয়ে আড়ে আড়ে একবার আমাকে দেখল বোদা। তারপর আচমকা টান টান হয়ে বলল, 'ঠিক আছে, বেরুব না। তোমার কী প্ল্যান আছে বল—'

'তার আগে বল তুই আমার সঙ্গে কদ্দিন থাকতে চাস?'

বোদা অবাক। বলল, 'মানে—'

'মানে দু'বছর থাকবি, না পাঁচ বছর, না দশ বছর? নাকি হোল লাইফ? তুই যদ্দিন থাকবি সেটা জানতে পারলে পাঁচ-সালা দশ-সালা কি হোল লাইফের প্ল্যান করব।'

বোদা বিমূঢ়ের মতো তাকাল, 'যাঃ বাবা! তোমাকে জানি না, আগে কখনো দেখি নি, তোমার সঙ্গে পাঁচ বছর দশ বছর থাকব কি করে?'

'কারেক্ট কারেক্ট—' আমি আস্তে আস্তে মাথা নাড়লাম, 'না বুঝে সুঝে কারো হোল লাইফের পার্টনার হওয়া ঠিক নয়। এক কাজ কর না—'

'কী?'

'অল্প কিছুদিন আমার সঙ্গে থাক।'

বোদা চিন্তা করে বলল, 'সেই ভাল। তোমার সঙ্গে আগে একমাস থেকে দেখি।'

'তা হলে এক কাজ করা যাক—' এবার আমিও বোদার দিকে পাশ ফিরে শুলাম। বললাম, 'আপাতত একটা শর্ট টার্ম-প্ল্যান মানে স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা করা যাক—'

বোদা উৎসুকভাবে তাকিয়ে রইল, কিছু বলল না।

আমি বলতে লাগলাম, 'প্ল্যানটা অবশ্য মনে মনে ঠিকই করে রেখেছি। মন দিয়ে শোন—'

'বল—'

'তার আগে আরেকটা কথা শুনে নে। এখন থেকে আমি যেভাবে বলব সেভাবে তোকে চলতে হবে। তোর ওই সিনেমার টিকিট ব্ল্যাক করা চলবে না। এমন কি নো বক্স কালেকসান, নো ছেনতাই বিজনেস—'

সট করে বিছানায় উঠে বসে বোদা বলল, 'যাঃ বাবা, খাব কী?'

তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলাম না। বোদার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে দেয়ালের ফোকর দিয়ে ঝকঝকে আকাশের দিকে তাকালাম। অনেক উঁচুতে একটা খয়েরি রঙের চিল ডানা ছড়িয়ে দিয়ে সিনেমার ফ্রিজ শটের মতো স্থির হয়ে আছে। চিলটাকে দেখতে দেখতে দুরমনস্কের মতো বলতে লাগলাম, 'দ্যাখ বোদা, এই পৃথিবীতে অনেক ভাল ভাল খাবার, ফাইন সব বাড়িঘর রয়েছে। কিছু লোক সেগুলো যক্ষের মতো আগলে বসে আছে। আছে কিনা?'

'তা আছে।' বোদা তক্ষুনি ঘাড় কাত করল।

'এই কলকাতা শহরে বড় বড় কত বাড়ি আছ জানিস?'

'হাজার হাজার।'

'কারেক্ট। একেকটা বাড়িতে ঢুকে দেখবি হয়তো পঞ্চাশ ষাটটা করে টাইলস-বসানো ঘর, শাওয়ার-লাগানো বাথরুম, মোজেক-করা সিঁড়ি—অথচ লোক থাকে চার জন কি পাঁচ জন। আর তুমি শালা কোথায় থাকো?'

বোদা বলল, 'কোথায় আর, আমাদের মতো ভাগাড়ের শুয়োরদের জন্যে ফুটপাথ আর সি-এম-ডি-এ'র পাইপ।'

আমি বললাম, 'তা হলে?'

'তা হলে কী?'

'শালা মদন, নিজের চোখটা ফুটিয়ে চারদিকটা একটু দ্যাখ। নইলে ওই পাইপ নিয়েই থাকতে হবে।'

'ধুস মাইরি, তুমি কী বলছ বুঝতে পারছি না। ব্রেনের ভেতরটা গড়বড় হয়ে যাচ্ছে।'

'সোজা কথাটা বুঝতে পারছিস না। পৃথিবীতে এত এত খাবার, এত এত বাড়ি, এত এত পোশাক—মাত্র ক'জন লোক এগুলো দখল করে বসে থাকবে আর তুমি আমি কলার খোসা চুষব, তা তো হয় না।'

'তোমার প্ল্যানটা কী?'

'ওই সব খাবারে, পোশাকে, বাড়িঘরে ছোঁ মারা—'

'মানে—'

'মানে ভাগ বসানো। ওদের কাছ থেকে কিছু কিছু আদায় করে নিতে হবে।'

'আরি ব্বাস!' বোদার গলার ভেতর থেকে ঘড়ঘড়ে জড়ানো একটা শব্দ বেরিয়ে এল।

'কী হল রে?' ঘাড় ফিরিয়ে বোদার দিকে তাকালাম।

'ছোঁ মারতে গেলে মেরে হাড়-ফাড় একেবারে পাউডার করে দেবে যে—'

'আমার দিকে তাকা, বেশ ভাল করে তাকা। কী মনে হচ্ছে, হাড় পাউডার হয়ে গেছে?'

একদৃষ্টে প্রায় পলকহীন কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল বোদা। তারপর কাঁধে একটা ঝটকা মেরে বলল, 'তোমার কথা আমি কিছু বুঝতে পারছি না মাইরি।'

আমি হাসতে লাগলাম, 'তোর মাথায় একেবারে স্ক্র্যাপ আয়রণ পোরা। আমার কত বয়েস আন্দাজ করতে পারিস?'

'না।'

'পঁয়তাল্লিশ। এই পঁয়তাল্লিশটা বছর ছোঁ মেরেই চালাচ্ছি। কোনো বানচোৎ হাড় তো অনেক ভেতরে রে, চামড়ায় একটা টুসকি পর্যন্ত দিতে পারে নি।'

বোদার মুখটা হাঁ হয়ে ঠোঁট ঝুলে পড়ল। আবছা গলায় সে বলল, 'তুমি দাদা—তুমি—'

আমি নিঃশব্দে হেসেই যাচ্ছি। হাসিটা ঠোঁট থেকে গালে, গাল থেকে চোখের তারায় খেলে বেড়াতে লাগল। বললাম, 'আমার লাইফ হিস্ট্রি বলতে গেলে ঝাড়া একটা মাস লেগে যাবে। তার চাইতে প্ল্যানের কথাটাই শোন। মাখনের ভেতর দিয়ে ছুরি চালাতে দেখেছিস কখনো?'

বোদা ঘাড় হেলিয়ে দিল—দেখেছে।

'কোথাও আটকায়?'

'না।'

'ওই রকম মসৃণভাবে আমাদের বেরিয়ে যেতে হবে, বুঝলি?'

বোদা কতটা কী বুঝল, সে-ই জানে। হতভম্বের মতো ঘাড় কাত করল।

আমি বলতে লাগলাম, 'তোর সঙ্গে কথা বলতে বলতে মাথায় একটা ছোট প্ল্যান এসে গেছে। আজ বিকেল থেকেই কাজ শুরু করে দেব।'

'কী প্ল্যান?'

'অপারেশন পার্ক স্ট্রিট—'

'মানে?'

'এত তাড়াহুড়ো কেন? বিকেল পর্যন্ত ধৈর্য ধরে থাক না।'

বোদা কিছু বলতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, 'স্পিকটি নট, এখন ও পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়।' বলেই এ পাশ ফিরলাম।

পরিপাটি একটি দিবানিদ্রা দিয়ে যখন উঠলাম গরমকালের বেলা হেলে গেছে। বাইরে রোদের রং এখন হলুদ। তাব ঝাঁঝও কমে এসেছে। দেয়ালের ফোকর দিয়ে সুখদায়ক ঠাণ্ডা হাওয়া খেলে যাচ্ছিল।

আড়মোড়া ভেঙে এ ধারে ফিরতেই বোদার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। চোখ গোল করে সে আমার দিকেই তাকিয়ে ছিল। হেসে বললাম, 'কী দেখছিস?'

বোদা বলল, 'তোমাকে।'

'আমাকে আর দেখতে হবে না। চটপট উঠে রেডি হয়ে নে। অপারেশন পার্ক স্ট্রিটের কথা মনে আছে?'

দু মিনিটের মধ্যে বোদা পোশাক-টোশাক পাল্টে তৈরি হয়ে গেল। পোশাক আর কি, শস্তা দামের খেলো রিপু-করা প্যাণ্ট আর আধ-ন্যাংটো মেমসাহেবদের ছাপা-মারা টী-শার্ট। দুটোই ময়লা এবং চিটচিটে। পায়ে তালিমারা চটি।

আমারও বেশিক্ষণ সময় লাগল না। ত্রিনাথের দুর্বল গ্ল্যাণ্ডে সা-রে-গা-মা বাজিয়ে যে দামী স্যুটটা এনেছিলাম দ্রুত সেটা পরে ফেললাম। চুলটুল ব্রাশ করে অ্যাটাচি কেস থেকে আমেরিকান ব্যাঙ্কের সেই চেক বইটা বার করে জুতোটা পায়ে গলালাম। ঝুঁকে জুতোর ফিতে বাঁধতে বাঁধতে আচমকা একটা কথা মনে পড়ে গেল। মুখ তুলে বোদাকে বললাম, 'একটু পিচবোর্ড পাওয়া যাবে?'

বোদা অবাক, 'পিচবোর্ড দিয়ে কী হবে?'

'তোর ধৈর্য-টৈর্য বড্ড কম। সবই আগেভাগে জানতে হবে! যা, পিচবোর্ড নিয়ে আয়—'

খুঁজে পেতে ঘরের কোণ থেকে চৌকো-মতো বেশ বড় একটা পিচবোর্ড নিয়ে এল বোদা। শেভিং বক্স থেকে পুরনো ব্লেড বার করে ওটা থেকে দেড় ফুট লম্বা ছ'ইঞ্চি চওড়া একটা টুকরো কেটে নিলাম। তার ওপর কালি দিয়ে মোটা করে লিখালাম ঃ ডবলু এন এস ১২৩৪৫। বোদার পেটের ভেতর সোডার ফেনার মতো কৌতূহল গেঁজিয়ে উঠতে যাচ্ছিল। ডবলু এন এস ১২৩৪৫ সম্বন্ধে অজান্তেই প্রশ্ন করতে যাবে, আচমকা আমার

ধমকের ভয়ে দু'হাতে মুখটা ঠেসে ধরে প্রশ্নটা গিলে ফেলল।

আমি দেখেও দেখলাম না। খবরের কাগজে পিচবোর্ডটা মুড়ে বোদাকে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলাম।

হে-হে মহাশয়গণ, এবার আমি কী করতে যাচ্ছি আন্দাজ করতে পারেন? দেখতে পাচ্ছি আপনাদের কপাল কুঁচকে যাচ্ছে, দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াচ্ছেন, কেউ কেউ চুল খামছে ধরছেন কিন্তু আমি জানি স্বর্গমর্ত তোলপাড় করে ফেললেও ধরতে পারবেন না আসলে কোন প্ল্যানটা আমার মাথায় ঘুরছে। আপনাদের ভাবনা-চিন্তা বা অনুমানের ডাইমেনসান আমার জানা আছে। কিঞ্চিৎ ধৈর্যধারণ করুন, স্বচক্ষেই সব কিছু দেখতে পাবেন।

শোভাবাজার থেকে বেরিয়ে ট্যারাবাঁকা অলিগলির ভেতর দিয়ে শর্ট কাট করে খানিকটা পর আমরা সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউতে এসে পড়লাম। তারপর রাস্তা পেরিয়ে পুবদিকের একটা ওয়েসাইড মোটর গ্যারেজে এসে ঢুকলাম।

এতটা রাস্তা এসেছি, বোদা একটা কথাও বলে নি। মুখ বুঁজে আমাব গায়ে সেঁটে থেকে মন্ত্রচালিতের মতো শুধু অনুসরণ করে গেছে।

গ্যারেজটার নাম 'এভারগ্রিন অটোমোবাইলস'। ওই যে কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন না কী যেন বলে, এ হল তা-ই। আসলে ভাঙাচোরা ফুটিফাটা লঝ্ঝড় টিনের শেডের তলায় গাড়ি মেরামতের কারখানা।

এই মুহূর্তে তেলকালি-মাখা মিস্তিরিরা কেউ গাড়ির তলায়, কেউবা গাড়ির ভেতরে ঢুকে খুটখাট করে কাজ করছিল। একধারে দু-তিনটে ছোকরা প্রকাণ্ড একটা স্টেশন ওয়াগনের গায়ে রং স্প্রে করছিল।

গ্যারেজেরই শেষ মাথায় চেয়ার-টেবিল পেতে অফিস। প্রোপ্রাইটর জগবন্ধু [illegible] এখন সেখানে বসে আছে। লোকটার বয়েস পঞ্চাশের কাছাকাছি। ভারি চৌকো মুখ, খাড়া খাড়া কাঁচাপাকা চুল, চওড়া মাংসল কাঁধ, মোটা মোটা শক্ত আঙুল, ভারি ঠোঁট। চোখ দুটো কালীমার্কা বাংলা মালের কল্যাণে সব সময়ই লালচে এবং ঘোলাটে। তার পরনে এখন দুই পকেটওলা হাফ শার্ট আর পায়জামা। লোকটা একসময় নামকবা মোটর মিস্তিরি ছিল। অন্যের গ্যারেজে ফুরনে কাজ করত, বছর দশ বার হল সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউর এই জায়গাটা 'লীজ' নিয়ে গ্যারেজ খুলেছে। পাঁচ সাতজন মিস্তিরি রেখেছে, তারাই কাজকর্ম করে। তবে তেমন কোনো জরুরি ব্যাপার থাকলে চিটচিটে প্যান্ট শার্ট গায়ে গলিয়ে যন্ত্রপাতি নিয়ে গাড়ির তলায় ঢুকে যায়।

জগবন্ধুর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল চোদ্দ পনের বছর আগে—এক বাংলা মালের দোকানে। তখনও সে গ্যারেজের মালিক হয়ে বসে নি, অন্যের কারখানায় কাজ করত। এতগুলো বছরে তার সঙ্গে এক ধরনের ঘনিষ্ঠতাই হয়েছে। মহাশয়গণ, ঘনিষ্ঠতাটা নিজের গরজেই আমি করেছি। অকারণে চোদ্দ পনের বছর ধরে একটা লোকের সঙ্গে ঝুলে থাকা আমার ধাতে নেই। কিন্তু জগবন্ধুর কথা আলাদা, হোল লাইফ তাকে আমার দরকার।

জগবন্ধু আমাকে দেখতে পেয়েছিল। হাত তুলে জড়ানো ভারি গলায় ডাকল, 'আসুন হোড় সাহেব, আসুন—' এই বিকেল বেলাতেই শালা কালীমার্কা গলায় ঢেলে ভোম হয়ে আছে।

কাছে এসে মুখোমুখি বসতেই জগবন্ধু আবার বলল, 'অনেক দিন পর এবার এলেন।'

'হ্যাঁ—' আমি হাসলাম।

'এখন কোথায় আছেন?'

'শোভাবাজারের কাছে।'

বোদা আমার গা ঘেঁষে একটা চেয়ারে বসে ছিল। তাকে দেখিয়ে জগবন্ধু জিজ্ঞেস করল, 'এ কে?'

চোখের কোণ দিয়ে এক পলক বোদাকে দেখে বললাম, 'আমার এখনকার পার্টনার।'

জগবন্ধু ঘোলাটে আরক্ত চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে কি বুঝতে চেষ্টা করল, তারপর বলল, 'কী খাবেন বলুন? চা আনাব, নাকি একটু মা কালীর সেবা করবেন? পাশেই দোকান আছে—'

'না-না, ওসব থাক। বিশেষ একটা দরকারে এসেছি।'

'কী?'

'ভাল একটা গাড়ি পাওয়া যাবে? বেশ ঝকঝকে—ইম্পোর্টেড কার হলেই ভাল হয়।'

চোখ কুঁচকে একটু হাসল জগবন্ধু, 'মাথায় নতুন প্ল্যান ফ্ল্যান এসেছে বুঝি?'

আমার অনেক ব্যাপারই জগবন্ধু জানে, বাকিটা আন্দাজ করে নেয়। লোকটার নাক দারুণ চোখা, দুর থেকে সে গন্ধ পায়।

হে-হে মহাশয়গণ, আমার পয়লা নম্বর তাসটাই আপনাদের চিত করে দেখিয়ে দিয়েছি। আপনারা জেনেই ফেলেছেন আমি একজন সাধারণ চিট—খুব নিরীহ ধরনের প্রতারক। জগবন্ধুও তা জানে। তবে মহাশয়রা চিটিংবাজিটা মানে তঞ্চকতা বা প্রতারণা জগবন্ধুর সঙ্গে কদাপি করি না। ওর সঙ্গে আমার একটা অলিখিত জেণ্টলম্যানস এগ্রিমেণ্ট আছে। ও আমাকে বিশ্বাস করে। তার সঙ্গে কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করি নি। এ বিষয়ে আমি ভদ্রলোক, আগাপাশতলা জেণ্টলম্যান। নিজের ঢাক নিজে পেটাবার মতো হলেও কথাটা সত্যি, আপনারা বিশ্বাস করতে পরেন।

জগবন্ধু একটু ভেবে বলল, 'ইম্পোর্টেড কার তো নেই। তবে ভাল একখানা দিশি গাড়ি রেডি হয়েছে। কাল সকালে ডেলিভারি নেবে। আপনি কয়েক ঘণ্টার জন্যে নিতে পারেন। দশটার ভেতর কিন্তু ফেরত দিয়ে যেতে হবে।'

'আটটার মধ্যেই ফেরত পবেন।'

'আর—' বলেই একটু ঠোঁট টিপল জগবন্ধু।

আমি তার চোখের ভেতর তাকালাম, 'কী?'

'আপনার ওপর আমার টেরিফিক বিশ্বাস তবু গাড়িটা তো পরের, তাই বলছিলাম ওটা নিয়ে কোনো ঝামেলা-টামেলা হবে না তো? আমি শালা আবার না গাড্ডায় পড়ে যাই—'

'কিচ্ছু ভয় নেই।'

'তবে আসুন—'

গ্যারেজের এক প্রান্তে একটা ঝকঝকে নীল রঙের অ্যামবাসাডর দাঁড়িয়ে ছিল। তার চাবিটা আমার হাতে দিয়ে জগবন্ধু বলল, 'কদ্দুর যাবেন?'

বললাম, 'পার্ক স্ট্রিট।'

'আর কোথাও না তো?'

'না।'

মনে মনে হিসেব কষে জগবন্ধু বলল, 'তার মানে দু-আড়াই লিটারের মতো তেল লাগবে। গাড়ি ভাড়া দশ টাকা আর তেলের দাম—আচ্ছা আপনি কুড়িটা টাকাই দেবেন।' প্রতিবারই গাড়ি ভাড়া দশটাকা আর যতটা তেল লাগে তার দামটা নিয়ে নেয় জগবন্ধু।

কুড়ি টাকা জগবন্ধুকে দিয়ে বললাম, 'ট্যাঙ্কে তেল দিয়ে দিন।'

'তেল আছে।'

বোদাকে পাশে বসিয়ে গাড়িটা নিয়ে রাস্তায় এলাম। খানিকটা গিয়ে স্টার্ট বন্ধ করে নেমে পড়লাম। তারপর এদিক সেদিক ভাল করে দেখে যে পিচবোর্ডটায় নম্বর লিখে এনেছিলাম সেটা গাড়ির আসল নাম্বার প্লেটের ওপর আটকে দিলাম।

বোদা আবছাভাবে জিজ্ঞেস করল, 'এ কি দাদা, ফল্‌স নম্বর লাগালে যে?'

চোখের তারায় হাসি চকচকিয়ে তুলে বললাম, 'তুই তো তখন বলছিলি, ফল্‌সের ওপরেই ওয়ার্ল্ডটা চলছে। চল চল, আর দেরি করা যাবে না।'

আবার গাড়িতে গিয়ে বসলাম। মিনিট কয়েক পর লক্ষ করলাম, দরজা ঘেঁষে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে বোদা। আমার দিকেই তাকিয়ে ছিল সে। চোখাচোখি হতেই বলল, 'দাদা কিছু হবে না তো?'

তার মুখচোখ দেখে মনে হল, এমন ঝকঝকে আরামদায়ক গাড়িতে চড়ে একদিনের চেনা একটা লোকের সঙ্গে কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে, ইত্যাদি ছিটে ফোঁটাও না বুঝে দারুণ ভয় পেয়ে গেছে। আমার পেটের ভেতর হাসি বগবগিয়ে উঠছিল। মুখটা যতখানি সম্ভব গম্ভীর করে বললাম, 'কী হবে?'

'মানে কোনোরকম ব্যাগোরবাই—'

'কিচ্ছু হবে না।'

বোদা আর কোনো প্রশ্ন করল না।

বাস-লরি-ট্যাক্সি-টেম্পো এবং হাজার হাজার প্রাইভেট কারের ভেতর দিয়ে পথ কেটে কেটে আরো খানিকটা গিয়ে একটা ট্রাফিক সিগন্যালের রক্তচক্ষুর সামনে থমকে দাঁড়াতে হল। তখন ঘাড় ফিরিয়ে বোদাকে বললাম, 'ব্যাপারটা কী জানিস, একেবারে গোড়া থেকে আমি শুরু করতে চাই। প্রথমে লোকে কী দ্যাখে?'

'কী?' বোদা বিমূঢ়ের মতো প্রতিধ্বনি করল।

'চেহারা—জামা কাপড়। পৃথিবীতে এত ফাইন ফাইন কাপড় বেরুচ্ছে—সিল্ক,

সিনথেটিক, টেরিকট, টেরিউল। নতুন নতুন ডিজাইন বেরুচ্ছে। আর তুমি মাকড়া রদ্দি কটনের লঝ্ঝড় ডিজাইনের প্যান্ট শার্টের ভেতর নিজেকে ঢুকিয়ে লাইফ কাটিয়ে দেবে, তা হবে না। ভদ্দরলোকের মতো একটু বাঁচতে চেষ্টা কর—'

বোদা কী বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই ট্রাফিক সিগন্যালে সবুজ আলো জ্বলে উঠেছে। শ'খানেক মিনি-বাস-টেম্পো-ট্রাক ফ্রাকের সঙ্গে অতএব আমরাও উর্ধ্বশ্বাসে দৌড় লাগালাম। তারপর কি আশ্চর্য, একটা ট্রাফিক আইল্যান্ডেও গাড়িটা আটকাল না। বউবাজার-মিশন রো-চোরঙ্গি-লিণ্ডসে স্ট্রিট, সটাসট সব পেরিয়ে দশ মিনিটের মধ্যে পার্ক স্ট্রিটের একটা প্রকাণ্ড এয়ার কণ্ডিশানড পোশাকের দোকানের সামনে এসে গাড়ি পার্ক করলাম। বোদাকে নামিয়ে আমি নেমে গাড়িটা 'লক' করে বললাম, 'আয়—'

দোকানের দরজায় এসে বোদা দারুণ ঘাবড়ে গেল। এ রকম জায়গায় আসার অভ্যাস নেই। কোনোদিন স্বপ্নে টপ্নেও এমন দোকান দেখে নি সে। বলল, 'দাদা, আমাকে ছেড়ে দাও।'

'ধুস, আয় আমার সঙ্গে—'

বোদা বুঝল, আমি তাকে ছাড়ছি না। অগত্যা নিঃশ্বাস বন্ধ করে ছুঁচের পেছনে সুতোর মতো আমার গায়ের সঙ্গে জুড়ে ভেতরে ঢুকল।

প্রকাণ্ড ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর। প্রথমে আমরা গেলাম শার্ট কাউণ্টারে। সেখানে দারুণ সুন্দরী সেলস গার্লটাকে বলতেই বোদার মাপের কয়েক ডজন টেরিকট আর সিনথেটিকের শার্ট বার করে দিল। বললাম, 'কোনটা কোনটা নিবি পছন্দ কর—'

বোদার হাত-পায়ের জোড়গুলো আলগা হয়ে গেছে খুব সম্ভব। চোখের তারা স্থির। পছন্দ করবে কি, দারুণ কাঁপছিল সে।

অতএব কি আর করা, আমিই দশ বারটা জামা পছন্দ করলাম। জামার কাউণ্টার থেকে গেলাম ট্রাউজার্সের কাউণ্টারে। সেখানে এসেও বোদার কাঁপুনি থামেনি। এয়ার কণ্ডিশানড হল-এর ভেতরেও ছোকরা গলগল করে ঘামছিল। এখানেও আমাকেই ট্রাউজার্স পছন্দ করতে হল। দশ বারটা শার্ট দশ বারটা ট্রাউজার্সের কার্বন করা ক্যাশমেমো নিয়ে ক্যাশ-কাউণ্টারে আসতেই পকেটে হাত দিয়ে জিভ এবং তালুর যোগাযোগ ঘটিয়ে একটা শব্দ করলাম, 'আই অ্যাম এক্সট্রিমলি স্যরি। পার্সটা বাড়িতে ফেলে এসেছি। আমি আপনাদের ম্যানেজারের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।'

ম্যানেজার-কাম-প্রোপ্রাইটর কাছেই ছিলেন, আমার কথা শুনে থাকবেন। কাছে এসে বললেন, 'কী ব্যাপার?'

আপনাদের আগেই জানিয়ে দিয়েছি, কপালে একটি রেখাও না ফুটিয়ে নিষ্পাপ দেব-শিশুর মতো মুখ করে সব চাইতে জঘন্য মিথ্যে কথাটা বলে যেতে পারি। এতে এতটুকু আটকায় না আমার। চোখে মুখে পৃথিবীর সব সরলতা মাখিয়ে ম্যানেজার-কাম-প্রোপ্রাইটরকে জানালাম, পার্সটা ভুলবশত ফেলে এসেছি। এখন যদি অনুগ্রহ করে তিনি কাউকে আমার সঙ্গে দেন, টাকাটা দিয়ে দিতে পারি।'

মহাশয়গণ, আপনারা তো জনেনই, আমার চেহারাটা দারুণ ডিসেপটিভ। আমার মুখ দেখে কোনো শালা টের পাবে না ভেতরে কী প্যাঁচ কষে যাচ্ছি।

ম্যানেজার-কাম-প্রোপ্রাইটরের চোখ মুখ দেখে বুঝতে পারছি, ব্যাটা ইঁদুরকলে পা দিয়ে ফেলেছে। তিনি বললেন, 'আপনার বাড়ি কোথায়?'

'কাছেই। ল্যান্সডাউন রোডে—'

ঘাড় না ফিরিয়েও টের পাচ্ছি বোদার গলা ভয়ে এবং বিস্ময়ে সাড়ে চার ফুট লম্বা হয়ে গেছে। আমার হাসিও পাচ্ছিল আবার চিন্তাও হচ্ছিল, ও আবার কিছু বেফাঁস বলে টলে পুরো প্লানটা কাঁচিয়ে না দেয়।

ম্যানেজার-কাম-প্রোপ্রাইটর বললেন, 'ঠিক আছে, দোকানের একটা বয়কে আপনার সঙ্গে পাঠিয়ে দিচ্ছি, টাকাটা ওর হতে দিয়ে দেবেন।'

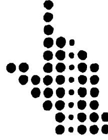
'থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ। আমার সঙ্গে গাড়ি আছে, পনের মিনিটের মধ্যে আপনার লোককে আমি নিজে পৌঁছে দিয়ে যাব।'

একটা বয়কে ডেকে আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন ম্যানেজার-কাম-প্রোপাইটার। বয়টাই শার্ট ট্রাউজার্সের প্যাকেটগুলো ঘাড়ে করে গাড়িতে এনে তুলল।

আমি আর বোদা বসেছি সামনের সিটে, বয়টা পেছনে।

দোকানে ঢোকবার পর থেকে একটা কথাও বলেনি বোদা। এবাব আমার কাঁধের কাছে মুখ এনে দম-আটকানো গলায় ফিসফিস করল, 'বয়টাকে নিয়ে এলে, কী হবে দাদা?'

'চুপ কর, সোজা হয়ে বোস—'



বোদা মেরুদণ্ড সোজা করে উইণ্ড-স্ক্রিনের কাচের ভেতর দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। আমি গাড়িটা ঘুরিয়ে ক্যামাক স্ট্রিটে নিয়ে গেলাম। থিয়েটার রোডের কাছে এসে, কি যে হল, গাড়িটা আচমকা থমকে দাঁড়িয়ে গেল। চমৎকার ইঞ্জিন, কলকব্জার এতটুকু গোলমাল নেই। তবু অ্যাকসিলেরেটর এবং ব্রেকের কারসাজিতে এমন একটা ঝামেলা পাকিয়ে তুললাম, যেন গাড়িটা ঠিকমতো স্টার্টই নিচ্ছে না। দু ফুট যেতে না যেতেই দাঁড়িয়ে যাচ্ছে।

বললাম, 'এ তো ভারি মুশকিল হল দেখছি। এই বোদা এক কাজ কর দেখি, নেমে একটু ঠ্যাল।' পেছন ফিরে বয়টাকে বললাম, 'ভাই কিছু মনে কোরো না, ও একা পারবে না, তুমি যদি একটু হাত লাগাতে—'

'হ্যাঁ, সাব, জরুর—' বয়টা গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। অর্থাৎ সে-ও নিমেষে ম্যানেজার-কাম-প্রোপ্রাইটরের মতো সেই ইঁদুর কলটায় পা ঢুকিয়ে বসেছে।

আমি বোদাকে বললাম গাড়ির পাশ থেকে ঠেলতে, আর বয়টাকে বললাম পেছন থেকে। কথামতো ওরা ঠেলে নিয়ে চলল।

দু'তিন মিনিট পর নিঃশব্দে গাড়ির সাইড ডোরটা খুলে দিয়ে বোদকে উঠে আসতে ইশারা করলাম। বোদা প্রথমটা হকচকিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল, ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে তাকে থামিয়ে দিলাম। খুব চাপা গলায় বললাম, 'ঝট করে উঠে আয়—'

হতভম্বের মতো বোদা উঠে এল। হাত বাড়িয়ে কোনোরকম শব্দ না করে আস্তে আস্তে দরজা বন্ধ করে দিলাম। ঘার ফিরিয়ে পেছনের কাচ দিয়ে একবার দেখে নিলাম ঘাড় গুঁজে বয়টা প্রাণপণে গাড়ি ঠেলছে।

বোদা উঠে আসতেই ইঞ্জিনের গোলমাল আর নেই। চাবি ঘোরাতেই গাড়িটা স্টার্ট নিল এবং অ্যাকসিলেরেটরে চাপ দিতেই পলকে তিরিশ মাইল স্পিড উঠে গেল। সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় করে কিছু পড়ে যাবার শব্দ হল।

বোদা পাশ থেকে চেঁচিয়ে উঠল, 'দাদা, দোকানের সেই ছোকরাটা পড়ে গেছে—'

জানতাম স্পিড তুললেই ছোকরা পড়ে যাবে। কেননা গাড়ির ওপর শরীরের সব ভার রেখে ও ঠেলছিল, গাড়িটা সরে গেলে ব্যালান্স রেখে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না। স্পিড একটু কমিয়ে বললাম, 'দ্যাখ তো উঠেছে কিনা—'

জানলার বাইরে মুণ্ডু বাড়িয়ে বোদা বলল, 'হ্যাঁ উঠেছে, গায়ের ধুলো ঝাড়ছে। অ্যাই এদিকে তাকাল, আরে এবার দৌড় লাগিয়েছে।' রেডিওতে যেভাবে ক্রিকেটের রানিং কমেণ্টারি দেয় অনেকটা সেই কায়দায় বলে যেতে লাগল সে।

ঘাড় ফিরিয়ে পেছনের কাচ দিয়ে আমিও একবার দেখে নিলাম, সত্যিই বয়টা দু'হাত তুলে আমাদের গাড়ির দিকে দৌড়ে আসছে। আমি আবার স্পিড তুললাম, এক মিনিটও লাগল না, ক্যামাক স্ট্রিট থেকে সার্কুলার রোডে ঢুকে রাইট টার্ন নিয়ে চৌরঙ্গিতে চলে এলাম। আবার ডাইনে ঘুরে হাজার হাজার গাড়ির স্রোতে ভাসতে ভাসতে সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউর দিকে চললাম।

আমার চোখ উইণ্ডস্ক্রিনের বাইরে ছড়ানো ছিল। হঠাৎ পায়ে সুড়সুড়ি লাগতে চমকে মুখ নীচু করলাম। দেখলাম, বোদা খানিকটা ঝুঁকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করছে। বললাম, 'কী হল রে?'

ঘাড় তুলে সোজা হয়ে বসতে বসতে বোদা বলল, 'তুমি গুরু সত্যি যাদুকা খেল জানো। ম্যাজিক জানো।'

'বলছিস?'

'হাজার বার। যেভাবে শার্ট-ফার্টগুলো নিয়ে এলে আমার ফোরটিন জেনারেশনও ভাবতে পারত না।'

আমি হাসতে লাগলাম। বললাম, 'তাসের প্যাকেটে কতগুলো তাস থাকে রে?'

'বাহান্ন পাত্তি—'

'একটা পাত্তি সবে দেখলি। আরো অনেক খেল আমার হাতে আছে, বুঝলি?'

'না বললেও এখন বুঝতে পারছি।'

'কিন্তু—'

'কী?'

'মোটে একটা মাস তো আমার সঙ্গে থাকছিস। কী ম্যাজিক আর দেখাব—'

ধাঁ করে আবার পা ধরল বোদা, 'তুমি কী মাল, তখন বুঝতে পারিনি গুরু। ক্ষমা করে দাও।'

বাঁ দিকের ভুরু অনেকখানি ওপরে তুলে বললাম, 'ক্ষমা!'

'হ্যাঁ, ক্ষমা। বুঝতে পারছি তোমাকে ছাড়া আমার আর একটা দিনও চলবে না। হোল লাইফ তোমার পায়ে মাইরি লেপ্টে থাকব।'

'গুড। এখন উঠে বোস—'

বোদা উঠে বসলে বললাম, 'তা হলে প্ল্যান-ফ্ল্যানগুলো আবার নতুন করে রিভাইজ করতে হবে দেখছি। তখন শর্ট টার্ম পরিকল্পনা নিয়েছিলাম, এখন থেকে হোল লাইফের জন্যে কিছু ভাবতে হবে।'

বোদা কিছু বলল না। পৃথিবীর সব বিস্ময় নিয়ে স্থির গোল চোখে আমাকে দেখতে লাগল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। আচমকা কি মনে পড়ে যেতে বোদা বলে উঠল, 'আচ্ছা গুরু, একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না।'

'কী ব্যাপার?'

'তুমি গাড়ির নাম্বার প্লেটের ওপর পিচবোর্ডর ফল্‌স নম্বারটা চাপালে কেন?'

'আরে মাকড়া, বয়টা যদি গাড়ির আসল নম্বরটা দেখে দোকানের মালিককে জানাতো মোটর ভেইকেলসে খবর নিলেই গাড়ির মালিক ধরা পড়ে যেত। তখন গাড়ির মালিক ধরত গ্যারেজওলাকে, গ্যারেজওলা আমাদের ক্যাচ করত। তারপর তুমি আর আমি দুই মদন হাজতে বসে পুলিশের লাপসি খাচ্ছি।'

'আরি ব্বাস, তুমি এতদূর ভেবে কাজ কর।'

ঘাড় হেলিয়ে দিলাম, 'করি। তোকে বলেছিলাম না, মাখনের ভেতর দিয়ে ছুরির মতো বেরিয়ে যেতে হবে—'

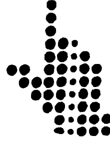
'হ্যাঁ গুরু—' বোদা বলল।

'কেটে বেরিয়ে যাবি কিন্তু কেউ টেরটি পাবে না। যখন পাবে তখন—কী?'

বোদা বলল, 'তখন হেভি লেট হয়ে গেছে।'

বোদার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললাম, 'এই তো ব্রেন খুলে গেছে।'

কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা জগবন্ধুর গ্যারেজে পৌঁছে গেলাম।



এভারগ্রিন অটোমোবাইলসে গাড়িটা ফেরতে দিয়ে বোদা আর আমি হোটেলে চলে গিয়েছিলাম। সেখানে মুরগির ঝোল দিয়ে চার প্লেট করে ভাত খেয়ে শোভাবাজারের সেই লঝ্ঝড় বাড়িতে এসে যে যার বিছানায় শুয়ে পড়েছি এবং পরিপাটি একটি ঘুম লাগিয়ে রাতটা কাবার করে ফেলেছি।

এখন বেশ বেলা হয়েছে। ঘুম ভাঙতেই উল্টোদিকের খালসা হোটেল থেকে ভাঁড়ে করে চা নিয়ে এসেছিল বোদা। বিছানায় বসে আয়েস করে সেই চায়ে চুমুক দিচ্ছি।

চায়ের ভাঁড় শেষ হয়ে গেলে বোদা জিজ্ঞেস করল, 'আজ আমাদের কী প্রোগ্রাম গুরু?'

বললাম, 'প্রোগ্রামের আগে আমার শার্টটা নিয়ে আয়। ক্যাশ-ট্যাশ কিরকম আছে দেখে নিই।'

কোণের দিকে একটা দড়িতে শার্টটা ঝুলছিল। সেটা নামিয়ে নিয়ে এল বোদা।

পকেট থেকে নোট আর খুচরো পয়সাগুলো বার করে ফেললাম। গুনে টুনে দেখলাম নীট একশো পঁচিশ টাকা সাতচল্লিশ পয়সা ব্যালান্স রয়েছে।

'গ্রেট হিমালয়ান বোর্ডিং হাউস'-এর ম্যানেজার তারকনাথ হালদারকে, বাবা তারকনাথও যাকে বলে থাকি মধ্যে মধ্যে, আমেরিকান ব্যাঙ্কের ভেলকি দেখিয়ে মসৃণভাবে একশো চল্লিশটা টাকা পকেটে পুরে ফেলেছিলাম। এ ছাড়া আগের গোটা তিরিশ বত্রিশ টাকা ছিল। তার মানে সবসুদ্ধু ছিল এক শো সত্তর-বাহাত্তর টাকার মতো। বোদার সঙ্গে রাধাকান্ত কুণ্ডুর শুঁড়িখানায় দেখা হবার পর তা হলে এ পর্যন্ত পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ টাকার মতো খরচ হয়ে গেছে।

খুচরো পয়সাগুলো থোক থোক বার করে সাজাতে সাজাতে বললাম, 'ঝামেলা হয়ে গেল যে—'

বোদা বলল, 'কী হল গুরু?'

'মোটে একশো পঁচিশ টাকা সাতচল্লিশটা পয়সা পড়ে রয়েছে। ক্যাশের ধান্দা করতে হবে দেখছি। এ টাকায় দু'জনের একদিনের বেশি তো চলবে না।'

'কী ধান্দা করতে চাও?'

'সেটাই ঠিক করতে হবে। ব্রেনটা ঠিক ওয়ার্ক করছে না।'

কিছুক্ষণ ইতস্তত করে বোদা বলল, 'গুরু তুমি যদি চটে না যাও, একটা কথা বলব?'

'কী?'

নর্থ ক্যালকাটার একটা সিনেমা হল এবং কালকের সেই মশলাওলা রগরগে হিন্দি ছবিটার নাম করে বোদা বলল, 'পিকচারটা সবে রিলিজ করেছে। টিকিট ব্ল্যাক করে কিছু

মালকড়ি নিয়ে আসব?'

মাথা নাড়লাম, 'না।'

'তবে বক্স কালেকশনের কৌটোটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ব?' বোদা দারুণ আগ্রহের চোখে আমার দিকে তাকাল।

আমি কিন্তু ভীষণ চটে উঠলাম, 'আগেই তোকে ওয়ার্নিং দিয়েছি, আমার সঙ্গে থাকতে হলে এসব ছ্যাঁচড়ামো ছাড়তে হবে। হোল ডে ঘুরে 'হেলথের বারটা বাজিয়ে তিন টাকা সাড়ে তিন টাকা হয়তো উঠবে। তারও গ্যারন্টি নেই। কোনো মানে হয়!'

বোদা চুপসে গেল। ভয়ে ভয়ে বলল, 'তা হলে?'

'তোকে কিছুই ভাবতে হবে না। দেখা যাক, মাথায় কোন প্ল্যান আসে কি না। এক কাজ কর, জল এনে দে। শেভটেভ সেরে ফলি।'

বোদা দৌড়ে জল নিয়ে এল।

দাড়িটাড়ি কামিয়ে বেশ সময় নিয়ে স্নানটা চুকিয়ে ফেললাম। ঘণ্টাখানেক বাদে বাথরুম থেকে বেরিয়ে বোদাকেও স্নান-ফান সেরে নিতে বললাম।

বোদার একটা মরচে-পড়া পুরনো শেভিং বক্স আছে। আমার কাছ থেকে নতুন ব্লেড চেয়ে নিয়ে সে দ্রুত দাড়িটা কামিয়ে ফেলল। তারপর স্নান চুকিয়ে আবার যেই চটকানো বাসি চিটচিটে প্যান্ট আর শার্টটা পরতে যাবে, আমি বলে উঠলাম, 'উঁহু, উঁহু—'

ততক্ষণে বোদা এক পায়ে ড্রেন পাইপের অর্ধেকটা গলিয়ে ফেলেছিল। থমকে গিয়ে বলল, 'কী হল?'

'আর মায়া কেন, এগুলোকে এবার রিটায়ার করিয়ে দাও। ঐ লক্কড় মালগুলোকেই যদি গায়ে ঝুলিয়ে রাখবে তা হলে কাল অত মাথা খাটিয়ে পার্ক স্ট্রিট থেকে দশটা ট্রাউজার্স দশটা শার্ট নিয়ে এলাম কেন?'

'ওর থেকে পরতে বলছ?'

'হ্যাঁ রে বাবা, হ্যাঁ।' আমি আস্তে মাথা নাড়লাম।

নতুন জামা-টামার প্যাকেটগুলো থেকে একটা টেরিকটের ট্রাউজার্স আর শার্ট বার করে মুগ্ধ চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল বোদা। তারপর গালে ঘষল, গন্ধ শুঁকল। এমন দামী পোশাক পরা তো দূরের কথা, তার চোদ্দ পুরুষে কেউ কোনোদিন ছুঁয়ে পর্যন্ত দেখে নি সে।

বললাম, 'কি রে, ওগুলো হাত করে একেবারে ফ্রিজ শট হয়ে গেলি যে?'

বোদা এবার ভয়ে ভয়ে খুব আলতো করে শার্ট আর ট্রাউজার্সটা পরে ফেলল। এ ঘরে লাইফ-সাইজ আয়না নেই। ঘাড়টা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিজেই নিজেকে কতবার করে যে দেখল সে! দেখা টেখা হয়ে গেলে একটা পারা-ওঠা হাত-আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়ে ফেলল। তারপর ঝট করে টিনের সুটকেশ থেকে সেই মরচে-পড়া অকেজো রিভলবারটা বার করে পকেটে পুরল। তারও পর পুরনো তাপ্পিমারা চপ্পল দুটো পায়ে গলিয়ে বলল, 'দাদা আমি রেডি—'

বোদাকে লক্ষ করছিলাম। আগেও দেখেছি বেরুবার সময় রিভলবারটা পকেটে ঢুকিয়ে নেয় বোদা। এ নিয়ে তাকে কিছু জিজ্ঞেস করি নি, এখনও করলাম না। শুধু তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঝট করে একবার দেখে নিয়ে বললাম, 'মেক-আপটা টেরিফিক হয়েছে রে বোদা, তোকে না একেবারে সিনেমার হিরো হিরো লাগছে।'

বোদার চোখ খুশিতে চক চক করছিল। দাঁত বার করে লাজুক একটু হাসল সে। আমি আবার বললাম, 'সবই ঠিক আছে। তবে—'

'তবে কী?' বোদা আমার চোখের দিকে তাকাল।

'একটুখানির জন্য পুরো হিরোটা হতে পারলি না। পায়ে ওই তাপ্পি-মারা চপ্পলটার বদলে যদি নতুন শ্যু থাকত, শালা তোর যা একখানা সেক্স অ্যাপিল হতো না—'

'কি যে বল গুরু—' ঘাড় গুঁজে ফ্যাক করে হাসল বোদা।

আমি বলতে লাগলাম, 'ঠিক আছে চল, যদি নতুন জুতো একজোড়া ম্যানেজ করতে পারি, তোকে পুরোপুরি হিরো বানিয়ে দেব।'

দারুণ উৎসাহের গলায় বোদা জিজ্ঞেস করল, 'জুতোর জন্যে মাথায় কোনো প্লান এসেছে নাকি?'

বললাম, 'এখনও আসে নি। এসেও তো যেতে পারে। আয়, বেবিয়ে পড়া যাক।'

বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমরা চিৎপুরে এসে পড়লাম। এখন সাড়ে এগারোটার মতো বাজে। ট্রাম-বাসে অফিস টাইমের সেই দমবন্ধ ঠাসাঠাসিটা অবশ্য নেই, তবে ভিড়টা আছেই। চিৎপুর লাইনের ট্রাম-বাসে সারা দিনই মানুষের নশ্বর শরীর গাদাগাদি করে থাকে। বোদাকে নিয়ে ঠেলেঠুলে একটা ট্রামে উঠে পড়লাম। কয়েক হাজার ঠেলাগাড়ি, রিকশা. ট্রাক, প্রাইভেট কার, ট্যাক্সি ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ইঁদুরের মতো বুকে হেঁটে হেঁটে আমাদের ট্রামটা এক সময় এসপ্ল্যানেড পৌঁছে গেল। শোভাবাজার থেকে এসপ্ল্যানেড আসতে ঘণ্টাখানেক সময় লাগল। দূরে একটা উঁচু বাড়ির টাওয়ারে দেখলাম কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে বারটা বেজেছে।

দারুণ খিদে পেয়েছিল। সকালবেলা এক ভাঁড় চা ছাড়া আর কিছু খাওয়া হয়নি। পাকস্থলীর কয়েক স্তর নিচে খিদেটা আগুনের মতো দপ দপ করছিল। বোদাকে বললাম, 'চল, আগে খেয়ে নেওয়া যাক—' ওকে নিয়ে কর্পোরেশন স্ট্রিটে— অধুনা যার নাম সুরেন ব্যানার্জি স্ট্রিট— একটা মাঝারি ধরনের হোটেলে চলে এলাম।

এখানে ড্রিংক-ট্রিংকও পাওয়া যায়। আমরা বসতেই একটা বয় সামনে এসে দাঁড়াল। তার দিকে না তাকিয়ে বোদাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'পরশু দিন রাত্রে আমরা লাস্ট বাংলা মাল খেয়েছিলাম, না রে?'

বোদা ঘাড় কাত করল, 'হ্যাঁ, গুরু। তারপর দেড়দিন পার হতে চলল, পেটে এক ফোঁটা সুধাও পড়ে নি। গলাটা একেবারে শুকিয়ে ঝামা হয়ে আছে।'

'বলছিস?'

'হ্যাঁ।'

'বীয়ার খাবি?'

'ইংরিজি মাল নাকি? আমি গুরু বাংলা ছাড়া কখনও কিছু চাখি নি। তুমি বললে ইংরিজি, আমেরিকান, জাপানি, নেপালি—সব খেতে পারি।'

দু' বোতল বীয়ার এবং মাংস-ভাতের অর্ডার দিলাম।

কিছুক্ষণ বাদে বীয়ারের বোতলটা যখন শেষ হয়ে এসেছে, নিজেকে একটু একটু টিপসি লাগছিল। মাথার ভেতর মেরি-গো-রাউণ্ডের মতো কিছু একটা ঘুরে যাচ্ছে যেন। আমার সমপরিমাণ বীয়ার পাকস্থলীতে চালান করে বোদাও কিঞ্চিৎ টলছিল। তার মুখ লাল হয়ে উঠেছে, কপালে-ঘাড়ে-গলায় দানা দানা ঘাম জমেছে।

এর মধ্যে ভাত-মাংস এসে গিয়েছিল। খেতে খেতে বললাম, 'বোদা বীয়ার পেটে পড়তে ব্রেনটা অল্প অল্প খুলে যাচ্ছে—'

বোদা লালচে আধবোজা চোখে জিজ্ঞেস করল, 'কি রকম?'

'তখন তোকে বলছিলাম না, ক্যাশের ধান্দা করতে হবে।'

'হ্যাঁ।'

'একটা প্ল্যান মাথায় এসে গেছে।'

বোদা ঝুঁকে দারুণ উৎসাহের গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কী ?'

উত্তর না দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, 'দাঁড়া, ঝট করে ফোন করে আসি।'

হোটেলের ক্যাশ-কাউন্টারে টেলিফোন ছিল। সেখান থেকে ক্যামাক স্ট্রিটের একটা অফিসে ফোন করে টেবিলে ফিরে আসতেই বোদা বলল, 'কাকে ফোন করলে?'

'তোকে না বলেছি আগে থেকে কিছু জানতে চাইবি না, শুধু দেখে যাবি—'

এঁটো হাতেই নিজের কান মুলে বোদা বলল, 'ভুল হয়েছে, এবারটা [illegible] করে দাও। এই লাস্ট—'

কোনো কথা না বলে আমি আবার খাওয়া শুরু করলাম। কিছুক্ষণ চুপচাপ খাওয়ার পর বাঁ হাতটা বোদার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, 'দ্যাখ তো ক'টা বাজে?'

বীয়ারের নেশাটা ক্রমশ জমে উঠেছে বোদার (এবং আমারও)। লালচে ঘোলাটে চোখে ঘড়িটা দেখতে দেখতে সে বলল, 'দেড়টা হতে পারে, দুটোও হতে পারে।'

'ঠিক আছে। কাঁটায় কাঁটায় তিনটে বাজলে আমাকে বলবি। আমাদের ক্যামাক স্ট্রিটে যেতে হবে। একজনের সঙ্গে অ্যাপয়েণ্টমেন্ট করে ফেলেছি।'

'আচ্ছা—'

ক'মিনিট বাদে, মনে নেই, বোদা হঠাৎ বলল, 'তোমার ঘড়িটা আবার দেখাও তো।'

বাঁ হাত এগিয়ে দিলাম। বোদা হাতটা চোখের কাছে তুলে ধরে অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করল। তারপর বলল, 'তিনটে বেজে গেছে—'

'ঠিক?'

'ইয়েস গুরু—'

'চল তা হলে—'

চটপট হোটেলের বিল চুকিয়ে দিয়ে দু'জনে বেরিয়ে পড়লাম। রাস্তায় নামতেই একটা ফাঁকা ট্যাক্সি পাওয়া গেল। হাত তুলে সেটা থামিয়ে উঠতে উঠতে ড্রাইভারকে বললাম, 'ক্যামাক স্ট্রিট—'

ট্যাক্সিওলা গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে নিউ মার্কেটের গা ঘেঁষে লিণ্ডসে স্ট্রিটে চলে এল, তারপর দু'মিনিটের মধ্যে ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে। আমার পাকস্থলীতে পুরো এক বোতল উৎকৃষ্ট বীয়ার রয়েছে। তলপেটে তার চাপ টের পাচ্ছি। নেশাটা মাথায় টুংটাং করে এক ধরনের কনসার্ট বাজিয়ে যাচ্ছে।

সিটের পেছন দিকে গা এলিয়ে বসে ছিলাম। বোদাও হাত-পা ছড়িয়ে দিয়েছে। হঠাৎ ডাকলাম, 'অ্যাই—'

বোদা চোখ তুলে তাকাল।

বললাম, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি জানিস?'

'ক্যামাক স্ট্রিট—'

'ক্যামাক স্ট্রিটে কী করতে যাচ্ছি?'

'তা জানি না। তুমি জিজ্ঞেস করতে বারণ করেছ।'

'কারেক্ট কারেক্ট—'

বোদার কাঁধের ওপর হাত দিয়ে বললাম, 'কিন্তু জানবার জন্যে শালা তোমার পেটের ভাত-ফাত তো হজম হচ্ছে না।'

বোদা ঘাড় কাত করে তৎক্ষণাৎ বলল, 'তা হচ্ছে না।'

বোদার গলায় কৌতূহলের বঁড়শি আর আটকে রাখলাম না। তার কানের ভিতর মুখ গুঁজে দিয়ে গোপন সামরিক তথ্য ফাঁস করে দেবার মতো চাপা গলায় ফিসফিসিয়ে উঠলাম, 'আমরা যাচ্ছি একটা ছোটখাটো অপারেশনে—'

'কী অপারেশন?'

'পেটি ক্যাশ অপারেশন, অল্প কিছু মালকড়ি এতে পাওয়া যাবে। আপাতত এটা ছাড়া আর কোনো প্ল্যান নেই।'

বোদা আর কিছু জানতে চাইল না।

ট্যাক্সিটা ততক্ষণে পার্ক স্ট্রিট পেরিয়ে ক্যামাক স্ট্রিটের আধাআধি চলে এসেছে। একটা প্রকাণ্ড বাইশ তলা স্কাইস্ক্রেপারের সামনে আসতেই চেঁচিয়ে উঠলাম, 'রুখো—রুখো—'

ট্যাক্সি থেমে গেল। ভাড়া মিটিয়ে বোদাকে নিয়ে বাড়িটার কাছাকাছি আসতেই ভয়ে ভয়ে সে বলল, 'এখানে কী?'

'অপারেশনটা তো এখানেই করতে হবে।'

এত বিশাল বাড়িতে আগে আর কখনো ঢোকে নি বোদা। লক্ষ করলাম সে গলগল করে ঘামতে শুরু করেছে। কিছুক্ষণ আগেও তার ঘাড়ে-গায়ে-কপালে দানা দানা ঘাম দেখেছি, সেটা ছিল অতিরিক্ত বীয়ারপানজনিত। কিন্তু এখনকার এই ঘামটার একমাত্র কারণ ভয়। বোদার ঘাড়ে আলতো করে দু-তিনটে চাপড় মেরে বললাম, 'বী ব্রেভ, এত

ভীতু হলে চলবে না।' তাকে প্রায় টানতে টানতে একটা লিফটের মধ্যে পুরে ফেললাম।

লিফটটা অটোমেটিক। আমরা ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। তারপর বোতাম টিপতেই হাউইয়ের মতো সাঁ সাঁ করে ওপরে উঠতে লাগল।

বোদা হতভম্বের মতো নেশাজড়ানো চোখে লিফট-বক্সটা দেখছিল। ভেতরে আমরা ছাড়া কেউ নেই। ওর কানে আস্তে টোকা দিয়ে বললাম, 'একটা কথা শুনে রাখ—'

বোদা আমার দিকে ফিরল। বললাম, 'যেখানে যাচ্ছি সেখানে গিয়ে আমি যা-যা করব, বলব, চুপচাপ শুনে যাবি আর দেখবি চীনেদের দেখেছিস?'

'হ্যাঁ।' বোদা গলার ভেতর থেকে সরু আওয়াজ বার করল।

'তাদের মুখ কিরকম?'

'পাথরের তৈরি।'

'কারেক্ট। মুখ দেখে মাকড়াদের পেটের কথা বোঝা যায়?'

'উঁহু—'

'ঠিক ওই রকম মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকবি।'

'আচ্ছা। কিন্তু—'

'কিন্তু কী?'

'কোনো গাড্ডা-ফাড্ডায় পড়ে যাব না তো গুরু?'

আমি হাসলাম। বোদার নাকটা আদরের ভঙ্গিতে টিপে দিয়ে বললাম, 'সাহস সঞ্চয় কর বৎস। আমাদের বেঁচে থাকাটা হচ্ছে একটা ট্যাকটিক্যাল ওয়ারের মতো। ভয় টয় পেয়ে ঘাবড়ে গেছ কি মরেছ। তোমাকে ছিঁড়ে ফেলবার মতো লোক চারদিকে ওত পেতে আছে, এই কথাটা শুধু দয়া করে মনে রেখো।'

বোদা কতটা কী বুঝল, সে-ই জানে। তার মুখটা প্রকাণ্ড হাঁ হয়ে ঠোঁট ঝুলে পড়ল। আর সেই ফাঁক দিয়ে তার আলজিভটা আমি দেখতে পেলাম।

সেভেনটিনথ ফ্লোরে এসে লিফট-বক্সটা থেমে গেল। দরজা খুলতেই আমরা বাইরে বেরিয়ে এলাম।

এ বাড়িতে আগে একবার মাত্র এসেছি। এখানে সবগুলো ফ্লোরেই নানারকম মার্চেন্ট অফিস, দু-চারটে গভর্নমেন্ট অফিসও রয়েছে। গ্রাউণ্ড এবং ফার্স্ট ফ্লোরে দু-তিনটে ব্যাঙ্ক এবং ফরেন এয়ার লাইনসের অফিসও চোখে পড়বে। যাই হোক, লিফটগুলো সেভেনটিনথ ফ্লোর পর্যন্তই ওঠে। তারপর যে তিনটে ফ্লোর রয়েছে সেগুলো সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হয়। আমাদের যেতে হবে এইটিনথ ফ্লোরে। অর্থাৎ গোটা তিরিশ সিঁড়ি এখন টপকাতে হবে।

যা করতে যাচ্ছি, মনে মনে তার একটা রিহার্সাল দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলাম। বোদা আমার গায়ের সঙ্গে আটকে থেকে ঝুলতে ঝুলতে চলল।

তিন মিনিট পর তিরিশটা সিঁড়ি টপকে আমরা এইটিনথ ফ্লোরে চলে এলাম। এতগুলো সিঁড়ি ভেঙে দম বন্ধ হয়ে আসছিল, পায়ের জোড় আলগা হয়ে যাচ্ছিল যেন। হে-হে

মহাশয়গণ, আমাকে দেখে যতই ছোকরা ছোকরা ভাবুন না, আসলে বয়েস হয়েছে তো। দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ হাঁপিয়ে নিলাম। বোদাও হাঁ করে ঘোড়ার মতো শ্বাস টেনে টেনে এক চোট হাঁপাল।

দু'জনের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এলে সামনের দিকে তাকালাম। দশ ফুট দূরে কাঁচের পাল্লা দেওয়া প্রকাণ্ড দরজা। তার পাশে দেওয়ালের গায়ে চকচকে তামার প্লেটে বড় বড় অক্ষরে এনগ্রেভ করা আছেঃ আনন্দ মিনি স্টিল কোম্পানি, জেনিথ কেমিক্যালস, সুপার্ব বল বেয়ারিং। একেবারে নিচে লেখা আছেঃ রেজিস্টার্ড অফিস। আমাকে ওখানেই যেতে হবে। আপনারা হয়তো ভাবতে পারেন পেটি ক্যাশ অপারেশনের জন্যে এতগুলো নাম-করা বড় কোম্পানির রেজিস্টর্ড অফিসে হানা দেবার মানে কী? মহাশয়গণ, কয়েক মিনিট ধৈর্য ধরে থাকুন।

জেনিথ কেমিক্যালস, আনন্দ মিনি স্টিল ইত্যাদির রেজিস্টার্ড অফিসে বছরখানেক আগে আর একবার মাত্র এসেছিলাম, সে কথা আপনাদের বলেছি। কেন এসেছিলাম, তা অবশ্য জানানো হয় নি। আমার বন্ধু, হ্যাঁ, বন্ধুই বলতে পারেন। যার কাছ থেকে কাজ গোছাতে পারি সে-ই আমার বন্ধু। যাক গে যা বলছিলাম, আমার বন্ধু, মাই গ্রেট ফ্রেণ্ড হেনরি গোবিন্দ বিশ্বাস জেনিথ কেমিক্যালসের অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে কী একটা চাকরি করে। ঠিক কী করে অতশত জানি না। দরকারই বা কী। আমার নিজের কাজ নিয়ে কথা। কার কী ডেজিগনেশন, অত খবর মাথায় পুরে বোঝাই করে রাখার মানে হয় না। আমার মাথাটা তো আর ন্যাশনাল আর্কাইভস, বাংলায় কি যেন বলে, হ্যাঁ জাতীয় মহাফেজখানা নয়। এক বছর আগে হেনরি গোবিন্দ বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম এবং আজও তারই কাছে এসেছি।

সেবার যে এসেছিলাম, অফিসের ভেতরে ঢুকি নি। এই মুহূর্তে বোদা আর আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, গোবিন্দর সঙ্গে এখানেই দেখা হয়ে গিয়েছিল। এখানেই তার সঙ্গে দরকারি কাজ চুকিয়ে চলে গিয়েছিলাম।

আজ ভেতরে ঢুকতেই হবে। ঘাড় ফিরিয়ে বোদাকে একবার দেখে নিলাম। সেই যে সে ঘামতে শুরু করেছিল, এখনও ঘেমেই যাচ্ছে। তার জামা-টামা ভিজে সপসপে হয়ে গেছে। শালা যে রকম ঘামছে, শরীরের সব সল্ট বেরিয়ে না যায়। দারুণ নার্ভাস হয়ে পড়েছে ছোকরা, চোয়াল ঝুলে গেছে, চোখ আড়াই ইঞ্চির মতো বসে গেছে, সে দুটো মরা মাছের চোখের মতো স্থির। আস্তে করে বললাম, 'অ্যাই—'

চিঁ-চিঁ সুরে বোদা সাড়া দিল, 'কী বলছ?'

'বী স্টেডি।'

গা ঝাড়া দিয়ে চাঙ্গা হবার চেষ্টা করল বোদা।

আমি আবার বললাম, 'চীনেদের মুখের কথা মনে আছে তো?'

দুর্বল গলায় বোদা বলল, 'আছে গুরু।'

'সব সময় ওটা মনে রাখবি। নাউ ফরওয়ার্ড মার্চ—লেফট, রাইট, লেফট, রাইট—'

একটু পরেই ঝকঝকে কাঁচের সুইং ডোর ঠেলে আমরা ভেতরে চলে এলাম। ঢুকেই বোঝা গেল, গোটা অফিসটা এয়ার কণ্ডিশানড, ঠাণ্ডায় প্রথমটা শীত ধরে গেল।

দরজা থেকে একটু ঢুকে বিরাট ফ্লোর জুড়ে অফিস। বাঁ-দিকে প্লাইউডের ছোট-বড় কামরায় অফিসারদের চেম্বার। চেম্বারগুলোর গায়ে নেমপ্লেটে অফিসারদের নাম এবং ডেজিগনেশন লেখা রয়েছে। মাঝখানে অগুনতি চেয়ার-টেবিল পাতা। প্রতিটি টেবিলে স্তূপাকার ফাইলপত্র নিয়ে কেরানিরা কাজে ডুবে আছে। মাথার উপর সারিবদ্ধ টিউব লাইট চমৎকার করে সাজানো।

কেরানিদের গোলকধাঁধায় ঢুকে হেনরি গোবিন্দ বিশ্বাসকে খোঁজ করতে যাব, হঠাৎ চোখে পড়ল ডান দিকের একটা বড় কম্পার্টমেন্টের ভেতর থেকে ভারি চেহারার মধ্যবয়সী এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। প্রায় ছ'ফুটের মতো হাইট তাঁর, চওড়া কপাল। চুল কাঁচায়-পাকায় দাবার ছক। সেগুলো নিখুঁতভাবে ব্যাকব্রাশ-করা, ছড়ানো কাঁধ, দৃঢ় চোয়াল, গায়ের রং টকটকে, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। পরনে দামী স্যুট, চকচকে জুতোয় বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। তাঁর সঙ্গে সাত-আটটা লোক-আর্দালি, বেয়ারা ইত্যাদি। সবাই তটস্থ হয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলেছে।

ভদ্রলোককে যখন হাতের কাছে পাওয়া গেছে, গোবিন্দর খোঁজে আবার কাকে গিয়ে ধরব! সোজা তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালাম। বললাম, 'দাদা, একটা কথা—'

জুতোয় মস মস শব্দ তুলে ভদ্রলোক বাঁ দিকে যাচ্ছিলেন, থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। ভুরু কুঁচকে গেল তাঁর, চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। বিরক্ত মোটা গলায় অত্যন্ত রূঢ়ভাবে জিজ্ঞেস করলেন, 'হু আর ইউ?'

ভদ্রলোকের সাঙ্গপাঙ্গরা আগেই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। লক্ষ করলাম, তাদের দম বন্ধ হয়ে গেছে। কী করবে, কী করা উচিত, তারা যেন ভাবতে পারছিল না। খুবই বিনীতভাবে বললাম, 'আমার নাম পিটার স্বয়ম্ভু হোড়—'

এমন কিম্ভুতকিমাকার উদ্ভট নাম আগে আর শোনেন নি ভদ্রলোক। আমি ইয়ার্কি-টিয়ার্কি দিচ্ছি কিনা, প্রথমটা বুঝতে চেষ্টা করলেন। পরক্ষণেই তাঁর চোয়াল আরো শক্ত হয়ে উঠল, চোখের দৃষ্টি নিষ্ঠুর। মুখের ভেতর জিভটাকে খানিকক্ষণ বোধ হয় চিবিয়ে নিলেন। তারপর প্রায় চেঁচিয়েই উঠলেন, 'হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট?'

বললাম, 'আমার এক বন্ধু এখানে কাজ করে। তিনটের সময় সে আসতে বলে ছিল। তাই এসেছি—'

গম্ভীর ভারি গলায় ভদ্রলোক বললেন, 'এখন তিনটে বাজে?'

'হ্যাঁ—' আমি ঘাড় হেলিয়ে দিলাম। তার পরেই শুধরে নিয়ে বললাম, 'পনের কুড়ি মিনিট বেশিও হতে পারে।' শোধরালাম, কেননা কর্পোরেশন স্ট্রিট থেকে কাঁটায় কাঁটায় তিনটের সময় আমরা ট্যাক্সিতে উঠেছিলাম। ক্যামাক স্ট্রিটের এই অফিসে আসতে নিশ্চয়ই কয়েক মিনিট লেগে গেছে।

বাঁ হাতের কবজি থেকে কোটের স্লিভটা সরিয়ে দিলেন ভদ্রলোক, সঙ্গে সঙ্গে ধূসর

ডায়ালের তারিখ-মাস-বার ইত্যাদি লাগানো একটা হেক্সাগোনাল অটোমেটিক ঘড়ি বেরিয়ে পড়ল। ঘড়িটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'লুক—'

দেখলাম দুটো বেজে দশ হয়েছে।

ভদ্রলোক এবার ধমকেই উঠলেন, 'ক'টা বেজেছে?'

হে-হে মহাশয়গণ, আপনারা তো জানেনই, আমার দু'কান কাটা, লজ্জাটজ্জা বলতে কিছু নেই। আমার নার্ভও দারুণ স্ট্রং। কোনো আবস্থায় কোনো কারণেই ঘাবড়াই না। অমায়িক হাসিটি হেসে ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে বললাম, 'খানিকক্ষণ আগে ঘড়িতে দেখলাম তিনটে, এখন দেখছি দুটো দশ। টাইমটা ব্যাক গিয়ারে চলছে নাকি দাদা?' বলতে বলতেই একটা কথা মনে পড়তে আমার চোখ চকমকিয়ে উঠল, 'বুঝেছি। স্টমাকে পাক্কা এক বোতল বীয়ার আছে কিনা, তাই দুটোকে তিনট দেখে ফেলেছিলাম। পুরো এক ঘণ্টা সময় এদিক ওদিক হয়ে গেছে।'

ভদ্রলোক উত্তর দিলেন না।

আমি ঘাড় ফিরিয়ে বোদাকে একবার দেখে নিলাম। আমার কথামতো বোদা মুখটাকে প্রাণপণে চীনেদের মতো করে রাখতে চেষ্টা করছে। অর্থাৎ অেনেই এক্সপ্রেসানলেস, শুদ্ধ বাংলায় যাকে ভাবলেশহীন বলে অবিকল তা-ই। মনে মনে বোদাকে তারিফ করলাম, তালিম দিলে ছোকরাকে দিয়ে অনেক বড় বড় কাজ করিয়ে নেওয়া যাবে। বললাম, 'আস্ত এক বোতল বীয়ার আর খাস না, আমিও খাব না। এত মাল পেটে স্টোর করলে এক ঘণ্টা করে সময় হাতের ফাঁক দিয়ে গলে যাবে।' বলেই সেই ভদ্রলোকের দিকে ফিরলাম। সোজাসুজি তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'কিন্তু হিসেব-করা টাইম, যাবে কোথায় বলুন? আমার ঘড়িতে এগিয়ে গিয়েছিল। আপনার ঘড়িতে পিছিয়ে এসে কারেক্ট করে দিয়েছে। আমি—'

ভদ্রলোকের মুখটা এখন দেখবার মতো। বিস্ফোরণের আগে আগ্নেয়গিরির অবস্থা কিরকম হয়, আমি দেখি নি। আন্দাজ করছি এ রকমটাই হয়ে থাকে। তাঁর চোখ এই মুহূর্তে ফেটে যাবে যেন। দাঁতে দাঁত চেপে চিৎকার করে উঠলেন, 'স্টপ ইট—'

একটুও না ঘাবড়ে, খুবই সহজভাবে বললাম, 'ঠিক আছে দাদা, ঠিক আছে। আপনাকে আর আটকে রাখব না। কাইন্ডলি যদি জেনিথ কেমিক্যালসের অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্ট থেকে হেনরি গোবিন্দ বিশ্বাসকে একটু ডেকে দেন, খুব উপকার হয়। আমি আবার এখানে কিছু চিনি টিনি না—'

দু'মিনিট ভদ্রলোক এবং তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা সিনেমার ফ্রিজ শটের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। এমন একটা অনুরোধ করতে পারি, শুনেও তাঁরা যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না। তারপরেই আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতটা ঘটে গেল। ভদ্রলোক কাঁধ ঝাঁকিয়ে দু'হাত ছুঁড়তে ছুঁড়তে খ্যাপার মতো চেঁচাতে লাগলেন, 'এই লোকটা—ইম্পসিবল, ননসেন্স—' বলতে বলতেই আমার পাশ দিয়ে ঝড়ের বেগে বাঁ দিকের একটা বিশাল কম্পার্টমেন্টের দরজা ঝড়াং করে খুলে ঢুকে পড়লেন। তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা প্রায় সবাই উর্ধ্বশ্বাসে তাঁর পেছন

পেছন ছুটল। শুধু একটা সিড়িঙ্গে চেহারার লোক দলটা থেকে বেরিয়ে সুড়ুৎ করে কেরানিদের গোলকধাঁধায় ঢুকে পড়ল।

গোটা ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারছি না। হেনরি গোবিন্দ বিশ্বাসকে ডেকে দিতে বলায় কোনো ঝামেলা হয়ে গেল নাকি? ভদ্রলোক হঠাৎ ও রকম খেপে গেলেন কেন?

ঘাড়ের কাছ থেকে বোদার চাপা ঘড়ঘড়ে গলা শোনা গেল, 'গুরু, কিচাইন হয়ে গেল যে—'

বললাম, 'তাই তো দেখছি। তবে ঘাবড়াস না, চীনেদের মতো মুখ করে স্টেডি হয়ে থাক।'

'আচ্ছা—' বলেই চুপ করে গেল বোদা।

এখন আমি কি করব? কেরানিদের কাছে গিয়ে গোবিন্দর খোঁজখবর নেব কিনা যখন ভাবছি সেই সময় সেই সিড়িঙ্গে লোকটার সঙ্গে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটতে ছুটতে গোবিন্দ এসে হাজির। বুঝলাম সিড়িঙ্গেটাই তাকে ধরে নিয়ে এসেছে। গোবিন্দর বুশ শার্টের বোতাম খোলা, চুল উষ্কখুষ্ক, চোখ লালচে। দেখে মনে হচ্ছে শালা এইমাত্র শ্মশান থেকে মড়া পুড়িয়ে এসেছে। প্রায় কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে সে বলল, 'শালা, আমার সর্বনাশ করেছিস, আই অ্যাম ফিনিশড—'

হকচকিয়ে গেলাম, 'কী হয়েছে? অমন করছিস কেন?'

নাকের ভেতর থেকে গোঙানির মতো একটা আওয়াজ বার করে গোবিন্দ বলতে লাগল, 'আমার বারটা বাজিয়ে এখন জিজ্ঞেস করছিস কী হয়েছে!'

'অমন করছিস কেন? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'আমাকে ডেকে দেবার জন্যে কাকে বলেছিলি?'

'কেন, এক ভদ্রলোক—বেশ হেফটি চেহারা, চোখে পুরু লেন্সের ভারি চশমা—'

এক ঝটকায় আমাকে থামিয়ে দিয়ে গোবিন্দ বলল, 'ডেসক্রিপশানের দরকার নেই। উনি কে জানিস?'

আস্তে মাথা নেড়ে বললাম, 'কী করে জানব! আজই তো ওঁকে প্রথম দেখলাম—'

'উনি আমাদের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিস্টার সমাজপতি।'

'ম্যানেজিং ডিরেক্টর!' বেশ তারিফের গলায় বলতে লাগলাম, 'ওই রকম ইমপর্টাণ্ট রেসপনসিবল পোস্টের পক্ষে ভদ্রলোকের চেহারাটা কিন্তু দারুণ ফিট করে গেছে।'

গোবিন্দ আমার কথা শুনতে পেল না, সমানে নাকের ভেতর গুঙিয়ে যেতে লাগল, 'আমার চাকরিটা এবার গেল। কারো ফোর ফাদারের সাধ্যি নেই এ চাকরি বাঁচায়—'

'চাকরি যাবে কেন?'

'যাবে না!'

'কেন যাবে, সেটাই তো জিজ্ঞেস করছি।'

গোবিন্দ দু'হাত তুলে লাফাতে লাফাতে বলল, 'ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে বলেছিস আমাকে ডেকে দিতে! আমি একটা পেটি অ্যাকাউণ্টস ক্লার্ক। এরপর আমার চাকরি

থাকবে?'

জিভ কেটে তাড়াতাড়ি বললাম, 'এ হে-হে-হে, এমন গড়বড়টা করে ফেললাম। স্লাইট ভুল হয়ে গেল দেখছি।'

গোবিন্দ চেঁচিয়ে মেচিয়ে এক কাণ্ডই বাধিয়ে দিল, 'স্লাইট ভুল! শালা আমার চাকরি নিয়ে টানাটানি হচ্ছে, অনশন করে মরতে হবে। আর একে বলছিস স্লাইট ভুল! জানিস আরো কী কেলেঙ্কারি হয়েছে?'

'কী?'

'এর আগে বারটা ওয়ার্নিং খেয়েছি অফিস থেকে। তুই এসে ফেয়ারওয়েলের ব্যবস্থা পাক্কা করে দিয়ে গেলি। এখন বল, কী জন্যে এসেছিস। তাড়াতাড়ি বলবি। আমাকে আবার ইউনিয়নের সেক্রেটারিকে গিয়ে ধরতে হবে—'

'কেন?'

'তাকে ধরে ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে একটু বাটার লাগাতে হবে, যদি রাগটা পড়ে। নে বল—'

আচমকা মুখটাকে বিয়োগান্ত নাটকের ট্রাজিক হীরোর মতো করুণ করে বললাম, 'আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে গোবিন্দ—'

গোবিন্দ চমকে উঠল, 'কী হয়েছে?'

'আগে কথা দে আমায় বাঁচাবি!'

'কী হয়েছে না জেনে—'

গলার স্বরটাকে কান্নায় অর্ধেক বুজিয়ে দিয়ে, চোখের কোণে কয়েক মিলিগ্রাম অশ্রু জমিয়ে ভাঙা ভাঙা গলায় বললাম, 'তোর বৌদি মৃত্যু শয্যায়—' হে-হে মহাশয়রা, আপনারা মোটামুটি জেনেই গেছেন আমি একজন উৎকৃষ্ট চিট। তঞ্চকতা, প্রতারণা, এ সব নিয়ে আমার পশার এবং প্রোফেসান দুটোই জমজমাট। কিন্তু আমি যে একজন টেরিফিক অ্যাক্টর, পাবলিক থিয়েটারে নামলে অনেক নট-সমুদ্র নট-এভারেস্ট নট-কাঞ্চনজঙঘার নাকে ঝামা ঘষে দিতে পারতাম, মহাশয়গণ এটা বোধ হয় আপনাদের জানা ছিল না। হাসতে হাসতে ঝট করে মুড পাল্টে গান্ধারীর মতো দশটা পুত্র শোকের কান্না আমি একসঙ্গে কেঁদে ফেলতে পারি। চোখে গঙ্গা-গোদাবরীর বান ডাকিয়ে দিতে আমার এক ফোঁটা গ্লিসারিনও লাগে না।

গোবিন্দর দুটো হাত ধরে করুণ রসে গলা ডুবিয়ে বললাম, 'তুই না বাঁচালে তোর বৌদি মরে যাবে।'

গোবিন্দর লাফালাফি চিৎকার থেমে গিয়েছিল। হতভম্বের মতো আমাকে দেখতে দেখতে সে বলল, 'বৌদি কে?'

'কে আবার? আমার বউ। আমার বউ তোর বৌদি হয় না?'

'তুই বিয়ে করেছিস!'

'না করলে কি আর ফোকটে বউ পাওয়া যায়।'

'কবে বিয়েটা করলি?'

'বছর দেড়েক আগে।'

'কই, আমি তো জানি না।'

'আর বলিস না ভাই, আমার বিয়েটা একটা অ্যাকসিডেণ্ট। কিছু বুঝবার আগে ওটা হয়ে গেল। বিয়ের সত্তর ঘণ্টা আগেও জানতাম না বিয়ে করতে যাচ্ছি। এখন বল, তোদের কি করে খবর দিই।'

একটু চুপ করে থেকে গোবিন্দ বলল, 'ও। তা তোর বউর কী হয়েছে?'

এক সেকেণ্ডের মধ্যে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দিলাম। ভাঙা ভাঙা জড়ানো গলায় বললাম, 'পরশু সিজারিয়ান অপারেশন হয়েছে। অপারেশনটা খুব ভাল হয় নি। বেবি ইজ ডেড, বউটাও এখন যায় যায়, ব্লাড দেওয়া হচ্ছে, আরো দিতে হবে। অথচ আমার হাতে একটা পয়সাও নেই। তুই দয়া না করলে আমার বউটা মরে যাবে—'

চিন্তাগ্রস্তের মতো গোবিন্দ বলল, 'তাই তো, এখন এই মাসের শেষে তুই তো ভারি বিপদে ফেলে দিলি—'

'যে করেই হোক একটা ব্যবস্থা কর। আমি হোল লাইফ তোর জুতোর ফিতে বেঁধে দেব।'

চোখ দুটো অর্ধেক বুজে ঠোঁট কামড়ে কি ভাবতে লাগল গোবিন্দ। বুঝতে পারছি যেটুকু ডোজ প্রয়োগ করা হয়েছে তাতে কাজ হবে। একটু পরে সে বলল, 'কত টাকা দরকার?'

'দেড় শো হলে ভাল হয়।'

'একটু দাঁড়া, আমার একটা পুরানো বিল পাওনা আছে। দেখি যদি পেয়ে যাই—'

গোবিন্দ চলে গেল। দশ মিনিট বাদে যখন সে আবার ফিরে এল তার হাতে একগোছা দশ টাকার নোট। আমার দিকে সেগুলো বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'এই নে। দেড়শোই আছে।'

টাকাটা পকেটে পুরে কৃতজ্ঞতায় গলা ভিজিয়ে বললাম, 'তোকে শুকনো ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করব না। শুধু জেনে রাখ, একটা প্রাণ তুই বাঁচালি। তোর টাকাটা যত তাড়াতাড়ি পারি দিয়ে যাব।'

'ঠিক আছে ঠিক আছে, তুই এখন যা। আমি ম্যানেজিং ডিরেকটরকে বাটার লাগিয়ে চাকরিটা বাঁচাবার চেষ্টা করি গিয়ে।' যেতে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল গোবিন্দ। বলল, 'আরে এতদিন পর দেখা, তোর খবরই তো নেওয়া হয় নি। এখন আছিস কোথায়?'

'টালিগঞ্জের রেলব্রিজের কাছে।'

'কী করছিস আজকাল?'

কোনো অবস্থাতেই কোনো প্রশ্নের উত্তর আমাকে ভাবতে হয় না। পৃথিবীর যাবতীয় প্রশ্নের যাবতীয় উত্তর আমার জিভের ডগায় সাজানো রয়েছে। জিজ্ঞেস করলেই ইনস্ট্যান্ট কফির মতো নগদ নগদ পাওয়া যাবে। বললাম, 'ছোটখাটো একটা সাপ্লাইয়ের কাজ করছি। তবে বুঝিসই তো, এ লাইনে অনেক টাকা আটকে থাকে, হাজার বার হেঁটে একটা বিল

হতো ক্লিয়ার করতে পারি।'

গোবিন্দর হঠাৎ কি মনে পড়তে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'তোর বউ কোন হসপিটালে আছে?'

'পি-জিতে—'

'একদিন পাঁচটার সময় আসিস। অফিস থেকে বেরিয়ে তোর বউকে দেখে আসব। আজ তো আর হল না, সেদিন কোথাও বসে একটু গল্প-টল্প করা যাবে। আচ্ছা চলি ভাই।' গোবিন্দ প্রায় ছুটতে ছুটতেই অফিসের ভেতরে চলে গেল।

আর আমি পিটার স্বয়ম্ভু হোড় এবার ঘাড় ফিরিয়ে বোদার দিকে তাকালাম। বোদা দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে ছিল। মুখটা অবশ্য চীনেদের মতো ভাবলেশহীন করেই রেখেছে। চোখাচোখি হতেই সে জোরে বার কয়েক শ্বাস টানল। আমি বললাম, 'অপারেশন সাকসেসফুল, চল এবার ফেরা যাক।'

গোবিন্দর অফিস থেকে বেরিয়ে আবার তিরিশটা সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে নিচে নামতে লাগলাম। সেভেনটিনথ ফ্লোরে গিয়ে লিফট ধরতে হবে।

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বোদা বলল, 'ওই লোকটা কে?'

বুঝলাম গোবিন্দ সম্বন্ধে জানতে চাইছে বোদা। ছেলেবেলায় গোবিন্দ আর আমি গাদা গাদা ছেলের সঙ্গে কার্সিয়াঙের মিশনে থাকতাম। এ কথাটা আর বোদাকে জানালাম না। শুধু বললাম, 'ও আমার ফ্রেণ্ড।'

আরো পাঁচটা সিঁড়ি নেমে বোদা আবার বলল, 'গুরু তোমার জবাব নেই।'

গম্ভীর চালে আমি একটু হাসলাম, উত্তর দিলাম না।

বোদা বলতে লাগল, 'তোমার তো কেউ নেই। এর মধ্যে হাওয়া থেকে একটা বউ জুটিয়ে ফেললে দাদা। যাঃ বাবা!'

বাঁ চোখের ভুরুটা পাঁচ সেন্টিমিটার ওপরে তুলে বললাম, 'একটা বউ কি রে, দরকার হলে আমি মোগল হারেম বসিয়ে দিতে পারি।'

লিফট বক্সের কাছে এসে ভেতরে ঢুকতে যাব, হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল। বললাম, 'বোদা, আমাদের আবার তিরিশখানা সিঁড়ি টপকে গোবিন্দর অফিসে যেতে হবে।'

বোদা অবাক, 'কেন গুরু? ব্রেনে আবার কোনো প্ল্যান এসেছে নাকি?'

'না।'

'তবে?'

'গোবিন্দ আমাদের এত উপকার করল। আমাদের তার রিটার্ন দেওয়া দরকার। আমরা তো আর অকৃতজ্ঞ পশু নই। হে-হে জেণ্টলম্যান, না কি বলিস?'

বোদা তৎক্ষণাৎ আমার সঙ্গে একমত হয়ে ঘাড় হেলিয়ে দিল, 'এক শো বার!' তারপরেই সন্দিগ্ধভাবে বলল, 'কিন্তু গোবিন্দবাবুর কী উপকার করবে?'

বোদাকে নিয়ে ফের ওপরে উঠতে উঠতে বললাম, 'ম্যানেজিং ডিরেক্টর গোবিন্দর ওপর টেরিফিক খচে আছে, দেখলি তো?'

'হ্যাঁ।'

'আগেই গোবিন্দ বারটা ওয়ার্নিং খেয়েছ, শুনেছিস নিশ্চয়ই। ভাবছি ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সঙ্গে দেখা করব।'

বোদা আর কোনো প্রশ্ন করল না।

গোবিন্দর অফিসে ঢুকে ম্যানেজিং ডিরেক্টরেব চেম্বারটার খোঁজ করতে যাব, হঠাৎ আরে কি আশ্চর্য, স্বয়ং তাঁকেই চোখের সামনে দেখতে পেলাম। কিছুক্ষণ আগের মতোই মিস্টার সমাজপতি সামনে-পেছনে পুরো এক ব্রিগেড লোকলস্কর নিয়ে তাঁর চেম্বার থেকে বাঁ দিকে যাচ্ছিলেন। দৃশ্যটা শোভাযাত্রা করে কোনো দেশের রাষ্ট্রপতির পার্লামেন্টে যাবার সঙ্গে তুলনীয়। ম্যানেজিং ডিরেক্টরের বিশাল বাহিনীর মধ্যে দ্রুত এক পলক সেই সিড়িঙ্গে চেহারার লোকটাকেও বোধহয় দেখে ফেললাম।

আমাকে দেখে মিস্টার সমাজপতি থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। প্রথমে তাঁর কোঁকড়া কোঁকড়া লোমে-ভরা মোটা ভুরুদুটো সোজা হয়ে গেল, পরক্ষণেই সেকেণ্ড ব্র্যাকেটের আকার ধারণ করল। চোখদুটো হেড লাইটের মতো স্থির হয়ে জ্বলতে লাগল।

আমি পিটার স্বয়ম্ভু হোড়, ডান কান থেকে বাঁ কান পর্যন্ত মুখমণ্ডলের বিশাল ভূভাগ হাসিতে আলো করে বললাম, 'আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। নইলে আপনার চেম্বারে ঢুকবার জন্যে বেয়ারাদের মবিল লাগাতে হত।'

টের পেলাম ভদ্রলোক মুখের ভেতর জিভটাকে চিবিয়ে যাচ্ছেন। রাগ বা উত্তেজনার সময় খুব সম্ভব এই কাজটি তিনি করে থাকেন। চিবুতে চিবুতে বললেন, 'কী ব্যাপার, যখনই বেরুচ্ছি, এই লোকটার সঙ্গে দেখা হয়ে যাচ্ছে!'

চোখ-কান বুজে অমায়িক হেসে বললাম, 'রাগ করবেন না স্যার, আপনার কাছে একটু দরকার আছে।'

'কী দরকার?

'তখন বুঝতে পারি নি, আপনিই এতগুলো কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর মানে টপ বস। না চেনার জন্যে টেরিফিক অন্যায় হয়ে গেছে—'

মিস্টার সমাজপতি উত্তর দিলেন না, জিভটা চিবিয়েই যেতে লাগলেন।

আচমকা হাত দুটো জোড়া করে ঘাড় নুইয়ে কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললাম, 'গোবিন্দ আমার বন্ধু, আপনাকে বলেছিলাম তাকে ডেকে দিতে। বীয়ার খেয়ে মুড়ি মিছরি চিনতে পারি নি। দয়া করে গোবিন্দর চাকরিটা খাবেন না।'

দু'হাত মাথার ওপর তুলে জোরে জোরে ঝাঁকালেন মিস্টার সমাজপতি। গলার ভেতর চাপা একটা গর্জন ছেড়ে বললেন, 'ইনকরিজিবল, এই লোকটা আমাকে পাগল করে দেবে দেখছি।' বলেই ফ্লোর কাঁপিয়ে মস মস করতে করতে সামনের দিকে চলে গেলেন।

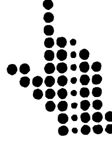
মুহূর্তে জায়গাটা ফাঁকা। সেই সিড়িঙ্গে চেহারার লোকটা আমাদের অজান্তে কখন যেন অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। একটু বাদে গোবিন্দকে সঙ্গে করে ফিরে এল। গোবিন্দ প্রায় চুল ছিঁড়ছিল। চেঁচাতে চেঁচাতে বলল, 'তোর জন্যে এবার আমাকে আঠার তলা থেকে ঝাঁপ

দিতে হবে। চাকরিটা আর বাঁচানো গেল না।'

আমি বললাম, 'আহা, তোর উপকারের জন্যে তোদের বসকে ধরেছিলাম। মানে—'

'আর উপকারের দরকার নেই, এখন চল—' আমাকে আর বোদাকে ঠেলতে ঠেলতে সেভেনটিনথ ফ্লোরে নামিয়ে লিফট বক্সে পুরতে পুরতে বলল, 'শালারা আবার যাতে উঠে ঝামেলা পাকাতে না পারে তার জন্যে আমি এই লিফটের মুখ একঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকব।'

হুড়হুড় করে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে নিচে নেমে এলাম। এই মুহূর্তে কি জানি, আজই খানিকটা পর আবার মিস্টার সমাজপতি্র সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে!



ক্যামাক স্টিটে নেমে বোদাকে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চীনেপাড়ায় চলে এলাম। নগদ আটাশটি টাকা গুনে দিয়ে বোদার জন্যে একজোড়া ঝকঝকে গ্রীসিয়ান শু্য কিনে বললাম, 'পরে ফেল।'

বলামাত্র নতুন জুতো পরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল বোদা। আমি বললাম, 'এবার পাক্কা হীরো বনে গেলি।'

বোদা উত্তর দিল না। শালার চোখ খুশিতে চকচকিয়ে উঠল। তার এ-কান থেকে ও-কান পর্যন্ত একটা গ্যাদগেদে হাসি ঢেউয়ের মতো খেলতে লাগল।

আমি আবার বললাম, 'এবার বেরুনো যাক। চল—'

নতুন জুতোর বাক্সে তালিমারা পুরনো রংচটা লঝ্‌ঝড় চপ্পল দুটো পুরতে যাচ্ছিল বোদা। আমি প্রায় চেঁচামেচি জুড়ে দিলাম, 'উঁহু—উঁহু—'

বোদা হকচকিয়ে গেল। থতিয়ে যাওয়া মুখে বলল, 'কী হল?'

'ও দুটোকে এবার ফেয়ারওয়েল দিয়ে দাও।'

'কিন্তু—'

'নো 'কিন্তু' বিজনেস। নতুন যখন হাতে পেয়েছ তখন পুরনোর জন্যে আর মায়া নয়। ডোন্ট লুক ব্যাক—' বলেই চপ্পল দুটো বোদার হাত থেকে নিয়ে বাইরে ছুঁড়ে দিলাম। তারপর বোদাকে নিজের গায়ে ওভারকোটের মতো সেঁটে নিয়ে রাস্তায় নেমে চৈত্রের দুপুরে উল্টোপাল্টা দমকা হাওয়ায় বেওয়ারিশ পাতার মতো এলোমেলো লক্ষ্যহীন উড়তে উড়তে সন্ধের সময় দু'জনে কখন যেন পার্ক স্ট্রিটে হাজির হয়ে গেলাম।

এখন এখানে, এই পার্ক স্টিটে, দু'ধারের ফুটপাথে মার্কারি আলোগুলো জ্বলে উঠেছে। নানা রেস্তোরাঁ আর এয়ারকণ্ডিশানড 'বার'গুলোর মাথার নিওন সাইন থেকে অজস্র রঙিন আলো ফিনকি দিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে। বড় বড় ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের শো-উইন্ডোতে নানা আকারের মডেল সাজানো রয়েছে। চকচকে মসৃণ রাস্তা দিয়ে গাড়ির ঢল বয়ে যাচ্ছিল।

ঘাড়ের পাশ থেকে বোদা হঠাৎ ডেকে উঠল, 'গুরু—'

তার দিকে না তাকিয়েই সাড়া দিলাম, 'কী বলছিস?'

'আমার অনেক দিনের একটা ইচ্ছে আছে।'

'কী ইচ্ছে?'

একটু চুপ করে থেকে বোদা বলল, 'জন্মাবার পর থেকে শুধু বেঙ্গলই খেয়ে যাচ্ছি। তবে একটু আগে তুমি বীয়ার খাইয়েছ। সে যাক, রোজ বাংলা খাই আর ভাবি কবে সাহেবপাড়ায় শুঁড়িখানায় ঢুকে চুক চুক করে বিলিতি মাল খাব—'

এবার বোদার দিকে তাকাতেই হল। বললাম, 'এই ইচ্ছে?'

'হুঁ—'

'ইচ্ছে যখন, সাহেবপাড়ায় এসে একটা 'বার'-এ ঢুকে পড়লেই পারতিস।'

'সাহস হয় নি গুরু।'

'ঠিক আছে। চল, আজ তোর সাধটা মিটিয়ে দিচ্ছি। নইলে মরবার সময় 'আমার সাধ না পুরিল, আশা না মিটিল' গানটা গেয়ে বুক চাপড়াবি, সেটা ঠিক হবে না।'

বোদাকে নিয়ে একটা এয়ারকণ্ডিশানড বার-কাম-রেস্তোরাঁয় ঢুকে পড়লাম। স্বপ্নময় নীলাভ আলোয় থোকা থোকা সুসজ্জিত পুরুষ এবং তাদের সঙ্গিনীরা বসে আছে। সবার সামনেই ড্রিঙ্কের গেলাস। সামনের দিকে চমৎকার করে সাজানো একটা ডায়াসে 'বার'-সিঙ্গার অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মেয়েটা চটকদার সুরে ইংরেজি গান গাইছিল। মেয়েটার গলা ঈষৎ দানাওলা, খ্যাসখেসে, সাদা কথায় যাকে সেক্সি বলে, তাই। তবে গানের চাইতে তার শরীর আরো আকর্ষক, চুম্বকের মতো সবার দৃষ্টি সে টানছিল। কমলার কোয়ার মতো ভারি রসালো ঠোঁট তার, চটুল চোখ, সরু কোমর, তার তলায় সুবিশাল অববাহিকা। গায়ে জামা কাপড় বিশেষ নেই মেয়েটার। বুকের জোড়া পাহাড়ে এক ফালি ব্রা, আর সুগভীর নাভির তলায় সরু বিকিনি। এই শীততাপ-নিয়ন্ত্রত 'বার'-এ সে যথেষ্ট উত্তাপ ছড়াচ্ছিল। নানা টেবিলের ফাঁক দিয়ে ট্রে হাতে 'বার'-বয়রা ব্যস্ত অথচ নিঃশব্দ পায়ে ছোটাছুটি করছিল। স্টুয়ার্ডরা এ-টেবিল সে-টেবিল ঘুরে তদারক করছিল। 'বার'-এর অন্য প্রান্তে ক্যাশ কাউন্টার।

এই ইন্দ্রসভায় ঢুকে প্রথমটা হকচকিয়ে গেল বোদা। কিছুক্ষণ বাদে বলল, 'গুরু, আমাকে একটা চিমটি কাটো তো।'

অবাক হয়ে বললাম, 'কেন রে?'

'স্বপ্ন ফপ্ন দেখছি কিনা, বুঝে নিই।'

আমি হাসলাম।

এবার বোদার চোখ গিয়ে পড়ল 'বার'-সিঙ্গার মেয়েটার ওপর। দৃষ্টিটা কয়েক পলক স্থির হয়ে রইল তার। তারপরেই চোখ দুটো বুজে বলল, 'উরি ব্বাস, এযে ফোর ফরটি ভোল্ট, কি স্পার্ক মারছে গুরু!'

হাসতে হাসতে তার হাত ধরে কোথাও ফাঁকা টেবিল পাওয়া যায় কিনা, ডিঙি মেরে

মেরে যখন দেখতে চেষ্টা করছি, আচমকা ডানদিকের সুদৃশ্য পিলারটার পাশের টেবিলে একটা চেনা মুখ আবিষ্কার করে ফেললাম। তাঁকে দেখিয়ে বোদার কানের ভেতর মুখ গুঁজে দিয়ে বললাম, 'চিনতে পারছিস?'

বোদা তক্ষুনি ঘাড় কাত করে দিল, 'পারছি গুরু। তোমার বন্ধু পিটার গোবিন্দ বিশ্বাসের বস্‌। কী যেন নাম—হ্যাঁ, সমাজপতি।'

'চল, মিস্টার সমাজপতির টেবিলে গিয়ে বসি।'

বোদা ঘাবড়ে গেল, 'না মাইরি, না।'

'কেন রে?'

'তখন তুমি ভদ্দরলোককে তার অফিসে গিয়ে চুলকে এসেছ। এবার দেখলে চটে ফায়ার হয়ে যাবে।'

'কিচ্ছু হবে না। ভাবছি আরেক বার চুলকে দেব।'

সন্দিগ্ধ চোখে আমাকে দেখতে দেখতে বোদা বলল, 'শেষে একটা কিচাইন বাধিয়ে বসবে না তো?'

বোদাতে টানতে টানতে বললাম, 'তুই আয় না, কিচ্ছু ভয় নেই।'

কাছাকাছি এসে দেখলাম, মিস্টার সমাজপতির চোখ এই সন্ধে সাতটার মধ্যেই পাকা করমচার মতো লাল হয়ে উঠেছে। আঁচ করতে পারছি তাঁর পাকস্থলীতে চার পাঁচ পেগ হুইস্কি অবশ্যই ঢুকে গেছে। তাঁকে বেশ টিপসি দেখাচ্ছিল। চোখের পাতা ভারি হয়ে ক্রমশ নিচের দিকে ঝুলে পড়ছে, অতি কষ্টে সে দুটো তিনি খুলে রাখতে চেষ্টা করছেন।

আমাদের দেখে আস্তে আস্তে মুখ তুললেন মিস্টার সমাজপতি। মোটা গলায় জানতে চাইলেন, 'হোয়াট ডু য়ু ওয়ান্ট?'

আমি বললাম, 'স্যার, আধ ঘন্টার জন্যে আমাকে আপনার চামচা করে নেবেন?' বলেই সঙ্গে সঙ্গে টের পেলাম বোদা ধাঁ করে আমার পেছনে গিয়ে একেবারে পিঠের সঙ্গে সেঁটে গেল।

মিস্টার সমাজপতি এবার নড়ে চড়ে বসলেন। কপালের চামড়ায় ভাঁজ পড়ল তাঁর। বললেন, 'চামচা কী?'

'এই তো স্যার ঝামেলায় ফেলে দিলেন। চামচা হল একটা ইনডিসপেনসেবল ব্যাপার। স্বয়ং ভগবান থেকে শুরু করে যত গ্রেট ম্যান আর বিগ ম্যান, সবার চামচা আছে। মানুষ বড় হয়েছে, লাইফে ট্রিমেণ্ডাস সাকসেস করেছে, অথচ চামচা নেই, এ হতেই পারে না।'

হাতের ভেতর ড্রিঙ্কের গেলাসটা ঘোরাতে ঘোরাতে মিস্টার সমাজপতি কি ভাবলেন, তারপর অন্যমনস্কর মতো বললেন, 'ইউ মিন ফ্ল্যাটারার—'

'ঠিক স্যার, অনেকটাই ধরে ফেলেছেন। তবে চামচার একজ্যাক্ট কোনো সিনোনিম নেই। স্বয়ং মা সরস্বতী নিজের হাতে অক্ষর বসিয়ে বসিয়ে শব্দটা বানিয়ে পৃথিবীতে ছেড়ে দিয়েছেন।'

'অ্যামিউজিং—'

আমি এবার বললাম, 'দূর থেকে দেখলাম আপনি এখানে একা-একা বসে আছেন। এত বড় কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর আপনি, অথচ ধারে কাছে একটা চামচাও নেই। দেখে আমার এত খারাপ লাগছিল যে নিজেই চলে এলাম।'

আমার কথায় মিস্টার সমাজপতির নেশাটা পাতলা হয়ে আসছিল বোধ হয়। বললেন, 'ডু য়ু নো মি?'

'হ্যাঁ স্যার, আপনিও আমাকে চেনেন।' বলেই 'দেখ তো আমায় চিনিতে পার কিনা' গোছের একটা ভঙ্গি করে সমাজপতির দিকে মুখটা বাড়িয়ে দিলাম।

চোখের তারা স্থির করে কয়েক পলক আমাকে দেখলেন সমাজপতি। তারপর মুখের ভেতর জিভটা চিবুতে চিবুতে বললেন, 'ইয়েস, য়ু সীম টু বী আ নোন ফেস। কোথায় যেন দেখেছি—'

'আপনারই অফিসে, ঘন্টা চারেক আগে। মনে পড়ছে স্যার?'

কয়েক পেগ হুইস্কি পাকস্থলীতে প্রবেশ করে সমাজপতির মেজাজটাকে তরল করে দিয়েছিল হতো। আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে হালকা গলায় বললেন, 'ইয়েস। সিট ডাউন।'

আমি বসে পড়ার আগেই পিঠের খাঁজ থেকে বোদা বেরিয়ে এল। ঘাড় গুঁজে হাত কচলাতে কচলাতে সমাজপতিকে বলল, 'স্যার, আমাকেও আধ ঘন্টাব জন্যে আপনাব চামচার চামচা করে নিন।'

বিগ ড্রামের শব্দের মতো ভারি গম্ভীর গলায় সমাজপতি বললেন, 'হু আর য়ু?'

বোদা ভয় পেয়ে পা পিছলে পড়ে যাচ্ছিল প্রায়। তার হয়ে উত্তরটা আমিই দিয়ে দিলাম, 'ওকেও আমার সঙ্গে আপনার অফিসে দেখেছেন স্যার। ও আমাব পার্টনার, দু'জনে মিলে আমরা যুগলবন্দি।'

সমাজপতি বললেন, 'অ। সিট ডাউন।'

বোদা আর আমি সমাজপতির মুখোমুখি বসলাম।

সমাজপতি বললেন, 'হুইস্কি চলে?'

মুখের ওপর দারুণ একটা হাসি আটকে রেখে বললাম, 'চলে বৈকি স্যার, নিশ্চয়ই চলে। ওটা মাইনাস করলে দেখবেন চামচার রাজ্য সিম্পলি মরুভূমি হয়ে গেছে। হুইস্কি-রাম-জিন পেসাদ পায় বলেই না চামচাদের প্রফেসান এমন জমজমাট।'

সমাজপতি বেশ আমোদ অনুভব করলেন। বললেন, 'ফানি।' একটা ওয়েটারকে ডেকে আমাদের জন্যে হুইস্কির অর্ডার দিলেন। তাঁর গ্লাসও ফাঁকা হয়ে এসেছিল। নিজের জন্যেও আরেক পেগ আনতে বললেন। তারপরেই সরাসরি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে শুরু করলেন, 'য়ু সীম টু বী আ ভেরি ইন্টারেষ্টিং ফেলো।'

আমি হেসে হেসে বিগলিত হতে হতে বললাম, 'চামচারা স্যার ইন্টারেষ্টিং হয়েই থাকে। নইলে—'

'নইলে কী?'

'অন্যের পকেট ফাঁক করে কি কেউ মাল খেতে পারে!''

সমাজপতি হাসতে লাগলেন। তাঁর মেজাজটা কয়েক পেগ হুইস্কির দৌলতে এখন বেশ মুচমুচে হয়ে আছে। বললেন, 'তুমি তো ভাল কথা বলতে পার, এ নাইস টেবল টকার।'

দাঁত বার করে হাসলাম, 'ওটাই তো আমার ক্যাপিটাল স্যার।' মনে মনে বললাম, 'আমার যে আরো কত ক্যাপিটাল আছে, শালা তা তো জানো না।'

'তোমার নামটা কিন্তু এখনও জানা হয় নি।'

'আমার নাম পিটার স্বয়ম্ভু হোড়।'

হাতের গেলাসে হুইস্কির যে তলানিটুকু পড়ে ছিল সেটা গলায় ঢেলে কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে রইলেন সমাজপতি। তারপর বললেন, 'ছদ্মনাম নাকি? সিডো নেম?'

বললাম, 'না স্যার, এক্কেবারে আসল নাম—তবে পিতৃদত্ত নয়, নিজেই ওটা দিয়ে নিয়েছি।'

সমাজপতি কি বুঝলেন, তিনিই জানেন। এ নিয়ে আর কিছু বললেন না। শুধু জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার বয়স কত?'

'ফরটি-ফোর ফরটি ফাইভ!'

'বাট ইউ লুক হার্ডলি থার্টি।'

হেসে হেসে বললাম, 'আমার চেহারাটাই স্যার ডিসেপটিভ। বাইরেটা দেখে বুঝবার উপায় নেই, কিন্তু তলায় তলায় বয়েসটা ম্যারাথন দৌড় প্রায় শেষ করে এনেছে। আর ক'দিনই বা বাঁচব!'

সমাজপতি বললেন, 'ভেতরে যে বয়েসই হোক, চেহারা দেখে যা মনে হয় সেটাই রিয়াল এজ।'

'ওটা তো মেয়েদের সম্বন্ধে বলা হয়।'

'ছেলেদের সম্বন্ধে বললে তোমার আপত্তি আছে?'

বোঝা যাচ্ছে হুইস্কির ঘোরে লোকটা একটা নিরীহ চেহারার অথচ বিপজ্জনক গর্তে পা ঢুকিয়ে দিয়েছে। আমার চেহারা দেখে অনেকেই এ রকমই ভুলচুক করে ফেলে। আমার বাবা-মা'কে কখনো দেখিনি। তারা কে, জানি না। তবে সুন্দর অ্যাট্রাকটিভ একখানা চেহারা দিয়ে তারা আমাকে পৃথিবীতে ছুঁড়ে দিয়েছে, অন্তত এটুকুর জন্যই আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। ভাবি এমন একটা লোভনীয় চেহারা যদি আমার না থাকত? বললাম, 'না স্যার, একটুও না। আপনার কমপ্লিমেন্ট পাওয়া যে কত বড় ভাগ্যের ব্যাপার—অ্যাই অ্যাম গ্রেটফুল, রিয়ালি গ্রেটফুল—'

আমাকে থামিয়ে দিয়ে সমাজপতি বললেন, 'কী কর তুমি?'

'এই স্যার নানারকম প্ল্যানিং—'

'তুমি গভর্নমেন্টের প্ল্যানিং কমিশনে আছ নাকি?'

'না স্যার।'

'তবে?' সমাজপতিকে বেশ কৌতূহলী দেখাল।

নিজের মাথাটা দেখিয়ে দিয়ে বললাম, 'আমার মাথাতেই আস্ত প্ল্যানিং কমিশন আছে।

সেখানে সব সময় নানা রকম পরিকল্পনা খেলে যায়।'

সমাপতি কি বলতে যাচ্ছিলেন, ওয়েটার হুইস্কি দিয়ে গেল।

গেলাস তুলে সমাজপতি বললেন, 'চিয়ার্স।'

আমিও তাই বললাম। কিন্তু বোদাটা ভ্যাবাচ্যাকা মেরে বসে রইল। তার কানে মুখ গুঁজে ফিসফিসিয়ে বললাম, 'চিয়ার্স বল মাকড়া—'

বোদা চাপা গলায় বলল, 'ইংরিজি মাল খেতে গেলে এ রকম কায়দা -টায়দা করতে হয় বুঝি?'

'হ্যাঁ রে শালা—

বোদা একটু দেরিতে অনভ্যস্ত সুরে বলল, 'চেয়ার—'

'চেয়ার না, চিয়ার্স। তুই টেবল ম্যানার্সে-র বারটা বাজিয়ে ছাড়বি দেখছি।'

বোদা নির্বিকারভাবে বলল, 'একদিনে চেয়ারের বেশি এগুবে না গুরু।'

বললাম, 'কাল থেকে দিনে সাতাশ বার জিভ ছুলবি। যা একখানা জিভ বানিয়েছিস, ও থেকে কি আর ভাল মাল বেরোয়—'

বোদা খ্যাল খ্যাল করে হাসল।

হুইস্কিতে চুমুক দিয়ে আমি আবার সমাজপতির দিকে ফিরলাম, 'তা হলে স্যার শুরু করে দিই?'

জিজ্ঞাসু সুরে সমাজপতি বললেন, 'কী?'

'যে জন্যে মাল খাওয়াচ্ছেন সেই ব্যাপারটা, মানে চামচাগিরি।'

সমাজপতি উত্তর দিলেন না। ঢুল ঢুল চোখে তাকিয়ে মৃদু মন্দ হাসতে লাগলেন।

আর আমি বলতে লাগলাম, 'বাঙালিদের মধ্যে আপনার মতো ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট আর একজনও নেই। পাঁচ দশ বছরও লাগবে না, ফোর্ড আর রকফেলারের নাকে আপনি ঝামা ঘষে দিতে পারবেন।' ইত্যাদি ইত্যাদি।

এব মধ্যে পেগের পর পেগ হুইস্কি আসতে লাগল, কখন যেন এক সময় ডিনারেরও অর্ডার দিয়ে বসলেন সমাজপতি। খাওয়া দাওয়ার পর টলতে টলতে বাইরে বেরিয়ে তিনি বললেন, 'তোমরা কোথায় থাকো?'

'থাকার কিছু ঠিক নেই স্যার। আমরা ওয়ার্ল্ড সিটিজেন। যখন যেখানে ইচ্ছে থেকে যাই।'

'ফাইন। তোমাদের মতো যদি হতে পারতাম।' বলেই একটা হেঁচকি তুললেন সমাজপতি। তারপর আবার শুরু করলেন, 'আমার সঙ্গে গাড়ি আছে। বল, তোমাদেব কোথায় পৌঁছে দিয়ে যাব?'

'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার, পৌঁছে দিতে হবে না। আমরা এখন একটু হাঁটব, আফটার সাপার ওয়াক অ্যান আওয়ার আর কি। হাঁটব আর কলকাতার শোভা দেখব।'

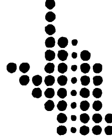
'আহা, আমিও যদি তোমাদের সঙ্গে একটু হাঁটতে পারতাম! সে যাক, তোমাদের সঙ্গে আবার কবে দেখা হচ্ছে?'

'আপনি যেদিন বলবেন—'

'কাল, না-না কাল না, পরশু তোমরা একবার আমার অফিসে এলে খুশি হব।'

'আমরাও । নিশ্চয়ই যাব স্যার। থ্যাঙ্ক ইউ স্যার ফর ড্রিঙ্ক অ্যাণ্ড ডিনার—'

সমাজপতি তাঁর গাড়িতে উঠে চলে গেলেন। আমরা দুই মাতাল রাতের কলকাতাকে পায়ের তলায় চেপে এলোমেলো পা ফেলে পূর্ব দিকে এগুতে লাগলাম।



খানিকটা যাবার পর এক গলির মুখে আসতেই চোখে পড়ল অনেকগুলো মেয়ে, কুড়ি থেকে তিরিশের মধ্যে বয়স, উদভ্রান্তের মতো ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে আসছে। তাদের পেছনে এক ব্যাটালিয়ান পুলিশ।

প্রথমটা খেয়াল করি নি। এবার চোখে পড়ল মেয়েগুলোর কারো গায়েই ঠিকঠাক পোশাক নেই। কারো পরনে শুধুমাত্র পেটিকোট আর ব্রা, কেউ ব্লাউজের ওপর শাড়িটা কোনো রকমে জড়িয়ে রেখেছে। ক'টা মেয়ের দেখলাম শাড়ি-ব্লাউজ-ব্রা -ফ্রা কিচ্ছু নেই, কোমরের তলা থেকে শুধু পেটিকোট ঝুলছে। মেয়েগুলো ভয়ার্ত চিৎকার করে চারদিকে ছোটাছুটি করছিল।

পাকস্থলীতে কয়েক পেগ দামী হুইস্কি রয়েছে। বার-কাম-রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে খোলা হাওয়ার নেশাটা যখন জমতে শুরু করেছে সেই সময় এমন একটা দৃশ্য দেখব, ভাবতে পারি নি। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম, আঙুল দিয়ে দু-চোখের ওপর এবং নিচের চামড়া টেনে অর্থাৎ চোখ দুটোকে যতটা সম্ভব বড় করে মেয়েগুলোকে দেখছে বোদা। কিছুক্ষণ আগে 'বার'-সিঙ্গার ছুঁড়িটাকেও এই ভাবে দেখেছিল সে। মেয়ে-ফেয়ের ব্যাপারে শালার নিশ্চয়ই গড়বড় আছে। সে যাক, বোদার ঘাড়ে আলতো টোকা দিয়ে ডাকলাম, 'অ্যাই—'

মেয়েগুলোর দিক থেকে চোখ ফেরাল না বোদা, তাদের দেখতে দেখতে অন্যমনস্কর মতো সাড়া দিল, 'কী বলছ?'

'আমরা এখন কোথায় আছি বল তো?'

আমার দিকে তাকাবার মতো অবস্থা নয় বোদার। মেয়েগুলোকে টার্গেট করে চোখ দিয়ে সে চাঁদমারি চালিয়েই যাচ্ছিল। নেশাজড়ানো আবছা গলায় বলল, 'কি জানি—'

একটু চিন্তা করে বললাম, 'আমরা বোধ হয় পার্ক স্ট্রিট ধরে হাঁটতে হাঁটতে আফ্রিকার জঙ্গলে চলে এসেছি।'

আমার কথাগুলো পুরোটা শোনে নি বোদা, দু-একটা শব্দ হয়ত তার কানে গিয়ে থাকবে। সে বলল, 'জঙ্গলে!'

'ইয়েস। আফ্রিকার জঙ্গল না হলে মেয়েদের এ ভাবে দেখা যায় নাকি?'

বোদা ঘড়ঘড়ে গলায় কী বলল, বোঝা গেল না।

এর মধ্যে ওদিকের দৃশ্যটায় নতুন কিছু যোগ হয়েছে। একটু আগে মেয়েগুলো ভয়ে চিৎকার করতে করতে যেদিকে পারছিল, ছুটছিল। এবার দেখা গেল, যে পুলিশেরা তাদের সঙ্গে সঙ্গে বড় অ্যাপার্টমেন্ট হাউসটা থেকে বেরিয়ে এসেছিল তারাও ছোটাছুটি শুরু করে দিয়েছে। ফ্লাই-ট্র্যাপ দিয়ে যেভাবে মাছি ধরা হয় প্রায় সেভাবেই মেয়েগুলোকে পটাপট ধরে তারা ওধারের একটা জালে ঘেরা ঢাউস পুলিশ ভ্যানে পুরে ফেলল।

এদিকে বোদা চোখ থেকে হাত নামিয়ে নিল, সঙ্গে সঙ্গে নেশার ঘোরে সে দুটো অর্ধেক বুজে গেল। জড়িয়ে জড়িয়ে সে বলল, 'বগরগে একখানা ইংরেজি সিনেমা দেখছিলাম, দিলে কিচাইন করে—'

হঠাৎ আমার কি হয়ে গেল, এলোমেলো পা ফেলে পুলিশ ভ্যানটার কাছে চলে এলাম। ভেতরে মেয়েগুলোর চাপা ভীত কান্নার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। নেশার ঝোঁকে ভ্যানের গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বললাম, 'কাঁদিস না মাইবি। ধুস, ইয়াং মেয়েরা কাঁদলে ভাল্লাগে না।' তারপর হাতড়ে হাতড়ে সামনের দিকে চলে এলাম।

ড্রাইভারের এ পাশে জানলার ধার ঘেঁষে ছোকরামতো একটি অফিসার বসে ছিল। তাকে বললাম, 'কী হয়েছে ব্রাদার, এতগুলো মেয়েকে তুলে নিয়ে কোথায় চললেন?'

অফিসারের চোখ এবং কপাল একসঙ্গে কুঁচকে গেল। কড়া গলায় সে বলল, 'আপনার প্রয়োজন?'

'প্রয়োজন নেই।'

'তবে?'

'কৌতূহল। আমাদের কান্ট্রিতে কোথায় কী হচ্ছে আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে। নিষ্পাপ কিউরিয়সিটি আর কি?'

অফিসারের গলা এবার আরো কড়া শোনালো, 'কিউরিয়সিটি?'

আমি ঘাড়টা দেড় মিটার হেলিয়ে দিলাম, 'আজ্ঞে—'

ততক্ষণে হ্যাঁচোড়-প্যাঁচোড় করতে করতে বোদা আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

অফিসার জিজ্ঞেস করল, 'আপনারা কে?'

'দুই মাতাল বিশ্ব-নাগরিক—'

'কী করেন?'

'ড্রিঙ্ক—' বলেই বোদার দিকে ফিরলাম, 'তাই করি না রে বোদা?'

বোদা তক্ষুনি সায় দিল, 'হ্যাঁ গুরু, ড্রিঙ্ক ছাড়া ওয়ার্ল্ডে কিছু করবার আছে নাকি।'

'ঠিক বলেছিস। ড্রিঙ্ক করাটাই আমাদের প্রফেসান।'

ছোকরা অফিসারটির পাশে মাঝবয়সী ভারি চেহারার এক অফিসার, প্রচুর রোঁয়াওলা ভুরু তার, চর্বিওলা গাল, জুলপি এবং রগের ওপর চোরাগোপ্তা রুপোর তার, শক্ত চোয়াল, তামাটে গয়ের রং—বসেছিলেন, তিনি আচমকা খেপে উঠলেন, 'মাঝরাত্তিরে শালারা আচ্ছা ঝামেলা বাধিয়েছে। সুকুমার, মাতাল দুটোকে ভ্যানে তুলে ফেল তো। দু'দিন লক-আপে থাকলে প্রফেসান ছুটে যাবে।

আমি পিটার স্বয়ম্ভু হোড়, কোনো কারণেই কোনো অবস্থাতেই ঘাবড়ে যাই না। এখনও ঘাবড়ালাম না। তবে নকল ভয়ের ভান করে বললাম, 'লক-আপে খুব কষ্ট স্যার, বড্ড মশা কামড়ায়। আর চোর ছ্যাঁচড়গুলো পেচ্ছাপ করে, থুতু ফেলে যাচ্ছেতাই করে রাখে। আর জেলখানার যা রান্না মাইরি, আমি খেলে আমার বাবার অন্নপ্রাশনের ভাত হাইজাম্প মেরে উঠে আসবে। আমার আবার ডিসেন্ট্রির ধাত, রান্নাটা ভাল হলে আর হাই প্রোটিন পাওয়া গেলে না হয় ক'দিন লক-আপে ঘুরে আসা যেত, না কি বলিস বোদা?' বলতে বলতে আমি বোদার দিকে ফিরলাম।

বোদা বলল, 'হ্যাঁ গুরু—'

এবার বয়স্ক অফিসারটি নিজের চুল খামচে ধরে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'মাঝরাতে কি পাল্লায় যে পড়া গেল! মাতাল শালারা জ্বালিয়ে খাচ্ছে।' বলেই ড্রাইভারকে বলল, 'রামধারী সিং স্টার্ট দাও—'

তৎক্ষণাৎ ঝাঁ-ঝাঁ করে ইঞ্জিন চালু হয়ে গেল। পুলিশ ভ্যানটা আস্তে আস্তে কয়েক ফুট এগিয়ে হঠাৎ স্পিড তুলে ফেলল, তারপর বোঁ করে বাঁয়ে ঘুরে উধাও হয়ে গেল।

বোদা টলছিল, তার সারা গায়ের জোড়গুলো আলগা হয়ে গেছে যেন। শরীরের দু'ধারে ঝুলন্ত দুই হাত তুলে হতাশভাবে ঘোবালো সে, তারপর বলল, 'যাঃ বাবা, পঞ্চাশটা পরী নিয়ে ওরা চলে গেল। আর আমরা দুই শ্লা এই ফাঁকা রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইলাম! এব নামই তকদির।' বলেই কপালে চাপড়াল।

রাস্তাটা এখন একেবারে ধু-ধু করছে। গাড়ি-ফাড়ি দূরের কথা, কোনো মানুষজনও চোখে পড়ছে না। আশেপাশের বাড়িগুলোর আলো নিভে গেছে, শুধু রাস্তার দু'ধারে কর্পোরেশনের আলোগুলো জ্বলছে। তবে সব আলো নয়, মাঝে মাঝে দু-চারটে আবার জ্বলছে না। যেখানে যেখানে জ্বলছে না সে-জায়গাগুলো অন্ধকার।

ডাকলাম, 'এই বোদা—'

বোদা তাকাল, 'বল—'

'ল্যাম্পপোস্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে? চল এগোই—'

দু'জনে আবার হাঁটতে শুরু করলাম। এক মিনিটও পার হয় নি, হঠাৎ চোখে পড়ল একটি মেয়ে ফুটপাতে ফায়ার ব্রিগেডের যে চওড়া চওড়া বাক্স বসানো থাকে তেমন একটা বাক্সের আড়াল থেকে ভীতু ইঁদুরের মতো উঁকি মারছে! এখানে পর পর চার পাঁচটা ল্যাম্পপোস্টে আলো জ্বলছে না। জায়গাটা বেশ অন্ধকার। তাই মেয়েটার কত বয়স, কি রকম চেহারা, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। সে কোত্থেকে এল, এত রাতে ফাঁকা রাস্তায় দাঁড়িয়ে উঁকিঝুঁকিই বা দিচ্ছে কেন, কে বলবে।

চোখাচোখি হতেই মেয়েটা সট করে তার মুখ সরিয়ে নিল। এখন কি করা? নিজের অজান্তেই দাঁড়িয়ে গিয়েছিলাম।

বোদা খুব সম্ভব মেয়েটাকে দেখতে পায় নি। আমি দাঁড়িয়ে যেতে সে-ও থেমে গিয়েছিল। বলল, 'গুরু আবার ল্যাম্পপোস্ট হয়ে গেল যে?'

তার কথা আমার কানে বোধহয় ঢুকল না। মেয়েটা অদৃশ্য আকর্ষণে আমাকে টানছিল, বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে গেলাম।

ফায়ার ব্রিগ্রেডের বাক্সটার পেছনে যেতেই মেয়েটাকে আবছা আলোতেও মোটামুটি স্পষ্ট দেখা গেল। সাতাশ-আটাশ বছব হবে তার বয়েস। গায়ের রং বেশ ফর্সাই, লম্বাটে মুখ। নাক-চিবুক বেশ ধারাল। অজস্র চুল তার, সেই চুল একবেণী করে পিঠের ওপর ফেলে রাখা হয়েছে। বেণীটায় ছেঁড়াখোঁড়া একটা বেলফুলের মালা। তার গায়ে একটা পেটিকোট আর ব্রা ছাড়া কিছুই নেই।

আমাকে এত কাছে আসতে দেখে মেয়েটা মুখ নামিয়ে জড়সড় হয়ে দাঁড়াল। তার পর দুটো হাত আড়াআড়ি করে বুক ঢাকতে চেষ্টা করল।

কয়েক পলক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকে দেখলাম। তারপর তর্জনীর ডগা দিয়ে ছুঁচলো থুতনিটা ধরে বললাম, 'কে তুমি ফুলটুসি?'

মেয়েটা জড়ানো গলায় বলল, 'আমি, আমি—'

এবার আমার নজরে পড়ল মেয়েটা ভীষণ কাঁপছে, ভয়ে তার ঠোঁট দুটো নীল আর চোখের তারা একেবারেই স্থির হয়ে গেছে। বললাম, 'কী হল, এত কাঁপছ কেন?'

ঠোঁট দুটো দ্বিধাবিভক্ত হল মেয়েটার। অস্পষ্ট গোঙানির মতো শব্দ বেরিয়ে এল তার গলা থেকে, 'ওরা—'

'ওরা কারা?'

'পুলিশ।'

'পুলিশ কী করেছে?'

মেয়েটা কিছু বলতে চেষ্টা কবল, পারল না। তার ঠোঁট দুটো থর থর করতে লাগল।

আচমকা বিদ্যুৎ খেলে যাবার মতো আমার হঠাৎ মনে হল, কিছুক্ষণ আগে ওধারের বড় অ্যাপার্টমেন্ট হাউসটা থেকে পুলিশের তাড়া খেয়ে যে মেয়েগুলো হুড়হুড় করে বেরিয়ে পড়েছিল, এ কি তাদের মধ্যে ছিল? সন্দেহ নেই, নিশ্চয়ই ছিল। তারপর পুলিশের চোখে ধুলো ছিটিয়ে ছিটকে এসে ফায়ার ব্রিগেডের বাক্সটার আড়ালে লুকিয়েছে। তবু পুরোপুরি নিশ্চিত হবার জন্য দূরের অ্যাপার্টমেন্ট হাউসটার দিকে হাত বাড়িয়ে বললাম, 'খানিক্ষণ আগে তুমি ওই বাড়িটায় ছিলে?'

চোখ নামিয়ে আস্তে মাথা নাড়ল মেয়েটা।

আমি আবার বললাম, 'তারপর পুলিশ রেইড করতে হডকে এখানে চলে এসেছ?'

'হ্যাঁ।'

'অন্য মেয়েগুলোর কী হাল হয়েছে। জানো?'

চাপা গলায় ফিসফিস করে বলল মেয়েটা, 'দেখেছি।'

'খুব বেঁচে গেছ। আরেকটু হলে কালো পক্ষীরাজে চড়তে হত। এতক্ষণে গারদে বসে হয়ত লাপসি খেতে।'

মেয়েটা শিউরে উঠল।

বোদা কখন যেন আমার গা ঘেঁষে এসে দাঁড়িয়েছে। তখনকার মতো আঙুল দিয়ে চোখ বড় করে মেয়েটাকে দেখছিল। ঘাড় ফিরিয়ে তার পাঁজরার কাছে কনুই দিয়ে গুঁতো মারলাম। বোদা আঁক করে গলার ভেতর একটা শব্দ করল, তারপর পাঁজরায় হাত বোলাতে লাগল। এবার মেয়েটার কান বাঁচিয়ে আমি বোদাকে বললাম, 'মাকড়া, ছুঁড়ি দেখলেই তোমার খাই খাই। সেই 'বার'-এ ঢোকার পর থেকেই দেখে যাচ্ছি। এভাবে দেখতে দেখতে থ্রম্বসিস হয়ে মরে যাবি যে শালা। ওদিকে ফিরে দাঁড়া।' উল্টো দিকের একটা দেয়াল দেখিয়ে দিলাম। কি আশ্চর্য, সেখানেও একটা আধ-ন্যাংটো ফিল্মি নায়িকার ছবি সাঁটা রয়েছে। শালী যা একখানা পোজ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে না, তাকালেই ব্লাড প্রেসার চড়চড়িয়ে একটা বিপজ্জনক সীমানায় পৌঁছে যাবে।

মহাশয়গণ, ব্যাপারটা লক্ষ করুন। সবাই মিলে যেখানে যত মেয়ে আছে, সুন্দরী এবং যুবতী, তাদের জামা-কাপড় খুলে রাস্তায় রাস্তায় তাদের উলঙ্গ শরীর ছালছাড়ানো পাঁঠার মাংসের মতো সাজিয়ে রাখছে। কিছু বুঝতে পারছেন বাবুমশায়রা? আমিও মাইরি পারছি না। যদি বুঝতে-টুঝতে পারেন, আমাকেও একটু বুঝিয়ে দেবেন কিন্তু, প্লিজ।

যাক গে, বোদাকে বললাম, 'বানচোৎ তোমাকে দেয়ালও দেখতে হবে না। তুই ওই পার্কটার দিকে তাকিয়ে এক শো আটাশ বার ছিন্নমস্তার স্তব আউড়ে যা।' একটু থেমে বললাম, 'মেয়েমানুষের খোলা গায়ে অত দেখবার কী আছে? হারামী—'

বোদা পার্ক দেখতে দেখতে বিড় বিড় করতে লাগল। আমি আবার মেয়েটার দিকে ফিরলাম, 'পুলিশকে ভক্কি মারতে পেরেছ। তারা এখন লালবাজার চলে গেছে, তুমিও এবার সতী-সাবিত্রী হয়ে বাড়ি ফিরে যাও।' বোদার দিকে ফিরে তার কাঁধে হাত ছড়িয়ে দিয়ে বললাম, 'চল রে পার্টনার, আমরাও সটকে পড়ি।'

টলটলায়মান দু'টি মদ্যপ মানে আমি পিটার স্বয়ম্ভু হোড় এবং বোদা, যুগলবন্দি হয়ে দশ ফুট দূরেও যেতে পারি নি, পেছন থেকে মেয়েটার গলা শুনতে পেলাম, 'একটু শুনবেন—'

অগত্যা ফিরেই আসতে হল। মেয়েটার চোখের ওপর নিজের চোখ স্থির করে বললাম, 'আবার কী হল বাওয়া, সং সেজে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কেন? বাড়ি চলে যাও না—'

মেয়েটা ঢোক গিলে বলল, 'এত রাত্তিরে —' বলেই চুপ করল।

'এত রাত্তিরে কী? বাড়ি গেলে ঢুকতে দেবে না?'

'তা নয়।'

'তবে?'

'শিয়ালদা থেকে ট্রেন পাব না। লাস্ট ট্রেন চলে গেছে।'

'আমি তো বাওয়া রেল কোম্পানিকে বলে তোমার জন্যে স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা করতে পারব না। কি রে বোদা, পারব?'

বোদা গুরুবাক্য মেনে নিয়ে মেয়েটার দিকে তাকাচ্ছিল না, ডাইনে-বাঁয়ে জোরে জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'না গুরু।'

মেয়েটাকে বললাম, 'তা হলে?'

আচমকা দু'হাতে মুখ ঢেকে শব্দ করে কেঁদে উঠল মেয়েটা। বলল, 'আমাকে বাঁচান—' কান্নায় তার গলা ভেঙে ভেঙে যেতে লাগল।

আমি হকচকিয়ে গেলাম। কান্নাকাটি আমার খুবই অপছন্দ। বললাম, 'আরে কী হল? দুম করে কান্না জুড়ে দিলে কেন?'

'আজ রাত্তিরে আমাকে বাড়ি ফিরতেই হবে। মায়ের খুব জ্বর দেখে এসেছিলাম। ডিলিরিয়াম বকছিল।'

'তা আমি কি করব বল?'

'আপনার পায়ে ধরছি, আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিন।'

এ তো হেভি গাড্ডায় পড়া গেল! কোথায় দারুণ একখানা প্ল্যান করে অনেক কাল পর আট পেগ হুইস্কি পাকস্থলীতে স্টোর করেছি, কোথায় আমরা দুই মাতাল মধ্যরাতের কলকাতাকে পায়ের তলায় চেপে শাসন করব, তা নয়। এখন এই মেয়েকে কাঁধে ঝুলিয়ে তার বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এস। তাকে ঝেড়ে ফেলে দেবার জন্যে বললাম, 'আমার সঙ্গে তোমার যদি দেখা না হত, কী করতে?'

মেয়েটা দুর্বল অসহায় সুরে বলল, 'ভাবতে পারছি না।'

'কিন্তু—'

'বলুন।'

'আমাদের তো দেখছই, টেরিফিক মাতাল। লোকও আমরা ভাল নই।'

মেয়েটা খুব উদাসীন গলায় বলল, 'খারাপ লোককে আমার ভয় নেই, অনেক খারাপ লোক আমি দেখেছি। আমাকে দয়া করে পৌঁছে দিন। এর জন্য যা চান আমি তাতেই রাজি।'

'মানে—'

মুখ নিচু করে চাপা গলায় মেয়েটা বলল, 'আমার শরীরটা তো দেখছেন—' বলেই চুপ করে গেল।

মেয়েটার ইঙ্গিত বুঝতে পারছি। মহাশয়গণ, আমি বার ঘাটের জল-খাওয়া লোক। কিন্তু কোনো মেয়ের মুখে খোলাখুলি এ রকম কথা শুনি নি। আমার মতো লোকেরও কান ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠল। বুঝতে পারছি আমি ঘাড় থেকে ঝেড়ে নামালেও মেয়েটা নামবে না। সে মরিয়া হয়ে উঠেছে। বললাম, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। তুমি থাকো কোথায়?'

'আগরপাড়ার কাছে, জায়গাটার নাম কর্ণপুর।'

'ট্রেন ছাড়া আর কিভাবে যাওয়া যায়?'

'শ্যামবাজার থেকে বি-টি রোড ধরে বাস-এ। তবে লাস্ট বাসও অনেক্ষণ আগে চলে গেছে।'

কি ঝামেলায় পড়া গেল! বললাম, 'আচ্ছা চল, দেখি কী করা যায়—' মেয়েটা বুকের ওপর আড়াআড়ি হাত রেখে আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। হঠাৎ আমার খেয়াল হল, আরে

তাই তো, এই ব্রা আর পেটিকোট পরিয়ে উদোম রাস্তার ওপর দিয়ে মেয়েটাকে মার্চ করিয়ে নেওয়া যায় নাকি?

হঠাৎ মাথায় একটা প্ল্যান এসে গেল। ঝট করে নিজের শার্টটা খুলে মেয়েটার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললাম, 'এটা পরে নাও—'

নিচের দিকে ট্রাউজার্স আছে আমার, ওপরে গেঞ্জি। মেয়েটা আমার শার্ট পরবে কি পরবে না, ঠিক করে উঠতে পারছে না। দ্বিধান্বিতের মতো সে বলল, 'কিন্তু আপনি?'

'আমার কথা না ভেবে দয়া করে ওটা গায়ে গলিয়ে নাও। ব্রা আর সায়া পরিয়ে আমরা দুই মাতাল প্যারেড করতে করতে যাই আর পুলিশ এসে ঘাড়ে লাথি ঝাড়তে ঝাড়তে লক-আপে ঢোকাক—এসব চলবে না বাওয়া।'

মেয়েটা চুপ করে রইল।

আমি বলেই যাচ্ছি, 'পুলিশের চোখে না পড়লেও একবার যদি ওই অবস্থায় জনগণের হাতে পড়ে যাই, কি হবে রে বোদা?' বলেই বোদার দিকে ফিরলাম।

বোদা বলল, 'ছাল ছাড়িয়ে আমাদের হাতে ধরিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেবে।'

মেয়েটা আর কিছু না বলে শার্টটা পরে ফেলল।

তলায় পেটিকোট, ওপরে ঢলঢলে শার্ট—মেয়েটাকে যা দেখতে লাগছে না! যাই হোক বললাম, 'এবার ফরোয়ার্ড মার্চ শুরু করা যাক—'

বোদা বলল, 'গুরু, ড্রপ সিন ফেলে ওর বডি ঢাকা হয়ে গেছে?'

অর্থাৎ মেয়েটা জামা পরে গা ঢেকেছে কিনা জানতে চাইছে বোদা। বললাম, 'ইয়েস।'

'এবার তা হলে চোখ খুলতে পারি?' এতক্ষণ চোখ বুজে ছিল বোদা।

বললাম, 'নিশ্চয়ই। একদিনের তালিমেই তুমি বাওয়া যতটা নিষ্কাম ব্রহ্মচারী হয়ে বসেছ, দু সপ্তাহের মধ্যে তো টপ সন্ন্যিসি হয়ে যাবি রে।'

বোদা চোখ মেলে দাঁত বের করে হাসল। তারপর মাঝখানে মেয়েটাকে রেখে বোদা আর আমি তার দু'পাশে রইলাম। এবং একটু পরে মধ্য রাতের ফাঁকা কলকাতায় আমরা থ্রি মাস্কেটীয়ার্স, নাক বরাবর হাঁটতে শুরু করলাম।

খানিকটা যাবার পর বললাম, 'তোমার নামটা যেন কী?'

'সুমনা—'মেয়েটা আস্তে করে বলল।

'তোমাদের বাড়ি এখান থেকে ক'মাইল হবে?'

'বার তের মাইল।'

ওধার থেকে বোদা সরু গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'এতটা রাস্তা এখন হেঁটে যেতে হলে আমি কিন্তু লাট খেয়ে পড়ে যাব গুরু।'

সুমনাকে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব যখন নিয়েছি তখন পৌঁছে দিতেই হবে। এখন আর ফেরা যায় না। ওয়ার্ড ইজ ওয়ার্ড। কিন্তু বার তের মাইল রাস্তা হাঁটতে হলে হাঁটুর সব পার্টস আলগা হয়ে যাবে। সুতরাং কী করা যায়? হঠাৎ মনে হল, আরে আরে এই ব্যাপার

নিয়ে এত ভাবছি কেন? সেন্ট্রাল এ্যাভেনিউতে জগবন্ধুর এভার গ্রিন অটো মোবাইল তো রয়েছে। ওখান থেকে একটা গাড়িটাড়ি জোগাড় করেই তো মুশকিল আসান করে ফেলা যায়। পর মুহূর্তেই খেয়াল হল, এত রাত্তিরে তো জগবন্ধুকে পাওয়া যাবে না, পাক্কা এক বোতল বেঙ্গল খেয়ে সে এখন নিশ্চয়ই বৌবাজার কিংবা নর্থ ক্যালকাটার বেশ্যাপাড়ায় কোনো মেয়েকে জড়িয়ে ধরে ঘুমোচ্ছে। হে-হে মহাশয়গণ, মেয়েপাড়ায় গিয়ে জগবন্ধুকে খুঁজে বার করা কি সম্ভব? আন্দাজে কার ঘরে গিয়ে ঢোকা দেব? অবশ্য দু-তিন ঘন্টা খোঁজাখুঁজি করলে শালাকে নিশ্চয়ই বার করে ফেলতে পারব। কিন্তু আপনারাই বলুন, মধ্যরাতে কারো সুখের ঘুম ভাঙানো কি ঠিক হবে?

অথচ জগবন্ধুকে না পেলে গাড়ি পাওয়া যাবে না। এভারগ্রিন অটোমোবাইলসের মিস্তিরিরা আমাকে চেনে ঠিকই কিন্তু জগবন্ধুর হুকুম ছাড়া গাড়ি দেবে না। আচমকা আমার মনে পড়ল, মৌলালির কাছে চেনাশোনা একটা গ্যারেজ আছে। গ্যারেজ ঠিক নয়, ওটা একটা ছোটখাটো রি-ফিলিং স্টেশন। পেট্রোল বিক্রির দোকান আর কি। তবে রাত্তিরে ভাড়া নিয়ে দু-চারটে প্রাইভেট বাস আর টেম্পো থাকতে দেয়। ওখানে গিয়ে সুবিধে না হলে জগবন্ধুকেই খুঁজে বার করতে হবে।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা ধর্মতলা স্ট্রিটে এসে পড়েছিলাম। বোদাকে বললাম, 'চল একবার মৌলালি হয়ে যাই।'

বোদা বলল, 'সেখানে কী?'

'মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে—' বলে চোখ টিপলাম।

বোদার নেশাজড়ানো ঘুমন্ত চোখ হেড লাইটের মতো জ্বলে উঠল। মাথাটাথা নেড়ে উত্তেজিতভাবে বলতে লাগল, 'তোমার মাথায় যখন প্ল্যান এসেছে—আর ভয় নেই। বার চোদ্দ মাইল হেঁটে কোমরের হাড় ঢিলে করতে হবে না।'

আমি হাসলাম। ক'দিনে আমার ওপর শালার দারুণ কনফিডেন্স এসে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা মৌলালির রি-ফিলিং স্টেশনটায় এসে পড়লাম।

একধারে অ্যাসবেস্টসের ছাউনি-দেওয়া ছোট অফিস ঘর, মাঝখানে পেট্রোলের দুটো মিটার, অফিস-ঘরটার গা ঘেঁষে এক দেয়ালে গাড়ির চাকায় পাম্প দেবার কিছু যন্ত্রপাতি ঝোলানো রয়েছে। রি-ফিলিং স্টেশনটায় তিন চারটে প্রাইভেট বাস আর গোটা কয়েক টেম্পো চোখে পড়ল। তবে অফিস-ঘরটা বন্ধ হয়ে গেছে, বাইরে একটা ঢাউস স্টিলের তালা ঝুলছে। তার মানে আমাদের বারটা বাজল। এই পেট্রোলের দোকানটার মালিক বজরঙ্গীপ্রসাদের সঙ্গে আমার অনেক দিনের জানাশোনা। এদিকে এলেই ওর সঙ্গে আড্ডা দিয়ে মাল-টাল খেয়ে যাই। বজরঙ্গীকে পাওয়া গেলে নিশ্চয়ই একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যেত। অন্যদিন রাত দেড়টা দুটো পর্যন্ত এখানে থাকে সে। কিন্তু তালা ঝুলিয়ে মাকড়াটা এরই মধ্যে চলে গেছে। মহাশয়গণ, এখন সোজা কথাটা দাঁড়াল এই, পাকা বার কি চোদ্দটি মাইল হাঁটতে হবে। ঘুরে বোদা এবং সুমনাকে যখন হাঁটার কথা বলতে যাব, হঠাৎ ওধারের একটা বাস থেকে ক'টা জড়ানো গলা কানে এল। সাপের হাঁচি যেমন বেদেরা চেনে, আমিও

চিনে ফেললাম ওগুলো মাতালের গলা। দু'পা এগুতেই চোখে পড়ল, বাসটার ভেতর টিমটিমে আলো জ্বেলে মদের আসর বসেছে। এই রি-ফিলিং স্টেশনে রাত্তিরে যে সব বাস টেম্পো থাকে তাদের ড্রাইভার-ক্লিনার-হেল্পার গোটাকয়েক কালী- মার্কা বোতল আর শালপাতায় ঘুগনি এবং স্তূপাকার ঠাণ্ডা তেলেভাজার চাট নিয়ে বসেছে। এই ইন্দ্রসভায় বিহারি-বাঙালি-পাঞ্জাবি—ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রায় সব প্রদেশেরই প্রতিনিধি রয়েছে। বজরঙ্গীর কাছে অনেক বার এসেছি, ড্রাইভারদের অনেকেই আমার মুখচেনা। তবে কথাবার্তা কখনো হয় নি। মুখোমুখি হয়ে গেলে অল্প হেসেছি, ওরাও হেসেছে। এই পর্যন্ত।

বাসের দরজার মুখে আমাকে দেখে ওরা সবাই ঘুরে তাকাল। নেশায় সকলেরই চোখ প্রায় বুজে আছে। সবাই প্রায় সমস্বরে বলে উঠল, 'কৌন?'

বললাম, 'আমি। বজরঙ্গীপ্রসাদ আমার দোস্ত, ওর কাছে এসেছিলাম। দেখছি ওর অফিসে তালা ঝুলছে।'

'হাঁ। পরসাদজি আজ থোড়া আগে আগে চলে গেছে।'

কী উত্তর দেব যখন ভাবছি, হঠাৎ একটা শিখ ড্রাইভার, বিরাট মাংসল চেহারা তার, কোমরে ঢলঢলে একটা ইজের ছাড়া আর কিছুই নেই, সারা শরীর রোমশ, বড় বড় চুল আর দাড়ি হাওয়ায় উড়ছে, দাড়িওলা বিশাল মা-কালীর মতো দেখাচ্ছে তাকে, হঠাৎ গমগমে গলায় বলে উঠল, 'পরসাদজি নেহী তো ক্যা, হামলোগ তো হ্যায়। আইয়ে না অন্দর। মালুম হোতা, আপ জানপয়চান হো—'

হে-হে মহাশয়গণ, আমার মন বলছে কিছু একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আমি আগে থেকে গন্ধ পেয়ে যাই। মেঘের গায়ে সিলভার লাইনিং, শুদ্ধ বাংলায় কি যেন বলে—রুপোলি রেখা, আমি তাই দেখে ফেললাম। আপনারা তো মোটামুটি জানেনই স্রেফ একমুঠো হাওয়া পেলে আমি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মতো একখানা প্রকাণ্ড বাড়ি বানিয়ে ফেলতে পারি। সর্দাবজি যখন একবার ডেকেই ফেলেছে, দেখাই যাক ওর জমি থেকে কতটা ফসল কেটে আনতে পারি। হাসি হাসি মুখে বললাম, 'জরুর জান-পয়চান, আসছি সর্দারজি—' বলেই বোদার কাছে চলে গেলাম! আধ ঘন্টা বাদে কী হতে পারে ভবিষ্যতের সেই চিত্রটি দর্শন করে পকেট থেকে একতাড়া নোট বার করলাম। বললাম, 'এখানে কোথায় বেঙ্গল পাওয়া যায় জানিস?'

বোদা তৎক্ষণাৎ ঘাড় কাত করল, 'জানি গুরু। আমার চোখে ধুলো দিয়ে এই কলকাতা শহরে কেউ বেঙ্গলের দোকান খুলে বসে আছে, সেটি হবার নয়। তবে ইংরেজি মাল যদি চাও, আনতে পারব না। আমার কারবার বেঙ্গল নিয়ে।'

বোদার থুতনিতে টোকা মেরে টাকাগুলো তার হাতে দিলাম। টেনে টেনে রগড়ের গলায় বললাম, 'শালা দেশপ্রেমিক। যা চারটে বোতল নিয়ে আয়।'

বোদা ছুটল। বাংলা মদের নামে তার পায়ে বিদ্যুৎ খেলে যেতে লাগল। আমি আর সুমনা দাঁড়িয়ে রইলাম।

মিনিট পাঁচেক বাদে সত্যিসত্যি চার চারটে বোতল বগলে পুরে এবং হাতে ঝুলিয়ে

হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এল বোদা। ওধারের একটা ফাঁকা বাস দেখিয়ে তাকে বললাম, 'সুমনাকে নিয়ে ওটার ভেতর গিয়ে বোস। আমি আসছি—'

চকচকানো চোখে বোতলগুলো দেখতে দেখতে ঠোঁট চাটতে লাগল বোদা। তার মনের কথাটা চট করে পড়ে নিয়ে বললাম, 'বোতলের দিকে তাকাবি না। অ্যাবাউট টার্ন করে সোজা ওই বাস-এ গিয়ে ঢুকে পড়।'

দেড় কিলো চিরতা গেলার মতো মুখ করে বোদা সুমনাকে নিয়ে ওধারের বাস-এ গিয়ে ঢুকল। আর আমি বোতলগুলো পেছন দিকে লুকিয়ে যে বাস-এ ড্রাইভারদের আসর বসেছে সেখানে চলে এলাম।

ওরা নীচে গোল হয়ে বসে মাটির খোরায় বাংলা মাল ঢেলে খাচ্ছিল। তলায় আর জায়গা ছিল না, অগত্যা আমাকে নারকেল ছোবড়ার গদিওলা সিটে বসতে হল।

একটি বাঙালি টেম্পো ড্রাইভার বলল, 'আপনি স্যার বজরঙ্গীর সঙ্গে মাল খান। আপনাকে আমরা পাই-ই না। তা টুকুস চলবে নাকি?'

সর্দারজি হেঁড়ে গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'চলবে না কেন? জরুর চলেগা। সাহাব এখন আমাদের দোস্ত—'

আমি ঝুঁকে বললাম, 'জরুর দোস্ত—'

সর্দারজিকে আর কিছু বলতে হল না, একটা খোরায় বাংলা ঢেলে এবং শালপাতায় ঠাণ্ডা মিয়ানো ক'টা পেঁয়াজি সাজিয়ে আমাকে দিল।

দশ মিনিটও লাগল না ওদের বোতলগুলো ফাঁক হয়ে গেল। তখন একটা ড্রাইভার বলে উঠল, 'যাঃ শালা, সবে নেশাটা জমে উঠেছে অমনি বোতলগুলো সাবাড় হয়ে গেল! কোনো মানে হয়! এখন কী করা যায়—'

আমি বললাম, 'কিছু করতে হবে না, সব ব্যবস্থা আমি করেই রেখেছি।' বলে সিটের আড়াল থেকে সেই বোতল চারটে বার করে আনলাম।

ড্রাইভাররা দারুণ খুশিতে হল্লা জুড়ে দিল, 'স্যারের জবাব নেই, জবাব নেই।' দু-তিন জন টলতে টলতে উঠে এক পাক করে নেচে নিল।

চারটে বোতল খতম হতে আর মিনিট পনের লাগল। তারপর বিয়োগান্ত সিনেমার নায়কের মতো মুখটা করুণ করে বললাম, 'ভাই সব, আমি একটা বিপদে পড়েছি—'

সবাই প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর, 'কী বিপদ দাদা?' তাদের ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছিল, আমার জন্যে কে প্রাণ দেবে তার কম্পিটিসান শুরু হয়ে যাবে।

আগরপাড়া যাবার কথাটা বললাম। এখনই সেখানে না পৌঁছলে নয়।

সবটা শুনে একটা টেম্পো-ড্রাইভার বলল, 'আমি আপনাদের পৌঁছে দিতে পারতাম কিন্তু—'

'কিন্তু কী?'

'আমার গাড়িতে মাল বওয়া হয়। মানুষ তো তোলা হয় না।'

'আমাদের মানুষ না ভেবে মালই ভেবে নাও না।'

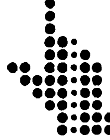
'ধুস মাইরি, তাই কখনো হয়!'

অন্য ড্রাইভাররাও আগরপাড়া যাবার নামে গাঁইগুঁই করতে লাগল। হঠাৎ সর্দারজি হাতের ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল। জড়ানো গলায় বলল, 'কোই বাত নেই। শালে হারামীর দল, তোরা যদি না যাস আমিই যাব। দোস্ত একটা ঝামেলায় পড়েছে, তাকে পৌঁছে না দিলে ক্যায়সা দোস্ত? উতার শালে লোগ, উতার যা।'

বোঝা যাচ্ছে বাংলা মাল তার গ্ল্যাণ্ডগুলোকে ভিজিয়ে নরম করে দিয়েছে। আমার কাজটা নির্ঘাত গুছিয়ে নেওয়া যাবে।

টাল খেতে খেতে মাতালেরা নেমে গেল। সর্দারজি এবার আমাকে বলল, 'যান সাহাব, আপনার আদমীদের নিয়ে আসুন।'

তা হলে এই বাসটা সর্দারজিরই। আমি দৌড়ে গিয়ে বোদা আর সুমনাকে ডেকে এনে উঠে পড়লাম। আর সর্দারজি সেই অবস্থাতেই অর্থাৎ খালি গায়ে কোমরে একটা ইজের সম্বল করে ড্রাইভারের সিটে গিয়ে বসল। একটু বাদে বাসটা স্টার্ট নিল। দশ মিনিটের মধ্যে দেখলাম শ্যামবাজার ফাইভ পয়েন্ট পেরিয়ে আমরা বি-টি রোডে এসে পড়েছি।



ঝড় তুলে মধ্যরাতের জনশূন্য রাস্তায় বাসটা যেন উড়ে যাচ্ছিল। ঘাড় ফিরিয়ে 'সর্দারজি একবার শুধু বলল, 'কোথায় রুখতে হবে, বলে দেবেন—'

বললাম, 'আচ্ছা—' বলেই সুমনার দিকে ফিরলাম, 'তোমাদের বাড়ির কাছে এলে জানিয়ে দিও।'

সুমনা মাথা নাড়ল।

দু'ধারে প্রচুর বাড়িঘর, গভর্ণমেন্ট হাউসিং স্কিমের অসংখ্য ফ্ল্যাট, রিফিউজি কলোনি, নানা ধরনের কল-কারখানা। সে-সবের ফাঁকে ফাঁকে ডোবা পুকুর, মজা খাল কিংবা ঝোপ ঝাড়। এত রাতে কোথাও আলো-টালো চোখে পড়ছে না। চারদিক গাঢ় গভীর ঘুমে অসাড় হয়ে আছে। মাঝে মাঝে বিরাট একেকটা ট্রাকের কনভয় আসছে উল্টো দিক থেকে। এই কনভয়গুলো এখানকার মানে ওয়েস্ট বেঙ্গলের নয়। অনেক অনেক দূর—সেই বম্বে, মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর কিংবা কানপুর থেকে আসছে।

আমাদের বাস রাস্তার বাঁ পাশ দিয়ে ছুটছিল। তার চাকার তলায় বি-টি রোডটা কালো ফিতের মতো দ্রুত গুটিয়ে যাচ্ছিল যেন।

বোদা বা সুমনা কেউ কথা বলছিল না। আমি কিছুক্ষণ জানলার বাইরে তাকিয়ে তাকিয়ে দু'পাশের অন্ধকার ক্যানভাস দেখলাম। দেখতে দেখতেই বোদাকে বললাম, 'আমার ওপর খুব চটে আছিস, না?'

বোদা জিজ্ঞেস করল, 'চটে থাকব কেন?'

'তখন মালের আড্ডায় গিয়ে বাংলা খেতে দিইনি বলে—'

'ধুস আমাকে ফাঁকি দেওয়া অত ইজি না।'

'কিরকম?'

'পেসাদ আমি ঠিক পেয়ে গেছি গুরু। তুমি যখন বেঙ্গল কিনতে পাঠিয়েছিলে তখনই ছিপি খুলে সবগুলো বোতল থেকে একটু একটু গলায় ঢেলে নিয়েছি।'

আমি যে আমি, পিটার স্বয়ম্ভু হোড়, একজন ফার্স্ট ক্লাস প্রতারক, বোদা আমার মাথা পর্যন্ত ঘুরিয়ে দিয়েছে। বললাম, 'তুমি শালা একটি সাবলাইম খচ্চর—'

বোদা দাঁত বার করে খ্যাল খ্যাল করে হাসতে লাগল। আমি আর কিছু বললাম না।

বোদার সঙ্গে কথা বলছিলাম ঠিকই, তবে সুমনার ভাবনাটাই আমার ওপর চাক চাক বরফের মতো চেপে বসে ছিল। বোদা হাসি থামাবার পর জানলার বাইরে থেকে চোখদুটো বাসের ভেতর নিয়ে এলাম। লক্ষ করলাম, হাত-পা গুটিয়ে একটা সিটে জড়সড় বসে আছে সুমনা। কয়েক পলক তার দিকে তাকিয়ে থেকে বললাম, 'যে বাড়িটায় পুলিশ রেইড করেছিল ওখানে রোজই যাও নাকি?' পার্ক স্ট্রিটের চারপাশে কিছু কিছু অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে মেয়েদের নিয়ে কী কারবার চলে তা আমার জানা আছে।

সুমনা মুখ নামিয়ে আবছা গলায় বলল, 'সপ্তাহে পাঁচদিন আসি।'

'কদ্দিন আসছ?'

'বছরখানেক।'

'এর আগে পুলিশ ঝমেলা করে নি?'

'না।'

'অন্য দিন লাস্ট ট্রেন চলে গেলে কি করে বাড়ি ফেরো?'

'আমাদের বাড়ি পৌঁছে দেবার জন্যে লোক আছে।'

'তারা কোথায়?'

'পুলিশ দেখে পালিয়েছে।'

বোঝা যাচ্ছে, যারা সুমনাদের দিয়ে ব্যবসা করে তাদের লোকজন বেশি রাত-টাত হলে মেয়েদের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসে। আচমকা পুলিশ হানায় আজ তারা হুটহাট সরে পড়েছে। বললাম, 'বাড়িতে কে কে আছে তোমার?'

সুমনা বলতে লাগল, 'মা, বিধবা দিদি, দিদির ছেলেমেয়েরা আর আমার ছোট একটা বোন।'

মহাশয়গণ, কোনো ব্যাপারেই আমার তেমন কৌতূহল-টৌতূহল নেই। নিজেকে নিয়েই বেশ আছি। অন্যের ঝামেলায় নাক ঢোকাতে গিয়ে ক্যাঁচাকলে পড়ে যাবার মানে হয় না। কিন্তু সুমনার ব্যাপারে দারুণ কৌতূহল হচ্ছিল। কলকাতার অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে মেয়েদের নিয়ে নানারকম নোংরা কারবার, পুলিশের কথায় ইমমরাল ট্রাফিকিং যে চলছে, তা আমার জানা ছিল। কিন্তু এর সঙ্গে যে-সব মেয়েরা আছে তাদের কাউকেই আগে দেখি নি। সুমনা যেন আমার নাকে একটা বঁড়শি আটকে তার দিকে টানছিল। বললাম, 'তোমার

বাবা নেই?'

'না।' সুমনা আস্তে মাথা নাড়ল, 'ছ-সাত বছর আগে মারা গেছে।'

'রোজগার করবার আর কেউ আছে?'

'না।'

'তোমাকেই তাহলে হোল ফ্যামিলি চালাতে হয়?'

'হ্যাঁ।'

জানলার বাইরে জিরাফের মতো গলা বাড়িয়ে রাতের দৃশ্য দেখছিল বোদা। দেখতে দেখতে বলল, 'আর শুনো না গুরু।'

ঘাড় ফিরিয়ে বোদার দিকে তাকালাম, 'কেন রে?'

'ওই সব প্যাচপ্যাচানি দুঃখ-ফুঃখুর কথা বেশি শুনলে আমাদের ক্যারেকটার খারাপ হয়ে যাবে।'

কথাটা ঠিকই বলেছে বোদা। আমরা হচ্ছি উৎকৃষ্ট চিট, লোক ঠকিয়ে যাওয়াটাই আমাদের একমাত্র প্রফেশান। মানুষের কান্নাকাটি আর চোখের জল দেখলে কিংবা দুঃখ-টুঃখের কথা শুনলে শরীরের উইক গ্ল্যাণ্ডগুলো আরো দুর্বল হয়ে যায় কিনা আপনারাই বলুন। দুর্বলতার ঝোঁকে হয়ত কোনোদিন আমার এতকালের রমরমা প্রফেশানটাই ছেড়ে দেব। তখন আমার চলবে কী করে? বিশুদ্ধ আগমার্কা ক্যারেকটা মাদুলি করে গলায় ঝুলিয়ে বসে থাকলে আপনারা নিশ্চয়ই স্লোগান দেবেন, 'পিটার স্বয়ম্ভু হোড়—যুগ যুগ জীয়ো। কিন্তু আমি জানি সেদিনই আমার বারটা বাজবে। বোদা আমাকে সাবধান করে দিয়েছিল ঠিকই কিন্তু তার সতর্কবাণী শুনেও শুনলাম না। সুমনাকে বলতে লাগলাম, 'কদ্দূর পড়াশোনা করেছ?'

সুমনা বলল, 'পি-ইউটা পাশ করেছি।'

সমাজপতির ঘাড় ভেঙে সন্ধেবেলা পুরো আট পেগ হুইস্কি খেয়েছি, তারপর ফার্স্ট ক্লাস একখানা ডিনার হয়েছে। দামী দামী খাবারগুলোর ওপর আট দশ খুরি ধান্যেশ্বরীর একটা লেয়ারও রয়েছে। দিশি ও বিলিতি, দু'রকম ড্রিঙ্ক পাকস্থলীতে মিলেমিশে একটা কেমিক্যাল কম্পাউণ্ড তৈরি হচ্ছিল। নেশাটা ফিকে হয়ে এলেও নার্ভের ওপর দিয়ে ঝমর ঝমর কনসার্ট বাজিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই মেয়েটা প্রি-ইউনিভার্সিটি পাশ করবার পরও এমন একটা নোংরা ব্যাপারে ঢুকে গেছে ভাবতেই ঝড়াং করে কোথায় যেন তাল কেটে গেল। চোখটোখ রগড়ে ভাল করে সুমনাকে দেখতে দেখতে বললাম, 'তুমি তো বেশ বিদ্বান হে। বিদ্বান—না না, জেণ্ডার চেঞ্জ হলে কী যেন হবে, হ্যাঁ বিদুষী, তুমি দস্তুরমতো বিদুষী—'

সুমনা উত্তর দিল না।

আমি আবার বললাম, 'এতটা লেখাপড়া শিখে চাকরি-বাকরি পেলে না?'

ঝাপসা গলায় বলল সুমনা, 'অনেক চেষ্টা করেছি।'

'তবু পাওনি?'

'একটা পেয়েছিলাম।'

'তবে?'

আমার ইঙ্গিতটা বুঝতে পারল সুমনা। অর্থাৎ চাকরিই যদি পেয়েছিল তবে এই নোংরা জঘন্য লাইনে সে এল কেন? সুমনা বলল, 'চাকরি জুটেছিল একটা বাজে প্রাইভেট ফার্মে। দশটা থেকে ছ'টা পর্যন্ত খাটতাম। আর সপ্তাহে দু' তিনদিন ম্যানেজারের বেডরুমে যেতে হত। মাইনে দুশো টাকা। ওই টাকায় ফ্যামিলি চলত না।'

'তারপর—'

'তারপর আর কি। একবার যখন একটা জানোয়ারের বেডরুমে ঢুকে পড়েছি তখন আমার সবই তো গেছে, সতীত্ব-ফতীত্ব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কি আর করব? তার চেয়ে অন্তত খেটে খেয়ে বাঁচতে চেষ্টা করি। ভাবলাম একজনের বিছানায় ওঠাও যা, একশো জনের বিছানায় ওঠাও তাই।' বলতে বলতে সুমনার চোখ দপ করে একবার জ্বলে উঠেই আবার নিভে গেল। ঠাণ্ডা গলায় সে বলে যেতে লাগল, 'একদিন চাকরিটা ছেড়ে দিলাম। তারপর থেকে অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে উইকে পাঁচ দিন করে আসছি। এখন আমার ইনকাম মিনিমাম হাজার টাকা।'

আমি কি বলতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ বাসটার স্পিড কমে গেল। ঘাড় ফিরিয়ে সর্দাবজি বলল, 'বহুৎ ঝামেলা হয়ে গেল।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হয়েছে?'

'পেট্রোল নিতে ভুলে গেছি, ট্যাঙ্ক বিলকুল ফাঁকা হয়ে এসেছে। বাস আর যাবে না।' স্পিড আরো কমে গিয়ে বাসটা রাস্তার এক ধারে দাঁড়িয়ে গেল।

মেয়েটাকে যখনই দেখেছি তখন থেকেই একটা-না-একটা ঝঞ্ঝাট এসে যাচ্ছে। আপনারা তো জানেনই মহাশয়গণ, কোনো কারণেই আমার মাথা-টাথা গরম হয় না, মস্তিষ্কটি আমার বরাবরই বরফের মতো ঠাণ্ডা। বললাম, 'এখন কী করা যায় সর্দাবজি?'

সর্দারজি জানালো, করবার কিছুই নেই। পেট্রোল না পাওয়া গেলে বাস এক ইঞ্চি নড়বে না।

আমার মাথার ভেতর স্বয়ংক্রিয় একটা ব্যাপার আছে। সর্দারজি যেই বলেছে ট্যাঙ্কে আর তেল নেই তৎক্ষণাৎ সেখানে একটা প্ল্যান এসে গেল। সুমনাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমাদের বাড়ি এখান থেকে কত দূর হবে, বলতে পারো?'

বাইরে মুখ বাড়িয়ে চারদিক ভাল করে দেখে নিয়ে সুমনা বলল, 'বেশি দূর নয়, দেড় থেকে দু' মাইলের মধ্যে।'

এখন কি করতে হবে চট করে ভেবে নিলাম। বললাম, 'চুপচাপ স্ট্যাচু হয়ে বাস-এ বসে থেকে কি হবে, এই রাস্তাটুকু তো হেঁটেই যাওয়া যায়।'

সুমনা মাথা নেড়ে জানালো, 'যায়।'

'তবে চল—' বলেই বোদার দিকে ফিরলাম। সিটের ওপর আধ-শোয়ার মতো করে সে পড়ে আছে। ডাকলাম, 'পার্টনার—'

বোদা লালচে ঘুমন্ত চোখে আমার দিকে তাকাল, 'বল গুরু—'

'একটু কষ্ট করে বডিখানা তুলতে হবে যে—'

বোদা বিরক্ত গলায় বিড় বিড় করতে করতে উঠে দাঁড়াল। এত রাত্তিরে তার আর হাঁটতে ইচ্ছে করছিল না। সুমনা আর আমিও উঠে পড়লাম।

সর্দারজি আমাদের কথা শুনছিল। বাংলা ভাষাটা সে বোধ হয় বোঝে। বলল, 'আপনারা তো চললেন। লেড়কিকে পৌঁছে দিয়ে কি ফিরে আসবেন? আমি কি আপনাদের জন্যে ইনতেজার করব?'

ইনতেজার অর্থাৎ অপেক্ষা করা ছাড়া তার উপায়ই বা কী? পেট্রোলের ট্যাঙ্ক খালি। এ অবস্থায় সে ফিরে যাবেই বা কি করে? সর্দারজিকে কথাটা বলতেই সে জানালো, উল্টো দিক থেকে হরবখৎ ট্রাক আসছে। তাদের থামিয়ে থোড়া থোড়া পেট্রোল চেয়ে নেবে। অবশ্য তার জন্যে ন্যায্য দাম দিয়ে দেবে। আর পেট্রোল পাওয়া গেলে কলকাতায় ফিরে যেতে অসুবিধেটা কোথায়?

ওভাবে যে পেট্রোল পাওয়া যেতে পারে, এটা আমার মাথায় আসেনি। চট করে গোটা ব্যাপারটা একবার ভেবে নিলাম। এমনিতেই সর্দারজির ওপর যথেষ্ট জুলুম করা হয়েছে। এখন সুমনাকে নিয়ে দেড় দু'মাইল রাস্তা হাঁটব, তাকে পৌঁছে দিয়ে অতটা রাস্তাই হেঁটে ফিরতে হবে। তার মানে তিন চার মাইল যাতায়াত করতে কম করে দেড়টি ঘন্টা লেগে যাবে। তা ছাড়া সুমনাদের বাড়ি গিয়ে নতুন ঝামেলায় ফেঁসে যাব কিনা, তাই বা কে বলবে। এতটা সময় সর্দারজিকে একা একা বসিয়ে কষ্ট দেবার কোনো মানে হয়! লোকটা কোমরের তলায় একটা ঢলঢলে ইজের ঝুলিয়ে প্রায় নাগা সন্ন্যাসী হয়ে বসে আছে। চারদিকের মশারা একবার টের পেলে রক্ষে নেই, ঝাঁকে ঝাঁকে হানা দিয়ে সর্দারজির রক্ত শুষে ছিবড়ে করে ছাড়বে। বললাম, 'তেল পেলে আপনি চলে যাবেন। আমাদের জন্যে বসে থাকতে হবে না। কখন ফিরতে পারব তার ঠিক নেই।'

'জি।' সর্দারজি ঘাড় কাত করল।

'আপনি মেহেরবানি করে পৌঁছে দিয়েছেন তার জন্যে বহুৎ বহুৎ সুক্রিয়া।'

'ও বাত ছোড়িয়ে—' আমাকে থামিয়ে দিয়ে সর্দারজি বলল, 'দোস্তকা লিয়ে সব কুছ করনা পড়তা। হ্যায় না?'

আমরা বাস থেকে সামনের দিকে ফরোয়ার্ড মার্চ শুরু করলাম। মিনিট পনের হাঁটবার পর সুমনার কথামতো বি-টি রোড থেকে ডান দিকের একটা সরু রাস্তায় ঢুকলাম। তারপর নানা অলিগলি পেরিয়ে, কখনও ঝোপঝাড় ঠেলে আরো আধঘন্টা বাদে যেখানে এসে পৌঁছুলাম সেটা একটা ভূতুড়ে চেহারার একতলা বাড়ি। কোথাও আলো-টালো চোখে পড়ছে না। বাংলা তিথি-ফিতির খবর রাখি না। অতএব মহাশয়গণ বলতে পারব না, এখন পূর্ণিমা না অমাবস্যা। তবে আকাশে চাঁদ-টাদ নেই। অগুনতি তারা কালো ক্যানভাসের ওপর রুপোর চুমকির মতো ফুটে আছে।

যে বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে আছি, আন্দাজে বুঝলাম সেটা পুরনো ব্যারাক জাতীয় কিছু। ইংরেজি 'এল' অক্ষরের মতো তার চেহারা। মনে হচ্ছে অনেক ঘরটর আছে

বাড়িটায়।

সুমনা আমাদের নিয়ে ডান দিকের একটা ঘরের কাছে গিয়ে দরজায় টোকা দিল। ভেতরে নিস্তেজ হেরিকেন-টেরিকেন জ্বলছিল, দরজার ফাঁকে আবছামতো আলোর রেখা আটকে আছে।

টোকা দেবার সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে চাপা গলায় কেউ বলল, 'কে?' গলাটা কোনো বয়স্ক মেয়েমানুষের।

সুমনা আস্তে করে বলল, 'আমি—'

'সুমি?'

'হ্যাঁ।'

সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল। হাতে কালিপড়া হেরিকেন ঝুলিয়ে একটি মেয়েমানুষ বেরিয়ে এল। গলার স্বর শুনে যা আন্দাজ করা গিয়েছিল তা-ই। মেয়েমানুষটির বয়স চুয়াল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ। পরনে আধময়লা একটা থান আর মোটা লংক্লথের সেমিজ। ভাঙাচোরা মুখ, চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা। শরীরে মাংসের চাইতে হাড় বেশি। কণ্ঠা দুটো মাস্তুলের মতো ফুটে বেরিয়েছে। দু চোখে মাছের আঁশের মতো কি যেন রয়েছে। ধোঁয়াটে কালি-লেপা হেরিকেনের ঝাপসা আলোয় ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, তবে এটুকু মনে হচ্ছে মেয়েমানুষটা খুব সম্ভব ভাল দেখতে পায় না। নাকি অন্ধই? সুমনা যে বলেছিল তার একটা বিধবা দিদি আছে, এ বোধ হয় সে-ই।

মেয়েমানুষটা বলল, 'আজ তোর এত দেরি হল?'

'লাস্ট ট্রেন ধরতে পারিনি।'

'লাস্ট ট্রেন ধরতে না পারলেও তো এর চাইতে ঢের আগেই আসিস। এখন কত রাত জানিস? একটু আগে থানার ঘড়িতে দুটো বাজল। তোর জন্যে বসে থেকে থেকে যা ভাবনা হচ্ছিল!'

'আজ আগে ফেরার অসুবিধে ছিল।'

'কি অসুবিধে?'

'পরে শুনো—'

'তোকে কে পৌঁছে দিলে, খুবলালজি?'

'না অন্য লোক—'

'কে?'

'তুমি চিনবে না। ওঁরা আমার সঙ্গে রয়েছেন। রাস্তা ছাড়, ভেতরে যাব।'

মেয়েমানুষটা রাস্তা ছেড়ে একপাশে দাঁড়াল। সুমনা আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। বোদা আর আমি তার পেছনে। ঘাড় ফিরিয়ে সে বলল, 'আসুন—'

আমি বললাম, 'আর গিয়ে কি হবে। তোমাকে পৌঁছে দেবার কথা, পৌঁছে দিয়েছি। এবার আমরা যাই।'

সুমনা বলল, 'কী করে যাবেন, সর্দারজিকে তো চলে যেতে বললেন।'

হে-হে মহাশয়গণ, আপনারা নিশ্চয়ই এতক্ষণে ধরে ফেলেছেন, কোনো সমস্যাই আমাকে তেমন দুশ্চিন্তায় ফেলতে পারে না। যেভাবেই হোক, তার থেকে বেশ হাসতে হাসতেই বেরিয়ে আসতে পারি। কিন্তু এই বালিকা অর্থাৎ সুমনা তো তা জানে না, কতটুকু সময়ই বা সে আমাকে দেখেছে! বললাম, 'তাব জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না। বি-টি রোড গিয়ে ট্রাক-ফ্রাক থামিয়ে ঠিক ম্যানেজ করে চলে যেতে পারব।'

এই সময় বোদা বলে উঠল, 'গুরু আমি আর হাঁটতে পারব না। আজ রাত্তিরের মতো এখানেই দেহরক্ষা করতে চাই। তবে তুমি যদি আমাকে নিতেই চাও সতীর মতো কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে যেতে হবে।'

সুমনা বলল, 'এত রাত্তিরে যাবার দরকার নেই। এখানেই আপনাদের শোবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

আমি দেখলাম বোদা যেরকম হাঁটু ভেঙে 'দ' হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর হুইস্কি এবং বেঙ্গলের নেশায় যেভাবে তার মাথা টলছে তাতে ওকে কলকাতায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া দারুণ ঝামেলার ব্যাপার। এখন দুটো বেজে গেছে, আর ঘন্টা তিনেক পরেই তো ভোর হয়ে যাবে। বি-টি রোডের ট্রাকগুলোর ওপর হুজ্জুৎ করে কলকাতায় পৌঁছুতে পৌঁছুতে তিনটে কি আর বেজে যাবে না? দু'ঘন্টা আগে যাওয়াও যা, ভোরে উঠে যাওয়াও তাই। হে-হে মহাশয়গণ, আপনারা তো জানেনই, এত রাত্তিরে আমরা দুই ফেরেববাজ মাতাল না ফিরলেও কলকাতার সুখনিদ্রায় একটুও চিড় ধরবে না। আমাদের জন্য আজকের মতো সেখানে কোনো রাজকার্যও পড়ে নেই। অতএব বাকি রাতটুকু কাটিয়ে দেওয়া যেতে পারে। সুমনার দিকে ফিবে বললাম, 'কিন্তু তোমাদের এখানে আমাদের থাকার জায়গা হবে কি?'

সুমনা বলল, 'এ বাড়িতে দুটো ঘর খালি পড়ে আছে। একটা ঘরে আপনাদের বিছানা করে দেব। আসুন—' বলেই সেই মাঝবয়সী মেয়েমানুষটির পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে তাকে বলল, 'মা এখন কেমন আছে রে দিদি?'

আগেই আন্দাজ করা গিয়েছিল, এই মধ্যবয়সিনী সুমনার দিদি। সে বলল, 'জ্বরটা সন্ধের দিকে একটু কমেছিল, তারপর আবার চড় চড় করে বেড়েছে। একটু আগেও জ্বরের ঘোরে তোর কথা বলছিল। কেন এত রাত হচ্ছে, কেন এখনও ফিরলি না—এই সব। ঘন্টাখানেক হল ঘুমোচ্ছে।'

সুমনা আর কিছু জিজ্ঞেস করল না। ঘরের ভেতরে ঢুকে গেল। তার সঙ্গে আমরাও ঢুকলাম।

ঘরটা বেশ বড়। মিনিমাম কুড়ি ফুট বাই ষোল ফুট হবে। হেরিকেনের লালচে নিস্তেজ আলোয় চোখে পড়ছে, পুরনো আমলের চওড়া চওড়া দেওয়াল গুলোর গায়ে বেশির ভাগ জায়গাতেই প্লাস্টাব নেই, ভেতরের ছোট ছোট ইটে নোনা লেগেছে। কোণে কোণে প্রচুর ঝুল জমে আছে। এখানে ওখানে সিলিং-এ ধোঁয়া এবং কালির দাগ। তৈরি হবার পর থেকে এ ঘরে আর বোধ হয় হোয়াইট ওয়াশ-টোয়াশ করা হয় নি।

লক্ষ করলাম, ঘরটার দু'ধারে দু'খানা তক্তাপোষে কালচে মশারি খাটানো রয়েছে।

একটা মশারির ভেতরে মনে হল, কেউ ঘুমোচ্ছে। খুব সম্ভব সুমনার মা। উল্টোদিকের তক্তাপোষটা এখন খালি। নিচে মেঝেতে ঢালাও বিছানা পড়েছে। সেখানে অবশ্য মশারি-টশারি নেই। নানা বয়েসের অনেকগুলো ছেলেমেয়ে চাদর কিংবা শাড়ি মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। আর কোটি দুয়েক মশা চারদিক থেকে তাদের ছেঁকে ধরেছে। বুঝতে পারছি এরাই সুমনার দিদির ব্রিগেড। হয়ত এদের মধ্যে সুমনার ছোট বোনটাও রয়েছে। আরেক ধারে দেয়াল ঘেঁষে একটা পাল্লাভাঙা কাঠের আলমারি, আলনা, সস্তা কাঠের টেবিল, আয়না, চিরুনি, পাউডারেব কৌটো, ক্রিমের শিশি। তার পাশে একটা র‍্যাকে রবীন্দ্রনাথের একটি ছবি, তার তলায় কিছু বই-টই, মাসিক পত্রিকা।

সুমনা ওধারের তক্তাপোষটা দেখিয়ে আমাদেব বলল, 'ওখানে একটু বসুন। আমি আসছি।' বলেই আলনা থেকে একটা শাড়ি, ব্লাউজ, সায়া এবং গামছা নিয়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেল। মিনিট দশেক বাদে যখন সে ফিরল দেখলাম চুলটুল ভেজা, কপালে-গালে কণা কণা জল জমে আছে। অর্থাৎ স্নান করে এসেছে। একটু আগের শার্ট ফার্ট ছেড়ে শাড়িটাড়িও পরেছে। গামছা-টামছা একধারে নামিয়ে রেখে আমার শার্টটা হাতে নিয়ে কাঁচুমাচু মুখে সে বলল, 'এটা কী করব বলুন তো?'

বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস কবলাম, 'কী কববে?'

'আমি গায়ে দিয়েছিলাম। যদি বলেন ধুয়ে দিই। সকালের মধ্যে শুকিয়ে যাবে।'

'ধোবার দবকার নেই।'

'কিন্তু—'

'কী?'

কাছে এসে নীচু বিষণ্ণ গলায় সুমনা বলল, 'আপনি তো জেনেই ফেলেছেন আমি নোংরা বাজে মেয়ে—'

সুমনার মনোভাবটা বুঝতে পারছিলাম। বললাম, 'তোমার কি ধারণা আমি একটা দারুণ সাধু-টাধু টাইপের লোক? খোদ ভগবান কপালে মহাপুরুষের রাবার স্ট্যাম্প মেরে আমাকে ওয়ার্ল্ডে পাঠিয়েছে? তুমি তো জানো না, আমি শালা কিরকম মাল। ভয় নেই, তুমি গায়ে দিয়েছ বলে শার্টটাব জাত যায় নি। ধুয়ে ওটাকে আর পবিত্র-টবিত্র করতে হবে না। দাও—' হাত বাড়িয়ে সুমনার কাছ থেকে জামাটা নিলাম।

সুমনা একটু ভেবে এবার বলল, 'আপনারা হাত-মুখ ধুয়ে নিন, ততক্ষণে ভাতে ভাত চাপিয়ে দিই।'

'না-না, কিচ্ছু করতে হবে না।'

এতক্ষণ সুমনাব দিদি একপাশে দাঁড়িয়ে চুপচাপ সব শুনে যাচ্ছিল। এবার সে বলে উঠল, 'তাই কখনো হয়?'

সুমনাও বলে উঠল, 'কেরোসিনেব কুকাব আছে, আধ ঘন্টাব মধ্যে ভাত হয়ে যাবে।'

'সত্যি সত্যি আমাদের খাওয়ার দবকার নেই। তোমার সঙ্গে দেখা হবার ঠিক আগেই আমরা রেস্তোরাঁ থেকে খেয়ে এসেছিলাম। স্টমাকে ফার্স্ট ক্লাস একখানা ডিনার রয়েছে।'

সুমনা আমার কথা বিশ্বাস করলা কিনা কে জানে। সে আর জোর-টোর করল না। শুধু বলল, 'আপনারা আরেকটু বসুন। আমি ওধারের ঘরে আপনাদের বিছানা করে দিয়ে আসছি।' পাল্লাভাঙা আলমারির ভেতর থেকে এক গাদা কম্বল বালিশ আর মশারি বার করল সে। এক কোণ থেকে আরেকটা হেরিকেন এনে জ্বালিয়ে নিল। তারপর বিছানাপত্তর কাঁধে চাপিয়ে হাতে হেরিকেনটা ঝুলিয়ে বেরিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। সুমনার দিদি যেমন দাঁড়িয়ে ছিল তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ বলল, 'আপনারা কলকাতা থাকেন বুঝি?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ।'

'সুমির সঙ্গে অনেক দিনের চেনাশোনা?'

বুঝতে পারছি সুমনার দিদি আমাদের সম্বন্ধে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। যে রকম ভণিতা-ফণিতা করে সে শুরু করেছে তাতে মনে হয় আমরা কে, সুমনার সঙ্গে আমাদের কিভাবে কোথায় আলাপ-টালাপ হয়েছে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এসব জানতে চাইবে। তখন কী কথার জবাব দিয়ে বসব আর তাতে হয়ত সুমনা ক্যাঁচাকলে পড়ে যাবে। তার চাইতে এ ঝামেলায় না যাওয়াই ভাল। বললাম, 'সুমনার কাছ থেকেই জেনে নেবেন।'

গলার ভেতর থেকে অস্পষ্ট জড়ানো একটা শব্দ বেরিয়ে এল মেয়েমানুষটার। তার চোখে মাছের আঁশের মতো যে সাদাটে পুরু সর জমেছে. তার ওপর একটা সন্ধিগ্ধ ছায়া খেলে বেড়াতে লাগল। কপাল কুঁচকে পাঁচ সাতটা ভাঁজ পড়ল। আমার কথায় কিসের যেন একটা গন্ধ পেল সে। তবে আর কিছু বলল না।

কয়েক মিনিট পর হেরিকেন হাতে সুমনা ফিরে এল। দুটো গামছা কোত্থেকে জোগাড় করে বলল, 'আসুন—'

চটপট আমরা উঠে পড়লাম। সুমনার সঙ্গে বাইরে এসে তার পিছু পিছু একটা কুয়োর পাড়ে চলে এলাম।

সুমনাই কুয়ো থেকে জল তুলে দিল। আমাদের হাতমুখ ধোয়া এবং মোছাটোছা হয়ে গেলে সে বলল, 'চলুন, আপনাদের ঘরটা দেখিয়ে দিয়ে আসি। আর রাত বাড়িয়ে দরকার নেই।' বলেই সে বাঁ দিকে পা বাড়িয়ে দিল।

এবার সুমনার সঙ্গে ব্যারাকবাড়ির যে ঘরটায় আমরা এলাম সেটা বেশ বড়সড়ই, মাপে আগের ঘরটার মতোই হবে। কম করে কুড়ি বাই ষোল। তবে এ ঘরের পেছন দিকের দুটো জানালার পাল্লা নেই, লোহার গরাদ কারা খুলে নিয়ে গেছে। ঘরটা একেবারে ফাঁকা। কেউ এখানে থাকে-টাকে বলে মনে হয় না। মেঝেতে দেখলাম, বেশ বড় একটা বিছানা পাতা, সেই মাপের একটা মশারি তার ওপর টাঙানো।

সুমনা বলল, 'এত কষ্ট করে বাড়ি পৌঁছে দিলেন কিন্তু কিছুই খেলেন না। আমার খুব খারাপ লাগছে।'

বুঝতে পারছি খাওয়াতে পারে নি বলে সুমনার মনে একটা খুঁতখুঁতানি থেকে গেছে। হেসে হেসে বললাম, 'ঠিক আছে, তোমার সঙ্গে আলাপ হল। পরে যদি দেখা হয়, খাইয়ে দিও।'

'পরে না, কালই। কাল না খেয়ে আপনারা যেতে পারবেন না।'

'কালকের কথা কাল ভাবা যাবে। টেরিফিক ঘুম পেয়েছে, আমি আর দাঁড়াতে পারছি না।' বলেই বিছানায় গিয়ে টানটান হয়ে শুয়ে পড়লাম।

'আমিও লেটে যাচ্ছি গুরু—' বোদাও বিছানায় ঢুকে মশারি ফেলে গুঁজে গুঁজে দিতে লাগল।

সুমনা জিজ্ঞেস করল, 'হেরিকেনটা রেখে যাব? যদি পরে দরকার হয়—'

বললাম, 'রাখতে পার। তবে দরকার হবে না। এই যে বডিখানা ফেললাম, কাল সকালের আগে আর উঠছি না।'

ঘরের এককোণে হেরিকেনটা নিভু নিভু করে রেখে চলে গেল সুমনা।

এখন বোদা আর আমি একই বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে আছি। আমার চোখ ঘন আঠায় জুড়ে আসছিল। হঠাৎ বোদা ডাকল, 'গুরু—'

ঘুমন্ত গলায় সাড়া দিলাম, 'কী বলছিস?'

'আমার কিন্তু খিদে পেয়েছে।'

'সে কি রে! সমাজপতির ঘাড় ভেঙে আস্ত রেস্তোরাঁটাই তো তখন গিলে এলি। এর মধ্যে আবার খিদে!'

'কখন খেয়েছি ভেবে দ্যাখো– '

'ঘন্টা পাঁচেকও তো হয় নি। শালা তোমার পেটে দেখছি একখানা ফার্নেস জ্বলছে।'

বোদা ফ্যাক ফ্যাক করে একটু হাসল, কিছু বলল না।

আমি বলতে লাগলাম, 'একা সাতজনের ডিনার খাবার পর পাঁচ ঘন্টার মধ্যে যদি আবার খিদে পেয়ে যায় আর দেখতে হবে না, গভর্ণমেন্টের হাতে তোরাই হেরিকেন ধরিযে দিবি।'

বোদা হাসতেই লাগল।

আমি আবার বললাম, 'খিদে পেয়েছে, তখন বললি না কেন? ওরা তো ভাত চড়িয়ে দিতে চেয়েছিল।'

নাকের ভেতর তাচ্ছিল্যসূচক একটা শব্দ করল বোদা, 'ধুস—'

'কী হল?'

'সুপ, ফ্রায়েড রাইস, ফ্রাই, চিলি চিকেন খাওয়ার পর সেদ্ধ ভাত খেতে ইচ্ছে করে? তুমিই বল দাদা—'

'শালা তোমাকে নিয়ে ফিউচারে আমার বহুৎ ঝামেলা আছে দেখছি।'

বোদা বলল, 'ঝামেলা থাকবে কেন গুরু? তুমিই তো বলেছ দুনিয়ায় অনেক ভাল ভাল খাবার আছে, কৌশল করে আমাদের সে সব খেয়ে যেতে হবে। ভাবছি এখন থেকে চিকেন ফিকেন ছাড়া কিছু খাব না।'

ওর কথা শুনতে বেশ মজা লাগছিল। রগড়ের গলায় বললাম, 'টেরিফিক ভেবেছিস। কিন্তু এখন চিকেন-টিকেন কোথায় পাবি বল? সমাজপতিকেই বা কোথায় পাওয়া যাবে? ও সব খেতে হলে ভাঙবার মতো একটা ঘাড় তো দরকার। এক কাজ কর—'

'কি—'

'আইসক্রিম, ফ্রায়েড রাইসের স্বপ্ন দেখতে দেখতে আর হাত চাটতে চাটতে আজকের মতো ঘুমিয়ে পড়—'

আচমকা খুক খুক করে হেসে উঠল বোদা, 'তুমি গুরু আমাকে ড্রিমে চিকেন, ফ্রায়েড রাইস খেতে বলছ!'

'ইয়েস।'

'ড্রিমে নয়, সত্যিসত্যিই ফিশ ফ্রাই আর চিলি চিকেন খাব।'

মাথা-টাথা খারাপ হয়ে গেল না কি ছোকরার? বললাম, 'পাবি কোথায়?'

বোদা সেইরকম শব্দ করে আবার হাসল, 'গুরু তোমার পার্টনার হবার পর আমার ব্রেনেও আজকাল দারুণ স্পার্ক মারছে। তুমি যখন চুটিয়ে সমাজপতির চামচাগিরি করছিলে সেই ফাঁকে চারটে ফ্রাই আর দুটো চিলি চিকেন হাতমোছা কাগজে মুড়ে পকেটে পুরে ফেলেছিলাম। এই নাও তুমিও একটু খাও।' সঙ্গে সঙ্গে খচমচানি আওয়াজ পাওয়া গেল। মনে হল কাগজের মোড়ক খুলছে বোদা।

হঠাৎ আমার মাথার ভেতর কট করে কোথায় যেন একটা শির কেটে গেল। ঝাঁ করে নিজের অজান্তেই বিছানায় উঠে বসলাম। হাত বাড়িয়ে মশারির বাইরে নিভু নিভু হেরিকেনটা উসকে দিয়ে বললাম, 'শালা ছ্যাঁচড়া—'

বোদাও হকচকিয়ে উঠে বসেছিল। সে বলল, 'কী হল?'

উত্তেজনায় আমার সব রক্ত মাথায় গিয়ে জমা হয়েছিল, ঘাড়ের কাছে বিপজ্জনক একটা রক্তচাপ টের পাচ্ছিলাম। তীব্র গলায় বললাম, 'হারামী ছিঁচকে চোর—'

বোদা আবকই হয়ে গেছে এবং যথেষ্ট ভয়ও পেয়েছে। ভীতভাবে সে বলল, 'তুমি ও রকম খেপে যাচ্ছ কেন মাইরি?'

আমি প্রায় চেঁচিয়েই উঠলাম, 'খেপব না! কে তোকে চুরি করে ফ্রাই-ট্রাই আনতে বলেছে? লোকের মাথায় চক্কর লাগিয়ে নিশ্চয়ই খাবি। তাই বলে শালা চুরি করবি? আমার সঙ্গে থাকতে হলে এ সব বন্ধ করতে হবে। নো সেভিংস বিজনেস, মানে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করা চলবে না।'

বোদা ভয়ে ভয়ে ঘাড় কাত করল।

আমি চেঁচিয়ে যাচ্ছি, 'একটা কথা মনে রাখবে শালা, আমাদের পাস্ট নেই, ফিউচার নেই। আমাদের একটাই টেন্স—প্রেজেন্ট টেন্স। নো লুকিং ফরোয়ার্ড, নো লুকিং পাস্ট, সামনে বা পেছনে তাকানো চলবে না। যাও মাকড়া, চুরির মাল ফেলে দিয়ে এস।'

আমার কথা কতটা বোদা বুঝল, সে-ই জানে। আদৌ বুঝল কি না, তাও সে-ই বলতে পারবে। ইঁদুরের মতো নিঃশব্দে উঠে গিয়ে জানালা গলিয়ে খাবারের প্যাকেটটা ফেলে ফিরে এল।

আমি হেরিকেনের তেজ কমিয়ে আবার শুয়ে পড়লাম। বোদাও শুয়ে পড়েছে। খানিক্ষণ চুপচাপ।

তারপর আমি পিটার স্বয়ম্ভু হোড়, একজন থার্ড ক্লাস প্রতারক, একেবারে দার্শনিকের মতো গলা করে রীতিমত গম্ভীর চালে বোদাকে লম্বা একখানা বক্তৃতা ঝেড়ে দিলাম। আমার ফিলজফিক লেকচারের সারমর্ম এইরকম। রোজ নতুন নতুন কৌশল উদ্ভাবন করে আমরা সেরা খাবার খাব, সেরা পোশাক পরব। কিন্তু কিছুই জমানো টমানো চলবে না। নো মানি, নো ফুড, নাথিং। আজ এক টাকা জমলে কাল পঞ্চাশ টাকা জমাতে ইচ্ছে করবে, পরশু হাজার টাকার কথা ভাবব, তারপর দিন লাখ টাকা, তারও পর কোটি টাকা। টাকার সঙ্গে অন্য জিনিসও জমানোর ভাবনা মাথায় সুড়সুড়ি দেবে। আর এই জমানো থেকে যত প্রবলেম—সোস্যাল, ইকনমিক, ন্যাশনাল, ইন্টারন্যাশনাল ইত্যাদি ইত্যাদি। অতএব নো জমানো কারবার।

লম্বা বক্তৃতা শেষ করে আমি থামলাম। বোদা অদ্ভুত শব্দ করে গুঙিয়ে উঠল। বুঝলাম পাথরের চাংড়ার মতো টেরিফিক ওজনওলা এই বক্তৃতার প্রেসার মাথায় পড়তেই গলা দিয়ে গোঙানিটা বেরিয়ে এসেছে।

আবার খানিক্ষণ চুপ। গাঢ় ঘুম গভীর দীঘির মতো যখন আমাকে তলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সেই সময় বোদার গলা শোনা গেল, 'গুরু—'

'কী?' ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই সাড়া দিলাম।

একটু চুপ করে থেকে বোদা বলল, 'কাল অন্ধকার থাকতে থাকতেই ওদের না জানিয়ে কেটে পড়তে হবে।'

অর্থাৎ সুমনাদের না জানিয়ে সরে পড়তে চাইছে বোদা। বললাম, 'কেন রে?'

'ফ্যামিলিটা দেখেছ?'

'দেখেছি।'

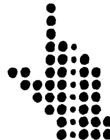
'মা'র হেভি অসুখ, বিধবা দিদির চোখদুটো আঁশফলের মতো সাদা—বোধ হয় অন্ধ তার অতগুলো লেণ্ডিগেণ্ডি, ছোট একটা বোন। আর সুমনা ওই কারবার করে সংসার চালায়—'

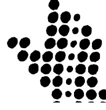
'তাতে কী হয়েছে?'

'সকালে উঠে হয়ত আবার কোন ফ্যাসাদ কাঁধে চেপে যাবে।'

কথাটা একেবারে খারাপ বলে নি বোদা। শালা দেখছি দারুণ ভবিষ্যৎদ্রষ্টা। কিন্তু এখন আর কিছুই ভাবতে ইচ্ছা করছে না। বললাম, 'এখন ঘুমো তো। কাল সকালে উঠে ভাবা যাবে কী করব।' বলেই পাশ ফিরলাম।

বোদা আর কিছু বলল না।





আমার যখন ঘুম ভাঙল, সকাল হয়ে গেছে। তবে রোদ-টোদ এখনও ওঠে নি। পাশ ফিরে দেখলাম দুই হাঁটু বুকের কাছে এনে ঘাড়-মুখ গুঁজে ঘুমোচ্ছে বোদা। মাকড়াটা বলেছিল অন্ধকার থাকতেই উঠে পালাবে।

একটু হাসলাম, বোদার নাকে আলতো করে একটা টোকা দিলাম। তবে ঘুমটা আর ভাঙালাম না।

বাইরে থেকে হাঁস-মুরগির ছানার মতো অগুনতি কাচ্চাবাচ্চার ক্যাচম্যাচানি ভেসে আসছিল। তা ছাড়া নানা লোকের কথাবার্তার শব্দও শোনা যাচ্ছিল। এই সকালবেলায় কোথায় যেন একটা ঝগড়া লেগেছে। চিৎকার-চেঁচামেচিতে কানের পর্দা চৌচির হয়ে যাচ্ছে।

কিছুক্ষণ লম্বা হয়ে পড়ে রইলাম। তারপর হাজার রকম শব্দের কনসার্ট শুনতে শুনতে উঠেই পড়লাম। হাই তুলে তুড়ি দিয়ে দিয়ে সেটাকে তোয়াজ করতে করতে একটু পর বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম।

কাল রাত্তিরে যা আন্দাজ করেছিলাম তা-ই। বাড়িটা নবাবী আমলের ব্যারাকের মতো। মোটা মোটা দেওয়াল, অগুনতি ঘর। বাড়িটা এত পুরনো যে দেয়াল থেকে চুণবালি খসে গেছে। ভিতে এবং ছাদে যেখানে এতটুকু ফাঁক পেয়েছে বট, অশ্বথ আর আগাছার জঙ্গলশকড় চালিয়ে দিয়েছে। কার্নিসে বর্ষার জল আর শ্যাওলার শুকনো দাগ।

বাড়িটার সামনের দিকে প্রকাণ্ড ন্যাড়া উঠোন, একটা ঘাসের শিষও সেখানে চোখে পড়ে না। উঠোনটার মাঝখানে একটা ঝাড়ালো রেন-ট্রি দাঁড়িয়ে আছে। এক ধারে দুটো কুয়ো চোখে পড়ল।

বাড়িটার কোনো কম্পাউণ্ড-ওয়াল নেই। উঠোনের সীমানা পেরুলেই রাস্তা। তার ওধারে খানিকটা জলা জমি ঘিরে রিফিউজিদের কলোনি। এখানে আগে আর কখনও আসি নি। তবু কলোনির বাড়িঘরের চেহারা দেখে ওটা যে রিফিউজিদের উপনিবেশ শনাক্ত করে ফেললাম। রাস্তা ধরে ডাইনে বাঁয়ে তাকালে আরো বাড়িঘর চোখে পড়ে। তবে বাড়িটার তুলনায় ফাঁকা জমি, ডোবা-টোবাই এখানে বেশি।

এই মুহূর্তে ব্যারাক-বাড়িটার ঘরগুলো থেকে গাদা-গাদা বাচ্চাকাচ্চা বেরিয়ে এসে উঠোনময় জীবাণুর মতো কিলবিল করছে। আর দেখা যাচ্ছে ভাঙাচোরা ক্ষয়ে-যাওয়া চেহারার অনেক পুরুষ এবং মেয়েমানুষ। প্রত্যেকটা ঘরের সামনেই ঘেরা বারান্দা। দেখে মনে হচ্ছে ওগুলো একই সঙ্গে ডাইনিং-কাম-ড্রইংরুম এবং কিচেনও। এই সকালবেলাতেই ঘরে ঘরে উনুন ধরানো হয়েছে। ফলে চারদিক ধোঁয়ায় ধোঁয়াক্কার। দশ মেগাটনের একখানা বোমা ফাটালেও এত ধোঁয়া বেরুবে কিনা সন্দেহ। ওধারে রাস্তায় একটা বারোয়ারি কল

ঘিরে অনেকগুলো মেয়েমানুষ গলার শির ছিঁড়ে চেঁচিয়ে ঝগড়া করছে। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝগড়ার ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিক শুনলাম। তারপর রাস্তার দিক থেকে ঘাড় ফিরিয়ে কোণাকুণি ব্যারাকটার দিকে তাকালাম। কি আশ্চর্য, এতক্ষণে সুমনার কথা মনে পড়ল। অথচ আনক আগেই, ঘুম ভাঙবার পরই তার কথা ভাবা উচিত ছিল।

কিন্তু সারি সারি একই চেহারার এতগুলো ঘরের মধ্যে কোনটা সুমনাদের, বুঝতে পারছি না। সুমনা কি এখনও ঘুম থেকে ওঠে নি? উঠলে নিশ্চয়ই দৌড়ে আসত।

দেখতে দেখতে সূর্য উঠে গেল। আকাশের গা চিরে ফিনকি দিয়ে খানিকটা তাজা ঝলমলে রোদ এসে রেন-ট্রিটার মাথায় আটকে গেল, সেখান থেকে ক্রমশ এনিয়ে এসে বাড়িটায় ছড়িয়ে পড়ল। ওদিকে প্রায় সবগুলো ঘরেই উনুনের ধোঁয়া কেটে গিয়ে চায়ের আসর বসেছে। হাঁস-মুরগির ছানার মতো সেই বাচ্চাগুলো উঠোন থেকে যে যার ঘরে গিয়ে খাওয়ার জন্য মা-বাপকে ছেঁকে ধরেছে। গ্রেট ফিলজফারের মতো আমি পিটার স্বয়ম্ভু হোড় দারুণ নিরাসক্তভাবে চারদিকের দৃশ্যাবলী দেখতে লাগলাম।

আচমকা ঘাড়ের পাশ থেকে বোদা ডেকে উঠল, 'গুরু—'

সঙ্গে সঙ্গে বাসি মদের এক ঝলক পচাটে গন্ধ নাকে এসে লাগল। আমি ঘাড় ফেরালাম।

বোদা ঘুমের ঘোরে বড় বেশি এপাশ-ওপাশ করে। ফলে ওর ট্রাউজার্স-ফাউজার্স চটকে মটকে আছে। বিছানা ছেড়ে সে উঠে পড়েছে কিন্তু ঘুমন্ত ভাবটা এখনও কাটে নি, সারা গায়ে ঘুমটা কামড়ে বসে আছে। কাল রাত্রে স্কচ হুইস্কি এবং পশ্চিমবঙ্গের কোনো লক্কড় ভাটিখানায় উৎপন্ন বাংলা মাল খেয়েছিল বোদা। পাকস্থলীতে গিয়ে দিশি আর বিদেশি পাঞ্চ হয়ে গিয়েছিল, চোখেমুখে এখনও তার খোয়ারি লেগে রয়েছে। প্রায় প্রতিটি ঘরের গাদা গাদা কাচ্চাবাচ্চা দেখিয়ে সে বলল, 'গুরু কত লেণ্ডিগেণ্ডি দেখেছ! একেকটা ঘরে যেন একেকটা পোলট্রি।'

একদা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর, এখনকার ইণ্ডিয়া বা ভারত প্রজাতন্ত্রের বিগেস্ট মেট্রোপলিস এই কলকাতায় লাইফের পঁচিশ তিরিশটা বছর কাটিয়ে দিলাম। মনে আছে ইণ্ডিপেনডেন্সের বছরে এবং তারিখে অর্থাৎ উনিশ শ সাতচল্লিশের পনেরই আগস্ট দার্জিলিং মেলে চেপে আমি কলকাতায় এসেছিলাম। মহাশয়গণ, কলকাতায় আমার আগমন একটা ঐতিহাসিক ঘটনা—এটা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন। কিন্তু আমার দারুণ আপসোস ইণ্ডিয়ার হিস্ট্রিতে এত বড় একটা ঘটনার কথা কোথাও খুঁজে পাবেন না। ইতিহাস আবার নতুন করে লেখা উচিত, না কি বলেন? যাক গে, যা বলছিলাম, ইণ্ডিপেনডেন্সের বছর কলকাতায় আসার পর দেখেছিলাম এই শহরে হু-হু করে মানুষ বেড়ে যাচ্ছে। পপুলেশন একসপ্লোসান কাকে বলে, কলকাতা প্রতি মুহূর্তে টের পাইয়ে দিচ্ছিল। এক পা হাঁটতে এখানে চারটে লোকের সঙ্গে ধাক্কা লেগে যায়। বাড়ি-ঘর-রাস্তা-ফুটপাথ, সি-এম-ডি-এর পাইপ—যেখানেই তাকাবেন শুধু মানুষ, মানুষ আর মানুষ। এতকাল আমি হোটেলে থেকেছি, ধর্মশালায় থেকেছি। গেস্টহাউস রেস্টহাউস, চার্চ কিংবা গুরুদ্বারের ডরমিটরি—যখন যেখানে ঢুকতে পেরেছি সেখানেই থেকে গেছি। কিন্তু মানুষ

তৈরির ওয়ার্কশপগুলো যে কোথায় ঠিক জানতাম না। এই ব্যারাকবাড়িতে এসে তার একটা আঁচ পাওয়া গেল।

বোদার নাকে টুসকি মেরে তারিফের গলায় বললাম, 'ফাইন বলেছিস। এই শালারা আর কিছু পারুক আর না-পারুক দেশের জনবল ঠিক বাড়িয়ে যাচ্ছে।'

একটু ভেবে বোদা বলল, 'আর কি বাড়াচ্ছে বল তো গুরু ?'

'কী?'

'ভোটার। পাঁচ বছর পর পর একখানা করে ভোট দেবার জন্যে মাকড়ারা কি রকম জন্ম দিয়ে যাচ্ছে দেখছ গুরু!'

বোদার মাথাটা দারুণ খুলে যাচ্ছে। সঙ্গগুণ আর কাকে বলে। আদরের ভঙ্গিতে তার পিঠটা চাপড়ে দিলাম, 'তুই শালা একটা ন্যাশনাল অ্যাসেট। তোর মাথাখানা যেরকম খুলে যাচ্ছে আর দেখতে হবে না। জ্বালিয়ে দিবি।'

বোদা কি বলতে যাচ্ছিল, আচমকা সেই কথাটা তার মনে পড়ে গেল। ঝপ করে গলার স্বরটা নামিয়ে বলল, 'গুরু—'

'কী বলছিস—'

'আমরা এখনও এখানে আছি কেন?'

'কী করতে হবে?'

'কাল কী বলেছিলাম মনে নেই?'

'আছে। বলেছিলি অন্ধকার থাকতে থাকতেই কেটে পড়বি। কিন্তু ঘুম থেকে উঠলিই তো দাঁতে রোদ লাগিয়ে।'

'কাল শুলামই তো রাত আড়াইটার পর। তা ছাড়া বডির ওপর দিয়ে কত ঝামেলা গেছে তুমিই ভেবে দ্যাখো। ভোরে ওঠা যায়! যাক গে, এবার চল সটকে পড়ি।'

ঠিকই বলেছে বোদা। এখানে আর থাকার মানে হয় না। কাল রাত্তিরে সুমনার অবস্থা দেখে মনটা স্যাঁতসেঁতে হয়ে গিয়েছিল। স্রেফ ঝোঁকের মাথায় তাকে এখানে পৌঁছে দিতে এসেছিলাম। পৌঁছে দিয়েছি। ব্যস, ডিউটি শেষ। বোদা কাল বলেছিল এখানে বেশিক্ষণ থাকা ঠিক হবে না। সুমনাদের যা ফ্যামিলি তাতে মনে হয়েছে হোল ওয়েস্ট বেঙ্গলের যাবতীয় প্রবলেম ওদের কাঁধে চাপানো রয়েছে। এখানে বেশিক্ষণ থাকা মানেই ফেঁসে যাওয়া। বোদার সতর্কবাণী কানে না ঢুকিয়ে তবু যে রোদ ওঠার পরও দাঁড়িয়ে আছি সেটা নিজেরই অজান্তে। হয়তো সুমনাদের জন্য শরীরের গ্ল্যাণ্ডগুলো উইক হয়ে রয়েছে এখনও। কিন্তু এই উইকনেসকে আর বোধ হয় আস্কারা দেওয়া ঠিক হবে না।

হে-হে মহাশয়গণ, আমার ক্যারেক্টার তো আপনারা জানেনই। আমি একটা ওয়ার্ল্ড সিটিজেন, আজে এখানে, কাল ওখানে করে ভেসে বেড়াচ্ছি। আমি ঝাড়া হাত-পা লোক। মহাশয়রা আমার কোনো প্রবলেম নেই, প্রপার্টি নেই। অবশ্য বলতে পারেন আমার ব্রেনটাই আমার প্রপার্টি। দু-চারটে ট্রাউজার্স-ফাউজার্স, একটা হাওয়া বালিশ আর একটা বেড কভার, এগুলো অ্যাটাচি-কেসে পুরে গ্লোবট্রটারের মতো চারদিক প্রদক্ষিণ করে বেড়াচ্ছি।

মহাশয়রা,আমি কেন কলকাতা নামে এক প্রবলেম সিটির একটা ধসে-পড়া ফ্যামিলির সমস্যা ফমস্যায় ফেঁসে গিয়ে নিজের চরিত্র খারাপ করে ফেলব? কাল স্কচ আর বেঙ্গল একাকার হয়ে আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এখন গ্ল্যাণ্ডগুলো আবার চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। অতএব সরে পড়াই ভাল। বললাম, 'চল, সুমনার সঙ্গে দেখা হবার আগেই হড়কে যাই।'

উঠোনটা এখন একবারে ফাঁকা। যে যার ঘরের বারান্দায় চা-ফা খেতে এতই ব্যস্ত যে কেউ আমাদের লক্ষ করছে না। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি তারপর চারটে ঘর পেরিয়ে দশ পা গেলেই রাস্তা। একবার রাস্তায় নামতে পারলেই চোখের পলকে উধাও হয়ে যাব।

কিন্তু রাস্তায় নামা গেল না। তার আগেই আচমকা প্রকাণ্ড উঠোনের ওধারে কোণের দিকের একটা ঘরে কান্নাকাটির শব্দ শোনা গেল। পরক্ষণেই দেখা গেল সেই ঘরটা থেকে বেরিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে এদিকেই আসছে সুমনা। ওটাই যে সুমনাদের ঘর, এখন বোঝা গেল।

আমরা হকচকিয়ে গেলাম। পাঁচ সেকেণ্ডও লাগল না, উঠোন পেরিয়ে সুমনা আমাদের কাছে এসে পড়ল। তার চুল উস্কখুস্ক, চোখ টকটকে লাল, চোখের তলায় শ্যাওলার মতো কালচে দাগ । দেখেই টের পাওয়া যায় সারারাত মেয়েটা ঘুমোয় নি। তার সারা গায়ে উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তার ছাপ মারা

দারুণ হাঁপাচ্ছিল সুমনা। হাঁপাতে হাঁপাতেই বলল, 'আপনি শিগগির একবার আসুন—'

বললাম, 'কী হয়েছে?'

'মা বোধ হয় বাঁচবে না।'

'সে কি!'

'হ্যাঁ, দয়া করে আসুন—'

লক্ষ করলাম সুমনার চোখ জলে ভবে গেছে। হঠাৎ আমার মনে হল, এই ব্যারাকবাড়িতে তো গাদা গাদা লোক। একই সঙ্গে পাশাপাশি তারা থাকে। সবাইকে বাদ দিয়ে আমার কাছে ছুটে আসার কারণটা কী? মাত্র সাত-আট ঘন্টা আগে সে আমাকে দেখেছে। আমার কতটুকু জানে সুমনা? তবে কি প্রচুর ঝামেলা করে কাল রাত্রে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিলাম বলে মেয়েটা আমার ওপর নির্ভর করতে শুরু করেছে? বললাম, 'চল—'

উঠোন পেরুতে পেরুতে বোদা আমার কানে মুখ ঢুকিয়ে বলল, 'গুরু, এই ভয়টাই করেছিলাম। আমরা বোধ হয় টেরিফিক গাড্ডায় পা ঢোকালাম।'

আমারও তাই মনে হল। কিন্তু মহাশয়গণ, এই অবস্থায় কি সরে পড়া যায়? বোদার দিকে না তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হয়েছে তোমার মা'র? কাল রাত্তিরে দেখলাম ঘুমুচ্ছে।'

সুমনা বলল, 'ঘুমুচ্ছিল। হঠাৎ রাত তিনটে সাড়ে তিনটের সময় ঘুমটা ভেঙে গেল। তারপর শ্বাসকষ্ট শুরু হল। দিদি আর আমি পালা করে মালিশ করলাম। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। কিছুক্ষণ আগে দম আটকানোর মতো শব্দ করে অজ্ঞান হয়ে গেছে। এখন

মা'র গা বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, দেখে এলাম।'বলতে বলতে গলাটা কান্নায় বুজে আসতে লাগল তার।

আমি আর কিছু বললাম না। লক্ষ করলাম, চারদিকের ঘর থেকে কান্নাকাটির শব্দে অনেকে বেরিয়ে এসেছে। চোখের তারা স্থির করে তারা আমাকে আর বোদাকে দেখতে লাগল। খুব সম্ভব নতুন লোক দেখে অবাক হয়ে গেছে।

সুমনার ঘরে ঢুকে দেখলাম ওর দিদি, দিদির ছেলেমেয়েরা এবং ছোট বোনটা কাঁদছে। আমি সোজা যে তক্তাপোষটায় সুমনার মা শুয়ে ছিল সেখানে চলে এলাম। বয়েস খুব বেশি হবে না মহিলার, ষাট-বাষট্টির মতো। তবে শরীর ভেঙেচুরে গেছে। মহাশয়গণ, আমি আবার তেমন পড়াশোনা-টোনা করতে পারি নি, আমার বিদ্যে বড় জোর ফোর-ফাইভ পর্যন্ত। তবে স্ট্রাগল্ ফর একজিসটেন্স বলে একটা কথা মনুমেন্টের তলায় কোন এক নেতার মুখে যেন শুনেছিলাম। আমি মহাশয়রা যা একবার শুনি তা আর ভুলি না। সেই একজিসটেন্সের স্ট্রাগল ব্যাপারটা সুমনার মা'র সারা গয়ে নিজের রাবার-স্ট্যাম্প মেরে দিয়েছে।

আমাদের দেখে কান্নাটা একটু থামল। আমি গিয়ে সোজা সুমনার মা'র গায়ে হাত দিলাম, সত্যি গা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। গলার ভেতর থেকে কিছুক্ষণ পর পর অস্পষ্ট হিক্কার মতো একটা শব্দ বেরুচ্ছিল।

অসুখ বিসুখ কিংবা মৃত্যু-টৃত্যুর ব্যাপার দেখলে আমি দারুণ নার্ভাস হয়ে পড়ি। সুমনার দিকে ফিরে বললাম, 'ডাক্তার ডেকেছ?'

সুমনা আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল, 'না।'

'এক্ষুণি কাউকে পাঠিয়ে ডাক্তার ডেকে আনো।'

সুমনা মুখ নিচু করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হল?'

খুব আস্তে করে কাঁপা গলায় সুমনা এবার বলল, 'ডাক্তার ডাকবার টাকা নেই। কাল রাত্তিরে পুলিশ আসতে কে কোথায় গেল, টাকা পাই নি।'

একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'ঠিক আছে। তোমাদের এখানে ভাল ডাক্তার কে আছে?'

'প্রিয়তোষ মল্লিক। এই রাস্তাটা সোজা গিয়ে যেখানে বাঁক নিয়েছে সেই মোড়ের মাথায় তার চেম্বার।'

'এখন গেলে তাকে পাওয়া যাবে?'

'যাবে।'

বোদার দিকে ফিরে বললাম, 'চল ডাক্তার নিয়ে আসি।'

বোদা কিলোখানেক কুইনিন গেলার মতো মুখ করে বলল, 'চল—'

বাইরে বেরিয়ে দেখলাম, ব্যারাকবাড়ির আর কেউ নিজেদের ঘরে নেই। সব সুমনাদের ঘরের সামনে ভিড় করেছে। তারা সরে সরে রাস্তা করে দিল।

কিছুক্ষণ পর ডাক্তার প্রিয়তোষ মল্লিক, এম-বি-বি-এস (ক্যাল) ডি-জি-ও (ক্যাল) তার মোটরে করে আমাদের সঙ্গে সুমনার মাকে দেখতে এল।

সেদ্ধ আলুর মতো মসৃণ গোলগাল চেহারা ডাক্তারের—বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, মাথা জোড়া চকচকে টাক, টাকটি ঘিরে কাঁচাপাকা চুলের রেলিঙ, গায়ে ঢলঢলে প্যান্ট এবং কোট, চওড়া টাই এবং বগলে ধূসরবর্ণ একটি হ্যাট, শজারুর কাঁটার মতো গোঁফ—সুমনার মা'র জিভটিভ এবং চোখের কোল টেনে, কিডনি বুক এবং পিঠ পরীক্ষা করে পটাপট দুটো ইঞ্জেকসান দিয়ে ঘস ঘস করে ব্রাহ্মীলিপির মতো হরফে একটা প্রেসক্রিপশন লিখে ফেলল। সেটা আমার হাতে ধরিয়ে বলল, 'আমার ডিসপেন্সারি থেকে ওষুধগুলো কিনে নেবেন।'

কাগজের টুকরোটা পকেটে পুরলাম।

প্রিয়তোষ ডাক্তার আরেকটা কাগজে লিখল ফী আট টাকা, যাতায়াতের পেট্রোল বাবদ এক টাকা পঁচিশ পয়সা। মোট ন'টাকা পঁচিশ পয়সা। এবার আর হাতের লেখাটা ব্রাহ্মীলিপিতে নয়, পরিষ্কার অক্ষরে সেটিং-করা মুক্তো মতো সারি সারি সাজানো।

আমি মোহিত হয়ে গিয়েছিলাম। এভাবে কোনো ডাক্তার ফীয়ের টাকা নেয় বলে আগে শুনি নি। তার সঙ্গে আবার পেট্রোলের খরচা জুড়ে দিয়েছে। মুগ্ধ চোখে লোকটার মুখ-থ্যাবড়া ব্রাউন রঙের বুটজুতো, নাইলনের মোজা থেকে বিশাল পেটে চেপে-বসা চওড়া টাইট বেল্ট, ক্রমশ আরো ওপরে বুরুশ-মার্কা গোঁফ এবং টাকের চকচকে চূড়াটি পর্যন্ত দেখলাম। তারপর পকেট থেকে ন' টাকা পঁচিশ পয়সা বার করে তার হাতে দিলাম।

কুড়ি বাইশটা চকচকে দাঁত বার করে ফেলম প্রিয়তোষ ডাক্তার, 'পেট্রোলের দামটা হঠাৎ বড্ড বেড়ে গেছে। তাই—'

আমিও তৎক্ষণাৎ কুড়ি বাইশটা দাঁত বার করে বললাম, 'তা তো বটেই, তা তো বটেই—' বলেই ঝট করে গলার স্বরটা নামিয়ে দিলাম, 'তুমি মাইরি একটা জিনিয়াস। মরবার পর তোমার বডিখানা রেয়ার হিউমান স্পিসিস হিসেবে ন্যাশনাল মিউজিয়ামে রেখে দেবার মতো।'

আমার কথা প্রিয়তোষ ডাক্তার হয়তো শুনতে পেয়েছিল, কিংবা শোনে নি। তার চোখদুটো পলকের জন্য জ্বলে উঠেই আবার আগের মতো স্বাভাবিক হয়ে গেল। দারুণ সহজ গলায় সে বলল, 'তা হলে চলুন আমার সঙ্গে, একেবারে ওষুধটা নিয়ে আসবেন।'

অর্থাৎ কিনা তার ডিসপেন্সারি থেকে ওষুধ আনার কথা বলেও সে নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। ছিটকে অন্য দোকানে গিয়ে ঢুঁ মারি, এই ভয়ে শালা নাকে বঁড়শি গেঁথে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে। টাকাটা যখন খসবেই তখন আর দাঁড়িয়ে থেকে কী হবে।

বললাম, 'হ্যাঁ, চলুন।'

এই সময় সুমনা ভীরু গলায় জিজ্ঞেস করল, 'ডাক্তারবাবু ভয়ের কিছু নেই তো?'

প্রিয়তোষ ডাক্তার বলল, 'একেবারেই নেই কি করে বলি। পেসেন্টকে এখন কিছুদিন সাবধানে রাখতে হবে। একটা মালিশ লিখে দিয়েছি, ওটা দিনে চার বার করে বুকে মাখাবে।

সময়মতো ওষুধগুলো খাওয়াবে তারপর দেখা যাক—'

একটু পর বোদা আর আমি প্রিয়তোষ ডাক্তারের গায়ে ঝুলতে ঝুলতে তার নাইনটিন এইটিন মডেলের ঝঝ্ঝরে ছোট গাড়িটায় উঠলাম।

গোটা রাস্তা এবং দু'ধারের বাড়িঘর কাঁপিয়ে দারুণ শব্দ করতে করতে গাড়িটা এগিয়ে চলল। মনে হল ঘ্যাটাং ঘ্যাটাং করে একসঙ্গে বাইশটা রোড রোলার চলছে।

খানিকটা যাবার পর প্রিয়তোষ ডাক্তার বলল, 'আপনাকে আগে আর দেখেছি বলে তো মনে হচ্ছে না।'

বললাম, 'দেখা হবার কোনো কারণ ছিল না, তাই দেখা হয় নি।'

প্রিয়তোষ ডাক্তার চোখ মিট মিট করে কিছুক্ষণ আমাকে দেখল। তারপর বলল, 'মশায় ও পাড়ায় নতুন বুঝি?'

'এক্কেবারে—'

'নামটা জানতে পারি?'

'নিশ্চয়ই। তবে বলা যাবে না।'

'কেন?'

'শুনলে ভাববেন ইয়ার্কি করছি। গুরুজনের সঙ্গে ইয়ার্কি করা কি ভাল?'

প্রিয়তোষ ডাক্তারের চোখের মিটমিটানি আরো বেড়ে গেল। তবে নামটা আর জিজ্ঞেস করল না। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'মশায়ের কী করা হয়?'

বললাম, 'এই তো গাড্ডায় ফেলে দিলেন। এটা বলা সত্যিই মুশকিল। তবু আপনার যখন এত জানার ইচ্ছে তখন বলেই ফেলি। হাতের কাছে যখন যা পাই তাই করি। এই যেমন আপনার পুষ্পক রথে চড়ে আপাতত ওষুধ আনতে চলেছি।'

প্রিয়তোষ ডাক্তারের চোখের তারা এবার গোল হয়ে গেল। ফের কিছুটা চিন্তা করে সে বলল, 'সুমনার মা'র জন্য এত করছেন। ওরা আপনার আত্মীয় নাকি?'

'সে রকম ধরলে আপনিও আমার মেসোমশাই।'

কিছু একটা আন্দাজ করে প্রিয়তোষ ডাক্তার জিজ্ঞেস করল, 'বুঝতে পারছি রিলেটিভ নন। তা ওই রকম একটা মেয়ের সঙ্গে আলাপ হল কোথায়?'

'কলকাতায়।'

'অনেক দিনের চেনাশোনা বুঝি?'

'কাল মাঝ রাত্তিরে আলাপ হয়েছে।'

প্রিয়তোষ ডাক্তার সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ঝট করে আমাকে একবার দেখে নিল। তারপর বলল, 'আট দশ ঘণ্টার আলাপেই তার ময়ের ওষুধ কিনতে বেরিয়ে পড়েছেন?' নাকের ভেতর কেমন করে যেন একটা শব্দ করল মাকড়াটা।

সুমনা কলকাতার অ্যাপার্টমেণ্ট হাউসে কেন যায়, ডাক্তার কি তা জানে? হয়তো জানে, হয়তো জানে না। আমি কিছু বলার আগেই গাড়িটা ডিসপেন্সারিতে পৌঁছে গেল। আমরা নেমে পড়লাম।

'সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে'র মতো প্রিয়তোষ ডাক্তারের ব্রাহ্মীলিপি তার সিড়িঙ্গে চেহারার শুঁটকো, হাড় এবং শির বার-করা অস্বাভাবিক ঢ্যাঙা কম্পাউণ্ডারটা ঠিক ঠিক পড়ে ফেলল। আধ ঘন্টার মধ্যে চার রকম ট্যাবলেট, একটা মিক্সচারের শিশি, একটা মালিশের কৌটো আর দু'রকম পাউডারের পুরিয়া নগদ আটত্রিশ টাকা তেষট্টি পয়সায় কিনে বেরিয়ে পড়লাম।

শাটল ককের মতো সুমনাদের বাড়ি ফিরতে ফিরতে বোদা বলল, 'হাওয়া থেকে কাল আমার একটা বৌদি জুটিয়ে তার অপারেশন বলে দেড়শো টাকা বাগালে কিন্তু গুরু শেষ পর্যন্ত টাকাটা ডাক্তারের স্টমাকেই ঢুকল!'

'ফাইন বলেছিস।' আমি হাসলাম।

'এবার আমার একটা কথা রাখবে?'

'কী?'

'কাল রাত থেকে ক্যাঁচাকলে পা ঢুকিয়ে রেখেছ। এবার পা-টা বার করে ফেল।'

বোদা কী বলতে চায়, পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। সুমনার ঝামেলা থেকে বেরিয়ে আমাকে নিয়ে সে চলে যেতে চায়। বললাম, 'আব এই ক্যাঁচাকলে আমি থাকি! এবার ফ্লাই-ফ্লু-ফ্লোন—স্রেফ হাওয়া হয়ে যাব।'

ডাক্তারের কাছ থেকে সুমনাব মা কখন কী ওষুধ খাবে জেনে এসেছিলাম। সুমনাদের ঘরে গিয়ে তাকে সব বুঝিয়ে বললাম,'একটু বাইরে এস।'

উঠোনের মাঝমধ্যিখানে রেন-ট্রির তলায় সুমনাকে ডেকে এনে বললাম, 'তুমি তো উইকে পাঁচদিন সেই অ্যাপার্টমেণ্টটায় যাও—'

'হ্যাঁ—' সুমনা মাথা নিচু করল।

'এখন আর কিছুদিন যেয়ো না।'

'কেন, পুলিশের ভয় আছে? আবার রেইড করবে নাকি?'

পুলিশেব ব্যাপারটা আমার মাথায় ছিল না। সুমনার কথায় দুম করে মনে পড়ে গেল। বললাম, 'রেইড না করুক, এখন কিছুদিন নিশ্চয়ই বাড়িটার ওপর নজর রাখবে। আমি অবশ্য সেজন্যে বলি নি।'

মুখ তুলে উদ্বিগ্নভাবে তাকাল সুমনা' আমি বলতে লাগলাম. 'তোমার দিদি তো ভাল দেখতে পায় না বলে মনে হল।'

'হ্যাঁ, ও একবকম অন্ধই।'

'দিদি ছাড়া আর যাদের দেখলাম তারা সবাই বাচ্চা-বাচ্চা। বাচ্চা আর অন্ধর ওপর তোমার মাকে ফেলে রেখে বেরুনো ঠিক হবে না।'

'কিন্তু—'

'বল।'

'না বেরুলে হোল ফ্যামিলি না খেয়ে মরবে।'

আমি আবার সুমনাকে মনে করিয়ে দিলাম, 'আপাতত কিছুদিন ওই অ্যাপার্টমেণ্ট

হাউসটায় যাওয়ার রিস্ক আছে।'

সুমনা বলল, 'ওখানে যাব না। সার্কুলার রোডে আরো অ্যাপার্টমেণ্ট হাউস আছে।'

আমি পিটার স্বয়ম্ভু হোড়, একজন থার্ড ক্লাস প্রতারক, হেসে হেসে লোককে পথে বসিয়ে দিই, সেন্টিমেণ্ট-ফেন্টিমেণ্টের ধার ধারি না, হঠাৎ সেই আমার কী হয়ে গেল। পকেটে হাত ঢুকিয়ে ধাঁ করে যা নোট ফোট আর রেজগি ছিল, বার করে ফেললাম। হেনরি গোবিন্দ বিশ্বাসের মাথায় চক্কর লাগিয়ে কাল যে দেড়শোটা টাকা হাতিয়েছিলাম তার থেকে বোদার জন্যে চীনেপাড়ার জুতো কিনেছি, চার বোতল বেঙ্গলের দাম দিয়েছি, ডাক্তারের ফি দিয়ে ওষুধও কিনেছি। গুনে দেখলাম, চৌষট্টি টাকা সাতাত্তর পয়সা ব্যালান্স পড়ে আছে। ষাটটা টাকা সুমনার হাতে দিয়ে বললাম, 'এটা রাখো—'

'না-না—'সুমনা হাত নেড়ে বলতে লাগল, 'আপনি আমাদের জন্যে অনেক খরচ করেছেন,আর নিতে বলবেন না।'

তার একটা হাত তুলে ধরে টাকাটা গুঁজে দিলাম। তারপর বললাম, 'আচ্ছা, এবার চলি।' বোদাকে বললাম, 'পার্টনার ফরোয়ার্ড মার্চ।'

উঠোন পেরিয়ে আমরা যখন সামনের রাস্তাটার কাছাকাছি এসে পড়েছি সেই সময় সুমনা ছুটতে ছুটতে এল। বলল, 'শুনুন—'

অগত্যা দাঁড়িয়ে পড়তে হল। বললাম 'কী হল?'

'আমাদের বাড়ি প্রথম এলেন, কিছুই তো খেয়ে গেলেন না।'

'মায়ের ও রকম অসুখ। এখন আমাদের খাওয়া-দাওয়া নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।'

'কিন্তু—'

'কিন্তু ফিন্তু নয়, ঘরে যাও।'

খুব সঙ্কোচের গলায় সুমনা এবার বলল, 'আরেকটা কথা ছিল—'

'কী?' আমি সুমনাকে লক্ষ করতে লাগলাম।

'কত টাকা আপনার খরচ হয়েছে?'

'কেন?'

মুখ নিচু করে সুমনা বলল, 'ওটা আমি ফেরত দিতে চাই।'

হালকা গলায় বললাম, 'ঋণ শোধ!'

'আপনি আমার জন্যে যা করেছেন সে ঋণ শোধ করা যায় না। তবে টাকাটা আপনাকে নিতেই হবে।'

'ওই ক'টা টাকার জন্যে তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না।'

'না-না—' সুমনা জোরে জোরে মাথা নাড়ল, 'আপনার ঠিকানাটা দিন। আজ বুধবার, রবিবার গিয়ে টাকাটা দিয়ে আসব।'

আমার চোখেমুখে দুশ্চিন্তার ছায়া পড়ল। বললাম, 'মুশকিলে ফেলে দিলে।'

'কেন?'

'ব্যাপারটা কি জানো, আমার কোনো ঠিকানাই নেই। যখন যেখানে থাকি সেটাই আমার ঠিকানা। এক ঘণ্টা দুঘণ্টা পর পর আমার অ্যাড্রেস বদলে যায়। ইন ফ্যাক্ট, হোল কলকাতাটাই আমার অ্যাড্রেস।'

সুমনা কী বুঝল সে-ই জানে। অবিশ্বাসের চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে হয়তো ভাবল, আমি তাকে ঠিকানা জানাতে চাই না। তারপর বলল, 'ঠিক আছে অ্যাড্রেস দিতে হবে না। দয়া করে একটা কাজ করবেন?'

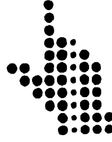
'কী?'

'পরশু সন্ধেবেলা পার্ক স্ট্রিট আর ক্যামাক স্ট্রিটের ক্রসিং-এর কাছে যে পার্কটা আছে ওখানে একটু আসবেন? এই ধরুন ছ'টা থেকে সাড়ে ছ'টার ভেতর।'

'দেখি।'

'দেখি না, আসতেই হবে। আপনার জন্যে আমি কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকব।'

ক্যাশ-ট্যাশ হাতে পেলে কেউ ফেরত দেয় না, এরকমই নিয়ম। কিন্তু এই মেয়েটা একেবারে উল্টো। টাকার ব্যাপারে আমার খুব একটা দুশ্চিন্তা ছিল না। একজনের টাকা আরেক জনের কাজে লেগেছে, তাতে আমার দুর্ভাবনার কি থাকতে পারে? তবু এই মুহূর্তে সুমনার হাত থেকে ছাড়া পাবার জন্যে কিছু না ভেবেই বললাম, 'আচ্ছা যাব।' বলেই রাস্তায় নেমে এলাম।



এখন প্রায় সাড়ে দশটা-এগারটার মতো বাজে। ঘুম থেকে ওঠার পর এমন সব ব্যাপার ঘটেছে যাতে বাসি মুখটাই ধোয়া হয় নি। তা ছাড়া সকালে নিজের হাতে শেভ-টেভ করা আমার অনেকদিনের অভ্যাস। পুরো একটি দিনের জমানো দাড়ি গালে খর খর করছে। শোভাবাজারের সেই লঝ্‌ঝড় বাড়িটায় ফিরতে না পারলে শেভ করার প্রশ্নই উঠে না। রাস্তার একটা কল থেকে বোদা আর আমি মুখ ধুয়ে নিলাম। তারপর বললাম, 'সকাল থেকে চা-ফা কিছু খাওয়া হয় নি। টেরিফিক খিদে পেয়ে গেছে। চায়ের দোকান-ফোকান কিছু চোখে পড়লে বলিস।'

'আচ্ছা—'বোদা ডিঙি মেরে মেরে রাস্তার দু'ধার দেখতে লাগল।'

·পাশাপাশি যাচ্ছি। যেতে যেতে বললাম, 'ফাইন একখানা এক্সপিরিয়েন্স হল, না?'

এক্সপিয়িয়েন্সের মানে বোদা নিশ্চয়ই জানে না। তবু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের মতো গম্ভীর চালে বলল, 'তা হল। কিন্তু এটা কী করলে গুরু?'

'কোনটা?'

'পুরো টাকাটা মেয়েটাকে দিয়ে দিলে!'

'পুরোটা তো দিই নি।' পকেট থেকে বাকি টাকাগুলো বার করে বোদাকে বললাম,

'এই তো চার টাকা সাতাত্তর পয়সা রয়েছে।'

'ওতে কি হবে!'

'কেন, দু'জনের দু'খানা ফার্স্ট ক্লাস লাঞ্চ হয়ে যাবে।'

আন্দাজে লাঞ্চ ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে বোদা বলল, 'চার টাকায় দুটো' লাঞ্চ হয় নাকি?'

বোদার ঘাড়ে আলতো করে একটা চাপড় বসিয়ে বললাম, 'শালা মদনা, কাল এয়ার-কণ্ডিশানড রেস্তোরাঁয় ডিনার খেয়ে তোমার বারটা বেজে গেছে। কাল আমরা ছিলাম ক্যাপিটালিস্ট, আজ প্রোলেটারিয়েট। আজ প্রোলেটারিয়েটদের খানাই খেতে হবে, বুঝলে চাঁদ?'

'তাই খাব। লেকিন গুরু—'

'কী?'

'এই চার টাকা সাতাত্তর পয়সা ফক্কা হয়ে যাবার পর কী হবে?'

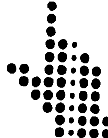
তুড়ি মেরে বোদার দুর্ভাবনাটা উড়িয়ে দিয়ে বললাম, 'তখনকার কথা তখন ভাবা যাবে।' নিজের মাথাটা দেখিয়ে বললাম, 'এখানে যোজনা-কমিশনের হেড কোয়ার্টার্স রয়েছে না? ঠিক একটা প্ল্যান বেরিয়ে যাবে। চায়ের দোকান চোখে পড়ল?'

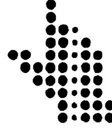
বোদা আর কিছু না বলে আবার ডিঙি মেরে ওয়ে-সাইড টি-শপ খুঁজতে লাগল।

কিছুক্ষণ পর আমরা মোটামুটি একটা ফাঁকা জায়গায় এসে পড়লাম। এখান থেকে দুটো রাস্তা রাইট অ্যাঙ্গেল তৈরি করে দু'দিকে চলে গেছে। একটা গিয়ে মিশেছে বি-টি রোডে, আরেকটা সোজা নাক বরাবর উত্তরে। মহাশয়গণ আপনাদের আগেই জানিয়েছি, এদিকটায় এই আমার প্রথম আসা। এখানকার টোপোগ্রাফি কিছুই জানি না। সামনের রাস্তাটা কোথায় গেছে তাও মহাশয়রা বলতে পারব না। তবে মনে হচ্ছে ওধারে অনেক কারখানা-টারখানা আছে। ফ্যাক্টরির অগুনতি চিমনি সোজা আকাশের গায়ে গিয়ে বিঁধে রয়েছে।

আচমকা কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের মতো গলা চিরে বোদা চেঁচিয়ে উঠল, 'গুরু চায়ের দোকান পেয়ে গেছি।' বলেই আঙুল বাড়িয়ে দিল।

সামনের রাস্তা দুটো যেখানে নাইনটি ডিগ্রি কোণ তৈরি করেছে ঠিক সেইখানটায় সত্যি সত্যি টালির চালের দরমা-ঘেরা একটা ওয়ে-সাইড টি-স্টল। আমরা লম্বা পায়ে সেখানে চলে এলাম। কিন্তু কে জানতো এই চায়ের দোকানের সামনে কিছুক্ষণের মধ্যে এমন একটু কাণ্ড ঘটে যাবে যাতে আমার—মানে পিটার স্বয়ম্ভু হোড়ের হোল লাইফটাই আচমকা সুপারসোনিক প্লেনের গতিতে ছুটতে শুরু করবে। মহাশয়গণ, আপনারা নিশ্চয়ই কৌতূহলী হয়ে উঠেছেন। কিন্তু এক কথায় তো বলা যাবে না। কিঞ্চিৎ ধৈর্য ধরে দেখতে থাকুন।





টি-স্টলটার এক ধারে খানিকটা জায়গা উঁচু করে লাল সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো। সেখানে দোকানদার বসে আছে। লোকটার বয়েস পঞ্চাশ থেকে ষাটের মধ্যে। মুখটা পেঁপের মতো। ওপর দিকটা সরু, চোয়ালের দিকটা ভারি এবং ছড়ানো। মাংসের চেয়ে লোকটার গায়ে হাড় বেশি। চুল কাঁচায়-পাকায় দাবার ছক। মুখে আলপিনের মতো চোখা চোখা দাড়ি। তার বাঁ পাশে একটা বড় উনুনে চায়ের জল ফুটছে। ডান ধারে অনেকগুলো শস্তা দামের কাপ উপুড় করা। কাপগুলোর পাশে দুধের বড় একটা ডেকচি, চা এবং চিনির কৌটো, চা ছাঁকবার ছাঁকনি ইত্যাদি সরঞ্জাম সাজানো রয়েছে। দোকানদারের পেছনে একটা পাল্লাভাঙা বেঁটে কাচের আলমারিতে সারি সারি বয়ামে কুচো নিমকি, জিবে গজা থেকে শুরু করে নানা রকম বিস্কুট রয়েছে। একটা তারের ঝুড়িতে বড় বড় মাদ্রাজি হাঁসের ডিমও চোখে পড়ল।

দোকানদার ছাড়া একটা বার তের বছরের ছোকরাও আছে টি-স্টলটায়, সে এ দোকানের বয়। কাপ-প্লেট ধোয়া থেকে খদ্দেরকে চা-টা দেওয়া, সবই সে করে থাকে। দোকানদার অবশ্য নিজের হাতে চা বানায়, অমলেট ভাজে, রুটি সেঁকে, এবং কাস্টমারদের কাছ থেকে হিসেব করে পয়সা বুঝে নেয়।

দোকানদারের মুখোমুখি দুটো বেঞ্চি পাতা, ও দুটো খদ্দেরদের জন্য। এই মুহূর্তে একটা বেঞ্চে বোদা আর আমি পাশাপাশি বসে কুচো নিমকি দিয়ে চা খাচ্ছি।

দোকানে এখন তেমন ভিড়-টিড় নেই। মাঝে মধ্যে এক-আধটা উটকো কাস্টমার এসে তিন চুমুকে চা শেষ করেই চলে যাচ্ছে। আমাদের অত তাড়াহুড়ো নেই। চা খেতে খেতে চারদিক দেখতে লাগলাম। দোকানটার দেয়ালে দেয়ালে শিবকাশীতে ছাপা নানারকম ঠাকুর দেবতা অর্থাৎ লক্ষ্মী-গণেশ-দুর্গা ইত্যাদির গাবদা গোবদা ছবিওলা ক্যালেণ্ডার। একটা দেয়ালে পিচবোর্ডের ওপর লেখা আছে ঃ রাত্রে রুটি ও আলুর দম পাওয়া যায়।

বললাম, 'দিনে রুটি করো না?' আমার ইচ্ছে হল রুটি-টুটি পাওয়া গেলে আজকের লাঞ্চটা এখানেই সেরে ফেলব।

দোকানদার বলল, 'না বাবু। একা লোক আর ওই ছোকরা। দু-বেলা পেরে উঠি না।

'ও।'

আমাদের কথাবার্তার মধ্যেই তিনটি যুবক—চব্বিশ থেকে আটাশের মধ্যে বয়স, পরনে বেলবটস আর টি-শার্ট, কোমরে ০০৭-মার্কা চওড়া বেল্ট, পায়ে ক্যানভাসের স্পোর্টস শ্যু, চোখমুখের চেহারা রীতিমত বেপরোয়া—টি-স্টলে এসে ঢুকল তাদের সঙ্গে একটা মধ্যবয়সী ঠেলাওলাও রয়েছে। লোকটা তার ঠেলা সামনের রাস্তায় রেখে এসেছে।

তিন যুবকের একজন দোকানদারকে বলল, 'চারটে চা আর দুটো করে লেড়ো বিস্কুট

দাও।' ওরা আমাদের পাশে রাস্তার দিকের বেঞ্চিটায় বসল। ঠেলাওলাটা অবশ্য বসল না। সে ঘ্যান ঘ্যান করতে লাগল, 'সাহাব আপলোগোকা মাল কিধার?'

'এখানেই আছে।'

চারদিক ভাল করে দেখে নিয়ে ঠেলাওলা জিজ্ঞেস করল, 'কাঁহা?'

যুবকটি বিরক্ত হল, 'শালা জ্বালিয়ে দিলে! আরে বাবা চুপচাপ বসে চা-ফা খা না। মাল এক্ষুণি এসে যাবে।'

ঠেলাওলা জানালো এখন চা খেতে বসলে দেরি হয়ে যাবে। সাহাবদের মাল পৌঁছে দিয়ে তাকে সাড়ে এগারটার মধ্যে আরেক জায়গায় যেতে হবে।

অন্য একটি যুবক একটু ভেবে বলল, 'ওখানে গেলে কত ভাড়া পাবি?'

'তিন-চার রুপেয়া তো জরুর।'

'ঠিক হ্যায়, আমরা পাঁচ টাকা বেশি দেব। খুশি তো?'

ঠেলাওলা অবাক হয়ে গিয়েছিল। অকারণে কেন এরা তাকে আটকে রেখে পাঁচটা টাকা বেশি দিতে চাইছে, সেটাই বুঝতে পারছিল না। আবছা গলায় সে শুধু বলল, 'জি—'

'যতক্ষণ না আমাদের মালপত্তর এসে হাজির হচ্ছে যা ইচ্ছে খেয়ে যা —চা, বিস্কুট, নিমকি, আণ্ডা—'

ওদের কথাবার্তা কিছু কিছু আমারও কানে আসছিল। বুঝতে পারছিলাম ঠেলাওলাটাকে মালপত্র বইবার জন্য ওরা ভাড়া করে এনেছে। কিন্তু মালেরই দেখা নেই। তার বদলে ওরা তাকে চায়ের দোকানে এনে এনতার খেয়ে যেতে বলছে। এমন কি অন্য জায়গায় ভাড়া খাটলে যে টাকা পাওয়া যেত তার চাইতেও বেশি দিতে চাইছে। যতক্ষণ না তাদের মাল এখানে এসে হাজির হচ্ছে ঠেলাওলাটিকে তারা আটকাতে চায়। কী ধরনের মাল আসবে ওদের? উদ্দেশ্যে কী ছোকরাগুলোর? মহাশয়গণ, আপনারাই বলুন, ব্যাপারটা কিঞ্চিৎ সন্দেহজনক কিনা।

বোদা আচমকা আমার কানে তার মুখটা ছুঁচলো করে ঢুকিয়ে দিল, 'গুরু, কিছু বুঝতে পারছ?'

বোদাও তা হলে ওদের লক্ষ করেছে। গলা নামিয়ে বললাম, 'এখন মুখে তালা ঝুলিয়ে চুপচাপ শুধু দেখে যা।' মনে মনে ঠিক করে ফেললাম, ব্যাপারটা কতদূর গড়ায়, না দেখে উঠছি না। নট নড়ন-চড়ন হয়ে এই আমি বসে রইলাম।

ওদের চা এসে গিয়েছিল। চোখের কোণ দিয়ে লক্ষ করলাম, ঠেলাওলাটা বেঞ্চিতে না বসে চা নিয়ে মেঝেতে উবু হয়ে বসল। আর ওরা সিগারেট ধরিয়ে অচেনা মানুষের মতো পাশাপাশি বসে চুপচাপ কিছুক্ষণ চা খেয়ে গেল। তারপর হঠাৎ একটি যুবক আরেক জনকে বলল, 'ক'টা বাজে রে পল্টা?'

পল্টা নামের ছোকরাটি, গালে লম্বা কাটা দাগ, বাঁ হাতে স্টিলের বালা, ঝট করে কবজি উল্টে হাতঘড়িটা দেখে নিয়ে বলল, 'দশটা বেয়াল্লিশ—'

বলার সঙ্গে সঙ্গে, চোখে পড়ল, হাই ভোল্টেজ ইলেকট্রিসিটির মতো কী যেন একটা

ছোকরাগুলোর চোখেমুখে খেলে গেল। তৃতীয় ছোকরাটি বলল, 'সাড়ে দশটার সময় তো ক্যামাক স্ট্রিট থেকে বেরুবে?'

'হ্যাঁ, ললিত হালদার সেই রকম খবরই দিয়েছে।'

'ললিত বাজে খবর দেবে না।'

ললিত হালদার কে, জানি না। মহাশয়গণ, আপনারা তো জানেনেই, কারো রদ্দি ঝামেলায় জিরাফের মতো আমি কখনও গলা বাড়িয়ে দিই না। কিন্তু এই ছোকরাগুলো দারুণভাবে আমাকে তাদের দিকে টানছে। আমার ক্যারেক্টার কি খারাপ হয়ে যাচ্ছে মহাশয়রা? কাল রাতে সুমনার জন্য গ্ল্যাণ্ডগুলো দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তার জন্য কতটা ফেঁসে গিয়েছিলাম আপনারা তো দেখেছেনই। আজ এই ছোকরাগুলোর মধ্যে নাক ঢোকাতে চাইছি। পরের ঝঞ্ঝাটে যদি ক্রমাগত জড়িয়েই যাই আমি কি আর বিশ্ব-নাগরিক মনে ওয়ার্ল্ড সিটিজেন থাকতে পারব? হে-হে মহাশয়গণ, আমার বোধহয় বারটা বেজেই এসেছে।

যাক গে, পল্টা নামের সেই ছোকরাটা বলল, 'সাড়ে দশটায় বেরুবে। রাস্তায় জ্যাম-ট্যাম যদি না থাকে, এগারটা বাজতে পাঁচ কি কারেক্ট এগারটায় এখানে পৌঁছে যাবে, নাকি বলিস ঝন্টে?'

ঝন্টে বেঞ্চির ও-মাথায় বসে ছিল। সে বলল, 'হ্যাঁ, আধ ঘণ্টার বেশি লাগার কথা নয়।' একটু থেমে মাঝখানের ছোকরাটিকে বলল, 'অ্যাই আজিজ, কী গাড়িতে আসবে, ললিত হালদার কিছু বলেছে?'

'হ্যাঁ, সবুজ রঙের টোয়োটাতে।'

'নম্বর বলেছে?'

'ডব্লু-বি-এস ৭৫৮৪২।'

তারপরই দেখা গেল, তিন যুবকের মাথা একসঙ্গে মিশে গেল। ঘাড় গুঁজে চাপা নিচু ফিসফিসে গলায় তারা কি একটা প্ল্যান করতে লাগল।

আমাদের চা শেষ হয়ে গিয়েছিল। দোকানদারকে আরো দু কাপ দিতে বললাম। বলেই নজরে পড়ল, বোদা চোখের তারা স্থির করে ছোকরাদের দেখছে। কনুই দিয়ে তার পেটের তলায় একটা খোঁচা দিলাম। গলার স্বরটা পঁচিশ ফুট খাদে নামিয়ে সামনের দেয়ালে গণেশ ঠাকুরের ছবিওলা একটা ক্যালণ্ডার দেখিয়ে বললাম, 'চোখ দুটো গণেশের শুঁড়ে ফিক্স করে কান দুটো ওদের দিকে রাখ।'

বোদা তাই করল। আমিও আরেকটা ক্যালেণ্ডারে মা কালীর টুকটুকে জিভটা গভীর মনোনিবেশে দেখতে লাগলাম। কিন্তু কান দুটো অ্যালসেসিয়ান কুকুরের কানের মতো ছোকরাদের দিকে খাড়া হয়ে রইল।

ওদের টুকরো টুকরো কথা আবছাভাবে কানে আসছিল।

'দশটা বেজে পঞ্চাশ হলে তুই রাস্তার ওধারে গিয়ে পজিশান নিবি।'

'ঠিক আছে।'

'তুই ইশারা করলে আমরা উঠব। তারপর যে রকম প্ল্যান আছে, করা হবে। ও-কে?'

'ও-কে।'

কথা বলতে বলতে ঘাড় ফিরিয়ে ওরা একবার আমাদের দেখে নিল। কি আর দেখবে! শালা তোমরা যাও ডাল ডালে, আমার মুভমেণ্ট পাতায় পাতায়। আমরা দু'জন তো দারুণ ভক্তিভরে কালী আর গণেশ ঠাকুর দেখছি। আমাদের সম্বন্ধে ভয় বা সন্দেহের কিছু নেই, হয়তো এরকম একটা কিছু ভেবে নিয়ে তিনজনে আবার ঘাড় গুঁজে প্ল্যান করতে লাগল।

সেকেণ্ড রাউণ্ডের চা এসে গিয়েছিল। খেতে খেতে বোদা আগের মতোই কানে মুখ গুঁজল, 'গুরু—'

'কী বলছিস?'

'আমার বুকে কিন্তু জগঝম্প বাজছে, হাঁটু দুটো টেরিফিক কাঁপছে।'

'কেন রে?'

'মাকড়াদের মতলব ভাল নয়, আমার দারুণ ভয় করছে। চল, কেটে পড়া যাক।'

ভয় ঠিক নয়, এক ধরনের উত্তেজনা এবং সেই সঙ্গে কৌতূহল, হারমোনিয়ামের পয়লা রিড থেকে শেষ রিড পর্যন্ত ঝড়ের বেগে বাজিয়ে গেলে যে রকম হয় সেই রকম পায়ের চেটো থেকে মাথার সেরিব্র্যাল পয়েণ্ট পর্যন্ত ঝমঝম বেজে যাচ্ছিল। বললাম, 'ভয়ের কিচ্ছু নেই। বসে বসে দ্যাখই না। জব্বর একখানা এক্সপিরিয়েন্স তো হবে।'

বোদা আর কিছু বলল না। কণ্ঠা পর্যন্ত উদ্বেগ নিয়ে গণেশ ঠাকুরের শুঁড় দেখতে লাগল। সত্যিই তার হাঁটু দুটো ভয়ানক কাঁপছে এখন।

আমাদের সেকেণ্ড রাউণ্ডের চা যখন আধাআধি শেষ হয়ে এসেছে সেই সময় হঠাৎ পল্টা ঝাঁ করে উঠে দাঁড়াল। তার চোয়াল শক্ত, চাপা ধরনের গোল চোখের বাদামী তারা দুটো ছুরির ফলার মতো ঝক ঝক করছে। ভাঁরি কালচে ঠোঁট দৃঢ়ভাবে আঁটা। সে গিয়ে সোজা চায়ের দোকানে ঢোকবার মুখটায় দাঁড়াল। ওখান থেকে রাইট অ্যাঙ্গেলে বাঁক-নেওয়া রাস্তার দুটো দিকই দেখা যায়। আজিজ আর ঝন্টে আস্তে আস্তে চা খাচ্ছিল। ঝন্টেকে দেখে বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না, নির্বিকার পরম ব্রহ্মের মতো চুপচাপ বসে আছে। তবে আজিজের গলার দুটো শিরা ঘোড়ার মতো লাফাচ্ছিল। তার ঠোঁটে এক ইঞ্চির মতো দাঁত বসে যাচ্ছে। একেক বার জোর জোরে শ্বাস টানছিল সে, পরক্ষণেই তার দম আটকে আটকে যাচ্ছিল। কপালে, গলায়, ঘাড়ের কাছে দানা দানা ঘাম জমেছে। ভেতরে ভেতরে দারুণ এক অস্থিরতা আর উত্তেজনা যে চলছে, বাইরে থেকেও তা টের পাওয়া যায়। দু'জনেই পল্টার চোখের দিকে দৃষ্টি আটকে রেখেছে। কারো চোখেই পাতা পড়ছে না।

বোদা আর আমি কালী আর গণেশ ঠাকুর দেখতে দেখতে ওদের দিকে লক্ষ্য রাখছিলাম। মনে হচ্ছিল, ঘড়ির ডায়ালে মিনিট, সেকেণ্ড এবং ঘণ্টার কাঁটাগুলো থমকে গেছে।

মিনিট পাঁচেকই হবে। তারপর আচমকা পল্টা মাথায় একটা ঝটকা মেরে ইশারা করল।

সঙ্গে সঙ্গে সট্ করে ঝন্টে আর আজিজ উঠে দাঁড়াল। পরমুহূর্তেই দেখা গেল, ঝন্টে চায়ের দোকানটার উল্টো দিকে গিয়ে পজিশান নিয়েছে। আর আজিজ সামনের ঠেলাটাকে রাস্তার মাঝখানে নিয়ে গিয়ে আড়াআড়ি দাঁড় করিয়ে দিল। অর্থাৎ রাস্তাটা এখন আটকে গেছে। যেদিক থেকেই গাড়ি আসুক ওটা না সরালে যেতে পারবে না।

এদিকে ঠেলাওলাটা চা-ফা ফেলে লাফিয়ে উঠেছে, 'এ কিয়া বাবুসাব—'

পল্টার বাদামী চোখে নিষ্ঠুরতা ঝিলিক দিয়ে গেল। হিপ পকেট থেকে লম্বা মাউথ অর্গানের মতো কি একটা বার করল সে। সেটার তলার দিকে ছোট্ট বোতামে চাপ দিতেই সট্ করে দশ ইঞ্চি চকচকে ইস্পাতের ফলা বেরিয়ে এল। পল্টা বলল, 'চোপ শালা—'

ঠেলাওলাটার হাত-পায়ের জোড় আলগা হয়ে গেল যেন। গোঙানির মতো একটা শব্দ বেরিয়ে এল তার গলার ভেতর থেকে। তার পরেই হুড়মুড় করে বসে পড়ল সে।

আমরা দুই গণেশ এবং কালীভক্ত ক্যালেণ্ডার থেকে এখনও চোখ সরাই নি। তবে চোখের কোণে তারা দুটো এনে সবই দেখে যাচ্ছিলাম।

হঠাৎ চাপা গলায় পল্টা আমাদের ডাকল, 'এই যে মিস্টার—'

এবার সোজাসুজি তাকালাম। পল্টা ছুরির ফলাটা আড়াআড়ি ঠোঁটের ওপর রেখে বলল, 'এইটা—'

বললাম, 'ওটা আমি চিনি—ড্যা'ার।'

'একটা কথা—'

'বুঝেছি। কোনো আওয়াজ করব না। যতক্ষণ না অপারেশনটা হচ্ছে স্টিল ফোটো হয়ে বসে থাকব—এই তো?'

পল্টা মাথা হেলিয়ে দিল, অর্থাৎ তা-ই। তারপর নিষ্ঠুর সন্দিগ্ধ চোখে কয়েক পলক আমাদের দেখে আবার রাস্তার দিকে তাকাল।

বোদা ধসে-পড়া ফ্যাসফেসে গলায় আমাকে বলল, 'গুরু আমার লিভারটা খুঁজে পাচ্ছি না, শালা কোথায় যেন হড়কে নেমে গেছে।'

আমি শুধু বললাম, 'নো টক। গণেশের দিকে তাকিয়ে থাক।'

ওদিকে চায়ের দোকানের ছোকরা এবং মালিক ভয়ে স্ট্যাচু হয়ে গেছে।

দু-মিনিটও কাটল না, কাছাকাছি একটা প্রাইভেট কারের হর্ণের শব্দ শোনা গেল। তৎক্ষণাৎ পল্টা লাফ দিয়ে রাস্তায় চলে গেল।

আমি কিন্তু স্টিল ফোটো হয়ে বসে থাকা প্রয়োজন বোধ করলাম না। হে-হে মহাশয়গণ আপনারাই বলুন, নাকের ডগায় খবরের কাগজের ভাষায় একটা দারুণ রোমহর্ষক ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে আর আমি সেটা কাছে গিয়ে দেখব না, তা কি কখনও হয়? মহাশয়রা, আপনারা তো সারা দিনে আট-দশ ঘণ্টা রাস্তায় রাস্তায় ঘোরেন। এ রকম ঘটনা ক'টা চোখে পড়েছে আপনাদের? চোখ দুটো যখন দেখবার জন্যই তখন কিচ্ছু বাদ দেব না। খারাপ-

ভাল, মজাদার বা ভয়াবহ, হাতের কাছে যা-ই ঘটুক দেখে যাব। ভালটা দেখব, খারাপের বেলা চোখ বুজে থাকব, কোনো মানে হয়?

আমি উঠে পড়লাম। বোদা হাড় গোড়-ভাঙা মানুষের মতো বসে আছে। মাকড়াকে ক্রেন লাগালেও এখন টেনে তোলা যাবে না। ওকে ফেলে রেখেই দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। পনের গজ দূরে সেই ঠেলাগাড়িটার ওধারে সবুজ রঙের একটা টোয়োটা দাঁড়িয়ে গেছে। পল্টা, আজিজ আর ঝন্টে দশ ইঞ্চি ড্যাগার বার করে গাড়িটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। গাড়িটার ভেতরে মনে হল ড্রাইভারকে নিয়ে তিন জন লোক বসে আছে। অবশ্য ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, দু'জনও হতে পারে।

গাড়ির দরজা খুলে পল্টারা ভেতরে ঢুকবার চেষ্টা করছিল। ভেতরের লোকেরা জানালার কাচ তুলে দিয়ে লক করে প্রাণপণে তাদের ঠেকাতে চাইছে।

চাপা গলায় আজিজ গর্জাচ্ছিল, 'লাশ হতে না চাইলে বাক্সটা দিয়ে দাও—'

ঝন্টে ঝাঁ করে রাস্তা থেকে দুটো প্রকাণ্ড খোয়া তুলে কাচে ছুঁড়ে মাড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ঝন ঝন করে দুই জালায় দুটো বড় ফোকর হয়ে গেল। তার ভেতর দিয়ে ছোরাসুদ্ধু হাত ঢুকিয়ে কারো গলার কাছে চেপে ধরল পল্টা। আর আজিজ এক ঝটকায় পেছন দিকের দরজাটা খুলে ফেলল।

হলিউডের একখানা টেরিফিক দম আটকানো ছবি দেখছিলাম। দারুণ লাগছিল। ক'বছরে ওয়েস্ট বেঙ্গলের যুবকদের বুকের পাটা বেশ বেড়ে গেছে। মোটে তিনটে দশ ইঞ্চি ড্যাগার নিয়ে টেক্সাসের বেপরোয়া ছোকরাদের মতো তিনটি বাঙালি ইয়াং ম্যান হাইওয়ে রবারিতে নেমে যাবে, কে ভাবতে পেরেছিল!

হঠাৎ দেখলাম, আজিজ একটা লোককে গলার নলী টিপে ধরে নামিয়ে ফেলল। তারপর ছুরির ফলাটা কণ্ঠার কাছে ঠেকিয়ে রাখল। হিন্দি যাসুসি ফিল্মে ভয়ে চোখ-ঠিকরে-যাওয়া যে ছবি থাকে লোকটা অবিকল সেই ছবি হয়ে গেল। ঝন্টে আরেকটা লোককে হুবহু একই কায়দায় নামিয়ে আনল এবং তার কণ্ঠনলীতেও ছুরি ঠেকাল। আর পল্টা গাড়ির ভেতর থেকে তৃতীয় লোকটিকে নামাবার চেষ্টা করতে লাগল।

ব্যাপারটা দেখতে বেশ মজাই লাগছিল আমার। তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ কি যেন হয়ে গেল। মহাশয়গণ, বুঝতেই পারছেন ছোকরা তিনটে দারুণ ডেসপারেট। এই বেলা এগারটার সময় প্রকাশ্য দিবালোকে তারা হাইওয়ে রবারিতে নেমেছে। যে কোনো দিক থেকে যে কোনো মুহূর্তে পুলিশের গাড়ি, সি আর পি'র ভ্যান কিংবা অন্য কোনোরকম গাড়ি-টাড়ি এসে পড়তে পারে। কিন্তু ওরা বেপরোয়া। ওদের যে দুর্দান্ত সাহস তা নিশ্চয়ই টের পাচ্ছেন। কিন্তু কতটা সাহস জানার খুব ইচ্ছে হচ্ছে আমার।

সট করে ঘাড় ফিরিয়ে একবার বোদার দিকে তাকালাম। তার চুল স্ট্রেট খাড়া হয়ে আছে, চোখের পাতা পড়ছে না। মরা মাছের মতো এদিকে তাকিয়ে রয়েছে সে। হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল বোদার পকেটে জং-ধরা রিভলবারটা সব সময় থাকে। বললাম, 'উঠে আয়—'

বোদা তার ট্যারাবাঁকা শরীরটাকে টেনে তুলল। তারপর পাক্কা বেহেড মাতালের মতো এলোমেলো পায়ে টলতে টলতে কাছে চলে এল। ফ্যাসফেসে গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কী বলছ গুরু?'

'রিভলবারটা বার কর—' পল্টাদের দেখতে দেখতে বোদার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলাম।

'কী হবে?'

'বার কর না। কুইক—'

'গুরু ওটা লঝ্ঝড় মাল, কোনো কাজে লাগবে না।'

আমি আবার বললাম, 'কুইক—'

আমার গলার স্বরে কিছু ছিল যাতে বোদা থতিয়ে গেল। কিছু না বলে চোখের পলকে হিপ পকেট থেকে রিভলবারটা বার করে আমার হাতে দিল। ঘাড় না ফিরিয়েও টের পাচ্ছি, টি-স্টলের দোকানদার এবং ছোকরাটা শ্বাসরুদ্ধের মতো আমাকে দেখছে। দেখুক, যত পারে দেখে যাক। আমি আমার কাজ করে যাই।

টি-স্টল থেকে বেরিয়ে গুনে গুনে তিন পা এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। রাস্তা থেকে দু'তিনটে ছোট ছোট ইটের টুকরো কুড়িয়ে বাঁ হাতেব চেটোতে পাশাপাশি সাজিয়ে কেরোমের ঘুঁটিতে টোকা মারার মতো টোকা দিলাম। একটা টুকরো পল্টার কানের পাশ দিয়ে উড়ন্ত চাকির মতো সাঁ করে বেরিয়ে গেল।

ওরা লক্ষ করে নি। এবার দ্বিতীয় টুকরোটা ফ্লাইং সসার করে উড়িয়ে দিলাম।

অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ। টুকরোটা গিয়ে সোজা আজিজের নাকে লাগল। ধাঁ করে সে ঘুরে দাঁড়াল। তার দেখাদেখি পল্টা আর ঝন্টেও।

চোখাচোখি হতে আমি উনত্রিশটা দাঁত বার করে হাসলাম। উনত্রিশটা, কেন না আমার দু'পাটিতে মহাশয়গণ, বত্রিশটা দাঁতই নেই। ওরা কিন্তু হাসল-না। জ্বলন্ত ফার্নেসের মতো চোখ করে আমাকে দেখতে লাগল।

আমি রিভলবারটা উঁচু করে ওদের দেখাতে দেখাতে বললাম, 'এটা চেনো?'

তিনটি যুবক হকচকিয়ে গেল। ঝন্টে আর আজিজ দুটো লোকের কণ্ঠায় ছুরি ঠেকিয়ে রেখেছিল। তাদের হাত দুটো কাঁধের কাছ থেকে আলগা হয়ে ঝুলে পড়ল।

আমি বললাম, 'সুবোধ বালক হয়ে হাতের মালগুলো মাটিতে ফেলে দাও। ওগুলো ডেঞ্জারাস কিনা, নাড়াচাড়া করতে করতে কখন কেটে ফেটে যাবে। কোনো মানে হয় না।' বলে আবার হাসলাম। হেডলাইটের মতো হাসিটা আমার মুখে ফিক্সড হয়ে রইল। হাসতে হাসতে নিজের অজান্তেই খানিকটা এগিয়ে গেলাম।

পল্টারা ছোরাগুলো ছুঁড়ে ফেলতে যাবে, বোদা সব কাঁচিয়ে দিল। দোকানের ভেতব থেকে গলার শির ছিঁড়ে সে চেঁচিয়ে উঠল, 'গুরু, ওই খচড়াদের কাছে আর এগিয়ো না। রিভলবারে গুলি ফুলি নেই, ওটা লক্কড় জং-ধরা মাল। শালারা তোমার লাশ ফেলে দেবে।'

বোদার কথা শেষ হল কি হল না, পল্টারা হঠাৎ যেন চমকে উঠল। একদৃষ্টে কয়েক

সেকেণ্ড আমার হাতের রিভলবারটা দিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করল বোদা যা বলছে সত্যি কিনা। তারপর ধোঁকা দেবার ব্যাপারটা চট করে ধরে ফেলল।

প্রথমে আজিজ, তারপর পল্টা আর ঝন্টে চাপা গলায় খিস্তি দিয়ে উঠল। পর মুহূর্তে খ্যাপা ষাঁড়ের মতো ওরা তিন দিক থেকে ড্যাগার নিয়ে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। পড়বার কথাই। হে-হে মহাশয়গণ, আমার জন্য শিকার ফসকে যাচ্ছে, আর ওরা খেপে যাবে না? যে কেউ হলে খেপে যেত।

মহাশয়রা, দেখুন তো, বোদা মাকড়া আমাকে কি ঝামেলায় ফেলে দিল! জং-ধরা অকেজো রিভলবারটা উঁচিয়ে স্রেফ ধোঁকা দিয়েই পল্টাদের হাড় আমি ঢিলে করে দিতে পারতাম। তার বদলে এখন তিন শালার সঙ্গে লড়ে যাও।

যা হবার তা তো হয়েই গেছে। এই বাজে রিভলবারটা কী কাজেই বা লাগবে! ওজন দরে পুরনো লোহা-লক্কড়ের দোকানে বেচলে এটার দাম দশ পয়সাও পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। অবশ্য হাতে যখন রয়েছে, ওজনও যখন পাঁচ শো গ্রামের মতো, তখন এটাকে ঢিলের মতো কাজে লাগানো যায়। তা-ই করা যাক, না কি বলেন মহাশয়গণ? আজিজের দিকে তাক করে সত্যি-সত্যিই রিভলবারটা ছুঁড়লাম।

হে-হে মহাশয়বা, আজ আমার চাঁদমারিটা দারুণ হচ্ছে। রিভলবারটা ধাঁ করে ব্যালিস্টিক মিসাইলের মতো আজিজের মুখে গিয়ে লাগল। তার হাত থেকে ছোরাটা ছিটকে পঁচিশ গজ দূরে গিয়ে পড়ল। 'আই বাপ—' বলেই দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ল আজিজ। তার আঙুলের ফাঁক দিয়ে টকটকে লাল রক্ত গড়িয়ে আসতে লাগল।

একজন সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। এক ঘন্টার মধ্যে ওকে আর দাঁড়াতে হবে না। এখন বাকি রইল পল্টা আর ঝন্টে। ওরা ফরটি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গল করে আমার দিকে ছুটে আসছিল।

পল্টা ওর হাতের ছুরিটা আমার পাঁজরায় বসাতে যাবে, হিলহিলে সাপের মতো কোমর বাঁকিয়ে বাঁ হাতে ওর চোয়ালে একটা ঘুষি বসিয়ে দিলাম। ওর বডিটা ভল্ট খেয়ে ছিটকে পড়ল। ততক্ষণে ঝন্টে আমার তিন ফুটের মধ্যে এসে পড়েছে। বিদ্যুৎবেগে ঘুরতে যাচ্ছিলাম কিন্তু তার আগেই ঝন্টের ছুরিতে আমার কাঁধের খানিকটা ছাল উড়ে গেল। আমি গোটা শরীরটা ঘুরিয়ে তার কোমরের কাছে ফুটবলের হাফভলির মতো বাঁ পা'টা চালিয়ে দিলাম। মুখ গুঁজে হুড়মুড় করে শক্ত পাথুরে রাস্তায় সে পড়ে গেল।

ওদিকে পল্টা উঠে পড়েছে। ছোকরার বডিটা দারুণ, একেবারে তেলতেলে চাবুকের মতো। ঝট করে হাওয়া কেটে সে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল, আমি ডাইনে ঝুঁকে পা চালিয়ে দিলাম, রাস্তার ধারে তিন ফুট ঢালু খাদে ও গড়িয়ে গেল। ঝন্টেও ভালই লড়ছে। ওর চেহারাটা একটু মোটার দিকে, বোঝাই যায় মালফাল খেয়ে বেশ ফ্যাট জমিয়ে ফেলেছে। তবে বয়স কম, ভাল স্পিড আছে। স্প্রিং-দেওয়া ঢাউস পুতুলের মতো কোমরে একটা ঝটকা মেরে সে আবার ছুটে এল। দশ ইঞ্চি ছুরির ফলাটা আমার নাকের ডগায় যখন নেমে আসছে বাঁ হাত দিয়ে ঝন্টের কবজি ধরে একটা পাক দিয়ে দিলাম, ঝন্টের শরীর বোঁ করে

চরকির মতো পুরো এক পাক ঘুরে পনের ফুট দূরে উড়ে গেল। খাদের ঢাল বেয়ে ততক্ষণে পল্টা আবার উঠে এসেছে।

মিনিট তিন চারেক এভাবে চলল। পল্টা আর ঝন্টের গতিবিধির ওপর আমার চোখ আটকে আছে। তবু তারই মধ্যে নজর পড়ল সেই লোক দুটো, পল্টারা গাড়ি থেকে যাদের টেনে নামিয়েছিল, পিরামিডের মমি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এক সেকেণ্ডের জন্য টোয়োটা গাড়ির জানলায় একটা গোলাকার মুখও দেখতে পেলাম। মুখটা কি আমার চেনা? ভাল করে বুঝবার আগেই এ রকম ফাইট দৃশ্যে ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিকের মতো বোদার গলার আওয়াজ শোনা গেল, 'লড়ে যাও গুরু, লড়ে যাও। আমি আসছি—'বোঝা যাচ্ছে মাকড়াটা ভয়টয় কাটিয়ে উঠেছে।

পল্টা এবং ঝন্টে আবার উঠে এল। এবার ওরা ব্লিৎসক্রিগ অ্যাটাক শুরু করল। দুই ফ্রন্টে একসঙ্গে প্রতিরোধ করা একটু মুশকিলই। আমি যখন পাল্টা আক্রমণের স্ট্র্যাটেজি ভাবছি সেই সময় বোদা টি-স্টলের ঝাঁপের একটা খুঁটি খুলে নিয়ে আঁকশির মতো পল্টার দু পায়ের ভেতর ঢুকিয়ে হ্যাঁচকা টান দিল। পল্টা ঠিকরে আবার খাদের মধ্যে গিয়ে পড়ল।

নতুন রি-ইনফোর্সমেন্ট অর্থাৎ বোদা এসে হাত মেলাতে আমার ঝামেলা অর্ধেক কমে গেল। শরীরটাকে কার্ভ করে ঝন্টের গালে একটা আপার-কাট ঝেড়ে পরবর্তী আক্রমণের জন্যে দাঁড়িয়ে রইলাম।

পল্টা কিন্তু আমার কাছে আর ঘেঁষতেই পারছে না। সে উঠলেই দুপায়ের ভেতর আঁকশি ঢুকিয়ে দিচ্ছে বোদা। অবশ্য অন্য ফ্রন্টে ঝন্টের চোয়ালে ঘাড়ে অথবা মুখে আমাকে আপার কাট কিংবা লোয়ার কাট চালিয়ে যেতে হচ্ছে।

মহাশয়গণ, আমি এখন চেঁচালে হয়তো কিছু লোকজন ছুটে আসবে। অন্য লোক না আসুক, টি-স্টলের দোকানদার, তার বয়, ঠেলাওলা, টোয়োটা গাড়ির সেই লোক দুটো কিংবা ভেতরের গোল মুখওলা লোকটা—এরা এসে আমার সাঁজোয়া বাহিনীর স্ট্রেংথ বাড়িয়ে দিতে পারে। কিন্তু মহাশয়রা আমি ধর্মযুদ্ধের পক্ষপাতী। আমার বিবেক এদিক থেকে পরিষ্কার। ওদের দু'জনের সঙ্গে আমরা দু'জন লড়ছি। দল বাড়িয়ে কিছুতেই অন্যায় করতে পারব না।

আরো মিনিট তিন চারেক এভাবে চলবার পর আচমকা দূরে গাড়ির আওয়াজ পাওয়া গেল। চট করে দেখলাম আর্মড পুলিশের একটা ভ্যান। ঝন্টে ড্যাগার উঁচিয়ে আমার কাছে এসে গিয়েছিল। তার কবজি ধরে এবার আর ঘুরিয়ে দিলাম না। ধরে থেকে বললাম, 'পুলিশ এসে গেছে। কেটে পড়—'

হে-হে মহাশয়গণ, আমার জন্য একে তো তিন ছোকরার মুখের ভেতর থেকে শিকার ফসকে গেল, তার ওপর ঘুষি খেয়ে খেয়ে মুখের ম্যাপ অনেকটা বদলে গেছে। এখন পুলিশ ওদের ধরে নিয়ে গিয়ে বডির মানচিত্র বদলে দিক, এটা মহাশয়রা আমি চাই না।

ঝন্টে দারুণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল। হকচকিয়ে একবার ভ্যানটা দেখল সে। ওদিকে পল্টার নজরেও ভ্যানটা পড়েছে। তাকেও বললাম, 'কুইক। ফাদারের বিয়ে দেখতে না

চাইলে আজিজকে নিয়ে ওই মাঠের ওপর দিয়ে দশ সেকেণ্ডের মধ্যে হাওয়া হয়ে যা। ওয়ান-টু-থ্রি —আমি গুনতে লাগলাম।

কৃতজ্ঞ চোখে এক পলক ওরা আমাকে দেখল। তারপর আজিজকে তুলে নিয়ে লাফ দিয়ে রাস্তার পাশে খাদে নেমে পড়ল। খাদের পর থেকেই মাঠ শুরু হয়েছে। একটু পরেই ওরা ঝোপঝাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

একটা দুশ্চিন্তার হাত থেকে বাঁচা গেল। পুলিশ আর ওদের ধরতে পারবে না। আমার ঘাড়-টাড় কেটেকুটে গিয়েছিল। ঘুষি চালিয়ে চালিয়ে দু'হাত ক্ষতবিক্ষত। হাত-টাত ঝেড়ে নিশ্চিন্তভাবে বোদার দিকে তাকিয়ে হাসলাম।

বোদা অবাক হয়ে গিয়েছিল। বলল, 'গুরু তুমি ওদের কেটে পড়তে দিলে! পুলিশ ভ্যান এসে গিয়েছিল, ওদের ধরিয়ে দিলে না কেন?'

বললাম, 'পুলিশ ছুঁলে টেরিফিক ঝঞ্ঝাট। সাক্ষি দাও, দশ বার কোর্টে ছোটো। শালা এই সব করব, না ফ্রি ওয়ার্ল্ড সিটিজেন হয়ে ঘুরব! ঝামেলা-ফামেলা আমার ভাল লাগে না। মিনিট দশেক একটা ফাইট হল, ঝন্টেরা চলে গেল। ব্যস, নাটকের ওপর কারটেন পড়ল, মানে, যবনিকা পতন। ব্রট ফরোয়ার্ড অর্থাৎ জের টেনে ফাঁসতে যাব কেন বল—'

বোদা আমার সঙ্গে একমত হল। ঘাড় হেলিয়ে বলল, 'সেটা ঠিক গুরু । তবে যা লড়েছ হিন্দি ছবিওলা দেখলে তোমাকে ফাইট-মাস্টার করে নিত।'

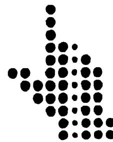
পুলিশ ভ্যানটা কিন্তু এদিকে আসে নি। হলিউডের নার্ভ-চমকানো ছবির একটা দৃশ্যের রিহার্সাল যে এই মুহূর্তে হয়ে গেল সেটা ওদের চোখে পড়ে নি। ভ্যানটা ওদিক দিয়ে ঘুরে বিটি রোডে চলে গেল।

আমি বললাম, 'চল চায়ের দাম-ফাম দিয়ে কলকাতার বাসে ঝুলে পড়া যাক।'

আমরা টি-স্টলের দিকে ঘুরতে যাব, পেছন থেকে ভারি গলায় ব্যকুলভাবে কেউ ডেকে উঠল, 'এই যে শুনুন, শুনুন—'

দেখলাম টোয়োটা গাড়ির সেই গোল এবং প্রচুর মাংসওলা মুখের অধিকারী নেমে ছুটতে ছুটতে আমাদের দিকে আসছে। দেখেই চিনতে পারলাম, মিস্টার সমাজপতি।

কি আশ্চর্য, কাল দুপুর দুটোয় ওঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে। পাঁচ ঘন্টা পর পার্ক স্ট্রিটের বার-এ ঝাড়া চার ঘন্টা অর্থাৎ রাত এগারটা পর্যন্ত ওঁর মুখোমুখি বসে ওঁরই পয়সায় দামী হুইস্কি গলা পর্যন্ত খেয়েছি। তারপর বার ঘন্টাও কাটে নি, আবার দেখা হয়ে গেল।



সমাজপতির সঙ্গে এভাবে এখানে দেখা হয়ে যাবে, ভাবতে পারি নি। লোকটা এমন একটা রোমহর্ষক নাটকের সঙ্গে কিভাবে জড়িয়ে গেল, কে জানে।

সমাজপতির চেহারাখানা এখন দেখবার মতো। চুল উষ্কখুষ্ক, এলোমেলো, চোখ

লালচে, চোয়ালের হাড় ঝুলে পড়েছে। দামী টাইয়ের অর্ধেকটা, কলারের খানিকটা এবং শার্টের তিনটে বোতাম উড়ে গেছে। কোটের বুক পকেটটা-ছিঁড়ে পেটের কাছে নেমে এসেছে। বোঝা গেল কিছুক্ষণ আগে পল্টা টানাটানি করে ওঁকে নামাতে চাইছিল, এগুলো তারই স্মৃতিচিহ্ন। কাছাকাছি এসে আমার একটা হাত ধরে এক নিশ্বাসে সমাজপতি বলে যেতে লাগল, 'ইউ হ্যাভ সেভড মাই লাইফ। ইউ আর মাই সেভিয়ার। আপনি না এগিয়ে এলে দ্যাট প্যাক অফ ব্লাড হাউণ্ডস আমাকে মেরেই ফেলত। বাই দিস টাইম আমার ডেড বডি রাস্তায় পড়ে থাকত।' বলতে বলতে হঠাৎ আমার মুখের দিকে নজর পড়তে থেমে গেলেন। একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'চেনা মনে হচ্ছে। ইউ সীম টু বি আ নোন ফেস—'

বললাম, 'কাল রাতে আমি স্যার আপনার চামচা ছিলাম। চেনার তো কথাই।'

বোদা আমার কাঁধের পাশ থেকে বলে উঠল, 'আর আমি ছিলাম আপনার চমচার চামচা।'

সমাজপতি গল গল করে ঘামছিলেন। একেক বার ঘাড়ে-গলায়-গালে রুমাল চেপে গা শুকিয়ে নেন। পরমুহূর্তে আবার ফিনকি দিয়ে ঘাম বেরোয়। লোকটা যেভাবে ঘামছে শরীরের সব সল্ট না বেরিযে যায়।

যাক গে, মিস্টার সমাজপতি দু'হাতে আমাকে তাঁর বুকের ভেতর জাপ্টে ধরলেন। ধরা ধরা গলায় বললেন, 'ইউ হ্যাভ গিভন মি নিউ লাইফ। তোমার জন্যে পুনর্জীবন পেলাম। নিজের লাইফের রিস্ক নিয়ে তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ। ইউ আর গ্রেট।'

বললাম, 'আমি তেমন কিছুই করিনি। আপনি যদি বার বার এ-কথা বলেন, আমার উইক গ্ল্যাণ্ডগুলোতে কিন্তু সুড়সুড়ি লেগে যাবে। আমি কিন্তু নিজেকে সত্যি সত্যি গ্রেট ভাবতে শুরু করব স্যার।'

সমাজপতি আমার কথা খুব সম্ভব শুনতে পেলেন না। গদগদ ভাষায় আমি যে তাঁর জীবনটা রক্ষা করেছি, আমার কাছে তাঁর কৃতজ্ঞতার যে শেষ নেই—এই কথাটাই বার বার বলে যেতে লাগলেন। মানে একই রেকর্ড ঘুরে ফিরে বাজতে লাগল।

বাজনার মধ্যে দম নেবার জন্য সমাজপতি যেই একটু থেমেছেন সেই গ্যাপটায় বললাম, 'এবার ছাড়ুন স্যার, আমাদের কলকাতায় ফিরতে হবে।'

'ছাড়ব মানে! তোমরা আমার সঙ্গে কলকাতায় যাবে। কাম অন—'

'কিন্তু—'

'কিন্তু ফিন্তু নয়। তুমি আমার লাইফ দিয়েছ, তোমার সম্বন্ধে আমার কিছু করা দরকার। আই হ্যাভ গট সামথিং টু ডু ফর ইউ।'

'এই সামান্য ব্যাপারের জন্যে আপনি ব্যস্ত হবেন না স্যার।' প্রায় বিনয়ের অবতার হয়ে বলে গেলাম।

কণ্ঠস্বরটা বিস্ময়ে চুবিয়ে এক হ্যাঁচকায় অনেকটা ওপরে তুললেন সমাজপতি, 'সামান্য! একে তুমি সামান্য বলছ! পরের জন্যে ক'জন লাইফের রিস্ক নেয়, অ্যাঁ? তোমাকে আমি

ছাড়ছি না।'

ভদ্রলোক যখন ছাড়তে চাইছেন না তখন ওর সঙ্গে যাওয়াই যাক। ভাল ভাল কিছু কথা শোনা যাবে। হে-হে মহাশয়গণ, আপনারা তো জানেনই আমার সম্বন্ধে কারো ধারণাই খুব সুখকর নয়। আমাকে পেলে অনেকেই ছাল-টাল ছাড়িয়ে আমারই হাতে ধরিয়ে দেবে। এইরকম যখন অবস্থা তখন একটা লোক কাছে বসিয়ে আমার সম্বন্ধে মহৎ, রক্ষাকর্তা, জাতির গৌরব ইত্যাদি বাছা বাছা সব অ্যাডজেকটিভ প্রয়োগ করবে। শুনতে খারাপ লাগবে না। তা ছাড়া এর মধ্যে আমার মাথায় একটা দুর্দান্ত প্ল্যানও এসে গেছে। আর কিছু না হোক, দুপুরবেলা সমাজপতির ঘাড় ভেঙে একটা ভাল লাঞ্চ নিশ্চয়ই জুটিয়ে ফেলতে পারব। এ ব্যাপারে মহাশয়রা আমার আত্মবিশ্বাস আছে। যাই হোক বললাম, 'তবু স্যার এক মিনিটের জন্য আমাকে ছেড়ে দিতে হবে। ওই চায়ের দোকানটায় বোদা আর আমি চা আর লেড়ো বিস্কুট খেয়েছিলাম, দামটা দিয়ে আসি। তা ছাড়া ঠেলাওলাটাকে তিনটে টাকা দিতে হবে। বেচারার কোনো দোষ নেই। ওর ঠেলা ভাড়া করে এনে ছোকরারা রাস্তায় ব্যারিকেড করেছে। অথচ দেখুন, কেটে পড়ার আগে ভাড়াটাই দিয়ে গেল না। গরিব মানুষ, ও শুধু শুধু কেন লস্ করবে বলুন।'

'ও, এই ব্যাপার!' সমাজপতি আমাকে যেতেই দিলেন না। স্বয়ং দৌড়ে গিয়ে দাম-টাম চুকিয়ে ঠেলাওলাকে দশটাকার আরো একখানা বাড়তি নোট দিয়ে এক মিনিটের মধ্যে ফিরে এলেন। সেই লোকদুটো—একজন সমাজপতির ড্রাইভার, অন্য লোকটা কে জানি না—রাস্তার একধারে পক্ষাঘাতের রুগীর মতে নট নড়ন চড়ন দাঁড়িয়ে ছিল। সমাজপতির হুঙ্কারে তারা দৌড়ে টোয়োটা গাড়িটায় গিয়ে ঢুকে পড়ল। এবার সমাজপতি আমার দিকে ফিরে সুগার-লাগানো হাসিটা হেসে বললেন, 'এস—'

সামনের সিটে শোফার, সেই লোকটা আর বোদা বসেছে। পেছনের সিটে সমাজপতি এবং আমি।

ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাব স্যার?'

সমাজপতি বললেন, 'আগে ফ্যাক্টরিতে চল। ওখান থেকে কলকাতায় ফিরব।'

গাড়িটা এতটুকু শব্দ না করে তেলের মতো রাস্তার ওপর দিয়ে গড়িয়ে যেতে লাগল।

সমাজপতি কি বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ আমার একটা কথা মনে পড়ে যেতেই বলে উঠলাম, 'ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না।'

সমাজপতি জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন, 'কোন ব্যাপারটা?'

'ওই ছোকরাগুলো আপনার গাড়িতে হোল্ড-আপ করল কেন? হেভি ক্যাশ-ফ্যাশ ছিল নাকি?'

'ছিল—' পায়ের কাছে একটা পুরু চামড়ার মজবুত বাক্স দেখিয়ে সমাজপতি বললেন, 'এতে দু লাখ টাকা আছে।'

বোঝা গেল, পল্টাদের লক্ষ্য ছিল এই বাক্সটা। আমি কিছু বললাম না।

সমাজপতি এরপর যা বললেন, সংক্ষেপে এইরকম। কাছাকাছি তাঁদের একটা লোহার

কারখানা আছে, নাম জেনিথ স্টিল লিমিটেড। ওর্য়াকার হাজার দেড়েক। মাসে দু'বার অর্থাৎ প্রতি ফোর্টনাইটে একবার করে মাইনে দেওয়া হয়। মাইনের দিন দশটা সাড়ে-দশটায় টাকাটা নিয়ে তিনি ফ্যাক্টরিতে আসেন। অন্য বিশ্বাসী লোক তাঁদের কোম্পানিতে যথেষ্ট আছে। তবু নিজেই টাকাটা নিয়ে আসা তাঁর একটা হবি। অন্য দিন গাড়িতে আর্মড গার্ড থাকে, আজ সঙ্গে গার্ড ছিল না। যে ভাবেই হোক, খবর পেয়ে ছোকরা তিনটে রাস্তায় ব্যারিকেড বসিয়ে হোল্ড-আপ করেছিল। অবশ্য ওদের অ্যাটেমপ্ট আনসাকসেসফুল। সমাজপতি বলতে লাগলেন, 'এর জন্যে সবটুকু কৃতিত্ব তোমার। আই অ্যাম রিয়ালি গ্রেটফুল। হোল লাইফের জন্যে তোমার কাছে ঋণী হয়ে রইলাম।'

উত্তর দিলাম না। আচমকা মনে পড়ল, ঝন্টেদের মুখে ললিত হালদারের নাম শুনেছিলাম। সে-ই তাদের সমাজপতির যাবতীয় খবরাখবর দিয়েছিল। ললিত হালদারের কথা বলব নাকি? একটু চিন্তা করে শেষ পর্যন্ত আর বললাম না। দেখাই যাক না, ললিত হালদাবের সঙ্গে দুম করে আলাপ-টালাপও হয়ে যেতে পাবে। হে-হে মহাশয়গণ, আপনারা জনেন চারদিক আমি চষে বেড়াই। আমার মতো একজন গ্লোব-ট্রটারেব পক্ষে এক বছর, দু বছর, কি দশ বছরের মধ্যে ললিত হালদার নামে একটি লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়াটা কোনো ঘটনাই নয়। পৃথিবীর যে কোনো লোকেব সঙ্গে যে কোন মুহূর্তে আমার যোগাযোগা ঘটে যেতে পারে।

কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা জেনিথ স্টিলের বিশাল ফ্যাক্টরিতে এসে ঢুকলাম। দারোযান থেকে ম্যানেজার পর্যন্ত একগাদা লোক পড়ি মবি করে ছুটে এল। ওয়ার্কস ম্যানেজাব নিজেরই গাড়ির দরজা খুলে দিয়ে বললেন, 'আসুন স্যার—'

সমাজপতি বললেন, 'আমি আজ আর নামব না। তুমি স্যালারি দিয়ে দিও।' বলেই চামড়ার ব্যাগটা তুলে ওয়ার্কস ম্যানেজারের হাতে দিলেন।

উদ্বিগ্নভাবে ওয়ার্কস ম্যানেজাব তাঁকে দেখতে দেখতে বললেন, 'স্যার, আপনার শরীব খারাপ হয়নি তো?'

'ডু আই লুক সো?' সমাজপতি ভারি ঠোঁটদুটো দু-ধারে ছড়িয়ে দিয়ে ঈষৎ হাসলেন।

ছেঁড়া টাই, ফেঁসে-যাওয়া পকেট, উল্টে যাওয়া কলারের ওপর ওয়ার্কস ম্যানেজারেব নজর আটকে ছিল। চিন্তিতভাবে তিনি বললেন, 'আপনাকে স্যার ভাল দেখাচ্ছে না।'

সমাজপতি বললেন, 'তুমি নেত্যগোপালেব কাছ থেকে সব জেনে নিও।' বলেই সামনের সিটে ড্রাইভার এবং বোদার মাঝখানে শিবঠাকুর হয়ে বসে থাকা সেই লোকটার দিকে তাকালেন, 'নেত্যগোপাল তুমি নামো। চক্রবর্তীকে রাস্তার ব্যাপারটা বলে দিও।'

'বলব স্যার—' নেত্যগোপাল নেমে পড়ল।

সমাজপতি ড্রইভারকে বললেন, 'কলকাতায় চল।'

জাপানি টোয়োটা মসৃণ গতিতে আবার রাস্তায় নেমে এল। খানিকটা যাবার পর সমাজপতি বললেন, 'একটা কাজ করা বোধ হয় দরকার, তুমি কি বল?'

সমাজপতি ঠিক কী বলতে চান, বুঝতে না পেরে তাকিয়ে রইলাম।

সমাজপতি এবার বললেন, 'এরকম একটা ইনসিডেন্ট ঘটল। পুলিশকে খবরটা জানানো উচিত। একবার এখানকার থানাটা হয়েই যাই।'

'তা যান স্যার। তবে আমার আর আমার পার্টনার বোদার নামটা করবেন না। হে-হে মহাশয়গণ, আপনারা বুঝতেই পারছেন পুলিশ-টুলিশের ঝামেলায় আমাদের না ঢোকাই ভাল। কী করতে কী হয়ে যাবে, গর্তের ভেতর থেকে সট করে একখানা কিং কোব্রা হয়তো বেরিয়ে পড়বে।'

সমাজপতি অবাক। বললেন, 'সে কি, তোমরাই তো সমস্ত ঘটনার হিরো। তোমাদের বাদ দিলে ডায়েরি হবে কী করে? ছোকরাগুলো যদি কখনও ধরা পড়ে, যদি পুলিশ-কেস হয়, তোমরা হবে ফার্স্ট উইটনেস। তোমরা না থাকলে কেসটা দাঁড় করানো যাবে না।'

'একটা কথা বলব স্যার?'

'নিশ্চয়ই।'

'ওরা তো একটা পয়সাও নিতে পারে নি। হোল্ড-আপ করতে এসে বেধড়ক রগড়ান খেয়ে মুখের ম্যাপ-ট্যাপ পাল্টে চলে গেল। ওদের পেছনে আর পুলিশ লেলিয়ে কী হবে? ছেড়েই দিন।'

'ছেড়ে দিতে বলছ!'

'আজ্ঞে—'

'ঠিক আছে। ইউ আর মাই সেভিয়ার। তোমার কথা আমাকে রাখতেই হবে। তবে কথাটা কি জানো, ব্যাপারটা ইগনোর করা ঠিক না। ফিউচার সেফটির জন্যে পুলিশকে জানাবার কথা বলছিলাম। ও-কে, তোমার যখন ইচ্ছে নয়—'

আমি উত্তর দিলাম না।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সমাজপতি বললেন, 'তোমাদের দেখে তো মনে হচ্ছে এখনও খাওয়া-টাওয়া হয় নি।'

'আজ্ঞে না। ওই টি-স্টলটায় বসে লেড়ো বিস্কুট দিয়ে সবে ব্রেকফাস্ট করছি তখনই ঘটনাটা ঘটল। ব্রেকফাস্ট আমরা শেষ করতে পারি নি স্যার, লাঞ্চ তো দূরের কথা।'

সমাজপতি খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। বললেন, 'তোমরা আমার গেস্ট, দুপুরে আমার সঙ্গে লাঞ্চ খাবে।' বলতে বলতে হঠাৎ আমার রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত হাত দুটোতে তাঁর নজর পড়ল। তাঁর ব্যস্ততা দুম করে দশগুণ বেড়ে গেল। ব্যস্ততার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উৎকণ্ঠাও। সমাজপতি বললেন, 'লাঞ্চের আগে তোমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে।'

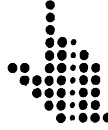
বললাম, 'ও কিছু না স্যার। একটু ডেটল-ফেটল লাগিয়ে দিলেই ঠিক হয়ে যাবে।'

'এ ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দাও। এ নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।'

হে-হে মহাশয়গণ, কাণ্ডটা একবার দেখুন। আমার মা-বাবা কিংবা ফোর ফাদারের কেউ কখনও আমার সম্বন্ধে এভাবে চিন্তা-ফিন্তা করে নি। যেরকম দেখছি আমার শালা না পাঁচখানা ল্যাজ গজিয়ে যায়। ঠিক বুঝতে পারছি না, ইস্টম্যান কালারে তোলা কোনো হিন্দি ছবির দুর্দান্ত একখানা ফিল্ম সিকোয়েন্সে ঢুকে পড়েছি কিনা। যাক গে, নিজেকে নিয়ে

আমি আর মাথা-ফাতা ঘামাচ্ছি না। আপনারা তো জানেনই, এতকাল—মানে তেতাল্লিশটা বছর পর্যন্ত নিজের ভাবনা আমার নিজেকেই ভাবতে হয়েছে। এখন আমার ডান পাশে প্রায় নব্বই কে-জি ওয়েট, ছ'ফুট খাড়াই, তিন ফুট প্রস্থের যে লোকটি বসে আছে সে যখন আমার কিছু দায়িত্ব নিজের কাঁধে চাপাতে চাইছে তখন আমার ব্রেনের সেই প্ল্যানিং কমিশনের দরজায় কিছুক্ষণের জন্য তালা ঝুলিয়ে দিতে পারি, না কি বলেন? হেসে হেসে বললাম, 'ঠিক আছে স্যার, আমি আর কিছু ভাবছি না।'

সমাজপতি গলার ভেতর আনন্দসূচক একটা শব্দ করে বললেন, 'দ্যাটস লাইক আ গুড বয়।'



কলকাতায় এসে মিস্টার সমাজপতি আমাদের যে এয়ার কণ্ডিশানড নার্সিং হোমটায় নিয়ে এলেন এর আগে তার আড়াই কিলোমিটার রেডিয়াসের মধ্যে কখনও ঢুকি নি। পুরো বার তলা বাড়িটাই লাল পার্সিয়ান কার্পেট দিয়ে মোড়া। পা ফেললেই হাঁটু পর্যন্ত ঢুকে যায়। প্রতিটি ফ্লোরে সিঁড়ি এবং করিডরের ধারে ধারে অর্কিড, ক্যাকটাস আব নানা বিদেশি ফুল ফুটিয়ে রাখা হয়েছে। নীলাভ নরম আলোয় চারদিক যেন ড্রিমল্যাণ্ড।

সমাজপতিকে দেখে গোটা নার্সিং হোমের পাল্‌স চঞ্চল হয়ে উঠল। রেসিডেন্ট ডিরেক্টব থেকে জুনিয়র এবং সিনিয়র ক'জন ডাক্তার এবং নার্স ছুটে এল।

মহাশয়রা, দশ মিনিট পর দেখলাম আমি এক্স-রে থিয়েটারে দাঁড়িয়ে আছি। সুখের বাতাসে গা ভাসিয়ে কখন আমি এখানে এসেছি, নিজেই জানি না। আধঘন্টার মধ্যে আমার এক্স-রে হয়ে গেল, তার রিপোর্ট পেয়ে গেলাম। নাঃ, হাড়ে ফ্র্যাকচার হয় নি। আরো পনেরো মিনিট পর দেখা গেল, আমি আরেকটা ড্রিম সিকোয়েন্সে ঢুকে গেছি। ড্রেসিং রুমে নিয়ে গিয়ে একটি ইউরেশিয়ান নার্স, মহাশয়গণ তার বয়েস তেইশ চব্বিশের বেশি হবে না, রং গোলাপি, সরু কোমরের তলায় বিশাল পশ্চাৎভূমি, খাড়া ধাবাল নাক, মেলে দেওয়া টিয়াপাখির ডানার মতো ভুরুর তলায় নীলচে চোখ—পালকের মতো নরম আঙুল দিয়ে আমার দু'হাতে ড্রেস করে দিল।

ঘন্টাখানেক বাদে সমাজপতি আমাদের নিয়ে নাসিংহোম থেকে সোজা পার্ক স্ট্রিটে কালকের সেই বার-কাম-রেস্তোরাঁটায় চলে এলেন। হালকা আরামদায়ক আলোতে রেস্তোরাঁটা ভরে আছে। কালকের মতোই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বার-সিঙ্গার একটা দারুণ উত্তেজক পপ গাইছিল। এই লাঞ্চ-টাইমে রেস্তোরাঁয় বেশ ভিড় রয়েছে। চারদিকের টেবলে থোকায় থোকায় কাস্টমাররা বসে আছে। কোণের দিকে একটা মোজেক-করা ত্রিকোণ পিলারের ধার ঘেঁষে ফাঁকা টেবল পেয়ে গেলাম।

সমাজপতি প্রথমে বিয়ার, পরে ইণ্ডিয়ান এবং ইউরোপিয়ান দু-রকম মিশিয়ে এক এক

কোর্স লাঞ্চের অর্ডার দিলেন। একটু পরেই বিয়ার এসে গেল।

এক চুমুক বিয়ার খেয়ে বোদার দিকে ফিরলাম। বোদা কালকের মতো চোখ টেনে বড় করে বার-সিঙ্গারের নাইকুণ্ডুল আর বুক দেখছিল। তার কানে মুখ ঠেকিয়ে ফিস ফিস করে বললাম, 'ওয়ার্ল্ডে আরো অনেক কিছু দেখবার আছে। বানচোত এদিকে চোখ ফেরাও।'

হকচকিয়ে বোদা আমার দিকে ঘুরল। সঙ্গে সঙ্গে হারমোনিয়ামের রিডের মতো তার দু'পাটি দাঁত দেখা গেল অর্থাৎ মাকড়া হাসল।

আমি ফিসফিসিয়ে আবার বললাম, 'চার টাকায় কি খাওয়া জুটবে ভেবে তো তার হার্ট ফেল করে যাচ্ছিল। এখন কিরকম একখানা লাঞ্চ হচ্ছে বল!'

বোদা কিছু বলল না। তবে আরেক বার হারমোনিয়ামের রিডগুলো দেখা গেল।

আমি এবার সমাজপতির দিকে তাকিয়ে বললাম, 'স্যার, আপনি আমাদের হ্যাবিট খারাপ করে দিচ্ছেন।'

সমাজপতির পুরো এক গেলাস বিয়ার খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। ন্যাপকিনে মুখ মুছতে মুছতে বললেন, 'কিরকম?'

'কাল হুইস্কি খাওয়ালেন, ডিনার খাওয়ালেন। আজ বিয়ার খাওয়াচ্ছেন, লাঞ্চ খাওয়াচ্ছেন। জিভটা স্যার ক্যাপিটালিস্টদের মতো হয়ে যাচ্ছে।'

সমাজপতি আমোদ অনুভব করলেন। ঈষৎ হাসলেন, কিছু বললেন না।

আমি তাঁর ফাঁকা গেলাসে বোতল থেকে বিয়ার ঢেলে দিয়ে বললাম, 'এরপর কি পাঞ্জাবির দোকানের রুটি-তড়কা গলা দিয়ে নামবে?'

সমাজপতি আবার হাসলেন। তারপর একটু ভেবে বললেন, 'এসব কথা থাক। ইউ হ্যাভ সেভড মাই লাইফ। তোমার সম্বন্ধে আমার একটা ডিউটি আছে। কিন্তু কী করা যায়?' সমাজপতি গম্ভীরভাবে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। আমার ব্যাপারে কিছু একটা করতে না পারলে লোকটার বোধ হয় ইনসমনিয়া হয়ে যাবে।

আমি চুপচাপ চুক চুক করে বিয়ার খেতে লাগলাম।

সমাজপতি হাতের মুঠোয় আচমকা কি যেন পেয়ে গেলেন। স্পটলাইটের মতো তাঁর চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। বললেন, 'আচ্ছা তোমাকে যদি আমার কোম্পানিতে একটা ভাল চাকরি দিই? সে—হাজার টাকা মাইনে?'

'না স্যার, দয়া করে ওটা দেবেন না।' আমি হুমড়ি খেয়ে টেবলের তলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে সমাজপতির পা ধরতে গেলাম।

সমাজপতি সট করে পা সরিয়ে নিয়ে আমাকে তুলে বসিয়ে দিলেন। হাজার টাকার চাকরি অফার করলে নিতে চায় না, এমন লোক সমাজপতি খুব সম্ভব এই প্রথম দেখলেন। অবাক হয়ে বললেন, 'নেবে না কেন?'

'চাকরি নিলে আমার ক্যারেক্টার খারাপ হয়ে যাবে।'

'আই সি—' সমাজপতি চোখ স্রেফ গোলাকার হয়ে গেল।

একটু চুপ। তারপর সমাজপতি আরেক প্রস্থ চিন্তাটিন্তা করে বললেন, 'তোমার নামে যদি একটা ফ্ল্যাট লিখে দিই?'

আমি আবার টেবলের তলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে সমাজপতির পা খুঁজতে লাগলাম। সমাজপতি আঁতকে ওঠার মতো করে বললেন, 'আরে কী করছ, কী করছ?' বলেই নিজের পা দুটো ফোম-দেওয়া চেয়ারে তুলে নিলেন।

অগত্যা আমাকে আবার সোজা হয়ে বসতে হল। বললাম, 'স্যার, ফ্ল্যাট নিলেও আমার ক্যারেক্টার খারাপ হয়ে যাবে।'

'কেন হে, কেন?'

'ফ্ল্যাট একটা প্রপার্টি কিনা।'

'তা তো বটেই।'

'প্রপার্টি মানেই ঝামেলা। এটা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন?'

থেমে থেমে সমাজপতি বললেন, 'তা হ্যাঁ, একটু আধটু ঝামেলা তো আছেই।'

'তা হলে ওই ক্যাঁচাকলে জেনেশুনে কেন পা ঢোকাব বলুন।' আমি হাসতে হাসতে বলতে লাগলাম, 'তা ছাড়া—'

'তা ছাড়া কী?'

'আজ আপনার ফ্ল্যাটটা নিলে কাল ইচ্ছে হবে আরো দামী একটা ফ্ল্যাট হোক, পরশু একটা ফার্স্টক্লাস বাংলোর চিন্তা মাথায় ঢুকে যাবে। তারপরের দিন ভাবব চৌরঙ্গিতে আমার একটা মাল্টি-স্টোরিড বিল্ডিং হবে না কেন? একবার এই চক্করে ঢুকলে খালি প্রপার্টির কথাই চিন্তা করব। নিজের কথা কখন ভাবব? আমাকে লোভ দেখাবেন না স্যার। আমার হার্ট খুব উইক।' বলে একটু থামলাম। তারপর বললাম, 'এ ছাড়া আরো একটা ব্যাপার আছে।'

'সেটা কী?'

'আপনাকে কালই জানিয়ে দিয়েছি আমি একজন বিশ্ব নাগরিক। মনে আছে স্যার?'

আস্ত এক বোতল বিয়ার ইতিমধ্যে সমাজপতির পাকস্থলীতে ঢুকে তাঁর হার্ট, কিডনি এবং নার্ভে চাপ দিচ্ছিল। ঘাড়ে-গলায় কণা কণা ঘাম জমছিল। ন্যাপকিন দিয়ে ঘাম মুছতে মুছতে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, মনে আছে।'

'তা হলে বুঝতেই পারছেন আপনার ফ্ল্যাট নেওয়া মানেই সেখানে আটকে যাওয়া। যখন যেখানে খুশি আর যেতে পারছি না। যেখানে সেখানে ইচ্ছামতো থাকতে পারছি না। আপনার দু-রুম কি তিন-রুম ফ্লাটে বাকি লাইফটা একটু ভাল জাতের প্রিজনার হয়ে কাটিয়ে দিতে হবে। তার মানেটা কী দাঁড়াল?'

স্কুলের গ্লোবের মতো সমাজপতির চোখ দুটো গোল্লা পাকিয়েই আছে। ঘামতে ঘামতেই তিনি বললেন, 'কী দাঁড়াল?'

'ওয়ার্ল্ড সিটিজেনশিপের খাতা থেকে ঘ্যাচাং করে আমার নামটি কাটা গেল। আমি আর বিশ্বনাগরিক থাকলাম না। আচ্ছা আপনি যে ফ্ল্যাটটা দিতে চাইছেন তার কার্পেট এরিয়া কত হতে পারে?'

সমাজপতি বিমূঢ়ের মতো জিজ্ঞেস করলেন, 'এই ধর অ্যাবাউট থাউজেণ্ড স্কোয়ার ফিট। কেন?'

'এক হাজার ফুট জায়গার জন্য গোটা ওয়ার্ল্ডটা আমি ছাড়তে পারি না। আপনিই বলুন স্যার, ছাড়া উচিত?'

আমার মতো জীব বোধ হয় আগে আর দেখেন নি সমাজপতি। পা থেকে মাথা পর্যন্ত আমাকে ভাল করে একবার দেখে নিয়ে বললেন, 'তুমি দেখছি একেবারে মুক্তপুরুষ হে।'

আমি হাসলাম। তারপর চুকচুক করে আবার বিয়ার খেতে লাগলাম।

সমাজপতি বলতে লাগলেন, 'ইউ আর আ ফাইন টেবল-টকার। তোমার কথাগুলো বেশ ভাববার মতো।'

বোঝা যাচ্ছে বিয়ারে যে এইট না টেন পারসেণ্ট অ্যালকোহল থাকে তাতেই লোকটার নার্ভে ঝুমঝুমি বাজতে শুরু করেছে। নইলে গণ্ডাখানেক কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর হয়ে সে কিনা একটা দারুণ নিরীহ চিটিংবাজের কথায় এরকম পটকে যায় দু'হাত কচলে বললাম, 'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার, থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ।'

একেক জনের স্টমাকে পুরো এক বোতল করে বিয়ার ঢুকে যাবার পর খাবার এসে গেল।

চিকেন সুপে চুমুক দিয়ে সমাজপতি বললেন, 'তুমি চাকরি নেবে না, ফ্ল্যাট নেবে না, কী করা যায় বল তো তোমাকে নিয়ে?'

আমি হাসতে হাসতে বললাম, 'কিচ্ছু করতে হবে না স্যার। আমার ভাবনাটা এবার আপনি ছেড়ে দিন।'

'ছাড়লেই হল!' সমাজপতি আরো গভীরভাবে চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

নাঃ, লোকটার মাথা থেকে কিছুতেই পোকাটা বার করা যাবে না। আমি তার প্রাণ বাঁচিয়েছি, সুতরাং আমার জন্য যতক্ষণ একটা কিছু তিনি করতে না পারছেন ততক্ষণ যতই বলি না কেন, ঠিক ভেবেই যাবেন। হে-হে মহাশয়গণ, ভাবতে ভাবতে লোকটার সেরিব্রাল অ্যাটাক না হয়ে যায়। যাক গে, এ নিয়ে আমি আর কিছু বললাম না।

নিঃশব্দে লাঞ্চ চলতে লাগল। বুঝতে পারছিলাম, লোকটার মাথায় সেই ভাবনাটা নাগরদোলার মতো ঘুরে যাচ্ছে।

খাওয়া যখন শেষ হয়ে এসেছে সেই সময় সমাজপতি বললেন, 'ঠিক আছে, তোমাকে এখন অন্য কিছু দিচ্ছি। এবার কিন্তু না বলতে পারবে না। প্লিজ—'

আমি কিছু বলবার আগেই পকেট থেকে ঢাউস একখানা পার্স বার করে দশখানা একশো টাকার নোট অর্থাৎ পুরো হাজারটি টাকা আমার পকেটে পুরে দিয়ে সমাজপতি বললেন, 'আপাতত এ ছাড়া আমার মাথায় কিছু আসছে না। এটা অ্যাবসোলুটলি টেম্পোরারি ব্যাপার। পরে তোমার জন্য পার্মানেণ্ট কিছু ভাবতে হবে।'

'কিন্তু স্যার—' বিয়ারের নেশায় ঢুলু ঢুলু ভারি চোখে সমাজপতির দিকে তাকালাম।

'কী হল?'

'আমি কিন্তু এভাবে টাকা রোজগার করি না।'

'কিভাবে কর?'

'ব্রেন থেকে নানারকম প্ল্যান ট্যান বার করে সেগুলো কাজে লাগিয়ে—'

আমাকে থামিয়ে দিয়ে সমাজপতি বললেন, 'এটাকে রোজগার ভাবছ কেন? ধর এই টাকাটা তোমাকে উপহার দিলাম—'

'উপহার!' আমি হাসলাম, 'ঠিক আছে স্যার, আপনি যখন চাইছেন আপনার মানিব্যাগ হালকা হয়ে আমার মানিব্যাগের হেল্‌থ্ ভাল হয়ে উঠুক তখন আর আপত্তি করব না। তবে এভাবে উপহার নিলে আমার চরিত্র দূষিত হয়ে যাবার ভয় আছে।'

আমার কথা সমাজপতি শুনলেন না। বলতে লাগলেন, 'পরশু তুমি থিয়েটার রোডের এই ঠিকানায় আমার সঙ্গে দেখা করবে। অ্যাট শার্প সেভেন। ওখানেই তোমার পার্মানেণ্ট একটা ব্যবস্থা করব।' বলেই পকেট থেকে কাগজ বার করে ঠিকানা লিখে আমার হাতে দিতে দিতে বললেন, 'স্যুইট নাম্বার থার্টি ফোর, ফিফটিনথ ফ্লোর—'

'কিন্তু স্যার—'

'নো প্রোটেস্ট। ডোণ্ট বি ডিস-ওবিডিয়েণ্ট বয়। পরশু, থিয়েটার রোড, স্যুইট নাম্বার থার্টি ফোর, ফিফটিনথ ফ্লোর, অ্যাট শার্প সেভেন। মনে থাকবে?'

'আমার পার্টনার এই বোদা যদি কোনো শুঁড়িখানায় ঢুকিয়ে বেঙ্গল খাইয়ে না দেয়, ঠিক মনে থাকবে স্যার—'

'বেঙ্গল—বেঙ্গল কী?'

লাজুক হেসে বললাম, 'মা কালীর পেসাদ—'

সমাজপতি বললেন, 'মানে ধেনো মদ! এই সব রাবিশ খেয়ে পেটে সিরোসিস ধরিয়ে ফেলবে যে।'

বুজগুড়ি কাটার মতো বুড় বুড় করে বললাম, 'স্যার আমরা দেশপ্রেমিক। দিশি এন্টারপ্রাইজকে সব সময় উৎসাহ দিয়ে থাকি। এতে যদি তিন ইঞ্চি একটা লিভার যায় তো যাক।'

'না না, আর বেঙ্গল-টেঙ্গল নয়। এখন থেকে আমি তোমাদের স্কচ-ফ্রেঞ্চ-কনিয়াক খাওয়াব।'

'কিন্তু স্যার, আমাদের প্যাট্রিয়টিজিমের কী হবে?'

'লিভার বাঁচলে অনেক দেশপ্রেম দেখাতে পারবে।'

একসময় আমাদের লাঞ্চ শেষ হল।

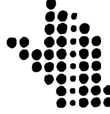
আড়াইটা বেজে গিয়েছিল। বাঁ হাতের কবজি উল্টে দামী জাপানি ঘড়িটা দ্রুত একবার দেখে নিয়ে সমাজপতি বললেন, 'আমাকে এখন উঠতে হচ্ছে। তিনটেয় আমাদের রেজিস্টার্ড অফিসে ডাইরেক্টরস বোর্ডের একটা মিটিং আছে।' বলেই বয়কে ডেকে তাড়াতাড়ি বিল চুকিয়ে উঠে পড়লেন।

একটু পর সমাজপতির পিছু পিছু ছুঁচের পেছনে সুতোর মতো বোদা আর আমি শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত রেস্তোরাঁটার বাইরে চলে এলাম। পরশু থিয়েটার রোডে দেখা করার

কথাটা আরেক বার মনে করিয়ে দিয়ে সমাজপতি তাঁর টোয়োটা গাড়িতে গিয়ে উঠলেন।

বোদা জিজ্ঞেস করল, 'গুরু, এখন আমাদের কী প্রোগ্রাম?'

বললাম, 'নো প্রোগ্রাম। বড্ড গরম লাগছে। ম্যাটিনি শো-তে একটা এয়ার কণ্ডিশানড সিনেমা হলে ঢুকে এখন পুরো তিনটি ঘণ্টা ঘুমবো। তারপর শোভাবাজারে হোম, সুইট হোমে ফিরে যাব।'



সিনেমা-টিনেমা দেখে সন্ধেবেলা শোভাবাজারে ফিরে দেখি, হে-হে মহাশয়গণ, সত্যনাশ হয়ে গেছে। আমরা দুই বিশ্ব-নাগরিক যে পুরনো লঝ্ঝড় বাড়িটায় ক'দিন ধরে আছি তার দোতলার অর্ধেকটাই এখন নেই। কর্পোরেশন নোটিশ লাগিয়ে গিয়েছিল, পনের দিনের মধ্যে বাড়িটা ভেঙে ফেলবে। কিন্তু তার ঢের আগেই বোধ হয় বাড়িভাঙার কাজ শুরু হয়ে গেছে। কাল দুপুর থেকে আজ সন্ধে পর্যন্ত আমরা এখানে ছিলাম না। তার ভেতরেই নিশ্চয় কর্পোরেশন তার স্কোয়াড পাঠিয়ে বাড়িটাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেবার কাজ চালু করে দিয়েছে।

বোদা বলল, 'গুরু, এটা কি আমাদের বাড়ি?'

বললাম, 'তবে কোনটা? ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলটা?'

আঙুল দিয়ে চোখের ফাঁদ বড় করে বোদা জিজ্ঞেস করল, 'তা হলে দোতলার ওধারটা গেল কোথায়?'

কোথায় যেতে পারে, বললাম।

এক সেকেণ্ড চোখ কুঁচকে কি ভাবল বোদা, তারপর চুল খামচে ধরে গলার শির ছিঁড়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'আমার বারট বেজে গেল গুরু—'

চমকে উঠলাম, 'কী হল রে?'

'মাকড়ারা যখন বাড়ি ভাঙতে এসেছিল তখন নির্ঘাত আমার নতুন প্যান্টজামা বাক্স-ফাক্স সব গেঁড়িয়ে নিয়ে গেছে। এত প্ল্যান করে গুরু তুমি পরশু পার্ক স্ট্রিটের সেই দোকানটা থেকে প্যান্ট-ফ্যান্টগুলো নিয়ে এলে—'

দামী দামী নতুন প্যাণ্ট-জামার শোকে বোদা চুল ছিঁড়ে যাচ্ছে। তার কাঁধে আলতো করে একটা টোকা দিয়ে সান্ত্বনা দিলাম, 'চোখের জল মুছে ফেল শালা। আমার মাথায় তুই তো জানিসই আস্ত একখানা প্ল্যানিং কমিশন বসানো আছে। এবার তোর জন্যে বাহাত্তরটা বেলবটস্ আর বাহাত্তরটা শার্ট এনে দেব। তা ছাড়া—'

হাতের পিঠে চোখ মুছে বোদা বলল, 'তা ছাড়া কী?'

'আগে গিয়ে দেখি সত্যি সত্যি তোর প্রপার্টি ফ্রপার্টি ওরা গেঁড়িয়ে নিয়েছে কিনা—'

বাড়ির ভেতরে ঢুকে সেই মইটা দিয়ে দোতলায় এসে দেখলাম, আমাদের ঘরটা মোটামুটি ঠিকই আছে। তবে উত্তর দিকের দেওয়াল এবং ছাদের সিকি ভাগ নেই। কর্পোরেশনের মজুররা গাঁইতি-ফাইতি চালিয়ে ওগুলো উড়িয়ে দিয়েছে। ঘরটা থাকলেও চারদিকে এক দেড় ফুট উঁচু হয়ে ধুলোবালি, ইটের টুকরো, চুন-সুরকি স্তূপাকার হয়ে আছে। এর মধ্যে আর যা-ই হোক রাত্তিরে শোওয়া-টোওয়া অসম্ভব।

কী করা যায় যখন ভাবছি, বোদা চার হাত-পায়ে খ্যাপার মতো ধ্বংসস্তূপ হাঁটকাতে হাঁটকাতে কি আশ্চর্য, তার এবং আমার যাবতীয় প্রপার্টি ইট-বালি টালির তলা থেকে বার করে ফেলল। খুশিতে এবং উত্তেজনায় তার চোখমুখ এখন চকচকিয়ে উঠেছে। বোদা হাসল, অর্থাৎ দু-পাটির সবগুলো দাঁত হারমোনিয়ামের রিডের মতো বিকশিত হল। সে বলল, 'গুরু আছে, সব আছে। শালাদের চোখে বোধ হয় পড়ে নি, তাই গ্যাঁড়াতে পারে নি।'

'তুই তো না দেখেই মড়াকান্না জুড়ে দিয়েছিলি।'

বোদা আরেক বার হারমোনিয়ামের রিড বার করল।

আমি এবার বললাম, 'মাল-ফাল পাওয়া গেছে, খুব ভাল কথা। কিন্তু রাত্তিরে থাকার কী হবে? এর ভেতর শুবি কি করে?'

'তাই তো গুরু, কী করা যায় বল তো?'

কয়েক সেকেণ্ড ভেবে নিলাম। তারপর বললাম, 'প্রপার্টিগুলো কাঁধে ঝুলিয়ে চল বেরিয়ে পড়া যাক।'

'কোথায়?' বোদা আমার চোখের দিকে তাকাল।

'নো কোশ্চেন।'

বোদা তার বাক্স-প্যাঁটরা কিছু কাঁধে তুলল, কিছু হাতে ঝুলিয়ে নিল। আমি আমার জিনিসপত্র তুলে নিলাম।

একটু পরে মই বেয়ে দুই ওয়ার্ল্ড সিটিজেন রাস্তায় নেমে এলাম। এটা আমার একশো সাতাশ নম্বর আস্তানা। এর আগে বাহাত্তরটা ধর্মশালা, বারটা রেস্ট হাউস, কুড়িটা হোটেল, রেলের ওয়েটিং রুম, গেস্ট হাউস ইত্যাদি যোগ করে একশো ছাব্বিশ জায়গায় থেকেছি। বোদাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এটা তোর কত নম্বর আস্তানা রে?'

বোদা বলল, 'ছিয়াত্তর নম্বর।'

এবার আমি বাড়িটার দিকে ফিরে স্যালুট করলাম, দেখাদেখি বোদাও একটা স্যালুট লাগাল। তারপর কয়েক দিনের আশ্রয়দাতা বাড়িটার উদ্দেশে একই সঙ্গে বলে উঠলাম, 'গুড বাই—' বলেই লম্বা লম্বা পা ফেলে ট্রাম রাস্তার দিকে এগিয়ে গেলাম।

ট্রাম রাস্তা ছাড়িয়ে এ-গলি সে-গলি ঘুরে কিছুক্ষণ পর আমরা যেখানে এসে পৌঁছুলাম সে রাস্তাটা জিলিপির প্যাঁচের মতো। দু-ধারে যত বাড়ি-টাড়ি সবগুলোর দরজায় গাদা গাদা মেয়ে সেজেগুজে দাঁড়িয়ে আছে। তাকালেই ওরা বুকে তুফান তুলে চোখ টোখ মারছিল। আর হেসে হেসে একজন আরেক জনের গায়ে গড়িয়ে পড়তে পড়তে নিজেদের মধ্যে

বলাবলি করছিল, 'এ মড়াগুলোন কে গো?'

মহাশয়রা শুদ্ধু কথায় কী যেন বলে—ইন্দ্রিয় পুড়িয়ে ব্রহ্মচারী—আমি তা হয়ে যাইনি। মেয়েমানুষ এবং তাদের শরীর-টরীর আমি অনেক দেখেছি। তাদের কেউ কেউ সিড়িঙ্গে লম্বা, কেউ ফর্সা, কেউ কালো, কেউ বা আবার হলদে কিংবা শ্যামবর্ণ। কেউ ছোট খাটো, কারো কারো মুখ গোল, কারো চৌকো বা লম্বাটে। কারো গায়ে মাংস বেশি, কারো গায়ে হাড়। তবে মহাশয়গণ সবার শরীরেই এক প্রপার্টি। কারো দুটোর জায়গায় তিনটে বুক কিংবা অন্য কোনো বাড়তি সম্পত্তি নেই। সুতরাং মেয়েমানুষ সম্বন্ধে আমার কৌতূহলটা ল অফ ডিমিনিশিং রিটার্নের মতো ক্রমশ কমে আসছে। মেয়েদের উলঙ্গ শরীর দেখলেও আজকাল আর নার্ভে তেমন কিক অনুভব করি না। তবু দু-পাশে গাদা গাদা মেয়ের ভিড়ে পছন্দমতো একটি মেয়ে আমি খুঁজছিলাম। আপনারা হয়ত ভাবছেন—কেন? কিঞ্চিৎ ধৈর্য ধরে থাকুন মহাশয়গণ।

বোদার অবস্থা এখন দেখবার মতো। তার কাঁধে বিছানা, হাতে টিনের স্যুটকেশ। ক্যাঁচাকলে-পড়া ইঁদুরের মতো সে ছটফট করছিল আর রাস্তার দু'দিকে যত মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে সটাসট মুণ্ডুটা এধারে-ওধারে ঘুরিয়ে তাদের দেখছিল। দেখতে দেখতে বলল, 'কোথায় নিয়ে এলে গুরু?'

বললাম, 'শালা সাবলাইম হারামী, তুমি কিছুই বোঝো না! নাকে তোমার বালি রগড়ে দেবো।'

বোদা গ্যাদগেদে শব্দ করে হেসে উঠল।

হাঁটতে হাঁটতে একটা খোলার চালার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়লাম। দরজার কাছে একটিমাত্র মেয়েই দাঁড়িয়ে ছিল। চোখ কুঁচকে আমাদের একটু দেখে নিল সে। হে-হে মহাশয়গণ, আমরা কোথায় কোন পাড়ায় এসে হাজির হয়েছি, আপনারা নিশ্চয়ই এতক্ষণে টের পেয়ে গেছেন। যাক গে, মেয়েটা খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল। এরকম লটবহর ঘাড়ে করে কাউকেই খুব সম্ভব এ পাড়ায় ঢুকতে দেখেনি। সে বলল, 'কী চাই?'

আমি দাঁত বার করলাম, 'আজকের রাতটা আমরা দু'জনে তোমার এখানে থাকতে চাই।'

'এটা কি ধম্মশালা?'

'ধুস, পুরোপুরি অধম্মশালা। ধম্মর আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, এখানে মরতে আসবে!'

'এ পাড়ায় এসেছ তো মালপত্তর নিয়ে কেন?'

'আর বোলো না মাইরি, যেখানে ছিলাম একটু আগে সেখান থেকে রিফিউজি হয়েছি। ভাবলাম রাত্তিরে কোথায় আর যাই—ফুলটুসিদের পাড়ায় গিয়েই থাকি।' বলতে বলতে মনে পড়ে গেল সমাজপতির সেই হাজার টাকা পকেটে আছে। বাক্স প্যাঁটরা কাঁধে চাপিয়ে দেড় মাইল রাস্তা প্যারেড করে এ পাড়ায় না এলেই হতো, হ্যারিসন রোড কি শেয়ালদার কোনো হোটেলে গিয়ে উঠলেই পারতাম। এখনও চলে যাওয়া যায়। কিন্তু না, ও-টাকাটা খরচ করব না।সমাজপতিকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ফেরত দিয়ে দেবো। মহাশয়গণ, চিটিংবাজি ছাড়া অন্য

রাস্তায় টাকা রোজগার করলে আমার চরিত্র দূষিত হয়ে যায় কিনা আপনারাই বিবেচনা করে দেখুন।

মেয়েটি জিজ্ঞেস করল, 'শুধু থাকবেই?'

'হ্যাঁ, স্রেফ রাতটুকু থাকব। রোদ উঠবার আগেই হাওয়া হয়ে যাব। তা কিরকম দিতে হবে?'

'দশ টাকা।'

'উরি ব্বাস—' বলেই অ্যাটাচি কেস খুলে একটা টাইপ-করা কাগজ বার করে বললাম, 'এই দেখ ইনসলভেন্সির সার্টিফিকেট রয়েছে। রেটটা কমিয়ে দাও মাইরি।'

অবাক বিস্ময়ে মেয়েটা জিজ্ঞেস করল, 'কিসের সাট্টিফিট?'

তাকে বুঝিয়ে বললাম, দেউলে খাতায় একবার নাম উঠেছিল আমার। গভর্ণমেণ্ট থেকে সে জন্য সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে। এখন মেয়েটা দেখুক, এ অবস্থায় রাত কাটাবার জন্যে দশ টাকা চার্জ করলে আমাদের প্রাণ বাঁচে কিনা।

এইরকম উদ্ভট টাইপের ক্লায়েন্ট নিশ্চয়ই আগে আর দেখে নি মেয়েটা। অনেক ধরাধরির পর চার টাকায় সেটেলমেণ্ট হল। বোদা আর আমি বাক্স-বিছানা নিয়ে তার ঘরে ঢুকে পড়লাম।

মহাশয়গণ, এ জাতীয় মেয়েদের ঘরটা কিরকম হয়, নিশ্চয়ই তার ডেসক্রিপশন আপনাদের কাছে দিতে হবে না। আপনাদের কেউ কেউ হয়তো এ-সব জায়গা কৌতূহলবশে কিংবা উত্তেজক কোনো গ্ল্যাণ্ডের তাড়নায় এক আধ বার ভিজিট করে গেছেন। যাঁরা এখানে আসেন নি তাঁরা নিশ্চয়ই এর রগরগে চ্যাটচেটে বিবরণ শুনে থাকবেন। অতএব রিপিটিশনের দরকার নেই।

মেয়েটির সঙ্গে দু-একটি কথা বলে হাত-মুখ ধুয়ে বোদা আর আমি তার ঘরে নিজেদের বিছানা পেতে শুয়ে পড়লাম। দুপুরবেলা সমাজপতি যে লাঞ্চ খাইয়েছেন সেগুলো এখনও হজম করতে পারি নি। স্টম্যাকে এত লোড রয়েছে, রাত্তিরে আর খাওয়ার দরকার নেই।

বিমূঢ়ের মতো মেয়েটা আমাদের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আবার গিয়ে দরজায় দাঁড়াল। চার টাকায় গোটা রাতটা সে বেচতে চায় না। যদি কোনো খদ্দের ধরা যায়, তাহলে আমাদের চারটে টাকা এক্সট্রা ইনকাম হয়ে গেল। নট ব্যাড।

চোখ বুজে আসছিল। পাশ ফিরতে ফিরতে বোদাকে বললাম, 'মেয়েটার সঙ্গে শোবার কনট্রাক্ট করেছি। আমি ঘুমিয়ে পড়লে অন্য কোনোরকম ধান্দাবাজি যদি করিস চামড়া তুলে ফেলব।'

'না গুরু—'বোদা বলল, 'কনট্র্যাক্ট ইজ কনট্র্যাক্ট। ওটা আমি ভাঙব না।'

কাল বলেছিলাম সূর্য উঠবার আগেই আমরা কেটে পড়ব কিন্তু তা আর হল না। মেয়েটা আমাদের চা না খাইয়ে ছাড়ল না।

চা-ফা খেতে খেতে সাড়ে আটটা বেজে গেল। মেয়েটার সঙ্গে কথা বলছিলাম, চা

খাচ্ছিলাম, সবই ঠিক, কিন্তু মাথার মধ্যে উড়ন্ত পোকার মতো সেই চিন্তাটা ঘুরছিল, এখান থেকে বেরিয়ে কোথায় যাব? একটা আস্তানা তো খুঁজে বার করতে হবে। অথচ সমাজপতির হাজারটা টাকা বাদ দিলে মাত্র সত্তর বাহাত্তরটা পয়সা পকেটে পড়ে আছে। এর ওপর ভরসা করে আর যাই হোক কোনো হোটেলে ঢোকা যায় না। নতুন একটা শেলটার অবশ্যই খুঁজে বার করতে হবে। তাতে কতটা সময় লাগবে, কে জানে। কাঁধে মালপত্তর চাপিয়ে রাস্তায় রাস্তায় আস্তানা খুঁজে বেড়ানোর কেনো মানে হয় না। মেয়েটাকে বললাম, 'তোমার ঘরে আমাদের কিছু জিনিসপত্তর থাকবে। একটা আস্তানা যোগাড় করতে পারলে ওগুলো নিয়ে যাব। অবিশ্যি—'

মেয়েটা জিজ্ঞেস করল, 'অবিশ্যি কী?'

'মাল রাখার জন্যে তোমাকে পাঁচটা টাকা দেবো।'

'আমি যদি ওগুলো ফেরত না দিই?'

মেয়েটার চোখের দিকে এক পলক তাকিয়ে থেকে তার গালটা টিপে দিয়ে বললাম, 'হাপিস করে দিবি! ধুস, তাই কি তুই পারিস! মুখ দেখলে আমি লোক চিনতেপারি। আচ্ছা চলি রে—'

মেয়েটা বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে থাকল। আমি আর দাঁড়ালাম না, কিছু জামাকাপড়ের বোঝা এখানে ঝেড়ে ফেলে বোদাকে গায়ের সঙ্গে জড়িয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

মেয়েপাড়াটা পেছনে ফেলে অগুনতি অলি-গলির গোলকধাঁধা পেরিয়ে বোদা আর আমি কখন যেন সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউতে এসে পড়লাম। এসপ্ল্যানেডের দিকে হাঁটতে হাঁটতে বললাম, 'কোথায় যাওয়া যায় বল দেখি—'

খানিকক্ষণ চিন্তা করে বোদা প্রায় চিৎকারই করে উঠল, 'মনে পড়েছে গুরু।'

'কী হল রে?' কিছুটা অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করলাম।

বোদা বলল, 'লাউডন স্ট্রিটে একটা চোদ্দতলা বাড়ি হাফ হয়ে পড়ে আছে। জানলা-দরজা এখনও বসানো হয় নি। ক'টা দিন ওখানে থাকা যেতে পারে।'

'বাড়িটার খোঁজ তুই কোথায় পেলি?'

'যেখানে যত ফাঁকা বাড়ি, সি-এম-ডি-এ'র বাহাত্তর ইঞ্চি পাইপ পড়ে আছে, সব খবরই আমাকে রাখতে হয়। ভেবেছিলাম শোভাবাজারের বাড়িটায় কর্পোরেশন যেই গাঁইতি চালাবে আমিও ঝটসে লাউডন স্ট্রিটের ওই চোদ্দতলা বাড়িটায় গিয়ে ঢুকে পড়ব। এর মধ্যে তুমি এলে, কত রকমের ম্যাজিক দেখালে। তোমার সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে আমি বাড়িটার কথা স্রেফ ভুলে গিয়েছিলাম।'

'চল, ওখানে গিয়েই এখন ওঠা যাক। পরে বেটার আস্তানার কথা ভাবা যাবে।'

আধ ঘণ্টার মধ্যে আমরা লাউডন স্ট্রিটে হাফ-ফিনিশড চোদ্দতলা বাড়ির ফিফথ ফ্লোরে এসে উঠলাম। কেয়ারটেকার কিংবা দারোয়ান ফারোয়ান নিশ্চয়ই কেউ দেখাশোনার জন্য আছে। কিন্তু তাদের আপাতত কোথাও দেখা গেল না।

বাড়ি তৈরির জন্য কর্পোরেশন থেকে জলের কানেকসান নিতে হয়েছিল। অতএব এ বাড়িতে প্রচুর জল। কাল এবং আজ দু'দিন শেভ করা হয় নি, গোটা মুখটা পিন কুশনের মতো হয়ে আছে। তা ছাড়া কাল স্নান-ফানও হয় নি। প্রথমে দাড়ি-ফাড়ি কামিয়ে বোদা আর আমি স্নানটা সেরে নিলাম। তারপর বোদাকে বললাম, 'সমাজপতির কাছ থেকে পঞ্চাশটা টাকা ধার করতে হবে, বুঝলি? ক্যাশ সব খতম।'

বোদা বলল, 'তাকে এখন পাচ্ছ কোথায়? তা ছাড়া—'

'তা ছাড়া কী?'

'ক্যাশ খতম হবে কেন? সমাজপতি তো তোমাকে থাউজেণ্ড রুপিজ দিয়েছে।'

'ওখান থেকে পঞ্চাশটা টাকা লোন নেবো।'

'তার মানে?'

'মানে ও টাকাটা ফেরত দিতে হবে।'

বোদা কী বলতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে পকেট থেকে একখানা একশো টাকার নোট বার করে বললাম, 'যা, হোটেল থেকে তন্দুরি আর ফাউল কারি নিয়ে আয়। খেয়ে-দেয়ে ফার্স্ট ক্লাস একখানা ঘুম লাগানো যাক।' একটু থেমে বললাম, 'বাড়িটা ভালই। ঝামেলা-টামেলা না হলে কিছুদিন এখানেই থেকে যাব, না কি বলিস?'

'ইয়েস গুরু, তোমার ইচ্ছেই আমার ইচ্ছে।' বোদা আমার হাত থেকে একশো টাকাব নোটটা নিয়ে চলে গেল এবং কিছুক্ষণ পর খাবার-দাবার নিয়ে ফিরে এল।

খাওয়া-দাওয়ার পর অ্যাটাচি কেস থেকে বেড-কভার বার করে পেতে নিলাম, তারপর হাওয়া-বালিশটায় ফুঁ দিতেই ফুলে উঠল। তোফা একখানা বিছানা হয়ে গেল। বিছানাই যখন হয়ে গেছে তখন লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লাম। বোদাও তার চিটচিটে বিছানাটা পেতে ওধারে শুয়ে পড়েছে।

কিন্তু মহাশয়গণ, শেষ পর্যন্ত এ বাড়িতে আমাদের থাকা হল না। চার-পাঁচ ঘণ্টা পর কাদের ঠেলাঠেলিতে আরামের ঘুমটা ভেঙে গেল। চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে দেখলাম দুটো নন-বেঙ্গলি দারোয়ান—বিহারী-টিহারী হবে—ঘাড়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। লক্ষ করলাম, বোদাকেও তারা টেনে তুলেছে।

একটা দারোয়ান জিজ্ঞেস করল, 'আপলোগ ইধার ক্যায়সা আয়া?'

জানালাম, ফাঁকা বাড়ি পেয়ে সুড়ুত করে ঢুকে পড়েছি।

'আপলোগ যাইয়ে, অভি চলা যাইয়ে—'

'ধুস, যাব কেন? এত বড় বাড়ি খালি পড়ে আছে। লোকজন না থাকলে বাড়ি থাকার কোনো মানে হয়? ভাবছি এখন কিছুদিন আমরা এখানে থাকব।'

এবার দুটো দারোয়ানই একসঙ্গে প্রায় আর্তনাদ করে উঠল। আমার চেহারা এবং দামী ট্রাউজার্স-ফাউজার্স দেখে ঘাড়ধাক্কাও দিতে পারছে না, আবার তর্জন-গর্জনও করতে পারছে না। কাকুতি-মিনতি করে তারা যা বলতে লাগল তা এইরকম। এ বাড়ি তৈরির কাজ বন্ধ আছে ঠিকই, তবে মালিক রোজ এসে একবার বাড়িটা দেখে যান। তিনি যদি দেখেন দুটো

অচেনা উটকো লোক এখানে শেকড় গেঁড়ে বসেছে, দারোয়ানদের নোকরি বিলকুল চলে যাবে। এখন বাবুসাহেবরা বিবেচনা করে দেখুন, দুই গরিব আদমীকে বিপদে ফেলা উচিত হবে কি না।

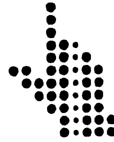
বিবেচনা করতেই হল। সত্যিই তো, আমাদের জন্য গরিব আদমীদের নোকরি চলে যাবে, এটা কোনো কাজের কথা নয়। বোদাকে নিয়ে দিন কয়েকের জন্য এখানে তাঁবু ফেলব ভেবেছিলাম। চার ঘণ্টার মধ্যে সেই তাঁবু তুলে ফেলতে হল। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল হাতে অ্যাটাচি কেস আর টিনের বাক্স-টাক্স ঝুলিয়ে আমরা রাস্তায় নেমে এসেছি।

এখন সময়টা বিকেল আর সন্ধের মাঝামাঝি জায়গায় থমকে আছে। রোদের রং ম্যাড়মেড়ে, বিষণ্ণ—অনেকটা বাসি হলুদের মতো। তবে দক্ষিণ থেকে হু-হু করে বঙ্গোপসাগরের হাওয়া ছুটে আসছিল। রাস্তার দু'ধারে দেবদারু আর কৃষ্ণচূড়া গাছগুলির ঝুঁটি নেড়ে দিয়ে উঁচু উঁচু স্কাই স্ক্রেপারে ঝাপটা মেরে উর্ধ্বশ্বাসে হাওয়াটা ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছে।

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বোদা হঠাৎ বলে উঠল, 'গুরু এবার কী করবে?'

বললাম, 'সেটাই তো ভাবছি রে। মনে হয়েছিল এই বাড়িটায় দিন কয়েক থাকা যাবে। কিন্তু সব গড়বড় হয়ে গেল। দেখি ব্রেনে কিরকম স্পার্ক মারে।'

বোদা আর কিছু জিজ্ঞেস করল না।



আমরা হাঁটছি, হাঁটছি, হেঁটেই যাচ্ছি। এর মধ্যে কখন যে হাওড়া সিটির ওপারে সূর্যটা নেমে গেছে, কখন সন্ধে হয়েছে আর কখন রাস্তায় রাস্তায় কর্পোরেশনের আলোগুলো জ্বলে উঠেছে, খেয়াল নেই। মাথার ভেতর নতুন একটা আস্তানার চিন্তা পোকার মতো উড়ে উড়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

আচমকা মনে পড়ে গেল সুমনা বলেছিল, আজ সন্ধে ছ'টা থেকে সাড়ে ছ'টা পর্যন্ত ক্যামাক স্ট্রিট-পার্ক স্ট্রিটের ক্রসিং-এ ছোট পার্কটার গায়ে সে আমার জন্য দাঁড়িয়ে থাকবে। চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম, আরে কি আশ্চর্য, আমরা পার্ক স্ট্রিটের গোরস্থানটির কাছে এসে পড়েছি। এখান থেকে ক্যামাক স্ট্রিটের ক্রসিং-এ সেই পার্কটা একশো গজ দূরেও না। তাড়াতাড়ি হাতঘড়িটা দেখে নিলাম, সবে ছ'টা দশ। হাতে এখনও কুড়ি মিনিট সময় রয়েছে।

ধীরে-সুস্থে বোদাকে নিয়ে একসময় ক্রসিং-এ চলে এলাম। সত্যিই সুমনা পার্কটার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চারদিকে লক্ষ রাখছিল। চোখাচোখি হতেই সে অল্প হাসল।

কাছে এসে জিজ্ঞেস করলাম, 'কতক্ষণ ওয়েট করছ?'

'মিনিট বার-চোদ্দ।'

'তা হলে খুব বেশিক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখি নি।'

'না। আমি ভেবেছিলাম আপনি হয়তো আসবেন না।'

'তোমার এরকম ধারণা হল কেন?'

সুমনা উত্তর না দিয়ে নখ খুঁটতে লাগল।

একটু ভেবে বললাম, 'তোমার মা কেমন আছে?'

সুমনা বলল, 'অনেকটা ভাল। জ্বরটা কমের দিকে।'

'গুড নিউজ।'

সুমনা বলতে লাগল, 'মাকে আপনার সব কথা বলেছি। সেদিন রাত্তিরে আপনি পৌঁছে না দিলে আমি বাড়িতেই ফিরতে পারতাম না। আর ডাক্তার এনে ওষুধের ব্যবস্থা না করে দিলে মা'র অবস্থা যে কী হত!' তার গলা কাঁপতে লাগল।

একটু চুপ করে থেকে সুমনা আবার বলল, 'মা বার বার বলে দিয়েছে আপনাকে একবার নিয়ে যেতে।'

বুঝতে পারছি, সুমনার মা আমাকে পেলে গলা কাঁপিয়ে কৃতজ্ঞতার কথা শুনিয়ে শুনিয়ে কানের পর্দা ফাঁসিয়ে ফেলবে। মহাশয়গণ, আপনারা জানেন আমি একজন উৎকৃষ্ট ফোর-টোয়েণ্টি, অর্থাৎ চিটিংবাজ। লোকেব খিস্তিখাস্তাই তো আমাব প্রাপ্য হওয়া উচিত। কিন্তু কৃতজ্ঞতা-টৃতজ্ঞতার কথা শুনলে আমার দারুণ অস্বস্তি হয়, শরীরের উইক নার্ভগুলো কুঁকড়ে যেতে থাকে। আসলে অভ্যাস-টভ্যাস নেই কিনা। সেই যে কথায় বলে অনভ্যাসের ফোঁটা, আমার হয়েছে তাই। বললাম, 'ধুস, ওসব কথা আবার তোমার মা'কে বলতে গেলে কেন?'

'বা রে, বলব না! আপনি আমাদের জন্যে এত করেছেন, না বলে পারি! কবে যাবেন বলুন?'

'যাব একদিন। তুমি দেখা করতে বলেছিলে, দেখা করলাম। আচ্ছা চলি।'

'সে কি, যাবেন মানে! আপনার সঙ্গে তো কথাই হল না।'

'এত কথা বললাম, তাতেও হল না! একস্ট্রা কথা যা আছে চটপট বলে ফেল।'

সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলল না সুমনা, কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর মুখ নিচু করে শুরু করল, 'সেদিন বলেছিলাম আপনার টাকাটা আজ দিয়ে দেব। কিন্তু পারছি না। আজ বিকেলে কলকাতায় এসে সেই অ্যাপার্টমেণ্ট হাউসটায় গিয়েছিলাম, দেখি সেখানে পুলিশ বসে আছে। সার্কুলার রোড আর থিয়েটার রোডে আর যে দুটো অ্যাপার্টমেণ্ট হাউসে যেতাম, পুলিশ সেগুলোরও খোঁজ পেয়ে গেছে। সেখানেও পুলিশ পোস্টেড হয়েছে। আর যারা আমাদের এই প্রফেসানে নিয়ে এসেছে তাদের কারো সঙ্গেই কন্ট্যাক্ট করতে পারছি না। এখন আমি কী যে করি!'

ব্যস্তভাবে বলে উঠলাম, 'তোমাকে ওই টাকাটা ফেরত দিতে হবে না। ওটা আমার টাকা নয়।'

'তবে কার টাকা?'

'গভর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়ার, মানে জনগণেরই বলতে পার। একজনের পকেট থেকে আমার পকেট ঘুরে তোমার হাতে গিয়েছিল। ওটা নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।' বলতে বলতে একটু হাসলাম। সমাজপতির টাকাগুলো আমার পকেটেই মজুদ রয়েছে। বললাম, 'জনগণের আরো কিছু টাকা আমার কাছে আছে। দরকার হলে নিতে পার।'

সুমনা মাথা এবং হাত একই সঙ্গে নাড়তে লাগল, 'না-না, আপনার কাছে এমনিতেই আমাদের ঋণের শেষ নেই, আর হাত পাততে পারব না।'

নাঃ, মেয়েটা একটা বাজে প্রফেসানে নামলেও ওল্ড ভ্যালুজ—মানে যেন কী, ও হ্যাঁ, পুরনো মূল্যবোধ—সেগুলোর একটু আধটু তলানি এখনও তার মধ্যে থেকে গেছে। বললাম, 'আরে বাবা , টাকা নিতে তোমার আপত্তিটা কিসের? ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্ট যত নোট ছাপায়, যত কয়েন বানায়, সে সব তো পিপলেরই। আর তুমি কী পিপলের বাইরে? তোমার টাকা তুমিই নিচ্ছ। আমি অন্য জায়গা থেকে এনে শুধু সাপ্লাই করছি। নো লজ্জা, নো সঙ্কোচ। হাত পাতো।'

সুমনা হাত পাতল না। আমার দিকে কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে বলল, 'আপনি যে টাকা দিয়ে এসেছিলেন, সেটা এখনও ফুরোয় নি। আগে ফুরোক, তারপর দেখা যাবে।'

'তুমি যখন নেবেই না তখন চলি। চল রে পার্টনার—'

যাবার জন্য পা বাড়িয়েছি, সুমনা হঠাৎ বলে উঠল, 'কিন্তু—'

'কী?'

'আপনাকে আমার ভীষণ দরকার।'

'কেন?'

'দয়া করে আমাদের বাড়িতে গেলে ভাল হতো, ওখানে বসে আমার কথা বলতাম। মা'র সঙ্গে দেখা হতো।'

আমি কী করে যাই বল?'

'কেন, খুব অসুবিধা আছে?'

'খুব না হলেও কিছুটা আছে।' বোদাকে দেখিয়ে বললাম, 'আমার এই পার্টনার আর আমি —আপাতত আমাদের কোনো থাকবার জায়গা নেই। যুগলবন্দি হয়ে দু'জনে আপাতত একটা আস্তানা খুঁজতে বেরিয়েছি। ওটা জোটাতে না পারলে হোল নাইট আমাদের রাস্তাতেই কাটাতে হবে।'

'থাকবার জায়গা চাই আপনাদের?'

না 'না।'

এক মুহূর্ত কী ভাবল সুমনা। তারপর বলল, 'আমাদের ওখানে থাকলে অসুবিধা হবে?'

বললাম, 'তোমাদের তো মোটে একটা ঘর, সেখানে কোথায় থাকব?'

'আমাদের ঘরে থাকবার কথা বলছি না। সেদিন রাত্তিরে যে ঘরটায় ছিলেন সেই ঘরটাতেই থাকবেন।'

'ওটা কার ঘর?'

'কারোই না, এমনি পড়ে আছে।'

'কত ভাড়া দিতে হবে?'

'কিচ্ছু দিতে হবে না। বাড়িটাই যে কার তা-ই জানি না। ভাড়া কে নিতে আসবে বলুন।'

'গ্র্যাণ্ড!' আমি প্রায় লাফিয়েই উঠলাম, 'তবে তো ফাঁকা ঘরে আমরা ফিল-আপ দি গ্যাপ করে ফেলতে পারি। চল পার্টনার—ফরোয়ার্ড মার্চ।'

সুমনাকে মাঝখানে রেখে আমরা পার্ক স্ট্রিট ধরে সোজা চৌরঙ্গির দিকে এগিয়ে চললাম। সেখান থেকে বাসে শিয়ালদা যাব। শিয়ালদা থেকে ট্রেনে আগরপাড়া।



হে-হে মহাশয়গণ, শাটলককের মতো বোদা আর আমি আবার সুমনাদের ব্যারাক বাড়িতে ফিরে এলাম। সেদিন এসেছিলাম শেষ রাত্তিরে, আজ অবশ্য ভদ্দরলোকদের মতো আটটা সাড়ে আটটার মধ্যেই এসে গেছি।

বাড়িতে ঢুকে সুমনা তাদের ঘরের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। উঠোনের মাঝমধ্যিখানে আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। বললাম, 'উঁহু—'

সুমনা অবাক। বলল, 'কী হল?'

'সেদিন যেখানে শুয়েছিলাম আগে সেখানে নিয়ে চল। ঘরটার পজেসান নিয়ে নিই।'

'নিশ্চিন্ত থাকুন, ঘরটা খালি পড়ে আছে। আপনারাই পাবেন।'

'আমাদের যা কপাল, দু-এক মিনিটের জন্যে হাতের ভেতর থেকে অনেক কিছু স্লিপ করে বেরিয়ে যায়। আগে পজেসান, তারপর অন্য কথা।'

সুমনা হাসল, 'তা হলে একটু দাঁড়ান, আমি আসছি।'

দৌড়ে নিজেদের ঘর থেকে একটা হেরিকেন নিয়ে এল সুমনা। বলল, 'চলুন—'

চট করে আমার মনে পড়ে গেল, এ বাড়িতে ইলেকট্রিক আলো নেই। যাক, বুদ্ধি করে হেরিকেনটা এনে ভালই করেছে সুমনা।

সুমনা আগে আগে যাচ্ছে। বোদা এবং আমি যুগলবন্দি হয়ে তার গায়ে ছায়ার মতো সেঁটে গিয়ে হাঁটতে লাগলাম।

ইংরেজি 'এল' অক্ষরের মতো এই প্রকাণ্ড ব্যারাক বাড়িটায় এখন সবাই জেগে আছে। ঘরে ঘরে রান্নাবান্না চড়েছে। কিছু বাচ্চাকাচ্চা এবং মেয়েপুরুষ উঠোনের চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তারা অন্ধকারেও আমাদের দেখতে পেয়েছিল। কে একজন এক কোণ থেকে চেঁচিয়ে বলল, 'এরা কে রে সুমনা?'

প্রশ্নটা যদিও সুমনাকেই, উত্তরটা কিন্তু আমিই দিলাম, 'আমরা দুই ওয়ার্ল্ড সিটিজেন,

গড়াতে গড়াতে আপনাদের এখানে চলে এসেছি।'

লোকটা আর কিছু বলল না।

একটু পর আমরা সুমনার সঙ্গে সেই ঘরটায় চলে এলাম। বেশির ভাগ মালপত্তর আজ সকালে মেয়েপাড়ার সেই মেয়েটার ঘরে রেখে এসেছি। একটা মোটামুটি আস্তানা যখন জুটে গেছে তখন বোদাকে পাঠিয়ে সেগুলো নিয়ে আসা যাবে। অবশ্য তাড়াহুড়োর কিছু নেই। কেননা যা জামা ফামা সঙ্গে আছে তাতে আট দশটা দিন ঠিক চলে যাবে। তা ছাড়া বিছানা-টিছানার জন্যও দুশ্চিন্তা নেই। আমার অ্যাটাচি কেসে হাওয়া-বালিশ আছে, গ্রেট হিমালয়ান বোর্ডিং হাউসের সেই বেড কভারটাও রয়েছে। আর বোদার বিছানা তো বোদার সঙ্গে সঙ্গেই ঘোরে। শালা ওটাকে কিছুতেই কাছ-ছাড়া করে না। ওটাতে শুয়েই মাকড়া হয়তো কেওড়াতলা কি নিমতলার দিকে একদিন মহাপ্রস্থান করবে। সুতরাং মহাশয়গণ, ভাববার আর কী থাকতে পারে আমাদের। কিস্‌সু না।

সুমনা তাড়াতাড়ি ঘরটা পরিষ্কার টরিষ্কার করে আমাদের বিছানা পেতে দিল। আমি ঘরের কোণের দিকে একটা দড়ি খাটিয়ে ট্রাউজার্স আর শার্ট গুছিয়ে রেখে একটু হাসলাম। বললাম, 'ফার্স্ট ক্লাস। তা হলে কিছুদিনের জন্য তোমাদের এখানে তাঁবু ফেলা যাক।'

সুমনা বলল, 'আপনাদের যতদিন ইচ্ছে এখানে থাকুন।' একটু চুপ করে থেকে আবাব বলল, 'কাল সকালে একটা জলের কুঁজো, আয়না-চিরুনি দিয়ে যাব।'

'একটা কুঁজো হলেই চলবে, আর কিচ্ছু দরকার নেই। আমাদের মালপত্তর এক জায়গায় রেখে এসেছি, দু-একদিন পর বোদা গিয়ে নিয়ে আসবে।'

'আচ্ছা। এবার কি আমাদের ঘরে যাবেন? মা আপনাকে দেখার জন্যে অস্থির হয়ে আছে। নেহাত বিছানা ছেড়ে উঠতে পারছে না, তা না হলে নিজেই ছুটে আসত।'

'ঘামে-ধুলোয় গা চটচট করছে। চান-ফান করে তোমার মা'র সঙ্গে দেখা করছি।'

'চলুন, আপনাদের কুয়োটা দেখিয়ে দিচ্ছি।'

'দেখাতে হবে না। কুয়োটা আমি চিনি। সেদিন রাত্তিরে দেখলাম না? তুমি এক কাজ কর, আধ ঘন্টা পর এসে আমাদের নিয়ে যেয়ো।'

সুমনা চলে গেল।

বোদা আর আমি যে যার বিছানায় খানিকক্ষণ চিত হয়ে শুয়ে রইলাম। তারপর কুয়োর পাড়ে গিয়ে হুড় হুড় করে গায়ে-মাথায় জল ঢেলে ফ্রেশ হয়ে নিলাম। ঘরে ফিরে সিল্কের একটা লুঙ্গি আর কলারওলা গেঞ্জি পরে ফেললাম। বোদাও নতুন ট্রাউজার্স আর বুশ শার্টের ভেতর নিজেকে পুরে ফেলেছে। টিনের সুটকেশটা হাতড়ে একটা প্লাস্টিকের সস্তা চিরুনি বার করল সে। লম্বা লম্বা চুলের ভেতর বারকয়েক সেটা চালিয়ে ভাল করে মুছে আমাকে দিল।

আমার চুল যখন আঁচড়ানো হয়ে এসেছে সুমনা আবার এসে হাজির। তার হাতে দু-কাপ চা আর একটা অ্যালুমিনিয়ামের প্লেটে খানকতক কড়কড়ে টোস্ট বিস্কুট।

চা-টা নিতে নিতে বললাম, 'তুমি দেখছি অন্তর্যামী। মনে মনে এখন চায়ের কথাই ভাবছিলাম।'

সুমনা হাসল।

চায়ে লম্বা চুমুক দিয়ে বললাম, 'তোমার কাছ থেকে একটা ইমপর্টান্ট খবর নিতে হবে।'

'কী খবর?'

'কাছাকাছি হোটেল আছে?'

'হোটেল দিয়ে কী হবে?'

' হোটেল দিয়ে কী হয়?'

'মানে খাওয়ার জন্যে?'

'কারেক্ট।' নিজের পেটটা দেখিয়ে বললাম, 'এটা হল টেরিফিক ঝামেলার জায়গা। রোজ চার বার এখানে কিছু জমা না দিলে হোল বডিটা ব্রেক ডাউন করে যাবে না? তোমাদের এখানে কিছুদিনেব জন্যে যখন তাঁবু ফেললাম তখন খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটা আগেই ঠিক কবে নেওয়া দরকার, না কি বলিস বোদা?' বলে বোদার দিকে ফিরলাম।

বোদা তৎক্ষণাৎ সায় দিল, 'ইয়েস গুরু—'

সুমনা এবার বলল, 'হোটেলে খাবেন।'

'হোল লাইফ তাই তো খাচ্ছি –' বলে একটু হাসলাম।

খানিকক্ষণ চুপ কবে থেকে সুমনা বলল, 'কাছাকাছি পাঞ্জাবিদের একটা হোটেল আছে। কিন্তু—'

'কী?'

'হোটেলটা ভাল না, ভীষণ নোংরা।'

'ওতেই চলবে। ফাইভ স্টার হোটেল থেকে ফুটপাথের ছাতুর দোকান, কিছু[illegible]ই আমার আপত্তি নেই। হোটেলটা কোথায়, একটু ডিরেকশান দিয়ে দাও তো।'

সুমনা জানালো তাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে ডান দিকে খানিকটা গিয়ে মিনিট পাঁচেক হাঁটলেই বি-টি রোড। বি-টি রোডের মুখেই পাঞ্জাবিদের পবিত্র খালসা হোটেল। খবরটা দিয়েই সে বলল, 'আজ কিন্তু আপনারা হোটেল যাচ্ছেন না।'

'কেন?'

'আজ আমাদের ঘরে খাবেন। সেদিন না খেয়ে চলে গিয়েছিলেন, আমাদের খুব খারাপ লেগেছে।'

আমি হাসলাম, 'ঠিক আছে, আজকেই শুধু। এরপর কিন্তু এরকম রিকোয়েস্ট আর করবে না।'

সুমনা উত্তর দিল না।

কথায় কথায় চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। বোদাকে আর আমাকে সঙ্গে করে সুমনা তাদের ঘরে নিয়ে গেল।

ঘরটা আমাদের চেনা। তফাতের মধ্যে সেদিন যখন এসেছিলাম গোটা ঘরময় মিলিটারি

ক্যাম্পের সারি সারি তাঁবুর মতো দুটো তক্তাপোষে মশারি খাটানো ছিল। তার একটার ভেতর সুমনার মা জ্বরে বেহুঁশ হয়ে পড়ে ছিল। মেঝেতে শুয়ে ঘুমোচ্ছিল সুমনার ছোট বোন আর দিদির ছেলেমেয়েরা। আজ কেউ ঘুমোচ্ছে না। চারদিকে বিছানাও পাতা নেই। সুমনার ছোট বোন আর দিদির বাচ্চাকাচ্চারা মেঝের একধারে ডেলা পাকিয়ে বসে আছে। আরেক ধারে সুমনার দিদিকে দেখতে পেলাম। তবে বাঁ-দিকের তক্তাপোষটায় একটা বিছানা রয়েছে। ওটা বোধ হয় অনন্ত শয্যা, সব সময় পাতাই থাকে। সেখানে চিটচিটে কাঁথা-বালিশের স্তূপের মধ্যে সুমনার মা শুয়ে ছিল। তার ভাঙাচোরা মুখ, ঘোলাটে চোখ, সারা গায়ের চামড়া কোঁচকানো।

আমাকে দেখিয়ে সুমনা তার মাকে বলল, 'ইনিই সে-ই। এঁর কথা তোমাকে বলেছি—'

সুমনার মা হাতের ভর দিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে বসল। তার মুখে ঢেউয়ের মতো কত কি খেলে যেতে লাগল। সরু সরু গাঁট-পাকানো আঙুল বাড়িয়ে আমার একটা হাত ধরল সে। কাছে বসিয়ে বলল, 'তুমি যে আমাদের কি উপকার করেছ বাবা, মুখে বলে কতটুকু আর বোঝাতে পারব! তোমার জন্যে মেয়েটা সেদিন কলকাতা থেকে ফিরতে পেরেছে, নইলে কী যে হত! তোমার জন্যে আমিও এ-যাত্রা মরার ঘর থেকে ফিরে এলাম। ঘরে একটা পয়সা ছিল না। তুমি টাকা না দিলে ডাক্তারও আসত না, ওষুধও পেতাম না।' একটানা ঘ্যানঘেনে প্যাচপেচে বৃষ্টির মতো বলে যেতে লাগল সুমনার মা, দারুণ আবেগে তার গলা কাঁপতে লাগল।

মহাশয়গণ, বুড়ি এরকম কিছু বলবে, আমি তা জানতাম। এ-জাতীয় কথায় আমার ভয়ানক অস্বস্তি হয়। কোনোরকমে তাকে থামিয়ে বললাম, 'আপনি এখন কি রকম আছেন বলুন—'

'অনেক ভাল, জ্বর কমে গেছে। এ সবই তোমার দয়ায় বাবা। তোমার জন্যে—' ইতি'র পর পুনশ্চ'র মতো বুড়ি আবার আমার সম্বন্ধে নতুন উদ্যমে শুরু করল।

বুড়ি তো জানে না, অজান্তে সে আমার সেই অস্বস্তির গ্ল্যাণ্ডটায় হাত দিয়ে ফেলেছে। আমি উসখুস করতে লাগলাম। বললাম, 'আপনি যদি আবার দয়া-ফয়া এসব বলেন আমি কিন্তু উঠে পড়ব।'

বুড়ি বলল, 'ঠিক আছে বাবা, বলব না। তবে কথাটা কি জানো—'

'কী?'

'তুমি আমাদের জন্যে যা করেছ হাজার ভাগের এক ভাগও কেউ কখনও করে নি। সুমি যখন তোমার কথা বললে আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল।' বলতে বলতে গলার স্বর বুজে গেল সুমনার মায়ের।

আমি যত সুমনার মায়ের কৃতজ্ঞতা-টৃতজ্ঞতার ব্যাপারগুলো সাইডিং-এ ঠেলে দিতে চাইছি বুড়ি ততই সেটাকে মেন লাইনে টেনে আনছে। বললাম, 'আবার শুরু করলেন তো?'

'দেখ বাবা, কেউ যদি কারো জন্যে কিছু করে সেটা বলেও তো সুখ—'

'আমি সত্যি সত্যি এমন কিছুই করি নি যাতে বার বার ওই কথা বলতে হবে। তা ছাড়া—'

'তা ছাড়া কী?'

'আপনি যদি বার বার ওই দয়া-ফয়ার কথা বলতে থাকেন আমার ক্যারেক্টার খারাপ হয়ে যাবে। আমি হয়তো বিশ্বাসই করে ফেলব—সত্যিই একটা ভাল কাজ করে ফেলেছি।'

সুমনার মা হেসে ফেলল, 'তোমার যখন এত আপত্তি, আর বলব না। সুমির মুখে শুনলাম তুমি নাকি এখন আমাদের এখানেই থাকছ।'

ঘাড় হেলিয়ে দিলাম, 'হ্যাঁ—'

'তোমার এক বন্ধুর কথাও শুনেছিলাম—সেও তো থাকছে?'

'নিশ্চয়ই। আমরা দু'জনে সব সময় একসঙ্গে এক জায়গায় থাকি। ওর সঙ্গে আমার এরকম প্যাক্ট আছে।'

'তোমার বন্ধুটি কোথায়?'

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল বোদা। হেরিকেনের আবছা আলো অতদূর পৌঁছয় নি, সুমনার মা তাই তাকে দেখতে পায নি। কিংবা আমাকে নিয়েই বুড়ি এত ব্যস্ত ছিল যে বোদাকে লক্ষ করে নি। ঘাড় ফিরিয়ে ডাকলাম, 'বোদা—'

বোদা এগিয়ে এলে বললাম, 'এই যে আমার পার্টনার—'

সুমনার মা বলল, 'বোসো বাবা, বোসো—'

বোদা আমার পিঠের চামড়ার সঙ্গে সেঁটে বসে গেল।

সুমনার মা এবার বলল, 'তোমরা থাকছ, আমরা এতে ভরসা পাব। পাঁচ ছ'বছর আগে সুমির বাপ মরেছে, তারপর থেকে ভরসা করার মতো একটা মানুষও [illegible] নি। কিভাবে দিন যে আমাদের যাচ্ছে—' বলতে বলতে নিজেদের পারিবারিক ইতিহাস শুরু করে দিল।

পাঁচ ছ'বছর আগেও তাদের সংসারের এমন হাল ছিল না। সুমনার বাবা ছিল মার্চেন্ট অফিসের লেজার কিপার। দুম করে বার দিনের জ্বরে সে মরে গেলে ফ্যামিলিটা টোটাল ব্রেক ডাউন করে বসল। তার ওপর বড় মেয়েটা আচমকা বিধবা হয়ে বসল এবং যথাসময়ে গাদাখানেক বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে এসে তাদের ঘাড়ে চাপল। বড় মেয়েটা এমনিতে চোখে কম দেখত, এই ক'বছরে বিনা চিকিৎসায় প্রায় অন্ধই হতে বসছে।

সুমনার বাবা বেঁচে থাকতে তারা টালিগঞ্জের ওধারে একটা ভাড়া বাড়িতে থাকত। তারপর উল্টোপাল্টা দমকা বাতাসে কুটোর মতো লাট খেতে খেতে আগরপাড়ার এই বেওয়ারিশ ব্যারাকে এসে উঠেছে। বছর কয়েক এখানেই আছে। এখন গোটা সংসারের দায়দায়িত্ব সুমনার ওপর। সে যে এতগুলো লোককে জামা-কাপড় ভাত-রুটি ইত্যাদি যুগিয়ে কিভাবে বাঁচিয়ে রেখেছে, সে-ই জানে।

শুনতে শুনতে বোদা হাই তুলছিল। তার ভাল লাগছে না। আমার অবস্থাও সুবিধার নয়।

বোদা আমার কানে মুখ গুঁজে চাপা গলায় ফিসফিস করল, 'গুরু ব্যাপারটা কী?'

বললাম, 'কিসের?'

'বুড়ি তো টেরিফিক ঝামেলা বাধাল।'

'হুঁ, একটা ডাইন্যাস্টির হিস্ট্রি শোনাচ্ছে। কিছু করার নেই বুঝলি, ওটা শুনতে হবে। আজ প্রথম দিন কিনা—'

'শুনতেই হবে!' বোদা হতাশ গলায় বলল।

'ইয়েস।' আমি ঘাড় কাত করলাম।

ওদিকে বুড়ি গভীর বিষাদের গলায় বলে যাচ্ছিল, 'কোথায় মেয়েটার বিয়ে দেব, ঘর-সংসার করবে, তা নয়—' বলতে বলতে চুপ করে গেল।

এত দুঃখ-টুঃখর ব্যাপার আমার ভাল লাগে না। নেহা নিরুপায় হয়ে শুনছিলাম। বুড়ি একটু থামতেই ঝট করে সুমনার দিদির বাচ্চাগুলোর দিকে ফিরলাম। তারা কিছুটা বিস্ময়, খাকিটা কৌতূহল আর খানিকটা ভয় নিয়ে জুল জুল করে আমাদের দেখছিল। হাত তুলে তাদের কাছে ডাকলাম, 'এখানে এস, তোমাদের সঙ্গে তো আলাপই করা হল না।'

বাচ্চাগুলো এবং সুমনার ছোট বোন একসঙ্গে প্রায় ডেলা পাকিয়ে উঠে এল। সুমনার ছোট বোনটার নাম মাধুরী, প্রায় সুমনার মতোই দেখতে। ওর দিদির বাচ্চাগুলোর নাম ঝাঁঝর, কাঁসর এবং সাইড ড্রাম।

আমি পিটার স্বয়ম্ভু হোড়, একজন মিনি গ্লোবট্রটার, সাত ঘাটের জল খেয়ে ঘুরে বেড়াই, কিন্তু এরকম নাম কখনও শুনি নি।

আমাকে অবাক দেখে সুমনা হেসে ফেলল। এই সব ঐতিহাসিক নামকরণ নাকি তার জামাইবাবুর কীর্তি। ছেলেমেয়েদের গলা দিয়ে ওইরকম আওয়াজ বেরোয় বলেই নাকি মিলিয়ে মিলিয়ে এই সব নাম দেওয়া হয়েছে। নাঃ, লোকটার ওরিজিন্যালিটি আছে।

আলাপ-পরিচয় হতে বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল। এ ঘরেই আসন পেতে আমাদের খেতে দেওয়া হল। খাওয়া দাওয়া চুকিয়ে আমাদের ঘরে ফিরে এলাম। সুমনা দুগ্লাস জল নিয়ে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে এল। বেশিক্ষণ থাকল না, গেলাস দুটো একধারে রেখে প্লেটে ঢাকা দিয়েই চলে গেল।

সুমনা চলে যাবার পর আমরা শুয়ে পড়েছি। বোদা হঠাৎ বলল, 'গুরু আমাদের ক্যারেক্টার কিন্তু সত্যিই খারাপ হয়ে যাচ্ছে।'

বালিশে মুখ গুঁজে বললাম, 'কেন?'

'তুমিই বল না—'

'মালুম হচ্ছে না।'

'আজ পেটে এক ড্রপও সোনার বাংলা পড়ে নি কিন্তু—'

আমি খাড়া হয়ে উঠে বসলাম। বললাম, 'ঠিক বলেছিস। আমার লাইফে এরকম ভুল আর কখনও হয় নি। আজ অনেক রাত হয়ে গেছে। তা ছাড়া টায়ার্ডও খুব। কাল এক কাজ

করবি—'

বোদা অন্ধকারে আমাকে দেখতে দেখতে বলল, 'কী?'

'কাল সকালেই এখানকার রি-ফিলিং স্টেশনগুলোর খোঁজ নিবি।'

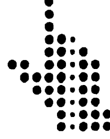
'রি-ফিলিং স্টেশন?'

'হ্যাঁ রে, হ্যাঁ। মানে বাংলা মালের দোকান—বুঝলি?'

'দারুণ বলেছ গুরু। গাড়ির ট্যাঙ্কি খালি হলে পেট্রোলের দোকানে ছোটে। আমাদেরও হয়েছে সেই অবস্থা।' বলে একটু থামল বোদা। নিজের পেটে তেরে-কেটে-তাক করে বারকতক তবলা বাজিয়ে সে আবার শুরু করল, 'আমাদের ট্যাঙ্কি খালি হলে রি-ফিল করতে শুঁড়িখানায় ছুটি, তাই না গুরু?'

'ইয়েস গুরু। এবার ওদিকে ফিরে ঘুমিয়ে পড়।'

বোদা ওধারের দেওয়ালের দিকে ফিরল। আমিও আর বসে না থেকে শুয়ে পড়লাম।



পরের দিন খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গেল। মহাশয়গণ, চিরকালই আমি একটু লেট-লতিফ। আমার বেয়াল্লিশ-তেতাল্লিশ বছরেব লাইফে কমগুলো দিন তো কাটল না। বেয়াল্লিশ-তেতাল্লিশ ইনটু তিন শো পঁয়ষট্টি অর্থাৎ কয়েক হাজার দিন। এর ভেতর একটা দিনও সজ্ঞানে সূর্যোদয় দেখেছি কিনা, মনে করতে পারছি না। আজ কি যে হল, সূর্য উঠবার আগে উঠে পড়েছি। পাশ ফিরতেই কি আশ্চর্য, চোখে পড়ল বোদা আমার দিকে ড্যাবডেবিয়ে তাকিয়ে আছে।

বোদার ঘুম আমারই মতো। দাঁতে রোদ না লাগিয়ে মাকড়া কোনোদিনই ওঠে না। মহাশয়গণ, আপনাদের আগেই বলেছিলাম আমরা মেড ফর ইচ আদার। অন্য দিন আমি বেলা পর্যন্ত পড়ে পড়ে ঘুমোই। আজ দেখুন ভোরবেলা আমার ঘুম ভেঙেছে তো ওরও ঘুম ভেঙেছে।

বললাম, 'কি রে, এত তাড়াতাড়ি নিদ্রাভঙ্গ হল!'

চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে বসে বোদা বলল, 'তোমারও তো তাড়াতাড়ি ঘুম ভেঙেছে গুরু।'

'ব্যাপারটা কি বল তো বোদা, সিস্টেমে এ রকম গোলমাল হয়ে গেল কেন? ন'টার আগে ঘুম ভাঙবার কথা নয়।'

'বলব গুরু?'

'হ্যাঁ—বল।'

'কাল পেটে ঘুমের ওষুধ পড়ে নি যে। ওষুধ না পড়লে ঘুম হয়?'

'তার মানে বেঙ্গল?'

'ইয়েস গুরু।'

আদর করে বোদার ঝুঁটি নেড়ে দিতে দিতে বললাম, 'ফাইন বলেছিস। তোর ব্রেনটা দিনকে দিন যা খুলছে না!'

বোদা খ্যাসখেসিয়ে হেসে উঠল।

আমি এবার বললাম, 'তাড়াতাড়ি যখন উঠেই পড়েছি তখন চল বেরিয়ে পড়া যাক। জায়গাটা একটু সার্ভে করে আসি।'

একটু পর আমরা দুই বিশ্ব-নাগরিক লম্বা ব্যারাক-বাড়িটা থেকে বেরিয়ে রাস্তায় চলে এলাম। এত ভোরে ব্যারাক-বাড়ির ঘুম ভাঙে নি, দু-একজন যা-ও উঠেছে, আমাদের লক্ষ করে নি।

রাস্তায় এসে ভো-কাট্টা ঘুড়ির মতো এদিকে ওদিকে ঘুরতে লাগলাম। সেদিন তাড়াহুড়োয় ভাল করে দেখতে পারি নি। আজ লক্ষ করলাম, চারদিকে অনেক রিফিউজি কলোনি। তা ছাড়া নতুন পুরনো প্রচুর বাড়িঘরও দেখা যাচ্ছে। আসলে পার্টিসানের পর কলকাতায় হু-হু করে লোক বেড়ে গেছে, পপুলেসন এক্সপ্লোসান যাকে বলে ঠিক তাই। কলকাতা কানায় কানায় বোঝাই হয়ে যাবার পর জনস্রোত উপচে এসে এখানে ছড়িয়ে পড়েছে। 'প্ল্যানড টাউনশিপ' বলে যে কথাটা আছে তার মাথায় হাতুড়ি মেরে যে যেখানে খুশি ঘরবাড়ি তুলে নিয়েছে। ড্রেন নেই, জঘন্য নোংরা রাস্তাঘাট, মিউনিসিপ্যালিটির যে ল্যাম্পপোস্টগুলো সারি সারি শহীদ মিনারের মতো দাঁড়িয়ে আছে তাদের গায়ে একটা বাল্বও নেই, কারা সব খুলে নিয়ে গেছে। ঘরবাড়ির চেহারা দেখেই টের পাওয়া যায়, কলকাতার এই আউটস্কার্টে কারা'থাকে। কার মুখে যেন শুনেছিলান, উই স্লিপ উইদ মোন, উই রাইজ উইদ গ্রোন। কার কথা আপনারা জানেন? মহাশয়গণ আমি একটা চিট, পেটে ডেপথ চার্জ করলে ক্লাস ফাইভের 'গোল্ডেন বুক'-এর গোটা কয়েক কবিতা ছাড়া হয়তো আর কিছু বেরুবে না। তবে ভাল ভাল কথা শুনলেই মনে করে রাখি এবং জায়গামতো লাগিয়ে দিই। তাতে লোকের তাক লেগে যায়। ভাবে বুদ্ধদেব কি যিশুখ্রিস্টের মুখ থেকে বাণী শুনছে। যাক গে, যারা সারাদিনের দুঃখ কষ্টের বোঝা কাঁধে নিয়ে গোঙাতে গোঙাতে ঘুমোতে যায়, আবার পরের দিন গোঙাতে গোঙাতেই জেগে ওঠে, এটা সেই হতচ্ছাড়া ডেস্টিচুটদের কলোনি।

ঘুরতে ঘুরতে রোদ উঠে গেল। চারদিকের লোকজনের ঘুম ভেঙে গেছে। একটু আগেও রাস্তা ফাঁকা ছিল। এখন বাচ্চাকাচ্চা, যুবক যুবতী এবং বয়স্ক মেয়েমানুষ কিংবা পুরুষদের রাস্তায় দেখা যাচ্ছে। যে যার ধান্দায় ব্যস্ত।

বোদা বলল, 'গুরু, দেড় ঘন্টা মর্ণিং ওয়াক করালে। এবার চা না খাওয়ালে আমি কিন্তু এখানে বডি ফেলে অনশন শুরু করব।'

সকাল থেকে চা খাই নি। জিভটা শুকিয়ে ব্লটিং পেপার হয়ে গেছে। বললাম, 'চল, একটা চায়ের দোকান খুঁজে দেখা যাক।'

আমরা এখন যেখানে আছি সেখান থেকে সুমনাদের বাড়িটা মিনিট দশেকের রাস্তা।

সেদিকে চায়ের দোকান নেই। চা খেতে হলে ডান দিকে ঘুরে বি-টি রোডে যেতে হবে। বি-টি রোডে নিশ্চয়ই টি-স্টল পাওয়া যাবে।

ডাইনে ঘুরে মিনিটখানেকও যাই নি, হঠাৎ একটা ব্যাপার দেখে থমকে গেলাম। আমার সঙ্গে বোদাও দাঁড়িয়ে গেল।

রাস্তার গায়ে একটা ভাঙাচোরা পুরনো শ্যাওলা-ধরাএকতলা বাড়ির সামনে অনেকগুলো ছেলে—একই রকম মুখ, ময়রার দোকানের 'আবার খাব' সন্দেশের মতো অনেকটা—দলা পাকিয়ে বসে আছে। চট করে গুনে দেখলাম তারা সংখ্যায় দশ।

একটা হিন্দুস্থানি নাপিত একটা ছেলের মাথায় ক্ষুর চালিয়ে নেড়া করে দিচ্ছে। কাছে দাঁড়িয়ে একটা বেঁটে চেহারার গোলগাল ঘাড়ে-গর্দানে-ঠাসা মধ্যবয়সী লোক, পরনে ঠেঁটি ধুতি গলাবন্ধ ফতুয়া, সারা গায়ে প্রচুর লোম, আমাদের পূর্বপুরুষ সম্বন্ধে ডারুইন থিয়োরিটা তাকে দেখে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই মাথা মুড়োবাব কাজ তদারক করছিল। তাকে এবং ছেলেগুলোকে বারকতক দেখে নিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। তার থেকেই এ প্রজাটির সৃষ্টি।

একটা ছেলের মাথা ক্ষুরের তলায়। বাকি ন'টা ছেলে সেই দিকে তাকিয়ে দারুণ অস্থির হয়ে উঠেছে। বোঝা যাচ্ছে তাদের মাথাগুলোরও ওই দশাই হবে। হঠাৎ চোখে পড়ল, একটা ছেলে আস্তে আস্তে পেছন দিক দিয়ে সরে পড়বার চেষ্টা করছে। কিন্তু ঘাড়ে-গর্দানে ঠাসা লোকটার চোখে ধুলো দেওয়া অত সোজা নয়। সে সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় ফিরিয়ে গর্জে উঠল, 'অ্যাই ভল্টে, ভাগবার চেষ্টা করলে চামড়া তুলে ফেলব। বোস এগিয়ে এসে—'

ছেলেটা ভয়ে ভয়ে গুটিসুটি মেরে সামনে এসে বসল। কিন্তু আরেকটা ছেলে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'এবার আমি ন্যাড়া হব না।' তার চোখেমুখে বিদ্রোহের ভাব।

ছেলেটার ঘাড়ে জোরে থাপ্পড় কশাল লোকটা এবং চুলের ঝুঁটি ধরে বসিয়ে দিয়ে বলল, 'বড্ড বাড় বেড়েছ, হাড় গুঁড়ো করে দেব।'

ছেলেটা আর কিছু বলল না, ঘাড় গুঁজে বসে রইল। অন্য ছেলেগুলোও ভয়ে কাঠ হয়ে আছে। কারো মুখে টুঁ শব্দটি নেই।

বিদ্রোহ দমন করে লোকটা এবার নাপিতকে তাড়া লাগাল, 'তাড়াতাড়ি হাত চালা। ন্যাড়া করতে কতক্ষণ লাগে!'

দু-তিনটে মাথা সাফ হয়ে যাবার পর হঠাৎ সেই লোকটার যেন খেয়াল হল, আমরা দাঁড়িয়ে আছি। ভুরু কুঁচকে ঘোলাটে চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে আমাদের সার্ভে করল। তারপর বলল, 'কাকে চাই?'

বললাম, 'কাউকেই না।'

'তবে?'

'দেখছি।'

'কী?'

'এই আপনারা যা করছেন। এমন রেয়ার দৃশ্য তো সহজে চোখে পড়ে না। তা—'

'তা কী?'

'এরা সবাই কি ন্যাড়া হবে?' বাকি ছেলেগুলোকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

লোকটা বলল, 'আলবত। তিন মাস পর পর ওদের গুরুদশা হয়। গুরুদশা হলে ন্যাড়া হতে হবে না?'

'মানে?' আমি হকচকিয়ে গেলাম।

লোকটা বলল, 'কাছে আসুন, বুঝিয়ে দিচ্ছি।'

দারুণ কৌতূহল হচ্ছিল। বোদাকে নিয়ে ভেতরে চলে এলাম।

মাঝবয়সী লোকটা এবার বলল, 'তিনমাস পর পর আমার এই দশটা ছেলের মাথা কামিয়ে দিই। কেন জানেন?'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন?'

'নইলে ফি মাসে চুল কাটাতে হতো। দশটা ছেলের প্রত্যেক মাসে একবার করে যদি চুল কাটাতে হয়, মাথা পিছু পঁচাত্তর পয়সা হিসেবে মাসিক সাড়ে সাত টাকা খরচ। তার মানে বছরে নব্বই টাকা শুধু চুলের বাবদেই বেরিয়ে যাবে। আর ন্যাড়া করলে তিন মাসের আগে ভাল করে চুল গজাবে না। তারপর তো কাটার প্রশ্ন। ন্যাড়া করার রেট মাথা পিছু পঞ্চাশ পয়সা। তা হলে দশটা মাথায় পাঁচ টাকা খরচ। তিন মাসে পাঁচ টাকা খরচ হলে বছরে কুড়ি টাকাতেই হয়ে যাচ্ছে। অবশ্য কুড়ি টাকা দিই না। এতগুলো মাথা একসঙ্গে কামাবার জন্যে পাইকিরি রেট পাই। আমি ষোল টাকা দিই। এখন দেখুন, নব্বইয়ের জায়গায় ষোল টাকায় হয়ে যাচ্ছে। তাতে বছরে চুয়াত্তর টাকা বাঁচাতে পারছি।' বলে লোকটা এবড়োখেবড়ো দাঁত বার করে হাঁসল।

এমন সূক্ষ্ম হিসেবের কথা আগে কখনও শুনি নি। আমার মাথার ভেতর একখানা চরকি ঘুরে যাচ্ছিল আর চোখের তারা দুটো এক্কেবারে ফিক্সড হয়ে গেল।

মধ্যবয়সী আবার বলল, 'অনেক চুলচেরা হিসেব করে আমাকে চলতে হয়। কারণ আমার মোট কুড়িটা ছেলেমেয়ে—' মাথায় এখন আর চরকি ঘুরছে না, ক'টা অ্যাটমিক এক্সপ্লোসান মানে বাংলা ভাষায় যাকে পারমাণবিক বিস্ফোরণ বলে তাই ঘটে গেল। বললাম, 'কুড়িটা! ওয়ান-ফিফথ অফ কুরুবংশ!' বলতে বলতেই আমার চোখ গিয়ে পড়ল ও-ধারের একটা দেওয়ালে। সেখানে সরকারি ফ্যামিলি প্ল্যানিং ডিপার্টমেন্ট থেকে লাল ত্রিকোণ ছাপ মারা একটা পোস্টার সাঁটা আছে। পোস্টারে হাসি-খুশি স্বামী-স্ত্রী আর দুটি শিশুর ছবিও রয়েছে : 'সুখী হতে হলে দুটি কি তিনটির বেশি সন্তান পৃথিবীতে আনবেন না।' সরকারি বাবুরা যতই 'দো আউর তিন বাচ্চে'র স্লোগান দিয়ে গলায় রক্ত তুলুক, যতই দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার সাঁটুক, ধুসো জামা-পরা এই লোকটা তার পরোয়াই করে না। ভারতীয় প্রজাতন্ত্রকে শালা কুড়িটি সলিড ভোটার উপহার দিয়ে বসে আছে। যতই সবুজ বিপ্লব ঘটিয়ে হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী ধান-গম যব-মাইলোতে ভরে দাও না, এই সব মাকড়াদের জন্মদানের ক্ষমতা যদ্দিন আছে তদ্দিন আর দেখতে হবে না। এদের জন্যই দেশে চিরস্থায়ী একখানা ফেমিন লেগে থাকবে।

মধ্যবয়সী লোকটাও উল্টোদিকের দেয়ালের পোস্টারটা দেখতে পেয়েছিল। দেখতে দেখতে সে দাঁত বার করে হাসল। বলল, 'আমার কুড়িটা ছেলেমেয়ের মধ্যে পাঁচটা হয়েছে ব্রিটিশ আমলে, বারটা আজাদীর পর, বাকি তিনটে ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর বাবুরা 'দো আউর তিন বাচ্চে'র স্লোগান বার করবার পর। তারপর থেকে ব্যস, একেবারে থামিয়ে দিয়েছি। আমার কাছে কোনোরকম বে-আইনি কাজ পাবেন না।' বলে দাঁত বার করে আরেক দফা হাসল।

আমিও হাসলাম কিন্তু কিছু বললাম না।

লোকটা আবার বলল, 'যাক, যেকথা বলছিলাম। আমার যখন কুড়িটা ছেলেমেয়ে তখন বুঝতেই পারছেন, হিসেব-টিসেব করে চলতে হয়। আগের দিকের দশটা বড় হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে পাঁচটা মেয়ে, ওদের ওপর জোর খাটাতে পারি না। তাই তলার দিকের দশটাকে ধরেছি। তিন মাস পর পর ওদের গুরুদশা ঘটিয়ে মাথা ন্যাড়া করে দিই।'

বললাম, 'আপনার এই প্ল্যানিংটার মধ্যে বেশ ওরিজিন্যালিটি আছে। গভর্ণমেণ্টের কাছে অ্যাপ্লাই করে আপনি এর ট্রেড মার্ক কি পেটেণ্ট নিয়ে বাজারে ছাডতে পারেন।'

'মানে—'

'ও কিছু না।' আমি এবাব দাঁত বার করলাম। তারপর বললাম, 'আপনি কী করেন?'

মধ্যবয়সী এবার পিছন ফিবে তার ধসে-যাওয়া পুরনো বাড়ির মাথায় একটা ঝরঝরে টিনের সাইনবোর্ড দেখিয়ে দিল। কতকাল আগে এই সাইনবোর্ডটা করানো হয়েছিল, কে জানে। রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে লেখাগুলো আবছা হয়ে গেছে। অনেক কষ্টে পড়তে পারলাম ঃতারকেশ্বর আয়ুর্বেদ ভবন। প্রোঃ নকুলেশ্বর দেবশর্মা, ভিষকরত্ন, আয়ুর্বেদাচার্য ধন্বন্তরি। স্থাপিতঃ বাং সন ১৩৪০ ; ইং সন। ১৯৩৩সাল।

'আপনি তা হলে কবিরাজি করেন?'

'হ্যাঁ।'

'কিরকম চলে?'

'চলে আর কোথায়। অ্যালোপ্যাথ ডাক্তার আর তাদের ওষুধে বাজার ছেয়ে গেছে। আমাদের এখন হাড়ির হাল। তাই কবিরাজির সঙ্গে ঘটকালি করি, সকালে প্রাইমারি স্কুলে পড়াই, বই বাঁধাবার জন্যে একটা দপ্তরিখানাও আছে। বিরাট সংসার, আর দিনকাল যা পড়েছে তাতে একটা নিয়ে পড়ে থাকলে তো চলে না, এটা ওটা করতেই হয়।'

'তা তো বটেই।'

কবিরাজ অর্থাৎ নকুলেশ্বর বলল, 'এবার বুঝতে পারছেন কেন আমার ছেলেদের তিন মাস পর পর গুরুদশা হয়?'

তক্ষুণি ঘাড় হেলিয়ে দিলাম, 'তা পারছি।'

হঠাৎ কি মনে পড়তে নকুলেশ্বর এবার বলল, 'ঐ দেখুন, এতক্ষণ ধরে কথা বলছি অথচ আপনাদের নামটাই জানা হয়নি।'

নিজের এবং বোদার নাম বললাম।

নকুলেশ্বর এবারে জিজ্ঞেস করল, 'আপনাদের এখানে নতুন দেখছি।'

'বিলকুল নতুন— ব্র্যাণ্ড নিউ।'

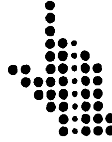
'কী করা হয়?'

'ডেফিনিট কিছু করি না। প্রফেসান বলতে ড্রিংক করা, গ্লোব-ট্রটারদের মতো ঘোরা আর—'

নকুলেশ্বরের চোখ গোল হয়ে যাচ্ছিল। সে বলল, 'আর কী?'

'আর চারদিকে কে কোথায় কী করছে, কে কী বলছে—সে সব দেখে আর শুনে বেড়ানো। আচ্ছা চলি, আশা করি আবার দেখা হবে।'

আমরা বাইরের রাস্তায় চলে এলাম আর কবিরাজ নকুলেশ্বর দেবশর্মা— ভিষকরত্ন, বুক-বাইণ্ডার, ঘটক, আয়ুর্বেদাচার্য' ধন্বন্তরি—সিনেমার ফ্রিজ শটের মতো দাঁড়িয়ে রইল।



হাঁটতে হাঁটতে একসময় আমরা বি-টি রোডের কাছাকাছি সেই পবিত্র খালসা হোটেলটা বার করে ফেললাম। সেখানে চা-ফা খেয়ে কিছুক্ষণ পর আবার রাস্তায় এলাম। এবার আমাদের ব্যারাক-বাড়িতে ফিরতে হবে। শেভ টেভ সেরে স্নানটা করে নিতে হবে। আমার দাড়িটা দারুণ বাড়ে, একদিন না কামালে গাল খরখরে হয়ে ওঠে।

কবিরাজের বাড়ির সামনে দিয়েই আমাদের বাড়ি ফিরতে হল। কারণ এটাই একমাত্র রাস্তা। সেখানে এসে দেখলাম কেউ নেই। তার মনে দশটা ছেলের মাথা মুড়নো সুচারুরূপে শেষ করে নকুলেশ্বর চলে গেছে।

কবিরাজের বাড়ি ছাড়িয়ে খানিকটা যাবার পর হঠাৎ মনে হল, বোদা আমার সঙ্গে নেই। ঘাড় ফিরিয়ে তাকে দেখতে পেলাম না। ছুঁচের পেছনে সুতোর মতো সে তো আমার পেছনে পেছনে আসছিল। চোখ কুঁচকে এক পলক ভাবলাম, ছোকরা গেল কোথায়?

মিনিট তিনেক দাঁড়িয়ে থেকে যখন তার দেখা পাওয়া গেল না তখন পেছন ফিরে হাঁটতে শুরু করলাম। খানিকটা যাবার পর বোদাকে দেখতে পেলাম। একটা দশ-বার বছরের মেয়ের সঙ্গে হাত-পা-মাথা ইত্যাদি নেড়ে নেড়ে আর হেসে হেসে সে দারুণ গল্প জুড়ে দিয়েছে। মেয়েটা ভারি সুন্দর। মাথা ভর্তি কোঁচকানো চুল, টকটকে ফর্সা রং, পাতলা ফুরফুরে নাক, প্রতিমার চোখের মতো চোখ, সরু চিবুক। তবে একবার দেখেই বোঝা যায় তারা খুবই গরিব। তার পরনে সেলাই-করা পুরনো ফ্রক আর ইজের। পা-দুটো খালি।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে ভুরু কুঁচকে ওদের দেখতে লাগলাম। মশগুল হয়ে গল্প করতে করতে আচমকা বোদার চোখ এসে পড়ল আমার ওপর। এক সেকেণ্ড তাকিয়ে রইল সে, তারপর মেয়েটার হাত ধরে দৌড়ে কাছে চলে এল। বলল, 'গুরু, তোমার পেছন পেছন

যেতে যেতে একটু খসে পড়েছিলাম।'

'কেন?' বোদার চোখের ভেতর সোজাসুজি তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

'এই মেয়েটাকে দেখতে পেয়ে গেলাম কিনা। একটু কথা বলতে ইচ্ছে করল। তাই—'

'মেয়েটা কে?'

'এর নাম আতর। এখানেই থাকে।'

'কথা শেষ হয়েছে?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ—'

'এবার দয়া করে চল।'

'হ্যাঁ—' বোদা আতরকে বলল, 'তুমি বাড়ি যাও। পরে আবার দেখা হবে।'

'আচ্ছা।' আতর চলে গেল।

আমরাও আর দাঁড়ালাম না, বোদাকে সঙ্গে নিয়ে ব্যারাক-বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। বললাম, 'ওই বাচ্চা মেয়েটার সঙ্গে কী এত বকর বকর করছিলি!'

বোদা বলল, 'এই কত রকমের কথা।'

'কথা বলার আর লোক পেলি না!'

'কেন মেয়েটার সঙ্গে অত গল্প করছিলাম বল তো?'

'কেন?'

'একটু ভেবে দেখ না। তোমার ব্রেনখানা তো টেরিফিক, ভাবলেই বুঝতে পারবে।'

বিরক্তও হচ্ছিলাম, আবার কৌতূহলও হচ্ছিল। বললাম, 'বুঝতে পারছি না।'

খ্যাল খ্যাল করে একটু হাসল বোদা। তারপর মুখটা আমার কানে গুঁজে দিয়ে ফিসফিসিয়ে উঠল, 'আগে বল মেয়েটা কি রকম দেখতে?'

'বিউটিফুল। কিন্তু ও বড় হতে হতে তোর চিতাভস্ম তো প্রয়াগে ঢেলে দিয়ে আসতে হবে।'

'ধুস, তুমি এই বুঝেছ! তোমার ব্রেনের জেল্লা কমে যাচ্ছে গুরু, পালিশ করিয়ে নিতে হবে।'

'তাই নাকি?' আমার বেশ আমোদ লাগল। বললাম, 'তোর ব্রেনের জেল্লাটা কেমন বেড়েছে দেখি। বল, ওর সঙ্গে কেন গল্প করছিলি—'

'খোঁজ নিচ্ছিলাম—'

'কিসের খোঁজ?'

'আতরের কোনো দিদি-টিদি আছে কিনা। এই মেয়েটা যেমন ফাস কেলাস দেখতে, ওর দিদিও নির্ঘাত তেমনই হবে। মানে আতরের দিদি-টিদি থাকলে একটু লড়ে যাব আর কি।'

আমার চোখের তারা ফিক্সড হয়ে গেল। বোদার পা থেকে চুলের ডগা পর্যন্ত ঝট করে একবার দেখে নিয়ে বললাম, 'ব্রেনখানা দারুণ খেলিয়েছিস তো মাকড়া—'

বোদা চোখ টিপে হাসল, 'সাত দিন ধরে তোমার গায়ে চিটে গুড়ের মতো সেঁটে আছি

গুরু। তোমার হাওয়া যদি একটু না লাগে তবে আমাকে কি বেশি দিন পার্টনার করে রাখতে চাইবে?'

বোদার ঘাড়ে আদরের ভঙ্গিতে গোটাকতক চাপড় মেরে বললাম, 'শালা আমার মাথা থেকে প্ল্যানিং কমিশনের হেড কোয়ার্টারটা দেখছি তোর মাথায় চলে যাচ্ছে —অ্যাঁ?'

'কি যে বল গুরু!'

'ঠিকই বলছি। এবার আসল খবরটা দে দিকি—'

'কী?'

'আতরের দিদি টিদি আছে?'

'আছে চার পাঁচটা।'

'কি রকম দেখতে জিজ্ঞেস করেছিলি?'

'সময় আর দিলে কোথায় গুরু। জিজ্ঞেস করতে যাব, তুমি এসে পড়লে।'

চুক চুক করে জিভ আর দাঁতের সাহায্যে কিছুক্ষণ শব্দ করে বললাম, 'আসল সময়টায় ছানা কাটিয়ে দিলাম, না কি বলিস?'

'বিলকুল। আর এক মিনিট পর এলে সব ব্যাপারটা ম্যানেজ করে জেনে নিতে পারতাম। আচ্ছা গুরু—'

'বলে ফ্যাল—'

'আতরের চেহারার যা স্যাম্পল দেখলে ওর দিদিদেরও সেই রকমই হবে, না কি বল? মায়ের পেটের একই ডাইস থেকে ঢালাই হয়ে সব বেরিয়ে এসেছে তো—'

'একই মায়ের পেট থেকে এলিজাবেথ টেলরের মতো জিনিসও জন্মায়,আবার আফ্রিকার কেলেকুস্টি নিগ্রোর মতো মালও বেরোয়। আতর ছাড়া বাকিগুলো যদি নিগ্রো-ফিগ্রো হয়ে থাকে—'

'বলো না গুরু, বলো না। আমার বুকে তাহলে ক্যান্সার হয়ে যাবে।'

'ঠিক আছে ঠিক আছে, ভাল করে খবরটা আগে নিয়ে নে—'

'নেব গুরু—' বলতে বলতেই আচমকা গলার ভেতর থেকে ঘোড়ার ডাকের মতো শব্দ করে উঠল বোদা, 'এ-হে-হে—'

'কী হল রে?'

'কিচাইন হয়ে গেল যে গুরু। মেয়েটার ঠিকানা নিতে ভুলে গেছি।'

'লাকে যদি থাকে আবার দেখা হয়ে যাবে।'

'লাকে থাক আর না-ই থাক, খুঁজে ওকে বার করবই।'

একসময় আমরা ব্যারাক-বাড়িতে পৌঁছে গেলাম।



বেলা বেশ বেড়ে গেছে। কবজি উল্টে রিস্ট ওয়াচে দেখলাম ন'টা বাজতে চার মিনিট বাকি। এর মধ্যে রোদের তাপ কয়েক সেন্টিগ্রেড বেড়ে উঠেছে।

উঠোনে পা দিতেই চোখে পড়ল চারদিকে কাচ্চা-বাচ্চা যুবক-যুবতী এবং বয়স্ক লোকজন গিজ গিজ করছে। ভোরে যখন আমরা বেরিয়ে যাই তখন এদের দেখি নি। রোদ উঠতে যে যার ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছে।

কালকের মতো চোখ কুঁচকে সন্দেহের চোখে তারা আমাদের দেখতে লাগল। সন্দেহের সঙ্গে কিছুটা আগ্রহও অবশ্য মেশানো রয়েছে। ঝট করে তাদের একবার দেখে নিয়ে হাসলাম। বললাম, 'আপনাদের এখানে এখন কিছুদিন থাকছি, পরে আলাপ-টালাপ হবে।'

লোকগুলো কিছু বলল না।

বোদা আর আমি আমাদের ঘরে এসে ঢুকে পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে কাছের থানা থেকে ন'টার সাইরেন বেজে উঠল।

দশ-বার মিনিট জিবিয়ে নিয়ে শেভটা করে নিলাম। তারপর কুয়োর পাড় থেকে দু'জনে স্নান সেরে পোশাক-টোশাক পাল্টে সবে চুল আঁচড়ানো শেষ করে এনেছি, সেই সময় সুমনা এসে হাজির। সে বলল, 'আমাদের ওখানে কিন্তু আপনাদের দু'জনের রান্না হয়েছে।'

ঘাড় ফিরিয়ে বললাম. 'তোমার সঙ্গে সে কথা তো ছিল না।'

'মানে—'

'মানে-টানে নয়। কৃতজ্ঞতা-টৃতজ্ঞতা দেখাতে চেয়েছিলে, সে জন্যে কাল খেয়েছি। আজ যদি জোর কর. বোদা আর আমাকে কিন্তু এখান থেকে তাঁবু তুলে ফেলতে হবে।'

এক ফুঁয়ে বাতে নিভে যাওয়ার মতো মুখটা কালো হয়ে গেল সুমনার। কিছু বলতে চেষ্টা করল সে, পারল না। ঠোঁট দুটো থর থর করতে লাগল শুধু।

মেয়েটার থুতনিতে একটা টোকা মেরে বললাম, 'আরে বাবা,এই নিয়ে মন খারাপ করে নাকি! আসলে ব্যাপারটা কি জানো?'

সুমনা আমার চোখের ভেতর তাকাল, কিছু অবশ্য জিজ্ঞেস করল না।

আমি বলতে লাগলাম, 'হোল লাইফ হোটেলে খেয়ে খেয়ে এমন হ্যাবিট হয়ে গেছে যে ওখানে না খেলে মনে হয় খাওয়াই হল না। ডেণ্ট বি সেন্টিমেণ্টাল। এখন বল তোমার মা কেমন আছে?'

'অনেক ভাল।'

'গুড।'

'জ্বর ছেড়ে গেছে?'

'এখনও পুরোটা ছাড়েনি, অল্প আছে।'

একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'আমরা একটু বেরুব সুমনা।'

সুমনা বলল, 'ও আচ্ছা, আমি তা হলে যাই।' ঘর থেকে বেরিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কখন ফিরবেন?'

'এই ঘণ্টাখানেকের মধ্যে।'

'আপনাদের তালা আছে?'

'তালা দিয়ে কি হবে?'

'ঘরে লাগিয়ে যাবেন।' সুমনা বলতে লাগল, 'সকালবেলা যখন বেরিয়েছিলেন তখনও ঘর খোলা রেখে গিয়েছিলেন। এভাবে যাওয়া ঠিক নয়।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন বল তো?'

ঘাড় ফিরিয়ে চারদিক দ্রুত একবার দেখে নিয়ে সুমনা গলার স্বর নামিয়ে ফেলল, 'এখানকার লোকজন ভাল না।'

'তুমি চুরিটুরির ভয় করছ?'

'হ্যাঁ।'

আমি হাসলাম, 'আমাদের কী আছে যে চুরি হবে! ক'টা প্যাণ্ট শার্ট, বোদার বিছানা, আমার একটা বালিশ, বেড কভার—কিন্তু এসব তো ন্যাশনাল প্রপার্টি, মানে জনগণের সম্পত্তি। ঘুরতে ঘুরতে আমাদের হাতে এসে পড়েছে। এখন যদি চোরের হাতে যায় তো যাবে।'

সুমনা বলল, 'এটা কোনো কাজের কথা নয়। তালা না থাকলে একটা কিনে আনবেন। আর যতক্ষণ না ফিরে আসছেন আপনাদের ঘরটার দিকে আমি নজর রাখছি।'

দু-একবার সুমনাকে বোঝাতে চাইলাম নজর রাখার দরকার নেই। কিন্তু কে কার কথা শোনে। অগত্যা বললাম, 'ঠিক আছে, তোমার যা খুশি করো।' বলেই আমরা যুগলবন্দি হয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

পবিত্র খালসা হোটেলে রুটি মাংস খেয়ে, রাস্তার এক দোকান থেকে আলিগড়ের একটি তালা কিনে ঘণ্টাখানেক বাদে ফিরে এসে দেখি সুমনা তাদের ঘরের বারান্দা থেকে আমাদের ঘরটার দিকে তাকিয়ে বসে আছে। তার মানে পুরো একটি ঘণ্টা ঠায় বসে সে পাহারা দিয়েছে। আমাদের দেখে সে ঘরের ভেতর চলে গেল। আমরাও আমাদের ঘরে ঢুকলাম।

তারপর গোটা দুপুরটা পাশাপাশি বিছানায় শুয়ে বোদা আর আমি পরিপাটি একটি ঘুম লাগিয়ে যখন উঠলাম তখন প্রায় সন্ধে নেমে গেছে। শুয়ে শুয়ে দেখতে পেলাম, রোদ জেল্লা হারিয়ে ম্যাড়মেড়ে হয়ে যাচ্ছে। উঠোনের মাঝমধ্যিখানে ঝাঁকড়া-মাথা রেইন ট্রি'টার মাথায় ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি ফিরে আসতে শুরু করেছে। তাদের ডানা ঝাপটানোর শব্দ এবং নানা বিচিত্র সুরের কিচির মিচির শুনতে পাচ্ছি।

নিস্তেজ রোদের রং দেখতে দেখতে আর নানারকম পাখির গলা শুনতে শুনতে আচমকা আমার মনে পড়ে গেল, আজ রাত সাতটায় বোধহয় থিয়েটার রোডে পৌঁছনো যাবে না।

ঘাড় ফিরিয়ে বোদাকে বললাম, 'এই রেডি হয়ে নে।'

বোদা জিজ্ঞেস করল, 'বেরুতে হবে নাকি গুরু?'

'ইয়েস। সমাজপতি ইনভাইট করেছে, মনে নেই?'

বোদার উঠবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। চিত হয়ে শুয়ে হাই তুলতে তুলতে আঙুল মটকাতে লাগল।

বললাম, 'কী হল রে, উঠবি না?'

বোদা হারমোনিয়ামের রিডের মতো দাঁতগুলো বার করে হাসল। বলল, 'বডিটা টেরিফিক ম্যাজ ম্যাজ করছে, বোধ হয় টাইফয়েড হবে।'

স্থির চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে বোদাকে দেখলাম। তারপর বললাম, 'টাইফয়েড হবে!'

'ইয়েস গুরু—'

'তার মানে মাকড়া তুমি যাবে না।'

'বডিটা আজ আর তুলতে ইচ্ছে করছে না গুরু—'

'মতলবটা কি রে?'

'আজ আর আমাকে টানাটানি কোরো না। তুমি একাই যাও। খানিকটা পর উঠে চা-ফা খেয়ে এধারে-ওধারে একটু ঘুরে ঘরে এসে শুয়ে থাকব।'

হঠাৎ আমার মাথায় ফোর ফরটি ভোল্টের বিদ্যুৎ খেলে গেল। বললাম, 'শালা তোমার ধান্দা ধরে ফেলেছি।'

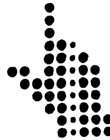
বোদা বলল, 'কী ধান্দা?'

'নির্ঘাৎ তুই সেই মেয়েটার—কী যেন নাম, হ্যাঁ আতর, আতরের খোঁজ করবি।'

আবার হারমোনিয়ামের রিড দেখা গেল। এক চোখ টিপে আর পেটেন্ট খ্যাল খ্যাল হাসিটা হাসতে হাসতে বোদা বলল, 'মাল ঠিক ক্যাচ করে ফেলেছ। এই না লে তুমি [illegible]ার গুরু। পায়ের ধুলো দাও মাইরি—' লম্বা হাত বাড়িয়ে আমার পায়ের তলা হাতড়াতে লাগল বোদা, 'ধুস, এমন ফর্সা পা, এক ফোঁটা ধুলোও নেই।'

'ঠিক আছে ঠিক আছে, অত ভক্তির আর দরকার নেই। আতরকে খুঁজবার সঙ্গে সঙ্গে রি-ফিলিং স্টেশনগুলোর একটু আধটু খোঁজ নিয়ো। কাল থেকে স্টমাকে এক ফোঁটা বেঙ্গল পড়ে নি, হুঁশ আছে?'

বোদা ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'নিশ্চয়ই খোঁজ নেব গুরু, নিশ্চয়ই নেব।'



কিছুক্ষণ পর ট্রাউজার্স ফাউজার্স বদলে বেরিয়ে পড়লাম। দশ মিনিট বাদে বি-টি রোডে এসে দেখি বাস-স্ট্যাণ্ডে সুমনা দাঁড়িয়ে আছে। তার পরনে দামী মাইশোর সিল্ক, পায়ে স্ট্র্যাপ দেওয়া স্লিপার, লাল রিবনে-বাঁধা শ্যাম্পু-করা ফাঁপানো চুল, হাতে ফ্যাশনেবল লেডিজ ব্যাগ,

চোখে সরু করে সর্মার টান, কপালে চায়না সিঁদুরের একটি টিপ। আমি পায়ে পায়ে সুমনার কাছে গেলাম।

সুমনা আমাকে এখানে দেখবে, ভাবে নি। জিজ্ঞেস করল, 'আপনি?'

বললাম, 'একটা দরকারে কলকাতায় যাচ্ছি। তুমি?'

'আমিও তো কলকাতায় যাচ্ছি।'

'ভালই হল, একসঙ্গে যাওয়া যাবে।'

'হ্যাঁ, চলুন।'

সুমনা কী উদ্দেশ্যে কলকাতায় যাচ্ছে, মোটামুটি আন্দাজে করতে পারছি। হে-হে মহাশয়গণ, আপনারা তো জানেনই আমি একটা থার্ড ক্লাস চিট, হাসতে হাসতে লোককে পথে বসিয়ে দিই, পৃথিবীর কোনো কিছু সম্বন্ধেই আমার আগ্রহ নেই, কোনো কারণেই আমি অস্থির হই না, আসলে আমার শরীরে উইক গ্ল্যাণ্ড খুব কমই আছে, ওয়ার্ল্ডের বাইরের দিকে প্যারাসাইটের মতো আমি ঝুলে আছি। তবু এই মেয়েটার জন্য বি-টি রোডের এই বাস-স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল।

সুমনা আবার বলল, 'আপনি কখন ফিরবেন?'

বললাম, 'বলতে পারছি না। এখন কলকাতায় গিয়ে নিজেকে একটি লোকের হাতে ছেড়ে দিতে হবে। নিশ্চয়ই মালের বোতল টোতলও থাকবে। সেই লোকটা আর মালের বোতলগুলো কখন আমাকে ছাড়বে এক্ষুণি বলা কি সম্ভব?'

সুমনা হাসল। তার হাসিটা আমার চোখে মুখেও ছড়িয়ে পড়ল।

আমি আবার বললাম, 'তবে দশটা সাড়ে দশটার বেশি আমি থাকছি না।' একটু ভেবে বললাম, 'আশা করছি লাস্ট ট্রেনেই ফিরতে পারব। তবে সব কিছু নির্ভর করছে মালের ওপর।'

'ট্রেনেই ফিরছেন তা হলে?'

'সেইরকম ইচ্ছে।'

একটু চুপ করে থেকে সুমনা এবার বলল, 'আপনি একা যাচ্ছেন, আপনার পার্টনার কোথায়?'

বললাম, 'পার্টনার বলল, তার নাকি শরীর খুব খরাপ। টাইফয়েড হবে।'

'টাইফয়েড হবে!'

'আসলে ওর আজ আর বেরুবার ইচ্ছা নেই। সেই জন্যে টাইফয়েডের কথা বলেছে।'

'তাই বলুন। সুমনা খুব একচোট হাসল।

আমি কী বলতে যাচ্ছিলাম, সেই সময় বাস এসে গেল।

বি-টি রোডের এই বাসগুলোতে ভোর থেকে মাঝরাত পর্যন্ত কোনো সময়ই ছুঁচ ঢোকাবার জায়গা থাকে না। সর্বক্ষণ ওগুলো বোঝাই হয়ে আছে। শুধু ভেতরেই নয়, বাসগুলোর ফুটবোর্ডে, ছাদের ওপর এবং পেছনে মানুষের নশ্বর শরীর ঝুলে থাকে।

কিন্তু এই বাসটার ভেতরে ঢুকতে পারা গেল। এবং কি আশ্চর্য, জানলার ধার ঘেঁষে

পাশাপাশি দুটো খালি সিটও পেয়ে গেলাম। বললাম, 'আজকে আমাদের স্টারের পজিশন খুব ভাল, নাকি বল? নইলে এই রুটের বাসে বসবার সিট পাওয়া যায়!'

সুমনা হাসল, 'যা বলেছেন!'

আমরা উঠবার সঙ্গে সঙ্গে বাসটা ছেড়ে দিয়েছিল। দারুণ স্পিডে সেটা এখন ছুটছে। দু'ধারের বাড়ি-ঘর, ফ্যাক্টরি, খোলা মাঠ, রিফিউজি কলোনি অর্থাৎ পরিচিত দৃশ্যাবলী সটাসট সরে যাচ্ছে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ দু'জনেই বাইরে তাকিয়ে রইলাম। তারপর হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে শুরু করলাম, 'তুমি কি পার্ক স্ট্রিটের ওধারে সেই অ্যাপার্টমেণ্ট হাউসটায় আজও যাচ্ছ?

সুমনা মুখ ফেরাল, 'হ্যাঁ—'

'কিন্তু—'

'কী?'

'কাল না বললে ওখানে পুলিশ বসেছে। তাছাড়া অন্য যে অ্যাপার্টমেণ্ট হাউসগুলো ছিল সেখানেও পুলিশ রেইড করছে?'

'হ্যাঁ—'

'তা হলে?'

'তবু যেতে হবে। নইলে খাব কী? গিয়ে দেখি সামতানি সাহেবরা অন্য কোনো ব্যবস্থা করেছে কিনা—'

'সামতানি সাহেব কে?'

সুমনা এবারে চমকে উঠল। বলল, 'না না, কেউ না—'

মহাশয়গণ, আমি হলাম হাজার ঘাটের জল খাওয়া লোক। কারো মুখের চামড়া এক চুল কুঁচকে গেলেও তার মনের কথা টের পেয়ে যাই। বললাম, 'ওই নামটা বলা বুঝি বারণ?'

প্রথমে উত্তর দিল না সুমনা। চোখ নামিয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর আবছা গলায় বলল, 'হ্যাঁ।'

তার দিকে অনেকটা ঝুঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ওই নামটা কি আমাকে ভুলে যেতে বলছ?'

সুমনা আস্তে করে মাথা নাড়ল, অর্থাৎ বলছে।

'অল রাইট, তোমার যখন ইচ্ছা নয় তখন মনে করে রাখব না। আমার মাথাটা তো আর ন্যাশনাল আর্কাইভ নয় যে দুনিয়ার সব কিছু সেখানে পুরে রাখতে হবে। তবে—'

'তবে কী?'

'ভুলে যাবার আগে একটা কথা শুধু জানতে চাই, সামতানি সাহেবটা কে?'

'আমাদের নিয়ে যে বিজনেস চালায়। কিন্তু ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেলে আমি খুব বিপদে পড়ে যাব।'

'জানাজানি হবে কেন? তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পার। কথা দিলাম ভুলে যাব, ওয়ার্ড

অফ অনার।'

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপে।

তারপর জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা সুমনা—'

সুমনা অন্যমনস্কের মতো বসে ছিল, মুখ ফিরিয়ে তাকাল।

'তুমি কিভাবে পয়সা রোজগার কর, তোমার মা বা দিদি জানে?'

'হয়তো জানে, হয়তো জানে না। ঠিক বলতে পারব না।'

'কেউ কিছু জিজ্ঞেস করে না?'

'না।'

মহাশয়গণ, যে মানুষ পৃথিবীর কোনো ঘটনাতেই বিস্ময় বোধ করে না, সেই আমি পিটার স্বয়ম্ভু হোড়, একটা টিপিক্যাল ফোর টুয়েন্টি, রীতিমতো অবাকই হয়ে গেলাম। বললাম, 'তুমি সেদিন বলেছিলে, বেশির ভাগ দিনই লাস্ট ট্রেন কি লাস্ট বাস ধরে বাড়ি ফেরো—'

সুমনা ঘাড় হেলিয়ে দিল, মানে তাই।

আমি বলতে লাগলাম, 'তুমি একটা ইয়ং গার্ল, এত রাত পর্যন্ত কোথায় থাকো, কী করে বেড়াও, বাড়ি লোকদের জানবার ইচ্ছা হয় না?'

'কী হবে জেনে?'

'তার মানে?'

'জানতে পারলে ওদের সুখ কি বাড়বে? তার চাইতে যদ্দিন লুকোচুরি করে চলে তদ্দিনই ভাল।'

আমার আর কিছু বলার ছিল না, চুপ করে রইলাম।

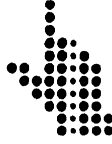
একসময় বাসটা শ্যামবাজার পৌঁছে গেল।

পাঁচমাথার মোড়ে নেতাজির স্ট্যাচুর কাছে নেমে ঘড়িটা একবার দেখে নিলাম। ছ'টা বেজে দশ। সাতটায় সমাজপতির সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট। হাতে এখনও অঢেল সময় আছে। ধীরেসুস্থে বাসে উঠলে সাতটার ঢের আগেই থিয়েটার রোডে পৌঁছে যেতে পারব। সুমনাকে বললাম, 'তোমার খুব তাড়া নেই তো?'

সুমনা বলল, 'না, তাড়া কিসের।'

'তা হলে চল বাসেই যাই।'

একটা ফাঁকা ন' নম্বর এল-মার্কা বাস পেয়ে গেলাম। ডালহৌসি ঘুরে পঁয়ত্রিশ মিনিটের মধ্যে বাসটা পার্ক স্ট্রিটের ক্রসিং-এ পৌঁছে গেল। সুমনা ওই স্টপেজেই নামল, আমি আরেকটু এগিয়ে থিয়েটার রোডের মুখে যখন নামলাম সাতটা বাজতে তখনও দশ মিনিট বাকি। তারপর সমাজপতির অ্যাপার্টমেণ্ট হাউসটা খুঁজে বার করতে পাঁচ মিনিটও লাগল না।



বাড়িটা প্রকাণ্ড, গুনে গুনে দেখলাম আঠার তলা।

এখন কলকাতার ওপর সন্ধে নেমে এসেছে। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকে পেছনে ফিরলে দূরে বিড়লা প্ল্যানেটেরিয়াম, তার ওধারে ক্যালকাটা র‍্যাকেট ক্লাব, ময়দান, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল। আর এধারে ওধারে বিশাল বিশাল সব বাড়ি। কলকাতার নতুন স্কাইস্ক্রেপার কমপ্লেক্সটা থিয়েটার রোডের চারপাশে গড়ে উঠেছে। যদিও রাস্তায় রাস্তায় মার্কারি ল্যাম্পের নীলচে ঝকঝকে আলোগুলো জ্বলে উঠেছে, যদিও কাছের এয়ার-কণ্ডিশানড মার্কেটটার গায়ে কিংবা বিভিন্ন ফ্যাশনেবল দোকানপাটের মাথায় আর শো-উইণ্ডোতে নানা রঙের নিওন সাইন ঝলমল করছে, তবু দূরের ময়দান বা কাছাকাছি স্কাইস্ক্রেপারগুলোর মাথায় আবছা অন্ধকার উলঙ্গ বাহার শাড়ির মতো জড়িয়ে রয়েছে। ওধারে চৌরঙ্গির ওপর দিয়ে ট্যাক্সি, প্রাইভেট কার, ডবল ডেকার, সিঙ্গল ডেকার, মিনিবাস দারুণ স্পিডে আলোর একেকটা রেখা টেনে দিয়ে চলে যাচ্ছে।

আঠার তলা বাড়িটার তলায় দু-মিনিট দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর আস্তে আস্তে পা ফেলে ভেতরে ঢুকে পড়লাম।

ভেতর ঢুকলেই বাঁ দিকে পর পর চারটে অটোমেটিক লিফট। একটা লিফট-বক্সে ঢুকে কত নম্বর স্যুইটে যাব, চট করে ভেবে নিলাম। হ্যাঁ মনে পড়েছে—থার্টিফোর, ফিফটিনথ ফ্লোর। সমাজপতি ওই নম্বরটাই বলেছিলেন। অতএব ফিফটিনথ নম্বরের বোতামটা টিপে দিলাম। ঝিঁঝির ডাকের মতো একটানা শব্দ করে লিফটটা সঠিক জায়গায় এসে থামল। দরজা খুলে যেতেই বাইরে এলাম। তক্ষুণি চোখে পড়ল, ওধারের একটা স্যুইটের দরজায় ঝকঝকে পেতলের চাকতিতে থার্টিফোর লেখা রয়েছে। সেখানে সাদা ধবধবে উর্দি-পরা দারুণ স্মার্ট চেহারার একটা বেয়ারা দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখেই সে ছুটে এল। বলল, 'সেলাম সাব—'

আমি দু-চোখে কৌতূহল এবং প্রশ্ন নিয়ে তাকালাম।

বেয়ারাটা জানতে চাইল, সমাজপতি সাহেবের কাছে আমি এসেছি কিনা।

মাথা নাড়লাম অর্থাৎ তাঁর কাছেই এসেছি। বেয়ারার সেলামটা এবার আরো লম্বা হল। অনেকখানি ঝুঁকে সে বলল, 'আইয়ে সাব, আইয়ে—' আমাকে সঙ্গে করে চৌত্রিশ নম্বর স্যুইটের কাছে গিয়ে দরজা খুলে দিল সে। ভেতরে ঢুকে পড়লাম। দরজার পর থেকেই কার্পেট পাতা রয়েছে। পা ফেলবার সঙ্গে সঙ্গে ছ'ইঞ্চি ঢুকে গেল। এদিক সেদিক তাকাতে সামনে একটা প্রকাণ্ড কাচের দরজা চোখে পড়ল। সোজা এখানে চলে এলাম।

দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ভেতরটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। সেটা একটা বিশাল হল ঘর। সেখানেও লাল টকটকে কার্পেট পাতা, ডিসটেম্পার-করা দেওয়ালে নানা রকম সূক্ষ্ম নকশা

আঁকা, সিলিং-এও নক্সা রয়েছে। দেয়ালে দেয়ালে ল্যাণ্ডস্কেপ কিংবা উলঙ্গ নারীদেহের স্কেচ ঝুলছে। মহাশয়গণ, আপনাদের আগেও বলেছি, আরো একবার বলছি, সারা দেশটার যত সুন্দর সুন্দর মেয়েমানুষ আছে সবার জামাকাপড় খুলে শালারা ন্যুডিজমের একখানা একজিবিশন লাগিয়ে দিয়েছে। মহাভারতে কে যেন কার, ও হ্যাঁ, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ মানে শাড়ি ধরে টানাটানি করেছিল বলে কি টেরিফিক একখানা লড়াই হয়ে গেল। এখন মহাশয়গণ, হাজার হাজার দ্রৌপদীর শাড়ি-ব্লাউজ-ব্রা খুলে ন্যাংটো মেয়েমানুষের প্যারেড করানো হচ্ছে কিন্তু মহাভারতের সেই লড়াই-ফড়াই দূরের কথা, কোথাও কোনো রি-অ্যাকশন নেই, কারো মুখের চামড়া পর্যন্ত কাঁপে না। যেন ওয়ার্ল্ডে এটাই একমাত্র স্বাভাবিক ঘটনা।

যাক গে, আমি তো একটা ফোরটোয়েন্টি, চিট, আমার কথা ছেড়ে দিন। মহাশয়গণ, আপনারা যদি চোখে ঠুলি লাগিয়ে বসে থাকেন আমি আর ভেবে কি করব?

কাচের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আমার চোখে আরো যা পড়ল তা হল দেয়াল ঘেঁষে কারুকাজ-করা সিংহাসনের মতো অনেকগুলো সোফা চমৎকার করে সাজানো। প্রতিটি সোফার গায়েই ছোট ছোট কাশ্মীরি টেবল।

দেখতে পেলাম মিস্টার সমজপতি এবং আরো তিন জন সোফায় বসে বসে কথা বলছিলেন। সবার পাশেই সেই ছোট টেবলগুলোতে ড্রিঙ্কের গেলাস। মহাশয়গণ, হাই সোসাইটি বা অ্যাফ্লুয়েন্ট সোসাইটি, যাই বলুন না কেন, চেহারা এবং পোশাক দেখে মনে হচ্ছে এঁরা সেই সব স্তরের মানুষ।

দরজার পাল্লা ঠেলে ঢুকতে যাব, সমাজপতিব দিকে তাকিয়ে হঠাৎ একজন বললেন, 'আপনি বলছেন দ্যা বয় ইজ ইনটেলিজেন্ট?'

সমাজপতি তাঁর গেলাসটা তুলে নিয়ে হাতের ভেতর ঘোরাতে ঘোরাতে বললেন, 'ভেরি মাচ। হি ইজ সামথিং একস্ট্রা-অর্ডিনারি। আমার লাইফ-টাইমে এরকম আর দেখি নি।'

'ওকে কাজে লাগানো যেতে পারে?'

'নিশ্চয়ই পারে। শুধু ইনটেলিজেন্ট না, ও যে কী, আই কান্ট রিয়েলি এক্সপ্লেন। আমি তো ভাবছি ওকে আমার কাছেই রেখে দেব। ছোকরা এমন একটা টাইপ, তাকে যেখানেই ফেলা যাক না, ঠিক কাজটি গুছিয়ে নিয়ে আসবে।'

ওধার থেকে আরেকজন বললেন, 'ইজ হি রিলায়েবল?'

সমাজপতি গলায় সবটুকু শক্তি ঢেলে দিয়ে বললেন, 'হানড্রেড পারসেণ্ট। সে আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে, তাকে আমি বিশ্বাস করি। কিভাবে আমার লাইফটা সেভ করেছে আপনাদের তো বলেছি। তা ছাড়া ওকে আমি ফ্ল্যাট দিতে চেয়েছি, চাকরি দিতে চেয়েছি। হি রিফিউজড।'

সেই ভদ্রলোক এবার বললেন, 'ছোকরাকে মিট করার জন্যে আমি খুবই এক্সাইটেড ফিল করছি। মিস্টার সমাজপতি, আপনি নিজেই যথেষ্ট ইনটেলিজেণ্ট, স্টোর অফ এনার্জি। ছেলেটাকে আমায় দিয়ে দিন।'

বাঁ পাশ থেকে চতুর্থ লোকটি বলে উঠলেন, 'ও নো, ছোকরাকে আমি চাই। মিস্টার

সমজপতি আপনি তো জানেন অনেক দিন ধরে, সে ফর অ্যাবাউট আ ডিকেড, আমি এমন একটা ছেলে খুঁজছি যে ইনডিপেনডেণ্টলি আমার বিজনেসের জন্য নতুন প্ল্যানিং করতে পারবে আর সেই প্ল্যান নিজে একজিকিউটও করবে। আমার বয়েস হচ্ছে তো। মাথার গ্রে ম্যাটারগুলো ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে। এখন আর নতুন কিছু ভাবতে পারি না। প্লিজ আমাকে ডিপ্রাইভ করবেন না। ছেলেটাকে আমার হাতেই দিন।'

সমাজপতি বেশ গর্বিত মুখে গম্ভীর চালে একটু হাসলেন, 'সবাই টানাটানি করলে কাকে দেব! তার চাইতে আমি একটা প্রস্তাব করছি—'

'বলুন—'

'ছোকরা আমার কাছেই থাকবে। কারণ আই হ্যাভ ডিসকভারড হিম। ওর মেইন সেন্টারটা হবে আমার গড়িয়াহাটার ফ্ল্যাটে। তবে আপনাদের দরকারমতো মাঝে মাঝে ওকে ডেপুটেশনে পাঠাতে পারি। এতে সবারই কাজ চলবে।'

'নট আ ব্যাড আইডিয়া—'

ডানদিকের শেষ সোফাটায চতুর্থ যে ব্যক্তিটি বসে ছিলেন তিনি এতক্ষণ একটি কথাও বলেন নি। হঠাৎ সামনের দিকে অনেকখানি ঝুঁকে মুখ খুললেন, 'আমার একটা কথা আছে—'

সবাই তাঁব দিকে ফিবে তাকালেন। সমাজপতি সকলের মুখপাত্র হিসেবে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী কথা?'

'ছোকরা বিশেষ একটা ব্যাপাবে ইনটেলিজেন্সেব পরিচয় দিয়েছে, সে আপনার লাইফ সেভ করেছে, এ সবই ঠিক। তবু আমাব মতে ওকে একটু টেস্ট করে নেওয়া দরকার।'

'কিভাবে?'

'আমরা প্রত্যেকে ওকে একেকটা কাজ দেব। সেগুলো যদি সাকসেসফুল কা‌ ফলতে পারে, বুঝব মিস্টার সমাজপতি একখানা রিয়েল জেম আবিষ্কার করেছেন। তখন ছোকরা শুধু একা সমাজপতিরই না, আমাদের সবার জয়েণ্ট প্রোপার্টি হবে। কি, রাজি?'

'দিস ইজ আ রিজনেবল প্রোপোজাল—' সমাজপতি আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন।

অন্য সকলে প্রায় কোরাসেই এবার বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, প্রস্তাবটা ভালই।'

হে-হে মহাশয়গণ, বুঝতেই পারছেন আমাব আর দাঁড়িয়ে থাকার মানে হয় না। নাটকের হিরোর মতো এবার আমাকে স্টেজে ঢুকে পভতেই হয়। দরজা ঠেলে ঢুকে পড়লামও।

একটা কথা ভেবে আমার খুব মজা লাগছিল। আমার অজান্তে কালনেমির লঙ্কা-ভাগের মতো ওরা আমাকে ভাগাভাগি করে নেবার ব্যবস্থা করেছে মহাশয়গণ। এতদিন গড়গড়িয়ে এক বগ্‌গা গাড়ির মতো ছুটছিলাম। আজ মনে হচ্ছে একটা ক্রসিংয়ের মুখে এসে গেছি। এবার ব্রকে কষে গাড়িটাকে খুব সম্ভব নতুন আরেকটা রাস্তায় গড়িয়ে দিতে হবে। দিতে যখন হবে, দেব। আপনারা তো জানেনই মহাশয়গণ, কোনো কিছুতেই আমি ঘাবড়াই না,আমার নার্ভ দারুণ স্ট্রং। দেখাই যাক না, কোথায় গিয়ে ঠেকি। একটা এক্স পিরিয়েন্স তো হয়ে যাক। হাজার ঘাটের জল খেয়েছি, সেই সংখ্যাটা না হয় আরেকটু বাড়বে।

ভেতরে ঢুকে বললাম, 'মে আই কাম ইন স্যার?'

সমাজপতি সোজা উঠে দাঁড়ালেন। তারপর উচ্ছ্বসিতভাবে বললেন, 'মোস্ট ওয়েলকাম। তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছি। এই দেখ, সবাই ড্রিঙ্কস নিয়ে বসে আছি কিন্তু কেউ ঠোঁট দিয়ে টাচ করি নি।'

বললাম, 'আই অ্যাম সরি স্যার। কিন্তু আমার তো আসবার কথা সাতটায়। ঠিক সাতটাতেই এসেছি।'

'না-না, তোমার সরি ফিল করার কারণ নেই। ড্রিঙ্ক নিয়ে আসর সাজিয়ে বসে ছিলাম আফটার অল ইউ আর মাই অনারড গেস্ট টু-ডে। ভেবেছিলাম তুমি এলেই শুরু করে দেব।' বলতে বলতেই গলার স্বরটা উঁচুতে তুলে ডাকলেন, 'বেয়ারা—'

তক্ষুণি একটা বেয়ারা মাটি ফুঁড়ে সামনে এসে দাঁড়াল।

সমাজপতি বললেন, 'হুইস্কি আউর সোডা—' বলেই আমার দিকে ফিরলেন, 'নাউ মিট মাই ফ্রেণ্ডস। এঁরা তোমার সঙ্গে আলাপ করবার জন্য উদ্‌গ্রীব। ইনি মিস্টার নবকুমার মুখার্জি, বিজনেসম্যান। আর এ পিটার স্বয়ম্ভু হোড়—'

আমি হাত বাড়িয়ে নবকুমারের হাত ধরলাম। তিনি বললেন, 'হ্যালো—'

আমিও প্রতিধ্বনি করলাম, 'হ্যালো—গ্ল্যাড টু মিট ইউ—'

সমাজপতি এরপর বলে যেতে লাগলেন, 'ইনি মিস্টার অভ্যুদয় মিটার, বিজনেসম্যান অ্যাণ্ড পলিটিসিয়ান। ইনি মিস্টার হারানিধি চট্টরাজ, বিজনেসম্যান। ইনি মিস্টার সুরেশ সামতানি, বিজনেসম্যান।'

সবার হাতেই হাত মেলাচ্ছিলাম। সৌজন্যের খাতিরে দুটো একটা কথাও হচ্ছিল। সুরেশ সামতানির কাছে এসে হাত বাড়াতে গিয়ে থমকে গেলাম। সামতানি, সামতানি। এই সারনেমটা কার কাছে যেন শুনেছি? কার কাছে? ঠিক মনে করতে পারলাম না। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে সামতানিকে বললাম, 'হ্যালো—'

মিস্টার সুরেশ সামতানির বয়েস পঞ্চান্ন ছাপান্ন। নাক মুখ কাটা-কাটা, ধারাল থুতনি, বেশির ভাগ সিন্ধির মতোই গায়ের রং টকটকে। পাশের টেবলে যখন হুইস্কির গেলাস সাজানো রয়েছে তখন ধরেই নিতে হচ্ছে ভদ্রলোক মদ্যপানটা করে থাকেন কিন্তু মদ্যপানজনিত ফ্যাট বা মেদ তাঁর শরীরের কোথাও জমতে পারে নি।

পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন বছর বয়সে কম করে নিশ্চয়ই হাজার গ্যালন হুইস্কি খেয়েছেন সামতানি। তা সত্ত্বেও শরীরটাকে এমন কমবয়েসী যুবকদের মতো মেদহীন এবং অ্যাট্রাকটিভ রাখা সোজা কথা নয়। আমি যে আমি, পিটার স্বয়ম্ভু হোড়, আমার পর্যন্ত চোখের তলায় এবং পেটে বাংলা মালের কল্যাণে কিঞ্চিৎ চর্বি জমেছে। হে-হে মহাশয়গণ, এই লোকটা বোধ হয় ম্যাজিক জানে।

সামতানি বললেন, 'হাউ ডু ইউ ডু?'

বললাম, 'ফাইন স্যার—'

'প্লিজড টু মিট ইউ—'আমার হাতটা জোরে একবার ঝাঁকিয়ে দিলেন সামতানি।

সবিনয়ে ঘাড়টা হেলিয়ে দিয়ে বললাম, 'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার, থ্যাঙ্ক ইউ—'

'আসুন, বসা যাক।'

আমি একটা সোফায় বসলাম। সঙ্গে সেই বেয়ারাটা ট্রে-তে করে হুইস্কির গেলাস নিয়ে এল। আমি বাংলা মাল খেয়ে থাকি, কিন্তু এখানে সেটা পাচ্ছি কোথায়? অগত্যা গেলাসটা তুলে নিলাম।

ওদিকে সামতানিরাও যে যার সোফায় বসেছেন। পাশের টেবল থেকে হুইস্কির গেলাস তুলে নিয়ে সবাই বললেন, 'চিয়রস্—'

নিজের গেলাসটা উঁচুতে তুলে আমিও সামতানিদের কোরাসে গলা মেলালাম, 'চিয়রস্—'

বিজনেসম্যান-কাম-পলিটিসিয়ান অভ্যুদয় মিটার গেলাসে আলতো চুমুক দিয়ে বললেন, 'মিস্টার হোড়, আমরা সবাই আপনার কাছে গ্রেটফুল—'

সামতানি কণ্ঠস্বরে কিঞ্চিৎ শক্তি প্রয়োগ করে বললেন, 'ভেরি মাচ গ্রেটফুল—'

বললাম, 'আজ্ঞে, কারণটা ঠিক বুঝতে পারছি না।'

বিজনেসম্যান হারানিধি চট্টরাজ চুক চুক শব্দ করে হুইস্কি খাচ্ছিলেন। তাঁর চেহারাখানা দেখবার মতো—বেঢপ লম্বা, জিরাফের মতো গলা। মুখটা স্টাফ-করা বয়স্ক বুলডগের কথা মনে করিয়ে দেয়। দারুণ দামী পোশাক পরনে, টকটকে লাল রঙের টাই নাভি পর্যন্ত নেমে এসেছে। চট্টরাজ বললেন, 'কারণ আপনি আমাদের ফ্রেণ্ড, অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় বন্ধু মিস্টার সমাজপতির প্রাণ রক্ষা করেছেন।'

বিনয়ের অবতার হয়ে বললাম, 'এসব কথা বললে আমি খুব বিব্রত বোধ করব। যে কেউ এটুকু করত, আমি বেশি কিছু করিনি।'

অভ্যুদয় মিটার বললেন, 'সমাজপতির মুখে আপনার কথা এত শুনেছি যে আপনাকে দেখবার খুব ইচ্ছা হয়েছিল। উনি আজকাল আপনার কথা ছাড়া আর কিছুই বলেন না।'

'এটা ওঁর গ্রেটনেস মানে মহত্ত্ব। আসলে আমি একটা —'

'আহা-হা, আপনি কী আমরা তা জানি। নিজের মুখে আপনাকে আর তা বলতে হবে না। মিস্টার সমাজপতি যার সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত সে জেনুইন গোল্ড হতে বাধ্য।'

হে-হে মহাশয়গণ, এই লোকগুলো কি করে লাইফে এত সাকসেসফুল হয়েছে, ভেবে পেলাম না। যদিও আমার চেহারাটা দারুণ ডিসেপটিভ, আপনাদের তো আগেই জানিয়ে দিয়েছি, আমাকে দেখলে দেবদূত-টেবদূত মনে হয়, তবু আমার মুখ দেখে কেউ যদি লোক চিনতে না পারে তবে কিসের পলিটিসিয়ান, কিসের বিজনেসম্যান! এরা তো জানে না জেনুইন গোল্ড ভেবে কাকে এনে নিজেদের মধ্যে ঢুকিয়েছে! আমার গলার কাছে একটা হাসি টগবগিয়ে উথলে উঠতে চাইছে। অনেক কষ্টে ঠেলে-ঠুলে সেটাকে নিচের দিকে নামিয়ে রেখেছি, কিছুতেই বেরিয়ে আসতে দিচ্ছি না। মহাশয়গণ, এতগুলো ঝানু বিজনেসম্যান আর পলিটিসিয়ানের মাথায় চক্কর লাগিয়ে দিতে পেরেছি, ব্যাপারটা খুব সিম্পল নয়। নিজের সম্বন্ধে, মহাশয়রা, শ্রদ্ধাটা চিরকালই আছে, সেটা এখন দশগুণ বেড়ে গেল। সেই সঙ্গে আত্মবিশ্বাসটা। সামতানিদের হাতে আমাকে সঁপে দিয়ে সমাজপতি এখন

চুপচাপ হাতের গেলাসটায় মনোনিবেশ করেছিলেন। সেটা ফাঁকা হয়ে গেলে বেয়ারাকে ডেকে আবার ভর্তি করে নিলেন। তারপর হঠাৎ কি খেয়াল হতে রক্তিম চোখে কিন্তু স্পষ্ট জড়তাহীন উচ্চারণে বললেন, 'স্বয়ম্ভুকে আপনি আপনি করে বলছেন কেন?'

তৎক্ষণাৎ সবাই কোরাসে বলে উঠলেন, 'তা তো বটেই, ও আমাদের চেয়ে অনেক ছোট—'

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনারা সবাই আমার শ্রদ্ধেয়, আমাকে তুমি করেই বলবেন।'

'দ্যাটস গুড—'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। এর মধ্যে সবার গেলাস শূন্য হয়ে নতুন করে আবার ভর্তি হল।

খেতে খেতে সামতানি এবার বললেন, 'স্বয়ম্ভু আমাদের ফ্রেণ্ড সমাজপতি সাহেবের প্রাণ বাঁচিয়েছে। তার সম্বন্ধে আমাদের কিছু কর্তব্য আছে—'

এই কর্তব্যের কথা সমাজপতি স্বয়ং আমাকে বলেছিলেন। তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, 'আপনারা একটা সামান্য ব্যাপার নিয়ে খুব ব্যস্ত হচ্ছেন—'

আমাকে থামিয়ে দিয়ে সামতানি বললেন, 'প্লিজ, তুমি চুপ করে বসে থাকো। এ বিষয়ে আর একটি কথাও তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই না।'

অভ্যুদয় মিটার গলায় বত্রিশ আউন্স আবেগ ঢেলে বললেন, 'নিজের লাইফ রিস্ক করে স্বয়ম্ভু একজন এতবড় ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, আই মিন শিল্পপতির জীবন রক্ষা করেছে। ন্যাশনাল লেভেলে এটা একটা মস্তবড় ঘটনা, ইভেন্ট অফ দি ইয়ার।'

চট্টরাজ তবলায় বোল তোল্বার মতো বললেন, 'একজাক্টলি—'

হে-হে মহাশয়গণ বুঝতেই পারছেন, হুইস্কি এদের নার্ভে তার কাজ শুরু করে দিয়েছে। সামতানি বললেন, 'ইওরোপ আমেরিকা হলে এই নিয়ে এতদিন হই চই বেধে যেত। টি-ভি, নিউজ পেপার, রেডিও,সব মিলে স্বয়ম্ভুকে ছ ঘণ্টায় ফেমাস করে দিত। কিন্তু তার দুর্ভাগ্য এদেশে জন্মেছে—'

অভ্যুদয় মিটার বললেন, 'এদেশে জন্মেছে বলে এতবড় একটা ইভেন্ট পিপল জানতে পারবে না, তা হতে দেওয়া যায় না। এটা যদি অজানা থেকে যায়, আমাদের পক্ষে সেটা খুবই লজ্জার ব্যাপার হবে। এ হতে দেওয়া যায় না।'

চট্টরাজ বললেন, 'একজাক্টলি। একটা লোকের এই সাহস, স্যাক্রিফাইস, পরের জন্য আত্মদান, ওহো, এসব হোল ইণ্ডিয়ায় প্রচার হওয়া দরকার। ফিউচার জেনারেশনের কাছে এটা একটা মহৎ উদাহরণ। ওয়ান পারসেন্ট ইয়ং ম্যানও যদি এর থেকে প্রেরণা পায়, হোল কান্ট্রির চেহারাই পাল্টে যাবে। তাই বলছিলাম আমার একটা প্রস্তাব আছে।'

সামতানি বললেন, 'কি?'

'মিটার সাহেবের তো কর্পোরেশনে বেশ ইনফ্লুয়েন্স আছে। ওদের দিয়ে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে স্বয়ম্ভুর একটা নাগরিক সংবর্ধনা দিলে কেমন হয়? তারপর না হয় পি-টি-আইকে দিয়ে একটা অল-ইণ্ডিয়া নিউজ করিয়ে দেওয়া যাবে—'

'নট আ ব্যাড আইডিয়া। তবে আমার অন্য একটা প্রস্তাব আছে।'

'কি?'

'বলছিলাম দিল্লিকে ঘটনাটা জানিয়ে যদি একটা খেতাব টেতাবের ব্যবস্থা করা যেত —'

ওপাশ থেকে চট্টরাজ বলে উঠলেন, 'এই প্রস্তাবটা বেশ ভাল।'

এতক্ষণ চুপ করেই ছিলাম। এতগুলো ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, বিজনেসম্যান আর পলিটিসিয়ান মাতালের কথা শুনতে মন্দ লাগছিল না। কিন্তু মহাশয়গণ, আর পারা গেল না। এবার প্রায় চেঁচিয়েই বলে উঠলাম, 'খেতাব বা সংবর্ধনা কোনোটাই আমার চাই না। প্লিজ—'

চার জোড়া টকটকে লাল চোখ আমার ওপর স্থির হয়ে আটকে গেল। প্রথমটা সবার দৃষ্টি স্থির হয়ে রইল। কিছুক্ষণ পর বিস্ময়ের ভাবটা কেটে গিয়ে ওঁদের মুখে ফুটি-ফুটি করতে করতে অদ্ভুত ধরনের একটা হাসি থুতনির তলা থেকে ভুরু আর কপাল পর্যন্ত ফুটে উঠে ছড়িয়ে যেতে লাগল। সবার হয়ে সমাজপতিই বলে উঠলেন, 'দেখছেন মিস্টার মিটার, মিস্টার সামতানি, গ্রেটনেসের সব লক্ষণ রয়েছে আমাদের এই স্বয়ম্ভুর মধ্যে। কোনোরকম পাবলিসিটি চায় না, লোভ নেই, ভ্যানিটি নেই। চুপচাপ শুধু মহৎ কাজ করে যেতে চায়। ঠিক আছে, তুমি যখন চাও না তখন নাগরিক সংবর্ধনা বা খেতাবের দরকার নেই। তোমাকে আমরা বিব্রত করব না।'

সামতানি বললেন, 'তুমি কোন ওয়ার্ল্ডের লোক হে, অ্যাঁ?' সিন্ধি হয়েও বাংলা ভাষাটা ভালই বলতে পারেন ভদ্রলোক।

আমি নিঃশব্দে দাঁত বার করে হাসলাম।

চট্টরাজ বললেন, 'স্বয়ম্ভু সব ওল্ড ভ্যালুজের একটা গো-ডাউন।'

আমি দ্বিতীয় বার দাঁত বাব করলাম।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তার মধ্যে আরো একবার হুইস্কির গেলাস খালি হয়ে পূণ হল।

একসময় অভ্যুদয় মিটার বললেন, 'পাবলিসিটি চাও না, খেতাব চাও না, রিসেপসান চাও না—তুমি তো সাধু-মহাত্মা লোক হে। সে যাই হোক, তুমি কিছু চাও আর না চাও, আমরা তোমাকে চাই—'

কাচের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আমাকে ঘিরে ওঁদের যাবতীয় পরিকল্পনার কথা আগেই শুনেছিলাম, তবু ওয়ার্ল্ডের সব সরলতা মুখে মাখিয়ে বললাম, 'আজ্ঞে—'

'সমাজপতি সাহেবের কাছে শুনেছি তুমি একটা ম্যান অফ আইডিয়াস। তোমার মতো একটা ব্রাইট শার্প ইয়াং ম্যান আমাদের খুবই দরকার। ইউ সি, আজ আমরা মোটে চারজন এখানে এসেছি। ইউ হ্যাভ গট আদার ফ্রেণ্ডস। বিশেষ কাজে তাঁরা আটকে গেছেন, তাই আসতে পারেন নি। কিন্তু তাঁরাও তোমার সম্বন্ধে খুবই ইন্টারেস্টেড।'

'কিন্তু—'

'কিন্তু কী?'

'আপনাদের কী দবকারে আমি লাগতে পারি?'

'সেটা আস্তে আস্তে জানতে পারবে।'

একটু ভেবে বললাম, 'আপনারা কি আমাকে কোনো গোপনীয় কাছে লাগাতে চান? আই মিন এনিথিং কনফিডেনসিয়াল।' আমার সিক্সথ সেন্স কেন যেন বলে দিচ্ছিল এঁরা আমাকে সোজা সরলভাবে ব্যবহার করতে চান না।

লক্ষ করলাম, ওঁদের চার জনের চোখ পরস্পরের সঙ্গে এক সেকেণ্ডের জন্য মিলল। সাংকেতিক কোনো ভাষা চোখে চোখে কিছুক্ষণ খেলে গেল। পরে তাঁরা আমার দিকে ফিরলেন। চট্টরাজ বললেন, 'কনফিডেনসিয়াল? তা খানিকটা বলতে পার।'

'এই তো মুশকিল হল—'

'মুশকিল কেন?'

'মিনিস্টার কি এম-পি টেম-পি'র ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট দেখাতে পারব না।'

'ওসব দিয়ে কী হবে?'

'সার্টিফিকেট না হলে আমাকে বিশ্বাস করবেন কি করে? আফটার অল কনফিডেনসিয়াল কাজ—' চারজনের মুখের ওপর দিয়ে সিনেমায় ক্যামেরা প্যান করে যাবার মতো চোখ দুটো ঘুরিয়ে নিয়ে গেলাম।

সামতানি বললেন, 'ও সবের কিচ্ছু দরকার নেই। তুমিই তোমার সার্টিফিকেট।'

'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ ফর ইওর কমপ্লিমেন্ট।' বলে একটু থামলাম। পর মুহূর্তে আবার শুরু করলাম, 'কবে থেকে স্যার আপনারা আমাকে কাজ দিচ্ছেন?'

সমাজপতি বললেন, 'ভেরি সুন। তবে একজাক্টলি কবে থেকে দেব তার ডেট পরে ঠিক হবে। কিন্তু কাজ টাজ শুরু করার আগে তোমার সঙ্গে দু-একটা কথা আছে আমার—'

'কী কথা?'

'এত তাড়াহুড়ো কিসের। পরে শুনো—'

রাত সাড়ে ন'টার মধ্যে চট্টরাজ, সামতানি, সমাজপতি এবং মিটার, সবার চোখ মহাশয়গণ, ট্রাফিক সিগনালের রেড লাইটের মতো রক্তবর্ণ হয়ে গেল। সবাই দারুণ টিপসি। আমার মাথার ভেতরেও এলোপাথাড়ি ম্যাণ্ডোলিন বেজে যাচ্ছে। হঠাৎ কেন যেন, হয়তো অকারণেই সুমনার কথা মনে পড়ে গেল। আসার সময় মেয়েটা বলেছিল, লাস্ট ট্রেন বা লাস্ট বাসে সে বাড়ি ফিরবে। এখন উঠতে পারলে শিয়ালদা গিয়ে বোধ হয় ওকে ধরতে পারব। তা হলে একসঙ্গে ফেরা যাবে।

সমাজপতিকে বললাম, 'স্যার আপনাদের পারমিসান পেলে আজ উঠতে পারি।'

ওধার থেকে জড়ানো গলায় সামতানি বলে উঠলেন, 'এখনই যাবে কিরকম! ইমপসিবল।'

চট্টরাজ বললেন, 'আজ এমন একটা অকেসান। ফার্স্ট টাইম আমরা মিট করছি। তেমন ড্রিঙ্কই তো করলে না—'

'স্যার আমার অলরেডি আট পেগ হয়ে গেছে। তা ছাড়া হুইস্কিটা আমার তেমন —'

'নাথিং নাথিং। বেয়ারা—'

বললাম, 'স্যার আজ আর নয়। আরেক দিন না হয় ড্রিঙ্কের একটা কম্পিটিসান দেওয়া যাবে।' কেন, কে জানে আমার আর এঁদের সঙ্গ ভাল লাগছিল না।

মহাশয়গণ, আপনারা তো জানেনই যখন যে স্রোত সামনে এসে হাজির হয় আমি তাতেই গা ভাসিয়ে দিই। কিন্তু সুমনার কথা যে বার বার মনে পড়ছে! নিজের ওপর ক্রমশ কনট্রোল হারিয়ে ফেলছি নাকি?

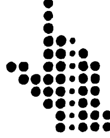
সমাজপতি বললেন, 'কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার যে দরকার আছে। ভেবেছিলাম এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে বলব। ঠিক আছে, চল আমিও উঠছি।' বলতে বলতে সত্যি উঠে পড়লেন। তারপর সঙ্গীদের দিকে ফিরে বললেন, 'এক্সকিউজ মি, আপনাদের অনুমতি নিয়ে আমি আজ বিদায় নিচ্ছি। গুড নাইট—'

সামতানিরা সমস্বরে বললেন, 'গুড নাইট। কিন্তু আমাদের কথাটা মনে রাখবেন সমাজপতি সাহেব।'

'কোন কথাটা?'

'স্বয়ম্ভুকে আমাদের কাছে মাঝে মাঝে ডেপুটেশনে পাঠাবেন বলেছেন। ইউ আর প্রমিজ-বাউণ্ড—'

'নিশ্চয়ই। প্রমিজ যখন করেছি তখন তার খেলাপ করছি না।'



বাইরে বেরিয়ে অটোমেটিক লিফটে ঝাঁ ঝাঁ করে আমরা নিচে নেমে এলাম। পার্কিং বে'তে সমাজপতির নতুন মডেলের স্ট্রিমলাইনড ইতালিয়ান গাড়িটা দাঁড়িয়ে ছিল। আমাকে নিয়ে তিনি সেটাতে উঠলেন।

বললাম, 'স্যার, সাড়ে দশটায় আমাকে শিয়ালদা স্টেশনে পৌঁছুতে হবে।'

সমাজপতি বললেন, 'ডোন্ট ওরি। সাড়ে দশটার আগেই তোমাকে পৌঁছে দেব।'

গাড়িটা তখনও স্টার্ট দেয় নি, ঝকঝকে সাদা উর্দি আর কালো টুপি-পরা ড্রাইভার সমাজপতির নির্দেশের জন্য কান খাড়া করে বসে ছিল। সমাজপতি বললেন, 'গড়িয়াহাট চল—'

জিজ্ঞেস করলাম, 'গড়িয়াহাটে কোথায় স্যার?'

'একটা অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে। গেলেই দেখতে পাবে।'

'কিন্তু স্যার, আমরা তো এইমাত্র একটা অ্যাপার্টমেন্ট হাউস থেকে এলাম।'

'ওখানে যে স্যুইটে গিয়েছিলে সেটা সামতানি সাহেবের। আর এখন যেখানে যাচ্ছি সেখানে আমার নিজের ফ্ল্যাট আছে।'

আপাতত আর কিছু জিজ্ঞেস করলাম না। এদিকে গাড়িটা থিয়েটার রোড থেকে বেরিয়ে সার্কুলার রোডে চলে এসেছিল। সেখান থেকে তেলের মতো নিঃশব্দে গড়িয়ে

গুরুসদয় রোডে। ম্যাক্সমুলার ভবন ডাইনে ফেলে গাড়িটা গড়িয়ে যাচ্ছে, গড়িয়েই যাচ্ছে।

হঠাৎ বললাম, 'স্যার, আমার সঙ্গে কী দরকারি কথা যেন বলবেন—'

'গড়িয়াহাটে গিয়েই বলব। ততক্ষণ ধৈর্য ধরে থাকো।'

মিস্টার সমাজপতি শেষ পর্যন্ত গড়িয়াহাটা রোডে যেখানে এনে আমাকে তুললেন সেটা আরেকটা অ্যাপার্টমেন্ট হাউস।

মহাশয়গণ, আপনারা যাঁরা ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন সিটির নাগরিক, যাঁরা দিনরাত এই শহরের রাস্তায় রাস্তায় পোকার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছেন তাঁদের চোখে নিশ্চয়ই পড়েছে, সাউথ অফ পার্ক স্ট্রিট মানে পার্ক স্ট্রিটের দক্ষিণে গণ্ডা গণ্ডা স্কাইস্ক্রেপার মাথা তুলছে। আপনারা তো জানেনই, ইণ্ডিপেনডেন্সের আগে সেই ব্রিটিশ আমলে এই জায়গাটা ছিল সাহেবপাড়া। বিরাট কমপাউণ্ডের মাঝখানে দারুণ দারুণ বাংলো বানিয়ে সাহেবরা থাকত। সেই সব বাড়ি ভেঙে এখন ঢ্যাঙা ঢ্যাঙা স্কাইস্ক্রেপার বানানো হচ্ছে।

স্বাধীনতার পর হুড়হুড় করে লোক বেড়ে গেছে এই শহরে। আগেও একবার বলেছি, এখনও বলছি পপুলেশন এক্সপ্লোসন কাকে বলে, সেটা প্রতি মুহূর্তে আপনারা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। এখানে রাস্তায় একটা পা ফেললে তিন জনের সঙ্গে ধাক্কা লেগে যায়। জুডো-যুযুৎসু না জানলে, ঝাড়া তিনটি বছর ফিজিক্যাল ট্রেনিং না নিলে এখানে ট্রামে-বাসে ওঠা যায় না। ইস্ট বেঙ্গলের রিফিউজিরা তো রয়েছেই, আমাদের জাতীয় সঙ্গীতে পাঞ্জাব-সিন্ধু-গুজরাট-মারাঠা ইত্যাদি ইত্যাদি যত প্রভিন্সের নাম আছে সব জায়গা থেকে মানুষের ঢল নেমেছে এই শহরের দিকে। কে যেন লিখেছিল, কলকাতা শহরে ঢুকবার হাজারটা দরজা রয়েছে কিন্তু বেরুবার জন্য একটাও নেই। অতএব মহাশয়গণ, একবার যে এখানে এসে ঢুকেছে, গুড়ের গায়ে মাছির মতো সে আটকে গেছে। তার আর বেরুবার উপায় নেই। অথচ দেখুন এই শহরের আয়তন, তিরিশ বছর আগে যে ফরটি স্কোয়ার মাইল ছিল এখনও তা-ই আছে। কিন্তু তিরিশ বছর আগে এই শহরে ছিল চোদ্দ লক্ষ মানুষ। সেই পপুলেশন এখন আশি লক্ষে দাঁড়িয়েছে। চল্লিশ বর্গ মাইল একটা খোলের ভেতর এইট মিলিয়ন মানুষকে ধরাতে হলে কী অবস্থাখানা দাঁড়ায় একবার ভেবে দেখুন। নিচে তো আর জায়গা নেই, সুতরাং বাড়ো ওপর দিকে। হাত-পা ছড়িয়ে যে সব বেঁটেখাটো বাড়ি এতদিন অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছিল, সেগুলো মাটিতে মিশিয়ে ঢাউস ঢাউস পাইল মেশিন এনে এখন শুধু স্কাইস্ক্রেপার তোলা হচ্ছে। হে-হে মহাশয়গণ, এখন স্কাই ইজ দি লিমিট।

পার্ক স্ট্রিট, ক্যামাক স্ট্রিট, সার্কুলার রোড, হ্যারিংটন স্ট্রিট, রাসেল স্ট্রিট, ব্রিটিশ আমলের এইসব সাহেবপাড়াই নয়, কলকাতার নতুন নতুন স্কাইস্ক্রেপার কমপ্লেক্স এখন গড়িয়াহাটা, বালিগঞ্জ, সার্দান অ্যাভেনিউ, যোধপুর পার্কের দিকেও ছড়িয়ে যাচ্ছে।

গড়িয়াহাটার যে অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে সমাজপতি আমাকে নিয়ে এলেন তার নাম ম্যাগনিফিসেন্ট। গাড়ি থেকে নেমে ঘাড় তুলে গুনে গুনে দেখলাম বাড়িটা ষোল তলা। সমাজপতি আমাকে নিয়ে সোজা লিফট বক্সে ঢুকে টুয়েলফথ ফ্লোরের বোতাম টিপে দিলেন। লিফটটা কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে হাউইয়ের মতো ওপরে উঠে এল।

সমাজপতি ডান দিকের প্রথম স্যুইটটায় কলিং বেল টিপতেই একটা নেপালি ছোকরা, বাইশ তেইশের মতো বয়েস, দরজা খুলে লম্বা সেলাম হাঁকল। তার পাশ দিয়ে সমাজপতি আমাকে নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন। ঢুকতে ঢুকতে বললেন, 'আগে তোমাকে স্যুইটটা দেখিয়ে নিই। কাম অন—' তাঁর কণ্ঠস্বর জড়ানো। পাকস্থলীতে জমা-করা আট দশ পেগ হুইস্কি তাঁকে রীতিমত টিপসি করে তুলেছে।

ছুঁচের পেছনে সুতোর মতো সমাজপতির পেছন পেছন ঘুরতে লাগলাম। টুয়েলথ ফ্লোর অর্থাৎ তের তলার এই স্যুইটটায় তিনটে বেডরুম, একটা প্রকাণ্ড হল, ডাইনিং স্পেস, কিচেন, দুটো বাথ, ইত্যাদি ইত্যাদি। মেঝেতে দামী ইটালিয়ান টাইলস, তার ওপর ছ'ইঞ্চি পুরু পার্সিয়ান কার্পেট। দেয়াল এবং সিলিং ডিসটেম্পার করা। প্রতিটি ঘর, হল, ডাইনিং স্পেস, সব দুর্দান্ত সাজানো। দরজায় জানলায় দামী দামী পর্দা।

সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবার পর সমাজপতি আমাকে হল-এ নিয়ে এলেন। বললেন, 'এই স্যুইটটার কার্পেট এরিয়া ফিফটিন হানড্রেড স্কোয়ার ফিট। নট ব্যাড, কি বল?'

বললাম, 'ইয়েস স্যার—'

'সাউথ অ্যাণ্ড ইস্ট ওপেন। ওই দু'দিকে কোনোদিনই বাড়িটাড়ি হবার সম্ভাবনা নেই। সাউথ ইস্ট ওপেন, এমন বাড়ি গড়িয়াহাটায় তুমি খুব বেশি পাবে না।'

'ও—'

'এখন বল স্যুইটটা কেমন লাগল? আই মিন তোমার পছন্দ কিনা?'

'মানে—'

'মানে এখন থেকে তুমি এই স্যুইটে থাকবে। আমার তরফ থেকে এটা তোমাকে উপহার। অ্যান আম্বল টোকেন অফ গ্র্যাটিচুড।'

আমি পিটার স্বয়ম্ভু হোড়, যে কোনো কারণেই এবং কোনো অবস্থাতেই চঞ্চল হয় না, সে পর্যন্ত হকচকিয়ে গেল। মেরুদণ্ড টান করে বললাম, 'কিন্তু স্যার—'

'কোনো কিন্তু নয়—' ডান হাতের একটা আঙুল তুলে আমাকে থামিয়ে দিলেন সমাজপতি, 'এখন থেকে তুমি এখানেই থাকবে।'

'তা হয় না—'

'আলবত হয়।'

আমার পাকস্থলীতেও কয়েক পেগ হুইস্কি জমা রয়েছে। তার উত্তাপ মাথার ভেতর ছড়িয়ে যাচ্ছিল। গলা চড়িয়ে বললাম, 'না, হয় না—'

সমাজপতি গলার স্বর আরেক পর্দা চড়ালেন, 'কেন হয় না? তুমি কি মনে কর এটা একটা বাজে স্যুইট? লোকালিটিটা খারাপ?'

'আমি একবারও তা বলি নি—'

'তা হলে?'

'আপনাকে প্রথম দিনই বলেছিলাম আমি একজন ওয়ার্ল্ড সিটিজেন। কোনো এক জায়গায় আটকে থাকতে চাই না।'

'ইয়েস ইয়েস মনে পড়ছে বটে।'

'তবে এটা দিয়ে আমাকে আটকাতে চাইছেন কেন?'

'মনে মনে ঠিক করেই রেখেছিলাম, এই স্যুইটটা তোমাকে দেব। তুমি যদি এখানে না থাকো আমার খুব খারাপ লাগবে।'

'এই তো স্যার ঝামেলা বাধিয়ে দিলেন। কেউ মন খারাপ করলে আমার মনটাও টেরিফিক খারাপ হয়ে যায়। ঠিক আছে, আপনার যখন এত ইচ্ছে তখন থাকতেই হবে। তবে আমাকে তো একটু আধটু জেনেই ফেলেছেন, রেগুলার থাকাটা হবে না। বেঙ্গল-টেঙ্গল খেয়ে যদি লটকে যাই সোজা এখানে চলে আসব।'

'তা হবে না। রোজ তোমাকে এখানে আসতে হবে। মিনিমাম দু'টি ঘন্টা স্যুইটে থেকে যাবে। বাকি বাইশ ঘন্টা তুমি ওয়ার্ল্ড সিটিজেন, ফ্রি বার্ড।'

এই ব্যাপারটা নিয়ে আর দড়ি টানাটানি করতে চাইলাম না। আমি যত না-না করব, সমাজপতির রোখ ততই বেড়ে যাবে। কেননা তাঁর পাকস্থলীতে যে কয়েক পেগ হুইস্কি রয়েছে সেটা চুপচাপ ঘুমিয়ে থাকবে, তা তো আর হয় না। ওই হুইস্কিটা সমাজপতির মেজাজও নির্ঘাত চড়িয়ে দেবে। বললাম, 'আচ্ছা স্যার, আপনার হুকুমই তামিল করব। আজ তা হলে উঠি।'

সমাজপতির বড় বড় রক্তাভ ঘোলাটে চোখ অনেকক্ষণ স্থির হয়ে রইল। তারপর তিনি বললেন, 'এখনই যাবে কি? নাইট ইজ টু ইয়াং।'

আমার মাথায় সুমনার চিন্তাটা চরকির মতো ঘুরছিল। লাস্ট ট্রেনে সে বেশির ভাগ দিন বাড়ি ফিরে থাকে। সাড়ে দশটায় শিয়ালদা পৌঁছুতে পারলে হয়তো ওর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। সুমনাকে অবশ্য জোর দিয়ে কিছু বলি নি। তবে মনে মনে ভেবে রেখেছিলাম, লাস্ট ট্রেনে ওর সঙ্গে আগরপাড়া ফিরে যাব। আসলে একটা খবরের জন্য ভেতরে ভেতরে আমি খানিকটা অস্থির হয়ে আছি। আসার সময় সুমনা বলেছিল সে পার্ক স্ট্রিট আর থিয়েটার রোডের সেই অ্যাপার্টমেন্ট হাউসগুলোতে যাচ্ছে। ওই বাড়িগুলোতে গিয়ে সে কী করল, আদৌ সেখানে ভেতরে ঢুকতে পারল কি-না, সেটাই আমার জানার ইচ্ছা।

হে-হে মহাশয়গণ, আপনারা নিশ্চয়ই ভাবছেন হাজার ঘাটের জল-খাওয়া পিটার স্বয়ম্ভু হোড়ের বারটা বেজে যাচ্ছে। এখন কার্ডিওগ্রাফ করালে হয়তো দেখা যাবে তার হার্টটা ক্রমশ উইক হয়ে পড়ছে।

সমাজপতি আবার বললেন, 'আরেক রাউণ্ড হুইস্কি হয়ে যাক, কি বল—'

বললাম, 'এখানে হুইস্কি কোথায়?'

অতিরিক্ত নেশার ফলে সমাজপতির চোখই শুধু না, মুখও লাল টকটকে। শরীরের সব রক্তচাপ সেখানে গিয়ে জমা হয়েছে যেন। আরক্ত মুখে চোখ কুঁচকে কিছুক্ষণ হাসলেন তিনি। তারপর বললেন, 'তুমি ড্রিঙ্ক লাইক কর, তাই তোমার জন্য এই ফ্ল্যাটে একটা বার সাজিয়ে রেখেছি।' নিজেই উঠে গিয়ে দেয়াল-ঘেঁষা একটা আলমারি পাল্লা সরিয়ে দিলেন সমাজপতি। সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়ল নানা চেহারার ছোট-বড়-মাঝারি, বেঁটে-মোটা-লম্বা

হুইস্কি টুইস্কির অগুনতি বোতল চমৎকার করে ভেতরে সাজানো রয়েছে।

আমি প্রায় চেঁচিয়ে উঠলুম, 'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার, থ্যাঙ্ক ইউ।' একটু থেমে আবার বললাম, 'ওগুলো দেখে একটা কথা মনে পড়ছে—'

'কী?' সমাজপতি ফিরে এসে আমার মুখোমুখি বসলেন।

'যিস সিটিমে হুইস্কি বহতী হায়, তার নাম বোধ হয় ক্যালকাটা।'

'ফাইন বলেছ।' সমাজপতি হাসলেন, 'সেই হুইস্কির স্রোত তোমার ফ্ল্যাট পর্যন্ত টেনে এনেছি। তোমার সম্বন্ধে আমি কত চিন্তা করি, ভেবে দেখ।'

'তাতে কোনো সন্দেহ নেই।'

'তা হলে ড্রিঙ্ক দিতে বলি?'

'কিন্তু একজনের সঙ্গে আমার দেখা করতে হবে যে—'

'ভেরি আর্জেন্ট?'

'খানিকটা—'

'কিন্তু তোমার সঙ্গে আমারও কিছু দরকারি কথা আছে যে।' সমাজপতিকে বেশ চিন্তিত দেখাল। একটু ভেবে তিনি আবার বললেন, 'ক'টায় দেখা করার কথা?'

'সাড়ে দশটা।'

কবজি উল্টে রিস্ট ওয়াচটা দ্রুত এক পলক দেখে নিয়ে সমাজপতি বললেন, 'এখন পৌনে দশটা। তার মানে হাতে পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় রয়েছে। পঁয়তাল্লিশ মিনিটে দশটা ওয়ার্ল্ড ওয়ারের ডিসিসান নেওয়া যায়। বাহাদুর—'

সেই নেপালি ছোকরাটা কোত্থেকে ছুটে এল। সমাজপতি বললেন, 'হুইস্কি আউর সোডা—'

দু মিনিটের মধ্যে স্কোয়ার-বটম সুদৃশ্য গেলাসে হুইস্কি এসে গেল। আলতো করে চুমুক দিয়ে সমাজপতি বললেন, 'তা হলে আসল কথাটা সেরে নিই।'

আমি সোজা তাঁর চোখের দিকে তাকালাম।

সমাজপতি বলতে লাগলেন, 'তোমাকে আমার একটা কাজ করে দিতে হবে।'

'কী?'

'এই অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের ফিফটিনথ ফ্লোরে একটা মেয়ে থাকে, নাম ডোরা। শি ইজ আ মডেল গার্ল। তার ওপর তোমার নজর রাখতে হবে।'

আমি পিটার স্বয়ম্ভু হোড়, একজন থার্ড ক্লাস চিট, লোক ঠকানো আমার প্রফেসান বা জীবিকা যা-ই বলুন এবং এ ব্যাপারে আমি হানড্রেড পারসেন্ট অনেস্ট। অত্যন্ত সততার সঙ্গে বার তের বছর বয়েস থেকে সেই প্রফেসানটা চালিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু কোনোদিন আমাকে গোয়েন্দাগিরি করতে হবে, ভাবি নি। দামী হুইস্কির নেশাটা হঠাৎ যেন ফিকে হয়ে গেল। বললাম, 'এই জন্যেই কি আমাকে থাকতে বলছেন?'

'আরে না-না, এটা একটা বাই-প্রোডাক্টের ব্যাপার। তুমি এখানে থাকবে আর সেই সঙ্গে মেয়েটার ওপর লক্ষ রাখবে।'

'কিন্তু স্যার—'

'আবার কী হল?'

'এ ভারটা আপনি কোনো প্রাইভেট ডিটেকটিভকে দিলে পারতেন।'

'এটা ভাড়া করা ডিটেকটিভের কাজ নয়। আমি চাই আমার নিজের একজন ট্রাস্টেড লোক ডোরা কোথায় যায়, কী করে, কার সঙ্গে মেশে, এই সব খবর যোগাড় করে আমাকে জানাবে।'

'এক্সকিউজ মি, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

'করবে বৈকি—'

'এই মেয়েটা সম্বন্ধে আপনার কী ধরনের ইন্টারেস্ট? ব্যাপারটা জানতে পারলে আমার কাজে একটু সুবিধা হয়।'

বাঁ পায়ের ওপর ডান পা'টা তুলে কিছুক্ষণ নাচিয়ে নিলেন সমাজপতি। চোখের পাতা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে কিছুক্ষণ হাসলেন। তারপর বললেন, 'শি ইজ মাই গার্ল ফ্রেণ্ড, এ বাড়ির ওই ফ্ল্যাটটা আমি ওকে উপহার দিয়েছি। ইউ আর সাফিসিয়েন্টলি ইনটেলিজেন্ট, বাকিটা বুঝে নাও।'

আমি হাসলাম, 'বুঝেছি স্যাব, খুব গভীর ব্যাপার। ঠিক আছে, নজর রাখব। আপনার যখন বান্ধবী তখন দেখতে শুনতে ডেফিনিটলি খারাপ হবে না। আর ইয়াং গার্লের ওপর নজর রাখতে ভালই লাগবে, চোখের ওপর তার এফেক্টও ভাল। কিন্তু—'

'কিন্তু কী?'

'আপনার গার্লফ্রেণ্ডকে কখনও দেখি নি। আলাপ-টালাপ না করিয়ে দিলে চিনব কি করে? লক্ষ্যই বা রাখব কিভাবে?'

'আলাপ-টালাপ করিয়ে দেব না। নিজে থেকে আলাপ করে তার ওপর নজর রাখতে হবে।'

'অল রাইট স্যার, তাই হবে। এতদিন যেভাবে প্ল্যান-ট্যান করছিলাম, এবার দেখছি তাতে চলবে না। প্ল্যানিং-এর ব্যাপারটাকে কমপ্লিটলি ঢেলে সাজাতে হবে। ঠিক আছে, একটা নতুন এক্সপিরিয়েন্স তো হোক—'

'তবে একটা কথা—'

'বলুন।'

সমাজপতি আরক্ত স্থির চোখে আমার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, 'ইউ আর আ হ্যাণ্ডসাম পার্সন, ডোরা ইজ আ হ্যাণ্ডসাম গার্ল। তোমাকে বিশ্বাস করেছি, আশা করি বিশ্বাসভঙ্গ করবে না।'

বললাম, 'স্যার, পঞ্চ'ম'-কারের মধ্যে একটি 'ম'-এরই আমি ভজনা করে থাকি। সেটা আমার এই হাতেই রয়েছে।' হুইস্কির গেলাসটা দেখাতে দেখাতে বলতে লাগলাম, 'বাকি 'ম'-গুলো বিশেষ করে মেয়েমানুষ আমার কাছে গ্রীক। ও ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝতে পারি না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—'

'থ্যাঙ্ক ইউ।'

'এবার তা হলে উঠি?'

'হ্যাঁ, আমিও উঠব।'

গেলাসের শেষ তলানিটুকু গলায় উপুড় করে দিয়ে দু'জনে বেরিয়ে পড়লাম।

নিচে নেমে হঠাৎ চোখে পড়ল পাশের লিফট বক্সটা আস্তে আস্তে ওপরে উঠে যাচ্ছে। সমাজপতি আমার কাঁধে আলতো টোকা দিতে ঘাড় ফিরিয়ে লিফটটার দিকে তাকালাম। গোল কাচ-বসানো দরজার ওপাশে অর্থাৎ লিফটের ভেতরে বিদ্যুৎচমকের মতো দারুণ সেক্সি চেহারার হট প্যান্ট-পরা একটি মেয়েকে দেখলাম। মেয়েটা অবশ্য আমাদের দেখতে পায় নি। ভাল করে তাকে দেখবার আগেই লিফটটা হাউইয়ের মতো ওপরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সমাজপতি বললেন, 'এই হল ডোরা। তোমাকে অবশ্য চিনিয়ে দেবার কথা ছিল না। তবু যখন দেখা হয়ে গেল, চিনিয়েই দিলাম। আচ্ছা গুড নাইট, কাল আবার দেখা হচ্ছে। সোজা এখানে এসে আমাকে ফোন করে দেবে।'

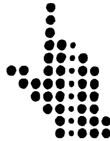
'দেব। আপনি কি—'

'আমি মানে—'

সমাজপতির মনোভাবটা বুঝতে পারছিলাম। হঠাৎ এক কাণ্ডই করে বসলাম, তাঁর একখানা হাত ধরে অন্য একটা লিফটের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করতে করতে বললাম, 'ফিফটিনথ ফ্লোরের বোতামটা টিপে দিন।' ফিফটিনথ ফ্লোরেই ডোরার স্যুইট।

সমাজপতি খিক খিক করে একটু হেসে বোতাম টিপতে টিপতে বললেন, 'তুমি একটি সাবলাইম হারামজাদা—'

ঝিঁঝির ডাকের মতো শব্দ করে সমাজপতির লিফট ওপরে উঠে গেল। আর আমি কিছুক্ষণ বাদে ম্যাগনিফিসেন্ট-এর কম্পাউণ্ড পেরিয়ে গড়িয়াহাট রোডে চলে এলাম। একটা ট্যাক্সি-ফ্যাক্সি ধরে আমাকে শিয়ালদা পৌঁছুতে হবে।



শিয়ালদায় এসে দেখলাম নর্থ স্টেশনের টিকিট কাউন্টারগুলোর কাছে সুমনা দাঁড়িয়ে আছে আর উদ্বিগ্নভাবে বার বার ঘড়ি দেখছে। আমি কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই সে বলল, 'আপনার জন্য এক ঘণ্টা ওয়েট করছি। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে শেষ পর্যন্ত আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম।'

সুমনা বলল, 'এই ট্রেনেই যাব, তোমাকে কিন্তু তেমন কোনো কথা দিই নি।'

বললাম, 'আমি একটা চান্স নিচ্ছিলাম। যদি এসে যান—'

আমি হাসলাম, 'যেখানে গিয়েছিলাম সেখান থেকে বেরুনোই মুশকিল। চারদিকে শুধু হুইস্কি আর হুইস্কি—'

সুমনা আমার সঙ্গে কথা বলছিল ঠিকই তবে তার চোখ ছিল ঘড়ির দিকে। এবার সে ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'চলুন চলুন, আর দাঁড়িয়ে থাকা যাবে না। দু মিনিটের মধ্যে লাস্ট ট্রেন ছেড়ে দেবে।'

'একটু দাঁড়াও, চট করে টিকিটটা কেটে আনি।'

'আমি টিকিট কেটেই রেখেছি।'

'ভেরি গুড। কাজ তা হলে এগিয়েই রেখেছ।'

এই লাস্ট ট্রেনেও দারুণ ভিড়। হে-হে মহাশয়গণ, হোল নাইট গাড়ি চালালেও এই শহরে প্যাসেঞ্জারের অভাব হবে না। মহাশয়রা এর নাম পপুলেশন এক্সপ্লোসন!

সে যাক গে, লোকের ভিড়ে ইঁদুরের মতো পথ কেটে কেটে সুমনা আমাকে নিয়ে একটা কর্ম্পাটমেণ্টে উঠল এবং কি আশ্চর্য, জানালার ধার ঘেঁষে দুটো সিট যোগাড় করেও ফেলল। বলল, 'বসুন—'

আমরা মুখোমুখি বসলাম। আর বসতে না বসতেই ট্রেনটা ছেড়ে দিল।

মহাশয়গণ, সাবার্বন লাইনের এই সব ট্রেনে আলো নেই, পাখা নেই। অনেক কম্পার্টমেন্টে সিট এবং স্টিলের পাটাতন পর্যন্ত উধাও। হে-হে মহাশয়গণ, আপনারা তো জানেনই ট্রেন হল ন্যাশনাল প্রপার্টি অর্থাৎ জনগণের সম্পত্তি। নিজস্ব প্রপার্টি মনে করে কারা যেন নিজের নিজের অংশ খুলে নিয়ে গেছে।

অন্ধকারে আমরা দু ফুট দূরে বসে আছি ঠিকই কিন্তু কেউ কারো মুখ দেখতে পাচ্ছি না। চারপাশে অগুনতি মানুষ সিল্যুয়েট ছবি হয়ে দাঁড়িয়ে বা বসে আছে। মনে হচ্ছে আলোহীন একটা চলন্ত সুড়ঙ্গ আমাদের টেনে নিয়ে চলেছে।

মহাশয়গণ-আমার পেটে এই মুহূর্তে দশ পেগ ফার্স্ট ক্লাস হুইস্কি মজুদ রয়েছে। কিন্তু আপনারা তো ইতিমধ্যেই টের পেয়ে গেছেন সেই হুইস্কি এখনও কোনে ব্রুয়ারিতে জন্মায় নি যা আমাকে বেহুঁশ করে ফেলতে পারে। সুতরাং আগরপাড়া থেকে আসার সময় সুমনার সঙ্গে যে কথা হচ্ছিল সেটাই আমার মনে পড়ে গেল। বললাম, 'আজ কলকাতায় এসে কোনো কাজ হল?'

' সুমনা বলল, 'না।'

আমি কী উত্তর দেব যখন ভাবছি সেই সময় সুমনা আবার বলে উঠল, 'পার্ক স্ট্রিট আর লাউডন স্ট্রিটের অ্যাপার্টমেণ্ট হাউস দুটোতে এখনও পুলিশ বসে আছে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। এখন বেশ কিছুদিন ওখানে পুলিশ থাকবে।' খুব চাপা গলায় সুমনা বলল।

আমিও গলা নামিয়ে দিলাম, 'তোমার মালিকদের, আই মিন যারা তোমাদের দিয়ে এই প্রফেসান চালাতো তাদের খোঁজ পেলে?'

'না। ওরা এখন আণ্ডারগ্রাউণ্ডে চলে গেছে।'

একটু চুপচাপ।

তারপর সুমনাই আবার শুরু করল, 'আমি যে এখন কী করব বুঝতে পারছি না। ভাবতে ভাবতে আমার মাথাটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে।'

ডান হাতটা তুলে বললাম, 'ভেবো না—'

'আপনি তো বলছেন ভাবব না, কিন্তু আমাদের চলবে কি করে? কত বড় ফ্যামিলি, কত লোককে খেতে দিতে হয়, আপনি তো সবই জানেন।'

আমার মনে পড়ে গেল সমাজপতির দেওয়া হাজার খানেক টাকার প্রায় সবটাই পড়ে আছে। বললাম, 'আমার কাছে কিছু টাকা আছে আপাতত ওটা দিয়ে কাজ চালিয়ে নাও—'

'কিন্তু—'

'কী?'

'আপনার টাকা কত নেব?'

'আমার টাকা! তোমার ধারণা আমি নোট ছাপাবার প্রেস খুলেছি!'

'না, মানে—'

'তোমাকে আগেই বলেছিলাম, টাকাটা হল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের, জনগণের সম্পত্তি। আমার কাছে এসেছিল, এবার তোমার কাছে যাবে। মানে জনগণের কাছেই থাকবে। এ নিয়ে ভেবো না!'

অন্ধকারে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না। তবু মনে হল, কৃতজ্ঞ চোখেই আমার দিকে তাকিয়ে আছে সুমনা। আবার আমার গ্ল্যাণ্ডগুলো অস্বস্তিতে কুঁকড়ে যেতে লাগল। দয়া-মায়া-মমতা-স্নেহ-কৃতজ্ঞতা—এই সব ব্যাপারগুলোর সঙ্গে আমার যোগাযোগ নেই বললেই হয়। তবু মেয়েটা কেন যে বার বার সেই চক্করে এনে আমাকে ফেলতে চায়!

আগড়পাড়ায় আমাদের সেই ব্যারাকবাড়িতে এসে দেখলাম প্রায় কোনো ঘরে আলো জ্বলছে না। সবাই ঘুমিয়ে টুমিয়ে পড়েছে।

সুমনা সোজা তাদের ঘরে চলে গেল। আর আমি এলাম আমাদের ঘরে। দেখলাম এক কোণে হেরিকেন জ্বলছে। মাঝখানে আমাদের জোড়া বিছানার অর্ধেকটা দখল করে চিত হয়ে শুয়ে আছে বোদা।

জুতো খুলতে খুলতে বললাম, 'কি রে, টাইফয়েড হয়েছিল?'

বোদা আস্তে আস্তে উঠে বসল। হাত বাড়িয়ে হেরিকেনটা টেনে নিয়ে সলতেটা উসকে দিল। তারপর চোখ টিপে হাসতে হাসতে বলল, 'হয়েছিল গুরু, সেরেও গেছে।'

'ছ ঘণ্টার ভেতর টাইফয়েড হয়ে সেরেও গেল!'

'ইয়েস গুরু—'

'ভেরি গুড। তারপর?'

'তারপর কী জানতে চাইছ বল—'

'টাইফয়েডের ভেতর কী করলি বল—'

'ডিজিজ হলে কিছু করা যায় নাকি!'

ট্রাউজার্স শার্ট-ফার্ট ছেড়ে পাজামা আর গেঞ্জি পরে নিলাম। বেশ ফ্রি হয়ে হাত-পা ছড়িয়ে বোদার পাশে বসতে বসতে বললাম, 'যা বলছি তার উত্তর দে—'

বোদা আমার কথা শুনতে পেল কি পেল না, মুখের কাছাকাছি নাকটা এনে হাওয়ায় গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে বলল, 'গুরু—'

'কী বলছিস?'

'বিলিতি মাল টেনেছ মনে হচ্ছে?'

'ইয়েস। তুই গেলে তুইও টানতে পারতিস। এখন বল তো চাঁদ ছ ঘণ্টা কী ডিউটি দিলে?'

'তোমার কথামতো—' চোখ টিপে হাসতে হাসতে বোদা বলতে লাগল, 'রিফিলিং স্টেশনগুলো মানে বাংলা মালের দোকানগুলো দেখে এসেছি। উরে গুরু!' শেষ কথা দুটো বলার সময় বেশ চেঁচিয়েই উঠল সে।

বললাম, 'কি হল রে?'

'এখানে ক'টা বাংলা মালের দোকান আছে জানো?'

'ক'টা?'

'সাতাশটা।'

'বলিস কি!'

'ঠিকই বলছি গুরু। দশ পা ফেললে এখানে একটা করে মালের দোকান। যেরকম দেখছি ক'বছর বাদে হোল কানট্রিতে মালের দোকান ছাড়া আর কোনো দোকানই থাকবে না।'

'ঠিক আছে, শালা কালীমার্কা খেয়েই লাইফ কাটিয়ে দেব।'

'যা বলেছ দাদা।'

একটু ভেবে বললাম, 'সাতাশটা রিফিলিং স্টেশন তো খুঁজে বার করেছিস। আর কী করলি?'

বোদা তার হারমোনিয়ামের রিড বার করে হাসল। তারপর মুখ নিচু করে ঘাড় চুলকোতে লাগল।

তাড়া দিয়ে বললাম, 'কি হল রে, মুখে তালা আঁটলি যে?'

'আর যা করেছি তোমাকে বলতে লজ্জা করছে।'

'কেন?'

'তুমি আমার গুরুজন—'

'গুরুজন!'

'হ্যাঁ—'বোদা ঘাড় হেলিয়ে দিল।

বললাম, 'কাছে বসে মাল খাবার সময় গুরুজন মনে হয় না?'

'তুমি মাইরি কী যে বল তার ঠিকঠিকানা নেই। মাল খাওয়া আর এই ব্যাপারটা কী এক হল?'

'ব্যাপারটা কী, সেটা না জেনে বলি কী করে?'

লাজুক কিশোরীর মতো ব্রীড়াময় একটু হেসে বোদা বলল, 'ঠিক আছে, তোমার যখন এতই জানবার ইচ্ছে তখন বলি। কিন্তু তার আগে পেছন ফিরে বোসো। সামনাসামনি বসে বলতে পারব না।'

বোদার কথামতো ঘুরে বসতে হল। বললাম, 'হয়েছে তো। মাকড়া এবার বলে ফেল—'

বোদা বলল, 'আমি কনকচাঁপার দেখা পেয়েছি, তার সঙ্গে কথাও বলেছি।'

আমি অবাক। নিজের অজান্তেই ঘুরে বসে বললাম, 'কনকচাঁপা—সে আবার কে?'

'আতরের দিদি—'

'আতরই বা কে?'

'তোমার গুরু মেমোরিটা টেরিফিক খারাপ। সকালবেলা বেড়াতে বেরিয়ে সেই মেয়েটার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল না। ভুলে গেছ?' বোদা দারুণ আগ্রহ নিয়ে আমার দিকে তাকাল।

মনে পড়ে গেল। চোখ কুঁচকে বললাম, 'কনকচাঁপাকে দেখতে কেমন?'

'আতরকে দেখেছ তো? দশ বছর পর সে যা হয়ে দাঁড়াবে কনকচাঁপা হল তা-ই।'

'তবে তো শালা কামাল করে দিয়েছিস—'

ঘোড়ার ডাকের মতো শব্দ করে টেনে টেনে খুব একচোট হাসল বোদা। তারপর বলল, 'তবু তো তোমাকে একটা কথা বলি নি। সেটা বললে তোমার চোখ ব্রহ্মতালুতে উঠে যাবে।'

'কী কথা?'

'কনকচাঁপা কে জানো?'

'তুই-ই তো বললি আতরের দিদি।'

'সেটা ঠিক আছে। কার মেয়ে জানো কি?'

'কী করে জানব?'

'হে-হে গুরু, কনক হল নকুলেশ্বর দেবশর্মার মেয়ে।'

'নকুলেশ্বর দেবশর্মাকে আবার কোত্থেকে জোটালি?'

'আমি জোটাই নি গুরু, সকালবেলা তুমিই জুটিয়েছিলে। কনককে ধরে সুতো টানতে টানতে আবার তার কাছে গিয়ে পড়লাম। বুঝলে দাদা, আমরা নকুলেশ্বরের ক্যাঁচাকলে বোধ হয় ঢুকেই গেলাম। ওখান থেকে আর বেরুতে পারব না। হে-হে—'

একটু ভাবতেই মনে পড়ল। নকুলেশ্বর দেবশর্মা অথাৎ সেই কবিরাজ-কাম-স্কুল মাস্টার-কাম-ঘটক-কাম-বুক বাইণ্ডার অর্থাৎ একের ভেতর চার। সঙ্গে সঙ্গে সকালবেলার সেই দৃশ্যটা চোখের ওপর ভেসে উঠল। কবিরাজ তখন নাপিত ডাকিয়ে তার এক ডজন ছেলের মাথা কামিয়ে দিচ্ছিল।

আমি প্রায় আঁতকেই উঠলাম, 'মাকড়া করেছিস কি রে, শেষ পর্যন্ত ওখানে গিয়ে

ফাঁসলি! কবরেজের যদি কিছু হয়ে যায় তার গোটা রেজিমেণ্টটা তোর কাঁধে ঝুলে যাবে যে।'

'গুরু তুমি অন্য দিকটা দেখছ না।'

'কোন দিক?'

'আমার কেমন জনবল বেড়ে যাবে বল—'

'অ্যাঁ!'

'ধর আমি ইলেকশানে নামলাম, কখন কতগুলো সলিড ভোট হাতে রইল ভেবে দেখ।'

আমি যে আমি, পিটার স্বয়ম্ভু হোড়, হাজার ঘাটের জল খেতে খেতে যে আগরপাড়ার এই ব্যারাক বাড়িতে এসে ঠেকেছে তার মাথায় পর্যন্ত চক্কর লাগিয়ে দিল বোদা। বললাম, 'যত তাড়াতাড়ি পারিস ওখানে ঝুলে যা। মনে হচ্ছে দেড় ডজন শালা-শালীর ভেতর থেকে ফায়দা ওঠাতে পারবি।'

'বলছ?'

'এক শো বার।'

'এবার বল কলকাতায় গিয়ে তুমি কী করলে—'

'এখন না, টেরিফিক খিদে পেয়েছে। চল, হোটেল থেকে খেয়ে আসি। তারপর বলব—'

'হোটেলে যেতে হবে না। রুটি আর কষা মাংস কিনে এনে রেখেছি। তুমি হাত মুখ ধুয়ে এস—'

একটা তোয়ালে কাঁধে চাপিয়ে আমি কুয়োতলার দিকে চলে গেলাম। মিনিট তিনেক বাদে ফিরে এসে খেতে বসলাম। খেতে খেতে সেই বিকেল থেকে রাত দশটা পর্যন্ত কী করেছি, কোথায় কার সঙ্গে ঘুরেছি, কার সঙ্গে কী কথা হয়েছে, বোদাকে সব বললাম। হাজার হোক বোদা আমার পার্টনার, দু'জনে মিলে আমরা যুগলবন্দি। ওকে সব বলতেই হবে।

হে-হে মহাশয়গণ, বোদা সব কথাই রুটি চিবুতে চিবুতে আর মাংসের হাড় চুষতে চুষতে চুপচাপ শুনে গেল। এসব ব্যাপারে তার একটুও ইণ্টারেস্ট নেই। কিন্তু যেই তাকে বললাম সমাজপতি গড়িয়াহাট রোডেব এক প্রকাণ্ড অ্যাপার্টমেণ্ট হাউসে থাকার জন্য চমৎকার একটা ফ্ল্যাট দিয়েছেন আর সেখানে গণ্ডা গণ্ডা হুইস্কি-রাম-জিনের বোতল মজুত রয়েছে, অমনি বোদার চোখ চকমকিয়ে উঠল। মুখের রুটি-মাংস গালের একপাশে ঠেলে দিয়ে বলল, 'গুরু তা হলে আমরা এই ব্যারাক বাড়িতে লটকে আছি কেন? চল আজই ফরোয়ার্ড মার্চ করে ওখানে চলে যাই।'

'উঁহু—'

'কী হল?'

'ফরোয়ার্ড মার্চ করে তো এখুনই যেতে চাইছিস। গেলে কনকচাঁপার কী হবে?'

বাঁ হাত দিয়ে ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে বোদা বলল, 'ওই এক শালা গড়বড়ের ব্যাপার

বাধিয়ে বসেছি। তা গুরু, কলকাতা থেকে রোজ এসে ওটা ম্যানেজ করে যাব।'

'তা হবে না, ম্যানেজটা এখানে থেকেই করতে হবে।'

বোদা হতভম্বের মতো তাকাল, 'মানে—'

বললাম, 'মানেটা খুবই সোজা। এখন আমরা এখানেই থাকব। কোথাও যখন থাকার জায়গা পাচ্ছিলাম না, তখন এখানে শেলটার পেয়েছি। এসেই যখন পড়েছি তখন কিছুদিন জায়গাটা একটু সার্ভে করে যাই।' বলতে বলতে বোদার চোখের দিকে তাকালাম, 'ব্যাপারটা কি জানিস, যতক্ষণ কেটে পড়ার দরকার না হয় ততক্ষণ কোনো জায়গা থেকে আমি নড়ি না।'

'কিন্তু—'

'আবার কী?'

'আমরা যদি না যাই ওই ফ্ল্যাটটার কী হবে?'

'কী আবার হবে, ওটা আমাদেরই থাকবে।'

'তা ছাড়া অতগুলো হুইস্কিব বোতল—'

'ওরে মাকড়া, বুঝতে পাবছি ওগুলোর জন্যই যাবার এত গরজ তোমার।'

বোদা ঘোড়ার ডাকের মতো শব্দ করে তার পেটেন্ট হাসিটা হাসল। হাসতে হাসতে বলল, 'ঠিক ধবেছ গুরু। একসঙ্গে এক বোতলের বেশি বিলিতি মাল আমি কোনো জন্মে চোখে দেখি নি। বড্ড দেখতে ইচ্ছে করছে।'

সান্ত্বনা দেবার মতো করে বোদাকে বললাম, 'দেখবি। ওগুলো আমাদেরই থাকবে।'

'তোমার কথা বুঝতে পারছি না গুরু। আমরা আছি এখানে, ফ্ল্যাট আর হুইস্কি আছে কলকাতায়। ওগুলো থেকে আমাদের কী লাভ?'

বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে বোদাব নাকে একটা টুসকি মেরে বললাম, 'লাভ [illegible]। তার আগে বল একদিনে কত ঘন্টা?'

'টোয়েন্টিট ফোর আওয়ার্স।'

'ভেরি গুড। সমাজপতির সঙ্গে কথা হয়েছে, চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আমরা দু'ঘন্টা ওখানে গিয়ে থাকব। আমাদের হেড কোয়ার্টারটা এখানেই থাকবে, রিজিওনাল ঘাঁটিটা হবে কলকাতায়। হ্যাঁ রে—'

'বল—'

'দিনে দু-ঘন্টা সময় পেলে একটা বড় হুইস্কির বোতলের ব্যবস্থা করা যাবে না?'

বোদা দাঁত বার করল, অর্থাৎ হাসল। তার হাসিটা এক কান থেকে আরেক কান পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে গেল। মাথাটা ডান দিকে দেড় ফুট হেলিয়ে দিয়ে সে বলল, 'দু'ঘন্টা তো অনেকটা টাইম। আধ ঘন্টা মানে থার্টি মিনিটস সময় পেলে একটা কি বলছ, চারটে করে বোতল উড়িয়ে দিতে পারি।'

'তা তুমি পার। তোমার পেটটা তো জানি, একখানা টালার ট্যাঙ্ক।'

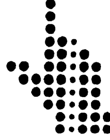
বোদা হাসতে লাগল, কিছু বলল না।

আমি আবার বললাম, 'বুঝলি বোদা, একটা কথা ভেবে আমার দারুণ মজা লাগছে।'

'কী কথা গুরু?' হাসি থামিয়ে আমাকে লক্ষ করতে লাগল বোদা।

'দিনের বেলা আমরা কলকাতার দামী অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে থাকব আর রাত্তিরে থাকব এই ব্যারাক বাড়িতে। দিনের বেলা আমরা ক্যাপিটালিস্ট আর রাত্তিরে প্রোলেটারিয়েট। দারুণ মজার ব্যাপার, তাই না?'

বোদা বুঝতে পারল কিনা কে জানে। তবে আরেক বার দাঁত বার করল।



আমাদের খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। আঁচিয়ে এসে পাশাপাশি শুয়ে পড়লাম।

বোদার টেরিফিক ক্ষমতা আছে। যে কোনো জায়গায় যে কোনো সময় সে ঘুমিয়ে পড়তে পারে। পাশে শুয়ে শুয়ে তার শ্বাসটানার গাঢ় গভীর শব্দ শুনতে লাগলাম। ছোকরা শোবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়েছে।

আমার কিন্তু ঘুম এল না। যদিও পাকস্থলীতে দশ পেগ উৎকৃষ্ট হুইস্কি রয়েছে, এই ব্যারাক বাড়ি একেবারে নিঝুম, চারদিকে মধ্যরাত ঝিম ঝিম করছে, কোথাও কোনো শব্দ নেই, এখনই গভীর ঘুমে আমার ডুবে যাবার কথা, তবু ঘুম আসছে না। কেন কে জানে, আমার পেছনের জীবনটার কথা বার বার মনে পড়ে যাচ্ছে।

অথচ মহাশয়গণ, আমি কখনও পেছন ফিরে তাকাই না। আমার লাইফে 'লুকিং ব্যাক' বলে কোনো কথা নেই। তবু পেছনের জীবনটা আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও হাজারটা পর্দা সরিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল।

হে-হে মহাশয়গণ, আপনাদের একবার বলেছিলাম, মাঝে মধ্যে কার্সিয়াং-এর কাছাকাছি একটা অরফ্যানেজ মানে অনাথ আশ্রমের কথা আমার মনে পড়ে। বহুকাল আগে দেখা কোনো স্বপ্নের মতো অনাথ আশ্রমটা আমার স্মৃতিতে ঝাপসা হয়ে এসেছে। কখনও সখনও মনে হয়, ব্যাপারটা বোধহয় সত্যি না। কিন্তু স্টমাকে দামী হুইস্কির ডোজটা একটু বেশি পড়লে কিংবা নার্ভগুলো স্যাঁতসেঁতে হয়ে গেলে মহাশয়গণ, সেই ড্রিম সিকোয়েন্সটা চোখের সামনে এসে দাঁড়ায়।

আপনাদের আগেই বলেছি, অরফ্যানেজটা ছিল কার্সিয়াং থেকে দার্জিলিং যাবার রাস্তার মাঝামাঝি একটা জায়গায়। দূরে ধোঁয়ার দৈত্যের মতো ঢেউ-খেলানো পাহাড়ের রেঞ্জ। কাছাকাছি ছিল অগুনতি চা-বাগান। এ-সবের মাঝখানে অরফ্যানেজটা ছবির মতো বিউটিফুল মনে হত।

অরফ্যানেজটার মোটামুটি একটা নকশা এঁকে দিলে আপনাদের পক্ষে সুবিধা হবে। মহাশয়গণ, আমি ছবি আঁকতে পারি না। কথা দিয়ে যতটা পারি বুঝিয়ে দিচ্ছি।

অনাথ আশ্রমটার ছিল বিরাট কম্পাউণ্ড। মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা মাঠ। তার এক ধারে

ব্যারাকের মতো টালির চালের তিনটে লম্বা দোতলা বাড়ি। চাল টালির হলেও বাড়িগুলোর দেয়াল এবং মেঝে পাকা। আমরা দু-আড়াই শ' ছেলে এই ব্যারাকগুলোতে থাকতাম। ওখানে আরো কিছু কিছু লোকজন থাকত। যেমন রান্নাবান্নার লোক, বাজার-টাজার করার লোক, হিসেবপত্তর রাখার লোক, ইত্যাদি ইত্যাদি।

মাঠটার ওপারে ছিল প্রকাণ্ড চার্চ। চার্চের ছুঁচলো চূড়োয় একটা সাদা ধবধবে কাঠের ত্রুশ বসানো ছিল। অনেক দূর থেকে ক্রুশটা চোখে পড়ত। চার্চের গায়ে একটা হলুদ রঙের ছোট দোতলা বাড়িতে থাকতেন দশ বার জন ফাদার। এঁরাই অরফ্যানেজটা চালাতেন, মানে আমদের দেখাশোনা করতেন। চার্চটার আরেক পাশে ছিল একটা স্কুল। আমরা সেই স্কুলে পড়তাম, ফাদাররা আমাদের পড়াতেন।

এ হে মহাশয়গণ, একটা কথা বলতে একেবারেই ভুলে গেছি। ওই যে প্রকাণ্ড মাঠটা, তার এককোণে ছিল একটা ছোট্ট সিমেন্টের ছাউনি। কলকাতার বাস স্ট্যাণ্ডে যেরকম শেড-টেড থাকে অনেকটা সেইরকম। আর এই শেডের তলায় একটা দড়ির দোলনা ঝোলানো ছিল। সেই দোলনাতে ছিল তুলোর গদি-বালিশ। মহাশয়গণ, এই শেড এবং দোলনাটা খুব ইমপর্ট্যান্ট ব্যাপার। এটার কথা ভুলে যাবেন না। পরে আপনাদের এর সম্বন্ধে বেশ বিস্তৃতভাবে বলতে হবে। তবে একটা কথা বলা যেতে পারে, প্রায়ই এক-আধটা বাচ্চা মনে হতো সেদিনই জন্মেছে, তাদের ওই দোলনাতে পড়ে থাকতে দেখা যেত। ফাদাররা বাচ্চাগুলোকে তুলে নিয়ে যেতেন। ওই দেখুন, আরেকটা কথাও আপনাদের জানাতে ভুলে গেছি। মেমোরিটা আমার দিনকে দিন যাচ্ছে-তাই হয়ে যাচ্ছে। যাক গে, আমরা যে ব্যারাকগুলোতে থাকতাম সেখানে জন কয়েক মিড ওয়াইফও থাকত। ফাদাররা বাচ্চাগুলোকে কুড়িয়ে এনে মিড ওয়াইফদের হাতে তুলে দিত। তারা বাচ্চাগুলোকে মানুষ করত। বছর কয়েক বাদে বাচ্চাগুলো আমাদের ঝাঁকে মিশে যেত।

দোলনার কথা বা বাচ্চাদের প্রসঙ্গ আপাতত বন্ধ থাক।

হে-হে মহাশয়গণ, এই যে এত বড় একটা অরফ্যানেজ, এতগুলো ছেলের থাকা এবং খাওয়া আর তাদের পড়াশুনার খরচ কিভাবে চলত জানেন? ক্রিশ্চানদের কি একটা ইন্টারন্যাশনাল ফাণ্ড ছিল। ব্রিটেন, জার্মানি, ফ্রান্স, হাঙ্গেরি, স্কাণ্ডিনেভিয়ান কান্ট্রিগুলো, মানে যেখানে যত ক্রিশ্চান দেশ আছে সবাই কিছু কিছু চাঁদা দিয়ে ওই ফাণ্ডটা খুলেছিল। শুদ্ধ ভাষায় চাঁদা হলেও ওটা ভিক্ষেই। সেই ভিক্ষের টাকায় কয়েক হাজার মাইল দূরে ইণ্ডিয়ার এক কোণে আমাদের আড়াই শ ছেলের লাইফ বেঁচে গিয়েছিল। ভ্যাগিস ওই রকম একটা ফাণ্ড ছিল, নইলে এই যে আপনাদের কাছে নিজের অটোবায়োগ্রাফিখানা শোনাচ্ছি, তা কি কোনো দিন সম্ভব হতো?' মহাশয়গণ, মনে মনে ওই ইন্টারন্যাশনাল ক্রিশ্চান ফাণ্ডটার নামে এখনও আমি বলি, 'যুগ যুগ জীয়ো'।

অবশ্য এই ইন্টারন্যাশনাল ফাণ্ডটার কথা ছেলেবেলায় জানতে পারি নি। জেনেছি অনেক পরে—বড় হয়ে।

অরফ্যানেজটার হিস্ট্রি আর জিওগ্রাফির মোটামুটি খবর দিয়েছি। এবার মহাশয়গণ,

ফাদারদের সম্বন্ধে কিছু শুনে নিতে পারেন। দশজন ফাদারের মধ্যে তিনজন ব্রিটিশ, চারজন খাস স্কচ আর বকি তিনজনের একজন ফ্রেঞ্চম্যান, একজন নরওয়েজিয়ান আর একজন আইরিশ। সবার নাম এতদিন পর আর মনে নেই। ফাদার জোহানসন, ফাদার হ্যালিডে, এই রকম দু-একটা নাম ভুলে যেতে যেতেও মনে থেকে গেছে। তবে এঁদের সঙ্গে দু'জন ইণ্ডিয়ান মিশনারিও ছিলেন—রেভারেণ্ড হোড় আর রেভারেণ্ড মণ্ডল। এঁদের, বিশেষ করে রেভারেণ্ড হোড়ের কথা এখনও ভুলিনি।

ফাদারদের কথা তো শুনলেন। এবার আমাদের কী করতে হতো শুনুন। আগেই বলেছি ব্যারাক বাড়িতে আমরা থাকতাম। ধর্মশালায় কিংবা মুসাফেরখানায় যেভাবে লোকজন সারি সারি বিছানা পেতে শোয়, আমরাও সেইভাবে শুতাম। আমাদের জন্য মাথা পিছু ছ'ফুট লম্বা আর চার ফুট চওড়া, মানে চব্বিশ স্কোয়ার ফুট জায়গা বরাদ্দ ছিল। বছরে আমরা তিন সেট জামা প্যান্ট, দুটো করে গেঞ্জি আর বাটা কোম্পানির লাল কেডস পেতাম। শীতকালে ভুটানিদের বোনা রোঁয়াওলা মোটা মোটা উলের পুল-ওভার আমাদের দেওয়া হতো। শীতের পর যার যার পুল-ওভার ধুয়ে টুয়ে ফেরত দিতাম। পরের শীতে অবশ্য আবার ওটা পাওয়া যেত।

মহাশয়গণ, সেই মিশনারি অরফ্যানেজে ভোর বেলা ঠিক পৌনে পাঁচটার সময় ঘণ্টা পিটিয়ে আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে দেওয়া হতো। গরম কালটা তেমন একটা ঝামেলা হত না কিন্তু শীতে অত ভোরে উঠতে দারুণ কষ্ট হতো। কিন্তু উপায় নেই।

ঘুম থেকে উঠেই বিছানা গুটিয়ে যার যার জায়গা সাফ করে মুখটুখ ধুয়ে নিতাম! আধ ঘন্টা বাদে অর্থাৎ সোয়া পাঁচটায় মাঠে গিয়ে আমাদের লাইন দিয়ে দাঁড়াতে হতো। তখন ফাদার হ্যালিডে কিংবা রেভারেণ্ড হোড় আমাদের কিছুক্ষণ খ্রিস্ট বন্দনা করাতেন। মঙ্গলময় যিশুখ্রিস্টের মহিমা নিয়ে লেখা একটা গান সুর করে একটা লাইন গেয়ে যেতেন, আমরা কোরাসে সেই গানটা গাইতাম। এইভাবে গোটা গানটা শেষ হতে মিনিট পনের কুড়ি লেগে যেত।

গানের পর ওখানেই মগে করে দুধ আর হাফ পাউণ্ড করে পাঁউরুটি দেওয়া হতো। এই দুধ আর পাঁউরুটির পয়সা ইন্টারন্যাশনাল ফাণ্ড থেকে আসত না। এর খরচটা দিত আমেরিকান এভাঙ্গেলিস্টরা। দুধ-ফুদ খেয়ে ব্যারাকে ফিরে বই খুলে পড়তে বসতে হতো। পড়া শেষ করে সাড়ে ন'টায় স্নান, পৌনে দশটায় খাওয়া চুকিয়ে স্কুলে ছুটতাম। ক্লাশ ছুটির পর একটু জিরিয়ে কিছু খেয়ে-টেয়ে কাউকে মিশনের খেত কোপাতে হতো, কেউ বা হ্যাণ্ডিক্র্যাফটের কাজ করত। মিশনের অনেক চাষের জমি ছিল। এ ছাড়া নানারকম হাতের কাজের জন্য একটা কারখানা। আমাদের খাটবার ক্ষমতা এবং বয়স ইত্যাদি দেখে যে যে কাজ করতে পারবে তাকে তাই দেওয়া হতো। কাজকর্ম সেরে আবার পড়াশুনো, তারপর খেয়েদেয়ে ন'টার ভেতরে শুয়ে পড়তাম। অবশ্য শোবার আগে ফাদার হ্যালিডে বাইবেল থেকে একটা সুসমাচার শুনিয়ে যেতেন।

এইভাবেই চলে যাচ্ছিল। হে-হে মহাশয়গণ, হঠাৎ একবার হল কি, আমার নিজের

সম্বন্ধে দারুণ কৌতূহল হল। কোনো এক ঋষিটিষি, নাকি একজন ফিলজফার, ঠিক জানি না, হোল লাইফ কাটিয়ে দেবার পর বলেছিল, 'আত্মানং বিদ্ধি'। মহাশয়গণ, আমার বার-তের বছর বয়সেই ব্যাপারটা মাথায় এসে গিয়েছিল। বুঝতেই পারছেন, ছেলেবেলা থেকেই আমি শালা এক মহর্ষি, ফিলজফারও বলতে পারেন। যাই হোক, যা বলছিলাম। নিজের সম্বন্ধে কৌতূহল হতেই আমি ফাদার হ্যালিডের কাছে দৌড়ে গিয়েছিলাম। বলেছিলাম, 'ফাদার আমি কে?'

আমাদের সেই অরফ্যানেজে যত ফাদার আর রেভারেণ্ড ছিলেন তাঁদের মধ্যে ফাদার হ্যালিডে আর রেভারেণ্ড হোড়কে আমার সব চাইতে ভাল লাগত। ওঁরা ছিলেন মাটির মানুষ, আমাকে স্নেহ টেহ করতেন।

ফাদার হ্যালিডে—যিশুখ্রিস্টের মতো চেহারা—আমার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'ইহার অর্থ?'

ভদ্রলোক শুদ্ধ বঙ্কিমী কি বিদ্যাসাগরী বাঙলায় কথা বলতেন। তাঁর ওই রকম গুরুগম্ভীর খটমট ভাষা সবটা বুঝতে পারতাম না। তবে শুনতে শুনতে তিনি যা বলতে চান সেটা ধরতে পারতাম। বলেছিলাম, 'মানে, আমি কোত্থেকে এলাম?'

ফাদার হ্যালিডে বলেছিলেন, 'ঈশ্বরের নিকট হইতে।'

আমি হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'আচ্ছা ফাদার—'

'বল—'

'সবারই তো মা-বাবা থাকে। আমার বাবা-মা কে?'

'ঈশ্বর তোমার পিতা-মাতা।'

মহাশয়গণ, ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করুন। ঈশ্বরের তো আর খেয়ে দেয়ে কাজকর্ম নেই, আমার মতো একজন থার্ড ক্লাস চিটের জন্ম দেবার জন্য তার যেন আর ঘুম হচ্ছিল না।

ফাদার হ্যালিডের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ আমার মাথায় একটা থট-ওয়েভ খেলে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি বলে ফেলেছিলাম, 'একটা কথা বলুন তো ফাদার, আমি কি আমাদের খেলার মাঠে যে দোলনাটা টাঙানো আছে তাতে চড়ে এখানে এসেছিলাম?' দোলনার ব্যাপারটা জ্ঞান হবার পর থেকে ফিক্সেশানের মতো আমার মাথায় আটকে আছে। অরফ্যানেজে আমার চেয়ে কম বয়সের যে-সব ছেলে ছিল তাদেব ব্যাপারটা জ্ঞান হবার পর লক্ষ করে এসেছি। ওরা জন্মবার পরই কারা যেন ওই দোলনায় ফেলে দিয়ে গিয়েছিল। তারপর ফাদাররা তুলে নিয়ে গিয়ে মানুষ টানুষ করতেন। আমার মনে হয়েছিল, ওইভাবে কেউ আমাকে দোলনায় ফেলে দিয়ে গেছে। তারপর বড় হয়ে ওখানকার ঝাঁক ঝাঁক ছেলের সঙ্গে মিশে গেছি।

কয়েক পলক আমার দিকে তাকিয়ে থেকে ফাদার হ্যালিডে বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, তুমি দোলনায় চাপিয়াই এখানে আসিয়াছ।'

'কে আমাকে দোলনায় ফেলে দিয়ে গিয়েছিল?'

'ঈশ্বর।'

আমি আর কি বলব, চলে এসেছিলাম।

এর বছর দু-তিন বাদে অর্থাৎ আমার বয়স যখন ষোল, সেই সময় অরফ্যানেজের ছেলেদের সঙ্গে ছোট রেলে করে দার্জিলিং-এ এক্সকার্সানে গিয়েছিলাম। আমাদের কামরাগুলোতে কাপড়ের ফেস্টুনে অরফ্যানেজের নাম লেখা ছিল।

দার্জিলিং-এ নামতেই অন্য কামরার কয়েকজন প্যাসেঞ্জার পাশ দিয়ে যেতে যেতে আমাদের সম্বন্ধে বলেছিল, 'এতগুলো বাস্টার্ডের জন্য এবার দার্জিলিং আসার বারোটা বাজল। যেখানেই বেড়াত যাবে, দেখবে এই জার্মগুলো কিলবিল করছে।'

হে-হে মহাশয়গণ, সেই প্রথম বাস্টার্ড শব্দটা আমি শুনলাম। দেয়ালের গায়ে প্ল্যাস্টারের মতো শব্দটা আমার মাথায় আটকে রইল।

দার্জিলিং থেকে অরফ্যানেজে ফিরে আমি সোজা ফাদার হ্যালিডের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। বললাম, 'ফাদার, বাস্টার্ড মানে কী?'

ফাদার হ্যালিডে ছিলেন দারুণ উদার, খুবই ধীর স্থির আর শান্ত মানুষ। কোনো কারণেই রাগতেন না, উত্তেজিত হতেন না। সর্বক্ষণ তাঁর মুখে অদ্ভুত সরল আর পবিত্র একটি হাসি লেগে থাকত। এইরকম একটি মানুষেরও আমার প্রশ্ন শুনে ভুরু কুঁচকে গিয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, 'এই শব্দটি তুমি কোথায় শুনিয়াছ?'

কোথায় শুনেছি, বলেছিলাম।

ফাদার হ্যালিডে এবার বলেছেন, 'ইংরাজি ভাষায় হাজার হাজার শব্দ আছে। এই একটি শব্দের অর্থ না জানিলেও জ্ঞান সঞ্চয় কিছু কম হইবে না। এখন যাও—'

কৌতূহলটা আমার মাথায় আটকে ছিল। ফাদার হ্যালিডের কাছ থেকে আমি সটান রেভারেণ্ড হোড়ের কাছে চলে গিয়েছিলাম। ভাল বাংলায় কি যেন বলে, ও হ্যাঁ সদানন্দ, রেভারেণ্ড হোড়ও ছিলেন সদানন্দ পুরুষ। তাঁকে প্রশ্নটা করতে আঁতকে উঠে বলেছিলেন, 'আর কোনো কথা পেলে না বাবা! বেছে বেছে এটাকেই আমার কাছে হাজির করলে!'

থতমত খেয়ে বলেছিলাম, 'না, মানে—'

রেভারেণ্ড হোড় আমার পিঠে আদরের ভঙ্গিতে চাপড় মেরে বলেছিলেন, 'সবে দার্জিলিং থেকে এসেছিস। খেয়ে দেয়ে একটু ঘুমিয়ে নে গিয়ে। যা—'

বুঝতে পারছিলাম রেভারেণ্ড হোড় আমাকে এড়িয়ে গেলেন। কিন্তু ওই শব্দটা মাথা থেকে কিছুতেই ঝেড়ে ফেলতে পারছিলাম না। ঘুণপোকার মতো কোথায় যেন একটা অদৃশ্য শিরা সেটা কেটে যাচ্ছিল।

কোনোরকমে স্নানটা সেরে আর খাওয়া চুকিয়ে স্কুলের লাইব্রেরি থেকে ইংলিশ টু বেঙ্গলি একটা ডিকশনারি নিয়ে এসেছিলাম। পাতা উল্টে বাস্টার্ড শব্দটা বারও করেছিলাম। তার অর্থের জায়গায় লেখা আছে—বেজন্মা, জারজ, যাহার পিতামাতার ঠিক নাই, ইত্যাদি। দেখতে দেখতে আমার মাথার শিরাগুলো যেন খ্যাপা ঘোড়ার মতো লাফাতে

শুরু করেছিল। সেই প্রথম জানতে পেরেছিলাম আমার মা-বাবার ঠিক নেই।

হে-হে মহাশয়গণ, অরফ্যানেজের মাঠের মাঝখানে সেই দোলনার ব্যাপারটাও আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। যে সব মা বিয়ে-ফিয়ের আগেই প্রেগনান্ট হয়ে বসে তারা তাদের অবাঞ্ছিত ছেলেদের জন্মের পরই অন্ধকারে চোরের মতো ঐ দোলনাটায় ফেলে দিয়ে যায়। দোলনাটা ওই জন্যই ওখানে টাঙানো রয়েছে।

জীব হত্যা নাকি করতে নেই। তাই মিশনারি ফাদাররা বেজন্মাদের তুলে নিয়ে মানুষ করেন। হে ফাদারের দল, তোমরা যুগ যুগ জীয়ো।

আমার বাপ-মা একদিন নিশ্চয়ই আমাকে ওই দোলনায় শুইয়ে দিয়ে গিয়েছিল। হে-হে মহাশয়গণ, পৃথিবীর তিনশো কোটি মানুষের মধ্যে কে আমার মা কে আমার বাবা, এখন পর্যন্ত সনাক্ত করতে পারি নি।

মহাশয়গণ, ওয়ার্ল্ডের এই বিশাল পপুলেশনের ভেতরে কোন পুরুষটি এবং কোন মহিলাটির রক্ত নিজের শরীরে বয়ে বেড়াচ্ছি, জানি না। জানতে পারলে দারুণ একখানা নাটক জমিয়ে দেওয়া যেত। দুম করে একবার তাদের সামনে হাজির হয়ে বলতাম, 'এই যে ফাদার এবং মাদার, চোরের মতো দিব্যি তো জন্মখানা দিয়ে অরফ্যানেজের দোলনায় চড়িয়ে কেটে পড়লে। তারপর থেকে ওদিকে আর মাড়াও নি। আমি কিন্তু মাইরি গন্ধ শুঁকে শুঁকে তোমাদের ঠিক বার করে ফেলেছি। তোমাদের গায়ে এখন থেকে জোঁকের মতো আটকে রইলাম। আর নড়ছি না।' এই কথাগুলো বলবার পর আমার জন্মদাতাদের মুখের চেহারা কি রকম দাঁড়ায় অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে অনেক বার ভাবতে চেষ্টা করেছি, আর নিজের মনে টেরিফিক হেসেছি। কিন্তু ওদের তো আর খুঁজে পাবার উপায় নেই।

যাক গে মহাশয়গণ, আপনারা তো জানেন সেই একটা সময় ছিল যখন বাপ-মা নিয়ে কেউ মাথা-টাথা ঘামাত না। আমার লেখাপড়ার দৌড়ও তো আপনাদের জানাই আছে। নিজে ঠিকঠাক বলতে পারব না, তবে আপনাদেরই কারো মুখে যেন শুনেছি, একটা সময় ওয়ার্ল্ডে পারমিসিভ সোসাইটি বলে একটা ব্যাপার ছিল। মহাভারত আর বিদেশি মাইথোলজি টাইথোলজিতে এ নিয়ে দারুণ দারুণ সব কেচ্ছা আছে। তখন আনম্যারেড মেয়ে বাচ্চার জন্ম দিয়ে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াত। কারো হয়তো একটা রেজিস্টার্ড স্বামী ছিল, তবু সে অন্য দশটা পুরুষের দ্বারা দিব্যি প্রেগনান্ট হয়ে বসত। আর এ ব্যাপারে ঢাক ঢাক গুড় গুড় ছিল না। কেউ বা এক সঙ্গে ডজনখানেক পুরুষ নিয়ে ঘর সংসার করত। তখন কে কার বাচ্চার জন্ম দিচ্ছে, কার মা-বাপের ঠিকঠিকানা নেই, এসব কেউ নিয়ে চিন্তা-ফিন্তা করত না। মহাশয়গণ, খেয়েদেয়ে লোকের অন্য কাজকর্ম ছিল। আমার মতো অনেক বাস্টার্ড অনেক বেজন্মার সোসাইটিতে জায়গা ছিল। কেউ তাদের গায়ে থুতু দিত না। বরং ভাল কাজটাজ করলে সম্মানই করত। আসলে কর্মটাই ছিল তখন ইমপর্ট্যান্ট ব্যাপার, জন্মটা সেকেণ্ডারি।

কিন্তু মহাশয়গণ, পারমিসিভ সোসাইটির ব্যাপারটা জন্তু-জানোয়ারদের মধ্যে এখনও থেকে গেলেও আমরা মনুষ্যরা জিনিসটাকে টেরিফিক গোলমেলে করে তুলেছি। এখন

দেখাবার মতো একটি ফাদার একটি মাদার চাই। তারা যদি বেঁচে না থাকে, একদা যে ছিল তার সাক্ষি-সাবুদ বা জোরাল ডকুমেন্ট থাকতেই হবে। নইলে আপনার শালা বারটা বাজল।

মহাশয়গণ, আপনারা তো বুঝেই গেছেন আমার এসব কিছুই নেই। আমার পূজ্যপাদ পিতৃদেব এবং মাতৃদেবী আমার কপালে পিতৃ-পরিচয়ের স্ট্যাম্প লাগিয়ে পৃথিবীতে পাঠায় নি। বুঝে দেখুন সেই ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলাটি আমার সঙ্গে কিরকম চিটিংবাজি করে গেছে। পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম, আর জননী স্বর্গাদপি গরীয়সী ব্যাপারগুলো নিশ্চয়ই আমার জন্য লেখা হয়নি। আমার চোখে আমার বাপ মা হচ্ছে চিট, শুদ্ধ বাংলায় যাকে বলে প্রতারক।

মহাশয়গণ, এখন আমি কোনো কিছুই পরোয়া করি না। বাপ-মা'র আইডেন্টিটি ছাড়াও চালিয়ে নিচ্ছি। যাই হোক, বাস্টার্ড শব্দটার মানে জানার পর কিছুই ভাল লাগছিল না। একদিন করেছিলাম কি, ভাবতে ভাবতে দুম করে রেভারেণ্ড হোড়ের কাছে চলে গিয়েছিলাম। বলেছিলাম, 'আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে ফাদার।'

রেভারেণ্ড হোড় বেশ আদরের ভঙ্গিতে আমার পিঠে একখানা হাত রেখে বলেছিলেন, 'কী কথা?'

'আমি আর পড়াশোনা করব না।'

'কেন রে?'

'ভাল লাগছে না।'

'পড়াশোনা না করে কী করবি?'

'আমি একজন চিটিংবাজ হতে চাই।'

রেভারেণ্ড হোড় আঁতকে ফুট তিনেক লাফিয়ে উঠেছিলেন, 'কী বললি!'

আমি আগের কথাটা আরেক বার বেশ স্পষ্ট করে উচ্চারণ করেছিলাম।

'কী যা-তা বকছিস!' রেভারেণ্ড হোড় চোখ গোল করে বলেছিলেন।

'ঠিকই বলছি। ভেবে দেখুন ফাদার, আমার জন্মটাই হচ্ছে একটা চিটিং-এর ব্যাপার। আর মা বাবাই সেটি করেছে। যার মা-বাবা চিট, তাদের ছেলে কী হবে? কী হওয়া উচিত?'

রেভারেণ্ড হোড় এবার আমার গায়ে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে সস্নেহে বলেছিলেন, 'জন্মটা কিছু না রে, আসলে কে কি কাজ করল সেটাই বড় কথা।'

মহাশয়গণ, সেই পুরনো রেকর্ডটা আরেক বার বাজিয়ে দিয়েছিলেন রেভারেণ্ড হোড়! আমি বলেছিলাম, 'ওসব মহাভারত-টহাভারতের সময় চলত, এখন অচল। চিটিংবাজ আমি হবই ফাদার।'

রেভারেণ্ড হোড় বলেছিলেন, 'ও সব আজেবাজে চিন্তা ছাড়। মন দিয়ে পড়াশোনা কর গে।'

রেভারেণ্ড হোড় পোপের বাণীর মতো একগাদা উপদেশ দিয়েছিলেন এরপর। কিন্তু আমি যা ঠিক করার করেই ফেলেছি। আর কেউ না, স্বয়ং আমার পিতৃদেব এবং মাতৃদেবী

আমাকে চিট করেছে। সুতরাং ওয়ার্ল্ডকে প্রতারণা করার অধিকার আছে আমার। আই হ্যাভ গট এভরি রাইট টু চিট দিস ওয়ার্ল্ড। মহাশয়গণ, সেদিন থেকে আমার লাইফের ফিলজফি বা জীবনদর্শন, যাই বলুন না, সেটি হল চিটিং। সেটা আমার জন্মগত অধিকার। এখনও তাই চালিয়ে যাচ্ছি।

রেভারেণ্ড হোড় যতই উপদেশ টুপদেশ ঝাড়ুন, যতই লেখাপড়া শিখে মানুষের মতো মানুষ হতে বলুন, দারুণ ভাল ভাল কাজ করে জন্মের দোষটাকে ঢেকে ফেলতে যতই পরামর্শ দিন, আমি কিন্তু তার দু'দিন পরেই অরফ্যানেজ থেকে হাওয়া হয়ে গিয়েছিলাম।

দার্জিলিং-এর কাছাকাছি সেই অরফ্যানেজটা থেকে প্রথমে এসেছিলাম শিলিগুড়ি, সেখান থেকে কি করে কলকাতা এসেছিলাম তার লম্বা ডেসক্রিপশান আপনাদের খুব একটা ভাল লাগবে না।

মনে আছে, কলকাতায় এসে নেমেছিলাম সকালে। সেই আমার প্রথম কলকাতায় আসা। সে দিনটা ছিল পনেরই আগস্ট, উনিশ শো সাতচল্লিশ অর্থাৎ ইণ্ডিয়ার স্বাধীনতা দিবস। চারদিকে জাতীয় নেতাদের নামে জয়ধ্বনি, পতাকা, শোভাযাত্রা। গোটা কলকাতা উৎসবের সাজে সেজেছিল। যেদিকে তাকাই শুধু উন্মাদনা।

কলকাতা নামে এই বিশাল মেট্রোপলিসটা আগের দিনও ছিল ব্রিটিশ এম্পায়ারের দ্বিতীয় শহর। এত বড় সিটিতে প' দিয়ে প্রথমটা হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু যার জীবনের ফিলজফিই হল চিটিংবাজ হওয়া তার কি ঘাবড়ে গেলে চলে!

অবাক চোখে চারদিকের বাড়িঘর, দোকানপাট দেখতে দেখতে হাঁটছিলাম কিন্তু মাথার ভেতর ফিলজফিটা চাকাব মতো ঘুরেই যাচ্ছিল, ঘুরেই যাচ্ছিল। কিভাবে ব্যাপারটা যে শুরু করব, বুঝতে পারছিলাম না।

ঘন্টাখানেক হাঁটার পর বেশ হাঁপিয়ে পড়েছিলাম। এদিক সেদিক দেখে এং ; .জরিয়ে নেবার জন্য একটা পুরনো আমলের প্রকাণ্ড বাড়ির ঝোলানো ব্যালকনির তলায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। হঠাৎ আমার চোখে পড়েছিল গেটের কাছে। পেতলের নেমপ্লেটে লেখা রয়েছে : পশুপতি তালুকদার। নামটা দেখতে দেখতে আচমকা, একেবারেই আচমকা, আমার ব্রেনে একটা প্ল্যান এসে গিয়েছিল। ওয়ার্ল্ডের বড় বড় ইনভেনসানগুলো এইরকম হঠাৎ হঠাৎই হয়ে যায়।

মহাশয়গণ, আপনারা অনেক আগেই জেনে গেছেন আমার মাথায় একটা আস্ত প্ল্যানিং কমিশন বসানো আছে। অনেক বার আমি আপনাদের সে কথাটা বলেওছি। সেদিন, আমার সেই ষোল বছর বয়সে সেই প্ল্যানিং কমিশনটার ইনঅগারেসন মানে শুভ উদ্বোধন হয়েছিল।

নেমপ্লেটটার দিকে খানিক্ষণ তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে গেটের দরজার মাথায় কলিং বেলটা টিপতেই একটা গোঁফওলা সিড়িঙ্গে চেহারার মধ্যবয়স লোক এসে দরজা খুলে দিয়েছিল। দেখেই বোঝা গিয়েছিল লোকটা চাকর-বাকর ক্লাসের।

সে আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত পুরোটা সার্ভে করে বলেছিল, 'কাকে চাই?'

চোখকান বুজে বলেছিলাম, 'পশুপতিবাবুকে'—

'কিছু দরকার আছে?'

'খুব জরুরি দরকার।'

লোকটা কি ভেবে বলেছিল, 'আচ্ছা এস আমার সঙ্গে।'

ভেতরে ঢুকে লোকটার পিছু পিছু একটা প্রকাণ্ড ঘরে চলে এসেছিলাম। এখানে সাবেক আমলের ভারি ভারি দামী দামী ফার্নিচার রয়েছে। বসবার জন্য সোফা-টোফা ছাড়াও একধারে ফরাস পাতা, তার ওপর ঝালর-দেওয়া তাকিয়া। কারুকাজ-করা কাশ্মীরি টেবলে ফ্লাওয়ার ভাস। দেওয়ালে সোনালি ফ্রেমে বাঁধানো বিশাল বিশাল অয়েল পেন্টিং। বোঝা যাচ্ছিল এটা বসবার ঘর।

সঙ্গের লোকটা বলেছিল, 'তুমি এখানে বোসো, আমি বাবুকে খবর দিচ্ছি।' বলেই চলে গিয়েছিল।

আর আমি বিশাল একটা সোফায় প্রচণ্ড আরামদায়ক গদির ভেতর ডুবে গিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘরের ভেতরটা দেখছিলাম।

বেশিক্ষণ বসে থাকতে হয় নি। মিনিট কুড়ি পঁচিশ বাদে যিনি ঘরে এসে ঢুকেছিলেন তাঁর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। টকটকে ফর্সা রঙ, গায়ে চাপ চাপ চর্বি। মাথায় পাতা-কাটা সিঁথি, প্রজাপতি মার্কা ফুরফুরে গোঁফ। পরনে নকশাপাড় ফাইন কুঁচনো ধুতি আর বাঁদিকে বোতাম ঘর-ওলা মলমলের পাঞ্জাবি। ভেতরে জালিকাটা গেঞ্জি। লোকটার পায়ে শুঁড়তোলা সৌখিন চটি, আঙুলের হীরের আংটি, পাঞ্জাবিতে হীরের বোতাম। মহাশয়গণ, কালীপ্রসন্ন সিংহি না টেকচাঁদ ঠাকুর, কার যেন লেখায় পুরনো কলকাতার বাবুদের যে ডেসক্রিপশান রয়েছে ইনি ঠিক তেমনটি।

লক্ষ করেছিলাম বাবুটির চোখ ফোলা ফোলা এবং লালচে, অল্প ঢুলু ঢুলুও। আগের রাত্রে নিশ্চয়ই ইনি হুইস্কি টুইস্কি বেশ ভালরকম টেনেছিলেন। তখনও তার হ্যাংওভার চলছে।

সেই চাকর জাতীয় লোকটা বাবুটির সঙ্গে সঙ্গে এসেছিল। সে আমাকে দেখিয়ে বলেছিল, 'এই ছেলেটি দেখা করতে এসেছে।'

আমি ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছি। বাবুটি ঘুম ঘুম লালচে চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে ছিলেন। তারপর বলেছিলেন, 'বাঃ, খাসা ছেলে! যেন দেবদূত।'

মহাশয়গণ, আপনারা তো জানেনই আমার চেহারাটা বেশ ডিসেপটিভ। এখনও রাস্তা দিয়ে গেলে যুবতীদের চোখ আমার গায়ে আঠার মতো আটকে থাকে। নয়নবাণ কথাটা যদি সত্যি হতো, হে-হে মহাশয়রা তো অনেক আগেই আমাকে গ্রেট পিতামহ ভীষ্মের মতো শরশয্যা পাততে হতো। লাইফের দৌড় যখন শেষ করে আনছি তখনই যদি এই অবস্থা হয়, সেই ষোল বছর বয়সের চেহারাটার কথা চিন্তা করুন। লোকটা যে দেবদূত বলেছে, সেটা খুব একটা মিথ্যে নয়। আর তখনই আমি টের পেয়ে গিয়েছিলাম, আমার এই চেহারাটা দারুণ একটা ক্যাপিটাল অর্থাৎ মূলধন হয়ে দাঁড়াতে পারে। একে কাজে

লাগাতে হবে।

যাক গে, বাবুটি তো আমাকে খুব দেবদূত টেবদূত বলল, কিন্তু আমি তো জানি এই দেবদূতটির ভেতর কিরকম একখানা সোর্ডে শান পড়ছে। মুখে কিছু না বলে তাঁর দিকে তাকি‌্যে ছিলাম। বাবুটি আবার বলেছিলেন, 'এস খোকা, আমার কাছে এস—'

ঢালাও ফরাসে গিয়ে তিনি তাকিয়া ঠেসান দিয়ে আধ-শোয়া আধ-বসার মতো শরীর এলিয়ে দিয়েছিলেন। আমি তিন ফুট দূরে গুটিসুটি সেরে বসে ছিলাম।

বাবুটি এবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তারপর বল কী জন্যে এসেছ?'

বলেছিলাম, 'আমি পশুপতিবাবুর সঙ্গে দেখা করব।'

'আমিই পশুপতিবাবু—বল।'

'আপনিই তা হলে আমার বাবা—' আমি ধাঁ করে উঠে গিয়ে পশুপতি তালুকদারকে একটা প্রণাম ঠুকে দিয়েছিলাম।

ফোর ফর্টি ভোল্টের ইলেকট্রিক শখ খাওয়ার মতো লাফিয়ে উঠেছিলেন পশুপতি, 'বাবা! বাবা কী!'

'বাবা মানে ফাদার. আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না বাবা?' আমি মুখটাকে দারুণ করুণ করে পশুপতির দিকে তাকিয়েছিলাম।

পশুপতি গলার শির ছিঁড়ে চিৎকার করে উঠেছিলেন, 'এসবের মানে কী, অ্যাঁ—মানে কী।' তারপর সেই চাকর জাতীয় লোকটাকে বলেছিলেন, 'শিগগির দরজা জানলা বন্ধ করে দে গুপী।'

গুপী নামক লোকটি তক্ষুণি হুকুম তামিল করেছিল।

দরজা জানালা বন্ধ করে দেওয়াতে আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। এরা আমাকে খুন-টুন করে ফেলবে না তো?

কিন্তু মহাশয়গণ, একটু ভাল করে সার্ভে করতেই দেখতে পেলাম, আমি আর কি ভয় পেয়েছি, আমার দশ গুণ ভয় পেয়েছে পশুপতি তালুকদার। আগের রাতের হ্যাং-ওভার তার ছুটে গেছে। চোখের তারা দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসবে যেন। গোটা মুখটায় আতঙ্ক। গলায় ফাঁস-আটকানো মানুষের মতো তিনি বলেছিলেন, 'কী, কী ব্যাপার?'

লোকটা ইঁদুর-কলে পড়ে গেছে। এখন ওকে নিয়ে বেশ খেলতে পারি। বলেছিলাম, 'আমি আপনার কাছে থাকতে এসেছি বাবা—'

পশুপতি গোঙানির মতো শব্দ করে বলেছিলেন, 'আমি কারো বাবা-টাবা নই—'

'নিশ্চয়ই আপনি আমার বাবা—'

'গা-জোয়ারি নাকি? আমাকে বাবা বলবে না। আমি কোনো শালার বাবা নই।'

নিষ্পাপ দেবশিশুর মতো মুখ করে বলেছিলাম, 'বাবাকে বাবা বলব না!'

পশুপতি উত্তর না দিয়ে চোখের ইশারায় গুপীকে কাছে ডেকে ফিসফিসিয়ে কি যেন বলছিলেন। সবটা শুনতে না পেলেও দু-একটা কথা কানে এসেছিল, ' সর্বনাশ করেছে গুপী। সে নয় তো?'

গুপীও চাপা গলায় বলেছিল, 'কি জানি বাবু—'

ফিসফিসানি থামিয়ে পশুপতি এবার আমার দিকে ফিরেছিলেন, 'কী নাম তোমার?'

অরফ্যানেজে আমার নাম ছিল জগদীশ। হে-হে মহাশয়গণ, তামাশাটা দেখুন, যার বাপ-মা'র ঠিক নেই তার নাম হল কিনা জগদীশ। সন্ধি বিচ্ছেদ করলে কি যেন দাঁড়ায়, জগৎ+ঈশ, অর্থাৎ কিনা জগতের ঈশ্বর। অরফ্যানেজের ছেলেদের সবারই ছিল ঠাকুর দেবতার নামে নাম। ভগবান-টগবানের নাম দিয়ে জন্মের দোষটাকে শোধন করে নেবার ইচ্ছে কিনা কে জানে। যাক গে, আমি তখনকার সেই জগদীশ নামটাই বলেছিলাম।

পশুপতি তালুকদার এবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'পদবি কী?'

'আপনার যখন ছেলে তখন তালুকদারই হবে। আমার পুরো নাম জগদীশ তালুকদার।'

'বার বার আমার ছেলে বলছ কেন?'

'আপনার ছেলে বলেই বলছি।'

বেশ বুঝতে পারছি লোকটা দারুণ ঝামেলায় পড়ে গেছে। মহাশয়গণ, যাকে সে অ্যাঞ্জেল ভেবেছে তার মধ্যে যে এরকম একটা বিপজ্জনক বিষধর সর্প লুকিয়ে আছে, আগে ভাবতে পারি নি। আমার কিন্তু দারুণ হাসি পাচ্ছিল, পেটের ভেতর হাসিটা বগবগিয়ে উথলে উঠে বেরিয়ে আসতে চাইছিল। আমি বেরুতে দিই নি। ভেবে দেখুন, বেরুতে দিলেই গোটা ব্যাপারটার বারটা বেজে যেত। উল্টে মুখটাকে দারুণ প্যাথেটিক করে এই ময়দার বস্তার মতো থ্যাসথেসে মাতাল বাবুমার্কা লোকটার পিতৃস্নেহের জন্য আকুল হয়ে তাকিয়ে ছিলাম।

বেশ ঘাবড়ে গিয়ে পশুপতি তালুকদার এবার বলেছিলেন, 'তুমি কোত্থেকে আসছ?'

বললাম, 'আটাগুড়ি অনাথ আশ্রম থেকে।'

আঁতকে উঠে পশুপতি আবার গুপীকে তাঁর কাছে ডেকেছিলেন। তার কানের ভেতর মুখ ঢুকিয়ে গুজগুজিয়ে বলেছিলেন, 'খুব ভাল করে দ্যাখ, এ সে কিনা?'

মহাশয়গণ, গুপীকে ডাকার পরই আমি উল্টো দিকের দেয়ালে একটা ল্যাণ্ডস্কেপের ছবি দেখতে শুরু করেছিলাম। তবে কান দুটো অ্যালসেসিয়ান কুকুরের মতো খাড়া করে গুপীদের দিকেই রেখেছিলাম।

গুপী তার গোল চোখের তারা কানের দিকে এনে আড়ে আড়ে আমাকে দেখতে দেখতে বলেছিল, 'অ্যাদ্দিন পর কি অত বোঝা যায়?'

'তাকে ওই অনাথ আশ্রমের কাছেই তো ফেলে এসেছিলি?'

'একজনকে কি আর ফেলে এসেছি বাবু! আপনার দুই বাঁধা মেয়ে মানুষের চারটে বাচ্চাকেই তো জন্মাবার পর অনাথ আশ্রমের দরজায় রেখে এলাম।'

ধাঁ করে একবার আমাকে দেখে নিয়ে পশুপতি চাপা গলায় গর্জে উঠেছিলেন, 'চোপ হারামজাদা শুয়ার, শুনতে পাবে না?'

যা শুনবার ততক্ষণে শুনেই ফেলেছি। আর মনে মনে ভেবেছি, শালা তুমি ভদ্রলোক সেজে ফার্স্ট ক্লাস আরামে দিন কাটাচ্ছ। ওদিকে তোমার ব্যাকগ্রাউণ্ডখানা ওইরকম। চার

চারটি বাস্টার্ডের জন্ম দান করে অনাথ আশ্রমের দরজায় ফেলে এসেছ! তোমায় আমি সহজে ছাড়ছি না। তোমার নার্ভের ওপর বিশ টন ওজনের রোড রোলারের মতো আমি চেপে থাকব।

গুপী গলার স্বরটা খাদে নামিয়ে বলেছিল, 'শুনছে না, ছবি দেখছে।'

পশুপতি তালুকদার এবার আমার দিকে ফিরে বলেছিলেন, 'তুমি এখানকার ঠিকানা পেলে কোথায়?'

ঘাড় ফিরিয়ে বলেছি, 'অরফ্যানেজের মিশনারি ফাদাররা দিয়েছে। জন্মের পর থেকে নিজের বাবাকে দেখি নি তো। তাই তাদের কাছে বাবার খোঁজ করেছিলাম। প্রথমে কিছুতেই বলবে না। তখন টেরিফিক কান্নাকাটি করলাম, তিনদিন না খেয়ে রইলাম। তাতেই ফাদাররা ভিজল। এখানকার ঠিকানা দিয়ে বলল, 'যা পশুপতি তালুকদারের সঙ্গে গিয়ে দেখা কর। তিনিই তোর বাবা।' বাবা অ্যাদ্দিন আমাকে অনাথ আশ্রমে ফেলে রেখেছেন। যখন এসেই পড়েছি, তাড়িয়ে দেবেন না। এখন থেকে আমি আপনার কাছেই থাকব।'

পশুপতি তালুকদার গল গল করে ঘামতে শুরু করেছিলেন, 'থাকবে মানে! না না, এখানে থাকা টাকা হবে না।'

'তা হলে আমি কোথায় যাব?'

পশুপতি বলেছিলেন, 'যেখানে খুশি।' একটু থেমে পরক্ষণেই আবার বলেছিলেন, 'তুমি অনাথ আশ্রমেই ফিরে যাও না—'

সঙ্গে সঙ্গে আমি কেঁদে ফেলেছিলাম। আমার চোখ থেকে শুদ্ধ বাংলায় যাকে বলে অশ্রুধারা, তাই বেরিয়ে এসেছিল। বাইবে কাঁদছিলাম ঠিকই, কিন্তু ভেতরে ভেতরে সেই হাসিটা বগবগিয়ে উঠছিল। মহাশয়গণ ভেবে দেখুন, সেই বয়সেই আমি কিরকম একখানা ফার্স্ট ক্লাস হারামী হয়ে উঠেছি। অ্যাক্টিং-এব লাইনে গেলে এতদিনে মারলোন ব্র্যাণ্ডো, পল মুনি কি মারসেলো মাস্ত্রোইয়ানির নাকে আমি ঝামা ঘষে দিতে পারতাম।

আমার কান্না দেখে হকচকিয়ে গিয়েছিলেন পশুপতি তালুকদার। কী করবেন বুঝে উঠতে না পেরে বলেছিলেন, 'আাই কেঁদো না, কেঁদো না। কী খাবে বল—'

হে-হে মহাশয়গণ, কোত্থেকে কোথায় এসে হাজির হয়েছি দেখুন। লোকটা আমাকে খাওয়াতে চাইছে। চাইছেই যখন, তখন খেয়ে নেওয়াই ভাল। কেননা মহাশয়গণ, ট্রেন থেকে নামার পর আমার পাকস্থলীতে কিছুই পড়ে নি। খিদেটা পেটের ভেতর তখন ছুঁচ ফোটাচ্ছে। চোখ মুছতে মুছতে বলেছিলাম, 'আমি কখনও রাজভোগ আর রাবড়ি খাইনি বাবা।'

'আবার বাবা!' বলেই গুপীর দিকে ফিরেছিলেন পশুপতি। তাকে বলেছিলেন, 'যা, চট করে রাবড়ি আর রাজভোগ নিয়ে আয়।'

বাড়িতেই খাবারগুলো স্টক করা ছিল কিনা, কে জানে। গুপী পাঁচ মিনিটের মধ্যে প্লেট সাজিয়ে নিয়ে এসেছিল।

আমার খাওয়া হয়ে গেলে গলা থেকে বার কেজি স্নেহ ঢেলে পশুপতি তালুকদার

ডেকেছিলেন, 'জগদীশ—'

আমি তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। তিনি বলে যাচ্ছিলেন, 'একটা কথা বলব?'

'কী?'

'তোমাকে দুশো টাকা দিচ্ছি, চলে যাও।'

'দুশো টাকা!'

পশুপতি তালুকদার খুব ব্যস্তভাবে এবার বলেছিলেন, 'আচ্ছা পাঁচশোই দেব—'

পাঁচশো টাকা! হে-হে মহাশয়গণ, এ আমি ভাবতেই পারি নি। মুখখানা দারুণ প্যাথেটিক করে বলেছিলাম, 'আপনি যখন এখানে থাকতেই দেবেন না তখন টাকাই দিন।'

পশুপতি ভেতর থেকে গুপীকে টাকাটা এনে দিতে বলেছিলেন। টাকা এলে গুপীর হাত থেকে নিয়ে আমাকে দিতে দিতে বলেছিলেন, 'এই নাও জগদীশ, এই নাও।'

আরেক বার চোখের জলে বুক ভাসিয়ে টাকাগুলো পকেটে পুরেছিলাম এবং বলেছিলাম, 'আপনি এখানে থাকতে দিলেন না, তবে মাঝে মাঝে কিন্তু আসব।'

পশুপতি চমকে উঠেছিলেন, 'কেন কেন, আসবে কেন?'

'আপনাকে দেখতে। আপনার জন্যে যে আমার ভীষণ মন কেমন করে।'

'না-না, আসার দরকার নেই। মানে আমি নানা কাজে বাইরে বাইরে ব্যস্ত থাকি। বাড়ি এসে শুধু শুধু ঘুরে যাবে, দেখা হবে না।'

'ঠিক আছে। আপনি যখন বলছেন, আসব না। তবে আমার ভীষণ কষ্ট হবে।' বলতে বলতে উঠে পড়েছিলাম এবং পশুপতিকে লম্বা একটা প্রণাম করে বলেছিলাম, 'যাই বাবা—'

বাবা বলায় এবার আর আপত্তি করেন নি পশুপতি তালুকদার। বলেছিলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, যাও—'

বাড়ির গেট পর্যন্ত আমার সঙ্গে সঙ্গে এসেছিলেন পশুপতি তালুকদার। অর্থাৎ আমাকে কম্পাউণ্ডের বাইরে বার করে না দেওয়া পর্যন্ত ভাল করে নিশ্বাস ফেলতে পারছিলেন তিনি।

কিন্তু গেটের কাছে এসে হঠাৎ আমার ইচ্ছা হয়েছিল পশুপতি তালুকদার নামে এই লোকটার ল্যাজে আরেকটু মোচড় দিয়ে যাই। বোঁ করে ঘুরে গিয়ে বলেছিলাম, 'একটা কথা মনে ছিল না বাবা—'

পশুপতি হকচকিয়ে গিয়েছিলেন, 'আবার, আবার কী হল?'

'জন্মের মতোই তো চলে যাচ্ছি। মা'র সঙ্গে দেখা করে যাব।'

পশুপতির অবস্থাটা তখন অগাধ জলে সাঁতার-না-জানা মানুষের মতো। পাশে দাঁড়িয়ে ডুবন্ত গলায় ভদ্রলোক বলেছিলেন, 'সে এখানে নেই, দিল্লি গেছে।'

বলেছিলাম, 'ঠিক আছে, আমি খবর রাখব। দিল্লি থেকে ফিরলে একবার এস দেখা করে যাব।'

'তার ফেরার কোনো ঠিক নেই। দু-এক বছরের ভেতর ফিরবে বলে মনে হয় না।'

'লোকটাকে যথেষ্ট রগড়ানো হয়েছে। আর কষ্ট দিতে ইচ্ছা হয় নি। বলেছিলাম, 'আচ্ছা, তা হলে যাই।'

মহাশয়গণ, পরে যে আমি একজন উৎকৃষ্ট চিট বা ফোরটোয়েন্টি হয়ে উঠেছিলাম, তার হাতে খড়ি হয়েছিল পশুপতি তালুকদারকে দিয়ে।

নগদ পাঁচশো টাকা হাতে আসার পর আমি তখন রাজা লোক। সোজা সেন্ট্রাল ক্যালকাটার একটা হোটেলে গিয়ে উঠেছিলাম। দু-চার মাস সেখানে থেকে কিছু পয়সা চোট দিয়ে চলে গিয়েছিলাম আর এক হোটেলে। সেটা ছেড়ে আর এক মুসাফিরখানায়। সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রফেসানটাও চালিয়ে যাচ্ছিলাম। বড় বাড়ি টাড়ি দেখে একেক দিন দুম্ করে ভেতরে ঢুকে পড়তাম। তারপর পশুপতিকে মুচড়ে যেভাবে ক্যাশ বার করেছি সেইভাবে টাকা বার করতাম। শুভ উদ্বোধনের দিন বলে পশুপতি পাঁচশো টাকা দিয়ে পার পেয়ে গিয়েছিলেন। তা ছাড়া তখন আমি এই প্রফেসানে একেবারেই আনাড়ি, এক্সপিরিয়েন্সও নেই। পরে অবশ্য রেটটা বাড়িয়ে হাজার টাকা করে দিয়েছিলাম। হে-হে মহাশয়গণ, সব প্রফেসানে সব বিজনেসে রেট বাড়ে, এতেই বা বাড়াবে না কেন? এই চিটিংবাজির ব্যাপারটা চালাতে গিয়ে একটা ব্যাপার লক্ষ করেছি, এই গ্রেট মেট্রোপলিস মানে সিটি অফ ক্যালকাটার বহু লোকের সামনে ঘোমটা, পেছনে খ্যামটা। তাদের কাপড় সরালেই দেখতে পাবেন একটি করে শীলমোহর দাগানো আছে। একটু উল্টোপাল্টা জেরা করলেই বুঝতেই পারবেন, অবৈধ ছেলেপুলের জন্ম দিয়ে ডাস্টবিনে কি অনাথ আশ্রমে ফেলে তোফা ভদ্রলোকটি সেজে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে।

তবে এটা মানতে হবে, ওরা এই রকম কুকর্ম করে বেড়াচ্ছে বলেই না আমি প্রফেসান চালিয়ে যেতে পারছিলাম। নইলে এই কলকাতা শহরে নতুন এসে কোথায় দাঁড়াতাম!

মনে পড়ে, তিন চার বছর এই বিজনেসটা চালাবার পর হঠাৎ এক জায়গায় এসে আরেকটু হলে ফেঁসে যেতে বসেছিলাম। সেদিন সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউতে এক মাড়োয়ারির বাড়িতে অপারেশন করতে গেছি। বাচ্চা হাতির মতো মোটা, ঢাউস ভুঁড়িওলা মাড়োয়ারি আমাকে বসিয়ে রেখে পাশের ঘরে গিয়েছিল। পরক্ষণেই শুনতে পেয়েলিাম, সে ফোনের ডায়াল ঘোরাচ্ছে। আমি কান খাড়া করেছিলাম। একটু পর মাড়োয়ারির চাপা গলা ভেসে এসেছিল, 'বড়বাজার থানা—'

হে-হে মহাশয়গণ, অ্যালসেসিয়ান কুকুরের কান দেখেছেন তো। এমনিতে লটর পটর করে। কিন্তু যেই কোথাও একটু শব্দ হল অমনি সে দুটো স্ট্রেট খাড়া হয়ে উঠল। আমার কানও সেইরকম সজাগ।

আমি এ ঘরে বসে আছি। পাশের ঘর থেকে লোকটার গলা ভেসে আসছিল।

তার নামটা আগেই জেনে ফেলেছি। কেননা এ বাড়িতে ঢুকবার সময় গেটের কাছে ব্রোঞ্জের নেমপ্লেটটা চোখে পড়েছিল। সেখানে ঢাউস ঢাউস অক্ষরে লেখা রয়েছে, বিজলীপ্রসাদ রাজঘরিয়া।

বিজলীপ্রাসাদ পাশের ঘরে আমার সম্বন্ধে কী বলছে পরিষ্কার শুনবার জন্য গুটি গুটি

করে উঠে দেয়ালের কাছে কান পেতেছিলাম। বিজলীপ্রসাদ বলছিল, 'জলদি চলে আসুন পুলিশ সাহাব। মনে হচ্ছে শালা বিলকুল ফরেবী (ফেরেববাজ)। আমাকে ব্যালেকমিল করে কিছু খিঁচে লিতে চায়। লেকিন আমিও বিজ্‌লী পরসাদ. .কী বললেন? একঘণ্টা পর আসছেন? ঠিক আছে...আমি শালাকে ঠিক আটকে রাখছি।'

ফোনটা নামিয়ে বিজলীপ্রসাদ ওঘর থেকে বেরিয়ে আসতে যাবে, তার আগেই আমি আবার এ ঘরে নিজের জায়গাটিতে দেবদূতের মতো মুখ করে বসে রইলাম।

একটু পরেই বিজলীপ্রসাদ চলে এসেছিল। বিজলীর ইংরেজি তো ইলেক্‌ট্রিসিটি। লক্ষ করলাম শালার মুখে ফোর ফর্টি ভোল্ট যেন স্পার্ক মারছে। কিন্তু তুমি বিজলীপ্রসাদ আর আমি হলাম জগদীশ (তখনও আমার নাম পিটার্স স্বয়ম্ভু হোড় হয়নি), মানে ভগবান। সোজা ব্যাপার নয় মহাশয়গণ, স্বয়ং ভগবান। এক্কেবারে অলমাইটি গড। মনে মনে ভাবলাম, শালে বিজলীচরণ, ও না না বিজলীপরসাদ, তুমি ভেবেছ আমাকে তুমি পুলিশের হাতে তুলে দেবে। ঠিক আছে, দেখাই যাক।

বিজলীপ্রসাদ, মনে আছে, সোজা আমার সামনে এসে বসেছিল। পবিত্র শিশুটির মতো তাকে দেখতে দেখতে বলেছিলাম, 'বাবুজি—'

কয়েক কেজি বিশুদ্ধ আগমার্কা স্নেহ গলায় ঢেলে বিজলীপ্রসাদ বলছিল, 'বোল বেটা, বোল—'

মহাশয়গণ বিজলীপ্রসাদ নামে এই সাবলাইম খচ্চরটি আমার সঙ্গে বেশ ভালই সঙ্গত ধরেছিল। আমি যদি বাঁয়া হই, এ নির্ঘাৎ তবলা। মনে মনে বললাম, 'চালিয়ে যাও মাইরি। ফাস কেলাস লড়ছ।' মুখে বলেছিলাম, 'বাবুজি, আমার বড্ড খিদে পেয়েছে।'

বিজলীপ্রসাদ ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল, 'হাঁ হাঁ জরুর।' তারপরেই দরজার দিকে মুখে বাড়িয়ে ডেকে উঠেছিল, 'এ ভগলু, ভগলুয়া—'

একটা গাঁট্টাগোট্টা চাকর—ঘাড়ে গর্দানে ঠাসা, মাথায় কদম ছাঁট—দরজায় মুখ বাড়িয়েছিল। বিজলীপ্রসাদ তাকে লাড্ডু, রসগোল্লা থেকে শুরু করে সিঙ্গাড়া কচৌরি ইত্যাদি ইত্যাদি খাবার নিয়ে আসতে বলেছিল।

হে-হে মহাশয়গণ, বিজলীপ্রসাদের মতলবটা কী বোঝাই যাচ্ছিল। খাবার দাবার দিয়ে আমাকে যতক্ষণ আটকে রাখা যায়। কিন্তু ও তো জানে না আমার মাথায় এখন কিসের প্ল্যানিংটা চলছে।

কয়েক মিনিটের মধ্যে ভগলু প্রকাণ্ড পেতলের থালায় রসগোল্লা টোল্লা সাজিয়ে নিয়ে এসেছিল। পাওয়া মাত্র আমি চটপট মুখে পুরতে শুরু করেছিলাম।

বিজলীপ্রসাদ বলেছিল, 'আরে বাচ্চে আস্তে খা না। অত জলদির কী আছে!' কেন যে এত তাড়াহুড়ো তা আমিই শুধু জানি। ফোনের কথাগুলোর প্রতিটি অক্ষর আমার মনে আছে। বড়বাজার থানার পুলিশ অফিসার এক ঘণ্টার মধ্যেই চলে আসছে। তার ভেতরেই যা করবার আমাকে করে ফেলতে হবে।

বিজলীপ্রসাদের কথার উত্তর না দিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে থালাটা পরিষ্কার করে

ফেললাম। মনে মনে হিসেব করে দেখলাম এখনও আমার হাতে পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় আছে।

বিজলীপ্রসাদ জিজ্ঞেস করল, 'পেট ভরে খেয়েছিস তো বাচ্চে?'

বললাম, 'হাঁ বাবুজি—' বলতে বলতেই হঠাৎ চোখে পড়ল বিজলীপ্রসাদের গলায় একটা সোনার হার রয়েছে। হারটা দেখিয়ে বললাম, 'বাবুজি ওটা একটু দেখব?'

'হাঁ-হাঁ জরুর।' হার খুলে আমার হাতে দিল বিজলীপ্রসাদ।

শুধু হার কেন মহাশয়গণ, আমাকে আটকাবার জন্য দরকার হলে লোকটা তার সব প্রপার্টি কিছুক্ষণের জন্য আমার হাতে তুলে দিতে পারে।

হারটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কিছুক্ষণ দেখলাম। তারপর বললাম, 'ভারি সুন্দর তো—'

বিজলীপ্রসাদ বলল, 'হাঁ—'

'বাবুজি এটা আমি একটু পরব?'

'হাঁ-হাঁ জরুর।'

হারটা তক্ষুণি গলায় পরে ফেললাম। ঘরের এক কোণে একটা বড় আয়না ছিল। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে সেটার সামনে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ নিজেকে দেখে আবার বিজলীপ্রসাদের কাছে ফিরে এলাম। দারুণ খুশি-খুশি মুখ করে ডাকলাম, 'বাবুজি—'

বিজলীপ্রসাদ বলল, 'বোল বেটা –'

'হারটা পরে আমাকে ভাল লাগছে?'

'জরুর।'

'এটা নেব?'

বিজলীপ্রসাদের মুখে কালচে একখানা ছায়া পড়েই মিলিয়ে গেল। তারপরই স্পার্ক মারার মতো করে হেসে সে বলল, 'নিবি? আচ্ছা নে—'

বিজলীপ্রসাদ জানে কতক্ষণ আর। পুলিশ এসে পড়লেই হারটা আবার তার কাছে ফিরে যাবে। মহাশয়গণ, শালা একেবারে টোয়েণ্টিয়েথ সেঞ্চুরির দাতাকর্ণ।

বিজলীপ্রসাদ আবার বলল, 'কোনোদিন তোকে তো কিছু দিই নি। কাছে থাকলে কত কি পেয়ে যেতিস।'

হারামী টেরিফিক খেলে যাচ্ছিল। এতদিন যাদের কাছে গেছি তাদের সবার ব্রেনেই স্ক্র্যাপ আয়রন পোরা। বাবা বলে যেই কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছি অমনি এককে জনের ব্লাড-প্রেসার হুড় হুড় করে নেমে গেছে, হাঁটুর হাড় আলগা হয়ে ঝুলে পড়েছে। কিন্তু এই বিজলীপ্রসাদ ফার্স্ট ক্লাশ লড়ে গিয়েছিল। এর ব্রেনখানায় বেশ ভাল জিনিস আছে। শালাকে কাত করা যার তার কাজ নয়।

একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'বাবুজি, এই পাঁচতলা বাড়িটা কি আপনার?'

'হাঁ রে বেটা। কেন?'

খুশিতে আটখানার জায়গায় আটানব্বুইখানা হয়ে বলেছি, 'তাহলে এটা তো আমারও বাড়ি।'

'ও তো ঠিক বাত।' বিজলীপ্রসাদ তক্ষুণি ঘাড় হেলিয়ে দিয়েছে।

'একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

'কী?'

'এবার থেকে আপনার কাছে এ বাড়িতে থাকতে দেবেন?'

গলার স্বরটা খাঁটি মধুতে চুবিয়ে বিজলীপ্রসাদ বলেছে, 'নিজের ছেলেকে থাকতে দেব না! তুই আমার মনে বড় দুখ দিলি বেটা।'

বিজলীপ্রসাদের সঙ্গে কথা বলেছিলাম ঠিকই কিন্তু মনে মনে সময়ের হিসেবটা ঠিকই রেখে যাচ্ছিলাম। মিনিট চল্লিশের মতো কেটে গেছে। আমার হাতে আছে আর মোটে কুড়ি মিনিট। অতএব মহাশয়গণ আর রিস্ক নেওয়াটা ঠিক হবে না। হঠাৎ আমি বললাম, 'বাবুজি—'

বিজলীপ্রসাদ তক্ষুণি সাড়া দিল, 'কী?'

'বাবুজি আমাদের বাড়িটা একটু দেখব?' আমি সোজা তার চোখের দিকে তাকালাম।

আমার মুখে অ্যাঞ্জেলমার্কা সেই নিষ্পাপ হাসিখানা ঝুলেই আছে। সেটা দেখলে কে বলবে আমার মাথার ডজন ডজন প্ল্যানিং কমিশনের হেড কোয়ার্টার বসানো রয়েছে।

বিজলীপ্রসাদ হয়তো ভাবল আর ক'টা তো মিনিট। তারপরেই আমাকে তারের জালঘেরা পুলিশের গাড়িতে তুলে দিয়ে খানিকক্ষণ গোঁফ নাচিয়ে নেবে। সুতরাং আমার শেষ ইচ্ছাটি পূরণ করার জন্য হাতের ভর দিয়ে বিশাল শরীরের ওয়েটটা টেনে তুলেছে সে। বলেছে, 'চল। তোকে মকান দেখিয়ে আনি। আমি আর ক'দিন। মারা গেলে এ বাড়ি তো তোরই হবে। দেখেশুনে নে।'

বিজলীপ্রসাদ প্রথমেই আমাকে নিয়ে গেল ছাদে। এতটা উঁচুতে ওঠার ফলে কুড়ি মিনিট থেকে ছ'সাত মিনিট বেরিয়ে গেল। আর মোটে তের-চোদ্দ মিনিট আমার হাতে রয়েছে। এই সময়টুকুর মধ্যেই বিজলীপ্রসাদকে একখানা ম্যাজিক দেখিয়ে দিতে হবে।

দিতে তো হবে কিন্তু কিভাবে। এখন পর্যন্ত আমার মাথায় তেমন প্ল্যান আসে নি। ছাদ থেকে চারদিকে তাকাতে তাকাতে হঠাৎ চোখে পড়ল একটা লোহার ঘোরানো সিঁড়ি পাক খেয়ে খেয়ে নিচে নেমে গেছে। সিঁড়িটা যেখানে গিয়ে ঠেকেছে সেটা মনে হল বাড়ির পেছন দিক। পেছনের খানিকটা অংশ ফাঁকা। তারপর উঁচু কম্পাউণ্ড ওয়াল। ওয়ালের গায়ে একটা দরজাও চোখে পড়ল। দরজাটা খোলা এবং তার ওপারে একটা গলি।

মহাশয়গণ, আপনারা তো জানেনই এক মুঠো হাওয়া পেলে তাই দিয়ে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মতো একখানা বাড়ি বানিয়ে ফেলতে পারি।

এই মুহূর্তে হাতের কাছে সলিড লোহার এত বড় একটা সিঁড়ি রয়েছে, কম্পাউণ্ড ওয়ালে দরজা রয়েছে এবং দরজার বাইরে গলি দেখা যাচ্ছে। একটা ছেড়ে বিজলীপ্রসাদকে এখন আমি দশটা ম্যাজিক দেখিয়ে ছাড়তে পারি।

বিজলীপ্রসাদকে ঘোরানো সিঁড়িটা দেখিয়ে বললাম, 'বাবুজি এই সিঁড়িটা কোথায় গেছে?' সব দেখেশুনেও প্রশ্নটা করলাম।

বিজলীপ্রসাদ বলল, 'নিচে।'

'নিচটা একবার দেখে আসব?'

'আবার নিচে যাবি?'

'বা রে, গোটা বাড়িটা একবার দেখব না?' বলেই আবার সেই দেবশিশু মার্কা পেটেন্ট হাসিটা হাসলাম।

আর শালা বিজলীপ্রসাদের মতো সাবলাইম খচ্চরও সেই হাসিতেই কাত হয়ে গেল। বলল, 'নামবি আর উঠবি। আমার ভুঁড়ি দেখেছিস তো। তাতে সিঁড়ি ভাঙতে পারব না। আমি এখানেই রইলাম।'

বললাম, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, এখানেই থাকুন। আপনি আবার কষ্ট করে কেন নামবেন?'

দু মিনিটের মধ্যেই পাকানো সিঁড়ি বেয়ে তরতরিয়ে সত্তর ফুট নিচে নেমে ঘাড় উঁচু করে ওপরে তাকালাম। দেখি বিজলীপ্রসাদ ছাদের দেওয়ালের ওপর দিয়ে জিরাফের মতো গলা বাড়িয়ে ঝুঁকে রয়েছে। চোখাচোখি হতেই সে গলা চড়িয়ে ডাকল, 'চলে আয়।'

আমি করলাম কি, মিলিটারি কায়দায় গোড়ালিতে গোড়ালি ঠেকিয়ে বিজলীপ্রসাদকে একখানা লম্বা স্যালুট ঠুকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বললাম, 'গুড বাই ফাদার, চললাম।' সেই হারটা আমার গলাতেই ছিল। সেটা দেখিয়ে আবার বললাম, 'এটার জন্যে মেনি মেনি থ্যাঙ্কস।' বলেই অ্যাবাউট টার্ণ করে ফরোয়ার্ড মার্চের ভঙ্গিতে খোলা দরজাটার দিকে এগিয়ে গেলাম।

ওপরে হাত-পা ছুঁড়ে বিজলীপ্রসাদ চিৎকার করতে লাগল, 'শালে চোট্টা, শালে ডাকু, শালে ফরেবি, ভাগতা হ্যায়। পাকড়ো পাকড়ো—'

আমি খুব একটা ঘাবড়ালাম না। খুব ধীরে-সুস্থে ঠাণ্ডা মাথায় ওধারের গলিতে গিয়ে দরজাটা বাইরে থেকে টেনে শেকল তুলে দিলাম।

হে-হে মহাশয়গণ, আপনাদের আগেই বলেছি আটাগুড়ির সেই অরফ্যানেজ থেকে আসার পর প্রথম চারটে বছর গাদা গাদা লোককে 'বাবা' বলে বল টায়ার্ড হয়ে গিয়েছিলাম। ব্যাপারটা ভাল লাগছিল না। এদিক থেকে দেখতে গেলে বিজলীপ্রসাদই আমার শেষ। পিতৃদেব, লাস্ট ফাদার। তারপর থেকে নিজের প্রফেসানটার ডাইভার্সিফিকেসন শুরু করে দিয়েছিলাম। আমার যা ট্যালেন্ট সেটাকে টুকরো টুকরো করে সেই থেকে দশ দিকে ছড়িয়ে দিচ্ছি।

সেই সঙ্গে আরো একটা ব্যাপার করে বসেছি, নিজের নামটা বদলে ফেলেছি। অরফ্যানেজে থাকতে আমার নাম ছিল জগদীশ। তার মানে জগতের ঈশ্বর অর্থাৎ গড। আমি শালা গড! কারবারটা দেখুন একবার।

জগদীশ নামটা বদলে তার জায়গায় পরে যা বসালাম তা হল পিটার স্বয়ম্ভু হোড়। আপনারা হয়তো জিজ্ঞেস করতে পারেন, স্বয়ম্ভু কেন? মহাশয়রা আমার পিতামাতা নেই,

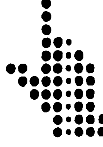
থাকলেও তাদের পরিচয় জানি না, তারা আমাকে অরফ্যানেজে ফেলে ভেগে গেছে। ওরা যখন আমাকে ছেলে বলে স্বীকার করে নি তখন আমি বা তাদের পিতৃত্ব আর মাতৃত্ব নিয়ে মাথা ঘামাই কেন? এখন থেকে কেউ আমার জন্মদাতা নয়, আমি নিজে নিজেই মাটি ফুঁড়ে গজিয়ে গেছি। তাই আমি স্বয়ম্ভু। মিশনারিদের অরফ্যানেজে ষোলটা বছর কাটিয়ে এসেছি, তার স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে পিটারটা স্বয়ম্ভুর আগে জুড়ে নিয়েছি। আর অরফ্যানেজের রেভারেণ্ড হোড় আমাকে স্নেহ করতেন, তাঁর সারনেমখানাও ডেকরেসনের মতো স্বয়ম্ভুর ডান পাশে বসিয়েছি। এই তিনটি মিলে আমি পিটার স্বয়ম্ভু হোড়। মহাশয়গণ আমার কোনো পাস্ট নেই। আমার গোটা ব্যাপারটাই প্রেজেন্ট টেন্সের। আর ফিউচার সম্বন্ধে আমি কিছুই ভাবি না। আপনারা বলতে পারেন আমাকে দিয়ে একটা নতুন ডাইন্যাস্টির শুরু।

নিজের কথা ভাবতে ভাবতে একসময় গভীর ঘুমে তলিয়ে যেতে লাগলাম।

প্রথম পর্ব সমাপ্ত

আমাকে দেখুন

দ্বিতীয় পর্ব



পরের দিন সকালে আমারই প্রথমে ঘুম ভাঙল।

দরজা ভেজানো ছিল। তাই কতটা বেলা হয়েছে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তবে সূর্য যে উঠে গেছে সেটা টের পাওয়া যাচ্ছে। ঘুলঘুলির ফোকর দিয়ে সরু সরু সোনালি সুতোর মতো রোদ এসে পড়েছে ঘরের ভেতর।

চোখটোখ রগড়ে বিছানায় উঠে বসতেই দেখতে পেলাম বুকের কাছে হাঁটু গুঁজে শরীরটাকে স্রেফ একখানা জ্যামিতির সার্কেল বানিয়ে বোদা ঘুমোচ্ছে। আর ঘুমের ঘোরেই অল্প অল্প হাসছে। হাসিটা একেবারে হেভেনলি। বাংলায় কী যেন বলে—ও হ্যাঁ, স্বর্গীয়।

চোখ কুঁচকে ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে বোদাকে লক্ষ করতে লাগলাম। হে-হে মহাশয়গণ, আপনারা তো জানেনই মনে ফুর্তি থাকলে মানুষ ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও হাসে। ও শালার মনে এখন টেরিফিক সুখ, মাকড়া সুখের জোয়ারে একেবারে ভেসে চলেছে। আতরকে ধরে কালই বোদা কনকচাঁপার খোঁজ পেয়ে গিয়েছিল। হোল নাইট তারই স্বপ্ন দেখেছে হয়ত। এই সকালবেলাতেও সেই স্বপ্নের খোয়ারি চলছে। কনকচাঁপার গন্ধ, তার ড্রিম, সুইট ড্রিমের ভেতর এখনও ছড়িয়ে আছে। শালার ঘাড়ে একখানা লাথি হাঁকিয়ে সুখের স্বপ্নটা কিচাইন করে দেব নাকি?

তাকিয়ে থাকতে থাকতে মহাশয়গণ হঠাৎ মায়াই হয়ে গেল। ভাবলাম থাক, যতক্ষণ পারে ছোকরা স্বপ্ন-ফপ্ন দেখে যাক। আজ আর ওর ঘুমটা ভাঙাচ্ছি না। নিজের থেকে বোদা যখন ওঠে উঠবে।

কাঁধে একটা তোয়ালে ঝুলিয়ে ব্রাশ আর পেস্ট নিয়ে একটু পর আমি বাইরে বেরিয়ে এলাম।

এর মধ্যে এই ব্যারাকবাড়ির প্রায় সবাই জেগে উঠেছে। হাঁস মুরগির ছানার মতো গাদা গাদা বাচ্চাকাচ্চা উঠোনময় কিলবিল করে বেড়াচ্ছিল। আগেও মনে হয়েছে, এখনও আরেক বার মনে হল, এই ব্যারাকবাড়িটা যেন টেরিফিক আকারের এক পোলট্রি। বাচ্চাদের জন্মদাতা এবং জন্মদাত্রীদেরও এধারে ওধারে দেখা যাচ্ছে। তবে কে কার বাপ, কে কার মা—এসব শনাক্ত করা আমার পক্ষে সম্ভব না। কারণ এই নিয়ে বার-তিনেক আমি ব্যারাকবাড়িতে এলাম। এর মধ্যে সুমনারা ছাড়া আর কারো সঙ্গেই আলাপ হয় নি। ওদের কারো নাম-টামও জানি না।

উঠোনে নেমে আমি সোজা কুয়োর দিকে এগিয়ে গেলাম। চারদিক থেকে জোড়া জোড়া চোখ আমাকে লক্ষ করতে লাগল। আমি জানি, বোদা আর আমার সম্বন্ধে এ-বাড়ির লোকগুলোর দুর্দান্ত কৌতূহল। আমরা কে, কোত্থেকে দুম করে এখানে এলাম, পার্মানেন্টলি এই বাড়িতে থেকে যাব কিনা ইত্যাদি জানবার জন্য হারামীগুলোর দম বন্ধ হয়ে আছে।

ওদের দেখতে দেখতে আমি এগিয়ে গেলাম। এই ব্যারাকবাড়ির বাচ্চাকাচ্চা, ছেলেবুড়ো, যুবক-যুবতী—প্রতিটি বাসিন্দারই চেহারা ভাঙাচোরা, ক্ষয়ে যাওয়া। সবারই চোখ দেড় ইঞ্চি করে গর্তে ঢোকানো, কণ্ঠার হাড় গজালের মতো ঠেলে বেরিয়ে আছে।

হে-হে মহাশয়গণ, আপনারা আমার স্মৃতিশক্তিকে একটু সাহায্য করুন। ছেলেবেলায় হাইজিনের বই সবাই পড়েছেন। বলুন তো স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য মাথা পিছু কত ক্যালরি খাদ্যের দরকার? আপনাদের চোখমুখের চেহারা দেখে মনে হচ্ছে স্রেফ ভুলে বসে আছেন। যাক গে, মনুষ্যদেহ ভালভাবে টিকিয়ে রাখতে হলে যত ক্যালরির দরকার, আমি বেট রেখে বলতে পারি এ-বাড়ির লোকেরা তার পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগও পায় না। সারা গায়ে তারা ম্যালনিউট্রিসান অর্থাৎ অপুষ্টির স্ট্যাম্প মেরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মহাশয়গণ, মাঝে মাঝে সোসিওলজির এক্সপার্টরা ম্যাল-নিউট্রিসানের রুগী দেখবার জন্য ঝাঁক বেঁধে বেরিয়ে পড়ে। যদি তাদের দেখা পান এখানে পাঠিয়ে দিতে পারেন।

কুয়োর জলে মুখ-টুখ ধুয়ে যখন ফিরছি আচমকা উঠোনের মাঝখান থেকে একটা লোক উঠে এসে আমার গায়ে জুড়ে গেল। লোকটা মধ্যবয়সী, ঢ্যাঙা ট্যারাবাঁকা চেহারা, সারা গায়ে গ্যারগেরে হাড়। মুখটা উল্টে দেওয়া পেপেঁর মতো। মাথার দিকটা চওড়া, চোয়ালের দিক সরু। মাথার মাঝখান দিয়ে সিঁথি। গায়ে রংবেরং-এর তাপ্পিমারা টেকনিকালার জামা আর তাপ্পিমারা ঢলঢলে ফুলপ্যান্ট। লোকটা সার্কাসের দলে ভিড়লে দারুণ একটা ক্লাউন হতে পারত।

মাথাটা ডান দিকে মিটার খানেক হেলিয়ে দিয়ে হাত কচলাতে কচলাতে লোকটা বলল, 'আজ নিয়ে দাদাকে তিন দিন আমাদের এখানে দেখলাম।'

চোখের কোণ দিয়ে তাকে মাপতে মাপতে বললাম, 'আমাকে ওয়াচ করছেন বুঝি?'

লোকটা পোকায়-কাটা কালচে দাঁত বার করল, 'তা করছি। নতুন মাল কারা এখানে আসছে যাচ্ছে, একটু ওয়াচ না করলে কি চলে? তা দাদা আপনি গ্রেট—'

'মানে?' আমি ভুরু কুঁচকে তাকালাম।

'গ্রেট মানে মহৎ। আপনি মহৎ। আপনার মতো মহাপুরুষ আমি আর দেখি নি।' লোকটা আরেক বার দাঁত বার করল।

লোকটার মতলব ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তার ওপর চোখ রেখে বললাম, 'কিসে বুঝলেন আমি গ্রেট?'

'আমি সব জানি স্যার। আমি কেন, আমাদের এই গোটা মহল্লাটা জানে আপনি সুমনার মাকে বাঁচিয়েছেন। আপনি না থাকলে বুড়িটা ভাট্রা হয়ে যেত। মহাপুরুষ না হলে কেউ পরের জন্যে এরকম করে!'

তা হলে দেখা যাচ্ছে সুমনাদের ব্যাপারটা এখানে জানাজানি হয়ে গেছে।। বললাম, 'ও, এই জন্যে মহাপুরুষ?'

লোকটা ডাইনে বাঁয়ে বারকয়েক মাথা নাড়িয়ে বলল, 'তারপর দাদা—'

'কী?'

'এবার থেকে আপনি আমাদের কাছেই থাকবেন নাকি?'

'হ্যাঁ, দিন কতক এখানেই তাঁবু ফেলবার ইচ্ছা।'

দারুণ খুশির গলায় লোকটা বলল, 'দিন কতক কেন, হোল লাইফ আপনি আমাদের সঙ্গে থেকে যান স্যার—'

আমাকে এখানে রাখবার জন্য লোকটার এত উৎসাহ কেন? তার মতলব-টতলব কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। ঠিক আছে, দেখাই যাক শেষ পর্যন্ত পর্দা তুলে কোন ভেলকি দেখায় সে। একটু হেসে বললাম, 'দেখি—'

লোকটা আমার গায়ে ঝুলতে ঝুলতেই চলেছে। এবার তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার সঙ্গে আলাপ হল, নামটা কিন্তু জানা হয় নি।'

মাকড়া একেবারে কৃতার্থ হয়ে গেল যেন। কাঁধটা বাহাত্তর ইঞ্চি হেলিয়ে বলল, 'আমার নাম নদেরচাঁদ মাইতি—'

'এখানেই থাকেন?'

'হ্যাঁ, স্যার। ঐ ঘরটা আমার—' লোকটা অর্থাৎ নদেরচাঁদ ব্যারাকবাড়ির ডান দিকে একটা ঘর দেখিয়ে দিল।

লোকটা যেভাবে মাটি ফুঁড়ে উঠে আমার গায়ে জুড়ে গেছে তাতে ওর সম্বন্ধে একটু-আধটু খবর টবর নিয়ে রাখা দরকার। মানে এক বাড়িতে থাকব। শেষ পর্যন্ত মাকড়া কোনো ঝামেলা-টামেলায় না ফেলে দেয়। আগে-ভাগে ওর সম্বন্ধে জানা থাকলে শালা কোনো কাঁচাকলে ফেলতে পারবে না। বললাম, 'অনেকদিন এখানে আছেন?'

'তা স্যার সাত আট বছর হবে।'

'ম্যারেড?'

'আজ্ঞে। বিয়েটা স্যার ছেলেবেলাতেই সেরে ফেলেছি।'

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে চোখ কুঁচকে বললাম, 'কত বয়সে? দশ বারতে?'

লাজুক ছুঁড়িব মতো জিভ কাটল নদেরচাঁদ। তারপর ঘাড় গুঁজে গুজগুজ করে একটু হাসল। হাসতে হাসতেই বলল, 'না স্যার, আঠারতে বিয়ে করেছি। মানে ঠকুরদা বেঁচে ছিল কিনা, আহ্লাদ করে নাতির বিয়েটা দিয়ে গেছে।'

'মা ষষ্ঠীর কৃপা টৃপা হয়েছে?'

'তা স্যার একটু বেশিই হয়েছে।'

'যেমন?'

'আমার মিসেস মোট বার বার গর্ভ ধারণ করেছিল।'

আমি প্রায় আঁতকেই উঠলাম, 'বলেন কি।'

নদেরচাঁদ আমার দিকে তাকিয়ে তার ট্যারাবাঁকা দাঁত বার করে একটু হাসল। তারপর ভরসা দেবার মতো করে বলল, 'ভয় পাবেন না স্যার, আমার ওয়াইফ বার বার প্রেগনান্ট হলেও বারটা বাচ্চাই বেঁচে নাই। চার বার অ্যাবরসান হয়েছে, তিনটে বাচ্চা রিকেটে মরেছে, একটা মরেছে দুধের অভাবে। বাকি চারটে অবশ্য বেঁচে আছে।' একটু থেমে আবার বলল, 'তবে একটা ব্যাপারে আপনাকে নিশ্চিন্ত করতে পারি।'

লোকটার সঙ্গে কথা বলে মজা লাগছিল। কিছুটা কৌতূহলও হচ্ছিল। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী ব্যাপারে?'

'ওয়াইফকে ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর বাবুদের কাছ থেকে কাটিয়ে কুটিয়ে এনেছি। আর শালী

ছেলেপুলের জন্ম দিতে পারবে না।'

এবার আমি বললাম, 'কী করেন আপনি? মানে কাজকর্মের কথা বলছি—'

'ধার।'

'ধার মানে!'

'ধার মানে ধার। চেনা-অচেনা, কাবলেওয়ালা, রিক্সাওয়ালা, ভুজাওয়ালা ভাজাওলা, বাঙালি, মাড়োয়ারি, সিন্ধি, পার্শি, শত্রু-মিত্র—আমার স্যার পার্সিয়ালিটি নেই। যাকেই হাতের সামনে পাই তার কাছেই হাত পাতি। ধার করাটাই আমার হোল টাইম প্রফেশান।'

আমি যে আমি—পিটার স্বয়ম্ভু হোড়, একজন থার্ড ক্লাস চীট—নদেরচাঁদ আমার মাথায় পর্যন্ত চক্কর লাগিয়ে দিয়েছে। এবার বেশ ভক্তিভরে লোকটাকে দেখতে দেখতে বললাম, 'ধার ছাড়া আর কিছু করেন না?'

'করতাম স্যার। একটা ফ্যাক্টরিতে লেজার-কিপার ছিলাম। দু'বছর হল ফ্যাক্টরিটা দরজায় তালা ঝুলিয়েছে। তার ফল হয়েছে এই, আমার চাকরিটা 'নট' হয়ে গেছে। চাকরি তো গেছেই। কোম্পানি প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকাটাও হজম করে দিয়েছে।'

'তারপর?'

'তারপর আর কি। মাস কয়েক চাকরির জন্যে দরজায় দরজায় ঢুঁ মেরে বেড়ালাম। যেখানেই যাই সেখানেই 'নো ভ্যাকান্সি'র বোর্ড ঝোলানো রয়েছে। মিডল ক্লাস ফ্যামিলির ছেলে, সোজাসুজি ভিক্ষে তো করতেপারি না। কনফার্মড ভিখিরি না হয়ে ভিক্ষেটা অন্যভাবে করতে লাগলাম। মানে ভদ্রলোকের ভাষায় ধার করি আর কি। তবে—'

'তবে কী?'

'একবার কারো কাছ থেকে কিছু নিলে সেটা আর ফেরত দিই না। কোত্থেকে দেব বলুন—'

পাঁচ মিনিটও হয় নি নদেরচাঁদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। কিন্তু এরই মধ্যে মাকড়া তার লাইফ হিস্ট্রির প্রায় পুরোটাই শুনিয়ে দিয়েছে। লোকটার কোনোরকম ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় নেই, তার সবটাই সরল অকপট স্বীকারোক্তি। নদের চাঁদকে আমার মোটামুটি খারাপ লাগছে না।

কথায় কথায় দু'জনে আমাদের ঘরের কাছাকাছি চলে এসেছিলাম। নদের চাঁদ তার গলাটা কোমল নিখাদে নামিয়ে ডাকল, 'স্যার—'

ডাকটার মধ্যে এমন কিছু ছিল যাতে আমার নার্ভগুলো হঠাৎ টান-টান হয়ে গেল। কিসের একটা সিগন্যাল পেয়ে গেলাম যেন। ঘাড় ফিরিয়ে বললাম, 'কিছু বলবেন?'

হাত কচলে নদেরচাঁদ বলল, 'আপনি একটা গ্রেট সোল—মহাপুরুষ লোক। সুমনার মাকে আপনি বাঁচিয়েছেন। খবরটা যখন শুনলাম তখনই ভেবেছি স্যারের কাছে হাত পাতব। আর এটাও জানি, স্যার আমাকে কিছুতেই ফেরাবেন না। স্যারের মনটা বাটারের মতো সফট্ কিনা—'

চোখ নাচিয়ে বললাম, 'কিরকম দরকার?'

'আপাতত টোয়েন্টি, না-না—' এই পর্যন্ত বলে নদেরচাঁদ হঠাৎ একটু থামল। মনে মনে কি ভেবে বিড়বিড় করে কিসের হিসেব কষে নিল। তারপর বলল,'স্যার আপনি থার্টিই দেবেন।'

'ঠিক আছে—' আমি সঙ্গে সঙ্গে সায় দিলাম।

নদেরচাঁদ এবার বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার, থ্যাঙ্ক ইউ।' একটু থেমে আবার বলল, 'এই লোন নেবার ব্যাপারে আরেকটা কথা বলব স্যার।'

'কী কথা?'

'এ ব্যাপারে আমার একটা প্রিন্সিপ্যাল আছে।'

'সেটা কেমন?'

'যার কাছ থেকে একবার লোন নিই ছ'মাসের মধ্যে তার কাছে আর হাত পাতি না। মানে বার বার একজনের কাছে হাত পাতলে ট্যাক্সেসান হয় কিনা। একজনকে অত প্রেসার দিতে নেই।'

শালার টেরিফিক বিবেচনা! আমি মুগ্ধ চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। লোনের ব্যাপারটা একটা ফিলজফির স্টেজে নিয়ে গেছে মাকড়া।

নদেরচাঁদ আবার বলল, 'একজনের ওপর চাপ না দিয়ে অনেকের ওপর প্রেসারটা ছড়িয়ে দিলে কারোরই গায়ে লাগে না—না কি বলেন স্যার?'

মোহিত হয়ে বললাম, 'তা তো বটেই, তা তো বটেই।'

আমরা ঘরের ভেতর চলে এসেছিলাম। এর মধ্যে বোদার ঘুম ভেঙে গেছে। তবে ঘুমের জেরটা এখনও কাটে নি। তুড়ি দিয়ে দিয়ে সে হাই তুলছিল।

নদেরচাঁদ বলল, 'আপনাদের মতো লোকেরা আছে বলেই আমি ছেলেপুলে নিয়ে কোনোরকমে বেঁচে আছি। আমার চাকরি-বাকরি নেই। তাই বলে না খেয়ে তো মরতে পারি না। আবার ফ্যামিলিসুদ্ধু সুইসাইডও করতে পারি না। দেশের লোকেরই তো আমাদের দেখা দরকার, না কি বলেন স্যার?'

'হাজার বার।' বলেই বোদার দিকে ফিরলাম। বললাম, আমার অ্যাটাচি থেকে তিরিশটা টাকা বার করে একে দে।'

নতুন একটা হাই তুলতে গিয়ে থমকে গেল বোদা। চোখ কুঁচকে নদেরচাঁদকে ঝট করে একপলক দেখে নিয়ে আমার দিকে তাকাল। বলল, 'টাকা দিতে বলছ!'

'ইয়েস।' আমি ঘাড় কাত করলাম।

ব্যাপারটা খুব একটা পছন্দ হয় নি বোদার। আড়ে আড়ে আমাকে আর নদেরচাঁদকে দেখতে দেখতে টাকা বার করল সে। নদেরচাঁদের হাতে নোটগুলো দিয়ে নিজের বিছানায় গিয়ে শিবলিঙ্গের মতো খাড়া হয়ে বসে রইল।

আমি নদেরচাঁদের দিকে ফিরে বললাম, 'ছ'মাসের জন্যে তা হলে আপনার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হলাম তো?'

'নিশ্চয়ই স্যার। আমার কথায় আর কাজে তফাত পাবেন না। ওয়ার্ড অফ অনার। আচ্ছা স্যার, অনেক ধন্যবাদ। এবার তা হলে যাই—'

'হ্যাঁ, আসুন—'

নদেরচাঁদ চলে গেলে বোদা বলল, 'এই মালটা কে গুরু?'

বললাম, 'জনগণের একজন।'

'একে পেলে কোথায়?'

'এই বাড়িতেই থাকে। মুখ ধুয়ে ফিরছি, আলাপ হল।'

'শালা চোখাচোখি হবার সঙ্গে সঙ্গে তোমার তিরিশটা টাকা খসিয়ে দিল!'

'ধুস, আমার টাকা বলছিস কেন? জনগণের টাকা জনগণ নিয়ে যাচ্ছে।'

বোদা আবার কী বলতে যাচ্ছিল, দরজার কাছে খুক খুক করে একটু কাশি শোনা গেল। চোখ ফেরাতেই বোতলের মতো লম্বাটে একটা মুখ দেখতে পেলাম। ভাল করে লক্ষ করতে চোখে পড়ল, লোকটার বয়স পঞ্চাশ বাহান্নর মতো। পাকানো হাড়-বার-করা চেহারা, গায়ের চামড়া কোঁচকানো, মুখে ছ'সাত দিনের দাড়ি পেখম মেলে আছে। পরনে আধময়লা ধুতি আর হাফ শার্ট।

লোকটা হাত জোড় করে বলল, 'দাদা আসতে পারি?'

বললাম, 'নিশ্চয়ই পারেন।'

লোকটা দাঁড়কাকের মতো লম্বা লম্বা পা বার করে সুড়ুৎ করে ঘরের ভেতরে চলে এল। আরেক দফা হাতজোড় করে বলল, 'একটু বসব দাদা—'

'নিশ্চয়ই বসবেন—'

আমার বিছানার একধারে হাত-পা গুটিয়ে বসতে বসতে লোকটা এবার বলল, 'আমার নাম পঞ্চানন সাহা। এ বাড়িতেই ফ্যামিলি নিয়ে থাকি।'

বললাম, 'আচ্ছা। তা আমার কাছে কিছু দরকার আছে?'

এবার হাত কচলাতে কচলাতে পঞ্চানন বলল, 'তা একটু আছে। আপনি নতুন লোক, তাই আলাপ-টালাপ করতে এলাম। তাছাড়া—'

'তা ছাড়া কী, সেটাই বলে ফেলুন।'

লোকটার বেশ শ্লেষ্মার ধাত। বারকতক কেশে গলা-টলা ঝেড়ে নিয়ে পঞ্চানন বলল, 'আপনি শুনেছি গরিবের মা বাপ—'

তার কথা শেষ হতে না হতেই আমার নার্ভগুলো মুহূর্তে টান টান হয়ে গেল। ওদিকে বোদার ভুরুও অ্যালজেব্রা-এরিথমেটিকের সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মতো বেঁকে গেছে। আস্তে আস্তে বললাম, 'আপনাকে এ খবরটা কে দিল?'

'সবাই বলাবলি করছে।'

'কিরকম?'

'আপনি সুমনার মাকে বাঁচিয়েছেন। তাছাড়া নদেরচাঁদকে লোন দিয়েছেন। হেঁ-হেঁ—' হাত কচলানোটা বেড়েই যেতে লাগল পঞ্চাননের।

সুমনাদের ব্যাপারটা দু'দিন আগেকার। সেটা জানাজানি হতেই পারে। কিন্তু নদেরচাঁদ মাইতি এই তো সবে আমার ঘর থেকে টাকা নিয়ে গেল। এখনও পাঁচ মিনিট হয় নি এর মধ্যেই খবরটা হাওয়ায় হাওয়ায় ছড়িয়ে গেছে! আর শোনামাত্র পঞ্চানন মাকড়া এসে আমার ঘরে বড়ি ফেলে দিল!

বোদা ওধার থেকে বলে উঠল, 'সুমনার মাকে বাঁচিয়েছে, নদেরচাঁদকে লোন দিয়েছে—কথাগুলো ঠিক। তা তোমার মতলবখানা কী? গলাটা ঝেড়ে বলে ফেল দিকি মাইরি—'

'মানে ব্যাপারটা হল—' বারকতক ঢোক গিলে পঞ্চানন বলতে লাগল, 'আজ শনিবার—'

'শনিবার, তাতে কী?'

'রেসের দিন না? অথচ হাতে একটা পয়সা নেই। দশটা টাকা যদি পাওয়া যেত একবার লাকটা ট্রাই করে দেখতাম।'

বোদা আর পঞ্চাননের কথার ফাঁকে আমি নাক ঢুকিয়ে দিলাম, 'আপনি কী করেন?'

পঞ্চানন আমার দিকে ফিরে খানিকটা ঘাড় কাত করে বলল, 'আজ্ঞে জুয়া খেলে থাকি।'

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে জিজ্ঞেস করলাম, 'এটা আপনার প্রফেসান নাকি?'

'আজ্ঞে—' মাথাখানা আরো আধ মিটার হেলিয়ে দিল পঞ্চানন।

'হোল টাইম প্রফেসান?'

'আজ্ঞে—'

সুমনাদের এই ব্যারাকবাড়িতে আসার পর দু'টি লোকের সঙ্গে আলাপ হল। একজন নদেরচাঁদ, আর একজন এই পঞ্চানন। একজনের প্রফেসান ধার করা, আরেকজনের জুয়া খেলা। ফার্স্ট ক্লাস। শালা একেবারে আমার আইডিয়াল মানে আদর্শ জায়গায় এসে পড়েছি। বললাম, 'কী ধরনের জুয়া আপনি খেলেন?'

'রেস, সাট্টা, মাটকা, রামি, ফ্লাশ—মানে যখন যেটায় সুবিধা হয়। এ-ব্যাপারে আমার কোনোরকম পক্ষপাতিত্ব নেই।'

'ম্যারেড?'

'আজ্ঞে, ওটা অনেক আগেই সমাধা করে ফেলেছি।'

'ছেলেপুলে?'

'দু'টি।'

নাঃ, লোকটা বেশ বিবেচক দেখা যাচ্ছে। এবং দেশপ্রেমিকও। জনবল বাড়িয়ে কান্ট্রির খাবার-দাবারে তেমন ভাগ বসায় নি। একটু ভেবে বললাম, 'জুয়ার লাইনে এলেন কী করে?'

পঞ্চানন বলতে লাগল, 'আচমকা—'

'মানে?'

'মানে বছর তিন চারেক আগেও আমি চাকরি-বাকরি করতাম। ডালহৌসিতে একটা ইমপোর্ট এক্সপোর্টের কনসার্নে আমি ছিলাম মাছিমারা কেরানি। হঠাৎ কোম্পানিতে স্ট্রাইক হল আর কোম্পানিও এখান থেকে কারবার গুটিয়ে চলে গেল বোম্বাই। বুঝতেই পারছেন, আমার চাকরিটাও তাতেই গেল।' এই পর্যন্ত বলে চুপ করল পঞ্চানন। খানিকটা দম নিয়ে পরক্ষণেই আবার শুরু করে দিল, 'চাকরি গেল বলে তো আর ছেলেপুলে নিয়ে মরতে পারি না। আবার আত্মহত্যাও করতে পারি না। সুইসাইডটা আইনে আটকায়। হাজার রকম ধান্দা করতে করতে শেষ পর্যন্ত জুয়ার লাইনে চলে এলাম।'

'কিরকম হয়?'

'মন্দ না। সংসারটা কেঁদে ককিয়ে একরকম চলে যায় আর কি।'

খানিকক্ষণ চিন্তা করে বললাম, 'চললে দশ টাকার জন্য রেসের মাঠে যাওয়া আটকে যাচ্ছে?'

পঞ্চানন দাঁত বার করল। ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে বলল, 'মানে হাতে যা ছিল কাল রাত্তিরে সাট্টায় লাগিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু ক্যালকুলেসানটা ঠিক হয় নি। ক্যাপিটাল সুদ্ধু লোপাট হয়ে গেছে। এখন যদি দশটা টাকা পাই রেসকোর্সে গিয়ে আজ ভেলকি লাগিয়ে দেব।'

'অল রাইট—' বলেই বোদার দিকে ফিরে চোখের ইশারায় অ্যাটাচি কেস থেকে টাকা বার করে পঞ্চাননকে দিতে বললাম।

কিলোখানেক কুইনিন গেলার মতো মুখ করে বোদা দশটা টাকা পঞ্চাননকে দিল।

টাকাটা পেয়েই স্প্রিং-দেওয়া পুতুলের মতো লাফিয়ে উঠে পড়ল পঞ্চানন। হাতজোড় করে বলল, 'গেল জম্মে আপনি আমার গডফাদার ছিলেন দাদা। টাকাটা পেয়ে আমার কী উপকার যে হল! আজ একটা ট্রিপল টোট নির্ঘাত লাগিয়ে দেব। আচ্ছা এখন চলি—'

'আসুন—'

পঞ্চানন দরজার কাছাকাছি যখন চলে গেছে সেই সময় হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যেতে ডাকলাম, 'শুনুন—'

পঞ্চানন থমকে দাঁড়িয়ে গেল। ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'কিছু বলবেন?'

আস্তে মাথা নাড়লাম, 'হ্যাঁ—'

পঞ্চানন আমার চোখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

আমি বলতে লাগলাম, 'এখানে সব লোকের খুব টাকার দরকার, তাই না?'

'হ্যাঁ।' মাথাটা প্রায় হাঁটুর কাছাকাছি নামিয়ে নিয়ে পঞ্চানন বলল, 'সব শালা টাকার জন্য বাইশটা করে হাত বাড়িয়ে রয়েছে। কী করবে বলুন? এখানে বেশির ভাগই বেকার। যাদের কাজকর্ম আছে তাদের যা ইনকাম তাতে ফ্যামিলি চালাতে শালা আলজিভ বেরিয়ে যাচ্ছে।'

আমি বললাম, 'আপনি কাইন্ডলি একটা কাজ করবেন?'

'একটা কেন, আপনি বললে হাজারটা কাজ করব। বলুন দাদা—'

'আজ দুপুরে আমি এই ব্যারাকবাড়ির লোকেদের নিয়ে একটা মিটিং করব। আপনি সবাইকে বলে দেবেন কাঁটায়-কাঁটায় একটার সময় সবাই যেন উঠোনে এসে জড়ো হয়—'

'ঠিক আছে, বলব স্যার। কিন্তু মিটিংটা কিসের?'

'সেটা তখনই জানতে পারবেন।'

'আমি তো একটার সময় রেসকোর্সে থাকব। তা হলে মিটিং-এ কী হল, তা যে জানতে পারব না।'

'রেসের মাঠ থেকে ফিরে জেনে নেবেন।'

'আচ্ছা দাদা, তা হলে আপনার অনুমতি নিয়ে চলি—'

'আসুন—'

'আশীর্বাদ করুন ট্রিপল টোটটা যেন আজ লাগাতে পারি।'

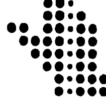
আশীর্বাদ করলাম। মুনিঋষিরা যেভাবে বর-টর দেয়, হাত বাড়িয়ে আমি পিটার স্বয়ম্ভু হোড়, একটা থার্ড ক্লাশ চীট, একটা ফোর-টুয়েন্টি পঞ্চাননকে সত্যি সত্যি বর দিয়ে ফেললাম।

পঞ্চানন আর দাঁড়াল না, জেট ইঞ্জিনের গতিতে হুস করে বেরিয়ে গেল। রেসের মাঠ থেকে

ঘোড়াগুলো গ্যালপ তুলে দৌড়তে দৌড়তে তাকে যেন ডাকছিল।

বোদা এতক্ষণ মুখে ছিপি আটকে বসে ছিল। এবার বলল, 'তোমার ধান্দাটা কী গুরু? মাকড়াদের টাকা দিলে, আবার মিটিং করতে চাইছ! মিটিং করে কী হবে?'

বাঁ দিকের ভুরুটা অনেক উঁচুতে তুলে বললাম, 'বেলা একটা পর্যন্ত ধৈর্য ধরে থাক না মাকড়া।'



মহাশয়গণ, পঞ্চাননকে মিটিং-এর কথা বলার ঘন্টা দুয়েক বাদে শেভ-টেভ করে স্নানফান সেরে বোদা আর আমি খেতে চলে গেলাম। বি-টি রোডের কাছে পবিত্র খালসা হোটেলে তেঁতুলের চাটনি, হারা মিরচি আর কাঁচা পেঁয়াজ সহযোগে রুটি-তড়কার প্রোলেটারিয়েট লাঞ্চ ঢুকিয়ে চাকুম-চুকুম করে মৌরি চিবুতে চিবুতে আবার ব্যারাকবাড়িতে ফিরে এলাম।

উঠোনে পা দিয়েই চোখের তারা ভুরু টপকে এক হাই জাম্পে কপালে উঠে গেল। গাদা-গাদা মানুষ, বাচ্চাকাচ্চা, বুড়ো, আধবুড়ো, যুবক-যুবতী, উঠোনময় গিস গিস করছে। এই ব্যারাকবাড়িটায় তো এত লোক নেই। আমার মনে হল, এ-বাড়ির তো বটেই, চারপাশের কলোনি-টলোনি সাফ হয়ে লোক এসেছে।

এত মানুষ কেন জমা হয়েছে প্রথমটা আমার মাথায় ঢুকছিল না। ঘাড়ের পাশ থেকে বোদা বগবগিয়ে উঠল, 'কী ব্যাপার গুরু, এত সব মাল এখানে জুটেছে কেন?'

'বুঝতে পারছি না।'

এত লোক একসঙ্গে জড়ো হলে যা হয়—হইচই হল্লা, তাই হচ্ছিল। চিৎকার-চেঁচামেচিতে উঠোনের মাঝখানের সেই রেন-ট্রিটায় কাকচিল আর বসতে পারছিল না। [illegible]ও গলায় রক্ত তুলে চেঁচাতে চেঁচাতে গাছটার মাথায় সমানে চক্কর দিয়ে যাচ্ছিল।

চেঁচামেচি করতে করতে আচমকা দু-একজনের চোখ পড়ল আমার ওপর। তারপর একে একে সবার চোখগুলো ধাঁ-ধাঁ করে আমার দিকে ঘুরতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে হল্লাটল্লা থেমে গেল।

আমার কী করা উচিত যখন ঠিক করে উঠতে পারছি না সেইসময় ভিড়ের ভেতর থেকে একটা গলা শোনা গেল, 'দাদা এসে গেছে, দাদা এসে গেছে—'

গলাটা চেনা-চেনা। ডানদিকে ঘাড় ফেরাতেই দেখতে পোলাম শ'খানেক লোক চাপ বেঁধে বসে আছে। তাদের ভেতর থেকে বোতলের মতো মুন্ডুটা তুলে পঞ্চানন সটান উঠে দাঁড়াল। বলল, 'একটু দাঁড়ান দাদা, আমি আসছি—'বলেই ভিড়ের মধ্যে দিয়ে বকের মতো লম্বা লম্বা ঠ্যাং ফেলে সে আমার সামনে এসে দাঁড়াল।

একটু অবাকই হয়ে গিয়েছিলাম। মহাশয়গণ, পঞ্চানন নামের এই মাকড়াটির এখন রেসের মাঠে থাকার কথা ছিল। ঘোড়ার গ্যালপের সঙ্গে চিৎকার করে এতক্ষণে তার গলার নলী হয়ত ছিঁড়েই যেত। তার বদলে শালা আগরপাড়ায় এই ব্যারাকবাড়িতেই ঘাঁটি গেঁড়ে বসে আছে। বললাম, 'এ কি, আপনি রেসকোর্সে যান নি!'

'না দাদা। পুজো-টুজোর মতো নিষ্ঠার সঙ্গে আমি ফি শনিবার রেসের মাঠে গিয়ে থাকি। লাস্ট থ্রি ইয়ার্সে আজই প্রথম অনিয়মটা করলাম।' বলে এক কান থেকে আরেক কান পর্যন্ত গোটা মুখে যেন ফ্ল্যাশ লাইট জ্বেলে হেসে উঠল পঞ্চানন।

'হঠাৎ এই অনিয়মটা করলেন যে?'

'আপনার জন্যে দাদা।'

'মানে?'

'আপনি মিটিং-এর কথা বললেন কিনা। তাই—'

'তাই কী?'

'তাই মিটিংটা অর্গানাইজ করে ফেললাম। আমাদের এই ব্যারাকবাড়িটা তো আছেই। চারপাশের যত কলোনি-ফলোনি রয়েছে, সব জায়গায় টুঁ মেরে ঝেঁটিয়ে লোক নিয়ে এসেছি। ওদের বলেছি, শালারা দাতাকর্ণর নাম শুনেছিস? চোখে দেখতে হলে আমার সঙ্গে চল। হেঁ হেঁ দাদা, আপনি আহ্লাদ করে একটা মিটিং-এর কথা বললেন, আর তাতে খুঁত থেকে যাবে, আমি থাকতে সেটি হবে না।'

মহাশয়গণ, এই মাকড়া পঞ্চানন দেখছি আমাকে ফাঁসিয়েই ছাড়বে। কিন্তু আমি পিটার স্বয়ম্ভু হোড়, একজন থার্ড ক্লাস চীট, একটা ফোরটুয়েন্টি, এত সহজে কি ঘাড়-ফাড় ভেঙে কাত হয়ে পড়ি! আপনারা তো জানেনই আমার নার্ভগুলো দারুণ স্ট্রং। চোখ কুঁচকে আড়ে-আড়ে আমি পঞ্চাননের দিকে তাকাতে লাগলাম।

পঞ্চানন বলতে লাগল, 'সারা বছর ফি শনিবার কলকাতায় আর ফি রবিবার টালিগঞ্জে রেস রয়েছে। চিরকাল থাকবেও। কিন্তু এই মিটিংটা তো রোজ রোজ হবে না। তাই আমি আজ রেসের মাঠে অ্যাবসেন্টই থেকে গেলাম দাদা। স্রেফ আপনার অনারে। হেঁ-হেঁ—' পঞ্চানন তার মুখময় কাঁচাপাকা দাড়িতে পেখম মেলে হাসতে লাগল। সেই সঙ্গে দারুণ বিগলিত একখানা পোজ মেরে সমানে হাত কচলে যাচ্ছে।

পঞ্চাননের বোতলের মতো লম্বা ভাঙা গালটা আদর করে টিপে দিতে দিতে বললাম, 'আমার জন্যে এতদিনের নিয়মভঙ্গ করে শনিবার ব্যারবাড়িতে থেকে গেলি। আর জন্মে তুই আমার কী ছিলি রে পেঁচো?' স্ট্রেট এক লাফে পঞ্চাননকে আপনি থেকে তুইতে নামিয়ে নিয়ে এলাম।

পঞ্চাননও হড়-বড় করে খানিকটা নামল। তবে তুই-তোকারিতে নয়, তুমি-টুমি শুরু করে দিল। সে বলল, 'তোমার মা'র পেটের ভাই ছিলাম।'

পঞ্চাননের ভাঙাচোড়া গজালের মতো হাড়-বার-করা গলাটা আরেক বার টিপে দিয়ে বললাম, 'শালা মাকড়া—'

পঞ্চানন এবার বলল, 'দাদা সবাই এসে গেছে। মিটিংটা কি এখনই আরম্ভ করবে?'

কবজি উল্টে ঘড়িটা দেখে নিয়ে বললাম, 'এখন সোয়া বারোটা। একটার সময় তোকে মিটিং-এর কথা বলেছিলাম। আচ্ছা ঠিক আছে, ঝামেলাটা এখনই চুকিয়ে ফেলি। এক কাজ কর পেঁচো—'

'কী?'

'চেয়ার টেবিল মালা আর মাইক যোগাড় করে আন—'

'এ সব দিয়ে কি হবে দাদা?'

'এ সব ছাড়া মিটিং-টিটিং হয় নাকি? মনুমেন্টের তলায় লিডারদের বক্তৃতা-টক্তৃতা করতে দেখিস নি? আমার আবার কোনো কাজে খুঁত থেকে গেলে মেজাজ গড়বড় হয়ে যায়। যেটি করব সেটি এক্কেবারে পারফেক্ট হওয়া চাই।' আমি গোটা মুখের মানচিত্রখানা আলো করে হাসলাম।

পঞ্চাননের বোতলের মতো মুখটা আরো খানিকটা লম্বা হয়ে গেল। কাঁচুমাচু ভঙ্গি করে ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে সে বলল, 'চেয়ার টেবিল এক্ষুণি যোগাড় করছি। কিন্তু মাইক আর মালা—মানে বুঝলে কিনা দাদা, আমরা শালা টেরিফিক গরিব, ক্যাশ-ট্যাশ তো নেই।'

'তা হবে না। মাইক আর মালাও চাই। বক্তৃতা দেব আর লিডার ফিডারের মতো আমাকে দেখাবে না, সেটি চলবে না। আয় আমার সঙ্গে—'

'কোথায়?'

'আয় না—'

পঞ্চাননকে নিয়ে আমাদের সেই ঘরটায় চলে এলাম। বোদাও আমার সঙ্গে সঙ্গে এল। গায়ের জামাটা খুলে দড়িতে ঝুলিয়ে রাখতে রাখতে বোদাকে বললাম, 'অ্যাটাচি থেকে পঞ্চাশটা টাকা বার করে পেঁচোকে দে—'

চুপচাপ পঞ্চাননকে টাকাটা বার করে দিল বোদা।

এবার পঞ্চাননের দিকে ফিরে বললাম, 'মাইক আর মালার অ্যারেঞ্জমেন্ট করে ফ্যাল—'

পঞ্চানন আর একটি সেকেন্ডও দাঁড়াল না, সট করে দরজার বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি মেঝেতে-পাতা পার্মানেন্ট বিছানাটায় গা এলিয়ে দিয়ে বলতে লাগলাম, 'মালা থাকবে না, মাইক থাকবে না, অথচ সভা-টভা হবে, এর কোনো মানে হয়?'

বোদা উত্তর দিল না। আমার কথা তার কানে ঢুকেছে বলে মনে হল না। মুখটা নিরাসক্ত দার্শনিকের মতো করে সে আমার পাশে এসে শুয়ে পড়ল। তারপর দুটো হাত আড়াআড়ি চোখের ওপর রেখে আলো আড়াল দিয়ে ঘুমোতে চেষ্টা করল।

মাকড়ার ভাবগতিক দেখে বুঝতে পারছি, এত টাকাপয়সা খরচ করাটা সে খুব একটা পছন্দ করছে না। যাই হোক, আমি আর কিছু বললাম না। যতক্ষণ না মিটিং-এর পারফেক্ট বন্দোবস্ত হচ্ছে, একটু রেস্ট নেওয়া যাক।

শুয়ে থাকতে থাকতে চোখ বুজে আসছিল। আচমকা দরজার কাছ থেকে পঞ্চানন ডেকে উঠল, 'দাদা, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?'

আস্তে আস্তে উঠে বসলাম। বললাম, 'না, ঘুমোতে আর দিলি কোথায়? ঘুমটা সবে আসছিল, তুই তো ব্রেক কষে দিলি। তারপর সব যোগাড় ফোগাড় হয়েছে?'

'তুমি একটা দায়িত্ব দিলে মাইরি আর সেটা না করে কি পেঁচো মাকড়া এমনি এমনি ফিরে এসে বদন দেখাবে? তেমন বাপ-মা তাকে জন্ম দ্যায় নি। এভিরিথিং তোমার জন্যে রেডি করে এসেছি। এখন তুমি গেলেই মিটিংটা শুরু হয়ে যায়।'

'তোর মতো এমন কাজের লোক হোল লাইফে আর দেখি নি পেঁচো। তোকে না একটা চুমু খেতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু শালা তোর গালে আলপিনের মতো খাড়া দাড়ি। চুমু খেলে আমার গালে প্ল্যাস্টিক সার্জারি করতে হবে। নে নে, চল—'

বাইরে বেরিয়ে দেখি পঞ্চানন সত্যি সত্যিই ব্রিগ্রেড প্যারেড গ্রাউন্ড কি মনুমেন্টের তলায় পিপলস লিডারদের মিটিং-এর জন্য যেরকম ডায়াস-টায়াস সাজানো হয়, রঙিন শাড়ি-ফাড়ি দিয়ে সেইরকম একটা মঞ্চ বানিয়ে ফেলেছে। চেয়ার টেবিল তো আছেই, পাশে একটা মাইকও মজুদ রয়েছে। টেবিলের ওপর টাটকা যুঁইফুলের বেশ মোটাসোটা একটা মালাও দেখতে পেলাম।

আমি গিয়ে চেয়ারে বসতেই পঞ্চানন মাইকের সামনে গিয়ে বলতে শুরু করল, 'ভাই সব, আর বোনেরা আর কাচ্চাবাচ্চারা, তোমাদের বলেছিলাম দাতাকর্ণ দেখাব। দ্যাখ শালারা, ভাল করে দ্যাখ। দেখে চোখ সার্থক কর, জন্ম সার্থক কর।' বলেই ঘাড়টা মিটারখানেক হেলিয়ে হাসি-হাসি চোখ করে আমার দিকে তাকাল। তারপরেই আবার মাইকে মুখটা সেট করে চেঁচিয়ে উঠল, 'তালি লাগাও, তালি লাগাও—'

চারদিক থেকে চটর-পটর করে হাততালির আওয়াজ উঠল।

আওয়াজটা একটু কমলে পঞ্চানন আমার কানের কাছে মুখটা এনে গুজগুজিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'দাদা, তোমার নামট যেন কী?'

'কেন? নাম দিয়ে কী হবে?' আমি পাল্টা প্রশ্ন করলাম।

'দরকার আছে, বল না—'

. 'পিটার স্বয়ম্ভু হোড়।'

পঞ্চানন হকচকিয়ে গেল। বোঝাই যাচ্ছে এরকম নাম বাপের জন্মে সে শোনে নি। চোখমুখ কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, 'কী বললে?'

নামটা আরেক বার বলতে হল।

সন্দিগ্ধ চোখে কয়েক পলক আমাকে দেখে পঞ্চানন মাকড়া আবার মাইকের কাছে ফিরে গেল। গলা চড়িয়ে বলতে লাগল, 'ভাইবোন এবং আন্ডাবাচ্চারা, আমি তোমাদের একটা নাম বলব। নামটা বলা হলেই তোমরা বলে উঠবে জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। ঠিক আছে?'

জনতা চেঁচিয়ে উঠল, 'ঠিক আছে।'

পঞ্চানন এবার ওপর দিকে হাত ছুঁড়ে বলল, 'দাতাকর্ণ পিটার স্বয়ম্ভু হোড়—'

'জিন্দাবাদ। জিন্দাবাদ।'

বারকয়েক জয়ধ্বনির পর পঞ্চানন ভিড়ের ভেতর থেকে সাদা ফ্রক আর ইজের-পরাএকটা ছোট মেয়েকে ডাকল। মেয়েটার হাতে চন্দনের বাটি। পঞ্চানন তাকে বলল, 'দাদাকে মালা-চন্দন পরিয়ে দে—'

মেয়েটা আমার কপালে চন্দনের ফোঁটা লাগিয়ে গলায় টেবিলের সেই মালাটা গলিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে চটর-পটর করে আবার হাততালির শব্দ উঠল।

এবার পঞ্চানন ভিড়ের ভেতর থেকে আরেকটা মেয়েকে ডেকে নিয়ে এল। এই মেয়েটা বয়সে একটু বড়, এই তের চোদ্দর মতো হবে। পরনে ঘরে-কাচা-নীল পাড় শাড়ি এবং সাদা

ব্লউজ। তার পেছন পেছন ঢ্যাঙা ত্রিভঙ্গ চেহারার একটা লোক কাঁধে চাপিয়ে রিড-ভাঙা হারমোনিয়াম নিয়ে এসেছে। পঞ্চানন তাদের বলল, 'এবার তা হলে উদ্বোধন সঙ্গীতটা হয়ে যাক।'

মাকড়া দেখা যাচ্ছে অনুষ্ঠানে কোনরকম ত্রুটি রাখে নি। পুরোদস্তুর একটা মিটিং করতে হলে যা-যা দরকার সমস্ত ব্যবস্থা করেছে। শালার কাজে একটুও ফাঁক নেই।

মেয়েটা কাঁপা গলায় মাইকের কাছে গিয়ে গাইল, 'আমাদের যাত্রা হল শুরু—' সেই ঢ্যাঙা ত্রিভঙ্গ লোকটা হারমোনিয়াম বাজিয়ে চলল। বাজনাটা গানের সঙ্গে টেরিফিক ব্যাগরবাই করে যেতে লাগল। কেননা হারমোনিয়ামের বেলো ফেঁসেই আছে। তার ভেতর দিয়ে বাজনার প্রায় সবটা শব্দই ভসভসিয়ে বেরিয়ে গেল।

উদ্বোধন সঙ্গীতের পর বিগলিত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে ঘাড়-টাড় হেলিয়ে পঞ্চানন বলল, 'এস দাদা, সভার কাজ শুরু করে দাও—'

অগত্যা আমাকে উঠতেই হল। গলায় ফুলের মালাটা ঝুলছেই। পঞ্চানন সব ব্যবস্থাই নিখুঁত করেছে। শুধু ফোটোগ্রাফার যোগাড় করতে পারে নি। কথাটা আগে আমার মনে পড়ে নি, পড়লে আরো ক'টা টাকা দিয়ে দিতাম। যাক গে, যা হবার তা হয়েই গেছে। এখন ফোটোগ্রাফারের কথা বললে হয়ত পঞ্চানন জুটিয়ে আনবে কিন্তু তার জন্য ঘন্টাখানেক বসে থাকতে হবে। নাঃ, গলায় মালা ঝুলিয়ে অতক্ষণ বসে থাকার মানে হয় না। পরে যদি আবার আমাকে মিটিং টিটিং করতে হয় তখন দেখা যাবে।

হে-হে মহাশয়গণ, আমি পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে মাইকটা ধরে দাঁড়ালাম। আমার সামনে কয়েক শ' মানুষ। তাদের জোড়া-জোড়া চোখ আমার ওপর ফিক্সড হয়ে আছে।

মহাশয়রা, আমাকে এখন কিরকম দেখাচ্ছে বলুন তো? পায়ের তলা থেকে চুলের ডগা পর্যন্ত একেবারে জনগণের নেতা মানে পিপলস লিডার, তাই না? আমার নিজেরও তাই মনে হচ্ছে। নিজের ভেতরে বেশ একটা এনার্জি টের পাচ্ছি। পঞ্চানন মাকড়া একদিন আমাকে জনগণের নেতা বানিয়ে ছাড়লে দেখছি।

মাইকের সামনে মুখটা সেট করে চার্চিল বা নেতাজি,বিপিন পাল বা বিসমার্ক, কে কিভাবে বক্তৃতা-টক্তৃতা করতেন ভাবতে চেষ্টা করলাম। তারপর মুখটা শুদ্ধ ভাষায় যাকে বলে 'ভারগম্ভীর' তাই করে শুরু করে দিলাম, 'ভাই আর বোনেরা, দেখা যাচ্ছে এই সভায় আমিই সভাপতি, আমিই প্রধান অতিথি, প্রধান বক্তা, উদ্বোধক, বিশেষ অতিথি, একটা মিটিং-এ যা-যা থাকা দরকার সে সবও আমিই। মানে সবগুলো পোস্টই আমি দখল করে আছি। আপনারা তো জানেনই, যে কৃষ্ণ সে-ই কালী। যে অলমাইটি গড সেই আবার ব্রহ্মা কিংবা মহেশ্বর। আমার দেখছি সেই অবস্থা। একের ভেতর আমি দশ হয়ে বসে আছি। যেভাবে আজ শুরু হল, তাতে মনে হচ্ছে একদিন আমার মধ্যে আপনারা বিশ্বরূপ দেখে ফেলবেন।

'যাক গে, ফালতু কথা ছেড়ে এবার কাজের কথায় আসা যাক। আমার নামটা পঞ্চানন আপনাদের আগেই জানিয়ে দিয়েছে। কিন্তু নামের আগে একটা অ্যাডজেক্টিভ জুড়ে দিয়েছে। আমি নাকি দাতাকর্ণ। কথাটা ও যখন আপনাদের বলছিল তখন কি টেরিফিক হাসিটাই না আমার পাচ্ছিল। ভাই আর বোনেরা আমি সত্যি বলছি, যার নামে দিব্যি কাটতে বলবেন কেটে বলব,

আমি দাতা কর্ণ-ফর্ণ কিন্তু নই। নদেরচাঁদকে ক'টা টাকা ধার দিয়েছি, পঞ্চাননকে রেসের জন্যে পয়সা দিয়েছি। সেই জন্যে ওরা ধরে নিয়েছে আমি শালা একটা টেরিফিক দানবীর। ক'টা পয়সা পেয়ে মাকড়ারা আমার চামচা হয়ে গেল নাকি?'

'যাক, যা বলছিলাম। যে টাকা ক'টা আমি ওদের দিয়েছি সেগুলো আমার টাকা নয়। সেগুলো ওদেরই টাকা। আমার কাছে নানা জিগজ্যাগ পথ ঘুরে এসেছিল। সেটা আমি ওদের ফেরত দিয়ে দিয়েছি। আপনারা নিশ্চয়ই অবাক হয়ে যাচ্ছেন তো? কিন্তু কথাটা হ্যাণ্ড্রেড পারসেন্ট সত্যি।

'ভাই আর বোনেরা, আপনাদের মানে জনগণের টাকা হোল কান্ট্রিতে ছড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে সেই সব টাকার খানিকটা খানিকটা দুম করে নানা লেন বাই-লেনের ভেতর দিয়ে আমার কাছে চলে আসে। কিভাবে আসে প্লিজ সেটা আর জিজ্ঞেস করবেন না। করলে আমি শালা হেভি ঝামেলায় পড়ে যাব। আমার প্রেসটিজ বিলকুল পাংচার হয়ে যাবে। আপনাদের সামনে আজই প্রথম এসে দঁড়ালাম। প্রথম দিনেই প্রেসটিজটার বারটা বাজানো কি ঠিক হবে?'

'ওই দেখুন আবার আজেবাজে কথা বলে যাচ্ছি। কোথায় মেইন লাইন দিয়ে ইঞ্জিন ছোটাব তা নয়, বার বার লুপ লাইনে গাড়ি নিয়ে যাচ্ছি।

'ঠিক আছে, এবার দরকারি কথাটা সেরে ফেলি। মানে যে কারণে এই মিটিং করা সেটা আপনাদের জানিয়ে দিই। পঞ্চানন আর নদেরচাঁদকে দেখে মনে হয়েছে আপনাদের সবারই টাকার দরকার।' তর্জনী আর বুড়ো আঙুল দিয়ে টাকা বাজাবার ভঙ্গি করে বললাম, 'এথী ছাড়া কার আর চলে বলুন? বাঁচতে হলে এথীর খুবই দরকার। বাপ ভালা না ভালা ভাইয়া, সবসে ভালা রুপাইয়া। হে-হে, রুপাইয়াটা হেভি ইমপর্টান্টি ব্যাপার দুনিয়ায়। বলুন না, আপনারাই বলুন, কথাটা সত্যি কিনা?'

আমার আশপাশে এবং সামনের দিকে ডজন ডজন মুখ দেখতে পাচ্ছি। তারা জিরাফের মতো গলা লম্বা করে দম আটকে বসে ছিল। এবার কোরাসে চেঁচিয়ে উঠল, 'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।'

আমি বলতে লাগলাম, 'তাই ভাবছি জনগণের মানে আপনাদের যে টাকাগুলো ঘুরে ফিরে আমার কাছে চলে আসে তা দিয়ে ক'টা ফাণ্ড খুলব। ফাণ্ডগুলোর নাম দেব 'পাবলিক বেনিফিট ফাণ্ড'। তার অনেকগুলো ব্রাঞ্চ থাকবে। যেমন ধরুন ধার নেবার ফাণ্ড, স্কুলে মাইনে দেবার ফাণ্ড, চিকিৎসা ফাণ্ড, রেশন তোলার ফাণ্ড, জুয়া খেলার ফাণ্ড, এটসেটরা এটসেটরা। আমার ঘরে টিনের কৌটোয় কৌটোয় টাকা থাকবে। কোন কৌটোয় কিসের জন্যে টাকা আছে তা লেখা থাকবে কৌটোর গায়ে। কী ব্যাপারে কত টাকা নেওয়া যাবে তাও কৌটোর গায়েই লেখা থাকবে। কৌটোগুলোর পাশে থাকবে একটা করে হিসেবের খাতা। আপনারা টাকা নিয়ে খাতায় তারিখ দিয়ে নিজের নিজের নাম লিখে রাখবেন। তবে যে একবার টাকা নেবে তিন মাসের ভেতর সে আর নিতে পারবে না। অবশ্য খুব এমার্জেন্সি হলে নেওয়া যেতে পারে। এমার্জেন্সিটা কতখানি সেটা আপনারা বিবেচনা করবেন।'

আমার ঘাড়ের কাছেই পঞ্চানন দাঁড়িয়ে ছিল। সে হঠাৎ আকাশের দিকে হাত ছুঁড়ে চিৎকার করে উঠল, 'পিটার স্বয়ম্ভু হোড়—'

উঠোনের চারদিক থেকে কয়েক শ' বউ-বাচ্চা-যুবক-যুবতী-পুরুষ-মেয়েমানুষ কোরাসে

চেঁচিয়ে উঠল, 'যুগ যুগ জীয়ে—'

পঞ্চানন আবার চেঁচাল, 'কলির দাতাকর্ণ—'

'যুগ যুগ জীয়ে—'

আমি হাত তুলে সবাইকে থামিয়ে আবার শুরু করলাম, 'এই পাবলিক বেনিফিট ফাণ্ডের ব্যাপারে আপনাদের একটা কথা মনে রাখতে হবে। এই টাকাগুলো জনগণের অর্থাৎ আপনাদেরই। আমি বা আমার পার্টনার বোদা কেউ টাকা পাহারা দেব না। টাকার কৌটোগুলো আমাদের ঘরে পর পর সাজানো থাকবে। দরকার হলে আপনারা নিয়ে যাবেন। শুধু দেখবেন কেউ যেন একবার নিয়ে বেনামে আবার নেবেন না। মানে কেউ বেশি পেল, কেউ কম পেল, এটা যেন না হয় আপনাদেরই টাকা, এর বিনিফিটটা সবাই যাতে সমান পায় সেটা আপনাদেরই দেখতে হবে। আমার আর কিছু বলার নেই। সভা এখানেই ভঙ্গ হোক। আপনারা যে দয়া করে এখানে এসেছেন সেজন্যে আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। জনগণ জিন্দাবাদ—'প্রফেসনাল রাজনৈতিক নেতাদের মতো বক্তৃতা শেষ করে বসে পড়লাম।

পঞ্চানন মাইকের সামনে গিয়ে আবার চেঁচিয়ে উঠল, 'পিটার স্বয়ম্ভু হোড়—'

জনগণও চিৎকার করে করে গলার শির ছিঁড়ল, 'যুগ যুগ জীয়ে—'

হে-হে মহাশয়গণ, মিটিং ভাঙার পর আমার নামে 'যুগ যুগ জীয়ে' এই স্লোগান দিতে দিতে জনতা যে যার আস্তানায় ফিরে গেল। সবাই চলে গেলে আমিও চেয়ার থেকে উঠে আমার ঘরের দিকে পা বাড়িয়ে দিলাম।

মহাশয়রা, এখন আমি দারুণ মেজাজে আছি। এতকাল যাদের কাছাকাছি এসেছি তারা আমাকে ধরতে পারলে চামড়া খুলে নিত। নইলে হাতে-পায়ে দড়ি পরিয়ে দেড় মাইল লম্বা প্রসেসান করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়ে আসত। এতদিনে হয়ত দেখতেন আমি প্রেমসে জেলের ভেতর ঘানি ঘুরিয়ে যাচ্ছি কিংবা নারকেল ছোবড়া পিটিয়ে পিটিয়ে দড়ি বানাচ্ছি।

কিন্তু এই লোকগুলো—ডেস্টিচিউট কলোনির হতচ্ছাড়া চেহারার কয়েক শো মানুষ আমার নামে জয়ধ্বনি দিচ্ছে। কারবারটা একবার বুঝে দেখুন মহাশয়রা। আমি হলাম একটা থার্ড ক্লাস চীট, একটা দুর্দান্ত ফোরটুয়েন্টি, আমার নামে কেউ কখনও এভাবে স্লোগান আওড়ায় নি। মহাশয়গণ, বেশ একটা নতুন টাইপের এক্সপিরিয়েন্স হয়ে গেল। এই মুহূর্তে আমার দারুণ একটা নেতা-নেতা ফিলিং হচ্ছে।

হঠাৎ সমাজপতির কথা মনে পড়ে গেল আমার। সে দিল টাকা, আর দেখুন আমি ফাঁক তালে কেমন জনগণের লিডার হয়ে বসলাম। লাক মহাশয়গণ, লাক। আমার বোধহয় জুপিটার, মার্স, স্যাটার্ন সবগুলো প্ল্যানেটই এখন তুঙ্গী। ফুটপাথে যে সব মাকড়ারা পক্ষী দ্বারা ভাগ্য পরীক্ষা করে তাদের কাছে একবার যেতে হবে। কে জানে আমার কপালে কী আছে। লাকটা একবার জেনে নেওয়া দরকার। আজ যেভাবে শুভ উদ্বোধন হল তাতেই একদিন ন্যাশনাল হিরোও তো বনে যেতে পারি।

যাক গে, বেশ ফাইন মেজাজে যখন আমার ঘরের কাছাকাছি এসে পড়েছি, চোখে পড়ল

দরজার ওপর কোমর বাঁকিয়ে টেরিফিক একখানা পোজ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বোদা। আমি যখন মিটিং করতে উঠোনে এসেছিলাম মাকড়া তখন ঘুমোচ্ছিল। তারপর কখন উঠে এসে দরজায় দাঁড়িয়েছে, টের পাই নি।

বললাম, 'ঘুম ভেঙেছে?'

বোদা মুখটা বাংলা ন-এর মতো করে বলল, 'ভাঙবে না! তুমি মাইরি মাইক লড়িয়ে পাবলিক হিরো বনছ, আর আমি ঘুমিয়ে থাকব—তাই কখনও হয়?'

'তা হলে মিটিং-এর সময় তুই এখানে দাঁড়িয়ে ছিলি?'

আমি এবার বললাম, 'বক্তৃতাটা কিরকম দিলাম বল দিকি?' বলেই ঠোঁট কামড়ে চোখ টিপলাম।

বোদা বলল, 'ফাস কেলাস। তুমি মাইরি একদিন মিনিস্টার ফিনিস্টার হয়ে যাবে। লড়ে যাও দাদা, লড়ে যাও। তবে—'

'তবে কী?'

'ঘরে চল। বলছি—'

ঘরে গিয়ে গলার মালাটা বোদার গলায় ছুঁড়ে দিয়ে বললাম, 'আমি যদি মিনিস্টার হই তোকে আমার প্রাইভেট সেক্রেটারি বানিয়ে দেব। নে, কী বলছিলি এবার বলে ফ্যাল—'

বোদা বলল, 'তুমি তো এখানকার যত শালা খচড়াদের ক্যাশ-ফ্যাশ দেবার জন্যে দেড় ডজন ফান্ড খুলে বসলে—'

'তা বসলাম। তার রেজাল্টটা কি হল দেখেছিস?'

'দেখেছি। ওরা তোমার নামে 'যুগ যুগ জীয়ে' করে স্লোগান দিল—এই তো?'

বোদার নাকে আদর করে একটা টুসকি দিলাম, 'কারেক্ট। শালা তোর ব্রেনটা দারুণ স্পার্ক মারছে তো।'

'তোমার বডিতে বডি ঠেকিয়ে আছি, স্পার্ক মারবে না?'

'শালা সাবলাইম হারামী।'

'কিন্তু গুরু সমাজপতি যে ক'টা টাকা দিয়েছে এই খচড়াদের দিয়ে এভাবে ফুঁকে দিচ্ছ!'

'তোকে তো আগেই বলেছি এ সব হচ্ছে জনগণের টাকা।'

'তা বলেছ।'

'জনগণের টাকা জনগণকে দিয়ে দিচ্ছি। এর মধ্যে অত ভাবাভাবির কী আছে?'

'কিন্তু—'

'আবার কী হল?'

'যে টাকাই আসছে সবই যদি তুমি উড়িয়ে দাও ফিউচারে কি হবে? আমি শালা আবার কনকচাঁপার চক্করে পড়ে গেছি।'

এতক্ষণে বোদার দুশ্চিন্তার কারণটা বোঝা গেল। কনকচাঁপাকে যদি সে খেলিয়ে তুলতে পারে তখন হেভি-ক্যাশের দরকার হয়ে যাবে। কাজেই টাকা পয়সা যা আসছে সেটা সে জমিয়ে রাখতে চায়। অন্য সময় হলে আমি খেপে যেতাম। বলতাম, আমার লাইফে জমানো-টমানো

বলে কোনো কারবার নেই। নো সেভিং বিজনেস। কিন্তু বোদার জন্য এই মুহূর্তে একটু মায়াই হল। বললাম, 'ঘাবড়াস না, টাকা যেমন যাচ্ছে তেমনি হুড় হুড় করে এসে যাবে। কনকচাঁপাকে তুই গেঁথে তুলে ফেল না। তারপর আমি তো আছি।'

বোদা এক কান থেকে আরেক কান পর্যন্ত ট্যারাবাঁকা মুখের ম্যাপখানা আলো করে হেসে উঠল, 'তোমার জবাব নেই গুরু—'

'বলছিস?'

'বলছি।'

'এবার একটা কাজ কর।'

'কী?'

'অ্যাটাচি কেস থেকে টাকা বার করে বারটা টিনের কৌটো, গদের শিশি আর বারটা দু নম্বর এক্সারসাইজ খাতা নিয়ে আয়।'

'এক্ষুণি?'

'ইয়েস এক্ষুণি।'

বোদা টাকা নিয়ে বেরিয়ে গেল। আর আমি বিছানায় শুয়ে পায়ের ওপর পা তুলে নাচাতে লাগলাম।

দু মিনিটও কাটল না, হঠাৎ বাইরে থেকে একটা গলা শোনা গেল, 'মে উই কাম ইন—'

যাবার সময় দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে গিয়েছিল বোদা। সেদিকে পাশ ফিরে বললাম, 'কাম ইন।'

আমার কথা শেষ হতে না হতেই দরজার পাল্লা দুটো খুলে গেল। তার ফাঁক দিয়ে তিনটি যুবক—পঁচিশ থেকে তিরিশের মধ্যে বয়স—ঘরের ভেতর ঢুকল। তাদের সবারই মুখে-ঘাড়ে-হাতে প্ল্যাস্টার আর ব্যান্ডেজ।

যুবকদের মধ্যে যে একেবারে সামনে রয়েছে সে বলে উঠল, 'আপনি নিশ্চয়ই পিটার স্বয়ম্ভু হোড়—'

'হ্যাঁ। কেন?'

'আমরা আপনাকে দেখতে এলাম।'

মজা করে বললাম, 'আমি খুব একটা দর্শনীয় মাল নাকি? আই মীন কিউরিও শপের কোনো একজিবিট না সার্কাসের ক্লাউন?'

ছোকরা তিনটে কোনো উত্তর দেবার আগে আবার বলে উঠলাম, 'আমার বয়স কত মনে হয়?'

একটি ছোকরা বলল, 'থার্টি ফোর, থার্টি ফাইভ—'

অন্য সবাই আমার বয়স সম্বন্ধে যে ভুলটা করে এরাও তাই করল। হে-হে মহাশয়গণ, আমার চেহারা এবং বয়স যে টেরিফিক ডিসেপটিভ তা তো আপনারা জানেনই। বললাম, 'তার সঙ্গে আরো দশ অ্যাড করে নাও—'

সেই ছোকরাটা বলে উঠল, 'তার মানে ফর্টি ফোর, ফর্টি ফাইভ!'

'একজ্যাক্টলি। তবে প্রুফ দিতে পারব না। কারণ আমার কাছে ব্যার্থ সার্টিফিকেট নেই। সে

যাক গে, আমার লাইফে এটা একটা রেড লেটার ডে। ফর্টি ফোর ফর্টি ফাইভ ইয়ার্সের লাইফে আজই প্রথম কেউ আমাকে দেখতে এল। তা ব্যাপারটা কী ব্রাদারেরা, আমার কাছে কিছু দরকার আছে?'

আরেকটা ছোকরা বলে উঠল, 'দরকার-টরকার কিছু নেই। কিছুক্ষণ আগে শুনলাম আমাদের এখানে একজন দাতাকর্ণ এসেছে। মিটিং ফিটিং করে পাবলিক বেনিফিট ফান্ড খুলে বসেছে। লোকটাকে দেখবার খুব ইচ্ছে হল। তাই চলে এলাম।'

'বহুত বহুত সুক্রিয়া। তা দাঁড়িয়ে কেন? বসো না—'

ছোকরাগুলো আমার বিছানার পাশেই ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে পড়ল। আর হাতের ভর দিয়ে উঠে বসতে বসতে আমার মাথার সেরিব্র্যাল পয়েন্টে আচমকা বিদ্যুৎ চমকে গেল। ছোকরাগুলোকে চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। কোথায়, কোথায় যেন এদের দেখেছি? তিনজনের মুখে চোখের তারা দুটো ফিক্সড করে বললাম, 'তোমাদের ফেসগুলো খুব চেনা লাগছে। কোথায় দেখা হয়েছিল বল তো?'

ছোকরা তিনটে ততক্ষণে মেরুদন্ড খাড়া করে ফেলেছে। বুঝতে পারছি তাদের নার্ভগুলো কষে-বাঁধা স্টিলের তারের মতো টান টান হয়ে গেছে। ওদের চোখগুলোও এখন স্থির। খুব সম্ভব আমার মুখটাও ওদের চেনা-চেনা।

মহাশয়গণ, তাকিয়ে থাকতে থাকতে এবার মনে পড়ে গেল। দেখা যাচ্ছে মেমোরিটার এখনও বারটা বেজে যায় নি। বললাম, 'সেই চায়ের দোকানে দেখা হয়েছিল না? দোকানটার সামনে সেই টোয়োটা গাড়ি, মিস্টার সমাজপতি, হিন্দি সিনেমার সেই ফাইট সিকোয়েন্স, হোল্ড আপ—হে-হে, সব মনে পড়ে গেছে।'

ছোকরা তিনটে ততক্ষণে সটাসুট উঠে দাঁড়িয়েছে।

ক্যামেরা প্যান করে নেবার মতো আমি তিনজনের মুখের ওপর দিয়ে দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে নিতে নিতে বললাম, 'তোমার নাম তো আজিজ, তুমি হলে ঝন্টে আর তুমি পন্টা, তাই তো?'

ছোকরা তিনটে উত্তর দিল না, তাদের চোখ ধক ধক করে জ্বলতে লাগল।

আমি আবার বললাম, 'তোমাদের গায়ে এই যে ব্যান্ডেজ-প্লাস্টার সেঁটে রেখেছ, এগুলো আমার জন্যে, মনে পড়ছে? মনে পড়ছে তোমাদের মুখের ম্যাপ আমিই পাল্টে দিয়েছিলাম?'

ঝট করে ঝান্টে আর পন্টা কোমরের খাঁজ থেকে দুটো দশ ইঞ্চি ড্যাগার বার করল আর আজিজ বের করল একটা রিভলবার। রিভলবারটা সেই হোল্ড-আপের দিন দেখি নি। খুব সম্ভব পরে ইমপোর্ট করা হয়েছে। মানে শুধু ড্যাগারের ওপর ডিপেন্ড করে সব কাজ যে করা যায় না, এটা ওরা সেদিন বুঝতে পেরে গিয়েছিল।

মহাশয়গণ, আপনারা তো জানেনই কোনো ব্যাপারেই আমি ঘাবড়ে যাই না, ভয় পাই না। হাত নেড়ে নেড়ে বললাম, 'ওগুলো নিয়ে বেশি নাড়াচাড়া করতে নেই; শালা টেরিফিক খচ্চর জিনিস। নাও নাও, যেখান থেকে বার করেছিলে সেখানে পুরে ফেল।'

চাপা গলায় আজিজ গর্জে উঠল, 'কী মতলব আপনার?'

'কিছু না।'

'কিছু না হলে এখানে ভিড়েছেন কেন?'

'ভেড়ার আর জায়গা পাওয়া যাচ্ছিল না, তাই। মানে এই ঘরটা ফাঁকা পড়ে ছিল, খবর পেয়ে সুড়ুৎ করে ঢুকে পড়লাম।'

'পুলিশের লোক?'

'ধুস, যেখানে পুলিশের গন্ধ আমি তার দশ মাইল রেডিয়াসের ভেতর ঢুকি না।'

'সত্যি?'

'তিন সত্যি। মা কালীর দিব্যি।'

'আমাদের কোনো ঝামেলায় ফেলবেন না?'

'ইচ্ছে করলে সেদিনই তো পারতাম। পুলিশের গাড়ি এসে পড়েছিল, ডেকে তোমাদের ধরিয়ে দেওয়া যেত।'

ছোকরারা কয়েক সেকেন্ড কী ভেবে নিল। হয়ত সেদিনের সেই ঘটনাটা। চিন্তা-ফিন্তা করে তারা বুঝল, আমি যা বলেছি তার প্রত্যেকটা অক্ষর সত্যি। হাতের কাছে পুলিশের গাড়ি ছিল। আমি বললেই তারের জালে-ঘেরা কালো গাড়িতে চড়ে ওরা সোজা লক-আপের ভেতর ঢুকে যেত। কে জানে এতদিনে কেসটা কোথায় কতদূরে গিয়ে গড়াত!

আস্তে আস্তে ছোকরাগুলোর তাকানোর ভঙ্গি সফ্‌ট হয়ে আসতে লাগল। আমার দিকে চোখ রেখেই ড্যাগার দুটো আর রিভালবারট' কোমরের কাছে চালান করে দিতে লাগল তারা। তবে কিছু বলল না।

আমি এবার বললাম, 'আমাকে তোমাদের ফ্রেন্ড মনে করতে পার।'

'ফ্রেন্ড?'

'ইয়েস ফ্রেন্ড, দোস্ত—জিগরি দোস্ত। নাও বসো। একটু গল্পটল্প করা যাক।'

ওরা আস্তে আস্তে বসে বড়ল।

আমি বলতে লাগলাম, 'তোমাদের সঙ্গে যে আবার দেখা হয়ে যাবে ভাবতে পারি নি। ওয়ার্ল্ডটা যে গোল, সেটা আরেকবার প্রুভ্‌ড হয়ে গেল।'

ঝন্টে আমার বাঁ পাশে বসে ছিল। সে বলল, 'আপনাকে কিন্তু বিশ্বাস করলাম।'

'আমাকে বিশ্বাস করা যায় কিনা বলতে পারব না। তবে কথা দিচ্ছি তোমাদের ফাঁসাব না। ওয়ার্ড অফ অনার।'

ওদের মুখচোখ দেখে মনে হল আমার কথা ওরা পুরোপুরি বিশ্বাসও করছে না, আবার অবিশ্বাসও করছে না। বিশ্বাস অবিশ্বাসের মাঝামাঝি একটা জায়গায় ঝুলে রয়েছে। মহাশয়গণ, এ ব্যাপারটা নিয়ে আমি টানাটানি করলাম না। একেবারে অন্য লাইনে চলে গেলাম, 'তারপর বল, তোমরা কোথায় থাকো?'

ঝন্টে বলল, 'আমি আর পন্টা এখানকার একটা রিফিউজি কলোনিতে থাকি। আজিজ থাকে একট দূরে, বি-টি রোডে।'

'পডাশোনা কদ্দুর?'

'সবাই সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট।'

'কোন ইয়ারের?'

'সিক্সটি সিক্সের।

'গণ টোকাটুকি শুরু হবার আগের?'

'হ্যাঁ।'

'পেটে তা হলে কিছু ভাল জিনিস আছে।'

ছেলে তিনটে হাসল। আজিজ বলল, 'আমরা তিনজনেই অনার্স নিয়ে হাই সেকেন্ড ক্লাস পেয়েছিলাম।'

বেশ একটা ইন্টারভিউ নেবার অ্যাটমস্‌ফিয়ার তৈরি করে বললাম, 'চাকরি-বাকরি কিছু করা হয়?'

'পেলাম আর কোথায়? আমাদের তো মালদার মেসো বা মামা নেই। চাকরি কোত্থেকে জুটবে? পাশ করারর পর সার্টিফিকেটখানা গলায় ঝুলিয়ে ছ' বছর অফিসে অফিসে ঘুরেছি, এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে গেছি, ঘুরতে ঘুরতে শালা গোড়ালি ক্ষয়ে গেছে। কোথাও কিছু না পেয়ে শেষ পর্যন্ত—'

আজিজের কথা শেষ হবার আগেই বাকিটা পূরণ করে দিলাম, 'হোল্ড-আপের লাইনে মানে স্ট্রিট রবারিতে চলে গেলে—এই তো?'

অজিজ ঘাড় কাত করে, 'রাইট।'

মহাশয়গণ, এ লাইনটা আমার কাছে একেবারে নতুন। ব্যাঙ্ক রবারি, হোল্ড-আপ, স্ট্রিট রবারি, এসব সম্বন্ধে শুদ্ধ বাংলায় কি যেন বলে, ও হ্যাঁ, রোমহর্ষক ঘটনা, আমার কোনো এক্সপিরিয়েন্সই ছিল না। আপনারা তো জানেনেই আমার লাইনটা আলাদা, সেটা চিটিং-এর ব্যাপার। ওয়ার্ল্ডের কোনো বিষয়েই আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। আজিজদের সম্বন্ধে খানিকটা কৌতূহল হল। আফটার অল, এসব হল জ্ঞানের ব্যাপার। যার কাছ থেকে যেটুকু পাওয়া যায়। আসলে একটু একটু করে জ্ঞানের ঝুলিটাকে ভর্তি করে নেওয়া আর কি। জ্ঞান বাড়লে তার ডিভিডেন্ড একদিন না একদিন পাওয়া নিশ্চয়ই যাবে।

বললাম, 'এটাই এখন তোমাদের প্রফেসান?'

ঝন্টে ঘাড় হেলিয়ে দিল, 'হ্যাঁ।'

'হোল টাইম?'

'হ্যাঁ।'

'তোমাদের লাইনটা সম্বন্ধে আমার আইডিয়া নেই। বল তো দোস্তরা, বেশ ভাল করে আলোকপাত কর। ব্যাপারটা বুঝেটুঝে নিই।'

'বুঝে কী হবে? লাইনে আসবেন নাকি?'

'না। নলেজ বাড়বে। আমি অন্য ব্যাপারে স্পেশালাইজ করেছি। এই বয়েসে নতুন লাইনে যাওয়াটা ঠিক হবে না।'

পল্টা বলল, 'আমাদের লাইনে প্রথমে যেটা করতে হয় সেটা হল প্ল্যানিং। আমরা ব্যাঙ্ক রবারি বা কোনো বাড়ি-টাড়ি ঢুকে ডাকাতি ফাকাতি করি না। আমরা হাইওয়ে রবারিটাতেই

স্পেশালাইজ করেছি।' একটু থেমে সে আবার শুরু করল, 'প্রথমে আমরা করি কি, কারা কোত্থেকে হেভি ক্যাশ-ট্যাশ নিয়ে কোথায় যাচ্ছে তারা খোঁজ খবর নিই। বেশ কিছুদিন ধরে তাদের ওয়াচ করি। তাদের সঙ্গে কি ধরনের আর্মড গার্ড আছে লক্ষ করি।'

বললাম, 'গুড। তারপর?'

'তারপর কোথায় অপারেশনটা করব সেই জায়গাটা সিলেক্ট করি।'

'চালিয়ে যাও ভাই।'

'তারপর অনেক রাত্তিরে সেখানে গিয়ে দিনকয়েক অপারেশনটার রিহার্সাল দিয়ে যাই।'

'একসেলেন্ট। আগে বাড়ো—'

'তারপর অপারেশনটা করেই ফেলি।'

'এ ব্যাপারটায় রিস্ক আছে—নাকি বল?'

'টেরিফিক। যে কোনো সময় পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যেতে পারি। যারা ক্যাশ নিয়ে যায় তাদের গার্ডরা পাল্টা চার্জ করতে পারে। তাতে ডেথ পর্যন্ত হয়ে যাবার ভয় থাকে। এই তো বছর তিনেক আগে ব্যারাকপুরে একটা হোল্ড-আপ করতে গিয়ে পল্টার বাঁ পায়ে গুলি লেগেছিল।'

হেসে হেসে বললাম, 'তোমাদের প্রফেসানটা বাঘের খেলার মতোই ডেঞ্জারাস দেখছি।'

পল্টা আজিজ আর ঝন্টে একটু হাসল। আমি আবার বললাম, 'তা এতে কিরকম হয়? মানে পার ক্যাপিটা ইনকামের কথা জিজ্ঞেস করছি।'

ঝন্টে বলল, 'কিছু ঠিক নেই। আমরা ঠিক ফিক্সড ইনকাম গ্রুপে পড়ি না তো। যখন অপারেশন হয় তখন ক'টা দিন ভালই কাটে। না হ'লে চুপচাপ উইদআউট ক্যাশে সময় কাটাই। এই তো দু'মাস ধরে কোনো ইনকাম নেই।' একটু থেমে আবার বললে, 'ক'দিন আগে একটা স্ট্রিট রবারির পাক্কা অ্যারেঞ্জমেন্ট করে ফেলেছিলাম। আপনি কিচাইন করে দিলেন।'

আমি দাঁত বার করলাম অর্থাৎ হাসলাম। একটু ভেবে বললাম, 'এ[illegible] আনসার্টেন প্রফেসানে থেকে কী লাভ? ডাইভার্সিফিকেসনের কথা ভাবতে পার তো।'

'এ-লাইনে স্পেশালিস্ট হয়েছি। অন্য লাইনে ঝট করে গিয়ে ফিল্ড করা দারুণ মুশকিল।'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ালাম। বললাম, 'রাইট। আচ্ছা তোমাদের এই প্রফেসানে হোল কান্ট্রিতে কত লোক আছে?'

'সেভারেল থাউজেন্ড হবে।'

একটু চিন্তা করে বললাম, 'ভাল কথা, এখন তোমরা তো বেকার—'

পল্টা বলল, 'হান্ড্রেড পারসেন্ট।'

আমি কী উত্তর দিতে যাচ্ছিলাম, ডজনখানেক টিনের চৌকো চৌকো কৌটো, ডজনখানেক দু'নম্বর এক্সারসাইজ খাতা, আঠার শিশি ইত্যাদি ইত্যাদি নিয়ে বোদা ফিরে এল। ফিরেই আজিজদের দেখে টেরিফিক ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'উরি শালা, সেই মাকড়ারা না?' ওদের দেখেই চিনতে পেরেছে বোদা। সে প্রায় লাফ দিয়েই বেরিয়ে যাচ্ছিল। আমি তাকে থামিয়ে বললাম, 'নো ফিয়ার, এরা এখন ফ্রেন্ড—'

'ফ্রেন্ড!'

'ইয়েস ফ্রেন্ড।'

বোদা আর বাইরে গেল না। আড়ে আড়ে আজিজদের দেখতে দেখতে কৌটো-ফৌটোগুলো মেঝেতে নামিয়ে রেখে আমার পিঠের কাছে ঘন হয়ে বসল।

আমি বোদাকে বললাম, 'বসে পড়লি যে! শুভ কাজটা শুরু করে দে—'

বোদা জিজ্ঞেস করল, 'কী কাজ?'

'ফান্ডগুলো খুলতে হবে না? কৌটোর মাঝে মাঝে কাগজ কেটে গুলোর গায়ে আঠা দিয়ে সেঁটে দে।'

হাতে ভর দিয়ে আবার উঠে পড়ল বোদা। আমার শেভিং বক্স থেকে ব্লেড বার করে এক্সারসাইজ খাতার পাতা কেটে কৌটোগুলোর গায়ে গদের আঠা দিয়ে লাগিয়ে দিল। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'গুরু এবার কী করব?'

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল আমার। মহাশয়গণ, পরের পয়সায় পিপলস বেনিফিট ফান্ড খুলতে যাচ্ছি। তার ওপেনিংটা বেশ ভালভাবেই হওয়া দরকার। অনুষ্ঠানে এতটুকু ত্রুটি থেকে যাক, এটা আমি চাই না।

হে-হে মহাশয়গণ, আপনারা তো জানেনই, যে কোনো প্রদর্শনী অথবা জুতোর দোকান, ফ্লাওয়ার শো বা ডগ শো একজিবিসনের উদ্বোধনের সময় ফিতে কাটতে হয়। 'কাটিং দি টেপ' একটা দারুণ ব্যাপার! ওটা ছাড়া, শুদ্ধ ভাষায় যাকে বলে শুভ উদ্বোধন, তাতে খুঁত থেকে যায়। সুতরাং খানিকটা ফিতে আর একটা কাঁচি বোদাকে দিয়ে আনাতে হবে।

তা ছাড়া আরো একটা ব্যাপার আছে। দশ বারটা ফান্ড খুলতে যাচ্ছি। কিন্তু আমার ক্যাপিটাল বলতে সমাজপতির দেওয়া এক হাজারটা টাকা। না মহাশয়রা, কথাটা ঠিক হল না। এক হাজারের মধ্যে কিছু খরচা হয়ে গেছে। তার মানে ন'শ আর কিছু খুচরো-খাচরা পড়ে রয়েছে। সমাজপতি আমাকে একশ টাকার নোটে টাকাগুলো দিয়েছিলেন। নোটগুলো বোদাকে দিয়ে এখনই ভাঙিয়ে আনাতে হবে। এই মুহূর্তে পারহেড একশ টাকা করে ডোল দেওয়া সম্ভব না। টাকার ফ্লো বাড়লে তখন দেখা যাবে। বোদাকে বললাম, অ্যাটাচি কেস থেকে এক শ টাকার নোটগুলো বার করে ভাঙিয়ে নিয়ে আয়। সব পাঁচ টাকার নোট করে আনবি।'

'আচ্ছা—' বোদা ঘাড় হেলিয়ে দিল।

'আর চার মিটার লাল ফিতে আর একটা ছোট কাঁচি কিনে আনবি।'

'কী হবে?'

'আনলেই দেখতে পাবি।'

বোদা আর কিছু জিজ্ঞেস করল না। চুপচাপ নোটগুলো বার করে বেরিয়ে গেল। আর আমি একটা কৌটো তুলে নিয়ে তার গায়ে লিখতে লাগলাম, 'স্টুডেন্টস ফান্ড'! তার তলায় লিখলাম, যে কোনো গার্জেন এখান থেকে প্রতি মাসে ছেলের স্কুলের মাইনের দশ টাকা নিতে পারবে। দ্বিতীয় কৌটোটা তুলে লিখলাম, 'হেলথ ফান্ড'। তার তলায় লেখা হল, এখান থেকে প্রতি মাসে কুড়ি টাকা নেওয়া যেতে পারে। এই ভাবে 'ম্যারেজ ফান্ড,' ওল্ড-এজ ফান্ড' ইত্যাদি ইত্যাদি করে ন'টা ফান্ড হয়ে গেল। তারপরও দেখা গেল একটা কৌটো বাকি পড়ে রয়েছে। এটা নিয়ে

কী ফান্ড খোলা যায় যখন ভাবছি হঠাৎ আজিজদের দিকে আমার চোখ পড়ল। ওরা টেরিফিক মনোযোগ দিয়ে আমার কান্ড টান্ড দেখছিল। ওদের দেখতে দেখতে দুম করে দশ নম্বর প্ল্যানটা মাথায় এসে গেল। আমি শেষ কৌটোটা তুলে নিয়ে তার গায়ে লিখলাম, 'ক্যাশ ডোল ফান্ড ফর আন-এমপ্লয়েড ইয়ুথ।' এখান থেকে প্রতি মাসে চল্লিশ টাকা করে নেওয়া যেতে পারে। লেখা হয়ে গেলে আবার আজিজদের দিকে তাকালাম। বললাম, 'যদ্দিন না তোমাদের চাকরি হচ্ছে, কি পার্মানেন্ট কোনো ইনকামের ব্যবস্থা করতে পারছ, এই ফান্ড থেকে তোমরা ডোল পাবে।'

মহাশয়গণ, আজিজ পল্টা আর ঝন্টে তিনজনই আমার দিকে দারুণ কৃতজ্ঞ চোখে তাকাল। বলল, 'আপনি দাদা টেরিফিক—'

জিজ্ঞেস করলাম, 'টেরিফিক কী?'

'ওই যে ওরা যা বলছিল—'

'কী বলছিল?'

'ছদ্মবেশী ভগবান—গড। কিন্তু—'

'কী?'

'মান্থলি চল্লিশ টাকায় কী হবে। দুটো রেশনও তো তোলা যাবে না।'

'এখন এর বেশি অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে পারছি না। কয়েকটা দিন ওয়েট কর, ওটা বাড়িয়ে দেড় শ দুশ টাকা করে দেব।'

'কিন্তু—'

'আবার কী হল?'

পল্টা আমার কানের ভেতর মুখ গুঁজে দিয়ে বলল, 'ওই টাকা নিয়ে ডাইজেস্ট করতে পারব তো?'

ঘাড় ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'মানে—'

'মানে পুলিশের ঝামেলায় পড়ে যাব না?'

'তাই মনে হচ্ছে?'

'বুঝতে পারছি না। রাজা হরিশ্চন্দ্র আর দাতাকর্ণর পর আপনার মতো মহাপুরুষ তো আর দেখা যায় নি। এরকম দানবীরের কথা কোনো রেফারেন্সও পাই নি। মানে তাই—'

'তাই ডাউটটা কিছুতেই কাটতে চাইছে না, এই তো?'

ওধার থেকে ঝন্টে বলে উঠল, 'এগ্‌জাক্টলি—'

একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'আমার কাজ খুব ক্লিন, গায়ে একটু হাওয়াও লাগবে না। আই ক্যান অ্যাসিওর—'

ওরা কিছু বলল না।

আমি আবার বললাম, 'আসলে ব্যাপরটা কী হয়েছে জানো, তোমরা আমাকে আগে কখনও দেখ নি, তাই বিশ্বাস করতে পারছ না। ক'দিন দেখ, তারপর আমার গায়ে চিটেগুড়ের মতো সেঁটে যাবে। তোমাদের গ্যারান্টি দিচ্ছি, আমি একটা লাভেবল্‌ ট্রাস্টওয়ার্দি ম্যান। ও-কে?'

ঝন্টে কী বলতে যাচ্ছিল সেই সময় ফিতে-কাঁচি নিয়ে ফিরে এল বোদা। এক শ টাকার

নোটগুলোও ভাঙিয়ে নিয়ে এসেছিল সে। প্রত্যেকটা কৌটোয় ইমপর্টান্স অনুযায়ী কিছু কিছু টাকা রেখে কৌটোগুলোর মুখ আটকে ঘরের এক কোণে পর পর সাজিয়ে রাখলাম। সেগুলোর পাশে হিসেব রাখার জন্য একটা করে এক্সসারসাইজ খাতাও রেখে দেওয়া হল।

মহাশয়গণ, এবার আমি কী করছি দেখুন। আজিজদের দিকে ফিরে বললাম, 'সবাই দু'মিনিটের জন্য বাইরে চল তো। ফর টু মিনিটস ওনলি—'

কথামতো আজিজ ঝন্টে আর পল্টা ঘরের বাইরে টালির শেড দেওয়া বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল, বোদাও গেল তাদের সঙ্গে সঙ্গে। আমিও আর বসে থাকলাম না। হে-হে মহাশয়গণ, ওদের চারজনের পিছু পিছু সেই নতুন ফিতে আর কাঁচিটা নিয়ে বেরিয়ে এলাম। ফিতেটা দরজার মাঝখানে টান টান করে আটকে ঘাড় ফিরিয়ে একবার দেখে নিলাম। তারপর আজিজদের দিকে ফিরে বললাম, 'এবার টেপ কাটিং সেরিমনি শুরু হবে। তোমরা সবাই হাততালি দেবার জন্য রেডি হও।'

মহাশয়গণ, আজিজরা গার্ড অফ অনার দেবার ভঙ্গিতে লাইন দিয়ে দাঁড়াল। আর আমি ওয়ার্ল্ডের সেরা লিডারের মতো মুখটা ভাবগম্ভীর করে সেই কাঁচিটা বাগিয়ে ফিতের দিকে এগিয়ে গেলাম।

কুচ করে ফিতেটা কেটে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে চটর-পটর করে অজিজরা হাত তালি দিয়ে উঠল। তাদের দিকে স্মাইলিং ফেস অর্থাৎ হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে বললাম, 'গ্র্যান্ড, ফিতে কাটা উৎসব ইজ কমপ্লিট। চল সবাই ভেতরে যাই।'

মহাশয়রা, আবার আমরা ঘরের ভেতরে চলে এলাম। এসেই আজিজদের বললাম, 'টেপ কাটিং তো হয়ে গেছে। শুভ উদ্বোধনটা তা হলে তোমাদের হাত দিয়েই হয়ে যাক।'

আমার কথা বুঝতে না পেরে আজিজরা তাকিয়ে রইল।

অগত্যা মহাশয়গণ, ব্যাপারটা ওদের কাছে পরিষ্কার করে দিতে হল। বললাম, 'ক্যাশ ডোল ফর আন-এমপ্লয়েড ইয়ুথ'-এর ফান্ড থেকে তোমাদের স্টাইপেন্ড নিয়ে যাও—'

ঝন্টে বলল, 'আজই নেব?'

'ইয়েস। শুভস্য শীঘ্রম্—'

বেকারদের জন্য যে ফান্ডটা খুলেছি তাতে দু'শ টাকা রেখেছিলাম। ওরা তিনজন চল্লিশ টাকা করে নিয়ে এক্সারসাইজ খাতায় লিখে রাখল। আসলে রেকর্ড রাখার মানে হয় না। কেননা টাকাটা আমার নিজস্ব না, আবার পৈতৃক সম্পত্তিও নয়। ওই দেখুন কোত্থেকে বাবা, মানে জন্মদাতা পিতার কথা এসে পড়ল! অথচ শালা কারবারটা ভাবুন, আমার বাবাই নেই। আমি নিজে নিজেই মাটি ফুঁড়ে যে গজিয়ে গেছি তা তো আপনারা জানেনই। বাবা নেই তো পৈতৃক প্রপার্টিটা আসবে কোত্থেকে? যাক গে ও সব কথা। আসলে আমি একটা রেকর্ড রাখতে চাই। দেখতে চাই পিপলের কত টাকা আমার হাত ঘুরে আবার পিপলের কাছে ফিরে যায়। জনগণের কত টাকা ট্রানজাকসন করলাম, সেটা জানতে পারলে খুব খারাপ লাগবে না।

টাকা ফাকা নিয়ে ঝন্টে বলল, 'যাক, একটা উইকের জন্য বাঁচা গেল। মা খ্যাচর খ্যাচর করছিল, ঘরে একটা পয়সা নেই, রেশন আনা যাবে না।' এই পর্যন্ত বলে একটু থামল। তারপর

আবার শুরু করল, 'মনে হচ্ছে—আপনি দাদা আমাদের সেভিয়ার হয়েই এলেন। আপনাকে—'

হাত বাড়িয়ে ঝন্টেকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, 'প্লিজ ডোন্ট মেক মি গড। তোমাদের টাকা তোমাদের দিচ্ছি, এর ভেতর আমার কোনো ক্রেডিট নেই। আমি সেভিয়ার না, স্রেফ একজন মিডলম্যান।'

আরো দু-চারটে কথার পর ঝন্টেরা উঠে পড়ল। বলল, 'দাদা আজ চলি। আবার দেখা হবে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই। যখন ইচ্ছে তোমরা চলে আসবে। আই এ্যাম অলওয়েজ অ্যাট ইওর সারভিস।'

ওরা চলে গেল।

এর মধ্যে বোদা আবার শুয়ে পড়েছে। তার হাত দুটো ক্রসের মতো আড়া আড়ি চোখের ওপর চাপানো রয়েছে। আমি ওর গা ঘেঁষে শুয়ে পড়লাম। অনেকটা সময় কেটে গেল।

পাশে শুয়ে শুয়ে বেশ বুঝতে পারছি বোদা মাকড়া ঘুমোয় নি। আস্তে করে তাকে ডাকলাম, 'পার্টনার—'

বোদা তক্ষুণি সাড়া দিল, 'বল গুরু—'

'আজ তোর কী প্রোগ্রাম?'

'তোমার কী প্রোগ্রাম তাই বল—'

'একবার কলকাতায় ডিউটি মারতে যেতে হবে।'

'কিসের ডিউটি?'

'মনে নেই, সমাজপতিকে কথা দিয়েছি এভরি ডে দু ঘন্টা করে তার গড়িয়াহাটার স্যুইটে কাটিয়ে আসব!'

'মনে আছে।'

'তা হলে উঠি—' বলতে বলতে কবজি উল্টে হাত ঘড়িটা একবার দেখে নিলাম। প্রায় চারটের মতো বাজে। বেরুতে হলে আর দেরি করার মানে হয় না। এর পর বেরুলে আজ রাত্তিরে আর ফেরা যাবে না।

বোদার বিছানা ছেড়ে ওঠার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। মহাশয়গণ, শালা চোখের ওপর দু হাতের ক্রস লাগিয়ে পড়ে আছে তো পড়েই আছে। আমি আবার তাড়া লাগালাম, 'কি রে মাকড়া, উঠবি না?'

আদুরে গলায় নাকের ভেতর থেকে একটা শব্দ করল বোদা, 'ন্‌না—'

'না কি রে? কলকাতায় যাবি না?'

'ন্‌না। আজকেও আমার টাইফয়েড হবে গুরু।'

এতক্ষণে বোদার মতলবটা টের পাওয়া গেল। বললাম, 'শালা তোমার মাথায় কনকচাঁপার ধান্দা ঘুরছে, তাই না?'

ঝট করে চোখ থেকে হাত দুটো সরিয়ে বোদা বলল, 'তুমি গুরু ভগবান। মনের কথা ঠিক শালা টের পেয়ে যাও। ব্যাপারটা কি জানো মাইরি, কনকচাঁপাকে সবে খেলাতে শুরু করেছি। গেঁথে তুলতে হলে রোজ ওর পেছনে ডিউটি মারতে হবে। এখন যদি রেগুলার সীনে না থাকি

মছলি বিলকুল হড়কে অন্যের বঁড়শিতে গেঁথে যাবে।'

বোদার কথা শুনতে শুনতে আমার দারুণ মজা লাগছিল। কিছু না বলে চোখ কুঁচকে ওকে দেখতে লাগলাম।

বোদার আবার বলল, 'গুরু সেটা কি খুব ভাল হবে?'

'কিন্তু—' এই একটা মাত্র শব্দ গলা থেকে বার করে আমি চুপ করলাম।

বোদা জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু কী?'

'সমাজপতির স্যুইটে এক ডজন জিন আর হুইস্কি রয়েছে। তুই না গেলে শালা বোতলগুলো কেঁদে ভাসিয়ে দেবে যে—'

'এই তো গুরু ঝামেলায় ফেলে দিলে! এখন কোন দিক রাখি—শ্যাম না কুল? হুইস্কি না কনকচাঁপা?' বলে একটু থামল বোদা। ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে ঝট করে কি ভেবে নিয়ে পরক্ষণেই শুরু করে দিল, 'সমাজপতির স্যুইট যখন আছে অনেক হুইস্কি পাওয়া যাবে কিন্তু কনকচাঁপা একবার স্লিপ করে গেলে আর পাওয়া যাবে না। গুরু তখন হাতে হেরিকেন নিয়ে কোথায় আরেকটা কনকচাঁপা খুঁজে বেড়াব?'

'ঠিক আছে, তবে শালা তুমি এখানেই কনকচাঁপার ধান্দা কর। আমি চলি।' বিছানা থেকে উঠে ট্রাউজার ফাউজার পাল্টে, মাথায় হেয়ার টনিক লোশন আর মুখে কোল্ড ক্রিম মেখে পায়ে জুতো গলিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

পেছন থেকে বোদা বলে উঠল, 'টেরিফিক মাঞ্জা দিয়েছ গুরু—'

ঘাড় ফিরিয়ে বললাম, 'বলছিস!'

'ইয়েস গুরু। কিন্তু ব্যাপারটা কী?'

'ব্যাপার একটা নিশ্চয় আছে।'

'লড়কীর ধান্দা নাকি?'

হে-হে মহাশয়গণ, আগে খেয়াল ছিল না, বোদার কথায় আচমকা ডোরার চেহারাটা ফ্ল্যাশ লাইটের মতো মনে পড়ে গেল। ওর দিকে তাকিয়ে চোখ টিপলাম শুধু, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম।

উঠোন পেরিয়ে ব্যারাকবাড়িটার গেটের কাছে আসতেই চোখে পড়ল সুমনা দাঁড়িয়ে আছে। আধময়লা একটা শাড়ি ঘরোয়া ভঙ্গিতে পরেছে সে। তার মানে সে এখন বেরুচ্ছে না।

সুমনা বলল, 'কলকাতায় যাচ্ছেন?'

আস্তে মাথা নাড়লাম, 'হ্যাঁ, তুমি?'

'বড় বোনপোটাকে দোকানে পাঠিয়েছি। অনেকক্ষণ গেছে, ফেরার নাম নেই। ওর জন্য দাঁড়িয়ে আছি।'

'আজ কলকাতায় যাবে না?'

'না। গিয়ে কী আর হবে। আপনি সবই তো জানেন।'

একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'পয়সা রোজগারের জন্য আর কলকাতায় যাবার দরকার নেই তোমার।'

সারা মুখে শুদ্ধ বাংলায় কি যেন বলে হ্যাঁ বিষাদ—বিষাদ মাখিয়ে হাসল সুমনা। বলল, 'তা হলে চলবে কি করে?'

'আমি অনেকগুলো ফান্ড খুলেছি, তা জানো?'

'জানি। আপনার মিটিংও শুনলাম।'

'বক্তৃতাখানা কিরকম দিলাম বল দিকি? লিডার লিডার মনে হচ্ছিল?'

সুমনা হাসল, কিছু বলল না।

আমি আবার বললাম, 'ওই বেনিফিট ফান্ড থেকে মাসে মাসে টাকা নিয়ে যাবে।'

'কিন্তু—'

'বলে ফেল।'

'আপনি তো মাসে মাসে চল্লিশ টাকার বেশি দেবেন না। ঐ টাকায় কি সংসার চলবে?'

'ক'টা দিন ওয়েট কর। ওটা বাড়িয়ে দেব। এনিওয়ে তোমার আর কলকাতায় যাওয়া হচ্ছে না। আচ্ছা—'

'কী?'

'আমি যে মিটিং করলাম, বেনিফিট ফান্ড খুললাম—এতে এখানকার পিপলের রিঅ্যাকশন কী?'

'সবাই আপনাকে ভগবান ভাবতে শুরু করেছে।'

মহাশয়গণ, আরেক বার তামাশাটা দেখুন, টাকা দিল সমাজপতি আর ফাঁকতালে আমি পিটার স্বয়ম্ভু হোড়—একটা থার্ড ক্লাস চীট, একজন উৎকৃষ্ট ফোরটুয়েন্টি—একেবারে অলমাইটি গড বনে গেছি। আমি শালা এখন একটা দানবীর, একটা দাতাকর্ণ, একটা গড। মনে পড়ে গেল অরফ্যানেজে থাকতে আমার নাম ছিল জগদীশ। অ্যাদ্দিনে দেখা যাচ্ছে নামটা সার্থক হল।

বললাম, 'এত তাড়াতাড়ি ভগবান না ভাবলেই বোধ হয় ভাল হত।'

সুমনা জিজ্ঞেস করল, 'কেন?'

'ভগবানের ভেতর থেকে দুম করে কোন দিন কী বেরিয়ে পড়বে! তখন শালা—' এই পর্যন্ত বলে হাসতে লাগলাম। তারপর হাসতে হাসতেই আবার বললাম, 'সব পিপল মিলে এমন রগডান দেবে যা বাপের নাম পুন্ডরীকাক্ষ করে ছাড়বে।'

সুমনা উত্তর দিল না।

আমি এবার বললাম, 'কি হল, তুমি চুপ করে রইলে যে? আমি যা বললাম তা ঠিক না?'

গভীর গলায় সুমনা বলল, 'আপনি এরকম বললে আমি খুব কষ্ট পাই।'

হে-হে মহাশয়গণ, সুমনার কথায় আমার মজাও লাগল, আবার রীতিমত চমকও। মেয়েটার গলার আওয়াজ যেন কেমন, দারুণ সন্দেহজনক। ছুঁড়ি কি ফেঁসে গেছে? আমি অনেকখানি ঝুঁকে বেশ মজার গলায় বললাম, 'তুমিও আমাকে গড ভেবে বসে আছ নাকি?'

সুমনা চুপ করে রইল

আমি এবার বললাম, 'কিন্তু তুমি তো জানো, আমি একটা ড্রাংকার্ড, থার্ড ক্লাস এলিমেন্ট, চালচুলো নেই, রাস্তায় রাস্তায় লাফাঙ্গার মতো ঘুরে বেড়াই। আমার আরো বাছা বাছা অনেক

গুণ আছে। সে সব শুনলে তোমার হার্টে একসঙ্গে তিনবার স্ট্রোক হয়ে যাবে। তোমার মতো মেয়ের আমার সম্বন্ধে ভগবান ঠাওরানো ঠিক নয়।'

সুমনা এবার বলল, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

'একটা কেন, পঞ্চাশটা কর না—'

'আপনি এই যে গন্ডা গন্ডা বেনিফিট ফান্ড খুললেন এতে রেগুলার টাকার যোগান দিতে হবে তো?'

'তা তো হবেই। তা না হলে ফান্ড খোলার দরকার কী?'

'টাকা যোগাড় করতে গিয়ে আপনার কোনো বিপদ হয়ে যাবে না?'

হে-হে মহাশয়গণ, মেয়েটা সত্যিই ফেঁসে গেছে। আমার ছত্রিশ ঘাটের জল-খাওয়া লম্বা কেরিয়ারে এই প্রথম একজনকে দেখলাম যে আমার সম্বন্ধে চিন্তা ফিন্তা করে আর সেই কারণে দারুণ অস্বস্তি হচ্ছে। কারণটা কী জানেন, কেউ আমার ব্যাপারে কখনও তো মাথা ঘামায় নি। ব্যাপারটা আমার কাছে একেবারে নতুন, টেরিফিক ঝামেলারও। অভ্যাস নেই কিনা।

হেসে হেসে বললাম, 'একটু রিস্ক যে নেই তা বলব না। তবে জানোই তো, নো রিস্ক নো গেইন। ভেবো না, মাখনের ভেতর দিয়ে ছুরি চলে যাবার মতো আমি ঠিক বেরিয়ে যেতে পারব।'

কথা বলছিলাম ঠিকই, তবে লক্ষ করছিলাম চোখের তারা ফিক্সড করে সুমনা প্রথম থেকে আমাকে দেখেই যাচ্ছে। বললাম, 'কী দেখছ?'

সুমনা লজ্জা পেল না, চোখও সরিয়ে নিল না। আস্তে করে শুধু বলল, 'আপনাকে।'

আমি একটু হাসলাম।

সুমনা আবার বলল, 'আপনাকে আমি ঠিক বুঝতে পারি না।'

'আমার পার্টনার গ্রেট বোদা মাকড়াও ওই কথাই বলে। একলা বোদাই না, যে আমার সঙ্গে দু-দিন চলে ফেরে সে-ই ওই কথা বলে।' যাক গে, নিজের সাজসজ্জা দেখিয়ে বললাম, 'আমার মেক-আপটা কিরকম হয়েছে বল দিকি?'

সুমনা উত্তর দিল না, তাকিয়েই রইল।

আমি আবার বললাম, 'এই ট্রাউজার আর শার্টটা পরাতে দারুণ একটা সেক্স অ্যাপিল এসে গেছে, নাকি বল?'

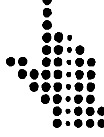
সুমনা এবারও চুপ।

আমি সট করে গলা নামিয়ে বলতে লাগলাম, 'আসলে ব্যাপারটা কী জানো, একটা ছুঁড়িকে পটাতে হবে। একবারই তাকে দেখেছি। মনে হচ্ছে টেরিফিক খেলোয়াড় মেয়ে। তাই এরকম মাঞ্জা চড়িয়ে নিলাম।'

লক্ষ করলাম, সুমনার মুখের ওপর পাতলা কুয়াশার মতো একটা ছায়া পড়েই মিলিয়ে গেল। মহাশয়ণ, সিজমোগ্রাফ দেখেছেন? কেউ কেউ হয়ত দেখে থাকবেন, বেশির ভাগ লোকই দেখে নি। সিজমোগ্রাফ হচ্ছে এমন একটা মেশিন যাতে ভূমিকম্প ধরা পড়ে। আমার হার্টের ভেতর ওইরকম একটা মেশিন ফেশিন আছে। সুমনার দিকে তাকিয়ে আবছাভাবে ভূকম্পনের মতো কিছু একটা ধরা পড়ল। জেলাসি নাকি?

মহাশয়গণ, হার্ট-টার্টের ব্যাপার খুবই বিপজ্জনক। আপনারা তো জানেনেই আমার বুকের ভেতর ওই বস্তুটি একেবারেই নেই। ওই মেটিরিয়ালটি বাদ দিয়েই মাটি ফুঁড়ে আমি গজিয়ে গেছি।

তবু বলব হার্টের ব্যাপারটা খুবই ছোঁয়াচে, অনেকটা সংক্রামক ডিজিসের মতো। এর তিন মাইল রেডিয়াসের ভেতর আমার থাকা উচিত না। আমার যা প্রফেসান, আমার যা লাইফের ফিলজফি, তাতে এই সব হৃদয়ঘটিত ঝামেলায় লটকে যাওয়াটা কোনো কাজের কথা নয়। প্রথম থেকেই এতে ব্রেক কষে দেওয়া ভাল। বললাম, 'আচ্ছা এখন চলি।'



কালকের মতো আজও বাসেই কলকাতায় এলাম। শ্যামবাজারে নেমে একটা এল-তেত্রিশ ধরে সোজা বালিগঞ্জ ফাঁড়িতে যখন পৌঁছুলাম কলকাতার স্কাইলাইনের ওপর সন্ধে নামতে শুরু করেছে। তারপর ফুটপাথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ক্রিকেট ক্লাবের সামনে চলে এলাম। তার উল্টো দিকে দু-তিন গজের মধ্যেই লম্বা অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে সমাজপতির সেই ফ্ল্যাটটা। কথাটা ঠিক হল না, ফ্ল্যাটটা আমারই। সমাজপতি আমাকেই ওটা গিফট হিসেবে দিয়েছেন।

নোম্যাডের মতো গ্লোব-ট্রটারের মতো এতকাল কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় সাতাশ আটাশ বছর ধরে চক্কর দিয়ে বেড়াচ্ছিলাম। আপনারা লক্ষ করেছেন আমার কোনো ফ্যামিলি নেই, বাড়িঘর নেই, অ্যাটাচমেন্ট নেই, প্রপার্টি নেই। কিন্তু এই প্রথম আমার একটা প্রপার্টি হল। সম্পত্তিওলা লোকেদের ফিলিং কিরকম হয়, আমার জানা ছিল না।

কিন্তু মহাশয়গণ, প্রকান্ড অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে ষোল শ স্কোয়ার ফুটের বিরাট একটা ফ্ল্যাট পাবার পরও প্রপার্টিওলা লোকের ফিলিংস আসছে না। কান্ডটা দেখুন, আমি শালা সাইকোলজিক্যালি হ্যাভ-নটদের মতোই হেঁটে বেড়াচ্ছি। মহাশয়গণ, আমার বোধহয় এ জন্মে কিচ্ছু হবে না।

অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের ভেতর এসে সোজা প্রথম লিফট-বক্সটায় ঢুকে পড়লাম। দরজাটা টেনে বন্ধ করতে যাব, প্রায় ঝড়ের মতো সেই মেয়েটা, হ্যাঁ ঠিকই ধরে ফেলেছেন, ডোরা বক্সটার মধ্যে ঢুকল।

মহাশয়গণ, কাল রাত দশটার সময় পাশের লিফট বক্সে ডোরাকে এক সেকেন্ডের জন্য দেখেছিলাম। ফ্ল্যাশ লাইটের এক ঝলক আলোর মতো মনে হয়েছিল তাকে।

আজ ডোরা আমার এক ফুটের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। এই ছোট ছ' ফুট বাই চার ফুট লিফট-বক্সে একটু নড়াচড়া করলেই ওর গায়ে গা ঠেকে যাবে।

তেতাল্লিস চুয়াল্লিশ বছরের চেকার্ড কেরিয়ারে কম করে কয়েক হাজার যুবতী দেখেছি। মহাশয়গণ, যার নামে দিব্যি দিতে বলবেন, মা কালী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, শনিঠাকুর, যেসাস ক্রাইস্ট—দিয়ে বলছি, নাইনটি নাইন পয়েন্ট নাইন মেয়ের কাছে বসলে ফিলিংই হয় নি যে একটা

যুবতীর কাছে বসে আছি। কিন্তু এই মেয়েটা, এই ডোরার সঙ্গে এক লিফট-বক্সে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে একটা বেশ উত্তপ্ত ফার্নেসে ঢুকে পড়েছি।

মহাশয়গণ, আপনাদের ছোঁকছোঁকানি দেখে বুঝতে পারছি, ডোরার শরীরের একটা ডেসক্রিপসান জানার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছেন। ঠিক আছে তাই দিচ্ছি। পিপলের ডিম্যান্ড মাথা পেতে নিতেই হবে।

ডোরার সঠিক ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকসটা দিতে পারব না। কারণ গজ ফিতে-টিতে তো আমার হাতে নেই। তবে ওকে দেখে যা মনে হচ্ছে তাই জানিয়ে দিচ্ছি। ওর মাপ ৩৬-২৫-৩৬। মহাশয়গণ, কাঁধ পর্যন্ত ওর বাদামি চুল, পেন্সিলে-আঁকা আইব্রো'র তলায় নীলচে চোখ। মহাশয়রা, আমি আবার স্ল্যাং- ট্ল্যাং তেমন জানি না। তবে চাকু-মারা চোখ বলে একটা কথা কবে কার কাছে যেন শুনেছিলাম। ডোরার চোখ দুটো সেইরকম, একেবারে হার্ট পর্যন্ত বিঁধে যায়। গায়ের চামড়া পালিশ-করা ব্রোঞ্জের মতো, সেখান থেকে ফোর ফর্টি ভোল্টের মতো হিট বেরিয়ে আসছে।

পরনে হট প্যান্ট আর ব্রা'র উপর লুক-থ্রু খাটো শার্ট। শার্ট এবং প্যান্টের মাঝখানে অনেকখানি জমি ফাঁকা। সেখানে সুগভীর নাভি। নাভির নিচে বিপজ্জনক খানিকটা এলাকার পর মাখনের স্তুপের মতো উরু নিচের দিকে নেমে গেছে। মহাশয়গণ, আমি নিচের দিকে নেমে যাচ্ছি কিন্তু ওপরের একটা দারুণ পয়েন্ট বাদ দিয়ে গেছি। আপনারা সবটা পড়ার পর নিশ্চয়ই ক্যাঁক করে আমার গলা টিপে ধরবেন। বলবেন, তুমি দেখছি সত্যিই চীট, নাম্বার ওয়ান ফোরটুয়েন্টি। যুবতী ছুকরির ডেসক্রিপসান দিতে বসেছ, অথচ তার বুকের বর্ণনা কোথায়? মহাশয়গণ আপনাদের কাছে হাতজোড় করে মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি। মেয়েমানুষের ব্যাপারে আমি একেবারেই আনাড়ি। তবু আপনারা যে রকম উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন, যেভাবে ধৈর্য হারিয়ে ফেলছেন, তাতে বুকের কথাটা বলতেই হয়। মহাশয়গণ সে দুটো বুপোর পাহাড়ের মতো। বুপোর দ্বীপ বলতে পারেন। এখন হুড় হুড় করে আরেক বার নিচে নামা যাক। ডোরার পেছন দিকটা যেন ওল্টানো তানপুরা।

মহাশয়গণ, বুঝতেই পারছি এইরকম একটা ডেসক্রিপসানের পর আপনাদের নাক দিয়ে আগুনের মতো ঝাঁঝ বেরুতে শুরু করেছে। আমি যে আমি, একটা কনফার্মড পরম ব্রহ্ম, একজন চালচুলোহীন নাগা সন্ন্যাসীও ভাবতে পারেন আমাকে, সেই আমার পর্যন্ত নিঃশ্বাস গরম হয়ে উঠেছে। জিভের তলায় থার্মোমিটার রাখলে টেম্পারেচার এক শ চার ডিগ্রি উঠে যাবে। সমাজপতি মাইরি গ্রেট সমঝদার লোক, রিয়াল কনয়েসিয়ার। সাত সমুদ্দুর তের নদী ছেঁচে কিরকম একখানা গার্লফ্রেন্ড যোগাড় করেছে! লোকটার ওপর আমার শ্রদ্ধা দশ গুণ বেড়ে গেল।

আমি খুব সম্ভব লাইফে এই প্রথম একটি মেয়ের দিকে এক নাগাড়ে পঞ্চাশ সেকেন্ড চোখ ফিক্সড করে তাকিয়ে ছিলাম। ডোরা আচমকা বলে উঠল, 'হ্যাভ্ ইউ নট সীন এনি গার্ল বিফোর? দরজাটা বন্ধ করে দিন।'

আমি পিটার স্বয়ম্ভু হোড় একটি দু-কান কাটা চীট, কোনো কারণেই আমি শুদ্ধ বাংলায় যাকে বলে অপ্রতিভ হওয়া, তা হই না। লিফটের দরজা বন্ধ করতে করতে দাঁত বার করে হাসলাম।

বললাম, 'অনেক মেয়ে দেখেছি। সে অ্যাবাউট অ লাখ। কিন্তু আপনাকে এই প্রথম দেখলাম।'

'আমি কি খুব দেখবার মতো জিনিস?'

'অ্যাট আ স্ট্রেচ পঞ্চাশ সেকেন্ড যখন তাকিয়ে থেকেছি তখন ইউ ডু হ্যাভ সামথিং দ্যাট টু মি।' গলা নামিয়ে বললাম', আই মিন ইওর চার্ম, ইওর বিউটি—'

'রিয়ালি!'

মহাশয়গণ, ছুকরি ঘাড় বাঁকিয়ে এমন করে তাকাল যাতে আপনাদের কেউ থাকলে একটা ভয়ঙ্কর হার্ট অ্যাটাক হয়ে যেত। কিন্তু হার্ট বলে কোনো ব্যাপারই তো আমার নেই।

আমি বললাম, 'রিয়ালি।'

'ডু য়ু মিন ইট?'

'হানড্রেড টাইমস।'

'ফ্ল্যাটারি?'

'নো, ট্রুথ।'

'থ্যাঙ্ক ইউ।'

একটু চুপচাপ। তারপর ডোরা জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কোন ফ্লোরে যাবেন?'

আচমকা মেয়েটা এটা জানতে চাইলে কেন বুঝতে না পেরে বললাম, 'কেন বলুন তো?' মহাশয়গণ, এরকম মেয়েদের কাছে সাবধানে পা ফেলাই ভাল, না কি বলেন?

ডোরা বলল, 'সেটা না জানলে বাটন টিপব কি করে? লিফট কতক্ষণ আর এখানে দাঁড় করিয়ে রাখব?'

দারুণ ব্যস্তভাবে এবার বললাম, 'টুয়েলভথ্ ফ্লোরে—'

ডোরা বার আর পনের এই দুটো বোতাম টিপল। আমি জানি মেয়েটা ফিফটিনথ ফ্লোরে থাকে।

লিফট-বক্সটা ঝিঁঝির ডাকের মতো একটানা শব্দ করে ওপরে উঠতে লাগল।

ডোরার শরীর থেকে মহাশয়গণ, প্রচুর উত্তাপ বেরিয়ে আসছিল। 'ক্যাট অন আ হট টিন রুফ' বলে একটা কথা আছে, আপনারা নিশ্চয়ই জানেন। আমার অবস্থা হয়েছে অনেকটা সেই রকম। টেরিফিক হিটে ঘামতে ঘামতে আমি হাউ ইয়ের মতো ওপরে উঠছি।

ডোরা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি এ বাড়িতে থাকেন?'

মহাশয়গণ, মিস্টার সমাজপতি ডোরার ওপর নজর রাখার পবিত্র একটি ডিউটি আমার কাঁধে ঝুলিয়ে দিয়েছেন। এ বাড়িতে আমি একেবারে তাঁবু ফেলে বসে আছি, এটা বোধহয় প্রথম আলাপেই বলে ফেলা ঠিক হবে না। বললাম, 'ঠিক থাকি না, একজনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

ডোরা এ নিয়ে আর কোনো প্রশ্ন করল না। শুধু বলল, 'আপনার সঙ্গে আলাপ করে ভাল লাগল।'

মহাশয়গণ, ফ্ল্যাটারি কার না ভাল লাগে! চামচাদের সবাই পছন্দ করে থাকে। তা ছাড়া আপনারা তো জানেনই, দেখতে শুনতে আমি খুব একটা খারাপ না। আমাকে দেখলে ছুকরিদের

মধ্যে সেক্স অ্যাপিল চিড়বিড়িয়ে ওঠে। ঘাড়টা ঝুঁকিয়ে বললাম, 'ধন্যবাদ। আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়াটা আমার লাইফের বেস্ট প্লেজার।'

ডোরা ঠোঁট দুটো ছুঁচলো করে চোখ মারল, 'এগেন ফ্ল্যাটারি।'

'নো, ট্রুথ। বিলিভ মি—'

কথায় কথায় লিফট-বক্সটা টুয়েলভথ ফ্লোরে এসে থামল। দরজা খুলে আমি বাইরে বেরিয়ে গেলাম। তারপর দরজা বন্ধ করতেই ডোরা হাত নাড়ল, 'বাই।'

বললাম, 'বাই—'

লিফটটা ঝাঁ করে ওপরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সামনের করিডর দিয়ে আমি আস্তে আস্তে সমাজপতির সেই ফ্ল্যাটটার কাছে চলে এলাম। কলিং বেল টিপতে সঙ্গে সঙ্গে ফ্ল্যাটের দরজা খুলে সেই নেপালি বয়টা লম্বা স্যালুট হাঁকাল।

আমি ভেতরে ঢুকতেই দেখতে পেলাম সামনের ড্রইং রুমটায় সমাজপতি বসে আছেন। চোখাচোখি হতেই তিনি হাত নেড়ে ডাকলেন, 'কাম অন। আমি তোমার জন্যেই ওয়েট করছি।'

আমি পায়ে পায়ে সমাজপতির কাছে এগিয়ে গেলাম।

মিস্টার সমাজপতিকে এই মুহূর্তে এখানে দেখব, ভাবতে পরি নি। আমি একটু অবাক হয়ে গেলাম। সত্যি সত্যি এই বিশাল অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের এই ফ্যাশনেবল ফ্ল্যাটটায় পজেসান নিতে আসছি কিনা, তাই দেখবার জন্যই কি লোকটা এখানে বসে আছে?

সমাজপতি দারুণ খুশির মাথায় আবার ডাকলেন, 'এস হে স্বয়ম্ভুচন্দ্র—' একটা সোফা দেখিয়ে বললেন, 'বোসো—'

মুখোমুখি বসতে বসতে বললাম, 'স্যার কতক্ষণ?'

'আধ ঘন্টার মতো হবে।'

'কিছু দরকার আছে স্যার?'

'তা একটু আছে।'

মহাশয়গণ, মাকড়ার মাথায় নতুন কী প্ল্যান এসেছে কে জানে। একবার তো এই ষোল শ স্কোয়ার ফুটের প্রপার্টি দিয়ে আমাকে ফাঁসিয়েছে। দেখা যাক নতুন করে আরেক বার ফাঁসাবার ধান্দা নিয়ে হাজির হয়েছে কিনা। বললাম, 'কী দরকার স্যার?'

সমাজপতি একটু নড়েচড়ে বসলেন। বললেন, 'তাড়াহুড়োর কিছু নেই। আগে একটু ড্রিংক দিতে বলি?'

'বলুন স্যার। পাক্কা টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স রাম-জিন-হুইস্কি বা সোনার বাংলা, গলায় কিছু পড়ে নি। আলটাগরা পর্যন্ত একেবারে ডেজার্ট হয়ে আছে।'

সমাজপতি তাঁর শুঁয়োপোকার মতো মোটা লোমওলা ভুরু দুটো কুঁচকে এক সেকেন্ড কী ভাবলেন। পরক্ষণে বলে উঠলেন, 'আমি কেন বলতে যাব? এই ফ্ল্যাটটা কার?'

'কাল পর্যন্ত আপনারই ছিল। তবে আজ থেকে বোধহয় আমার।'

'তোমার যদি হয় ইউ শুড প্লে হোস্ট—'

আমি এবার রীতিমত ব্যস্ত হয়ে উঠলাম, 'বেয়ারা—'

সেই নেপালি ছোকরাটা দৌড়ে সামনে এসে দাঁড়াল। তাকে হুইস্কি দিতে বললাম। এক মিনিটও লাগল না, সুদৃশ্য কাটগ্লাসের দু'টি কনিক্যাল পানপাত্রে হুইস্কি ঢেলে নিয়ে এল সে। হুইস্কির সঙ্গে একটা কাচের বাটিতে বরফের ছোট ছোট কিউব আর প্লেটে কিছু কাজু বাদাম টাদামও এনেছে।

আমরা চামচে করে দরকারমতো বরফ তুলে হুইস্কির সঙ্গে নিলাম। তারপর একটা দুটো করে কাজু বাদাম চিবুতে চিবুতে ড্রিংকের গেলাস তুলে নিলাম।

ছোট্ট একটা চুমুক দিয়ে সামাজপতি বললেন, 'ইউ আর নট আ গুড হোস্ট—'

বললাম, 'কেন স্যার?'

'শুধু কাজু বাদাম দিয়ে হুইস্কি খাওয়াচ্ছ! কোনো মানে হয়।'

বুঝলাম, শুকনো কাজু বাদাম দিয়ে ড্রিংক করার হ্যাবিট নেই সমাজপতির। আমি আরেক বার ব্যস্ত হয়ে উঠলাম, 'স্যার চিকেন রোল-টোল আনিয়ে দেব—'

কী ভেবে সমাজপতি বললেন, 'আজ থাক। কাল থেকে সব অ্যারেঞ্জমেন্ট করে রেখো—'

মহাশয়গণ, আমার একটু খটকা লাগল। বললাম, 'কাল থেকে আপনি কি রেগুলার আসবেন?'

'আমি আসি বা না আসি, তাতে কিছু যায় আসে না। তুমি তো আসবে, ড্রিংকও করবে। যেটি করবে সেটি বেশ ভাল করেই করবে। এই ফ্ল্যাটে থাকবে আর থার্ড ক্লাস মাতালদের মতো বাদামের চাট দিয়ে হুইস্কি খাবে, সেটা হবে না।'

হে-হে মহাশয়গণ, সমাজপতির মনের কথাটা আমি পড়তে পারছি। ড্রিংকটা তিনি রীতিমত সমারোহ করেই করে থাকেন। সমাজপতি চান, একা তিনিই নন, আমিও ড্রিংকটাকে পুরোপুরি মর্যাদা দিই, বাদাম চিবিয়ে দামি স্কচের ইজ্জতের বারটা না বাজাই।

একেক জন পেগ তিনেকের মতো পাকস্থলীতে চালান করার পর হঠাৎ আমার সেই কথাটা মনে পড়ে গেল। বললাম, 'তখন কী একটা দরকারের কথা বলছিলেন স্যার—'

সমাজপতির চোখ এর মধ্যেই কিঞ্চিৎ ঢুলু ঢুলু হয়ে এসেছে। একটু কষ্ট করেই তিনি চোখের পাতা তুলে আমার দিকে তাকালেন। বললেন, 'ইয়েস—' বলেই চুপ করে গেলেন। তারপরই চোখের পাতাদুটো ড্রপসিনের মতো ঝপ করে খানিকটা নেমে তাঁর চোখ আধাআধি ঢেকে ফেলল।

আমি উটের মতো গলাটা লম্বা করে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

মিনিটখানেক বাদে আবার সমাজপতির চোখ থেকে ড্রপসিন উঠল। আস্তে করে তিনি বললেন, 'কাল যার ফোটো দিয়েছি তার সঙ্গে আর দেখা হয়েছে?'

মানে ডোরার কথা জিজ্ঞেস করছেন সমাজপতি। বললাম, 'হয়েছে স্যার—'

'কোথায়?'

'লিফট-বক্সে।'

'আলাপ হয়েছে?'

'হয়েছে।'

'ডোরা কী বললে?'

'তেমন কিছু নয়। গ্রাউন্ড ফ্লোর থেকে টুয়েলভথ ফ্লোরে উঠতে ক'টা কথা আর বলা সম্ভব?'

'তবে—'

'তবে কী?'

'মনে হচ্ছে পরে ওর অনেক ডায়লগ শুনতে হবে।'

'কী করে বুঝলে?'

'স্টার্ট দেখে।'

'স্টার্টটা তা হলে ভালই হয়েছে, দেখা যাচ্ছে।' বলতে বলতে চোখের ড্রপসিন আরেকটু তুললেন সমাজপতি, 'আমার কথাটা মনে আছে তো?'

আমি সঙ্গে সঙ্গে ঘাড়টা দেড় মিটার হেলিয়ে দিলাম, 'আছে স্যার। আপনার গার্ল-ফ্রেন্ডের ওপর নজর রাখতে হবে কিন্তু নজর দেব না। বিলকুল ব্রহ্মচারী হয়ে থাকব।'

মহাশয়গণ, সমাজপতি তিন পেগ হুইস্কি স্টমাকে চালান করে কিঞ্চিৎ টিপসি হয়ে পড়েছিলেন। আমার নাকে আলতো একটা টোকা দিয়ে বললেন, 'তুমি একটি সাবলাইম খচ্চর—' আমার সম্বন্ধে আদর উথলে উঠলে তিনি এই খিস্তিটা করে থাকেন।

বললাম, 'স্যার চিনির বলদ বলে একটা কথা আছে না? আমার হচ্ছে সেই অবস্থা। ঘাড়ে চাপিয়ে বেড়াও কিন্তু জিভটি ঠেকাতে পারবে না। ঘাবড়াবেন না, আমি দেখেই যাব, কোনোদিনই চাখতে চাইব না।' হাতের গেলাসটা দেখিয়ে বললাম, 'আমি এই একটা 'ডব্লু'রই সাধনা করে থাকি। এর ওপর দু নম্বর 'ডব্লু'টা আর চাপাবার ইচ্ছে নেই। হেভি ওয়েট হয়ে যাবে।'

তিন চারটে কোম্পানির ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মিস্টার সমাজপতি গলায় কয়েক কিলোগ্রাম স্নেহ ঢেলে বস্তির বাসিন্দা প্রোলেটারিয়েটদের মতো বলে উঠলেন, 'শালা হারামজাদা—' একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন, 'তোমাকে আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট বিশ্বাস করি, তুমি আমার লাইফ দিয়েছ। কিন্তু আমি জানি অনেক সোয়াইনের ডোরার ওপর নজর আছে। তাই তোমাকে ওয়াচ রাখতে বলেছি। যাক গে, এবার আসল কাজের কথায় আসা যাক। তোমার ক'টা নাম?'

'একটাই। পিটার স্বয়ম্ভু হোড়—'

লালচে ঢুলু ঢুলু চোখে আমাকে সার্ভে করতে করতে সমাজপতি বললেন, 'মোটে একটা! ভাল করে ভেবে দেখ।'

আমি যে আমি পিটার স্বয়ম্ভু হোড়, কোনো ব্যাপারেই যে অবাক হয় না, ঘাবড়ায় না, তার ভুরু দুটো পর্যন্ত কুঁচকে গেল। এই মাকড়াটি আমার নামাবলীর জন্য হঠাৎ এত খেপে উঠল কেন? একটু ভেবে বললাম, 'মনে পড়েছে স্যার, ছেলেবেলায় আমার আরেকটা নাম ছিল।'

'কী নাম?'

'জগদীশ—'

'ভেরি গুড। জগদীশ আর স্বয়ম্ভু। কিন্তু এই দুটো নামে তো হবে না। আরো যে দরকার।'

এবার আমাকে অবাকই হতে হল। বললাম, 'স্যার কি শ্রীকৃষ্ণের মতো আমার অষ্টোত্তর শত নাম চান?'

মহাশয়গণ, এর মধ্যে চতুর্থ পেগ হুইস্কি এসে গিয়েছিল। গেলাসটা হাতে তুলে সমাজপতি বললেন, 'একজ্যাক্টলি। গড কেষ্টর মতো তোমার অতগুলো নামই আমার চাই।' বলে চুক চুক করে একটু হুইস্কি খেয়ে নিলেন।

আমার গেলাসটাও তুলে নিয়েছিলাম। হাতের ভেতর সেটা ঘোরাতে ঘোরাতে বললাম, 'স্যার কি আমাকে একটা নামে ডেকে সুখ পাচ্ছেন না?'

'তা পাচ্ছি। তোমার নামটাতে বেশ মিউজিক আছে হে, বার বার উচ্চারণ করলে গলা সাধার কাজ হয়ে যাবে।'

মনে মনে বললাম, 'শালা খচড়া।' মুখে বললাম, 'তা হলে বাকি অতগুলো নাম এই বয়েসে আর কাঁধে ঝুলিয়ে কী হবে?'

'ওগুলো ডাকবার জন্যে নয়।'

'তবে?'

'অন্য কাজে লাগাবার জন্যে।'

'কী কাজ?'

'সেটা পরশু বলব।'

হে-হে মহাশয়গণ, আপনারা তো জানেন কোনো ব্যাপারেই আমার তেমন কৌতূহল নেই। বললাম, 'ঠিক আছে স্যার, পরশু দিনই শুনব।'

সমাজপতি চুক চুক করে আরেকটু হুইস্কি খেয়ে নিলেন। তারপর বললেন, 'কালকের মধ্যে তোমার বাকি এক শ সাতটা নামের লিস্ট করে ফেল। হিন্দু, মুসলিম, কৃশ্চান, জৈন, পার্শি, সবরকম নাম নেবে।'

মহাশয়গণ, এবার বেশ চমকই লাগল আমার। বললাম, 'এতগুলো রিলিজিয়ন আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চাইছেন?'

মিটি মিটি হাসতে হাসতে সমাজপতি বললেন, 'তুমি না বলেছিলে তুমি একজন গ্লোবট্রটার, একজন ওয়ার্ল্ড সিটিজেন?'

'তা বলেছিলাম স্যার। একজ্যাক্টলি আমি তা-ই স্যার।'

'তা হলে তো প্রবলেম সলভড হয়েই গেল।'

'কিরকম?'

'তুমি যদি ওয়ার্ল্ড সিটিজেন হও তা হলে যে কোনো কান্ট্রিই তোমার কান্ট্রি, যে কোনো রিলিজিয়নই তোমার রিলিজিয়ন। এতে তোমার আপত্তি হওয়া উচিত নয়।'

মাকড়া মনে হচ্ছে, আমাকে একটি ক্যাঁচকলে ফেলার ব্যবস্থা করছে। দেখা যাক শালা কতদূর খেলতে পারে। বললাম, 'না স্যার, আপত্তি হওয়া উচিত নয়।'

'জানতাম তোমার মতো বিশ্বনাগরিকের আপত্তি হবে না। ওয়েল, একটা নয় তুমি নামের দুটো লিস্ট করে ফেলবে।'

'ঠিক আছে স্যার।'

'আর নামগুলোর তলায় অ্যাড্রেস লেখার জায়গা-টায়গা রেখো।'

'আচ্ছা।'

ফোর্থ পেগ শেষ হয়ে এসেছিল। সমাজপতি আচমকা উঠে পড়লেন। বললেন, 'এবার আমাকে যেতে হচ্ছে। তুমি পরশু দিন একটু কষ্ট করে এগারটা সাড়ে এগারটার সময় আসতে পারবে?'

একটু ভেবে বললাম, 'না পারার কারণ নেই।'

'তা হলে এস—'

সমাজপতি আস্তে আস্তে পা ফেলে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। আমিও উঠে পড়েছিলাম। তাঁর গায়ের সঙ্গে ঝুলতে ঝুলতে অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বাইরের প্যাসেজে বেরিয়ে এলাম।

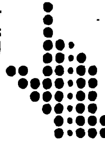
সমাজপতি সোজা লিফটের কাছে গিয়ে বোতাম টিপলেন। ঝিঁঝির ডাকের মতো একটানা একটা শব্দ হতে লাগল। বোঝা যাচ্ছে নিচের দিক থেকে একটা লিফট উঠে আসছে।

লিফট বক্সটা আমাদের এই টুয়েলভথ ফ্লোরে এসে থামতেই দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়লেন সমাজপতি। মহাশয়গণ, সমাজপতি যখন ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করতে যাবেন সেই সময় আমার জিভ আচমকা সুড় সুড় করে উঠল। বললাম, 'কোন দিকে যাবেন স্যার, আপ অর ডাউন?'

মহাশয়গণ, তিন তিনটে কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্ল্ডের একজন লুমিনারি, শুদ্ধ ভাষায় যাকে জ্যোতিষ্ক ট্যোতিষ্ক বলে আর কি, দুম করে আমাকে চোখ মেরে বসলেন। বললেন, 'সাবলাইম হারামজাদা, উঠলে ওপরে ওঠাই ভাল, নরকে গিয়ে কী লাভ, না কি বল?'

কুর্নিশ করার ভঙ্গিতে ঘাড় হেলিয়ে বললাম, 'এক শ বার স্যার—'

সমাজপতি লিফটের দরজা ঝড়াং করে বন্ধ করলেন। তারপর বোতামে আঙুল ছোঁয়াতেই সেটা সাঁ করে ওপরে উঠে গেল।



আমি আবার আমার অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এলাম। যে ঘরে যে সোফায় বসে ছিলাম সেখানে বসেই দুটো পা ক্রস করে টেবিলের ওপর দোলাতে লাগলাম। আর ভাবতে লাগলাম, সমাজপতি আমার কাঁধে হিন্দু-মুসলিম-পার্শি ইত্যাদির অষ্টোত্তর শত নামের হেভি-ওয়েট ঝুলিয়ে দিতে চাইছেন কেন? নাঃ, অনেক ভেবেও কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। শালা ব্রেনটার বারটা বেজে গেল নাকি?

পা দোলাতে দোলাতে হঠাৎ চোখে পড়ল ওধারে কারুকাজ-করা কাশ্মিরি টেবলটার ওপর মেরুন রঙের বিউটিফুল একটা টেলিফোন আর ক্যালকাটা টেলিফোনের একটা ডাইরেকটরি রয়েছে।

কোনো কাজ নেই মহাশয়গণ, এই মুহূর্তে আমি হ্যান্ড্রেড পারসেন্ট বেকার। কিন্তু চুপচাপ পা দুলিয়ে দুলিয়ে কতটা সময় আর কাটানো যায়। অবশ্য নেপলি বয়টাকে বললে রাম-জিন-হুইস্কি, যা চাই এক্ষুণি এনে হাজির করবে। কিন্তু এখন আর ড্রিঙ্ক করতে ইচ্ছে করছে না। সময় কাটাবার জন্য হাত বাড়িয়ে টেলিফোন ডাইরেকটরিটা টেনে নিলাম। তারপর অন্যমনস্কর মতো পাতা ওল্টাতে লাগলাম। কত রকমের নাম আর কত বদখত টাইপের সারনেম যে শালা ওয়ার্ল্ডে পয়দা হয়েছে টেলিফোন ডাইরেকটরি না দেখলে টের পাওয়া যায় না। দেখতে দেখতে দারুণ মজা লাগছিল। পাতার পর পাতা উল্টে যাচ্ছিলাম।

আচমকা যে পাতায় 'সমাজপতি' সারনেমটা শুরু হয়েছে সেখানে আমার চোখ আটকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মিস্টার সমাজপতির মুখটা ফ্ল্যাশ লাইটের আলোর মতো চোখের সামনে ফুটে উঠল। মিস্টার সমাজপতির পুরো নামটা আমি জানি, ইন্দ্রকুমার সমাজপতি। তবে তাঁর বাড়ি কখনও যাই নি, বাড়ির ঠিকানাও আমার জানা নেই। কেননা সমাজপতি এ খবরটা কখনও আমাকে দেন নি। মাকড়া তার ত্রাণকর্তা, সেভিয়ার ইত্যাদি ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট ক্লাস বিশেষণে আমাকে প্রায় ফ্ল্যাট করে দিয়েছে কিন্তু কখনও নিজের বাড়িতে নিয়ে যায় নি।

কোনো ব্যাপারেই আমার কৌতূহল বা আগ্রহ-টাগ্রহ কিছুই নেই। মহাশয়গণ, এ আপনারা জানেন। কিন্তু এই মুহূর্তে শালা কী যে হয়ে গেল, টেলিফোন ডাইরেকটরির পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে চোখদুটো ঠিক সমাজপতি ইন্দ্রকুমারের ওপর আটকে গেল।

সমাজপতি ইন্দ্রকুমার তো কলকাতায় একটা নেই, কয়েক ডজন কয়েক শই হয়ত আছে। কিন্তু আমার চোখ যার ওপর সেট হয়ে গেছে তার তলায় লেখা আছে ম্যানেজিং ডিরেকটর, জেনিথ স্টিল ইত্যাদি ইত্যাদি। সুতরাং মহাশয়গণ, ইনিই যে আমাদের সমাজপতি তা খুব সহজেই শনাক্ত করে ফেললাম। বাড়ির ঠিকানা দেখা যাচ্ছে যোধপুর পার্কের। তার পাশে ফোন নাম্বারটা রয়েছে।

হে-হে মহাশয়গণ, আমার মাথার ভেতর প্ল্যানিং কমিশনের যে হেড কোয়ার্টারটা রয়েছে সেখানে আচমকা দারুণ অ্যাকটিভিটি শুরু হয়ে গেল। আমার দারুণ ইচ্ছে হল মিসেস সমাজপতির সঙ্গে একটু কথা বলি। যাঁর স্বামী ফিফটিনথ ফ্লোরে, মানে আমার মাথার ঠিক আটাশ ফুট ওপরে এই মুহূর্তে ডোরার সঙ্গে লীলা করছেন তাঁর স্ত্রীটি আড়াই মাইল দূরে যোধপুর পার্কে কী করে বেড়াচ্ছেন একটু জানবার ইচ্ছা হল। মহাশয়গণ, আপনারা বলবেন কৌতূহল খুব খারাপ সিমটম এবং এসব আমার ক্যারেকটারে একেবারেই থাকা উচিত না, কিন্তু কী করব! মানুষের বডি তো স্টিলের নার্ভ দিয়ে তৈরি নয়, সেখানে কিছু কিছু উইক গ্ল্যান্ডও থাকে।

সমাজপতির বাড়ির টেলিফোন নম্বরটা দেখে নিয়ে আমি ডায়াল করতে লাগলাম।

মহাশয়গণ, নাম্বারটা ডায়াল করার পর কুর কুর করে ঘুঘুর ডাকের মতো একটা আওয়াজ শোনা গেল। একটু পরেই ওধার থেকে একটি ভারি অথচ দারুণ সুরেলা মেয়ে-গলা ভেসে এল। শুনে মনে হল, কোনো বয়স্ক মহিলার কণ্ঠস্বর।

মহিলা জিজ্ঞেস করলেন, 'কাকে চান?'

হে-হে মহাশয়গণ, আমি যে ঠিক কাকে চাই, সেটা নিশ্চয়ই জানি। ফোনটা করে ছিলাম

ঝোঁকের মাথায়, মিসেস সমাজপতিকে পেলে একটু চুলকে দেবার জন্য। এই মহিলা কে জানি না। যাক গে, যাকে পাওয়া গেছে তাকে দিয়েই ইনস্ট্যান্ট নাটক শুরু করা যাক। আমি কিছুই ভাবব না, গলা দিয়ে হুড়হুড় করে যে ডায়লগ বেরিয়ে আসে আমি সেগুলোই ঝেড়ে যাবে। এতে রি-অ্যাকশান যা হবার হোক। বললাম, 'মিস্টার সমাজপতি বাড়ি আছেন?'

'আপনি কে বলছেন?'

'নাম বললে আমাকে ঠিক চিনতে পারবেন না। আমি নানারকম প্ল্যানিং নিয়ে আছি আর কি। মিস্টার সমাজপতি আমাকে চেনেন।'

মহাশয়গণ, মহিলা কী বুঝলেন তিনিই জানেন। বললেন, 'ওঁকে কোনো খবর দেবার আছে?'

এক সেকেন্ডও চিন্তা না করে বললাম, 'একটা আর্জেন্ট দরকার ছিল মিস্টার সমাজপতির সঙ্গে। মানে ওঁর অফিসের ব্যাপারে।'

মহিলাকে এবার স্লাইট উদ্বিগ্ন মনে হল, 'ও আচ্ছা—'

তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই আমি আবার বলে উঠলাম, 'ক্ষমা করবেন, আমি মিসেস সমাজপতির সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি কি?'

'আমিই মিসেস সমাজপতি।'

'নমস্কার। আমি ঠিক বুঝতে পারি নি।'

'নমস্কার।'

'অনুগ্রহ করে আপনি আমাকে একটা খবর দিতে পারেন?'

'কী খবর?'

'মিস্টার সমাজপতি এখন কোথায় আছেন, সেটা যদি বলেন খুব উপকার হয়।'

'ঠিক কোথায় আছেন জানি না। তবে সন্ধেবেলা বেলেঘাটায় আমাদের গুরুদেবের আশ্রমে ওঁর যাবার কথা ছিল। আমার মনে হয় উনি এখন ওখানেই আছেন।'

হে-হে মহাশয়গণ, সমাজপতি মাকড়াটি কিরকম একটি মাল বুঝে দেখুন। বউকে, মানে অগ্নিসাক্ষী করে বিয়ে-করা ধর্মপত্নীকে বলেছে গুরুদেবের আশ্রমে যাচ্ছে। একটি একটি করে স্বর্গের স্টেয়ারকেস খাড়া করছে শালা। খচ্চরটা আমাকে বলে সাবলাইম হারামজাদা। আসলে কে সাবলাইম হারামজাদা আপনারাই ভেবে দেখুন। তিনি এখন কোথায় কী করে বেড়াচ্ছেন তা তো আপনারা জানেনই। মহাশয়গণ, বুঝে দেখুন, এক গন্ডা কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর, একজন ফেমাস ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, একটা ঝকঝকে পালিশ-লাগানো ভদ্দরলোক কেমন নিজের বেটার হাফকে ম্যাজিক দেখিয়ে যাচ্ছে মনে মনে স্লোগান আউড়ে বললাম, 'সমাজপতি, যুগ যুগ জীয়ে।' মুখে অবশ্য বললাম, 'আপনি ঠিক জানেন মিস্টার সমাজপতি এখন বেলেঘাটার আশ্রমেই আছেন?'

মিসেস সমাজপতি বললেন, 'আমার তো সেই রকমই মনে হচ্ছে। গুরুদেবের কাছে গেলে ওঁর আর সময়ের জ্ঞান থাকে না। ওখানে অষ্টপ্রহর ভজন-টজন হয়। উনি গেলে আর ফিরতেই চান না।'

বউ-এর ওপর মাকড়া নিজের সম্বন্ধে কিরকম একখানা ইম্প্রেসন করে রেখেছে, মহাশয়গণ,

আপনারাই একটু আধটু চিন্তা করে দেখুন। মিসেস সমাজপতির নিশ্চয়ই ধারণা গুরুদেবের কাছে তাঁর স্বামীটি একেবারে তপোবনের আগমার্কা সন্ন্যাসী হয়ে বসে আছে।

হে-হে মহাশয়গণ, আপনারা তো দেখেছেনই মিস্টার সমাজপতিকে আমি অনেক খেলিয়েছি। মিসেস সমাজপতিকে যে একটু খেলাতে ইচ্ছা করছে তা-ও আপনারা জানেন। বললাম, 'ধর্মের দিকে আজকাল তা হলে ওঁর ঝোঁকটা বেড়ে গেছে?'

'খুব। অফিস থেকে বেশির ভাগ দিন বাড়িতেই আসেন না। সোজা গুরুদেবের কাছে চলে যান। ওখান থেকে ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে যায়। এক একদিন আবার ফিরতেও পারেন না।'

মিসেস সমাজপতিকে দেখা যাচ্ছে দারুণ সরল আর সাদাসিধে এক মহিলা। আমাকে তিনি চেনেন না, জানেন না, কোনোদিন চোখে পর্যন্ত দেখেন নি। তবু অনেক দিনের চেনাজানা মানুষের সঙ্গে লোক যেরকম হুড় হুড় করে কথা বলে যায় ঠিক সেভাবেই আমার সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছেন। বললাম, 'কিছু মনে করবেন না, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

মিসেস সমাজপতি বললেন,'করুন না—'

'মিস্টার সমাজপতির সঙ্গে আপনি কখনও গুরুদেবের আশ্রমে গেছেন?'

'না তো। উনি বলেন গুরুদেবের ওখানে মেয়েদের যাওয়া বারণ। তাই আমার আর যাওয়া হয় নি।'

মহাশয়গণ, আরেক বার আপনারা সমাজপতির কারবারটা বুঝতে চেষ্টা করুন। আমি যে আমি পিটার স্বয়ম্ভু হোড়, একজন ফোর টুয়েন্টি, চিটিংবাজি যার লাইফের হোল টাইম প্রফেসান—সমাজপতি তার ব্রেনেও চরকি ঘুরিয়ে দিয়েছে। ধর্মের ক্যামোফ্লেজটি করে কেমন লুকিয়ে ক্ষীরটি খেয়ে যাচ্ছে দেখুন। বললাম, 'এভাবে মিস্টার সমাজপতিকে একা একা ছেড়ে দেওয়া কি আপনার উচিত?'

আমার কথা বুঝতে না পেরেই হয়ত একটু অবাক হলেন মিসেস সমাজপতি। বললেন, 'আপনি কী বলতে চাইছেন?'

'খারাপ কিছুই না। বলছিলাম এভাবে আপনি যদি সুতো ছেড়ে ছেড়ে ওঁকে উড়তে দ্যান তা হলে ফ্যামিলির দিকে যে ওঁর কোনো টানই থাকবে না। উনি যদি গুরুদেবের কাছে যেতে যেতে হানড্রেড পারসেন্ট সন্ন্যাসী টন্ন্যাসী বনে যান, তা হলে বুঝতেই পারছেন, মানে—' এই পর্যন্ত বলে আচমকা ব্রেক কষার মতো আমি থেমে গেলাম।

আর তাতেই মিসেস সমাজপতির কোনো একটা দুর্বল নার্ভে অজান্তে আঙুল লেগে গেল যেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলে উঠলেন, 'আমার তো সবসময় সেই ভয়, কোনদিন যে উনি ঘর-সংসার ছেড়ে চলে যাবেন—'

গলায় কয়েক কেজি উদ্বেগ আর সহানুভূতি ঢেলে দিয়ে বললাম, 'মিসেস সমাজপতি আপনি আমাকে চেনেন না, তবে এটুকু ধরে নিতে পারেন আমি আপনার একজন শুভাকাঙ্ক্ষী।'

আমার কথার মাঝখানেই মিসেস সমাজপতি বলে উঠলেন, 'তা তো বটেই।'

'তাই বলছিলাম, আর সুতো ছাড়বেন না। স্বামীটি তা হলে হাতের ভেতর থেকে স্লিপ কেটে

বেরিয়ে যাবে।'

'আপনি আমাকে কী করতে বলেন?' মিসেস সমাজপতিকে রীতিমত উদ্বিগ্ন মনে হল। স্বামীর ব্যাপারটা নিয়ে তিনি যে অনেক ভেবেছেন তা টের পেয়ে গেছি কিন্তু কী করা উচিত এখনও ঠিক করে উঠতে পারেন নি।

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলাম না। শালা অনেক চুলকানো হয়েছে। এবার খেলাটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া যাক। বললাম, 'কী করবেন সেটা ব্রেন খাটিয়ে আপনাকেই বার করতে হবে। তবে যদি ক্ষমা করেন একটা কথা বলব—'

মিসেস সমাজপতি জিরাফের মতো গলা বাড়িয়ে উদ্‌গ্রীব হয়েই ছিলেন যেন। বললেন, 'ক্ষমা চেয়ে লজ্জা দেবেন না, আপনার যা মনে হয় বলুন।'

'আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে ফোন তুলে আমি মিস্টার সমাজপতির খোঁজ করেছিলাম।'

'হ্যাঁ—'

'আসলে আমি কিন্তু সমাজপতি সাহেবকে চাই নি।'

'তবে কাকে চেয়েছেন?'

'আপনাকে।'

'আমাকে! কেন?' মিসেস সমাজতির গলা শুনে এবার মনে হল, তিনি দস্তুরমতো হকচকিয়ে গেছেন।

বললাম, 'আপনার হাজব্যান্ড সম্পর্কে কিছু ফ্যাক্ট-ট্যাক্ট সাপ্লাই করবার জন্যে।'

'আপনি কী বলছেন আমি কিন্তু একেবারেই বুঝতে পারছি না।'

'না বুঝবারই কথা। কাইন্ডলি এবার আমার কথাগুলো মন দিয়ে শুনুন। তা হলেই বুঝতে পারবেন। আপনার হ্যাজব্যান্ডটি এই মোমেন্টে কোথায় আছেন, আমি জানি।'

মিসেস সমাজপতির গলার ভেতর দিয়ে দারুণ স্পিডে একটা চমক খেলে গেল, 'কোথায় আছেন?'

'গড়িয়াহাটা রোডে 'ম্যাগনিফিসেন্ট' বলে একটা ষোলতলা অ্যাপার্টমেন্ট হাউস আছে, আপনি তা জানেন?'

'না তো। কোথায় সেটা!'

'বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল মিউজিয়ামের কাছাকাছি। মিস্টার সমাজপতি এখন ওই বাড়িটার ফিফটিনথ ফ্লোর আলো করে বসে কিংবা শুয়ে আছেন। স্যুইট নাম্বার ফিফটি এইট।'

'ও আচ্ছা। ওঁর গুরুদেব কি তা হলে বেলেঘাটা থেকে এখন ওখানে এসে আছেন?'

'গুরুদেবকে বোধহয় আপনার হ্যাজব্যান্ড ছেড়েই দিয়েছেন। এখন গুরুদেবী ধরেছেন, আর এই 'মড' গুরুদেবীটি ওই অ্যাপার্টমেন্টেই থাকেন।'

'কত বয়স দেবীটির?'

হে-হে মহাশয়গণ, মানুষের তো শুনেছি গোটা পাঁচেক করে ইন্দ্রিয় আছে। কিন্তু মেয়েদের বোধহয় এক্সট্রা আরো দু-চারটে রয়েছে। নইলে গুরুদেবী নিয়ে কথা হচ্ছে, তার মধ্যে উনি দুম করে বয়েস জিজ্ঞেস করে বসবেন কেন? মহিলার কোন ইন্দ্রিয়ে টরে টক্কা করে কিসের সিগন্যাল

এসে গেছে তিনিই বলতে পারেন।

আমি বললাম, 'গুরুদেব-গুরুদেবীর বয়স কি জিজ্ঞেস করতে আছে মিসেস সমাজপতি! ওঁরা ভগবানের সমবয়সী।'

মিসেস সমাজপতি এবার জানতে চাইলেন, 'দেখতে কেমন?'

এখানেও মহাশয়গণ, মেয়েদের সেই এক্সট্রা ইন্দ্রিয়ের খেলা। আমি বললাম, 'এই তো গাড্ডায় ফেলে দিলেন।'

'মানে—'

গলার স্বরটা ঝট করে খাদে নামিয়ে বললাম, 'গুরুদেব-গুরুদেবীর রূপের কি ডেসক্রিপসান দেওয়া উচিত? শুনেছি এতে নাকি নরকে যেতে হয়। ঠিক আছে একবার না হয় নরকেই যাব। আপনি ইংরেজি সিনেমা দ্যাখেন?'

মিসেস সমাজপতি বললেন, 'দেখি। আমার স্বামী মাঝে মাঝে দেখাতে নিয়ে যান।'

'ফার্স্ট ক্লাস। তা লে ব্যাপারটা বোঝাতে আমার পক্ষে সহজ হবে। জিনা লোলোব্রিজিডা আর এলিজাবেথ টেলরকে নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে?'

'আছে।'

'আপনার স্বামীর 'মড' গুরুদেবীটি ঐ দু'জন সেক্স-বম্বের মিক্সচার বলতে পারেন। একেবারে এইট এট্টি ভোল্ট। ভাইট্যাল স্ট্যাটিসটিকস ছত্রিশ-পঁচিশ-ছত্রিশ।'

'উনি এখন ওখানে কী করছেন?' মিসেস সমাজপতির গলার স্বরে আচমকা এক্সট্রা অনেকখানি ঝাঁঝ ঢুকে গেল যেন।

মহাশয়গণ, বেশ আন্দাজ করতে পারছি বারুদের কাছাকাছি আমি আগুনকে নিয়ে যেতে পেরেছি। আগুনটা আরেকটু এগিয়ে দিতে পারলেই একটা টেরিফিক কান্ড ঘটে যাবে। বললাম, 'আমি যেখানে বসে আছি সেখান থেকে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। আমার মনে হয় উনি সাধন-ভজনই করছেন।'

'কী বিষয়ে সাধন-ভজন করছেন বলতে পারেন?'

'বোধহয় পারি। আমার ধারণা, বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্রের একটা প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস ওখানে চলছে।'

মহাশয়গণ, টেলিফোন লাইনের এধারে বসে টের পাচ্ছি, ইরাপসানের আগের মুহূর্তে ভলক্যানোর চেহারা যেরকম হয় মিসেস সমাজপতির মুখটা নিশ্চয়ই এখন সেইরকম হয়ে গেছে। তিনি গুম মেরে রইলেন, উত্তর দিলেন না।

আমি ডোজটা আরেকটু চড়িয়ে দিলাম, 'মিনিট পঁয়তাল্লিশেক আগে মিস্টার সমাজপতি তাঁর গুরুদেবীর স্যুইটে ঢুকেছেন। এতক্ষণে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসের সেই জায়গাটা বোধহয় চলছে—'

'কোন জায়গাটা?'

'ওই যেখানে বস্ত্রহরণের ব্যাপার ট্যাপারগুলো রয়েছে।' বলতে বলতে গলার স্বরটা ঝপ করে নামিয়ে দিলাম, 'আমার কী মনে হয় জানেন মিসেস সমাজপতি—'

'কী?'

'বস্ত্রহরণ পালা শেষ হবার আগেই আপনার হয়ত গুরুদেবীর আশ্রমে একবার আসা উচিত।'

মিসেস সমাজপতি বললেন, 'বাড়িটার নাম কী যেন বললেন?'

বুঝতে পারছি বাবুদের পলতেতে আগুন প্রায় লাগিয়েই দিয়েছি। আরেক বার বললাম, 'ম্যাগনিফিসেন্ট, ফিফটিনথ ফ্লোর, স্যুইট নাম্বার ফিফটি এইট।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ।'

'না-না, ধন্যবাদ দিয়ে আমাকে লজ্জা দেবেন না।'

'ঠিক আছে। আপনি আমার এত উপকার করলেন অথচ আপনার নামটা কিন্তু জানা হল না।'

'ইন ফ্যাক্ট পিতৃদত্ত আমার কোনো নামই নেই। নিজেই অবশ্য একটা লাগিয়ে নিয়েছি। তবে বলতে লজ্জা করে। দয়া করে ওটা আর জিজ্ঞেস করবেন না।'

'আচ্ছা।' গলার স্বরে মনে হল, মিসেস সমাজপতি রীতিমতো হতভম্বই হয়ে গেছেন। মহাশয়গণ, আপনারা তো আমার নামটা জেনেই গেছেন। কোনো মহিলাকে কি ওটা বলা যায়? যাই হোক বললাম, 'কথা হয়ে গেল। তা হলে ফোনটা এখন রাখছি।'

'ঠিক আছে। নমস্কার।'

'নমস্কার।'

খুব ঠান্ডা মাথায় একটা কাজ সুচারুভাবে শেষ করে টেলিফোনটা ক্রেডেলে রেখে দিলাম। তারপর নেপালি বয়টাকে ডেকে হুইস্কি দিতে বললাম।

আধ ঘন্টায় পাকা দুটি পেগ পাকস্থলীতে চালান করে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালাম। কিছুক্ষণ এলোমেলোভাবে গোটা স্যুইটটায় পায়চারি করে বেড়ালাম। কিন্তু একা একা এত বড় স্যুইটে আর ভাল লাগছে না। আজকের মতো ডিউটি শেষ হয়েই গেছে। আর এখানে থাকার মানে হয় না। এবার কেটে পড়াই ভাল।

বেরুতে গিয়ে হঠাৎ মনে পড়ল, বোদাটা এই স্যুইটে কোনো দিন আসে নি। মাকড়া দিনের পর দিন সোনার বাংলা গলায় ঢেলে লিভারে কড়া ফেলে দিচ্ছে। শালা কনকচাঁপার জন্য এখন খেলে যাচ্ছে। ওকে আগরপাড়া থেকে এক ইঞ্চিও নড়ানো যাবে না। খচড়াটা আবার বিলিতি মাল খেতে টেরিফিক ভালবাসে। মনে মনে ঠিক করে ফেললাম, ওর জন্য তিন চারটে হুইস্কির বোতল নিয়ে যাব।

কিন্তু এতগুলো বোতল তো হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না। নেপালি বয়টাকে চারটে বোতল একটা বাক্স কি ব্যাগে-ট্যাগে পুরে দিতে বললাম। বলার সঙ্গে সঙ্গে বয়টা আলমারি খুলে চারটে খাঁটি স্কচ হুইস্কির বোতল বার করে একটা চটের থলিতে ঢুকিয়ে তার মুখ বেঁধে দিল।

আমি হাত বাড়িয়ে বললাম, 'দে—'

বয়টা আমার হাতে দিল না। মহাশয়গণ, ও টের পেয়ে গেছে এই ষোল শ স্কোয়ার ফুটের ফ্ল্যাটটা আমারই, আমিই এটার মালিক। কাজেই মালিক ব্যাগ বয়ে নিয়ে যাবে, সেটা তো আর হয় না। বয়টা বলল, 'নহী। চলিয়ে ম্যায় আপকেঃ সাথ যাতে হেঁ—'

তার মানে এখন নিচে নেমে একটা ট্যাক্সি ফ্যাক্সি নিতে হবে। কেননা চারটে বোতল নিয়ে ট্রামে-বাসে ওঠা অসম্ভব ব্যাপার। ট্যাক্সি নিয়ে সোজা শিয়ালদা চলে যাব, সেখান থেকে ট্রেনে আগরপাড়া।

স্যুইটে তালা লাগিয়ে বয়টা আমার সঙ্গে সঙ্গে লিফটে করে নিচে নেমে এল। লিফট-বক্স থেকে বাইরে বেরিয়ে খোলা কম্পাউন্ডে আসতেই দেখতে পেলাম একটা বিরাট ইম্পোর্টেড আমেরিকান কার সামনের প্রকান্ড গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকে পার্ক করল। তক্ষুণি দরজা খুলে মধ্যবয়সী এক মহিলা নেমে এলেন।

তাঁর চেহারাখানা দেখবার মতো। প্রতিমা-ট্রতিমার মতো মুখ, সরু চিবুক, বড় বড় চোখ, ছোট কপাল, কাঁচাপাকা ঘন চুল, কপালে প্রকান্ড সিঁদুরের টিপ, সিঁথির ওপর দিয়ে ব্রহ্মতালু পর্যন্ত মোটা করে সিঁদুরের দাগ, টকটকে গায়ের রং। তাঁর পরনে লালপাড় দুধের মতো ধবধবে জমির গরদের শাড়ি আর গরদেরই ব্লাউজ। হাতে গোছা গোছা সোনার চুড়ি, গলায় চওড়া সীতা হার।

মহাশয়গণ, আমি যে আমি, বার ঘাটের জল-খাওয়া একজন উৎকৃষ্ট চীট, সমাজপতির ভাষায় একজন সাবলাইম খচ্চর, লাইফে কাউকে যে শ্রদ্ধাভক্তি করে না, তার পর্যন্ত মহিলার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে একটা প্রণাম ঠুকতে ইচ্ছা করল।

গাড়ি থেকে নেমেই সোজা মহিলা অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের দিকে এগিয়ে গেলেন।

আমরা গেটের কাছে ছিলাম। তিনি আমাদের দেখতে পান নি। আমার ঘাড়ের পাশ থেকে নেপালি বয়টা বলে উঠল, 'ইয়ে মিসেস সমাজপতি হ্যায়, উ ক্যায়সে ইধর আয়ী?'

ইনিই তা হলে মিসেস সমাজপতি! আমার নার্ভের ভেতর দিয়ে টুংটাং করে যেন অর্কেস্ট্রা বেজে গেল।

হে-হে মহাশয়গণ, কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বোঁ করে একশ আশি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘুরে গেলাম। বললাম, 'কী বললি?'

বয়টা বলল, 'মিসেস সমাজপতি।'

'তুই মিসেস সমাজপতিকে চিনলি কী করে?'

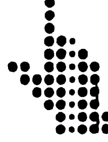
'সমাজপতি সাহেবের কোঠিতে আমি একবার গিয়েছিলাম। সাহেবই নিয়ে গিয়েছিলেন।'

গোড়ালির ওপর ভর দিয়ে একশ আশি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে উল্টো দিকে আবার ঘুরলাম। তার মানে আগে যেভাবে দাঁড়িয়েছিলাম সেইভাবেই আবার দাঁড়ালাম। কিন্তু কোথায় মিসেস সমাজপতি? কোথাও দেখতে পেলাম না। তার মানে এতক্ষণে তিনি লিফটে করে হাউই-এর মতো ফিফটিনথ ফ্লোরে পৌঁছে গেছেন।

মহাশয়গণ, আমি কি একবার ওখানে যাব? আপনাদের চোখমুখের চেহারা দেখে মনে হচ্ছে ফিফটিনথ ফ্লোরে যাওয়াটা আপনারা পছন্দ করছেন না। কারেক্ট, কারেক্ট। সব নাটকই যে সামনে বসে দেখতে হবে তার মানে নেই। ঠিক করে ফেললাম, স্বামী একটি টেরিফিক চেহারার সেক্স বম্বকে নিয়ে বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্রের ক্লাস করছে আর দুম করে স্ত্রী সেখানে গিয়ে হানা দিয়েছে, তারপর কী কী ঘটতে পারে সেই সব দৃশ্য-টৃশ্য ভাবতে ভাবতে আমি আগরপাড়া চলে যাব।

কাজেই এই গেটের কাছটায় ল্যাম্পপোস্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার মানে হয় না। বয়টাকে বললাম,'একটা ট্যাক্সি ধর তো—'

মিনিট পাঁচেক ছোটাছুটি করে রাস্তা থেকে ট্যাক্সি ধরে ফেলল বয়টা। হুইস্কির ব্যাগ হাতে ঝুলিয়ে আমি উঠে পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটা স্টার্ট দিল।



হে-হে মহাশয়গণ, অন্য দিনের চাইতে আজ ঢের আগেই ব্যারাকবাড়িতে ফিরে এলাম। কত আর রাত হবে—বড় জোর ন'টা। কিন্তু মহাশয়গণ, একটু ভাল করে লক্ষ করুন, এরই ভেতর ঘরে ঘরে খিল পড়ে গেছে। মাকড়াগুলোর সন্ধে হলেই বউ নিয়ে বিছানায় ওঠা চাই। শুদ্ধু বাংলায় কী একটা কথা যেন আছে—ও হ্যাঁ, আহার নিদ্রা আর মৈথুন—এই শালারা সেটাকেই জীবনের লাস্ট ওয়ার্ড ধরে ঝুলে বসে আছে। মহাশয়রা ফ্যামিলি প্ল্যানিং আর 'দো আউর তিন বাচ্চে', বলে চেঁচালে কী হবে! ওয়ার্ল্ডের কত কারখানায় লক আউট হয়, ক্লোজার হয় কিন্তু মানুষ তৈরির এই ফ্যাক্টরিগুলোতে ক্লোজার ফ্লোজার বলে কোনো কথা নেই। তার ফলে আউটপুট কিরকম হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে ভেবে দেখুন। পৃথিবীর সব প্রোডাকসান হয়ত বন্ধ হবে কিন্তু এই উৎপাদনটি কোনোদিন থামবে না।

যাক গে, আমার একশ তেত্রিশ নম্বর আস্তানায় নিজের ঘরটায় সুড়ুৎ করে ঢুকে পড়লাম। কিন্তু বোদা নেই। ঘরের এক ধারে সুমনার দেওয়া হেরিকেনটা ধিকিয়ে ধিকিয়ে জ্বলছে। চেঁচিয়ে দু একবার ডাকলাম 'বোদা, বোদা—'

সাড়া পাওয়া গেল না। শালা গেল কোথায়? যেখানেই যাক নিশ্চয়ই ফিরে আসবে। ওর সম্বন্ধে আপাতত চিন্তা ফিন্তা না করলেও চলবে।

হুইস্কির ব্যাগটা নামিয়ে রেখে চাবি ঘুরিয়ে হেরিকেনের পলতেটা উস্কে দিলাম। তারপর ট্রাউজার ফ্রাউজার ছেড়ে একটা পাজামা গলিয়ে নিলাম। তার ওপর কাঁধে তোয়ালে চাপিয়ে কুয়োতলার দিকে চলে গেলাম।

মিনিট পাঁচেক বাদে কুয়োর পাড় থেকে ফিরে এসে দেখি ঘরের মধ্যে সুমনা বসে আছে। মহাশয়গণ, তাকে এই মুহূর্তে এখানে দেখব ভাবি নি। বললাম, 'কী ব্যাপার, তুমি এই রাত্তির বেলায়?'

সুমনা বলল, 'আপনার খাবার নিয়ে এসেছি।'

তার মানে নিজেদের ঘর থেকে সুমনা নজর রেখেছিল। আমাকে ফিরতে দেখে চলে এসেছে। তার কথায় আমার ভুরু কুঁচকে গেল। বললাম, 'তোমাকে তো সেইদিনই বলে দিয়েছিলাম আমরা হোটেলে খাব। তোমরা আমার খাওয়ার ব্যবস্থা করলে এখান থেকে তাঁবু তুলে ফেলতে হবে।'

সুমনা বলল, 'আপনার কথা মনে আছে। আপনি বলার পরও আমাদের ঘর থেকে খাবার এনে দেব, এত সাহস আমার নেই।'

'তবে?'

আমার কথাটা বুঝতে পারল সুমনা। অর্থাৎ কিনা নিজেরা যদি না দেয় এই খাবার তারা পেল কোত্থেকে? সুমনা বলল, 'আপনার পার্টনার পাঞ্জাবির হোটেল থেকে বুটি-মাংস কিনে আমার কাছে রেখে গেছে। বলে গেছে আপনি ফিরে এলে যেন দিই। মাংসটা ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল, আমি গরম করে এনেছি। এতে যদি আপত্তি থাকে মাংসটা না হয় আবার ঠান্ডা করে দিচ্ছি।'

বাইরে থেকে যেরকম দেখা যায়, সুমনা আসলে ঠিক ততটা নিরীহ গোবেচারা নয়, তার ভেতরেও খানিকটা ফায়ার-টায়ার রয়েছে। আমি হাসলাম। বললাম, 'ঠিক আছে। ঠান্ডা করলে বোধহয় খাওয়াটা আর হয়ে উঠবে না, ফেলেই দিতে হবে।' বলতে বলতে বোদার কথা ভাবছিলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'বুটি মাংস কিনে দিয়ে সে গেল কোথায়?'

'তা কিছু বলে নি। তবে আপনাকে জানাতে বলেছে আজ আর ফিরবে না।'

'ফিরবে না?'

'না।'

মহাশয়গণ, শালা আমার হাতের ভেতর থেকে হড়কে বেরিয়ে গেল নাকি? পরক্ষণে মনে হলো, যাবে কোথায়? খাওয়া-দাওয়া, আরাম-টারাম, রোজ রোজ মদ্যপান, পার্মানেন্ট শেলটার—এ সব না হয় ছেড়েই দিলাম। কিন্তু কবিরাজ নকুলেশ্বর দেবশর্মা ভিষকরত্নর যেমেয়েটার নাম কনকচাঁপা—সে বোদা' মাকড়ার নাকে একটা বঁড়শি গেঁথে দিয়েছে। সুতরাং মাল আর কতদূর যাবে! এই জায়গাটার দু'শ গজ রেডিয়াসের ভেতর তাকে ঘুর ঘুর করতেই হবে। সুতরাং ওর সম্বন্ধে মাথা-ফাতা না ঘামালেও চলতে পারে। বুটি ছিঁড়ে এক টুকরো মাংসের সঙ্গে মুখে পুরে চিবুতে শুরু করলাম।

খাবার টাবার দিয়েই কিন্তু সুমনা চলে গেল না। মনে হল, তার আরো কিছু বলবার আছে।

হে-হে মহাশয়গণ, আপনারা তো আমাকে জানেনই। আমি শালা একটা ফার্স্ট ক্লাস ফোরটোয়েন্টি, কোনো ব্যাপারেই তেমন কৌতূহল টৌতূহল নেই, সুমনা আমার তিন গজের মধ্যে বসে থাকা সত্ত্বেও ওয়ার্ল্ডের সব চাইতে নিরাসক্ত ফিলজফারের মতো আমি বুটি টুটি চিবিয়েই যেতে লাগলাম।

যা ভেবেছিলাম তা-ই। একসময় ব্যাগের ভেতর থেকে বেড়াল আউট করে ফেলল সুমনা। বলল, 'আপনার সঙ্গে আমার দুটো কথা ছিল।'

'ফাইন। আগে এক নম্বরটা বলে ফেল।'

'আপনি কিছু মনে করবেন না তো?'

'কিচ্ছু না। আমার মাইন্ড বলে কোনো কারবারই নেই, মনে করবার কথাই ওঠে না, স্টার্ট করে দাও—'

'মনে আছে ফান্ডগুলো ওপেন করার পর জিজ্ঞেস করেছিলাম এতে আপনার বিপদ আছে কিনা?'

'আবার তাই জিজ্ঞেস করবে নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'ব্রেনে বুঝি ওটা সেট করে গেছে?'

সুমনা বলল, 'আপনার যা ইচ্ছা বলুন। কিন্তু আপনি কোত্থেকে এত লোককে এত টাকা দিয়ে যাবেন, আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না।'

মেয়েটার সত্যিই বারটা বেজে গেছে। আমার জন্য দেখছি ওর ঘুমটুম হচ্ছে না। মহাশয়গণ, কেউ আমার সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা করছে, এটা জানতে পারলেই আমার টেরিফিক অস্বস্তি হয়। ভাল করে খেতে পারি না, বদহজম হয়ে রেগুলার চোঁয়া ঢেকুর উঠতে থাকে। শালা আমি হলাম একটা চিট, একজন উৎকৃষ্ট প্রতারক। আমার কথা যে কারো বেশি ভাবা উচিত নয়, এটা কেমন করে সুমনাকে বোঝাব?

যাক গে, বিকেলবেলা সুমনা যখন জিজ্ঞেস করেছিল ফান্ডগুলোর টাকা কোত্থেকে আসবে তখন বলেছিলাম সে একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। মহাশয়গণ, নিজের ওপর যতই আমার বিশ্বাস থাক, টাকাটা কোত্থেকে আসবে সে সম্বন্ধে পরিষ্কার কোনো আইডিয়া তখন আমার ছিল না। এখনও নেই।

সুমনাকে বললাম, 'কিছু ভেবো না, যদ্দিন কারেন্সি নোট বাজারে চালু থাকবে তদ্দিন আমার ফান্ডগুলো বন্ধ হবে না।'

সুমনা আমার কথা কতটা বিশ্বাস করল, সে-ই জানে। তবে এ ব্যাপারে কিছু বলল না।

চুপচাপ খানিকক্ষণ কেটে যাবার পর আমি বললাম, 'এবার তোমার সেকেন্ড কথাটা বল।'

সুমনা বলল, 'আপনার জানাশোনা চোখের ডাক্তার আছে?'

'কেন বল তো?'

'দিদির চোখদুটো একেবারেই যেতে বসেছে। বাবা বেঁচে থাকতে একবার ডক্তার দেখানো হয়েছিল। ডাক্তার বলেছিল অপাবের্শন করাতে হবে। তার কিছুদিন বাদে বাবা মারা গেলেন। অপারেশনটা আর করানো হল না।' বলতে বলতে একটু থামল সুমনা। পরক্ষণেই আবার শুরু করল, 'কিন্তু এখন আর অপারেশন না করালেই না। দিদিটা চোখ নিয়ে ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে।'

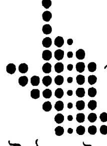
বললাম, 'সেরকম জানাশোনা ডাক্তার নেই। আচ্ছা দেখা যাক তোমার দিদির জন্য কী করতে পারি।'

এরপর এলোমেলো দু একটা কথা হতে লাগল। তার ভেতর আমার খাওয়া হয়ে গেল।

খাওয়াটা শেষ হবার পর সুমনা আর বসল না। উঠতে উঠতে বলল, 'আচ্ছা এখন আমি যাই—'

আমি ঘাড় হেলিয়ে দিলাম, 'ঠিক আছে।'

সুমনা চলে গেল। আমিও আঁচিয়ে এসে হেরিকেন নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম।



পরের দিন রীতিমতো বেলা করে উঠে মুখটুখ ধুয়ে রাস্তার দোকান থেকে চা-ফা খেয়ে আবার যখন ব্যারাকবাড়িতে ফিরে এলাম ততক্ষণে রোদটা গনগনে হয়ে উঠেছে।

মহাশয়গণ, ক'দিন ধরে বোদা মাকড়াটা আমার গায়ে আঠার মতো সেঁটে ছিল। দু'জনে মিলে যুগলবন্দি হয়ে দিন কাটিয়ে দিচ্ছিলাম। কিন্তু কাল রাত্তিরটা আমার একা-একা কেটেছে, আজ সকালেও বোদা নেই। আমার একটু ফাঁকা ফাঁকাই লাগছে। হ্যাবিট মহাশয়গণ, হ্যাবিট। 'হ্যাবিট ইজ দা সেকেন্ড নেচার' না কি যেন বলে, আমার হয়েছে সেই অবস্থা। বোদা শালা কাছে থেকে থেকে আমার অভ্যেস খারাপ করে দিল নাকি? একা একা লাইফের তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশটা বছর ফাইন কাটিয়ে দিয়েছি। এখন বোদাটা আমার সঙ্গে জুড়ে গিয়ে বহুত গাড্ডায় ফেলে দিল। ওকে ছাড়া আজকাল বেশ খারাপ লাগতে শুরু করেছে দেখছি।

যাক গে, বোদার ভাবনাটা টোকা মেরে গা থেকে ঝেড়ে ফেললাম। এখন আমার মাথায় অনেক ঝামেলা। ইন্ডিয়ার যত প্রভিন্স আর যত রকম ধর্মের লোক আছে তাদের একশ আটটা নামের দুটো লিস্ট আমাকে তৈরি করতে হবে।

একটা কাগজ আর পেন নিয়ে নিজের নামাবলীর তালিকা তৈরি করতে বসে গেলাম। লেখা যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে সেই সময় হুড়মুড় করে বোদা ঘরে এসে ঢুকল। কাগজ থেকে মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলাম, 'কাল কোথায় ছিলি?'

বোদা বলল, 'টিটাগড়ে গুরু।'

'কেন?'

'বলছি গুরু, বলছি। তার আগে আমাকে লেটে পড়তে দাও।' আমাদের বিছানা সব সময় মেঝেতে পাতাই থাকে। অনন্তশয্যা না কি যেন বলে, এটার হয়েছে সেই দশা। বোদা সত্যি সত্যি বিছানাটায় টান টান শুয়ে পড়ল। শুয়ে শুয়েই বলল, 'ওখানে যাত্রা-উৎসব হচ্ছে। তাই দেখতে গিয়েছিলাম।'

আমি বললাম,'যাত্রা দেখতে যাবি, আগে বলিস নি তো?'

বোদা ট্যারাবাঁকা দাঁত বার করে হাসল। তারপর চোখ মেরে বলল, 'আগে কি জানতাম কনকচাঁপা যাত্রা শুনতে টিটাগড়ে যাবে!'

'বুঝেছি, তুমি শালা লড়তে গিয়েছিলে।'

'তুমি আবার বুঝবে না! তোমার ব্রেনখানা যা গুরু, একেবারে গোল্ড দিয়ে বাঁধানো।' খ্যালখ্যাল করে একটু হাসল বোদা। তারপর পাশ ফিরে শুলো। ঘুমে তার চোখ জড়িয়ে আসছে। আমি এবার বললাম, 'জান কয়লা করে এত। যে খাটছিস সুবিধে-টুবিধে হবে? কনকচাঁপা কিরকম গন্ধ-টন্ধ ছাড়ছে?'

ঘুমজড়ানো গলায় বোদা বলল, 'টেরিফিক—'

'মাল খেলিয়ে শেষ পর্যন্ত তুলতে পারবি তো?'

'মনে হচ্ছে গুরু—'

'তা হলে লড়ে যা।'

আবছা করে একটু হাসল বোদা। তারপর হঠাৎ কি মনে পড়তে দারুণ কষ্ট করে চোখদুটো কোয়ার্টার ইঞ্চি মেলে বলল, 'গুরু তোমার ফান্ডগুলো বিলকুল ফাঁকা হয়ে গেছে। যা ক্যাশ ছিল খচড়ারা সব হাওয়া করে দিয়েছে।'

বললাম, 'ঘাবড়াস না, শিগগিরই নতুন সাপ্লাই এসে যাবে।'

'অ—' বোদার চোখ আবার বুজে এল।

আমি এবার বললাম, 'ঘুমিয়ে পড়লি যে? একটা কথা ছিল।'

'বল।'

'দয়া করে চোখের ড্রপসিনটা একটু খুলতে হবে।'

আরেক বার চোখ মেলল বোদা, 'কী বলছ?'

'ঐ দ্যাখ—' আঙুল বাড়িয়ে ঘরের এক কোণে সেই হুইস্কির বোতলগুলো দেখিয়ে দিলাম।

চোখের পলকে বোদার ঘুমটুম ছুটে গেল। ধাঁ করে উঠে বসতে বসতে সে বলল, 'গুরু, বিলিতি মাল মনে হচ্ছে?'

'ইয়েস। কনকচাঁপা তোমার নাকে বঁড়শি আটকে দিয়েছে। মাকড়া তোমার তো কলকাতায় যাবার সময় নেই। খেলে যাও শালা, খেলে যাও। কিন্তু আমি তোমাকে ফেলে রোজ রোজ হুইস্কি-রাম-জিন চালিয়ে যাব, তা তো আর পারি না। তাই এই বোতল চারটে নিয়ে এলাম।'

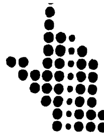
বোদা সোজা আমার পায়ের ওপর ডাইভ মারল। মুখটা পায়ের পাতায় ঘষতে ঘষতে বলল, 'তুমি গুরু আর জন্মে আমার জন্মদাতা ফাদার ছিলে।'

আস্তে করে এবং সস্নেহে বোদাকে একটা লাথি হাঁকিয়ে বললাম, 'মাকড়া এবার শুয়ে পড়।'

বোদা আবার শুয়ে পড়ল। আমি ফের সেই একশ আটটা নামের লিস্ট খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মিলিয়ে নিতে লাগলাম।

মহাশয়গণ, মিস্টার সমাজপতি আমাকে কাঁটায় কাঁটায় এগারটায় গড়িয়া হাটার অ্যাপার্টমেন্টে হাজির থাকতে বলেছেন। এগারটায় ওখানে থাকতে হলে ন'টার ভেতর বেরিয়ে পড়তে হয়। কবজি উল্টে দেখলাম এখন হাত-ঘড়িতে সাড়ে আটটা। তার মানে আর দেরি করা চলে না।

পনের মিনিট বাদে চান-ফান সেরে আমি যখন বেরুলাম, বোদা গুমিয়ে পড়েছে। তার নাকের ভেতর থেকে মিহি আর মোটা আওয়াজ বেরিয়ে যাত্রা-পার্টির কনসার্ট বাজিয়ে যেতে লাগল।



সাবার্বন ট্রেন এবং বাস যখন আমাকে গড়িয়াহাটায় পৌঁছে দিল তখন এগারটা বেজে দশ।

লিফটে করে হাউই-এর মতো টুয়েলভথ ফ্লোরে এসে দেখি সমাজপতি তখনও আসেন নি। বয়টাকে জিজ্ঞেস করতে সে-ও সঠিক জবাব দিতে পারল না।

মহাশয়গণ, সমাজপতি পাক্কা সাহেব। ব্রিটিশ পাংচুয়ালিটি বলে একটি কথা আছে না? সেটা তিনি মিনিট এবং সেকেন্ড ধরে মেনে চলেন। যাই হোক, এখন কি আর করা যাবে, তাঁর জন্য কিছুক্ষণ ওয়েট করেই দেখা যাক। আমি সোজা ড্রইং রুমে গিয়ে একটা সোফায় বসে সেন্টার টেবলের ওপর দু পা তুলে ক্রস করে নাচাতে লাগলাম।

বয়টা দরজায় এসে দাঁড়াল। জিজ্ঞেস করল, 'সাব আপকো কুছ চাহিয়ে?'

'না—' বলতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত বললাম, 'এক কাপ কফি বানাতে পারবি?'

'জি—'

পাঁচ মিনিট পর কফি নিয়ে বয়টা যখন ফিরে এল আচমকা সেই কথাটা মনে পড়ে গেল আমার। পা নামিয়ে সামনের দিকে অনেকখানি ঝুঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কাল মিসেস সমাজপতিকে আর দেখেছিলি?

বয়টার কুতকুতে মঙ্গোলিয়ান চোখ থেকে একসঙ্গে ভয় এবং আতঙ্ক ফিনকি দিয়ে যেন বেরিয়ে এল। মহাশয়গণ, গলাটা পুরোপুরি খাদে ঢুকিয়ে ফিস ফিসিয়ে সে বলল, 'সাহাব, কাল বহোত গড়বড় হো গিয়া—'

সোফার হাতলের ওপর গা এলিয়ে চোখ কুঁচকে তাকালাম, 'কী হয়েছে রে?'

'সমাজপতি মেমসাহাব বাঘিন হ্যায়।'

'কী করেছে সে?'

মুখ ওপরে তুলে আঙুল বাড়িয়ে সিলিং-এর দিকটা দেখিয়ে দিল বয়টা। গলার স্বর আরো কয়েক কিলোমিটার খাদে নামিয়ে বলল, 'উঁহা এক গোরী মেমসাব হ্যায়। বহোত খুবসুরত, বিলকুল ফিলমি হিরোইনকা তরা।'

তার মানে ফিফটিনথ ফ্লোরের ডোরার কথা বলছে বয়টা। আমি বললাম, 'আগে বাড়ো—'

এরপর যা বলল বয়টা তা এই রকম : মিস্টার সমাজপতি নাকি ডোরার ফ্ল্যাটেই ছিলেন। তাঁর আপনা মেমসাহাব অর্থাৎ মিসেস সমাজপতি সোজা সেখানে গিয়ে দমাদ্দম লাথি হাঁকিয়ে দরজা খোলান। ভাগোয়ান শিবশম্ভু কসম, সে নিজে কিছু দেখে নি, তবে এই অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের অনেকেই নাকি নিজের চোখে দেখেছে, সমাজপতি সাহাবকে চুলের ঝুঁটি ধরে স্রেফ পেটাতে পেটাতে নিচে নামিয়ে গাড়িতে পুরে চলে গেছেন তিনি। ডোরা কী বলতে গিয়েছিল, সেও দু-চারটে লাথি-টাথি খেয়েছে। সমাজপতি মেমসাহাব যেন বিলকুল মা কালী। ভাগোয়ান শিবশম্ভু জানেন, বাড়িতে নিয়ে সাহাবের কী হাল তিনি করে ছেড়েছেন!

হে-হে মহাশয়গণ, আমার দারুণ মজাও লাগছিল, আবার একটু দুঃখ-টুঃখও হচ্ছিল। খচড়ামো করে মিসেস সমাজপতিকে ফোন করে একটা টেরিফিক ঝামেলাই বাধিয়ে দিয়েছি, দেখা যাচ্ছে। আমি কী বলতে যাচ্ছিলাম, আচমকা ফোনটা বেজে উঠল। ধীরে সুস্থে ক্রেডেল থেকে সেটা তুলে কানে লাগিয়ে 'হ্যালো' বলতেই সমাজপতির গলা ভেসে এল, 'কে স্বয়ম্ভু বলছ?'

আমার মনে হয়েছিল সমাজপতি যখন এগারটায় আসেন নি, নিশ্চয়ই তাঁর একটা ফোন আসবে। বললাম, 'হ্যাঁ স্যার, আপনার জন্যেই ওয়েট করছি।'

'এগারটার সময় তোমার ওখানে আমার যাবার কথা ছিল। কিন্তু হঠাৎ একটু অসুস্থ হয়ে

পড়েছি। তাই যাওয়া হল না।'

মহাশয়গণ, সমাজপতির স্বাস্থ্যের জন্য আমার যেন শালা ঘুম হচ্ছে না, এই রকম উদ্বেগের গলায় বললাম, 'স্যার, কী হয়েছে আপনার?'

সমাজপতি বললেন, 'তেমন কিছু না। ডেন্ট ওরি। এক কাজ কর, তুমি আমার বাড়িতে একবার চলে এস। ওয়েল, সেই নামের লিস্টটা করেছ?'

'করেছি স্যার।'

'ভেরি গুড। চলে এস তা হলে—' বলে যোধপুর পার্কের একটা ঠিকানা দিলেন সমাজপতি। ওটা আমার জানা। কাল রাত্তিরে ওই ঠিকানাতেই মিসেস সমাজপতির সঙ্গে কথা বলেছি।

কিছুক্ষণের মধ্যে সমাজপতির বাড়ি পৌঁছে গেলাম। মহাশয়গণ, একজন মাল্টি-মিলিয়নেয়ার ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের বাড়ির চেহারা কিরকম হতে পারে আন্দাজ করে নিন। সামনে বিরাট লন, কেয়ারি-করা বাগান, বাদামি নুড়ি-বিছানো রাস্তা, রাস্তার দু'ধারে কনিক্যাল চেহারার ঝাউগাছ। লনে গার্ডেন আমব্রেলা, টেনিস কোর্ট, ফোয়ারা, ইত্যাদি ইত্যাদি।

নুড়ির রাস্তা পেরিয়ে ড্রইং রুমে ঢুকতেই পার্সিয়ান কাপের্টে আমার পা ছ'ইঞ্চি ঢুকে গেল। ঘরটার চারদিকে সোফা-টোফা, সেন্টার টেবল, ডিভান, অ্যাকুযেরিয়াম এবং বিশাল চেহারার একটা টি-ভি সেটও চোখে পড়ল।

সমাজপতি আমার জন্য ড্রইং রুমে অপেক্ষা করছিলেন। একাই ছিলেন তিনি। তাঁর কপালে এবং হাতে ছোট বড় ব্যান্ডেজ দেখলাম। হে-হে মহাশয়গণ, আমার পেটের ভেতর হাসি বগবগিয়ে উঠছিল। এই ব্যান্ডেজগুলো কিসের শীলমোহর বুঝতে খুব একটা অসুবিধা হচ্ছে না। কিন্তু মুখে দশটা পুত্রশোকের চেহারা ফুটিয়ে বললাম, 'স্যার, আপনি ইনজিওরড হলেন কি করে?'

সমাজপতি বললেন, 'বাথরুমে পড়ে গিয়েছিলাম। ও কিছু না, বোসো—' পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল সমাজপতি তাঁর ব্যান্ডেজ-ট্যান্ডেজ নিয়ে কোনো কথা বলতে চান না। আমি তাঁর মুখোমুখি একটা সোফায় বসে পড়লাম।

সমাজপতি বললেন, 'নামের লিস্ট দাও—'

পকেট থেকে ভাঁজ করা একটা কাগজ তাঁর হাতে দিলাম। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে সমাজপতি বললেন, 'পারফেক্টলি অলরাইট।'

আমি দাঁত বার করে বললাম, 'স্যার লিস্টটা বানাতে বানাতে কী মনে হচ্ছিল জানেন?'

'কী?'

'নিজের মধ্যে বিশ্বরূপ দেখছি।'

'ফাইন বলেছ।' বলেই পাশ থেকে একটা বড় ব্রিফকেস তুলে সমাজপতি খুলে ফেললেন। দেখলাম একশ আটটা ব্যাঙ্কের স্পেসিমেন সিগনেচারের কার্ড সেখানে রয়েছে। কার্ডগুলো বার করে তিনি বললেন, 'তোমার লিস্টের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে কার্ডগুলোতে সিগনেচার বসাও। আর কোন ব্যাঙ্কে কোন সিগনেচারটা দিলে আরেকটা লিস্ট বানিয়ে নোট করে নাও।'

মহাশয়গণ, বোঝা যাচ্ছে ওই একশ আটটা নামে একশ আটটা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা হবে। আধ ঘন্টার মধ্যে একশ আটটা অটোগ্রাফ লাগিয়ে নিজের আরেকটা নামাবলীর তালিকা বানিয়ে

তার সঙ্গে ব্যাঙ্কগুলোর নাম টুকে রাখলাম। আমি তো মহাশয়রা পঞ্চনন তর্করত্নের মতো টেরিফিক মেমোরিওলা লোক নই যে একবার দেখলেই মনে করে রাখতে পারব। ব্যাঙ্কগুলোর নাম যাতে গোলমাল না হয়ে যায় সেই জন্য টুকে রাখা দরকার।

সমাজপতি কার্ডগুলো ফের ব্রিফকেসে পুরতে পুরতে বললেন, 'দু' দিনের ভেতর তোমার নামে অ্যাকাউন্টগুলো খোলা হয়ে যাবে। আর খোলা হলেই পাশবুক আর চেক বই-গুলো তোমাকে দিয়ে দেব।'

'ঠিক আছে স্যার। কাজ তো হয়ে গেল। এবার আমি যেতে পারি?'

'আরে না না, এখনই যাবে কি। মিস্টার মিটার তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। তিনি না আসা পর্যন্ত তুমি যেতে পাববে না।'

'কে মিস্টার মিটার?'

'অভ্যুদয় মিটার, মাই ফ্রেন্ড।'

এবার মনে পড়ে গেল। মহাশয়গণ, আপনারা তো জানেন কোনো কারণেই আমি অবাক হই না। দাবুণ নিবাসক্তভাবে, অনেকটা ফিলজফারের মতো জিজ্ঞেস করলাম, 'আমার সঙ্গে মিটার সাহেবের কিছু দরকার আছে?'

সমাজপতি বললেন, 'তাই তো মনে হয়।'

এবপর খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করা নিশ্চয়ই ভদ্রলোকের কাজ নয়। কিন্তু আপনারা তো জানেন আমি একটা থার্ড ক্লাস চিট, একটা ফোর টোয়েন্টি। মহাশয়গণ, কোনটা ভদ্রতা আর কোনটা অভদ্রতা, আমি এসব ঠিক বুঝি না। দুম করে জিজ্ঞেস কবে বসলাম, 'কী দরকার আপনি জানেন স্যার?'

'না। একটু ওয়েট কর, মিস্টাব মিটার এলেই সব জানতে পারবে।'

'ঠিক আছে।'

এরপর কিছুক্ষণ এলোমেলো কথা চলল। আর তার মধ্যেই মিস্টাব অভ্যুদয় মিটার, বিজনেসম্যান-কাম-পলিটিসিয়ান, ড্রইংরুমে এসে ঢুকলেন।

হে-হে মহাশয়গণ, অভ্যুদয় মিটারকে নিশ্চয়ই আপনাবা মনে করে রেখেছেন। সেই যে থিয়েটার রোডে, এখন যার নাম সেক্সপিয়র সরণি, সামতানির ফ্ল্যাটে আমার অনারে একটা পার্টি দেওয়া হয়েছিল, সেখানে তিনি ছিলেন।

মিটার সাহেবের চেহারার একটু ডেসক্রিপসান দেওয়া যেতে পারে। মাঝারি হাইট, বয়স পঞ্চান্ন-ছাপান্ন। গায়ের রং দারুণ ফর্সা। চামড়া এত পাতলা যে তলায় রক্ত চলাচল দেখা যায়।

লোকটার মুখ গোল, চওড়া কপাল, মাথায় বাদামি রং-এর পাতলা চুল। থুতনির তলায় তার দু'তিনটে থাক—অনেকটা গলকম্বলের মতো দেখায়। মিটার সাহেব তাঁর শরীরে প্রচুর চর্বি জমিয়ে ফেলেছেন। এ সবই হুইস্কি এবং জিনটিনের অবদান।

তাঁর পরনে সেদিনও দেখেছি, আজও দেখলাম দারুণ দামি স্যুট। মেরুন রং-এর একটা টাই গলা থেকে ঠিক নাভি পর্যন্ত নেমে এসেছে।

অভ্যুদয় মিটার বললেন, 'এই যে স্বয়ম্ভু, এসে গেছ দেখছি।'

আমি চোখেমুখে বিনয়ের মবিল লাগিয়ে বললাম, 'হ্যাঁ, স্যার—'

সমাজপতি বললেন, 'বসুন মিটার সাহেব, বসুন—'

অভ্যুদয় মিটার আমার ঠিক পাশের সোফাটিতে নিজের বডিওয়েট ছেড়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখ গিয়ে পড়ল সমাজপতির সেই ব্যান্ডেজগুলোর ওপর। কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে তিনি বললেন, 'কী ব্যাপার, অ্যাকসিডেন্ট টেন্ট হয়েছে নাকি?'

'হ্যাঁ, এই সামান্য—'

'কী করে হল?'

'বাথরুমে পড়ে গিয়েছিলাম।'

ঝপ করে গলা নামিয়ে অভ্যুদয় মিটার বললেন, 'না কি অন্য কোনোরকম পদস্খলনের ফল?'

এই শালা অভ্যুদয় মিটারটা সমাজপতির ক্যারেক্টার-ফারেক্টার জানে নাকি? এত যখন বন্ধুত্ব তখন জানাই সম্ভব।

সমাজপতি সারা গা দুলিয়ে বগবগিয়ে হেসে উঠলেন। মুখে কিন্তু কিছু বললেন না। দেখুন মহাশয়গণ, হারামজাদা কিরকম একজন উৎকৃষ্ট খচ্চর।

অভ্যুদয় চোখ কুঁচকে আগের সুরেই বললেন, 'তাহলে আমি যা ভাবছি তাই নাকি?'

সমাজপতি এবার মুখ খুললেন, 'আপনার হল এক্সরে আই, হাড়ের ভেতর পর্যন্ত দেখতে পান। এসব ব্যাপারে আপনাকে ফাঁকি দেওয়া আমার এক জন্মের কাজ নয়।'

হে-হে মহাশয়গণ, অভ্যুদয় মিটার এবার কী করলেন জানেন? দুই হাত জোড় করে, ঘাড়টা পাক্কা দেড় ফুট হেলিয়ে তেলতেলে বিগলিত মুখে বললেন, 'কি যে বলেন মিস্টার সমাজপতি, হিউম্যান ক্যারেক্টর সম্পর্কে আমার যেটুকু জ্ঞান সবই আপনার কাছ থেকে পাওয়া।'

'বলছেন?'

'একশ বার।'

সমাজপতি অল্প একটু হাসলেন, তারপর বললেন, 'এবার কাজের কথায় আসা যাক। স্বয়ম্ভুর সঙ্গে আপনার কী দরকার যেন ছিল?'

অভ্যুদয় বললেন, 'সামতানির ফ্ল্যাটে সেই পার্টির দিনে কী কথা হয়েছিল, মনে আছে?'

'একটু ধরিয়ে দিন।'

'কথা হয়েছিল স্বয়ম্ভু আপনার কাছেই থাকবে। ওর হেড কোয়ার্টার হবে আপনারই কোনো একটা অ্যাপার্টমেন্টে। তবে আমাদের মধ্যে স্বয়ম্ভুকে যার যখন দরকার হবে সে-ই তাকে পাবে।'

'মনে আছে মিস্টার মিটার। স্বয়ম্ভু হল ন্যাশনাল প্রপার্টি, আমার একার সম্পত্তি তো নয়। এই রকম একটা অ্যাসেট হোল নেশনের কাজে লাগুক—তাই আমি চাই। সেলফিশ সোয়াইনের মতো আমি ওকে আগলে রাখার কথা ভাবতে পারি না।'

'তাই তো জানিই। আপনার মতো এই রকম গ্রেট সোল সারা দেশে ক'টা আছে আমার জানা নেই।'

'এ জাতীয় কথা বলে আমাকে বিব্রত করা কি আপনার উচিত মিস্টার মিটার? আমি খুবই সামান্য মানুষ।'

মহাশয়গণ, খচড়ামোটা একবার লক্ষ করুন। এক মাকড়া গলার স্বরে মাখন লাগিয়ে সমানে চামচাগিরি চালিয়ে যাচ্ছে, আরেক মাকড়া কেমন বিনয়ের অবতার সেজে তারিয়ে তারিয়ে সেটি এনজয় করে চলেছে। হে-হে মহাশয়গণ, দেখুন দেখুন—ভাল করে দেখে যান। পিপল মানে জনগণ থেকে শুরু করে ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, পলিটিসিয়ান, বিজনেসম্যান—সবার ভেতরেই একটা করে চামচা রয়েছে। দরকার মতো ঝট করে সেটা বেরিয়ে পড়ে।

সমাজপতি আবার বললেন, 'ক'দিনের জন্যে স্বয়ম্ভুকে আপনি চাইছেন?'

অভ্যুদয় মিটার একটু ভেবে বললেন, 'মাস দুয়েক।'

'হোল টাইম?'

'না। এই ধরুন মাসখানেক রোজ ঘন্টা তিনেক করে ওর সারভিস চাই। পরের এক মাস ওকে ফুল টাইম ছেড়ে দিতে হবে।'

সমাজপতি বললেন, 'ঠিক আছে। তবে আমার একটা কন্ডিশান আছে।'

অভ্যুদয় মিটার গলাটা দেড় মিটার লম্বা করে সামনের দিকে ঝুঁকলেন। বললেন, 'কী কন্ডিশান?'

'যতক্ষণ খুশি আপনি ওকে আটকে রাখতে পারেন। কিন্তু রোজ এক ঘন্টার জন্যে ওকে আমার কাছে আসতে হবে।'

'নিশ্চয়ই। আপনি যদি পারমিশন দেন স্বয়ম্ভুকে আমি এখনই নিয়ে যেতে চাই।'

'গ্ল্যাডলি।' বলেই সমাজপতি আমার দিকে ফিরলেন, 'মিটার সাহেবের সঙ্গে যাও। কাল ওখানে আসছ তো?'

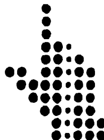
ওখানে বলতে গড়িয়াহাটার সেই অ্যাপার্টমেন্টে। বললাম, 'আসব স্যার। আপনি কি ওখানে যাবেন?'

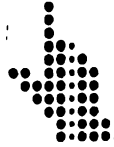
সট করে চারদিক একবার দেখে নিয়ে সমাজপতি বললেন, 'এক্ষুণি বলতে পারছি না। তবে তোমার সঙ্গে কনট্যাক্ট করে নেব।' বলে চারপাশ আরেক বার দেখে নিলেন।

কেন সমাজপতি চনমনে চোখে বার বার চারদিক দেখছেন, কাকে দেখছেন এবং কেন তাঁর এই সাবধানতা, বুঝতে পারছি। আমার দারুণ হাসি পাচ্ছিল। কিন্তু মুখটাকে খাঁটি মঙ্গোলিয়ানদের মতো, শুদ্ধ বাংলায় যাকে বলে ভাবলেশহীন করে তাকিয়ে রইলাম। বললাম, 'ঠিক আছে স্যার—'

অভ্যুদয় আগেই উঠে পড়েছিলেন। আমিও উঠলাম। তারপর তাঁর গায়ে জুড়ে গিয়ে বাইরে এসে একটা বিরাট ইম্পোর্টেড কারে ঢুকলাম। সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটা স্টার্ট দিল।

আমি, মানে এই পিটার স্বয়ম্ভু হোড়, একজন উৎকৃষ্ট ফোরটোয়েন্টি, একটি চিট, অবশ্য সমাজপতিদের ভাষায় ন্যাশনাল অ্যাসেট—দেখা যাক, এই জাতীয় সম্পত্তিটিকে অভ্যুদয় মিটার কিভাবে কাজে লাগান।





অভ্যুদয়ের লিমুজিন একটা প্রকান্ড বাজপাখির মতো রাস্তার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল। গাড়িটার এতটুকু ঝাঁকুনি নেই, জার্ক নেই। মনে হচ্ছে টেরিফিক একটা ড্রইং রুমে বসে আছি।

যেতে যেতে অভ্যুদয় বললেন, 'কাজে নামার আগে তোমার সঙ্গে আমার কিছু ডিসকাশন আছে। কোথায় বসবে বল—পার্ক স্ট্রিটের কোনো রেস্তোরাঁয়, না আর কোথাও?'

বললাম, 'আপনি যেখানে নিয়ে যাবেন সেখানেই আমি গ্ল্যাডলি যাব।'

অভ্যুদয় কি একটু ভাবলেন। তারপর বললেন, 'নাঃ, হোটেল রেস্তোরাঁ বার-ফার নয়। অন্য এক জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি তোমাকে।' বলেই ড্রাইভারের দিকে ফিরলেন, 'আলিপুর চল।'

হে-হে মহাশয়গণ, আলিপুরে মিলিওনেয়ারদের যে কলোনি রয়েছে তার একধারে একটা নতুন মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং-এর ইলেভেনথ ফ্লোরে আমাকে টেনে তুললেন অভ্যুদয়।

মহাশয়গণ, এই সব অ্যাপার্টমেন্ট হাউস যেরকম হয়—ডিসটেম্পার-করা দেয়াল, মেঝেতে দামি কার্পেট, জানালার মাথায় এয়ারকুলার, দরজায় ফ্যাশনেবল পর্দা ইত্যাদি ইত্যাদি—সবই এখানে আছে।

অভ্যুদয় আমাকে ড্রইং রুমে নিয়ে বসালেন। মুখোমুখি নিজেও একটা সোফায় বসলেন। তারপর বললেন, 'এটা আমার প্রাইভেট অ্যাপার্টমেন্ট। মাঝে মাঝে টায়ার্ড হয়ে গেলে এখানে এসে রেস্ট-ফেস্ট নিই।'

মহাশয়গণ, যত দেখবেন সাকসেসফুল ম্যান, তা ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টই হোক, বিজনেসম্যানই হোক আর পলিটিসিয়ানই হোক, সবার একটা করে এইরকম 'পশ' স্যুইট বা অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে। এদের সবারই তো ফাইন ফাইন বাড়ি-টাড়ি আছে। তবু রেস্টটা কেন যে সেখানে এরা নিতে পারে না, শুধু রেস্ট নেবার জন্য কেন যে এদের দশ বিশ লাখ টাকা খরচা করে এইরকম স্যুইট কিনতে হয়—এই সব কারবার আমার মাথায় ঠিক ঢুকতে চায় না। তবু ঘাড়খানা মিটার দুয়েক কাত করে বললাম, 'আপনার স্যুইটটা দারুণ স্যার—'

'মিস্টার সমাজপতির গড়িয়াহাটার স্যুইটের থেকেও ভাল?'

বুঝলাম সমাজপতির সঙ্গে ভেতরে ভেতরে এর কোথায় যেন একটা কম্পিটিসান রয়েছে। বললাম, 'দুটোই টেরিফিক স্যার।'

দু' সেকেন্ড আমার দিকে চোখ ফিক্সড করে তাকিয়ে রইলেন অভ্যুদয়। তারপর ট্রেন যেমন মেন লাইন থেকে ঝট করে লুপ লাইনে চলে যায় তেমনি অন্য দিকে চলে গেলেন, 'তোমার, লাঞ্চ হয়েছে?'

বললাম, 'না মানে—ঠিক আছে স্যার, আমি আপনার এখান থেকে বেরিয়ে কোথাও গিয়ে খেয়ে নেব'খন।'

অভ্যুদয় বললেন, 'নো, ইউ আর মাই গেস্ট। আজ তুমি আমার এখানেই খাবে।' বলতে

বলতে আচমকা গলা চড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'বেয়ারা—'

গলার স্বরটা বাতাসে মিলিয়ে যাবার আগেই ঝকঝকে উর্দি-পরা একটা বেয়ারা সামনে এসে ফ্রিজ শটের মতো দাঁড়িয়ে গেল। অভ্যুদয় তাকে পার্ক স্ট্রিটের দারুণ নাম করা একটা রেস্তোরাঁর নাম করে ড্রাই লাঞ্চের প্যাকেট নিয়ে আসতে বললেন। তারপর পকেট থেকে বিশাল পার্স বার করে একশ টাকার দু'খানা নোট দিলেন।

টাকা নিয়ে বেয়ারা চলে গেল। অভ্যুদয় এবার আমার দিকে ফিরলেন, 'খাবার আসার আগে তোমার সঙ্গে দরকারি কথাটা চুকিয়ে ফেলি।'

সমাজপতি তো আমাকে ষোল শ স্কোয়ার ফুটের একটা স্যুইটে পুরে, একশ আটটা ব্যাঙ্কের একশ আট নামে অ্যাকাউন্ট খুলিয়ে আটকে ফেলেছে। কিন্তু প্রচুর চর্বিওলা টকটকে চেহারার অভ্যুদয় মিটারের ধান্দাটা যে কী, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। সামনের দিকে ঝুঁকে বললাম, 'বলুন স্যার—' মনে মনে এর মধ্যে ঠিক করে ফেলেছি, তেমন কিছু বুঝলে অভ্যুদয়ের হাত গলে স্রেফ স্লিপ কেটে বেরিয়ে যাব।

অভ্যুদয় বললেন, 'তুমি হয়ত শুনেছ আমি একজন বিজনেসম্যান।'

'হ্যাঁ স্যার—'

'সেই সঙ্গে পলিটিকসেরও চর্চা করে থাকি। তবে এতদিন সেটা ছিল অ্যাবসোলুটলি থিওরিটিক্যাল। মানে পলিটিকস সম্বন্ধে এতদিন পড়াশোনা করেছি, খোঁজখবর রেখেছি। ডিফারেন্ট পার্টির লিডারদের সঙ্গে যোগাযোগ করে গেছি। প্রচুর বন্ধুবান্ধবকে ইলেকশনে ফাইট করার জন্য টাকা দিয়েছি।'

'ও—'

'এবার আমি প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে নামতে চাই।'

'কিরকম?'

'আমি ইলেকসানে কনটেস্ট করব।'

'অ্যাদ্দিন বিজনেস থেকে প্রফিট করেছিলেন। এবার পলিটিকস থেকে ফায়দা ওঠাতে চান—এই তো?'

'অনেকটা তাই। মানে পয়সা-টয়সা আমার কিছু আছে। এবার আমি প্রেসটিজ চাই, পাওয়ার চাই—'

উত্তর না দিয়ে অভ্যুদয়কে লক্ষ করতে লাগলাম।

অভ্যুদয় আবার বললেন, 'ফার্স্ট ইলেকসানে কনটেস্ট করতে যাচ্ছি। যেভাবেই হোক আমাকে জিততেই হবে। আর এ ব্যাপারে তোমার টেকনিক্যাল নো হাউটা আমার খুব দরকার। সেই জন্যেই সমাজপতির কাছ থেকে তোমাকে ডেপুটেসনে নিয়ে এসেছি।'

অভ্যুদয় মিটার বলতে লাগলেন, 'আমার দু-চারটে ফ্যাক্টরি আছে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর ট্রেড সার্কেলে রেপুটেসন-টেপুটেসনও পেয়েছি। এখন যদি একটা এম. এল. এ কি এম. পি হতে পারি, ওয়েটটা অনেক বাড়ে, না কি বল?'

বললাম, 'একজ্যাক্টলি স্যার—'

অভ্যুদয় কয়েক সেকেন্ড কি ভেবে নিলেন। তারপর বললেন, 'সময় আর বেশি নেই। তিন-চার মাসের ভেতর ইলেকসান হচ্ছে। এখনই তোমাকে স্ট্র্যাটেজি ঠিক করে ফেলতে হবে।'

মহাশয়গণ, আপনারা তো জানেনই আমি একটা চিট। তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ বছরের লাইফে চিটিং-এর ব্যাপারে স্পেশালিস্ট হয়ে উঠেছি। এতদিনে অন্য সব ফিল্ডের লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ হবার পর আমার অ্যাকটিভিটি নানা দিকে বেড়ে যাচ্ছে। হে-হে মহাশয়রা, একেই বোধহয় ডাইভার্সিফিকেসন বলে। ইলেকসানের 'ই' আমি জানি না, অথচ ব্যাপারটা দেখুন, স্ট্র্যাটেজির সব দায়িত্ব আমার কাঁধেই ঝুলিয়ে দিচ্ছেন অভ্যুদয়।

এর আগে আপনাদের দেড় হাজার বার বলেছি কোনো ব্যাপারেই আমি ঘাবড়াই না, আমার নার্ভগুলো দারুণ স্ট্রং। বললাম, 'স্যার আপনি ভাববেন না।'

অভ্যুদয় তাঁর মুখের গোল মানচিত্রখানায় ফ্লুয়োরেসেন্ট লাইট জ্বেলে হাসলেন, 'জানি। তুমি যখন রেসপনসিবিলিটি নিচ্ছ তখন রাত্তিরে পিল খেয়ে ঘুমোতে হবে না। ইলেকসানটা আমি জিততে পারবই।'

মহাশয়গণ, আমার ওপর মাকড়ার কিরকম বিশ্বাস দেখুন। আমি আর সেটা পাংচার করি কেন? গালের মাংস নাচিয়ে গম্ভীর চালে একটু হাসলাম শুধু, মুখে কিছু বললাম না।

অভ্যুদয়ও তৎক্ষণাৎ আর কিছু বললেন না। কপাল টপাল কুঁচকে কি ভাবতে লাগলেন। কিছুক্ষণ বাদে সোজা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে শুরু করলেন, 'আচ্ছা স্বয়ম্ভু—'

শিরদাঁড়া টান টান করে আমি বসে ছিলাম। বললাম, 'বলুন স্যার—'

'একটা ব্যাপারে তোমার সাজেসান চাই।'

'কী ব্যাপারে?'

'আমার কোত্থেকে ইলেকসান কনটেস্ট করা উচিত, রুরাল না আরব্যান এরিয়া থেকে?'

'যেখানে আপনার ইনফ্লুয়েন্স আছে, যেখানকার পিপল আপনাকে চেনে সেখান থেকে দাঁড়ালেই ভাল হয়।'

'কারেক্ট, কারেক্ট—' এই পর্যন্ত বলে একটু থামলেন অভ্যুদয়। পরক্ষণেই আবার শুরু করলেন, 'সিটি আর ভিলেজ, দু'জায়গাতেই আমার কিছু ইনফ্লুয়েন্স আছে। যেমন ধর নর্থ বেঙ্গলে জলপাইগুড়ির কাছে আমার রয়েছে গোটা চারেক টি-গার্ডেন। আশেপাশের ভিলেজগুলোর অনেক লোক আমার টি-গার্ডেনে কাজ করে। ওখান থেকে কনটেস্ট করলে নিশ্চয়ই ভোট পাওয়া যাবে।'

আমি বললাম, 'আরব্যান এরিয়ায় কোথায় আপনার ইনফ্লুয়েন্স আছে?'

অভ্যুদয় বললেন, 'আগরপাড়ায়।'

আমি জানতে চাইলাম, 'আগরপাড়ার কোথায়?'

অভ্যুদয় যে জায়গাটার নাম করলেন সেটা সুমনাদের ব্যারাকবাড়ির কাছাকাছি। তিনি বলতে লাগলেন, 'ওখানে আমার অনেকখানি জমি, অ্যাবাউট চার পাঁচ একরের মতো, রিফিউজিরা দখল করে জবরদখল কলোনি বসিয়ে রেখেছে। প্রথম প্রথম ওদের তুলবার অনেক চেষ্টা করেছি, পারি নি। এখন হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছি। ওই প্রপার্টিটা আমার গেল।'

এদিকে আমার মানে পিটার স্বয়ম্ভু হোড়ের মাথার ভেতর সেই প্ল্যানিং কমিশনের হেড কোয়ার্টারটায় দারুণ অ্যাকটিভিটি শুরু হয়ে গেছে। কিছু না বলে অন্যমনস্কর মতো ভাবতে লাগলাম।

অভ্যুদয় এবার বললেন, 'আগরপাড়া তো ক্যালকাটার ভেতরেই ঢুকে গেছে, না কি বল?'

বললাম, 'হ্যাঁ, তা বলা যায়। ওটা গ্রেটার ক্যালকাটার একটা পার্ট।'

অভ্যুদয় বললেন, 'রাইট। ওটা ক্যালকাটাই। এখন ব্যাপারটা খুব ভাল করে ভেবে দেখ। রিফিউজিরা কুড়ি বাইশ বছর ধরে একেবারে ফ্রি-তে বৃহত্তর কলকাতা না কি যেন বলে, তার ভেতর আছে। ওদের নিশ্চয়ই আমার সম্বন্ধে গ্র্যাটিচুড থাকা উচিত।'

'উচিত তো। কিন্তু স্যার আমি শুনেছি ওই জায়গাগুলো একসময় জলা জমি ছিল। কোনো কাজেই লাগত না। রিফিউজিরা রিক্লেম করে ঘরবাড়ি তুলেছে।'

'ঠিকই বলেছ। কিন্তু ল্যান্ডটা তো আমারই। ওটা না থাকলে রিফিউজিরা কলোনি বসাত কোথায়?'

মহাশয়গণ, এই মাকড়াটির সঙ্গে রিফিউজিদের ব্যাপার নিয়ে একটা লোকসভার অধিবেশন বসিয়ে দেওয়া যায় কিন্তু ওসব ঝুট ঝামেলায় গিয়ে কী লাভ? অভ্যুদয় মিটার ইলেকশানে নামছেন, তার ভেতর থেকে আমি কিছু রস নিংড়ে বার করে নিতে পারি কিনা, সেটাই আমার ধান্দা। শুধু বললাম, 'আপনার কথাটা হানড্রেড পারসেন্ট কারেক্ট। তবু স্যার ছোট্ট একটা প্রবলেম থেকে যাচ্ছে।'

অভ্যুদয় ভুরুদুটো সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মতো বাঁকিয়ে আমার দিকে তাকালেন, 'কিরকম?'

'আপনি একটু আগে বললেন না, রিফিউজিদের তুলে দেবার জন্য অনেক কান্ড করেছেন—'

'হ্যাঁ, বলেছি।'

'তার পরেও কি স্যার আপনার সম্বন্ধে ওদের গ্র্যাটিচুড থাকবে?'

'সেই জন্যেই তো তোমার হেল্প দরকার।'

'কী হেল্প?'

'শুনেছি তুমি হুডিনির মতো ম্যাজিক জানো। রিফিউজিদের সঙ্গে আমার রিলেসানটা সুইট করে দিতে পারবে না?'

উত্তর দিলাম না। ব্রেনের ভেতর কড়া ধবনের জ্যাজ বাজনার মতো কিছু একটা চলছে। অভ্যুদয়ের কাছ থেকে কী প্রফিট ওঠানো যায়, সেটা ভেবে পাচ্ছি না।

অভ্যুদয় আবার বললেন, 'তোমার ওপর আমাদের প্রচন্ড কনফিডেন্স। আমি জানি তুমি রিফিউজিদের আমার দিকে টেনে আনতে পারবে। অতগুলো সলিড ভোট পেলে আমাকে কেউ আটকাতে পারবে না। ইলেকসানে জিতবই।'

বললাম, 'তার জন্যে স্যার আমাকে কিছুদিন ওখানে অন-দি-স্পট সার্ভে করতে যেতে হবে।' আমি যে আগরপাড়াতেই আপাতত তাঁবু ফেলেছি সেটা আর অভ্যুদয়কে বললাম না।

অভ্যুদয় বললেন, 'নিশ্চয়ই। অন-দি-স্পট সার্ভে তো করতেই হবে। ওখানে কি তোমাকে একটা বাড়ি-টাড়ি ভাড়া করে দেব?'

'কিচ্ছু দরকার হবে না স্যার। কিভাবে কোথায় থেকে ভোটারদের স্টাডি করতে হবে, সেটা আমার ওপর ছেড়ে দিন।'

'অল রাইট। তা হলে কিছু টাকা পয়সা তোমাকে দিচ্ছি। কখন কি দরকার হয়ে যায়—'

'এখন কিচ্ছু দিতে হবে না। যখন দরকার হবে নিজেই চেয়ে নেব।'

'আমি তা হলে নিশ্চিন্ত?'

'টু হান্ড্রেড পারসেন্ট। আপনি স্যার ইচ্ছে করলে নিজেকে পার্লামেন্ট কি অ্যাসেম্বলির মেম্বার ডিক্লেয়ার করতে পারেন।'

অভ্যুদয় সস্নেহে হাসলেন, 'নটি বয়।'

বললাম, 'এবার তা হলে উঠি স্যার?'

'উঠবে মানে! তোমার আর আমার জন্যে লাঞ্চ প্যাকেট আনতে পাঠিয়েছি। এক সঙ্গে বসে খাব। তা ছাড়া আরো কথা আছে—'

গলাটা চার ফুট লম্বা করে আমি তাকিয়ে রইলাম।

অভ্যুদয় এবার বললেন, 'এই যে ফ্ল্যাটটা দেখছ, ইচ্ছে হলে এখানে এসে তুমি থাকতে পার। মানে কাজকর্মের সুবিধে জন্যে—'

মহাশয়গণ, ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখুন। ক'দিন আগেও আমার থাকার জায়গা ছিল না। বেওয়ারিশ পোস্টকার্ডের মতো হাওয়ায় হাওয়ায় লাট খেয়ে উড়ে বেড়াচ্ছিলাম। তারপর বোদার সঙ্গে তার শোভাবাজারের সেই লঝ্‌ঝড় বাড়িটায় ভিড়ে গেলাম। কলকাতার আদি পিতা জব চার্নক ওই বাড়িটার ভিত নিজের হাতে গেঁথে ছিলেন। বুঝতেই পারছেন মহাশয়গণ, সেই বাড়ি যে অ্যাদ্দিন টিকে ছিল তাই ঢের। দুম করে কর্পোরেসনের লোকেরা যেই ওটার গায়ে শাবল-গাঁইতি চালিয়ে মাটিতে মিশিয়ে ফেলতে লাগল, অমনি আমরাও কাঁধে মালপত্তর ঝুলিয়ে গ্লোবট্রটারদের মতো বেরিয়ে পড়লাম। তারপর একটা আস্তানার খোঁজে কোথায় না ঘুরেছি! থার্ড ক্লাস বেশ্যার ঘরে রাত কাটিয়েছি, অর্ধেক তৈরি মাল্টি-স্টোরিড বিল্ডিং-এ তাঁবু ফেলতে চেয়েছি। শেষ পর্যন্ত সুমনাদের ব্যারাকবাড়িতে গিয়ে ঠেকেছি।

তারপর থেকে মহাশয়গণ, কী কী ব্যাপার ঘটে চলেছে, আপনারা নিশ্চয়ই দেখে যাচ্ছেন। সমাজপতি তাঁর যোল শ স্কোয়ার ফুটের বিরাট ফ্ল্যাটটা আমাকে একেবারে দান করে ফেলেছেন। কোনো ফাদার-ইন-ল তার জামাইকে এইরকম একটা ফ্ল্যাট গিফট দেয় কিনা আমার জানা নেই। এখন দেখুন কলকাতার এই পশ লোকালিটিতে অভ্যুদয় মিটার আমাকে আরেকটা ফ্ল্যাটে থাকতে বলছেন। আমার হাইট তো মহাশয়রা জানেন ছ' ফুটের মতো। দুটো হাত, দুটো পা, একটা নাক, দুটো কান ইত্যাদি ইত্যাদি মানুষের যা-যা থাকে আমার তার চাইতে এক্সট্রা কিছু নেই। থাকলে না হয় এক সেট বাড়তি হাতপা অভ্যুদয়ের এই ফ্ল্যাটে রাখতাম, এক সেট রাখতাম সমাজপতির অ্যাপার্টমেন্টে, বাদ বাকিটা নিয়ে আমি সুমনাকে ব্যারাকবাড়িতে থেকে যেতাম। যাই হোক, বিনয়ে আইসক্রিমের মতো গলতে গলতে অভ্যুদয়কে বললাম, 'স্যার, আপনি আমাকে এখানে থাকতে বলছেন সেজন্যে আমি গ্রেটফুল। কিন্তু এখুনি এখানে এসে থাকার দরকার নেই।'

'ইলেকসানের ব্যাপারে তেমার সঙ্গে আমার যোগাযোগ থাকা তো দরকার।' অভ্যুদয় সোজাসুজি আমার মুখের দিকে তাকালেন।

বললাম, 'আপনার সঙ্গে আমিই কনট্যাক্ট রেখে যাব।'

'কিভাবে কনট্যাক্ট করবে?'

'মিস্টার সমাজপতির কাছ থেকে আপনার ফোন নাম্বার নিয়ে নেব।'

'ফোনে সব কথা হয় না। তুমি এক কাজ করতে পার—'

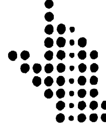
'বলুন—'

'রোজ রাত আটটা থেকে দশটা পর্যন্ত আমি এই অ্যাপার্টমেন্টে থাকি। দরকার হলে স্ট্রেট এখানে চলে আসবে।'

'সেটাই ভাল স্যার।'

'এখানকার ফোন নাম্বারটা তুমি রেখে দাও—'

অভ্যুদয় মিটার একটা ফোন নাম্বার দিলেন। বুক পকেটে বাসের পুরনো অকেজো একটা টিকিট ছিল। নাম্বারটা তার পেছনে টুকে নিলাম। তারপর অভ্যুদয়ের সঙ্গে পুরো দেড় বোতল বীয়ার আর দামি একখানা লাঞ্চ খেয়ে যখন তাঁর ফ্যাশনেবল পশ ফ্ল্যাটটা থেকে বেরিয়ে এলাম, বিকেল হয়ে গেছে।



মহাশয়গণ, অভ্যুদয় মিটারের সঙ্গে ইলেকসান নিয়ে শীর্ষ সম্মেলনের পর দিনকয়েক কেটে গেল।

এর মধ্যে রুটিন ওয়ার্ক ছাড়া আমি আর কিছুই করিনি।

আমার রুটিন ওয়ার্ক কী, মহাশয়গণ আপনারা তা জানেন। ঘুম থেকে উঠে মুখটুখ ধুয়ে চা খাওয়া, বোদার সঙ্গে কনকচাঁপা সম্পর্কে কিছুক্ষণ কনফারেন্স, ব্যারাকবাড়ির লোকেরা, বিশেষ করে সুমনারা এলে খানিকক্ষণ কথাবার্তা, তারপর চান, চানের পর পবিত্র খালসা হোটেলে লাঞ্চ, লাঞ্চের পর ফার্স্ট ক্লাস একখানা দিবানিদ্রা, তারও পর টেরিফিক মেক-আপ দিয়ে সমাজপতির, না-না আমারই সেই গড়িয়াহাটার ষোল শ স্কোয়ার ফুট ফ্ল্যাটে গিয়ে মদ্যপান, কোনোদিন সেখানে ডোরার সঙ্গে দেখা হলে দু-একটা কথা, সমাজপতির ফোন, এই নিয়েই আপাতত আমার লাইফ কাটছে।

হে-হে মহাশয়গণ, আপনারা তো জানেনই, আমার জীবনে একটাই মোটে টেন্স, সেটা হল প্রেজেন্ট টেন্স। তেতাল্লিশ-চুয়াল্লিশটা বছর কাটিয়ে ফেললাম। তার মানে লাইফের ঘোড়দৌড় প্রায় শেষ হয়েই আসছে। এর ভেতর কখনও আমি পেছন ফিরে তাকাইনি। 'লুকিং ব্যাক' বলে কি একটা কথা আছে না, সেটা আমার জন্য নয়। আবার সামনের দিকেও আমি তাকাই না। আমার গ্রামারে পাস্ট আর ফিউচার টেন্স নেই।

যাক গে, এর মধ্যে অবশ্য রোজই একবার করে গড়িয়াহাটার সেই ফ্ল্যাটে ফোন করে যাচ্ছেন অভ্যুদয়। তাঁর সঙ্গে মোটামুটি এই ধরনের কথাবার্তা হয়।

অভ্যুদয় বললেন, 'তোমার অন-দি স্পট সার্ভে শেষ হল?'

একটুও না ভেবে বলে যাই, 'ওটা চালিয়ে যাচ্ছি স্যার।'

'কিরকম মনে হচ্ছে?'

'ফেভারেবল।'

'গুড।' টেলিফোনের রিসিভারে অভ্যুদয়ের গলা খুশিতে বগবগিয়ে ওঠে, 'তা হলে বলছ ওখান থেকে ভোট পাওয়া যাবে?'

আমি বলতে থাকি, 'ও ব্যাপারটা নিয়ে একেবারেই ভাববেন না স্যার। আমি যখন রেসপনসিবিলিটি নিয়েছি তখন ধরে নিন আপনি রিটার্ন করবেনই।'

'তা কি আর আমি জানি না! তবু কিউরিওসিটি একটু থাকেই। তাই জিজ্ঞেস করছিলাম, মানে তুমি কী সার্ভে করলে সেটা যদি একটু এলাবরেটলি বলতে—'

মহাশয়গণ, আপনারা তো জানেনই, এই পিটার স্বয়ম্ভু হোড় কোনো ব্যাপারেই ঘাবড়ে যায় না ইনস্ট্যান্ট কফির মতো তার জিভে ইনস্ট্যান্ট উত্তর লেগেই আছে। 'এলাবরেটলি শুনে আর কি করবেন। আপনার ইলেকসানে জিততে হবে—এই তো?'

'অফ কোর্স।'

'তা হলে বলতে পরি ওই এলাকার নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট ভোট আপনি ব্যাগ করবেন।'

'গ্যারান্টি দিচ্ছ?'

'চোখ বুজে স্যার।'

'থ্যাঙ্ক ইউ স্বয়ম্ভু, থ্যাঙ্ক ইউ—'

রোজই অভ্যুদয়কে স্কার্ট সরিয়ে উরু দেখাবার মতো একটু একটু করে আশা দিয়ে যাচ্ছি। চাবি ঘুরিয়ে হেরিকেনের আলো তেজী করার মতো ওঁর ইচ্ছেটাকে উসকে দিচ্ছি। কিন্তু না, শেষ পর্যন্ত আর পারা গেল না, অন-দি-স্পট নেমে পড়তেই হল। ক'টা দিন চারদিকের ঘিঞ্জি দমবন্ধ-করা পাড়া আর রিফিউজি কলোনিগুলোতে ঘুরে বেড়ালাম। মহাশয়গণ, আপনারা তো আগেই জেনে গেছেন এই এরিয়াতে দাতাকর্ণ কি হরিশচন্দ্রের মতো আমার নাম ছড়িয়ে গেছে। এখানকার লোক আমাকে প্রায় ভগবান-টগবান ভাবতে শুরু করেছে। কেউ কেউ লক্ষ্মী-দুর্গা দশমহাবিদ্যার ফোটোর পাশে আমার ছবি বসিয়ে পুজোটুজো করে কিনা তা অবশ্য বলতে পারব না।

সে যাক গে, আমাকে দেখামাত্র লোকেরা টানাটানি করে যে যার বাড়িতে নিয়ে যেতে লাগল। আমাকে নিয়ে কী করবে, কোথায় বসাবে, কী খাওয়াবে, তারা ভেবে উঠতে পারছিল না। মহাশয়গণ, একবার দেখুন, পরের টাকায় ডজন খানেক পাবলিক বেনিফিট ফান্ড খুলে আমি কেমন বুদ্ধ চৈতন্য বা যিশুখ্রিস্টের মতো অবতার বনে গেছি!

হে-হে মহাশয়গণ, সুমনাদের ব্যারাকবাড়িতে তাঁবু ফেলার পর আর গড়িয়াহাটায় সেই পশ ফ্ল্যাটখানা পেয়ে এক এক সময় মনে হত, আমার ক্যারেক্টারের বারটা বোধহয় বাজল।

তেতাল্লিশ-চুয়াল্লিশ বছর ধরে যে ক্যারেক্টারটাকে একটুও এদিক সেদিক টাল খেতে দিইনি তাকে আর বাঁচাতে পারলাম না। কিন্তু চারদিকের মানুষ মানে মহান জনগণ আমাকে যখন ভগবান-টগবান বানিয়ে বসে আছে তখন মনে হল আমি আমার মধ্যেই আছি। 'মা কী ছিলেন, মা কী হইয়াছেন, এবং মা কী হইবেন'-এর মতো আমি ফোরটোয়েন্টি ছিলাম, ফোরটোয়েন্টি আছি এবং ফোরটোয়েন্টিই থেকে যাব।

যে-ই আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তাকেই জিজ্ঞেস করছি, 'আচ্ছা তোমরা অভ্যুদয় মিত্তিরকে চেন?'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তরটা পাওয়া যাচ্ছে, 'চিনব না! শালা—'

তারা অভ্যুদয়ের নামের সামনে এবং পেছনে এমন কিছু বাছা বাছা অ্যাডজেকটিভ আর খিস্তি জুড়ে দেয়, আমার মতো বার ঘাটের জল খাওয়া মালেরও কান গরম হয়ে একশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হিট বেরুতে থাকে। হে-হে মহাশয়গণ, আমার তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ বছরের লাইফে কম করে দেড়শ ঠিকানা বদলেছি, পাঞ্জাব-সিন্ধু-গুজরাট-মারাঠা অর্থাৎ ভারতীয় প্রজাতন্ত্রে যত রকম জাত আছে তাদের সঙ্গে মিশেছি। আমার ধারণা ইন্ডিয়ার যে ক'টা শিডিউল্ড ল্যাংগুয়েজ রয়েছে তাদের বেস্ট খিস্তিগুলো আমি মোটামুটি জেনে ফেলেছি। কিন্তু আগরপাড়ার এই লোকগুলো অভ্যুদয় সম্পর্কে স্রেফ বাংলা ভাষায় যে সব খিস্তি দেয় তাতে মনে হয়, অন্য ভাষা দূরের কথা, বাংলাটাই এখনও আমার ভাল করে শেখা হয়নি। তবে এটা ঠিক, অভ্যুদয় সম্পর্কে ওরা কী ভাবে, আমার কাছে তা পরিষ্কার হয়ে গেছে।

বললাম, 'তার ওপর তোমাদের এত রাগ কেন?'

'রাগ হবে না! শালা খচড়া পয়লা নম্বরের হারামী। এই যে দেখছেন যেখানে আমরা কলোনি বানিয়েছি এসব ছিল জলা জায়গা, চারদিকে ছিল হোগলার জঙ্গল, সাপ আর শুয়োরের ঘাঁটি। কলোনি বসিয়ে আমরা ওকে জায়গাটার ন্যায্য দাম দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সে যা দর হাঁকলে তা আমরা কোত্থেকে দেব? কথাটা একবার ভেবে দেখুন, পার্টিসান না হলে এসব জায়গায় কুকুরে পেচ্ছাপ করতেও আসত না। যেমন জলা তেমনি পড়ে থাকত। মওকা বুঝে শালা কিছু পয়সা খিঁচে নিতে চাইলে। আমরা অনেক হাতে পায়ে ধরলাম কিন্তু কে কার কথা শোনে! আমাদের উৎখাত করার জন্যে একদিন রাত্তিরে কলোনিতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। এর থেকেই বুঝতে পারবেন মালখানা কিরকম।'

অভ্যুদয় এখান থেকে দাঁড়ালে তার রেজাল্টটা কী হবে বুঝতে পারছিলাম। যাই হোক পুরোপুরি এরিয়া সার্ভের পর আমি জুয়াড়ি পঞ্চাননকে ব্যারাকবাড়িতে আমার সেই ঘরটায় ডেকে আনলাম। মহাশয়গণ, আমার মাথার ভেতর সেই প্ল্যানিং সেলে দারুণ একটা আইডিয়া এসে গেছে।

বোদা ঘরে ছিল না। পঞ্চনন আমার মুখোমুখি গড বিষ্ণুর কে যেন বাহন আছে, ও হ্যাঁ গরুড়—অবিকল গরুড়ের মতো পোজ নিয়ে বসল। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তারপর কারবার কিরকম চলছে?'

ম্যাগনাম সাইজের একটা বিড়ি ধরিয়ে সেটা দুই হাতের ভেতর পুরে হুবহু গাঁজার কলকের

মতো টানতে লাগল পঞ্চানন। গল গল করে এক মুখ নীলচে ধোঁয়া বার করে বলল, 'ফাস্ট কেলাস স্যার। সেদিন যে দশ টাকা ক্যাপিটাল দিয়েছিলেন সেটা ঘোড়ার পেছনে লাগিয়েছিলাম। একদানেই দেড়-শ টাকা উঠে এসেছে। 'আপনার স্যার দারুণ পয়।'

'তাই নাকি?' নাক কুঁচকে আমি একটু হাসলাম।

গাঁট-পাকানো হাত দুটো সমানে কচলাতে কচলাতে পঞ্চানন বলল, 'হাজার বার গুরু। সেই দেড়শ টাকা থেকে সাট্টায় পঁচিশ লাগালাম। পঁচিশ আড়াইশ হয়ে ফিরেছে। সেই আড়াইশ টাকা থেকে চল্লিশ লাগালাম মাটকায়। চল্লিশ সাতশ হয়ে রিটার্ন করল। এই প্রফেসানে ঢুকবার পর এরকম প্রফিট আর হয়নি। শালা যাতে হাত ঠেকাচ্ছি তাই গোল্ড হয়ে যাচ্ছে। সবই আপনার দয়ায় গুরু।'

আমি হাসতে লাগলাম।

পঞ্চানন আবার বলল, 'এরকম চললে এক বছরে কলকাতার হাফ কিনে ফেলতে পারব, দশটা ইমপোর্টেড গাড়ি বানিয়ে ফেলব। শালা বিলকুল রইস আদমি বনে যাব আমি।'

এবার কাজের কথায় চলে গেলাম, 'শোন, একটা বিশেষ দরকারে আমি তোমাকে ডেকেছি।'

'কী দরকার স্যার?'

'সেদিনের মতো একটা মিটিং করব। তিন ঘন্টার ভেতরে সব ব্যবস্থা করতে পারবে?'

'স্যার আপনি বললে জান লড়িয়ে দিতে পারি, তো একটা মিটিং! এখন ক'টা বাজে দেখুন তো?'

কবজি উল্টে ঘড়িটা দেখে নিয়ে বললাম, 'সাড়ে দশটা।'

'বারটার ভেতর এভরিথিং রেডি হয়ে যাবে।'

'সেদিনকার মতো মাইক, মালা, উদ্বোধনী সঙ্গীত—সব চাই কিন্তু।'

'সব পাবেন।'

ঘরের এককোণে আমার সেই অ্যাটাচি কেসটা দেখিয়ে বললাম, 'ওটা থেকে টাকা নিয়ে যাও—'

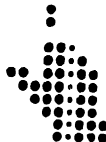
হাতের বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পঞ্চানন বলল, 'এটা বলবেন না স্যার। আজকের মিটিং-এর সব খরচা আমার।'

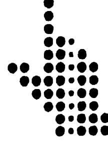
'না-না, তা—'

আমাকে মাঝখানে থামিয়ে দিয়ে পঞ্চানন বলল, 'স্যার আপনার দয়ায় টু পাইস হচ্ছে। আপনার সারভিসে যদি কিছু লাগাতে চাই 'না' বলবেন না। টেরিফিক দুঃখ পাব।'

আমি হাসতে হাসতে বললাম, 'ঠিক হ্যায়, যাও—'

সট করে উঠে দাঁড়াল পঞ্চানন। তারপর মর্টারের মতো দৌড়ে বেরিয়ে গেল।





হে-হে মহাশয়গণ, পাক্কা দু-ঘন্টা পর মিটিং শুরু হয়ে গেল।

চেয়ার-টেবিল-মালা-মাইক থেকে শুরু করে অডিয়েন্স পর্যন্ত সব এর ভেতর যোগাড় করে ফেলেছে পঞ্চানন। এমন কি উদ্বোধনী সঙ্গীত গাইবার জন্য একটা ছোট মেয়ে আর একটা হারমোনিয়মও জুটিয়ে এনেছে। মাকড়ার মাথায় স্ক্র্যাপ-আয়রণ পোরা নেই, কিছু ভাল জিনিসই রয়েছে।

উদ্বোধনী সঙ্গীত তো হয়ে গেল। সেদিনের মতো আজও আমি এই মিটিং-এর উদ্বোধক, সভাপতি, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, এবং একমাত্র বক্তা।

হে-হে মহাশয়গণ, পিপলস লিডার মানে, জনগণের নেতাদের মতো গলায় ঢাউস একটা যুঁইয়ের মালা চাপিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে চটর-পটর করে হাততালির শব্দ হতে লাগল। সেই সঙ্গে মিনিট তিন-চারেক পর পর আমার নামে জয়ধ্বনি উঠতে লাগল।

'পিটার স্বয়ম্ভু হোড়—'

'যুগ যুগ জীয়ে—'

সেদিনের মতো আজও ব্যারাকবাড়ির উঠোনটা মানুষে ঠাসা। এমন কি উঠোনের মাঝখানে যে ঝাঁকড়া রেইন ট্রিটা রয়েছে তার ডালেও অনেক লোক ঝুলছে। পঞ্চানন কাউকে আর ঘরে থাকতে দেয়নি, চারপাশের কলোনি আর বস্তি-টস্তি থেকে সবাইকে বার করে নিয়ে এসেছে।

চারপাশে জনগণের মুখের ওপর দিয়ে দৃষ্টিটাকে সেমি-সার্কেল একবার ঘুরিয়ে নিয়ে গেলাম। আমি কী বলি তা শুনবার জন্য প্রত্যেকটা লোক দম বন্ধ করে আছে, কারো চোখের পাতা পড়ছে না।

সার একসময় বলতে শুরু করলাম, 'ভাই আর বোনেরা, একমাস আগে একবার আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে লিডার-ফিডারদের মতো একখানা বক্তৃতা ঝেড়েছিলাম। সেদিন আপনাদের জন্য ক'টা ফান্ড খুলবার কথা ডিক্লেয়ার করার জন্যে মিটিং ডাকতে হয়েছিল। আজও একটা জুররি দরকারে বিনা নোটিশে একটা মিটিং ডাকতে হল। দুম করে মিটিং ডাকাতে নিশ্চয়ই আপনাদের কষ্ট হয়েছে।'

কে যেন বলে উঠল, 'কিসের কষ্ট?'

বললাম, 'হুট করে চলে আসতে হল বলে—'

রেইন ট্রির মাথা থেকে আরেকজন চিৎকার করে উঠল, 'আপনি মাইরি আমাদের ভগবান। যখন ডাকবেন তক্ষুণি আপনার পায়ের কাছে এসে বডি-থ্রো দেব। শুরু করে দিন গুরু—'

গম্ভীর চালে একটু হেসে বললাম, 'ধন্যবাদ। বড় বড় লিডারদের মতো আড়াই মাইল বক্তৃতা ঝেড়ে আপনাদের মেজাজ পটাসিয়াম করে দেব না। স্রেফ দু-চারটে দরকারি কথা বলে ছেড়ে দেব।'

আমার ডান দিক থেকে তিন-চারটে ছোকরা হল্লা করে উঠল, 'দু-চারটে কেন, আপনি যা বলবেন, যতক্ষণ বলবেন, সব শুনে যাব। হোল ডে হোল নাইটও যদি চালিয়ে যান, আমরা এখান থেকে এক ইঞ্চিও নড়ছি না। বাহ্যি পেচ্ছাপ বন্ধ করে বসে থাকব। আপনি মাইরি একসঙ্গে আমাদের ফাদার-মাদার এবং গ্র্যান্ড ফাদার, গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার। কত করেছেন আমাদের জন্যে!' বলেই চেঁচিয়ে উঠল, 'পিটার স্বয়ম্ভু হোড়—'

'যুগ যুগ জীয়ে—'

মহাশয়গণ, কারবারটা দেখুন, খুব ভাল করে দেখুন, পরের টাকায় দানছত্তর খুলে আমি কিরকম একখানা গড হয়ে বসেছি। অভ্যুদয়কে কাটিয়ে দিয়ে আমিই ইলেকসানে নেমে যাব নাকি? আপনাদের গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি হান্ড্রেড পারসেন্ট ভোট পাবই। কিন্তু মহাশয়গণ, আমি শালা একটা ফোরটোয়েন্টি, একটা থার্ড ক্লাস চিট এবং বেজন্মা, আমার মতো লোকের পিপলস রিপ্রেজেন্টেটিভ হওয়া কি উচিত? উচিত-ফুচিতের কথা বাদ দিলেও আরেকটা কথা থেকে যায়। মহাশয়গণ, আপনারা তো দেখেছেনই, ওপরে টেরেলিন-ফেরেলিন চড়ালেও ভেতরে ভেতরে আমি স্রেফ নাগা সন্ন্যাসী। এম. এল. এ, এম. পি হওয়া মানেই দেড় লক্ষ লোক চিটে গুড়ে মাছি আটকাবার মতো আমার গায়ে এঁটে যাবে। আমি মহাশয়গণ, ঝাড়া হাত-পায়ের লোক। এসব ঝামেলা আমার পোষাবে না।

উঠোনের চারধারে ঠাসা ভিড়টার দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলাম, 'ভাই আর বোনেরা, প্রথমেই আপনাদের একটা সুখবর দিতে চাই।'

চারদিক থেকে গলা মিলিয়ে সবাই চিৎকার করল, 'কী খবর?'

'আগের দিন আপনাদের বলেছিলাম, শিগগিরই বেনিফিট ফান্ডগুলো থেকে ক্যাশ ডোল বাড়িয়ে দেওয়া হবে। মনে আছে?'

'আছে, আছে—'

'আসছে মাস থেকে সবগুলো ডোল তিন গুণ করে দেওয়া হবে।'

মহাশয়গণ, আমার আর টাকার দুশ্চিন্তা কী। আপনারা তো জানেনেই, এখন আমি আর একমাত্র পিটার স্বয়ম্ভু হোড় নই। এক আমি বহু হয়েছি। স্বয়ম্ভু শ্রীকৃষ্ণের মতো অষ্টোত্তর শত নাম নিয়ে কলকাতার একশ আটটা ব্যাঙ্কে ছড়িয়ে পড়েছে। সমাজপতি আমার নামে ঐ ব্যাঙ্কগুলোতে কয়েক লাখ টাকা জমা দিয়ে রেখেছেন। দু-একদিনের মধ্যে সবগুলো ব্যাঙ্কের চেক-বই আমার হাতে এসে যাবে। অতএব মহাশয়গণ বুঝতেই পারছেন আমার বেনিফিট ফান্ডগুলোর হেল্‌থ কিরকম ভাল হতে চলেছে। পরের পয়সা পাওয়া গেলে মেজাজে দু-হাতে ছড়াতে কার না ভাল লাগে।

আমার কথা শেষ হতে-না-হতেই মিটিং-এর চারদিক থেকে ঘন ঘন চিৎকার উঠতে লাগল, 'পিটার স্বয়ম্ভু হোড়—'

'যুগ যুগ জীয়ে—'

'যুগ যুগ জীয়ে—'

দশ মিনিট ধরে একটানা চিৎকারটা চলল। সেটা থিতিয়ে এলে বললাম 'আরো একটা কথা

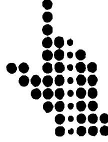
ছিল। একমাস আমি আপনাদের এই এরিয়াতে তাঁবু ফেলে আছি। চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে আমার চোখে পড়েছে এখানকার লোকজন সব সময় নানারকম রোগে ভোগে। কে কী রোগে ভুগছেন, ঘন্টাখানেকের মধ্যে যদি আমাকে জানিয়ে দেন, খুব ভাল হয়।'

মহান জনগণ চারপাশ থেকে চেঁচিয়ে উঠল, 'নিশ্চয়ই জানাবো, নিশ্চয়ই জানাবো—'

এই দায়িত্বটা আমি পঞ্চাননের ওপর দিলাম। তার কাছে সবাই নিজের নিজের অসুখের নাম লিখিয়ে দেবেন। পঞ্চানন সেই লিস্টটা আমাকে দিয়ে দেবে। দু'ঘন্টা পর আমি কলকাতায় যাব। তার ভেতর লিস্টটা পেলে ভাল হয়।'

জনতা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে জানিয়ে দিল এক ঘন্টার ভেতরেই এই এলাকার যাবতীয় রোগের তালিকা পঞ্চাননের মারফত আমার কাছে পৌঁছে দেবে।

আমি এবার বললাম, 'আর কিছু বলার নেই। মিটিং এখানেই শেষ হল। তবে আপনারা কেউ যাবেন না। পঞ্চানন থাকছে। তার কাছে রোগের নামগুলো লিখিয়ে দিন। আচ্ছা নমস্কার—' টাটকা যুঁইফুলের বেশ দামি মালাখানা গলায় ঝুলিয়ে আমি ঘরের দিকে পা বাড়িয়ে দিলাম।



মহাশয়গণ, ঘরে ঢুকতেই চোখে পড়ল বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে পায়ের ওপর পা ক্রস করে নাচিয়ে যাচ্ছে বোদা। কিছুক্ষণ আগে আমি যখন মিটিং করতে যাই, সে ঘরে ছিল না। আমাকে দেখে দু-হাতে তালি বাজাতে বাজাতে উঠে বসল। বলল, 'টেরিফিক গুরু, টেরিফিক। যা সব বক্তৃতা-টক্তৃতা ঝাড়ছ তাতে তুমি মাইরি লিডার হবেই। কোনো শালা রুখতে পারবে না।'

'বলছিস!' মালাটা গলা থেকে খুলতে খুলতে বোদার পাশে বসলাম।

'একশ বার।' বোদা বলতে লাগল, 'লেকিন গুরু—'

'কী?'

'সেদিন এখানকার মাকড়াদের জন্যে এতগুলো ফান্ড খুললে। তারপর আবার রোগের লিস্টি চাইলে। কী ব্যাপার বল তো?'

চোখ-টোখ কুঁচকে বললাম, 'আছে একটা ব্যাপার।'

'এত শালার রোগ সারাতে বাইশটা হাসপাতাল লেগে যাবে যে! তুমি হাসপাতাল টাতাল বসাবে নাকি?'

'দেখা যাক কী করি।'

ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে বোদা খানিকক্ষণ কি ভাবল। তারপর বলল, 'ব্রেনে কিছু প্ল্যান-ট্যান এসেছে নাকি?'

তার নাকে আদর করে একটা টুসকি মারলাম। বললাম, 'ঠিক ধরেছিস মাকড়া।'

'কী প্ল্যান?'

'এখন না, ক'দিন পর জানতে পারবি। শুধু একটা কথা বলে রাখছি। এক শালার শখ হয়েছে

গাড্ডায় পা ঢোকাবে। আমি গাড্ডাটাকে ওর পায়ের কাছে টেনে এনে দিচ্ছি আর কি।'

'গুরু তুমি যুগ যুগ জীও—'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। এখন একটা কথা বল তো, ভোরবেলা উঠে কোথায় হাওয়া হয়েছিলি?'

একটু চুপ করে থেকে বোদা বলল, 'কনকচাঁপার কাছে ইন্টারভিউ দিতে।'

মহাশয়গণ, বেশ কয়েকটা দিন বোদার কাছে কনকচাঁপার খবর নেওয়া হয়নি। বোদাও নিজের থেকে এ ব্যাপারে কিছু বলে নি। বললাম, 'ইন্টারভিউ কিরকম হল?'

ভুরু নাচাতে নাচাতে বোদা বলল, 'মামলা বহোত খারাপ।'

'কেন রে? বঁড়শি থেকে মাছ হড়কে বেরিয়ে গেল নাকি?'

'গেঁথে যখন ফেলেছি তখন হড়কাতে দিচ্ছে কে? তবে—'

'তবে কী?'

'ওই মাকড়া নোকলেশ্বর ব্যাপারটা ক্যাচ করে ফেলেছে।'

'মানে?'

'মানে একদিন ওদিকের রাস্তার ধারে যে মাঠটা আছে সেখানে দু'জনে পাশাপাশি বসে ছিলাম। তারপর মাইরি গুরু বডিতে কিরকম যেন হিট চড়ে গেল। আমি শালা ওর কোলে মাথা দিয়ে সিনেমার হিরোদের মতো শুয়ে পড়লাম। মাকড়া নোকলেশ্বর কোবরেজ ওধারে কী করতে গিয়েছিল কে জানে। দুম করে আমাদের সেই সিনটা দেখে ফেলেছে। তারপর সব কিচাইন হয়ে গেল।'

'কিরকম?'

'শালা নোকলে মেয়েটাকে ডিটেকটিভদের মতো নজরে নজরে রাখছে। আমি ওর দেড় মাইলের ভেতর বডি ভেড়াতে পারছি না। তবে ও মাকড়া যায় ডালে ডালে, আর আমি চলি পাতায় পাতায়। ইঁদুরের মতো আমি ওর ভিতের তলায় গর্ত খুঁড়ে যাচ্ছি। মওকা পেলেই শালার চোখে ধুলো ছিটিয়ে কনকের সঙ্গে দেখা করতে কোসিস করছি।'

'আজ যে ইন্টারভিউ দিতে গিয়েছিলি, তোর কনকচাঁপা কী বললে?'

'ওর বাবার সঙ্গে দেখা করতে বলেছে।'

'মানে নোকলের সঙ্গে?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'বলেছে দেখা করে ম্যারেজের ব্যাপারটা ফাইনাল করে ফেলতে।'

'একেবারে ম্যারেজ?'

'হ্যাঁ গুরু।'

'নোকলের সঙ্গে দেখা করেছিস?'

'না।'

'কেন?'

'ওকে দূর থেকে দেখলেই এখন হার্টে ক্যানসার হয়ে যাচ্ছে।'

'হুঁ। কী করতে চাস তাহলে?'

বোদা একটু চিন্তা করে বলল, 'আমি ভেবেছি এ ব্যাপারে তোমার সঙ্গে আগে একটা কনফারেন্স করে নেব।'

সঙ্গে সঙ্গে এক ফুট ঘাড় হেলিয়ে বললাম, 'ভেরি গুড। এখনই কনফারেন্স লাগিয়ে দে। কি চাস বলে ফেল—'

'গুরু তুমি কি আমাকে ঝুলে পড়তে বলছ?'

'মানে?'

'মানে বিয়ে করতে বলছ কিনা—'

বোদার ঘাড়ে আলতো একটা খোঁচা দিয়ে বললাম, 'ইয়েস—'

এই মুহূর্তে দুম করে বিয়েটা বোধ হয় সেরে ফেলতে রাজি নয় বোদা। আরো কিছুদিন কনকচাঁপার সঙ্গে সে খেলে নিতে চায়। এক্ষুণি কঁ্যাচাকলে পা ঢোকালে আর তো স্বাধীন চিড়িয়ার মতো চরে বেড়ানো যাবে না। সে বলল, 'কিন্তু গুরু—'

'বলে ফেল।'

ঘাড় চুলকাতে চুলকাতে বোদা বলল, 'এর ভিতর বিয়ে করলে, মানে শালা ছেলেপুলে লেন্ডিগেন্ডি হয়ে গেলে টেরিফিক ঝামেলা—'

বললাম, 'মাকড়া, বিয়ে যখন করবিই ঠিক করে ফেলেছিস, তাড়াতাড়িই করে ফ্যাল। কুচলে তেতো করবার পর বিয়েটা করলে আর চার্ম থাকবে না। বীয়ারে ফেনা থাকতে থাকতে চুমুক না দিলে কি ভাল লাগে! তবে একটা কথা—'

'কী?'

'বিয়ের পব তিন বছর হাম দোনো হয়ে থাকতে হবে।'

'বেম্মাচারী হয়ে থাকতে বলছ?'

'বিলকুল। তিন বছর পর একটা লেন্ডি হতে পারে, তার পাঁচ বছর বাদে একটা গেন্ডি। তারপর ফুল স্টপ। 'হাম দোনো হামারা দোনো'র পর গলায় একখানা লাল ত্রিকোণ ঝুলিয়ে ফেলবি। সমঝা?'

'সমঝা গুরু। তবু একটা লেকিন রয়ে গেছে।'

'কী?'

'বিয়ে যে করব, শালা খাওয়াব কী? তুমি যা ক্যাশ-ফ্যাশ আনছ সবই ফান্ড-খুলে দু-হাতে উড়িয়ে দিচ্ছ।'

বোদার ঝাঁকড়ানো চুলের ঝুঁটি ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললাম, 'ঘাবড়াস না, তোর বিয়ের পর নতুন একটা ফান্ড খুলে দেব।'

'কী ফান্ড?'

'ফান্ড ফর দি নিউলি-ম্যারেড।'

'মানে কী গুরু?'

'মানে নতুন ল্যাজকাটাদের অর্থাৎ নব বিবাহিতদের জন্যে তহবিল।'

'তুমি গুরু দয়ার সমুদ্দুর। মনটা তোমার হেভি সফট, এক্কেবারে বাটার।'

'তা হলে এক কাজ কর, আজই নোকলের সঙ্গে দেখা করে ম্যারেজটা পাক্কা করে ফ্যাল।'

হ্যান্ড গ্রেনেডের পলতেয় পা পড়ার মতো চমকে উঠল বোদা, 'আজই?'

'হ্যাঁ, আজই। শুভ কাজ ঝুলিয়ে রাখতে নেই।'

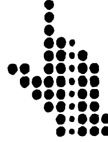
'কিন্তু গুরু, ঐ পাইপগানের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে আমার ভরসা হচ্ছে না। নোকলেকে দেখলেই আমার হাঁটুর বল বেয়ারিং ঢিলে হয়ে যায়। একটা কথা বলব?'

'জরুর—'

'তুমি আমার সঙ্গে যাবে? মানে একজন বরকত্তাও যাওয়া দরকার। তুমি ছাড়া আমার তো কোনো গার্জেন নেই। বোদা দাঁত বার করে হাসল।

একটু ভেবে বললাম, 'ঠিক আছে, যাব। আজ আর কলকাতা যাচ্ছি না, তোর বিয়েটাই ফাইনাল করে আসব।'

বোদা আমার পায়ের ওপর স্ট্রেট বডি থ্রো দিয়ে এক দমে বারটা প্রণাম করল।



সন্ধেবেলা বোদাকে বললাম, 'চল, এবার শুভ কাজটা সেরে আসা যাক।'

বোদা এর জন্যই দমবন্ধ করে বসে ছিল। সট করে উঠে দাঁড়িয়ে একটা নোংরা ড্রেন পাইপ প্যান্টের ভেতর পা গলাতে যাচ্ছিল। তাকে বললাম, 'উঁহু, আজ শালা তোর বিয়ের ব্যাপারে একটা টপ লেভেল কনফারেন্স করতে যাচ্ছি। আর তুমি মাকড়া চোঙা প্যান্ট পরে যাবে! ভাল করে মেক-আপ লাগা।'

পুরো বত্রিশটা দাঁত বার করে হাসল বোদা। তারপর পার্ক স্ট্রিটের ডিপার্টমেন্টাল স্টোর থেকে যে সব টেরিকট-টেরিলিনের শার্ট ফার্ট কায়দা করে বাগিয়ে এনেছিলাম সেগুলো থেকে রং মিলিয়ে ম্যাচ করে ট্রাউজার আর শার্ট বার করে পরে ফেলল। ড্রেস চড়াবার পর প্লাস্টিকের একটা চিরুনি দিয়ে ঝাড়া সাত মিনিট ধরে চুলে বে অফ বেঙ্গলের গোটাকয়েক ঢেউ তুলে আমার দিকে ফিরল, 'ও-কে গুরু?'

আমি দেখেই যাচ্ছিলাম। বললাম, 'ও-কে। যা মাঞ্জা চড়িয়েছিস নোকলে তো বাচ্চা, ওর ফোরটিন জেনারেসন একেবারে ফ্ল্যাট হয়ে যাবে।'

বোদা আবার ঠোঁট ফাঁক করে হারমোনিয়ামের রিড বার করল। একটু পর আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

রাস্তায় এসে বোদা আমার গায়ের সঙ্গে প্রায় লেপটে থেকে ঝুলতে ঝুলতে চলল। একটা টকিং মেশিনের মতো সমানে বকে যাচ্ছিল সে, 'গুরু—'

তার দিকে না ফিরেই বললাম, 'কী?'

'যত শালা এগুচ্ছি আমার হাঁটুতে হাঁটুতে বঙ্গো বেজে যাচ্ছে। আর মাইরি কোমরের অ্যাকসিলেরেটরটা ব্রেক ডাউন করে যাবে মনে হচ্ছে।'

'ভয় লাগছে নাকি?'

'হুঁ—'

'খুব?'

'টেরিফিক গুরু—'

'ভয়ের কী আছে!'

'নোকলে মাকড়া যদি আমার গলায় মেয়েকে ঝোলাতে রাজি না হয়? যদি বিয়ের ব্যাপার কিচাইন করে দ্যায়?'

বোদার কাঁধে আলতো করে একটা টুসকি মেরে বললাম, 'ঘাবড়াস না।'

বোদা এবার খানিকটা চাঙ্গা হয়ে উঠল যেন, 'হোপ দিচ্ছ গুরু?'

'কনকচাঁপার নাকে যদি ঠিকঠাক বঁড়শি গেঁথে থাকিস এ বিয়ে ওয়ার্ল্ডে কেউ বুখতে পারবে না।'

'গুরু একটু দাঁড়াও তো।'

আমি থামলাম না। হাঁটতে হাঁটতেই বললাম, 'দাঁড়াব কেন?'

বোদা বলল, 'আরেক বার তোমার পায়ের ধুলো জিভে ঠেকাব।'

'এখন না, আগে নোকলে কবরেজের সঙ্গে তোর ব্যাপারটা ফাইনাল করি, তারপর আমার পা থেকে আড়াইশ গ্রাম ধুলো খাস।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। এর মধ্যে আমরা ট্যারাবাঁকা রাস্তার দুটো বাঁক পার হয়ে গেলাম। আচমকা বোদা ঘাড়ের কাছে থেকে ডেকে উঠল, 'গুরু—'

মুখ না ফিরিয়েই বললাম, 'কী বলছিস?'

'নোকলে হারামীকে ম্যানেজ করতে পারবে তো?'

বুঝতে পারছি নকুলেশ্বর ভিষকরত্ন বোদার কাছে একটা ফোবিয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি যতই সাহস-টাহস দিই না, তার ভাবনাটা ঘুরে ঘুরে বোদার মাথায় ফিরে আসছে। বললাম, 'অত ভাবছিস কেন? মামলাটা স্ট্রেট আমার ওপর ছেড়ে দে—'

'ঠিক আছে গুরু, ঠিক আছে। আমি শালা আর ভাবব না। আমার যত ভাবনা তোমার কাঁধে ঝুলিয়ে দিলাম।'

কয়েক মিনিটের মধ্যে আমরা নকুলেশ্বর ভিষকরত্নের সেই ধসে-পড়া, টাল-খাওয়া, পলেস্তারা-খসা একশ বছরের পুরনো বাড়ির সামনে এসে পড়লাম। এর আগে আর একবারই মোটে এখানে এসেছি। তিন মাস বাদে বাদে নকুলেশ্বর কবরেজের ছেলেদের গুরুদশা হয় এবং সেই কারণে পাইকিরি রেটে মাথা চাঁছায় নকুলেশ্বর। তেমনি এক মাথা চাঁছার সময় বোদা আর আমার সঙ্গে এখানেই তার আলাপ হয়েছিল।

বাড়ির সামনেটা আজ ফাঁকা। এই সন্ধেবেলায় নকুলেশ্বর বা ময়রার দোকানের 'আবার

খাবো' সন্দেশের মতো একই ছাঁচের মুখওলা তার দেড় ডজন ছেলেমেয়ের একজনকেও এখন দেখা যাচ্ছে না। বললাম, 'বাড়িতে কেউ নেই নাকি? মাকড়ারা গেল কোথায়?'

এ বাড়িতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে বোদা সট করে আমার পেছনে চলে গিয়েছিল। পিঠের দিক থেকে কুঁই কুঁই করে সে বলল, 'কোথায় যাবে শালারা, ভেতরেই আছে। ডাকো না—'

গলা চড়িয়ে ডাকতে লাগলাম, 'নকুলেশ্বরবাবু, নকুলেশ্ববাবু—'

ভেতর থেকে মোটা ভারি সর্দি-বসা খ্যাসখেসে একটা গলা ভেসে এল, 'কে?'

নকুলেশ্বরের পেটেন্ট কণ্ঠস্বর। বললাম, 'নাম বললে চিনবেন না, কাইন্ডলি একটু যদি বাইরে আসেন—'

একটু পর নকুলেশ্বর বেরিয়ে এল।

মহাশয়গণ, নিশ্চয়ই মাকড়ার চেহারা-টেহারা আপনাদের মনে আছে। সারা মুখে পিনের মতো চোখা চোখা দাড়ি, নাক আর কানের ভেতর থেকে গোছা গোছা চুল বেরিয়ে আছে। ঘোলাটে লাল চোখ। পরনে গলাবন্ধ ধুসো কোট আর হাঁটুর নিচে নেমে-আসা ময়লা মিলের ধুতি, পায়ে টায়ার-কাটা স্যান্ডেল। সর্বক্ষণ তাকে এই পোশাকেই দেখা যাবে। মাকড়া মায়ের পেট থেকে এই ড্রেস নিয়েই মাটিতে পড়েছিল খুব সম্ভব।

নকুলেশ্বরের সঙ্গে 'আবার খাবো' সন্দেশের সেই ঝাঁকটাও বেরিয়ে এসেছে। তাদের মাথায় এর মধ্যে পাঁচ সেন্টিমিটারের মতো চুল গজিয়েছে। হে-হে মহাশয়গণ, বোঝা যাচ্ছে আরেকটা গুরুদশার সময় এগিয়ে আসছে।

নকুলেশ্বর চোখ কুঁচকে ঝাড়া দেড় মিনিট আমাকে দেখল। তারপর বলল, 'চেনা চেনা মনে হচ্ছে—'

কোথায় কিভাবে তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, জানালাম।

নকুলেশ্বর তার সর্দি-বসা গলায় এবার জিজ্ঞেস করল, 'আমার কাছে কী মতলবে?'

বললাম, 'আপনার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।'

'বলুন।'

'এভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অত কথা বলা যাবে না। সামিট কনফারেন্সের ব্যাপার, কোথাও একটু বসতে হবে।'

'আমার বাড়িতে আড়াইখানা ঘর, ছ ফুট বাই কুড়ি ফুট বারান্দা। এর মধ্যে আমরা উনিশ জন লোক থাকি। আর আছে বারটা তোরঙ্গ, একুশটা বালিশ, পঁয়ত্রিশটা কাঁথা, চারটে তক্তপোশ, দুটো আলনা, একুশটা এনামেলের থালা, একুশটা সিলভারের গেলাস, হাঁড়িকুঁড়ি, পাটি, বোতল, জুতো। এর ভেতর বসবার জায়গা নেই।'

'না বসতে পারলে তো মুশকিল হবে। ট্রাফিক পুলিশের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ আর কথা বলা যায়!'

নকুলেশ্বর দু সেকেন্ড কী ভাবল। তারপর 'আবার খাবো' সন্দেশের ঝাঁকের দিকে ফিরে বলল, 'দৌড়ে একটা শতরঞ্চি আর হেরিকেন নিয়ে আয় তো।'

চোখের পাতা পড়তে না পড়তেই একটা ছেলে ছেঁড়া তালি-মারা একটা শতরঞ্চি আর

হেরিকেন নিয়ে এল। দূরে একটা ঝাঁকড়া-মাথা জামরুল গাছ দেখিয়ে নকুলেশ্বর তাকে শতরঞ্চিটা সেখানে বিছিয়ে দিতে বলল। বিছানো হলে আমাকে বলল, 'চলুন, ওখানে বসে আপনার কথা শুনব।' বলে পা বাড়াল।

আমিও এগিয়ে চললাম। আমার পেছনে বোদা। হে-হে মহাশয়গণ, ঘাড় না ফিরিয়েও টের পাচ্ছি বোদা টেরিফিক কাঁপছে, তার হাঁটুতে হাঁটুতে সত্যি সত্যি বঙ্গো বেজে যাচ্ছে। আমাদের পাশে পাশে লাইট গোর্খা ইনফ্যান্ট্রির মতো নকুলেশ্বরের ডজনখানেক ছেলে তাদের গোল মুখ, কুতকুতে চোখে আর একই সাইজের চুল নিয়ে প্রশেসন করে এগিয়ে চলেছে।

যেতে যেতে নকুলেশ্বর বলল, 'বসবার আগে একটা কথা সাফ সাফ বলে নিচ্ছি।'

আমি তার দিকে তাকালাম, 'কী?'

'আমি কিন্তু চা খাওয়াতে পারব না।'

'একেবারেই সম্ভব না?'

'না।'

হে-হে মহাশয়গণ, নকুলেশ্বর মালটি কিরকম, আপনারাই ভেবে দেখুন। দু-হাত উল্টে বললাম, 'তাহলে কী আর করা যাবে! বেশ খাওয়াবেন না।'

একটু পর আমরা জামরুলতলায় সামিট কনফারেন্সে বসে গেলাম। নকুলেশ্বর আর আমি দুই দেশের প্রেসিডেন্ট বা প্রাইম মিনিস্টারের মতো মুখোমুখি বসলাম। আমার পিঠে স্টিকিং গামের মতো সেঁটে রইল বোদা। আর নকুলেশ্বরের চারপাশে তার ইনফ্যান্ট্রি গোল হয়ে বসল। মাঝখানে কালি-পড়া হেরিকেন জ্বলছে! সেটা থেকে আলোর চাইতে ধোঁয়া আর কালি পাওয়া যাচ্ছে বেশি।

নকুলেশ্বর বলল, 'এবার আপনার কথা শুরু করুন—'

টার্গেটে পৌঁছুবার আগে একটা অ্যাটমসফিয়ার তৈরি করবার জন্য বললাম 'অনেক দিন পর দেখা। আপনার শরীর ভাল আছে?'

নকুলেশ্বর মাকড়া আমার কথার উত্তর দিল না। স্ট্রেট বলল, 'আসল কথাটা পেটের ভেতর থেকে বার করুন। আমার শরীর নিয়ে ভাবতে হবে না।'

হে-হে মহাশয়গণ, আমিও পিটার স্বয়ম্ভু হোড়, আমার মতে তাড়াহুড়ো করে কিছু করতে নেই। মালকে একটু খেলিয়ে ফুসলে ফুসলে বঁড়শির মুখে এনে হ্যাঁচকা টান মারব। বললাম, 'বাড়ির সবাই ভাল আছে?'

খোঁচা খোঁচা দাড়িওলা মুখ নিয়ে নকুলেশ্বর টেরিফিক বিরক্ত গলায় বলল, 'আছে।'

'আপনার মিসেস?'

'আছে।'

শিশুরা?'

'আছে।'

'বিজনেস ভাল চলছে?'

নকুলেশ্বর এবার বেশ চটেই গেল, 'ধানাই পানাই না করে যে জন্যে এসেছেন তাই বলুন—'

হে-হে মহাশয়গণ, মাকড়া দুর্দান্ত খলিফা। মেন লাইন ছাড়া লুপ লাইনে একবারও যেতে চায় না। কাজেই আমাকে আসল জায়গায় আসতে হল। বললাম, 'আমরা একটা বিয়ের কথা বলতে এসেছি।'

'কার বিয়ে?'

'কনকচাঁপার।'

'কনকচাঁপা কে?'

'আপনার মেয়ে।'

'আমার মেয়ে!'

হে-হে মহাশয়গণ, নকুলেশ্বরের মুখ দেখে মনে হল, কনকচাঁপা নামটা সে এই প্রথম শুনল। স্মৃতির ভেতর অনেকক্ষণ হাতড়াবার পর বলল, 'ও নামে আমার কোনো মেয়ে-ফেয়ে নেই। আপনারা ভুল জায়গায় এসেছেন।'

এই সময় 'আবার খাবো' সন্দেশের ভেতর থেকে একজন বলে উঠল, 'আছে বাবা—'

তার দিকে ফিরে নকুলেশ্বর জিজ্ঞেস করল, 'কে কনকচাঁপা?'

সামিট কনফারেন্সের সময় টপ অফিসাররা যেভাবে লিডার অফ দি ডেলিগেসনকে নানারকম তথ্য সাপ্লাই করে ঠিক সেইভাবে সেই ছেলেটা বলল, 'ঘুন্টি।'

কয়েক পলক আবাক হয়ে থাকল নকুলেশ্বর। তারপর বলল, 'ঘুন্টির ভাল নাম কনকচাঁপা নাকি?'

'হ্যাঁ, বাবা—'

'অ। ভুলেই গিয়েছিলাম।' বলেই আমার দিকে আবার ফিরল নকুলেশ্বর, ছেলেমেয়ের কড়িটা ডাক নাম, কুড়িটা ভাল নাম। চল্লিশটা নাম সবসময় কারও মনে থাকে!'

আমি হাসলাম, 'ওই কনকচাঁপার বিয়ের কথাটা তা হলে সেরে ফেলি—'

মহাশয়গণ, নকুলেশ্বর দেবশর্মা ভিষকরত্ন তার চোখদুটো মিনিটখানেক পুরো ফিক্সড করে রাখল। তারপর বলল, 'কার সঙ্গে ঘুন্টির বিয়ে?'

বোদাকে আমার পিঠের কাছ থেকে সামনের দিকে টেনে আনলাম, 'এর সঙ্গে।'

নকুলেশ্বর কিছু বলবার আগেই বোদা ডাইভ মেরে নকুলেশ্বরের খই-ওড়া চামড়া-ফাটা পায়ের ওপর স্ট্রেট অ্যাঙ্গেলে শুয়ে পড়ল। তিন মিনিট ধরে লম্বা একটা পেন্নাম ঠুকে উঠে বসল। তারপর মুখখানা টেরিফিক কাঁচুমাচু আর করুণ করে হাত কচলাতে কচলাতে নকুলেশ্বরের দিকে তাকিয়ে রইল।

অন্ধকারে ভাল দেখা যাচ্ছিল না। নকুলেশ্বর একটা ছেলেকে বলল, 'হেরিকেনটা এই ছোকরার মুখের কাছে তুলে ধর তো।'

ছেলেটা হেরিকেন তুলে ধরল।

নকুলেশ্বর তখন তার গোল গোল ঘোলাটে চোখে বোদাকে দেখতে লাগল। ভাবী সান-ই-নল আর ফাদার-ইন-ল'র শুভদৃষ্টি হবার পর বোদা চোখ নামিয়ে ঘাড় গুঁজে বসে রইল। আর নকুলেশ্বর তার খ্যাসখেসে ভারি গলায় বলে উঠল, 'অ্যাই ছোঁড়ার সঙ্গে ঘুন্টিকে ক'দিন ঘুরতে

দেখেছি বটে।'

বললাম, 'তা হলে তো কেসটা ওরা পাকিয়েই রেখেছে। আপনি শুধু একটা পারমিসান দিয়ে দিন। দুই মাকড়ার গায়ে বিয়ের স্ট্যাম্প পড়ে যাক।'

'না।'

'কী না?'

'এই ছোকরার সঙ্গে ঘুন্টির বিয়ে দেব না।'

দরাজ হাতে সার্টিফিকেট লিখে দেবার মতো করে বললাম, 'পাত্র হিসেবে ও কিন্তু ফার্স্ট কেলাস।'

আমার কথা শেষ হল কি হল না, নকুলেশ্বর প্রায় খেঁকিয়ে উঠল, 'অত্যন্ত হারামী।'

আমি যে আমি, পিটার স্বয়ম্ভু হোড়, সেই আমি পর্যন্ত হকচকিয়ে গেলাম, 'মানে—'

'মানেটা জলের মতো সোজা। ভদ্দরলোকের বাড়ির মেয়েদের যে ফোসলায় সে হারামী নয়?'

মহাশয়গণ, ব্যাপারটা একবাব ভাবুন। বোদা কনকচাঁপার সঙ্গে প্রেম-ফ্রেম চালিয়ে যাচ্ছে। আর নকুলেশ্বর খচ্চরটি সেটাকে স্রেফ ফুসলানি বলে চালাচ্ছে।

পার্লামেন্টে অপজিসান পার্টির লিডারদের মতো মুখ করে বললাম, 'এটাকে আপনি ফোসলানি বলতে পারেন না। ওরা অন্য দিক থেকে ফেঁসেছে।'

চোখের পাতা কুঁচকে নকুলেশ্বর বলল, 'ফেঁসেছে মানে?'

'ওয়াটারের মতো সোজা। ওরা প্রেমে পড়েছে।'

গ্রেট ডিক্টেটরের মতো নকুলেশ্বর গর্জে উঠল, 'প্রেমে পড়েছে! খচড়ামো করার জায়গা পায় না! কোতকা মেরে প্রেম ছুটিয়ে দেব।'

ট্রেনটা মেন লাইন দিয়ে ছুটছিল। সেটাকে ঘুরিয়ে এবার লুপ লাইনে ঢুকিয়ে দিলাম। বললাম, 'আপনার ক'টি মেয়ে ভিষকরত্ন মশাই?'

মহাশয়গণ, এরকম একটা প্রশ্ন করব, নকুলেশ্বর ভাবতে পারে নি। একটু অবাক হয়ে সে বলল, 'আপনার প্রয়োজন?'

'আগে নাম্বারটা বলুন। তারপর প্রয়োজনের কথা বলছি।'

'আমার ছয় মেয়ে।'

'মোটে হাফ ডজন।' গলা নামিয়ে বললাম।

'কী বললেন?' নকুলেশ্বর কানদুটো খাড়া করে জিজ্ঞেস করল।

'না, কিছু না। বলছিলাম কি, মেয়েগুলোর বিয়ে তো দিতে হবে।'

'আমি বাপ। মেয়ের বিয়ের দুশ্চিন্তাটা কার বেশি হওয়া উচিত, আমার না জনসাধারণের?'

'হে-হে কি যে বলেন, আপনারই হওয়া উচিত।' দু-পাটির বত্রিশটা দাঁত বার করে আমি টেনে টেনে হাসলাম, 'তবে আপনি ভুলে গিয়েছিলেন কি না, তাই একটু মনে করিয়ে দিলাম। ফ্রেন্ড হিসেবে একটা কথা বলব?'

'কী কথা?'

'চান্স যখন এসেছে একটা মেয়েকে আমার এই পার্টনারের কাঁধে ঝুলিয়ে হালকা হয়ে যান। রেল কোম্পানি বিজ্ঞাপন দেয় না, 'ট্রাভেল লাইট', মেয়েদের ওয়েট ঘাড় থেকে নামাতে পারলে দেখবেন ডানা গজিয়ে ফুর ফুর করে উড়ছেন।'

'আপনাদের কথা ফিনিশ হয়েছে?'

'না, মানে—'

'আপনারা এবার উঠুন।'

'আমার কথাটা একবার চিন্তা করে দেখুন। একটা পয়সা পণ দিতে হবে না।'

'আপনারা উঠুন।'

'ডাউরি লাগবে না।'

'আপনারা উঠুন।'

'শুধু শাঁখা সিঁদুর আর বিয়ের খরচা ছাড়া আর কিছু আপনাদের লাগবে না।'

'আপনারা উঠুন।'

'আমি ছাড়া আর কোন বরযাত্রী আসবে না।'

'আপনারা উঠুন।'

শালা নকুলেশ্বর কিরকম একটি উৎকৃষ্ট হারামজাদা দেখুন! একই ডায়লগের রেকর্ড সমানে বাজিয়ে যাচ্ছে।

বললাম, 'আপনার তা হলে ওই এক কথা?'

নকুলেশ্বর তার চর্বিওলা মোটা ঘাড় নেড়ে নেড়ে সমানে বলে যেতে লাগল, 'এক কথা। মরদকা বাত, হাতিকা দাঁত। পেরেম করে আমার মেয়ে বিয়ে করবে, আর আমি শালা বগল বাজিয়ে পারমিশন দিয়ে যাব, কভী নেহী। আপনারা উঠুন।'

সুতরাং মহাশয়গণ, এরপর তো আর বসে থাকা যায় না। হে-হে, উঠে পড়তেই হল। বোদাও আমার দেখাদেখি উঠে দাঁড়িয়েছিল। এখন আর তার দিকে তাকানো যাচ্ছে না। মাকড়া আধ ঘন্টার মধ্যে পুরোপুরি অ্যানিমিয়ার পেসেন্ট হয়ে গেছে, মুখচোখ এখন তার রক্তশূন্য এবং কাগজের মতো সাদা ফ্যাটফেটে।

একসময় আমরা বাইরের রাস্তায় চলে এলাম। মহাশয়গণ, বোদা ভাল করে হাঁটতে পারছিল না, এলোমেলো পা ফেলছিল। মনে হচ্ছে তার বডির হাড় ফাড়গুলো একেবারে লুজ হয়ে গেছে।

আমরা ব্যারাকবাড়ির দিকে ফিরে যাচ্ছিলাম। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বোদা আচমকা ধসে-পড়া গলায় ডেকে উঠল, 'গুরু—'

তার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী বলছিস?'

'গলায় দড়ি, ফলিডল খাওয়া, জলে ডোবা, কী করলে কম কষ্টে সুইসাইড করা যায় বল তো—'

'আমি আগে কোনোদিন সুসাইড করিনি। এ ব্যাপারে যারা স্পেশালিস্ট তাদের জিজ্ঞেস করতে পারিস—'

'তুমি কিছু শোনও নি?'

'না।'

'বহুত ঝামেলায় ফেলে দিলে দেখছি।'

বোদার কাঁধে আলতো করে একটা হাত রেখে বললাম, 'কী হল রে, সুইসাইডের ব্যাপারে এত খবর নিচ্ছিস?'

বোদা বলল, 'আমি আত্মহত্যা করব গুরু—'

'একেবারে ফাইনাল করে ফেলেছিস?'

'ইয়েস গুরু। শুধু কষ্টটা কিসে কম হবে সেই খোঁজটা নিয়ে আমাকে জানিয়ে দাও। জানটা শালা হাপিস করে দিই।'

'প্ল্যানটা খুব খারাপ করিস নি। সত্যি সত্যি যদি সুইসাইড করিস ইন্ডিয়ার ফুড প্রবলেম স্লাইট কমে যাবে। একটা লোক হোল লাইফে কত খায় জানিস? বিশ হাজার কেজি ভাত, দশ হাজার কেজি তরকারি, দশ হাজার ডিম, চার হাজার কেজি চিনি, চা-জল মিলিয়ে বিশ হাজার গ্যালন, পাঁচ কুইন্টাল বিড়ি সিগারেট, তিরিশ হাজার গ্যালন সোনার বাংলা—'

আমার কথা শেষ হবার আগেই বোদা চেঁচিয়ে উঠল, 'গুরু এটা মাজাকি নয়, আমার লাইফ আর ডেথের ব্যাপার—'

বোদার ঘাড়ের ওপর হাতটা ছিলই, আস্তে আস্তে চাপড় মারতে মারতে বললাম, 'ঠিক আছে ঠিক আছে, বুঝতে পারি নি। এখন বল তো মাকড়া, তোর হার্টে কি এমন দুঃখের কারেন্ট বইছে যে সুইসাইড করতে চাইছিস?'

'নোকলে কোবরেজ কী বললে শুনলে না?'

'তোর সঙ্গে কনকচাঁপার বিয়ে দেবে না, এই জন্যে ওয়ার্ল্ড থেকে হাপিস হতে চাইছিস?'

'ইয়েস গুরু—'মুখটা দারুণ রকমের করুণ করে জোরে জোরে মাথা নাড়ল বোদা।

চোখদুটো সরু করে বললাম, 'শাজাহান বউর জন্যে তাজমহল বানিয়েছে, এডোয়ার্ড দি এইটথ বউর জন্যে শালা সিংহাসনই ছেড়ে দিলে। বউ হবার আগেই তুই মাকড়া কনকচাঁপার জন্যে সুইসাইড করতে চাইছিস! তোর জবাব নেই। কিন্তু—'

'কিন্তু কী?'

'সত্যি সত্যিই সুইসাইডটা করবি?'

'তোমার কি মনে হচ্ছে, ফল্স দিচ্ছি। আমি ওসব ফল্সের কারবারে নেই গুরু। গলায় দড়িফড়ি দিতে পারব না। তুমি আমাকে ফলিডলই যোগাড় করে দাও। খবরের কাগজে দেখি আজকাল শালারা ফলিডল খেয়েই সুইসাইড করছে। ওটা এখনকার তরীকা।'

'আমার একটা কথা শোন—'

'বল।'

'দুম করে সুইসাইডটা না করে ক'টা দিন ওয়েট্ কর।'

'তোমার কি ধারণা ওই নোকলে হারামী চম্বলের ডাকাতের মতো রাতারাতি সুধু ফাধু হয়ে যাবে।'

'মনে হচ্ছে না।'

'তা হলে—'

নিজের মাথায় আঙুল দিয়ে আস্তে টোকা দিতে দিতে বললাম, 'এটার ভেতর কী আছে জানিস তো?'

বোদা বলল, 'জানি গুরু—'

'কী আছে বল দেখি?'

'প্ল্যানিং কমিশনের হেড অফিস।'

'কারেক্ট কারেক্ট।' বলে একটু থেমেই আবার শুরু করলাম, 'তোর কি ধারণা প্ল্যানিং কমিশনের হেড কোয়ার্টারে আমি তালা ঝুলিয়ে দিয়েছি?'

বোদার দু'চোখ এতক্ষণে চকচকিয়ে উঠল, 'তা হলে গুরু কনকচাঁপার ব্যাপারে তোমার ব্রেন থেকে একটা প্ল্যান বেরুবে!'

'মনে তো হচ্ছে।'

'ঠিক আছে গুরু, কয়েকটা দিন দেখি। তদ্দিন সুইসাইডের ডেটটা পিছিয়ে দিচ্ছি।'

'অল রাইট। এখন একটা কথা মন দিয়ে শুনে নে।'

'বল গুরু—'

তক্ষুণি কিছু বললাম না। ফোর ফর্টি ভোল্টের ইলেকট্রিসিটি আমার ব্রেনে আচমকা স্পার্ক মারল যেন। সট করে ঘাড়টা ঘুরিয়ে বললাম, 'হয়ে গেছে—'

বোদা দম বন্ধ করে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। বলল, 'কী গুরু?'

'প্ল্যান এসে গেছে।'

বোদা ক্রেনের মতো গলা বাড়িয়ে তার মুখটা আমার মুখের কাছে নিয়ে এল, 'কী প্ল্যান গুরু?'

আমি নিজের মুখটা বোদার কানে গুঁজে দিয়ে গলা নামিয়ে ফিসফিসিয়ে প্ল্যানেব কথাটা বলতে লাগলাম। মহাশয়গণ, আপনাদের চোখমুখ দেখে মনে হচ্ছে আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন না। আমি সেটাই চাইছি অর্থাৎ এক্ষুণি আমার প্ল্যানটা আপনারা জেনে ফেলুন সেটা আমি চাই না। হে-হে, বুঝতে পারছি কিউরিওসিটি, শুদ্ধ বাংলায় কী যেন বলে, ও হ্যাঁ কৌতূহলে আপনাদের চোখ ঝকঝকিয়ে উঠছে। কিন্তু কয়েকটা দিন, খুব বেশি হলে দিন দশেক ধৈর্য ধরে থাকুন। তারপর সব জানতে পারবেন।

কথা শেষ করবার সঙ্গে সঙ্গে বোদার চোখদুটো ট্রাকের হেড লাইটের মতো জ্বলে উঠল। দারুণ উত্তেজনার গলায় সে বলল, 'টেরিফিক প্ল্যান গুরু—'

'বলছিস!' আমি গম্ভীর চালে একটু হেসে নিলাম।

'ইয়েস গুরু—'

'কাজ হবে মনে হচ্ছে?'

'কাজের চোদ্দপুরুষ হবে। গুরু পায়ের ডাস্ট দাও।' এক ঝটকায় কোমর বাঁকিয়ে আমার পা থেকে খানিকটা ধুলো তুলে জিভের ডগায় কপালে আর বুকে ঠেকাল বোদা।

কথা বলতে বলতে একসময় আমরা দুটো রাস্তার ক্রসিং-এর কাছে এসে পড়েছিলাম। আচমকা কী মনে পড়তে বোদা বলে উঠল, 'ক'টা বাজে দেখ তো?'

কবজি উলটে ঘড়িটা দেখে নিয়ে বললাম, 'সাড়ে সাতটা।'

'স্ট্রেট টেন্টে ফিরবে, না পাঞ্জাবিদের হোটেলে ডিনারটা চুকিয়ে যাবে?'

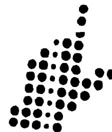
হে-হে মহাশয়গণ, কথাটা খুব খারাপ বলে নি বোদা। ব্যারাকবাড়িতে ফিরে খানিকক্ষণ বাদে আবার পবিত্র খালসা হোটেলে দৌড়তে হবে। তার চাইতে ঝামেলাটা মিটিয়ে যাওয়াই ভাল। বললাম, 'তা হলে চল, স্টমাকটা ফিল আপ করেই যাই।'

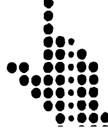
মহাশয়গণ, ঘন্টাখানেক বাদে আমরা দুই পার্টনার পাক্কা এক বোতল সোনার বাংলা এবং রুটি-তড়কা আর কষা মাংস খেয়ে ব্যারাকবাড়িতে ফিরে এলাম।

সুমনা কিংবা তাদের ঘরের অন্য কেউ এর মধ্যে হারিকেন জ্বালিয়ে বিছানা-টিছানা গোছগাছ করে রেখে গেছে। ঘরটা ঝেড়ে মুছে ঝকঝকে করেও দিয়েছে, এই কাজটা ওরা রেগুলার করে দিয়ে যায়। বোদা কিংবা আমি অনেক আপত্তি করেছি। বলেছি ঘরফর গুছিয়ে দিলে আমাদের হ্যাবিট খারাপ হয়ে যাবে। কিন্তু ওরা আমাদের কথা কিছুতেই কানে তোলে না। বলে বলে টায়ার্ড হয়ে শেষ পর্যন্ত সেই কী একটা কথা যেন আছে, হাল ছেড়ে দিয়েছি।

যাক গে, ট্রাউজার-ফাউজার পাল্টে সিল্কের লুঙ্গি আর গেঞ্জি পরে নিলাম। হেরিকেনের আলোটা উস্কে দিতেই আচমকা বিছানায় ফুলস্ক্যাপ সাইজের কাগজে একটা লিস্ট চোখে পড়ল। আমরা যখন ছিলাম না, পঞ্চানন নিশ্চয়ই ওটা রেখে গেছে। রোগ আর রুগীদের হাজার খানেক নাম তাতে লেখা আছে। হে-হে মহাশয়ণ, বিছানায় কাত হয়ে বসে লিস্টটা তুলে নিলাম। মাথার ভেতর কালী মার্কা ধান্যেশ্বরী ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক বাজিয়ে যাচ্ছিল। রোগের ফিরিস্তি দেখতে দেখতে আচমকা আমার খেয়াল হল, যে নামগুলো এতে রয়েছে তাদের বেশির ভাগই চোখের অসুখে ভোগে। এ ছাড়া টি বি, হাঁপানি, ক্যান্সার ইত্যাদি ইত্যাদি হাজার রকমের ডিজিস আছে। মহাশয়গণ, রোগের নামগুলো দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল এখানকার বেশির ভাগ মানুষই ম্যালনিউট্রিসনে ভুগছে। বডিকে সুস্থ রাখতে হলে যত ক্যালরির দরকার ওরা তার দশ পারসেন্টও পায় না। হে-হে মহাশয়গণ, আপনারাএখানে এলে এই সব মানুষের ফাটা ফাটা খই-ওড়া চামড়ায়, ভাঙা চোয়ালে গজালের মতো ফুঁড়ে-বেরুনো কণ্ঠার হাড়ে আর দেড় ইঞ্চি বসে-যাওয়া ধুলো-জমা টিমটিমে আলোর মতো ঘোলাটে চোখে ম্যালনিউট্রিসনের ছাপ দেখতে পাবেন। মহাশয়রা, অপুষ্টি এদের পায়ের নখ থেকে চুলের ডগা পর্যন্ত তার অটোগ্রাফ মেরে রেখেছে।

লিস্টটা দেখতে দেখতে আমার মাথায় দুম করে একটা প্ল্যান এসে গেল।





হে-হে মহাশয়গণ, কাল বোদার বিয়ের ব্যাপারে বরকর্তা হয়ে নকুলেশ্বর দেবশর্মা ভিষকরত্নের কাছে গিয়েছিলাম। সেখানে নকুলেশ্বরের সঙ্গে কনফারেন্স শেষ করতে করতে অনেক রাত হয়ে গেল। তাই আর কলকাতায় যাওয়া হয় নি।

আজ দুপুরবেলা পবিত্র খালসা হোটেলে লাঞ্চ সেরে আর ঘুমটুম লাগালাম না, স্ট্রেট গড়িয়াহাটার সেই ফ্ল্যাটে চলে এলাম। বোদা আমার সঙ্গে আসে নি। মহাশয়গণ, আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে কাল তার কানে গুজ গুজ করে কনকচাঁপার ব্যাপারে একটা টপ সিক্রেট প্ল্যান দিয়েছিলাম। সেই প্ল্যান অনুযায়ী তাকে অনেকগুলো জায়গায় ছোটাছুটি করতে হবে। এত জায়গায় দৌড়ুতে হবে যে সে সব যোগ টোগ করলে সাতাশ মাইলের একটা ম্যারাথন রেস হয়ে যায়।

এখন আড়াইটার মতো বাজে। গড়িয়াহাটার অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে আর ওয়েট করলাম না। পায়ের চটি দুটো ছুঁড়ে দিয়ে একটা ঘরে গিয়ে ফেদারের বালিশে মাথা রেখে দশ ইঞ্চি পুরু ফোমের গদিতে মারলোন ব্র্যান্ডো কি মার্সেলো ম্যাস্ত্রোইয়ানির মতো পোজ মেরে শুয়ে পড়লাম।

মহাশয়গণ, দুপুরে লাঞ্চের পর নাইনটিনথ সেঞ্চুরির বাবু কমিউনিটির মতো দিবানিদ্রাটি আমি দিয়ে থাকি। এটা আমার অনেক দিনের পোষা হ্যাবিট।

সেই নেপালি বয়টা এয়ারকুলার চালিয়ে দিল। আরামের সব রকম ব্যবস্থাই সমাজপতি এখানে করে রেখেছেন। খাড়া রোদের মধ্যে আগরপাড়া থেকে এতটা রাস্তা আসার জন্য দারুণ টায়ার্ড হয়ে পড়েছিলাম। আমার চোখ যখন ঘুমে জুড়ে আসছে সেই সময় মহাশয়গণ, বয়টার গলা শোনা গেল, 'সাব—'

আমার মনে হয়েছিল এয়ারকুলার চালিয়ে দিয়েই বয়টা চলে গেছে। চোখ মেলে দেখলাম, আমার কাছে দাঁড়িয়ে আছে সে। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী বলছিস?'

বয়টা বলল, 'কাল মিটার সাব আপনাকে সাত বার ফোন করেছেন।'

আমি জানতে চাইলাম, 'কী বলেছেন তিনি?'

বয়টা বলল, 'আপনি এলে যেন ফোন করেন।'

ইলেকসানটা অভ্যুদয়ের মাথায় চরকি-কল ঘুরিয়ে যাচ্ছে। আমাকে একদিন না দেখেই সাত বার ফোন করেছে। একসঙ্গে সাতদিন না দেখলে মাকড়ার তিন বার করোনারি থ্রম্বসিস হয়ে যাবে। বললাম, 'ঠিক আছে। আর কেউ ফোন করেছে?'

'জি।' বয়টা মাথা নাড়ল, 'সমাজপতি সাব করেছেন।'

'কী বলেছেন?'

'বলেছেন পরে আপনাকে ফোন করবেন।'

'বহোৎ আচ্ছা। আর কেউ ফোন করেছে?

'জি, না।' বলেই বেরিয়ে যাচ্ছিল বয়টা। দরজার কাছাকাছি গিয়ে আচমকা কি ভেবে গোড়ালির ওপর ভর দিয়ে বোঁ করে ঘুরে দাঁড়াল। দারুণ উত্তেজনার গলায় বলল, 'আউর একঠো ফোন এসেছিল।'

'কে করেছিল?'

'এক মেমসাব।' বয়টার মঙ্গোলিয় চোখ কাচের নতুন গুলির মতো চকচক করতে লাগল।

'আমার নাম করে?'

'জি।'

মহাশয়গণ, আমি একটু অবাকই হয়ে গেলাম। মেমসাব মানে বেশি বয়সের কোনো মহিলা-টহিলা কিংবা অল্প বয়সের কোনো ছুকরি টুকরি। কিন্তু আমার এ ফ্ল্যাটের ফোন নাম্বার তো কোনো মেয়ে-ফেয়ের জানার কথা নয়। অবশ্য মিসেস সমাজপতি জানেন। কিন্তু তিনি আমার নাম জানেন না। তবে আর কে হতে পারে? যে-ই হোক, তা নিয়ে এই মুহূর্তে ভেবে ভেবে ব্লাড-প্রেসার চড়াবার মানে হয় না। জিজ্ঞেস করলাম, 'মেমসাহেব কী বললে?'

'পরে ফোন করবে।'

'কত বয়স হবে মেমসাবের?'

'তেইশ চব্বিশ।'

আমি যে আমি, পিটার স্বয়ম্ভু হোড়, সেই আমি পর্যন্ত হকচকিয়ে গেলাম। বললাম, 'তুই মেমসাবকে চিনিস নাকি?'

'জি না।' ঘাড় কাত করল বয়টা।

আমি বললাম, 'তা হলে?'

'ফোনে গলা শুনে সোচলাম (ভাবলাম) উমর অ্যায়সাই হবে!'

শালা স্রেফ ফোনের গলা শুনে বয়েস আন্দাজ করে নিয়েছে! মহাশয়গণ, ব্যাপারটা একবার ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখুন। আর হবে না-ই বা কেন, সমাজপতি দি গ্রেটের কাছে কাছে থাকে সে। সেই সমাজপতি, যে দড়ির ওপর ব্যালান্সের খেলা জানে, যে গুরুদেবের কাছে ভাগবত গীতার ব্যাখ্যা শুনতে যাচ্ছি বলে ডোরার সঙ্গে লীলা করে যায়। সঙ্গগুণ মহাশয়গণ, সঙ্গগুণ! সমাজপতির গা থেকে রেডিও-অ্যাক্টিভ রে বেরিয়ে বয়টার ব্রেনে ঢুকে গেছে। তার ফলটা কী হয়েছে দেখুন, মেয়েমানুষ সম্বন্ধে মাকড়ার তিন নম্বর চোখ মানে তৃতীয় নয়ন খুলে গেছে।

চোখের তারা ফিক্সড করে কিছুক্ষণ বয়টাকে দেখলাম। তারপর বললাম, 'তুই মাকড়া টেরিফিক। যেভাবে দিব্যজ্ঞান লাভ করছিস তাতে এক বছরের ভেতর মহাপুরুষ হয়ে যেতে পারবি।'

আমার কথাটা খুব সম্ভব বুঝতে পারল না বয়টা। বলল, 'জি?'

'কিছু না, এখন যা—'

বয়টা কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে চলে গেল।

কিন্তু মহাশয়গণ, আজ দিবানিদ্রাটি কিছুতেই দেওয়া গেল না। বয়টা চলে যাবার পর পাঁচটা মিনিটও কাটল না, মাথার ভেতর করাত চালিয়ে চালিয়ে টেলিফোন বেজে উঠল।

দুপুরবেলার ঘুমটার বারটা বাজল দেখছি। হাত বাড়িয়ে ক্রেডল থেকে ফোন তুলে নিতেই হল। সেটা কানে লাগিয়ে বললাম, 'হ্যালো—'

লাইনের ওধার থেকে সঙ্গে সঙ্গে একটা মেয়ে-গলা ভেসে এল, 'হ্যাল্লো! হু ইজ অন দা লাইন প্লিজ—'

মহাশয়গণ, আপনারা তো জানেনই কবিতা-টবিতা আমার ধাতে নেই। তবু একটু কাব্য-ফাব্য করে বলতে ইচ্ছে করছে, মেয়েটার গলায় বিটোফেনের সিমফনির মতো কিছু একটা ব্যাপার আছে। যাই হোক আমি কে, তাকে জানিয়ে দিলাম।

'হাই সোয়াম্ভু, আমি তোমাকেই খুঁজছি।' মেয়েটার গলা উচ্ছ্বাসে তিন পর্দা চড়ে গেল।

কথাবার্তা ইংরেজিতেই হচ্ছে। মেয়েটা যে অ্যাকসেন্টে ইংরেজি বলছে তাতে চোখ বুজে বলা যায় সে কনভেন্টে পড়েছে। তা যদি না হয়, সে নন-ইন্ডিয়ান। অবশ্য অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানও হতে পারে। বললাম, 'তুমি কে?'

'গলা শুনে বুঝতে পারছ না?'

'না, মানে ঠিক—'

মেয়েটা ঝপ করে গলার স্বরটা পাতালে নামিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল, 'তুমি কী! পুরুষ মানুষ তো?'

আমার দারুণ মজা লাগল। ঘুমটা ছুটে গিয়েছিল। বললাম, 'আমার তো তাই মনে হয়।'

'ওহ্ নো। পুরুষ হলে আমার গলা একবার শুনলে আর ভুলতে না।'

'তাই নাকি! তোমার গলা আগে আমি শুনেছি?'

'সিওর।'

'তোমার গলায় কি এমন আছে যে শুনলে ভুলব না!'

এস্রাজে উল্টোপাল্টা ছড় টানার মতো মেয়েটা একদমে বলে যেতে লাগল, 'সেক্স—সেক্স—সেক্স—সেক্স—'

মহাশয়গণ, এর আগে আপনাদের একশ এগার বার জানিয়েছি কোনো ব্যাপারেই আমি বিচলিত হই না। দুঃখ-আনন্দ-প্যাসান-সেন্টিমেন্ট এবং অস্থিরতা, এই ব্যাপারগুলো আমার মধ্যে খুব বেশি পরিমাণে জমা নেই। মহাশয়রা ওয়ার্ল্ডের বাইরের স্তরে দারুণ উদাসীনভাবে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছি। কিন্তু মেয়েটার ঐ চারটে সেক্স শব্দ আমার শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে ফোর ফর্টি ভোল্টের ইলেকট্রিসিটি বইয়ে দিল। তবে সেটা তাকে টের পেতে দিলাম না। দারুণ স্মার্ট গলায় বললাম, 'কই, বুঝতে পারি নি তো।'

মেয়েটা বলল, 'সেই জন্যেই জিজ্ঞেস করছি তুমি পুরুষ মানুষ কিনা—'

'আমার এ ব্যাপারে ডাউট নেই। তবে কি করে তোমার কাছে প্রুভ করি বল তো? টেলিফোনে তো প্রমাণ দেওয়া যায় না।'

'আমিও তাই বলি। এক কাজ কর, চট করে আমার কাছে চলে এস—'

'তুমি কিন্তু এখনও তোমার নাম নি। কোথায় থাকো তুমি?'

'খুব কাছে। তোমার ফিফটিন ইয়ার্ডের মধ্যে।'

এতক্ষণে আমার কাছে ব্যাপারটা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। বললাম, 'আই সী, তুমি তা হলে ডোরা—'

'এগ্‌জাক্টলি। চলে এস—'

একটু ভেবে বললাম, 'তুমি কি খানিকটা আগে আরেক বার ফোন করেছিলে?'

ডোরা বলল, 'রাইট। চলে এস—'

'ব্যাপার কী বল তো?'

'কী আর, আই অ্যাম ফিলিং অ্যাবসোলুটলি লোনলি।'

মহাশয়গণ, একটা কথা ভেবে আমার দারুণ চমক লাগল। এর আগে মোটে দু'বার ডোরার সঙ্গে দেখা হয়েছে। একবার সমাজপতি দূর থেকে তাকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। আরেক বার লিফট বক্সের ভেতর তাকে দেখেছি। যতদূর মনে পড়ছে লিফটে থারটিনথ ফ্লোর পর্যন্ত উঠতে উঠতে তার সঙ্গে দু-একটা কথা হয়েছিল। তবে সমাজপতি তার ওপর আমাকে নজর রাখতে বলেছিলেন। বুঝতেই তো পারছেন মহাশয়রা, ওল্ড এজে চুলে পাক ধরিয়ে ডোরার মতো হাই এক্সপ্লোসিভ অর্থাৎ বিস্ফোরকে-বোঝাই একটি টেরিফিক ছুকরি জুটিয়েছেন সমাজপতি। জোটানো এক ব্যাপার, আর তাকে হাতের মুঠোয় ধরে রাখা আরেক ব্যাপার, নিশ্চয়ই এটা আপনারা স্বীকার করবেন। আগুনের রিং-এর ভিতর দিয়ে ম্যাজিসিয়ানদের চলে যেতে দেখেছেন? এই বুড়ো বয়সে সমাজপতি মাকড়া সেই রকম একটি ডেঞ্জারাস খেল দেখাতে শুরু করেছে। হে-হে মহাশয়গণ, তার সব সময় ভয় ডোরা নামে চিড়িয়াটি যে কোনো সময় হাতের মুঠো থেকে হড়কে বেরিয়ে যাবে। তাই, একমাত্র সেই কারণেই সে আমাকে পাহারা দেবার জন্য এখানে এনে তুলেছে। মহাশয়গণ, কারবারটা একবার ভেবে দেখুন, আমি হলাম চিট, ফোরটোয়েন্টি। এখন কিনা আমাকে হতে হচ্ছে গোয়েন্দা, হতে হচ্ছে ওয়াচ এ্যান্ড ওয়ার্ডের পাহারাদার। আমার ইভোলিউসানটা চিন্তা করুন। আরেকটা ব্যাপারও আপনাদের ভা[illegible] উচিত, কোথায় আমি ডোরার ওপর নজর রাখব, আর সে কিনা তার আগেই আমার মুভমেন্ট লক্ষ করে বসে আছে।

মহাশয়গণ, একটা সরল সত্য আপনাদের কাছে অকপটেই স্বীকর করতে চাই। বিউটিফুল ইয়ং মেয়েদের দিকে তাকিয়ে থাকলে দৃষ্টিশক্তি দশগুণ বেড়ে যায়, চোখ এবং মেজাজ দুই-ই ভাল থাকে। কিন্তু মহাশয়রা, নিজে ছাড়া আর কারো দিকে তাকাতেই আমার ভাল লাগে না। সমাজপতি আমার ওপর দায়িত্ব দেওয়া সত্ত্বেও আমি ডোরার ওপর গোয়োন্দাগিরি শুরু করি নি। দেখুন ছুকরি আমাকে কেমন চোখে চোখে রেখেছে।

যাক গে, আপনাদের চোখমুখের চেহারা দেখে বুঝতে পারছি ধৈর্যের শেষ মাথায় পৌঁছে গেছেন। আমি যে ঘরে শুয়ে আছি তার আটাশ ফুট ওপর থেকে ডোরা আমাকে ডাকছে আর আমি সমানে ভ্যাজোর ভ্যাজোর করে যাচ্ছি। মহাশয়গণ, আমি জানি এবং স্বীকারও করি, এ অবস্থায় ধৈর্য রাখা একেবারেই সম্ভব নয়। বুঝতে পারছি আপনারা একটা রগরগে ঘটনার জন্য দম বন্ধ করে বসে আছেন। অতএব আপনাদের পারমিসান নিয়ে ডোরার ফ্ল্যাটে যাওয়া যাক।

লাইনের ওধার থেকে ডোরার গলা আবার ভেসে এল, 'কি হল, আসছ তো?'

বললাম, 'আসছি।'

'প্লিজ তাড়াতাড়ি এস। আমার ফ্ল্যাটটা চেনো তো? ফিফটিনথ ফ্লোর।'

'কিছু বলতে হবে না।'

লাইনটা কেটে দিল ডোরা। টেলিফোন ক্রেডেলে রেখে উঠে পড়লাম।

মিনিট পাঁচেক বাদে মোট চল্লিশটা সিঁড়ি ডিঙিয়ে ফিফটিনথ ফ্লোরের আটান্ন নম্বর স্যুইটের সামনে দাঁড়ালাম। মহাশয়গণ, কলিং বেল টিপতেই ভেতর থেকে বেটোফেনের সেই সিমফনি আবার শোনা গেল। ডোরা বলল, 'কাম ইন প্লিজ। দরজা ভেজানো আছে—'

একটু ঠেলতেই সত্যি সত্যি দরজাটা খুলে গেল। আমি সট করে ভেতরে ঢুকে পড়লাম।

ডোরাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। তবে তার গলা শুনতে লাগলাম, 'প্লিজ টার্ন রাইট, দেন লেফট—'

মহাশয়গণ, এই ফ্ল্যাটটার নকশা অবিকল নিচের তলায় আমার ফ্ল্যাটটার মতো। অতএব চোখ বুজেই এগিয়ে যেতে লাগলাম। এবং যেতে যেতে ডানদিকের শেষ ঘরটার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

ডোরা ডাকল, 'দাঁড়িয়ে কেন, ঢুকে পড়।'

পর্দা সরাতেই যা চোখে পড়ল তাতে মনে হল মাথার ভেতর একসঙ্গে বাইশটা সাইক্লোন আর সতেরটা আর্থকোয়েক ঘটে গেল।

মহাশয়গণ, এটা ডোরার বেডরুম। এই মুহূর্তে এখানে জিরো পাওয়ারের লাল একটা আলো জ্বলছে। আলোটা চোখে সয়ে এলে দেখতে পেলাম তার বিছানাটা লাল সিল্কের বেড-শিট দিয়ে আগাগোড়া মুড়ে রাখা হয়েছে, আর তার মাঝখানে বালিশের ওপর একটা হাত রেখে এবং হাতের ওপর মাথা রেখে, হাঁটু দুটো স্লাইট মুড়ে শুয়ে আছে ডোরা। মাইরি মহাশয়রা, ক্লিওপেট্রা ছবিতে, নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে, লিজ টেলর অবকল এইরকম একটা পোজ মেরে শুয়ে ছিল।

কিন্তু আসল ব্যাপারটা লক্ষ করেছেন মহাশয়রা, ডোরা একেবারে নেকেড, স্টার্ক নেকেড? টের পেয়েছি, আমি দেখবার অনেক আগেই আমার ঘাড়ের পাশ দিয়ে জিরাফের মতো দেড় মাইল লম্বা গলা বাড়িয়ে আপনারা ডোরাকে দেখে নিয়েছেন। আপনারা যা একেকখানা শাহানশা মাল!

যাক গে, আপনাদের আর লজ্জা দিতে চাই না। আফটার অল আপনারা তো এক এক জন সদ্বংশজাত ভদ্দরলোক, জেণ্টলম্যান। তবে আমার কিন্তু মহাশয়রা এক ডেসিগ্রামও লজ্জা ফজ্জা নেই। আমি আপনাদের মতো জেণ্টলম্যান না, আমার কোনো উৎকৃষ্ট পেডিগ্রি ফেডিগ্রিও নেই। আমি একজন থার্ড ক্লাস চিট, একজন ফোরটোয়েন্টি, তার ওপর বাস্টার্ড, বাংলায় যাকে বলে বেজন্মা। আমার তো মহাশয়রা, দু-কান কাটা, কাজেই কনফেসানের ভয় নেই। আমার স্বীকারোক্তি শোনার পর কেউ যদি থুতু দেয় কিসসু মনে করব না।

এবার আমার কনফেসানটা শুনুন। আমি মহাশয়রা, শুদ্ধু ভাষায় যাকে বলে জিতেন্দ্রিয়

ব্রহ্মচারী, তেমন কিছুই নই। সুতরাং ডোরার ন্যুড বডি দেখে আমার শরীরে একটা কেমিক্যাল রি-অ্যাকশন ঘটে যেতে লাগল। নাক দিয়ে সোডার ঝাঁঝের মতো কিছু একটা বেরিয়ে আসছে। বগলে থার্মোমিটার ঢুকিয়ে দিলে দেখতে পাব আমার গায়ের টেম্পারেচার এক লাফে এক শ পাঁচ ডিগ্রি ক্রস করে যাবে। মহাশয়গণ, আপনাদের চোখমুখের চেহারা দেখে টের পাচ্ছি আপনাদের ব্লাড-প্রেসার দারুণ একটা বিপজ্জনক জায়গায় পৌঁছে গেছে। সংযত হোন, সেরিব্র্যাল অ্যাটাক-ট্যাটাক আবার ঘটিয়ে ফেলবেন না।

বাজে বকোয়াস ছেড়ে এবার কাজের কথায় আসা যাক। ডোরা আমাকে দেখে হাতের ভর দিয়ে আস্তে আস্তে উঠে বসল। মহাশয়গণ, অনেক বিউটিফুল মেয়ে আছে যারা তিন ফুট দূরে দাঁড়িয়ে স্ট্রিপ টিজের খেলা দেখালে মনে হবে পাঁঠার গা থেকে ছাল ছাড়ানো হচ্ছে। কিন্তু এই মেয়েটার বডির প্রত্যেকটা খাঁজে মহাশয়রা সেক্স, টেরিফিক এবং হাই এক্সপ্লোসিভ সেক্স। একটা ব্যাপারে কিন্তু আপনাদের হতাশ হতে হবে। আপনারা এবং আমি জিরো পাওয়ারের আলোয় প্রথমটায় দেখেছিলাম ডোরা পুরোপুরি নেকেড। না মহাশয়রা, আমাদের ভুল হয়েছিল। ভাল করে তাকাতেই তার কোমরে বিকিনির চাইতেও সরু একটা জাঙিয়া আর মিনি-ব্রা চোখে পড়ল।

ডোরা আমার দিকে তাকিয়েই ছিল। একটু হেসে বলল, 'বসুন—' ফোনে সে আমাকে তুমি করে বলেছিল, সেটা বোধহয় এখন তার খেয়াল নেই।

বিছানার একধারে নিজের বডিটাকে ঝপ করে ছেড়ে দিলাম। এই প্রথম কারো সম্বন্ধে আমার আগে থেকেই খানিকটা কৌতূহল টৌতূহল হচ্ছিল। জিজ্ঞেস করলাম, 'আমি যে থারটিনথ ফ্লোরে আছি আপনি জানলেন কেমন করে?'

ডোরা আঙুল দিয়ে তার চোখ দুটো দেখিয়ে বলল, 'আমার সামনের দিকে দুটো চোখ—'তারপর পেছন ফিরে বলল, 'আর ব্যাক সাইডে আটটা। এই দশটা চোখে ধুলো ছিটানো খুব ইজি না।' বলেই লাট্টুর মতো একটা পাক খেয়ে ঘুরে বসল।

মহাশয়গণ, এতটা বয়স পর্যন্ত আমি কোনো মেয়ে মানুষের ন্যাংটো শরীর দেখি নি। ডোরাকে নেকেড মনে করে একটু আগে গায়ে জ্বর এসে গিয়েছিল। মাত্র দু'এক মিনিট। আফটার অল আই আম অহিউম্যান বিয়িং। সেই রি-অ্যাকশানটা আস্তে আস্তে কেটে যাচ্ছে, নাক দিয়ে এখন আর ঝাঁঝ-টাঁঝ বেরুচ্ছে না। টেম্পারেচারও ফল করে গেছে। টের পাচ্ছি আর একটু পরেই জ্বরটা কমপ্লিট ছেড়ে যাবে। হে-হে মহাশয়গণ, হঠাৎ ডোরার ঘরে ঢুকে কেন যে একরম হল! আপনাদের তো আগেই বলে রেখেছি বাংলা এবং ইংরেজি অ্যালফাবেটের মধ্যে দুটো অক্ষরকে আমার দারুণ ভাল লাগে। একটা হল 'ম, অন্যটা 'ডব্লিউ'। ব্যাখ্যা করে বললে দাঁড়ায়, মদ্য এবং ওয়াইন। হোল লাইফ এই ব্যাপারটারই সাধনা করে চলেছি। 'ম' আর ডব্লিউ' দিয়ে মেয়ে আর উইম্যানও হয় কিন্তু সে ব্যাপারে আমার আগ্রহ নেই। যাক গে, ডোরাকে বললাম, 'আমার আর কী কী খবর আপনি রাখেন?'

ডোরা ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে ঘাড় বাঁকিয়ে আমার দিকে তাকাল। একটু ভেবে বলল, 'খুব বেশি কিছু না।'

'তবু—'

'বললে কি আপনার ভাল লাগবে?'

'আমি খারাপ-ভালোর বাইরে।'

ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে চোখ আধাআধি বুজে ডোরা আমাকে আরেক বার দেখে নিল। তারপর বলল, 'ফিলজফার নাকি?'

ঘাড়টা দেড় ফুট হেলিয়ে দিয়ে বললাম, 'তার কাছাকাছি।'

একটু চুপ করে থাকল ডোরা। তারপর আচমকা বলে উঠল, 'এবার তা হলে বলা যাক। দ্যাট ওল্ড সোয়াইন, সেই শুয়ারকা বাচ্চা আমার পেছনে আপনাকে স্পাই লাগিয়েছে।'

এই বাছা বাছা খিস্তিগুলো যে ব্যালিস্টিক মিসাইলের মতো সমাজপতির দিকে ছোঁড়া হল, তা বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়। তবে আমি অবাক হচ্ছিলাম এই ভেবে, সমাজপতি ডোরাকে ধোঁকা দিতে পারেন নি। আমি শালা ধরা পড়ে গেছি।

ডোরা আবার বলল, 'কিন্তু—'

'কিন্তু কী?' আমি সোজাসুজি ডোরার চোখের ভেতর তাকালাম।

'গোয়েন্দাগিরি স্টার্ট করার আগেই আপনি ক্যাচ-কট হয়ে গেছেন।'

আমি হাসলাম, 'আই অ্যাম আ ভেরি ব্যাড স্পাই, তাই না?'

'একজ্যাক্টলি।' নাক কুঁচকে ডোরা বলল। তারপর হঠাৎ কোনো বালিকার মতো কলকলিয়ে হেসে উঠল। শুনতে শুনতে মনে হল ডোরার মধ্যে দারুণ সরল টাইপের একটা মেয়ে আছে।

হাসিটা থামলে ডোরা বলতে লাগল, 'ওই বুড়ো গাটার-স্নাইপটা আমার পেছনে এর আগে বারটো স্পাই লাগিয়েছিল। সব ক'টাকে দু'দিনেই ধরে ফেলেছি।'

'ও আচ্ছা, আপনি দেখছি বেশ শাহানশা মেয়ে।'

ডোরা আগের মতোই আরেক বার হেসে উঠল।

এবার জিজ্ঞেস করলাম, 'আমার ব্যাপারে আর কী জানেন আপনি?'

'সমাজপতি আপনাকে নিচের ফ্ল্যাটটা দিয়ে দিয়েছে।'

'আর কী জানেন?'

'নাথিং মোর।'

'এবার একটা কথা বলুন তো।'

'কী?'

'আপনার পেছনে মিস্টার সমাজপতি স্পাই রাখে কেন?'

আরেক দফা খিস্তি টিস্তি করে ডোরা বলল, 'বুড়ো খচ্চরটা সব সময় আমাকে সন্দেহ করে।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন?'

'বাস্টার্ডটার ধারণা ওর ওপর আমার কোনো অ্যাট্রাকসান নেই, যে কোনোদিন একটা ছোকরা-টোকরা জুটিয়ে কেটে পড়ব।'

'মিস্টার সমাজপতি সম্বন্ধে আপনার কি অ্যাট্রাকসান আছে?'

'ভাগাড়ের সেক্সি বিচ ছাড়া ওই জানোয়ারটার ওপর আর কারো অ্যাট্রাকসান থাকতে পারে বলে আপনি মনে করেন?'

'আমি ভাগাড়ের বিচ নই, কি করে বলব!'

'দ্যাটস রাইট।' ডোরা হেসে ফেলল।

একটু চুপচাপ। তারপর আমি বললাম, 'আরেকটা কথা—'

'বলুন—'

ডোরার ব্রা এবং বিকিনির দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললাম, 'এই রকম টেরিফিক একখানা ড্রেস করে আমাকে ডেকেছেন কেন?'

ডোরা চোখের কোণ দিয়ে আমাকে একবার দেখে নিল। তারপর ঠোঁটের একটা ধার কামড়াতে কামড়াতে শুদ্ধ ভাষায় যাকে লাস্যময় বলে সেই ভঙ্গিতে বলতে লাগল, 'আপনার নার্ভ কতটা স্ট্রং, সেটা টেস্ট করতে।'

'অ্যাসিড টেস্টে পাস করেছি?'

'করেছেন।' ঘাড় হেলিয়ে দিল ডোরা, 'এই অবস্থায় আমাকে দেখলে কেউ স্ট্রেট দাঁড়িয়ে থাকতে পারত না।'

'বডি থ্রো দিয়ে আপনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত, তাই না?'

'একজক্টলি।' ডোরা হাসতে লাগল। হাসতে হাসতেই বলল, 'আপনার কথা তো শুনলাম। এবার আমি আমার একটা কথা বলি?'

ছুকরি কী বলবে, কে জানে! যা' বলুক, আমার খুব একটা দুশ্চিন্তা নেই।

হাসির স্পার্ক মেরে বললাম, 'নিশ্চয়ই। সুন্দরী মেয়েরা কাছে বসে কথা বললে শরীরে ব্লাড সার্কুলেসন ভাল হয়।'

ডোরা হাসছিলই। এস্রাজে এলোপাথাড়ি ছড় টানার মতো সেই হাসিটাকে চড়া পর্দায় তুলে সে বলল, 'আপনাকে নিয়ে আর পারা যায় না।'

আমি ফিলজফারের মতো মুখ করে চুপচাপ বসে রইলাম।

ডোরা এবার বলল, 'আপনার মতো লোক আমি আগে আর দেখি নি।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কিরকম?'

ডোরা বলল, 'আপনিই একমাত্র লোক, আমাকে এই অবস্থায় পেয়েও যার বডির ডায়নামো নরম্যাল আছে।'

'আসলে ব্যাপারটা কী জানেন?'

'কী?'

'সিফিলিস ব্যাপারটাকে আমার ভীষণ ভয়। এই ডিজিজে আমি একটা লোককে বদ্ধ পাগল হয়ে যেতে দেখেছি, আরেকটা লোকের চোখ থকথকে ঘায়ে পচে গিয়েছিল।'

হাসিটা থেমে গিয়েছিল ডোরার। চোখ দুটো এখন ফার্নেসের মতো জ্বলছে। দাঁতে দাঁত ঘষে সে বলল, 'হোয়াট ডু ইউ মিন?'

বললাম, 'বুঝতে অসুবিধা হবার তো কথা নয়। জলের মতো সিম্পল ব্যাপার—'

সট করে পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে খাড়া পারপেণ্ডিকুলারের মতো দাঁড়িয়ে গেল ডোরা। দৌড়ে ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার থেকে ভাঁজ করা অনেকগুলো কাগজ বার করে এনে

বলল, 'লুক, লুক হিয়ার—'

'কী এগুলো?

'মেডিক্যাল চেক-আপের রিপোর্ট। উইকে একদিন করে আমি ডাক্তারের কাছে যাই। থরো চেক-আপ করিয়ে লিখিয়ে আনি। দেখুন, আই ডোন্ট হ্যাভ এনি ব্যাড ডিজিজ—'

আমি হেসে ফেললাম, 'দেখতে হবে না, আমি বিশ্বাস করছি। কিন্তু একটা কথা বলতে চাই,মেয়েমানুষ সম্পর্কে আমার গ্ল্যান্ড একেবারেই উইক হয় না।'

চেক-আপের রিপোর্টগুলো ড্রয়ারে রেখে ফিরে এল ডোরা, 'ইউ আর আ সুপার ম্যান।'

'লিখে দিন। বাঁধিয়ে গলায় ঝুলিয়ে বেড়াব।' আমি মজা করে বললাম।

ডোরাকে এবার বেশ নরম দেখাল। মহাশয়গণ, আমার কাছে ঘন হয়ে বসে সে বলল, 'আমার মতো মেয়ের ক্যারেক্টার সার্টিফিকেটে কেউ বিশ্বাস করবে?'

'একশ বার। পোপের সার্টিফিকেটের চাইতে এ ব্যাপারে আপনার সার্টিফিকেটের দাম বেশি।'

'ব্যাপারটা ভেবে দেখব।'

একটু চুপ।

তারপর আমি বললাম, 'আপনার কথা নিশ্চয়ই শেষ হয়েছে। এবার যদি যাবার পারমিসান দ্যান—'

ডোরা বলল, 'আসল কথাটাই বলা হল না।'

'চটপট বলে ফেলুন। আমার টেরিফিক ঘুম পাচ্ছে। দুপুরবেলা দু ঘন্টা ঘুমোতে না পারলে আমার সেরিব্র্যাল অ্যাটাক হয়ে যায়।'

'আমার মতো একটা ইয়ং গার্ল আপনার পাশে বসে আছে। তার চাইতে দুপুরের ঘুমটা কি বেশি চার্মিং?'

'দিবানিদ্রার কোনো বিকল্প নেই।'

ডোরা এক পলক কি ভাবল। তারপর বলল, 'আপনার সঙ্গে আলাপ করে দারুণ ইন্টারেস্টিং লাগছে। উই মে বি ভেরি গুড ফ্রেণ্ডস—'

মহাশয়গণ, সমাজপতি আমাকে যে তার পেছনে স্পাই রেখেছে, সেটা ধরে ফেলেছে ডোরা। এখন সে কি উল্টো কোনো প্ল্যান কষে আমাকে ফাঁসাতে চায়? আমি শালা একটা ফোর-টোয়েন্টি। তা আমাকে কে আর ফাঁসাবে বলুন। এদিকে দু'চোখ ঘুমে জুড়ে আসছে। ঝামেলা কাটাবার জন্য বলে উঠলাম, 'বন্ধু? ঠিক আছে।'

'তা হলে কিন্তু আপনি টাপনি করে বলব না। তুমি বলব।'

ফোনে সে যে আমাকে তুমি করে বলেছে সেটা আর মনে করিয়ে দিলাম না। শুধু বললাম, 'আমি তোমাকে তুমি বলতে পারি। কিন্তু জ্যাঠামশাইয়ের বয়সী একটা লোককে তুমি বলতে তোমার জিভে আটকাবে না?'

'হু ইজ জ্যাঠামশাইর বয়সী?'

নিজের বুকে একটা আঙুল ঠেকিয়ে বললাম, 'এই পিটার স্বয়ম্ভু হোড়—'

মহাশয়গণ, চোখদুটো তুলে পায়ের আঙুল থেকে চুলের ডগা পর্যন্ত আমাতে দারুণ খুঁটিয়ে

খুঁটিয়ে দেখল ডোরা। তারপর গলার ভেতর আবার এস্রাজ বাজিয়ে দিল, 'তুমি, তুমি আমার জ্যাঠামশাইয়ের বয়সী!' হাসতে হাসতে তার শরীর বেঁকেচুরে যেতে লাগল।

বললাম, 'হাসার কী হল?'

মহাশয়গণ, ছুকরি এবার আমার নাকে আলতো করে একটা টুসকি মেরে বলল, "ফ্যান্টাস্টিক কথা বল তুমি। বুড়ো হবার এত শখ কেন তোমার?'

হে-হে মহাশয়রা, ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন কি? আমার চেহারাটা এমন ডিসেপটিভ যে কেউ বয়েস ধরতে পারে না। ছুকরি মরেছে, এক্কেবারে ফিনিশড। আমার কিছু বলার ছিল না, চুপ করে থাকলাম।

ডোরা এবার বলল, 'অনেকক্ষণ তোমাকে আটকে রেখেছি। আর না। শুধু একটা কাজ করে দেবে?'

'কী?' আমি ডোরার চোখের ভেতর তাকালাম।

ডোরা একটা মাপার ফিতে বার করে বলল, 'আমার ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকসটা একটু মেপে দিয়ে যাবে? সাতদিন পর পর ওটা আমি মাপাই। এবার আর মাপানো হয় নি।'

'হোয়াই নট? গ্ল্যাডলি।'

ডোরার ফিগারটা চমৎকার। তাড়াতাড়ি ফিতে দিয়ে মেপে ফেললাম, ছত্রিশ-পঁচিশ-ছত্রিশ।

ডোরা বলল, 'নাঃ, ঠিক আছে। মোটা হই নি। থ্যাঙ্ক ইউ।'

'আচ্ছা—' বলেই চট করে কি ভেবে নিল ডোরা। তারপর বলল, 'রোজ কিন্তু একবার করে আমার এখানে আসবে।'

'রোজ কি আসা যাবে?'

'আসতেই হবে কিন্তু—'

'দেখা যাক।'

'দেখা-টেখা না, না এলে তোমার ফ্ল্যাট থেকে ঠিক ধরে নিয়ে আসব।'

আমি হাসলাম। কিছু না বলে চলে যাবার জন্য যখন ঘুরে দাঁড়িয়েছি সেই সময় আচমকা একটা কথা মনে পড়ে গেল। মেয়েটা সমাজপতির পাল্লায় পড়ল কি করে? কিন্তু এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে গেলে পাক্কা একটা ঘন্টা আবার আটকে যাব। সুতরাং আর দাঁড়ানো ঠিক হবে না। আমি লম্বা লম্বা পা ফেলে ডোরার স্যুইট থেকে বেরিয়ে এলাম।



নিচে আমার সেই ফ্ল্যাটে এসে যখন ভাবছি সমাজপতি আমাকে স্পাই রেখেছেন, এই কথাটা ডোরা কি করে টের পেল, সেই সময় ফোন বেজে উঠল। ক্রেডেল থেকে সেটা তুলে নিয়ে কানে লাগিয়ে বললাম, 'হ্যালো—'

ওধার থেকে অভ্যুদয়ের গলা ভেসে এল, 'কে স্বয়ম্ভু?'

'ইয়েস স্যার—'

'ভেরি গুড। তোমার সঙ্গে আমার দেখা হওয়া দরকার।'

অভ্যুদয়ের সঙ্গে আমারও দেখা হওয়া একান্ত জরুরি। বললাম, 'কোথায় কখন আপনার সঙ্গে দেখা করব বলুন স্যার—'

অভ্যুদয় বললেন, 'প্লিজ এক মিনিট—' একটু ভেবে নিয়ে তিনি আবার বললেন, 'তুমি ছ'টার সময় কোথায় আছ?'

'এখানেই থাকব।'

'ঠিক আছে, তুমি ওখানেই থাকো। অ্যাট শার্প সিক্স তোমার কাছে যাচ্ছি।'

মহাশয়গণ, একটি পারফেক্ট বিনয়ের অবতার হয়ে বললাম, 'স্যার, আপনি আবার কষ্ট করে আসবেন কেন? কোথায় গেলে আপনার সঙ্গে দেখা হবে বলে দিন। আমি চলে যাব।'

অভ্যুদয় বললেন, 'আমার ক'টা ইমপর্ট্যান্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। কয়েক জায়গায় যেতে হবে। কোথাও দশ পনের মিনিটের বেশি থাকব না। এই দৌড়ের মধ্যে আমাকে ধরা তোমার পক্ষে অসম্ভব। তার চাইতে আমিই গিয়ে তোমাকে ধরব।'

'ঠিক আছে স্যার, আমি আপনার জন্য ওয়েট করব।'

'তা হলে এখন ছাড়ছি।' বলতে বলতেই হঠাৎ কি মনে পড়ে গেল অভ্যুদয়ের। স্বরটা একটু উঁচুতে তুলে বললেন, 'কাল ছিলে কোথায়? তিন চার বার ফোন করেছি—'

বললাম, 'কাল স্যার কলকাতায় আসি নি। আপনার জন্য জন-সংযোগ করতে বেরিয়ে ছিলাম। এই করতে করতে সন্ধে হয়ে গেল। তাই আর—'

দারুণ আগ্রহের গলায় অভ্যুদয় বললেন, 'কিরকম বুঝলে? আঁ—এনকারেজিং?'

টের পাচ্ছি অভ্যুদয় তার মুখটা টেলিফোনের ভেতর গুঁজে দিয়েছেন। মাকড়াকে কিছুক্ষণ ঝুলিয়ে রাখার জন্য বললাম, 'আপনি তো আসছেনই স্যার, তখন বলব।'

'আরে বাবা, একটু হিন্ট দাও না—'

'নট নাউ।'

অভ্যুদয় নাকের ভেতর সরু আওয়াজ করে বললেন, 'তুমি একটি টেরিফিক খলিফা—'

মহাশয়গণ, আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে সমাজপতি আমাকে বেশ কয়েক বার সাবলাইম খচ্চর বলেছেন। অভ্যুদয় মিটার বললেন, খলিফা। মাকড়ারা আমাদের মতো কমোনারদের ইডিয়ম, ফ্রেজ আর খিস্তি-টিস্তিগুলোর খবর বেশ ভালই রাখে দেখছি। আমি আর কি বলব, গুজগুজ করে একটু হাসলাম।

অভ্যুদয় আর কিছু বললেন না, লাইনটা কেটে দিলেন। আমিও ফোনটা ক্রেডেলে রেখে টান টান হয়ে ফোমের গদিতে শুয়ে পড়লাম।

আমার ঘুম ভাঙল কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে পাঁচটায়। মুখ-টুখ ধুয়ে জানালার পাশে ডিভানের ওপর এসে বসতেই চোখে পড়ল পশ্চিম দিকটা টকটকে লাল। সূর্যটা কাউকে খুন করে আকাশের গায়ে যেন রক্ত মুছতে মুছতে ডুবে যাচ্ছে। কাছে-দূরে উঁচু উঁচু বাড়ি দিয়ে ঘেরা কলকাতার স্কাইলাইন। হু হু করে দক্ষিণ দিক থেকে উল্টোপাল্টা হাওয়া বয়ে যাচ্ছে।

বাইরের এইসব দৃশ্যটৃশ্য নিয়ে আমার দুশ্চিন্তা নেই। ঘাড় ফেরাতেই চোখে পড়ল, আমার সামনের দিকের দেয়াল ঘেঁষে যে কাঠের ক্যাবিনেট রয়েছে তার মাথায় নানা চেহারার হুইস্কি, জিন, রাম এবং পোর্টওয়াইনের দামি দামি বোতল সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

মহাশয়গণ, মদের বোতল দেখলেই আমার মনে হয় দশ বছর ধরে আমার গলা শুকিয়ে ঝামা হয়ে আছে। কোথায় একটা বিজ্ঞাপনে দেখেছিলাম, 'এনি টাইম ইজ টি টাইম।' আমার কাছে মহাশয়রা 'এনি টাইম ইজ হুইস্কি টাইম।' হুইস্কি না পাওয়া গেলে জিন, বীয়ার, রাম, ভদকা—যা পাওয়া যায়। নইলে সোনার বাংলা তো আছেই।

গলা চড়িয়ে ডাকলাম, 'ফাদার হীরা বাহাদুর—' আমার বেয়ারাটার নাম ও-ই। আমি তার নামের গোড়ায় একটি ফাদাব জুড়ে দিয়েছি।

চোখের পাতা পড়তে না পড়তেই বাহাদুর হীরা এসে অ্যাটেনসানের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে পড়ল। বললাম, 'লুক—আমার দিকে একটু ভাল করে তাকা তো—'

কথামতো হীরা বাহাদুর আমাকে লক্ষ করতে লাগল।

আমি রগড়ের গলায় এবার বললাম, 'আমাকে দেখে তোর কী মনে হচ্ছে ফাদার বজ্রমানিক—' হে-হে মহাশয়গণ হীরাকে শুদ্ধ ভাষায় বজ্রমানিকই তো বলে, তাই না?

হীরা বাহাদুরের কুতকুতে মঙ্গোলিয়ান চোখ দেখে বোঝা গেল না, সে কী ভাবছে। মাকড়া একদৃষ্টে তাকিয়েই রইল।

আঙুল দিয়ে গলা থেকে নাইকুণ্ডুল পর্যন্ত জায়গাটা দেখিয়ে দিয়ে বললাম, 'এই যে জিওগ্রাফিটা দেখছ, এটা একেবারে শুকিয়ে ডেজার্ট হয়ে গেছে। বিলকুল 'থর' মরুভূমি। সমঝা?'

হীরা বাহাদুরের মুখের একটা রেখাও এধার ওধার হল না, শুধু চোখের পাতাদুটো বার তিনেক পিট পিট করল। তারপর আস্তে আস্তে সে বলল, 'হুইস্কি লাঁউ?'

শালা একটি উৎকৃষ্ট থট-রিডার কিংবা বহুদিন আমার মতো ড্রাঙ্কার্ডদের সঙ্গে থেকে থেকে ওর দিব্যচক্ষু খুলে গেছে। আমরা হাঁ করলেই টেলিপ্যাথিতে পেটের খবর টের পেয়ে যায়। ওই যে কী একটা কথা আছে না 'সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে', ওর হয়েছে সেই অবস্থা।

বললাম, 'ফাদার হীরাচাঁদ তুমি একেবারে সাচ্চা কোহিনূর ডায়মণ্ড। যাও মানিক, ঝট করে এক পাত্তর নিয়ে এস দিকি—' বলতে বলতেই অভ্যুদয়ের কথা মনে পড়ে গেল।

হীরা বাহাদুর চলে যাচ্ছিল। তাকে থামিয়ে বললাম, 'কাছাকাছি ভাল রেস্তোরাঁ ফেস্তোরাঁ আছে?'

'জি। একটা চাইনিজ রেস্তোরাঁ রয়েছে রাস্তার ওধারে।'

'ফার্স্ট ক্লাস। একজন গেস্ট ছ'টার সময় আসবে। আমাকে এক পেগ হুইস্ক দিয়ে দশ মিনিটের ভেতর মটন রোল আর রোস্ট চিকেন নিয়ে আসতে পারবে?'

'জি—'

'যাও, জলদি কর।'

ড্রিংক দিয়ে হীরা বাহাদুর চলে গেল। আমি চুক চুক করে খেতে লাগলাম। পেগটা যখন শেষ হয়ে এসেছে সেই সময় সে ফিরে এল। বড় একটা প্লেটে খাবার দাবার সাজিয়ে আমার

সামনে ছোট কাশ্মীরি টেবলটায় রাখল। তারপর দু নম্বর পেগটা যেই এনে দিয়েছে, টুং টাং করে মিউজিক্যাল কলিং বেল বেজে উঠল। বোঝা গেল অভ্যুদয় এসেছেন।

হুইস্কির গেলাস নামিয়ে রেখে আমি নিজে গিয়ে দরজা খুলে দিলাম। তারপর কুর্নিশ করার ভঙ্গিতে বললাম, 'আসুন স্যার, আসুন—'

আমি যে ঘরে শুয়ে ছিলাম অভ্যুদয়কে সেখানে এনে একটা সোফায় বসালাম। অমনি মাকড়ার চোখ পড়ল আমার সেই গেলাসটার ওপর। ভারিক্কি মেজাজে একটু হেসে অভ্যুদয় বললেন, 'আমি আসার আগেই ড্রিংকের সেসন বসিয়ে দিয়েছ দেখছি।'

বিশ জন্ম ধরে আমি যেন অভ্যুদয়ের আর্দালি হয়ে আছি, এইরকম একটা মুখ করে বললাম, 'স্যার, একা একা সময় কাটছিল না, তাই—'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। আই ডোন্ট মাইণ্ড।'

হীরা বাহাদুরকে ডেকে আমি অভ্যুদয়ের জন্য হুইস্কি আর রোস্ট চিকেন ফিকেন দিতে বললাম। হীরা বাহাদুর দারুণ চটপটে আর স্মার্ট। এক মিনিটের ভেতর খাবার আক ড্রিংক সার্ভ করল।

খেতে খেতে অভ্যুদয় বললেন, 'আমার নাকে তো একটা বঁড়শি আটকে রেখেছ। এবার বল কাল কী সার্ভে করলে?'

মহাশয়গণ, চট করে না বলে মালটাকে একটু খেলিয়ে নেওয়া যাক, না কি বলেন! কপালে বাইশটা ভাঁজ ফেলে ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে বললাম, 'স্যার, ওখানকার পিপল আপনার ওপর আগে থেকেই খেপে আছে। ভোট চাইতে গেলে কী রি-অ্যাকশান হবে বুঝতে পারছি না। তবে—'

'তবে কী?'

'বলব স্যার?'

মহাশয়গণ, অভ্যুদয় একটি টেরিফিক ড্রাঙ্কার্ড। ড্রিংকের ব্যাপারে তিনি আমার নাকে ঝামা ঘষে দিতে পারেন। প্লেন জল খাওয়ার মতো এক চুমুকে এক পেগ হুইস্কি স্টমাকে চালান করে দিয়ে গলা চড়ালেন, 'আলবত বলব। তুমি আমার পাবলিক রিলেশানস অফিসার। পিপল সম্পর্কে তোমার স্টাডি রিপোর্ট নিশ্চয়ই আমাকে দেওয়া দরকার। আই শুড নো এভরিথিং—না কি বল?'

আমি সঙ্গে সঙ্গে ঘাড়টা হেলিয়ে দিলাম, 'একশ বার স্যার—'

'তা হলে বলে ফেল—' অভ্যুদয় সোজাসুজি আমার মুখের দিকে তাকালেন।

'স্যার পিপল টেঁটিয়া ঘোড়ার মতো অন্য দিকে ঘাড় বাঁকিয়ে রয়েছে। মানে—'

'মানে বাঁকানো ঘাড়টা আমার দিকে ঘোরাতে হবে, এই তো?'

'আজ্ঞে স্যার—'

অভ্যুদয় সরবৎ খাবার মতো ঢক করে হাতের পেগটা এবার গলায় চালান করে দিলেন। তারপর স্বর চড়ায় তুলে বললেন, 'তুমি একটি প্রথম শ্রেণীর হারামজাদা। এই কথাটা বলতে তোমার একেবারে কনস্টিপেসন হয়ে যাচ্ছে।'

'না স্যার, আমার কথা শেষ হয় নি।'

'বেশ তো, শেষ করে ফেল।' হীরা বাহাদুর দরজার কাছে চোখের পাতা টান করে দাঁড়িয়ে ছিল। অভ্যদয়ের গেলাস ফাঁকা হতেই দু সেকেণ্ডের মধ্যে আবার হুইস্কি ঢেলে দিয়ে স্ট্যাচুর মতো গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বুড়ো আঙুল আর তর্জনী দিয়ে টাকা বাজাবার একটা মুদ্রা ফুটিয়ে বললাম, 'কিছু ক্যাশ খরচ করতে হবে স্যার।'

'এই ব্যাপার! আরে বাবা, ক্যাশ তো খরচা করতেই হবে। একটা বিগ ব্যাপারে নামছি, কিছু এক্সপেণ্ডিচার তো হবেই। ক্যাশ ছাড়া ওয়ার্ল্ডে কিছু হয় নাকি?'

'স্যার আপনি এক্সপিরিয়েন্সড অ্যাণ্ড গ্রেট ম্যান, আপনি তো সব জানবেনই। তবে এখানে ক্যাশটা একটু হেভিই খরচা করতে হবে।'

মহাশয়গণ, অভ্যুদয় মিটার দু নম্বর পেগটা খতম করে এনেছিলেন। মাকড়াকে আগেও দেখেছি মালের গেলাস হাতের কাছে থাকলে ওর যেন আর তর সয় না। এমন আঁক পাঁক করে সে মালটা খায় যেন এক্ষুণি না উঠলে প্লেন মিস করে ফেলবে। সেকেণ্ড পেগের আধাআধি পাকস্থলীতে ঢুকবার ফলে মেজাজ স্লাইট গরম হয়ে উঠেছিল। অভ্যুদয় বললেন, 'কত টাকা খরচ হবে বল। টেন থাউজেণ্ড, ফিফটিন থাউজেণ্ড, ফিফটি থাউজেণ্ড?'

'স্যার আপনি আমার প্ল্যানটা আগে শুনুন—'

'কিচ্ছু শুনব না।' দু নম্বর পেগের বাকি তলানিটুকু সট করে গলায় ঢেলে অভ্যুদয় চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে হীরা বাহাদুরকে ডাকলেন, 'হুইস্কি—'

বয়টা দৌড়ে এসে তাঁর গেলাসে আবার ঝাঁঝালো মাল ঢেলে দিল। দশ মিনিটের মধ্যে পর পর আরো চার পেগ খেয়ে ব্লাড সার্কুলেসনকে চাঙ্গা করে নিলেন অভ্যুদয়। তারপর চিৎকার করে বললেন, 'টাকা খরচার ভয় তুমি আমাকে দেখিও না স্বয়ম্ভু। ইউ আর মাই ওন ম্যান, তোমার কাছে আমার কোনো হাইড অ্যাণ্ড সিক নেই। আমার একটা লকারে ফিফটি ল্যাক ব্ল্যাক মানি আছে। এই রকম কত লকারে আর সেফে আমার কত আন-অ্যাকাউন্টেড মানি রয়েছে আমি নিজেও জানি না।'

বললাম, 'তাই নাকি স্যার?'

অভ্যুদয়ের স্টমাকে এক গ্যালনের মতো 'হট' জিনিস ঢুকে গেছে। হুইস্কি জিনিসটা এমনই যা পেটে পড়লে ফেনার মত ভেতর থেকে অনেক কিছু গোপন তথ্য বেরিয়ে আসে। অভ্যুদয় মিটার গলায় টেরিফিক জোর দিয়ে বললেন, 'আলবৎ।'

'এত টাকা কি করে করলেন স্যার? নোট ছাপাবার মিনি ছাপাখানা টাপাখানা বানিয়ে ফেলেছেন নাকি?'

'ছাপাখানা বানাবো কেন?'

'তা হলে?'

হে-হে মহাশয়গণ, ঢুলু ঢুলু লালচে চোখে আমার দিকে খানিক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে হাসতে লাগলেন অভ্যুদয়। মাল-খাওয়া হাসি এমনিতেই মিষ্টি হয়। মনে হল অভ্যুদয় মিটার তাঁর হাসিতে

তিন কুইন্টাল সুগার ঢেলে দিয়েছেন। হেসে হেসেই তিনি বললেন, 'আমার ব্রেনের ভেতরেই একটা মিন্ট আছে।' বলে আঙুল দিয়ে নিজের মাথাটা দেখিয়ে দিলেন।

মহাশয়গণ, ব্যাপারটা আমার কাছে ধাঁধার মতো লাগছে। তা ছাড়া পাকস্থলীতে বেশ খানিকটা হুইস্কি ঢুকে গেছে। মাথার ভেতর তা-তা-থৈ তা-তা-থৈ করে ভরত-নাট্যমের ড্যান্স চলছে যেন। অভ্যুদয়ের কথাগুলো বুঝতে না-পেরে বললাম, 'স্যার, ব্যাপারটা যদি এক্সপ্লেন করে বলেন।'

'সিওর। তুমি আমাদের নিজেদের লোক, আওয়ার মোস্ট ট্রাস্টেড পারসন। তোমাকে সব কথা বলা যায়। দেখ স্বয়ম্ভু,তুমি একটা দুর্দান্ত ইন্টেলিজেন্ট ইয়ং ম্যান। ইউ মাস্ট এ্যাডমিট যে বেশি টাকা করতে হলে স্ট্রেট রাস্তায় হাঁটলে চলে না।।'

'নিশ্চয়ই স্যার, জিগজ্যাগ রাস্তায় যেতে হয়। ভীষণ কিউরিওসিটি হচ্ছে আপনি কিরকম ট্যারাবাঁকা রাস্তায় ঢুকেছেন সেটা জানতে। মানে গোটা ব্যাপারটাই তো একটা শিক্ষার ব্যাপার। আপনার কাছ থেকে যতটা পারি শিখে নিই। এইরকম সবার কাছ থেকে একটু একটু কালেক্ট করেই তো জ্ঞানের আলমারি বোঝাই করতে হয়, না কি বলেন?'

'একজ্যাক্টলি।' বলে একটু থামলেন অভ্যুদয়। সেই ইন্টারভ্যালে আস্ত একটা ফিশ রোল আর এক পেগ হুইস্কি শেষ করে আবার শুরু করলেন, 'আণ্ডার ইন-ভয়েসিং ওভার-ইনভয়েসিং কাকে বলে জানো?'

জানি মহাশয়গণ, জানি। কিন্তু অভ্যুদয়ের কারবারটা বুঝে নেবার জন্য নিরেট গরুর মতো চোখের তারা পুরো ফিক্সড করে ডাইনে বাঁয়ে জোরে জোরে মাথা নাড়লাম, 'আজ্ঞে না স্যার, ইংরেজি ভোকাবুলারির স্টক আমার খুব কম।'

অভ্যুদয় মিটার এবার বললেন, 'ব্যাপারটা তা হলে পরিষ্কার করেই দিই। দু চারটে বিগ ইণ্ডাস্ট্রি ছাড়াও আমার ইমপোর্ট এক্সপোর্টের বিজনেস আছে। এখান থেকে নানারকম ইঞ্জিনিয়ারিং গুডস, লেদার, চা অনেক ইউরোপিয়ান কান্ট্রিতে পাঠাই। এর জন্য দু সেট কাগজপত্র তৈরি করতে হয়। এক সেট শো করবার জন্যে, আরেক সেট থাকে সিক্রেট। যে সব পার্টিকে মাল পাঠাই তারা আর আমরা ছাড়া সেটা কেউ জানে না।'

'দু সেট কাগজে কী থাকে?'

'যেটা শো করানো হয়, তাতে মালের দাম কম করে ধরা থাকে। আর যেটা সিক্রেট রাখি তাতে আসল দামটা লেখা হয়। কম দামটা পেমেন্ট নিই। আসল দাম থেকে ওটা কেটে যে ব্যালান্সটা থাকে সেটা সেই সেই দেশে নিয়ে থাকি। তারপর ওখানকারই কোনো ব্যাঙ্কে বেনামে রেখে দিই।'

'দারুণ কারবার তো স্যার। কিন্তু এতে লাভ কী?'

'ইনকাম-ট্যাক্স ওয়েলথ-ট্যাক্স কম দিতে হয়। তাছাড়া বিদেশে গেলে ওখান থেকে টাকা তুলে খরচ করা যায়। আমার ইচ্ছা লাস্ট লাইফটা ফরেনে কাটাব। তার জন্য নানা জায়গায় টাকা জমিয়ে যাচ্ছি।'

মহাশয়গণ দেখুন, একবার ভাল করে অভ্যুদয় মিটার নামে এই মালটির আগাপাশতলা নিরীক্ষণ করে যান। আমিও আপনাদের সঙ্গে তাকে দেখতে থাকি।

অভ্যুদয় আবার বলে উঠলেন, 'ওয়ার্ল্ডের নানা কান্ট্রি থেকে আমি ডিফারেন্ট টাইপের মালও ইমপোর্ট করে থাকি। তাতেও দু সেট কাগজপত্র তৈরি করতে হয়। এক সেটে আসল দাম থাকে, আরেক সেটে দামটা বেশি করে বাড়িয়ে ধরা হয়। আসল দামটাই ওদের পেমেন্ট করি কিন্তু ম্যানিপুলেট করে বেশি দামটা শো করে যাই। এতে খরচ বেশি দেখানো যায়। তার নিট ফল হল ট্যাক্স কম দেওয়া, শেয়ার হোল্ডারদের ডিভিডেণ্ড কম দেওয়া, এটসেটরা এটসেটেরা—'

'আপনি স্যার গুরুদেব লোক। যে রকম জিগজ্যাগ রাস্তার কথা বলছেন তাতে আমার মাথা বাঁই বাঁই করে ঘুরছে।'

অভ্যুদয় মিটার গম্ভীর মেজাজে একটু হাসলেন। তারপব শুরু করলেন, 'আমার ফ্যাক্টরিগুলোতে রেয়ার মেশিন পার্টস তৈরি হয়। আগে এগুলো ইমপোর্ট করা হত। মেশিন পার্টগুলোর দারুণ ডিমাণ্ড। মাঝে মাঝে লেবার ট্রাবল ক্রিয়েট করে প্রোডাকশন কয়েক মাসের জন্য হয়ত বন্ধ করে দিলাম। তারপর যে মাল স্টকে আছে সেগুলো চোরা বাজারে চালান করে দিই। তাতে আসল দামের দু-তিন গুণ উঠে আসে। এক সপ্তাহের মধ্যে হয়ত বিশ পঁচিশ লাখ টাকা এক্সট্রা হয়ে যায়, মানে ব্রেনটাকে একটু খাটানো আর কি।'

হে-হে মহাশয়গণ, কিরকম বুঝছেন? আমিও ব্রেন খাটাই। আপনাদের কম করে একশ বার জানিয়ে দিয়েছি আমি একটা চিট, একজন থার্ড ক্লাস ফোরটোয়েন্টি। আমার মাথায় একটা আস্ত প্ল্যানিং কমিশনের হেড কোয়ার্টার বসানো রয়েছে। কিন্তু মহাশয়রা, আমি আর কত বড় চিট!

আমি শুধু নিজের আরাম, ভাল ভাল ড্রেস, দামি দামি খাবার, বাংলা মাল কি স্কচ হুইস্কি ইত্যাদির জন্য একে-তাকে ভোগা দিয়ে যাই। কিন্তু লোকের ক্ষতি করার ক্ষমতা আমার খুবই কম। কিন্তু এই মালটি, মানে যিনি আমার মুখোমুখি বসে চুকচুক করে স্কচ হুইস্কি খেয়ে যাচ্ছেন তার সঙ্গে আমার একটা তুলনা করুন। কী বুঝলেন? কোনো তুলনাই হয় না, সেই না? মহাশয়গণ, আমি যে জাতের চিট, তাতে আপনারা আমাকে হাতের কাছে পেলে চামড়া খুলে নিয়ে হয়ত এক ডজন ডুগডুগি বানিয়ে ফেলবেন। কিন্তু অভ্যুদয় মিটারের মতো মাকড়ারা প্রেমসে আপনাদের কাঁধের ওপরেই চড়ে আছেন। ইমপোর্টেড এয়ার কণ্ডিশানড গাড়িতেই এঁরা ঘোরাফেরা করেন, অ্যাসফাল্টের রাস্তায় ক্বচিৎ কখনো এঁদের পা পড়ে। বাই চান্স এঁদের আপনারা দেখে ফেললে কী করবেন? মা কালী, মা শীতলা, জগজ্জননী মা দুর্গা আর যিশু-বুদ্ধ-রামকৃষ্ণ, ওয়ার্ল্ডের সব অলমাইটি গডদের নামে দু'শ বার দিব্যি কেটে বলতে পারি, দেখামাত্রই ঘাড় গুঁজে দশ বার করে সেলাম ঠুকবেন।

অভ্যুদয় মিটার বলে উঠলেন, 'আরো নানারকম অ্যাক্টিভিটি আছে, শুনবে?'

বললাম, 'আর দরকার নেই। যা শুনলাম তাতেই আমি জ্ঞানের প্যাসিফিক ওসেন হয়ে উঠেছি।'

'এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ দু-চার কি দশ লাখ টাকা—আই মিন এনি অ্যামাউন্ট খরচ করাটা আমার কাছে কোনো ব্যাপারই না। বল কত খরচ করতে হবে?'

বললাম, 'স্যার, হিসেব তো দিতে পারব না। তবে যা করতে হবে সেটা পারি।'

অভ্যুদয় মিটার বললেন, 'বলে ফেল—'

'ওখানে একটা মেডিক্যাল ক্যাম্প বসাতে হবে।'

'মেডিক্যাল ক্যাম্প!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার। আগরপাড়ার ঐ দিকটায় লোকজন নানারকম অসুখে ভুগছে। পারটিকুলারলি চোখের রোগের জন্যে মেডিক্যাল ক্যাম্পে একটা ফ্রি আই অপারেশন সেকসনও রাখতে হবে।'

'এই ব্যাপার! মেডিক্যাল ক্যাম্প বসালে পিপলস সেন্টিমেন্ট আমার ফেভারে চলে আসবে বলে তোমার ধারণা?'

'ইয়েস স্যার।'

'তবে আর দেরি করো না। যত তাড়াতাড়ি পার ক্যাম্পের অ্যারেঞ্জমেন্ট করে ফেল। বেস্ট ডক্টরদের দিয়ে একটা টিম কর। আই ডোন্ট মাইণ্ড স্পেণ্ডিং মানি—গেট মাই পয়েন্ট?'

'ইয়েস স্যার, হান্ড্রেড পারসেন্ট। থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ।'

'ওরা যখন আমাকে ওদের রিপ্রেজেনটেটিভ করবে তখন ওদের জন্যেও আমার কিছু করা। দরকার। দে ডু সামথিং ফর মি অ্যাণ্ড আই ডু সামথিং ফর দেম।'

'রাইট স্যার।'

অভ্যুদয় মিটার একটু ভেবে এবার বললেন, 'কাল তুমি আমার আলিপুরের অ্যাপার্টমেন্টে এস। মেডিক্যাল ক্যাম্পের ব্যাপারে পঁচিশ হাজার টাকা অ্যাডভান্স দিয়ে দেব। ও-কে?'

'ও-কে স্যার।'

'আমি আজ আর বসছি না। ঠিক সাড়ে সাতটায় আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।'

অভ্যুদয় মিটার চলে গেলেন। আমি তাঁকে লিফ্ট বক্স পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এলাম। মহাশয়গণ, এই ফ্যাশনেবল অ্যাপার্টমেন্ট ড্রিংক্স করা ছাড়া আমার এখন আর কিছু করবার নেই। অবশ্যই আটাশ ফুট ওপরে ফিফটিনথ ফ্লোরে উঠে ডোরার কাছে আরেক বার যাওয়া যায়। যার ভাইট্যাল স্ট্যাটিসটিক্স ছত্রিশ-পঁচিশ-ছত্রিশ, যার সারা গায়ের প্রত্যেকটা ইঙ্গিতে সেক্সের বারুদ মাখানো, যার কাছে বসলে খানিকটা এর্নাজি নিয়ে আসা যায়। কিন্তু না, আপনারা তো জানেনই, একটা 'ডবলিউ'রই আমি সাধনা করে থাকি, তার নাম ওয়াইন। উইম্যান সম্পর্কে আমার গ্ল্যাণ্ডগুলো সহজে উইক হয় না।

ডিভানে বসে বসে আমি আরেক পেগ হুইস্কি খেলাম, চিকেন রোস্ট থেকে একটা টুকরো কেটে নিয়ে চিবোলাম। তারপর ডিভান থেকে নেমে ডান পাশের প্রকাণ্ড কাচের জানালাটার কাছে দাঁড়িয়ে রাস্তার আলো আর হাজার হাজার গাড়ির ছোটাছুটি দেখলাম। দেখতে দেখতে ঠিক করে ফেললাম আজ আর লাস্ট ট্রেনের জন্য বসে থাকব না। একটু তাড়াতাড়িই আগরপাড়ার ব্যারাকবাড়িতে ফিরে যাব।

মহাশয়গণ, জানালার কাছ থেকে সরে এসে বেরুবার জন্য জুতো পরতে যচ্ছি সেইসময় টেলিফোনটা ঘুঘুর ডাকের মতো কুর কুর করে বেজে উঠল। আজ কতবার যে টেলিফোনটা বাজল! এই সময় আমাকে কার আবার দরকার হল, কে জানে। ফোনটা তুলে কানে লাগাতেই ওধার থেকে সমাজপতির গলা ভেসে এল, 'কে স্বয়ম্ভু?'

আমি মনে মনে একটা খিস্তি দিয়ে মাখন লাগানো গলায় বললাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার। গুড ইভনিং।'

'গুড ইভনিং। শোন, তোমাকে আমার ভীষণ দরকার।'

আগে আগে ব্যারাকবাড়িতে ফেরার বারটা আজ বাজল, দেখা যাচ্ছে। বললাম, 'স্যার, আমি তো অলওয়েজ অ্যাট ইওর সারভিস। কী করতে হবে বলুন—'

সমাজপতি বললেন, 'দরকারটা ঠিক আমার পার্সোনাল নয়, আমার গুরুদেবের। বেলেঘাটায় আমার গুরুদেব আছেন, তোমাকে বলেছিলাম কি?'

'বলেছিলেন স্যার। বাড়িতে তাঁর কাছে যাচ্ছেন বলেই তো ডোরার কাছে আসতেন—তাই না?'

'তুমি একটি উৎকৃষ্ট হারামজাদা।' বলে কলসীতে জল ভরার মতো বগবগিয়ে হেসে উঠলেন সমাজপতি। হাসি থামলে বললেন, 'শোন, আমার গুরুদেব তোমার জিনিয়াসকে একটু কাজে লাগাতে চান। মানে আমার কাছে তোমার সব কথা শুনেছেন কিনা। তোমাকে একবার আমার সঙ্গে তাঁর কাছে যেতে হবে।'

'আপনি যেদিন বলবেন সেদিনই চলে যাব।'

''জাস্ট আ মিনিট। আজ না, কাল রাত্তিরে ধর অ্যাট সেভেন তোমাকে নিয়ে আমি বেলেঘাটা যাব।'

'ঠিক আছে স্যার।'

'সাতটার সময় তুমি ওখানেই থেকো।'

'নিশ্চয়ই স্যার, আপনি বললেন আর আমি থাকব না!'

'এবার একটা দরকারি কথা জানতে চাই—'

'কী কথা?'

সমাজপতি জিজ্ঞেস করলেন, 'ডোরার ওপর নজরটা রেখে যাচ্ছ তো?'

বললাম, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন স্যার। একটা ডিউটি দিয়েছেন। সেটা করব না, তাই কখনও হয়?'

'থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ।' বলে একটু থামলেন সমাজপতি। তারপর কি ভেবে নিয়ে আবার শুরু করলেন, 'কোনো ছোকরা-টোকরাকে ডোরা তার স্যুইটে ঢোকায়?'

হে-হে মহাশয়গণ, বুড়ো ভামটার গায়ে কোথায় ফোস্কা টের পাওয়া যাচ্ছে। আপনারাও নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। বললাম, 'না স্যার, এখন দেখি নি। ইয়ং ওম্যান তো দূরের কথা, আশি নব্বই বছরের বুড়োকেও ডোরা তার স্যুইটের দেয়াল ছুঁতে দেয় না।'

'সত্যি!' খুশিতে সমাজপতির গলায় যেন স্পার্ক মেরে উঠল।

'আপনার কাছে মিথ্যে বলতে পারি! যদি বলেন তো মা কালী কি যিশু খ্রিস্টের নামে দিব্যি দিয়ে—'

আমাকে থামিয়ে দিয়ে সমাজপতি বললেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। তোমার কথা বিশ্বাস করলাম।'

মহাশয়গণ, ডোরার ব্যাপারটা এখনকার মতো এখানেই হয়ত থেমে যেত কিন্তু সমাজপতিকে একটু খেলাতে ইচ্ছা করল। খচড়ামো, স্রেফ খচড়ামো। বললাম, 'আসলে ব্যাপারটা কী জানেন স্যার?'

'কী?'

'ডোরার মতো সতী-সাধ্বী আমি আমার লাইফে দেখি নি।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ স্যার। আপনাকে ছাড়া ও আর কারো কথা ভাবতেও পারে না। আপনিই ওর ধ্যান-জ্ঞান, এভিরিথিং—'

আমার সম্বন্ধে প্রেম উথলে উঠলে সমাজপতি যে খিস্তিটা দিয়ে থাকেন এখনও সেটাই আরেক বার দিলেন, 'তুমি একটি অতি সাবলাইম হারামজাদা।'

'আসলে ব্যাপারটা কী জানেন স্যার?'

'কী?'

'ওই যে পঞ্চ সতী আছে না—কি যেন তাদের নাম? ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে—অহল্যা, কুন্তী, দ্রৌপদী, তারা আর মন্দোদরী। এবার থেকে ডোরার নামটা ওই লিস্টে ঢুকিয়ে দেওয়া যাবে।'

কলসীতে জল ভরার সময় যেরকম একটা শব্দ হয় আরেক বার তেমনি বগবগিয়ে হেসে উঠলেন সমাজপতি, 'তুমি একটি তুমি একটি—তোমার উপযুক্ত অ্যাডজেকটিভ কোনো লাংগুয়েজেই জন্মায় নি।'

মাকড়াটি যে এখন আমার ওপর ভয়ানক খুশি হয়ে উঠেছে, টের পাওয়া যাচ্ছে। যাই হোক আমি আর কিছু বললাম না।

সমাজপতি আবার বললেন, 'ওয়েল, তুমি তো ও বাড়িতেই যাওয়া-আসা করছ, বেশ কয়েক ঘন্টা থাকছও। ডোরার সঙ্গে তোমার আলাপ-টালাপ হয় নি?'

আলাপ তো খুব সামান্য ব্যাপার। আজ বিকেলেই যে একটি ঘন্টা ডোরার গায়ের কাছে আঠার মতো ঘন হয়ে বসে থেকেছি, যা খুশি তাই গল্প করেছি, তার হাই এক্সপ্লোসিভ শরীরের ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্সের মাপ নিয়েছি—এ সব কথা সমাজপতিকে বলা ঠিক হবে কিনা, প্রথমটা ঠিক করে উঠতে পারলাম না। তার পরেই ভাবলাম, বললে আমার রিস্কটা কী? কিছুই না। বরং বললে সমাজপতি কিরকম নাচানাচি জুড়ে দেন সেটা জানবার একটা ইচ্ছা আমার ঘাড়ে চেপে বসল। বললাম, 'আলাপ হয়েছে স্যার।'

টের পেলাম সমাজপতি টেলিফোনের ভেতর মুখটা যেন গুঁজে দিলেন, 'কবে? কবে?'

'আজই।'

'এলাবরেটলি বল।'

মহাশয়গণ, একেবারে নিরাসক্ত দার্শনিকের মতো মুখ করে যা-যা ঘটেছে তার শুদ্ধ ভাষায় যাকে বলে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ, তাই দিয়ে গেলাম।

কিছুক্ষণ লাইনের ওধার থেকে সাড়া শব্দ নেই। ভলক্যানিক ইরাপসানের আগে এই রকম একটা 'লাল' মানে ভয়ানক চুপচাপ অবস্থা খুব সম্ভব চলতে থাকে। যাই হোক, আমি টেলিফোনটা

নিয়ে ডিভানে বেশ টান টান হয়ে শুয়ে পড়লাম। মহাশয়গণ, সমাজপতির মুখটা যত ভাবতে চেষ্টা করছি ততই ফুটন্ত দুধের মতো আমার পেটের ভেতর হাসি উথলে উঠছে।

খানিকক্ষণ পর ইঞ্জিনের ধোঁয়া ছাড়ার মতো একটা শব্দ টেলিফোনের ভিতর দিয়ে কানে এসে ধাক্কা মারল। মাকড়া এতক্ষণ দম বন্ধ করে বসে ছিল নাকি? নাক মুখ দিয়ে অনেকখানি কার্বন-ডাই-অক্সাইড ছেড়ে সমাজপতি বলল, 'তুমি ডোরার ভাইট্যাল স্ট্যাটিসটিক্সের মাপ নিলে?'

'নিলাম স্যার।'

'বাট ডোরা ইজ মাই গার্ল ফ্রেণ্ড।'

'জানি। আপনার চিন্তার কিছু নেই। আমার হাত স্যার সার্জেনের হাতের মতো। আমার পক্ষে একটা গাছ ছোঁয়াও যা, বরফ ছোঁয়াও যা, যুবতী মেয়ের বুক ছোঁয়াও তাই। আলাদা কোনো সেনসেসানই হয় না, আমার কাছে ওয়ার্ল্ডের অ্যানিমেট বা ইন-অ্যানিমেট সব জিনিসই এক।'

'তুমি দেখছি মহাপুরুষ লোক হে—'

'তা বলতে পারেন। তবে যা বললাম সে কথাটা সত্যি।'

মহাশয়গণ, সমাজপতি নামক এই মাকড়াটি বোধ হয় আমাকে বিশ্বাস করল। তার কারণ এই রকম। সে হয়ত ভেবে নিয়েছে, আমার মাথায় যদি খারাপ মতলব থাকত নিশ্চয়ই এত সব তাকে বলতাম না।

সমাজপতি এবার জানতে চাইলেন, 'হঠাৎ ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স মাপবার জন্যে এত খেপে উঠল কেন ডোরা?'

'আপনি যেরকম আরামে রেখেছেন তাতে পাছে বেশি ফ্যাট জমে যায় সে জন্যে বোধ হয় নজর রাখছে।'

'অ।'

একটু চুপচাপ। তারপর আচমকা কি মনে পড়ে যেতে সমাজপতি আবার বলে উঠলেন, 'ওয়েল, তুমি তো তখন বললে, ইয়াং ম্যান ওল্ড ম্যান—কাউকেই ডোরা তার স্যুইটের দেয়াল ছুঁতে দেয় না?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তা হলে তোমাকে তার স্যুইটে ঢোকাল কি করে?'

'আমি স্যার ওল্ডও না, ইয়াংও না। চাইল্ডও না, মিডল-এজেডও না—'

'তবে তুমি কি?'

'আমি যে কী, নিজেও জানি না। ফিগারটা আমার মানুষের মতো, কিন্তু আমি বোধ হয় মানুষ না।'

'তুমি—তুমি, মানে তোমাকে নিয়ে আমি স্রেফ পাগল হয়ে যাব।' সমাজপতি হাসতে লাগলেন।

আমি এবার বললাম, 'স্যার, একটা কথা বলব?'

'উইদআউট হেজিটেশন।'

'আপনি স্যার অনেক দিন ডোরার কাছে আসেন না। এটা ভাল না—'

সমাজপতির গলা থেকে দারুণ এক উত্তেজনা ফোনের ভেতর দিয়ে আমার কাছে এল, 'কী ব্যাপার বল তো? এনিথিং রং?'

'নো—নো, নট অ্যাট অল। এ পর্যন্ত কোনো গড়বড় নেই।'

'তা হলে ও কথা বললে কেন?'

'মানে ডোরা পঞ্চ সতীর মডার্ন সংস্করণ ঠিকই। তবে চারিদিকে মডার্ন দুর্যোধন দুঃশাসনেরাও তো রয়েছে। আপনি যদি রেগুলার না আসেন ডোরার লাইফের একটা জায়গা ফাঁকা থেকে যায়। যায় কিনা?'

'তা যায়।'

'আর আপনি এত বড় লোক। নিশ্চয়ই আপনার জানা আছে নেচারের মধ্যে কোথাও ভ্যাকুয়াম থাকে না। ডোরা না চাইলেও অনেক বানচোত রয়েছে যারা ওই ফাঁকা জায়গাটা ফিল-আপ করে দিতে পারে।'

'কারেক্ট কারেক্ট। তুমি আমার রিয়েল ফ্রেণ্ড ফিলজার আর গাইডের মতো পরামর্শ দিচ্ছ। তুমি একটি উৎকৃষ্ট হারামজাদা।'

বুঝলাম আমার সম্বন্ধে সমাজপতির প্রেম এই নিয়ে আজ দ্বিতীয় বার টগবগিয়ে উঠল। কী বলতে যাচ্ছিলাম, তার আগেই সমজপতি আবার বললেন, 'কিন্তু—'

'কিন্তু কী?'

'ডোরার ওখানে যাবার ব্যাপারে আমার খানিকটা ডিফিকাল্টি আছে।'

মহাশয়গণ, ডিফিকাল্টিটা কী আমি জানি। আপনারাও জানেন। তবু সমাজপতিকে নিয়ে একটু খেলতে ইচ্ছে করল। বললাম, 'স্যার, কিরকম ডিফিকাল্টি?'

'টেকনিক্যাল।'

মালটি কেমন খলিফা, একবার ভেবে দেখুন। কিন্তু তুমি সমাজপতি যদি ডালে ডালে যাও আমি যাই পাতায় পাতায়। বললাম, 'টেকনিক্যাল ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

সমাজপতি গলার স্বর খাদে নামিয়ে বললেন, 'কথাটা হল, আমার স্ত্রী ডোরার ব্যাপারটা বোধ হয় টের পেয়েছে। তাই আর কি—'

'মানে এ দিকটা এখন আপনার পক্ষে ডেঞ্জার জোন—এই তো?'

'যা বলেছ।'

'আপনার সেই হাত-পায়ের ফ্র্যাকচারগুলো এখন কিরকম আছে?'

সমাজপতি সন্দেহের গলায় বললেন, 'ডোরার কথা হচ্ছিল। ফ্র্যাকচারের ব্যাপারটা নিয়ে এলে যে! দুটোর মধ্যে অ্যাসোসিয়েশন রয়েছে কিনা, সন্দেহ করছ?'

মহাশয়গণ দেখুন, এই সমাজপতি লোকটা তিনটে কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর, দুটো কোম্পানির চেয়ারম্যান এবং আরো গাদা গাদা ফার্মের কি সব বড় বড় পোস্টে জাঁকিয়ে বসে আছে। অথচ একটু খেলাতেই কেমন নিজেই ফাঁদের ভেতর পা ঢুকিয়ে বসল। কি করে যে এই মালটি এত বড় বড় কোম্পানি চালায় সে-ই জানে। বললাম, 'স্যার, আমি কিছুই ভাবি নি।'

'তুমি যা জিনিস, গন্ধ ঠিকই পেয়ে গেছ। আর পেয়েই যখন গেছ তখন তোমাকে ব্যাপারটা নিজের মুখে বলছি।' চাপা গলায় সেদিনকার সেই ঘটনাটা বলে গেলেন সমাজপতি। এমন কি ডোরার ঘরে তিনি ঢোকবার পর মিসেস সমাজপতি কিভাবে খবর পেয়ে হানা দিয়েছিলেন এবং কিভাবে টেবল ল্যাম্পের মোটা স্ট্যাণ্ড আর ব্রোঞ্জের ফুলদানি দিয়ে তাঁকে জখম করে চুলের ঝুঁটি ধরে টানতে টানতে বাড়ি নিয়ে গিয়েছিলেন তার পুরো ডেসক্রিপসন দিয়ে গেলেন।

আমি চুক চুক করে জিভের ডগায় একটু শব্দ করলাম।

সমাজপতি বললেন, 'সিমপ্যাথির জন্য ধন্যবাদ। তবে ব্যাণ্ডপার্টি বাজিয়ে ব্যাপারটা আর চাউর কোরো না।'

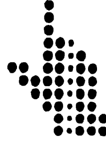
'না স্যার, তা কি আর করতে পারি!'

'তাহলে এখন ছাড়ি। কাল সন্ধে বেলার কথাটা মনে রেখো।'

'রাখব স্যার, গুড নাইট।'

'গুড নাইট।'

টেলিফোন নামিয়ে রাখতে রাখতে ভাবলাম আর এক সেকেণ্ডও আমি এখানে থাকছি না। আবার কোনো মাকড়া ফোন করে আমাকে ফাঁসাবে কিনা, তার কি কোনো গ্যারান্টি আছে? ভাবামাত্র উঠে পড়লাম।



ব্যারাকবাড়িতে ফিরে অন্য দিন সোজা নিজের ঘরে চলে যাই। আজ কিন্তু গেলাম না। উঠোন পেরিয়ে সুমনাদের ঘরের সামনে এসে পড়লাম। সুমনা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। আমাকে দেখে সে অবাক। বলল, 'আপনি!'

'হ্যাঁ, তোমাকে পেয়ে ভালই হল।'

সুমনা অবাক হয়েছে যতটা, তার চাইতে ঢের বেশি হয়েছে খুশি। তার চোখেমুখে আনন্দ যেন স্পার্ক মেরে যাচ্ছিল। মহাশয়গণ, আপনারা তো জানেনই মেয়েটা আমার ব্যাপারে দারুণ ফেঁসে আছে। একদিন মাঝরাত্তিরে ও যখন পার্ক স্ট্রিটে বেকায়দায় পড়েছিল তখন আমি আর বোদা দুই ওয়ার্ল্ড সিটিজেন ওকে আগরপাড়ার এই ব্যারাকবাড়িতে পৌঁছে দিয়েছিলাম। তারপর ওদের জন্য মাসে মাসে কিছু ক্যাশ ডোলের ব্যবস্থাও করেছি। কাজেই মহাশয়গণ বুঝতে পারছেন, মেয়েটা আমার ওপর টেরিফিক গ্রেটফুল, শুদ্ধু বাংলায় যাকে কৃতজ্ঞ বলে, তাই-ই হয়ে আছে আর এই কৃতজ্ঞতা টৃতজ্ঞতা থেকে যা হয়ে থাকে, প্রেমের একটি পাতাবাহার গাছ ওর মনে গজিয়ে উঠেছে, কিন্তু মুখ ফুটে কখনও সুমনা তা বলে নি। হে-হে মহাশয়গণ, আপনারা তো জানেনই, আফটার অল আমি কিরকম একটি খলিফা। সুমনা না বললে কী হবে, আমি কিন্তু সব টের পেয়ে যাই। আমার সঙ্গে কথা বলার সময় কেন ওর চোখে টুনি লাইট জ্বলে, আমার জন্য কেন ওর চিন্তা টিন্তা হয়—এসব কিসের লক্ষণ আমি জানি। মহাশয়গণ, এ ব্যাপারে আমার

রি-অ্যাকশান মাঝে মাঝেই আপনাদের জানিয়ে দিয়েছি। আপনারাই ভেবে দেখুন আমার মতো একটা থার্ড ক্লাশ চিট, একটা ফোরটোয়েন্টির জন্য কারো ফাঁসা উচিত?

সে যাক। সুমনা দারুণ ব্যস্ত হয়ে বলল, 'আসুন, ভেতরে আসুন।'

বললাম, 'এত রাত্তিরে আর যাব না। তোমার সঙ্গে—'

আমার কথা শেষ হবার আগেই সুমনা বলে উঠল, 'এ বাড়িতে আসার পর আমাদের ঘরে একদিনের বেলি আপনাকে আনতে পারি নি। বারান্দা পর্যন্ত এলেন, ভেতরে একটু আসবেন না?' তার গলা থেকে তিন কেজি অভিমান গড়িয়ে পড়ল।

হে-হে মহাশয়গণ, আমি ওসব অভিমান টভিমানের কারবারে নেই। স্ট্রেট সুমনার মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'তোমার সঙ্গে একটা দরকারি কথা আছে।'

'কী?'

'তোমার দিদির চোখে কী অসুখ যেন হয়েছে?'

'অসুখটার নাম বলতে পারব না, তবে ও খুব কম দেখতে পায়। দিনের বেলাটা কোনোরকমে চালিয়ে নেয়, কিন্তু রাত্তিরে একেবারে অন্ধ।'

'এর আগে ডাক্তার-ফাক্তার দেখিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ। বাবা বেঁচে থাকতে নানারকম চিকিৎসা করিয়েছিল। ডাক্তাররা বলেছিল অপারেশন করালে চোখ ভাল হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তার আগেই বাবা মরে গেল।'

'ট্রিটমেন্ট যা করানো হয়েছিল তার কাগজপত্র মানে প্রেসক্রিপশন ট্রেসক্রিপশনগুলো এখনও আছে?'

'আছে। দিদি কোনো কিছুই ফেলে না, সব জমিয়ে রাখে।'

'ভেরি গুড। ওগুলো ঠিক করে রেখো। দরকার হবে।'

সুমনা আগ্রহের সুরে বলল, 'কী ব্যাপার বলুন তো? দিদির চোখের জন্যে কিছু ব্যবস্থা করেছেন?'

মহাশয়গণ, কয়েক দিন আগে সুমনা তার দিদির চোখের ব্যাপারে আমাকে ধরেছিল। বলেছিল, যদি একটা ডাক্তার টাক্তার চোখ দুটো ভাল করে দিতে পারি চিরদিন ওরা কৃতজ্ঞ থাকবে, ইত্যাদি। সেই সময় অভ্যুদয় মিটার ইলেকসান স্ট্র্যাটেজি ঠিক করবার দায়িত্ব আমার কাঁধে চাপিয়ে দিলেন। মহাশয়গণ, আপনারা তো জানেন, চান্সটা পেয়েই তার টাকায় এই আগরপাড়ায় একটা মেডিক্যাল ক্যাম্প খোলাচ্ছি। এই মওকায় এ অঞ্চলের যত পেসেন্ট রয়েছে তাদের সবার ট্রিটমেন্ট হয়ে যাবে। সেই সঙ্গে সুমনার দিদির অপারেশনটাও করিয়ে নিতে পারব।

কী প্ল্যান করেছি সেটা আর সুমনাকে জানালাম না। শুধু বললাম, 'হ্যাঁ। সাত আটদিনের মধ্যেই একটা কিছু হয়ে যাবে। যদি অপারেশনের দরকার হয় তা-ও করা হবে। তোমার দিদির চোখের এখনও যদি কমপ্লিট বারটা বেজে না থাকে, মনে হয় এবার সে দেখতে পাবে।'

সুমনা বলল, 'আপনাকে কী বলে যে—'

তাকে মাঝ রাস্তায় থামিয়ে দিয়ে বললাম, 'কৃতজ্ঞতা টৃতজ্ঞতা জানাতে হবে না। ও সব বললে আমার ভীষণ সুড়সুড়ি লাগে।' বলে তার কাছে এক সেকেণ্ডও দাঁড়ালাম না, সোজা আমাদের

সেই ঘরটায় চলে এলাম।

মহাশয়গণ, অন্য দিন রাত্রে ফিরবার পর বোদাকে দেখা যায় না, কনকচাঁপার পেছনে লাইন করবার জন্য কোথায় কোথায় সে ঘুরে বেড়ায় কে জানে। আজ দেখা গেল বোদা ঘরে চিৎপাত হয়ে শুয়ে স্ট্রেট সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। বললাম, 'কি রে, আজ বেরুস নি! বিছানায় লেপ্টে রয়েছিস দেখছি।'

আমাকে দেখেই মাকড়া জ্যামিতির পারপেণ্ডিকুলারের মতো স্ট্রেট দাঁড়িয়ে গেল। তারপর চুলগুলো খিমচে ধরে বলল, 'গুরু এসেছ! তোমার জন্যে মাইরি মরে যাচ্ছিলাম।'

তার মুখচোখের চেহারা দেখে মনে হল, কিছু একটা ঝামেলা হয়েছে। বললাম, 'কী ব্যাপার রে?'

'হেভি গাড্ডায় পড়ে গেছি।'

'গাড্ডা!'

'হ্যাঁ। এখন তুমি যদি কোনো প্ল্যান ফ্ল্যান না কর, আমাকে ফলিডল খেয়ে মরতে হবে।'

জুতো ফুতো খুলে বিছানায় বসতে বসতে বললাম, 'কী হয়েছে তাই বলবি তো।'

বোদাও বসে পড়ল। আমার গা ঘেঁষে আঠার মতো সেঁটে গিয়ে বলল, 'গুরু, নোকলে কোবরেজ কনকচাঁপাকে বিয়ে দেবার জন্যে অন্য ছেলে ঠিক করে ফেলেছে। দশ দিন পর নাকি বিয়ে। আমি যাতে তার মেয়ের কাছে ভিড়তে না পারি তার জন্যে নিজের বারটা ছেলেকে পাহারায় রেখেছে। কনকচাঁপা বাড়ির বাইরে বেরুলে সে নিজে তার বডি গার্ড হয়ে সঙ্গে সঙ্গে যায়। এরপর তুমিই বল আমার শালা ফলিডল না খেয়ে উপায় আছে! গুরু, তোমার জন্যে ওয়েট করছিলাম। যদি কিছু একটা প্ল্যান করতে পার অল রাইট, আর তা না হলে ফলিডল আমি খাবই খাব।' একটু থেমে লম্বা দম নিয়ে আবার বলল, 'আচ্ছা গুরু, তোমার তো অনেক কিছু জানা আছে। ফলিউড খেলে কি খুব কষ্ট হয়?'

'তোকে তো কালই বলেছি আমি টেস্ট করে দেখি নি। তবে শুনেছি টেরিফিক কষ্ট হয়।'

'কম কষ্টে মরা যায় এমন কোনো কারবার তোমার জানা আছে?'

আমি ভেতরে ভেতরে খুবই বিরক্ত হচ্ছিলাম। বললাম, 'মরবার আগে একটা লাস্ট ট্রাই করে দেখবি না?'

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা চেষ্টা করল বোদা। আর তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার চোখে ফ্ল্যাশ লাইট জ্বলে উঠল যেন। মুখটা আমার কানের কাছে এনে গুজগুজিয়ে উঠল, 'গুরু, তোমার মাথায় প্ল্যান এসেছে?'

'কী মনে হচ্ছে তোর?'

'এসেছে।'

আমি উত্তর দিলাম না।

বোদা এবার দারুণ উৎসাহের গলায় বলল, 'তা হলে বলছ আমাকে ফলিডল খেতে হবে না?'

'না।' ডাইনে এবং বাঁয়ে বার কয়েক মাথাটা নাড়িয়ে বললাম, 'এখন ক'টা কথার জবাব দে।'

'বলে যাও গুরু—'

'কনকচাঁপাকে তুই সত্যি ভালবাসিস?'

'গুরু সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে এখন তুমি জিজ্ঞেস করছ সীতে কার পিতে?'

'ঠিক আছে, 'ঠিক আছে, কতটা ভালবাসিস?'

'কতটা বলতে?'

'মানে কনকচাঁপার জন্যে কী করতে পারিস তুই?'

'লাইফ দিয়ে দিতে পারি।'

'আরে মাকড়া লাইফই যদি দিবি তা হলে তাকে পাবি কি করে?'

বোদা ঘাড় চুলকাতে লাগল।

জিজ্ঞেস করলাম, 'এবার বল কনকচাঁপা তোকে ভালবাসে?'

বোদা বলল, 'বাসে গুরু, টেরিফিক বাসে। কনকও দেড় কে-জি ওজনের একটা ফলিডলের টিন যোগাড় করে রেখেছে। নোকলে কোবরেজ যদি আমার বদলে আর কাউকে ওর ঘাড়ে চড়িয়ে দেয় পুরো দেড় কে-জি মাল ও স্টমাকে চালান করে দেবে।'

'শালা, দু'জনেই অনেক দূর প্রগ্রেস করেছিস দেখছি।'

'তা করেছি গুরু।'

একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'কনকচাঁপা ওদের বাড়ির কোন ঘরে থাকে জানিস?'

বোদা বলল, 'জানি। ডান দিকের লাস্ট ঘরটায়।'

'কোনোদিন সিটি ফিটি ঝেড়ে ওকে বাড়ি থেকে বার করে এনেছিলি?'

'অনেক দিন।'

'তোর সিগনাল শুনলে কনকচাঁপা বুঝতে পারে?'

'গুরু, তোমার তো লেডিজের কারবার নেই, তাই জানো না।' মেয়েরা প্রেম ট্রেম করবে আর লাভারের সিগনাল বুঝবে না, তাই কখনও হয়?'

'তা হলে ঠিক আছে।'

'আমাকে কি কিছু করতে হবে?'

'জরুর করতে হবে। তুমি শালা কনকচাঁপাকে নিয়ে মজা ওড়াবে, আর অন্য লোক জান হালুয়া করে তোমার হাতের চেটোতে মজাখানা বসিয়ে দেবে তা তো হয় না মানিক। তোমাকেই সব কিছু করতে হবে। আমি তোমাকে হেল্প অবশ্য করব। তার আগে রাত্তিরের খাওয়াটা চুকিয়ে ফেলা যাক।'

বোদা পবিত্র খালসা হোটেল থেকে রুটি, তড়কা, চাটনি, পেঁয়াজ আর হরা মিরচি এনে রেখেছিল। আমরা আধ ঘন্টার ভেতর একখানা গ্র্যাণ্ড ডিনার সেরে নিলাম।

খাওয়া দাওয়ার পর বোদা বলল, 'এবার কী করবে গুরু?'

'কিছু না। একটু ঘুমিয়ে নেব, তবে তুই জেগে থাকবি। রাত বারটার পর আমরা বেরুব।'

'গুরু তুমি ঘুমোবে আর আমি জেগে থাকব!'

'তুই জেগে না থাকলে আমার ঘুম ভাঙাবে কে?'

এই ব্যবস্থাটা খুব ভাল লাগছিল না বোদার, সে খুঁত খুঁত করতে লাগল।

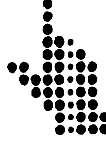
তার ঘাড়ে আলতো করে একটা লাথি হাঁকিয়ে বললাম, 'মাকড়া, একটা রাতের জন্যে একটু কষ্ট কর। কনকচাঁপাকে পেতে হবে না?'

বোদার ট্যারাবাঁকা মুখের ম্যাপটা জোরালো আলোয় ভরে গেল যেন। সে বলল, 'কনকচাঁপার জন্যে জেগে থাকতে বলছ! একটা রাত কেন, হোল লাইফে যত রাত আসবে আমি জেগে থাকতে রাজি।'

আমি কিছু না বলে আরেকটা লাথি হাঁকালাম।

বোদা এবার বলল, 'কনকচাঁপার জন্যে কী প্ল্যান করেছ গুরু?'

'রাত বারটার পর জানতে পারবি।' বলতে বলতে বডিটা স্ট্রেট করে শুয়ে পড়লাম।



মহাশয়গণ, কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম খেয়াল নেই। আচমকা আমার কানের কাছে মুখ এনে বোদা ডাকল, 'গুরু, গুরু—'

আমার ঘুমটা দারুণ পাতলা, একেবারে পেঁয়াজের খোসার মতো। চট করে সেটা ভেঙে গেল। চোখ রগড়াতে রগড়াতে বললাম, 'কি রে, টাইম হয়ে গেছে?'

'ইয়েস গুরু।'

'ঠিক আছে, চল বেরিয়ে পড়া যাক।'

দু'জনে ঘুমন্ত ব্যারাকবাড়ি পেছনে ফেলে বাইরের রাস্তায় চলে এলাম। তারপর সোজা কবিরাজ নকুলেশ্বর ভিষকরত্নের বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করলাম।

হে-হে মহাশয়গণ, রাস্তায় কোনো লোকজন চোখে পড়ছে না। দু ধারের বাড়িগুলোতে কেউ জেগে আছে বলে মনে না। পিরামিডের তলায় শুয়ে থাকা মমিদের মতো সবাই ঘুমিয়ে আছে।

রাস্তায় আলো টালো নেই। ল্যাম্প পোস্টগুলো অবশ্য এক পায়ে দাঁড়িয়ে ঢ্যাঙা মাথা আকাশের দিকে তুলে রেখেছে। কোনো এক কালে বোধহয় ইলেকট্রিসিটির যে বছর জন্ম হয় সেই বছরে মিউনিসিপ্যালিটি খানকতক মিটমিটে বাল্ব ল্যাম্পপোস্টগুলোর গায়ে ঝুলিয়ে দিয়েছিল। ন্যাশনাল প্রপার্টিকে নিজেদের খাস সম্পত্তি ভেবে চারদিকের জনগণ কবেই বাল্বগুলো খুলে নিয়ে গেছে।

. হে-হে মহাশয়গণ, মানুষ টানুষ না থাক, আলো না থাক, কিন্তু কুকুর আছ কয়েক ডজন। গোটা রাস্তা জুড়ে কুকুরদের একটা ইউনাইটেড নেশান বসেছে যেন। আমাদের দেখেই চেঁচিয়ে গোটা আগরপাড়া মাথায় তুলে ফেলল তারা।

দেখুন মহাশয়রা, খুব ভাল করে দেখুন। আমরা যাচ্ছি লুকিয়ে লুকিয়ে সীতা হরণের মতো একটা টেরিফিক ব্যাপার করতে আর এই শালা পাল পাল কুকুর ধ্রুপদ আর ধামার গেয়ে চারদিকে জানান দিয়ে যাচ্ছে। এই হারামীগুলোই না কনকচাঁপা হরণের বারটা বাজিয়ে দেয়।

ওদের চেঁচানির ঠ্যালায় লোকজন, বিশেষ করে যদি নকুলেশ্বর কবরেজের ঘুমটা ভেঙে যায় তা হলে আর দেখতে হবে না।

হে-হে মহাশয়গণ, কোন শালা এক কুকুর যেন যুধিষ্ঠিরকে স্বর্গের রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল! কী একটা বইতে যেন পড়েছি! রামায়ণেই বোধ হয়, নাকি মহাভারতে? মহাশয়রা, নিশ্চয়ই আপনারা আমার বিদ্যের দৌড় জানেন। পেটে তেরটা ব্যালিস্টিক মিশাইল মারলেও 'ক'র পর 'খ' বেরুবে না। যাই হোক, রাস্তায় এই কুকুরগুলো যুধিষ্ঠিরের মতোই আমাদের রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে চলেছে।

বিশ্বাস করুন মহাশয়গণ, আমরা চাই না এই শালারা হেভেন বা হেল, কোথাও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলুক। ওদের গা থেকে ঝেড়ে ফেলবার জন্য বললাম, 'ভাগ হারামীরা, ভাগ—'

বোদা যত না চটে যাচ্ছিল তার দশগুণ ঘাবড়ে গেছে। সে বলতে লাগল, 'দিলে মাকড়ারা কিচাইন করে।' বলেই আধলা একটা ইট তুলে কুকুরগুলোর দিকে ছুঁড়ে মারল, 'ভাগ শুয়ারের বাচ্চারা, ভাগ—'

কিন্তু ওরা কি সহজে আমাদের সঙ্গ ছাড়ে! একেবারে চিটে গুড়ের মতো জুড়ে থাকতে চাইছে। বোদা এবার আমার দিকে ফিরে বলল, 'গুরু, একটা কিছু প্ল্যান কর। নইলে এই শালারাই আমাদের গাড্ডায় ফেলে দেবে।'

বললাম, 'এক আধটা ইটে হবে না। ইটের বৃষ্টি বইয়ে দে। দাঁড়া, আমিও তোর সঙ্গে হাত লাগাচ্ছি।'

পুরো একটি ঘন্টা ইট ছুঁড়ে ছুঁড়ে কাঁধ থেকে হাতের জোড় যখন আলগা হয়ে এসেছে সেই সময় কুকুরগুলো আমাদের ছেড়ে দিল। রিট্রিট কথাটার মানে যেন কী? ও হ্যাঁ, পশ্চাদপসরণ. শালারা রিট্রিট করার পর বোদা আর আমি পাক্কা পনের মিনিট ধরে এক ফুট জিভ বার করে হাঁপালাম। কেননা ইট ছুঁড়ে ছুঁড়ে টেরিফিক টায়ার্ড হয়ে পড়েছিলাম।

মহাশয়গণ, জিরোবার পর বোদাকে বললাম, 'এখানে বি টি রোড়ের কাছে একটা ঘোড়ার আস্তানা রয়েছে না?'

বোদা দারুণ অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকাল। বলল, 'ঘোড়ার গাড়ির আখড়া দিয়ে কী করবে গুরু?'

'মাকড়া, কনকচাঁপাকে হরণ করে কি হাঁটিয়ে নিয়ে যাবি? রামায়ণ মহাভারত পড়িস নি? কাউকে হরণ করলে রথে চড়িয়ে নিয়ে যেতে হয়।'

'রথ কোথায় পাব গুরু?'

'রথ পাওয়া যাবে না বলেই তো ঘোড়ার গাড়ির ব্যবস্থা করতে বলছি। চল, একটা গাড়ি নিয়ে আসি।'

মহাশয়গণ, রাত দেড়টায় বি টি রোডে ঘোড়ার গাড়ির আস্তানায় গিয়ে কোচোয়ানদের ঘুম ভাঙাতে আরো আধ ঘন্টা লেগে গেল। ওরা কিছুতেই আসতে চায় না। মাঝ রাত্তিরে এভাবে গাড়ি ভাড়া করতে গেলে হেভি ঘাবড়ে যাবার কথা। শেষ পর্যন্ত অনেক জপিয়ে দশটা টাকা ভাড়া অ্যাডভান্স করতে একটা কোচয়ান রাজি হল। মাকড়া একখানা যা গাড়ি বার করল, দেখে

চোখের তারা পোল ভল্ট খেয়ে ব্রহ্মতালুতে গিয়ে গেঁথে গেল যেন। গাড়িটায় এক শ সাতাত্তরটা কাঠের তাপ্পি। আর ঘোড়াটার চোখ ড্যাবডেবে আর হলদেটে, পাঁজরার প্রত্যেকটা হাড় আলাদা আলাদা করে গোনা যায়, পেটটা মাটিতে ঝুলে পড়েছে। দেখে মনে হয় জণ্ডিস কিংবা কোলাইটিসের রুগী। তার কাঁধে অনেকখানি জায়গা জুড়ে শুকনো ঘা।

বললাম, 'তোমার ঘোড়ার যা স্যাম্পল দেখছি শেষ পর্যন্ত পৌঁছুতে পারবে তো?'

কোচোয়ান গাড়ির গায়ে ঘোড়াটাকে জুততে জুততে বলল, 'সাব, আমার এই ঘোড়া আটাশ বার ডার্বি জিতেছে। রেসে কত লোককে বাদশা কত লোককে ফকির বানিয়েছে তার হিসেব নেই। আর আপনি বলছেন ও আপনাদের নিয়ে যেতে পারবে না!'

'বল কি হে?'

'ওকেই জিজ্ঞেস করে দেখুন।'

আমি যে আমি, পিটার স্বয়ম্ভু হোড়—আমার পর্যন্ত তাক লেগে গেল। বললাম, 'ঘোড়া মানুষের কথা বোঝে!'

কোচোয়ান বলল, 'আমার কাছে থেকে থেকে কথা বুঝতে শিখেছে। তবে বোলটা এখনও ফোটে নি। আর বছরখানেক থাকলেই তোতার মতো বুলি ফুটিয়ে ছাড়ব।'

আমি ঘোড়াটার ঘাড়ে একটা চাপড় মেরে বললাম, 'কিরে মাকড়া, তোর 'বস' যা বলছে সত্যি?'

ঘোড়াটা আমার দিকে ড্যাবডেবিয়ে তাকিয়ে কান দুটো লটপটিয়ে নেড়ে দিল, মাথাটাও কান্নিক মেরে এক দিকে কাত করল যেন। মহাশয়গণ, ট্রেনিং—মানে শুদ্ধ বাংলায় প্রশিক্ষণটা কিরকম হয়েছে একবার দেখুন।

এবার আমি কোচোয়ানকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার ঘোড়ার কাঁধে ওই ঘা'টা কিসের? দাদ নাকি?'

কোচোয়ান বলল, 'না সাব, ও তো পক্ষীরাজ ঘোড়া ছিল। ডানা কেটে নেওয়া হয়েছে, তাই ওখানে ঘা হয়ে গেছে।'

'তুমি দেখছি একখানা টেরিফিক মাল।' বলেই বোদার দিকে ফিরলাম, 'আমরা কারেক্ট অ্যাড্রেসে এসে পড়েছি পার্টনার। এই পক্ষীরাজ ঘোড়া আর রথ ছাড়া কনকচাঁপা হরণ হত না, শালা একটু খিঁচ থেকে যেত।'

গাড়ির গায়ে ঘোড়া লাগানো হয়ে গিয়েছিল। কোচোয়ান বলল, 'উঠে পড়ুন সাব।'

আধ ঘন্টা পর আমবা কবিরাজ নকুলেশ্বর ভিষকরত্নের বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়লাম। মোড়ের মাথায় গাড়িটা দাঁড় করিয়ে বোদা আর আমি এগিয়ে গেলাম, তারপর বাড়িটার পেছন দিকে এসে বললাম, 'সামনে যাওয়াটা সেফ হবে না। গলার আওয়াজ টাওয়াজ পেলে নোকলের রেজিমেন্ট বেরিয়ে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। আমরা খিড়কির দিক থেকে ব্লিৎসক্রিগ অ্যাটাক করব। নে, সিগনাল মার—'

বোদা একটু ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'মারব গুরু?'

'নিশ্চয়ই মারবি।'

একটু চুপ করে রইল বোদা। তারপর মুখের ভেতর দুটো আঙুল পুরে 'হুইত' 'হুইত' করে অনেকক্ষণ ধরে কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে লম্বা সিটি মারল।

মহাশয়গণ, তিন-চার বার সিটি মারার পর হঠাৎ খুট করে খিড়কির দরজা খুলে একটি মেয়ে বেরিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে বোদা দুর্দান্ত একটা লং জাম্প মেরে তার কাছে উড়ে গেল যেন। এবং তক্ষুণি তার হাত ধরে টানতে টানতে আমার কাছে নিয়ে এল। বলল, 'বস, এই হল কনকচাঁপা।' তারপর কনকচাঁপার দিকে ফিরে আমাকে দেখিয়ে বলল, 'আর এ হল আমার গুরু, তোমাকে আগে দেড় লাখ বার এর কথা বলেছি। স্ট্রেট গুরুর পায়ে ডাইভ মেরে দাও।'

হে-হে মহাশয়গণ, ওয়ার্ল্ডে কতরকম ম্যাজিক হয়, আপনারা ভাবতে পারবেন না। নকুলেশ্বর কবরেজকে দেখলেই মনে হয় ডারউইন সাহেবের থিওরিটি প্রুভ করে দেবার জন্যই সে জন্মেছে। কিন্তু মহাশয়গণ, তার মেয়েটিকে লক্ষ করুন। এলিজাবেথ টেলরের সঙ্গে ব্রিজিট বার্ডোট আর হেমা মালিনীকে মিশিয়ে দিলে যোগফল যা দাঁড়ায় কনকচাঁপা হল তাই। আশ-শ্যাওড়া গাছে কিরকম বসরাই গোলাপ ফুটে আছে দেখুন। একেই বোধ হয় শুদ্ধু ভাষায় বলে 'ফ্রিক অফ নেচার'। মনে মনে ভাবলাম বোদা মাকড়ার টেস্ট আছে।

এদিকে বোদার কথামতো ঘুম চোখ রগড়াতে রগড়াতে কনকচাঁপা দুম করে আমার পা ছুঁয়ে একটা পেন্নাম ঠুকে বসল।

মহাশয়গণ, আপনারা তো জানেনেই, এ সব প্রণাম ট্রণামগুলো আমার কাছে দারুণ ঝামেলার ব্যাপার। আমার মা-বাপের ঠিক ঠিকানা নেই, আমি হলাম একটি বেজন্মা। আমার পায়ে কেউ মাথা ঠেকালে রি-অ্যাকশানটা কিরকম হতে পারে আপনারাই একটু ভাবুন। আমাকে মহাশয়গণ, ঠাস করে দুটো চড় হাঁকান, দশটা লাথি কষান, আমি দাঁত বার করে হাসব। কিন্তু প্রণাম করলে ভীষণ সুড়সুড়ি লাগে, টেরিফিক অস্বস্তি হয়। ভাবি আমি শালা সোসাইটির বটম থেকে একেবারে মাথায় চড়ে একখানা পূজনীয় প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি ট্যক্তি হয়ে গেলাম বোধ হয়। আপনারা আমাকে খিস্তি করুন, খাস্তা করুন, কিন্তু প্রণামটি করলেই আমার ক্যারেক্টারটির বারটা বেজে যাবে।

কনকচাঁপাকে বললাম, 'আমার পার্টনার বোদা মাকড়াকে সত্যিই তুমি ভালটালো বাসো?'

কনকচাঁপা ঘাড় কাত করল, 'বাসি।'

'ওর জন্যে কদ্দূর যেতে পার?'

'যদ্দূর আপনি বলবেন।'

'যদি বলি এক্ষুণি আমাদের সঙ্গে চলে যেতে হবে—রাজি?'

'রাজি।'

'ভাল করে ভেবে দেখ।'

'দেখেছি।'

'তোমার ফাদারটি যা একখানা জিনিস, পরে কিন্তু ঝামেলা করবে।'

'জানি।'

'তোমার জন্যে আমাদের পেছনে পুলিশকেও সেট করে দিতে পারে। ওদের বোঝাবে আমরা

তোমাকে ফুসলে বার করে এনেছি।'

কনকচাঁপা ব্যাপারটা যেন ঢের আগে থেকেই জানে, এমনভাবে বলল, 'পুলিশ তো লাগাবেই।'

বললাম, 'তখন তুমি স্লিপ কেটে বাবার দিকে চলে যাবে না?'

'না'।

হে-হে মহাশয়গণ, পুলিশের কথায় বোদা দারুণ ঘাবড়ে গিয়েছিল। আমার কাঁধের পাশ থেকে সে ফিসফিস করে বলল, 'গুরু, পার্টি হেরে গেলে এম.এল.এ-রাই চামড়া বাঁচানোর জন্যে সট করে অন্য দলে ভিড়ে যায়। কনকচাঁপা যদি হড়কে বাপের দিকে যায় আমাদের কিন্তু জেলে বসে রোজ লাপসি টেস্ট করতে হবে।' বলতে বলতে তার গলা কাঁপতে লাগল।

আমি তার কথার উত্তর না দিয়ে কনকচাঁপাকে আবার বললাম, 'পুলিশ এসে টানাটানি করলে তুমি কী বলবে?'

ইনস্ট্যান্ট কফির মতো জবাবটা যেন কনকচাঁপার জিভের ডগায় বসে ছিল। এক সেকেণ্ড না ভেবে সে বলল, 'বলব, কেউ আমাকে ফুসলে আনে নি, আমি নিজের ইচ্ছায় এসেছি।'

মহাশয়গণ, দেখতেই পাচ্ছেন বোদার সিলেকসানটা বেশ ভালই। হেরে যাওয়া এম.এল.এ'দের মতো কনকচাঁপা ফ্লোর ক্রস করবে না বলেই মনে হয়। ওরা দু'জনে 'মেড ফর ইচ আদার' হতে পারে। একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'তোমার বয়েস কত?'

কনকচাঁপা হাসল, 'একুশ পেরিয়ে গেছে। বাবা কি পুলিশ কেউ আমাকে ফাঁসাতে পারবে না। আঠার পেরুলেই মেয়েরা নিজের ইচ্ছামতো চলতে পারে।'

মহাশয়গণ, মেয়েটা কিরকম খলিফা দেখুন। ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডের সবগুলো ধারা মুখস্থ করে তারপর বোদার সঙ্গে ভিড়েছে। তবু আমি পিটার স্বয়ম্ভু হোড়—ব্যাপারটা আরেকটু পরিষ্কার করে নেবার জন্য বললাম, 'তোমার বয়েস যে একুশ তার প্রুফ আছে?'

কনকচাঁপা তক্ষুণি ঘাড় হেলিয়ে দিল, 'আছে।'

'কী?'

'বাবা আমার একটা কোষ্ঠী করিয়েছিল, তাতে বয়েস লেখা আছে। তার দু বছর কমিয়ে এবারে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছি। অ্যাডমিট কার্ড কমানো বয়েস লেখা আছে।'

'কোষ্ঠী আর অ্যাডমিট কার্ডটা আনতে পারবে?'

'এক্ষুণি আনব?'

'পারবে?'

'পারব।'

'আমরা দাঁড়িয়ে থাকছি। কষ্ট করে নিয়ে এস। বাড়ি গিয়ে আবার কোনো ঝামেলা পাকিয়ে বোসো না।'

কনকচাঁপা দৌড়ে চলে গেল।

বোদা এই সময় বলে উঠল, 'গুরু, ফিরে আসবে তো?'

বোদার পাছায় আলতো করে লাথি হাঁকড়ে বললাম, 'আসবে আসবে।'

তিন মিনিটও লাগল না, কোষ্ঠী আর স্কুল ফাইনালের অ্যাডমিট কার্ড নিয়ে ফিরে এল কনকচাঁপা। সে দুটো তার হাত থেকে নিয়ে একবার দেখে পকেটে রাখলাম। মহাশয়গণ, এজ প্রুফ, বাংলায় কী যেন বলে, ও হ্যাঁ বয়সের প্রমাণপত্র, ওটা হাতে থাকা ভাল, না কি বলেন!

এরপর আর রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকার মানে হয় না। বললাম, 'চল, পুষ্পক রথ ওখানে ওয়েট করছে। এবার ফেরা যাক।'

খানিকটা দূরে একটা ঝোপের আড়ালে ঘোড়ার গাড়িটা দাঁড়িয়ে ছিল। রোগা হাড়বার-করা ঘোড়াটা এখানে আসার পর থেকে দেড় কোটি মশার কামড়ে দারুণ বিরক্ত হয়ে অনবরত পা ছুঁড়ে যাচ্ছিল। আমরা সেখানে চলে এলাম। বোদাদের বললাম, 'তোরা ভেতরে বোস—'

বোদা জিজ্ঞেস করল, 'আর তুমি?'

'আমি কোচোয়ানের পাশে বসে যাব।'

বোদা হাত-পা ছুঁড়ে চেঁচামেচি জুড়ে দিল, 'তা হয় না গুরু। তুমিও গাড়ির ভেতরে বসে যাবে।'

আমি তার কানের কাছে মুখ গুঁজে বললাম, 'কাবারের মধ্যে হাড্ডি না ঢোকালে বুঝি ভাল লাগছে না! ছুঁড়িটাকে ভাগিয়ে নিয়ে যাচ্ছ, কোথায় তার কাছে বসে গুজগুজিয়ে ভালবাসার কথা বলে একটা অ্যাটমসফিয়ার ক্রিয়েট করবে, তা না। শালা লোক ডেকে মীনাবাজার বসাচ্ছে! কনকচাঁপাকে নিয়ে উঠে পড় মাকড়া—'

বোদা আর কি করে, কনকচাঁপাকে সঙ্গে নিয়ে সুট করে বাক্সের মতো গাড়িটায় ঢুকে গেল। আর আমি ওপরে উঠে কোচোয়ানের পাশে বসতে বসতে বললাম, 'চল—'

কোচোয়ান গাড়ি হাঁকিয়ে বলল, 'সাব আরও দশটা টাকা বেশি ভাড়া দিতে হবে।'

বললাম, 'দশ টাকা বেশি দেব কেন?'

'দু' টাকা দাওয়াই-এর দাম।'

'কিসের দাওয়াই!' আমি পিটার স্বয়ম্ভু হোড়, যে কোনো কারণেই ঘাবড়ায় না, চমকায় না, সে পর্যন্ত অবাক হয়ে গেল।

কোচোয়ান এবার যা বলল, শর্ট কাটে এই রকম। তার সঙ্গে গাড়ি ভাড়ার কনট্রাক্ট হয়েছে কিন্তু মশার কামড় খাবার কোনো কথা হয়নি। যতক্ষণ আমরা কনকচাঁপার সঙ্গে কথা বলেছি ততক্ষণ একা একা ঝোপের কাছে বসে সে আগরপাড়ার লাখ লাখ অ্যানোফিলিস মশার কামড় খেয়েছে। ফলে একখানা বেশ অ্যারিস্টোক্র্যাট ম্যালেরিয়া দু' একদিনের মধ্যে তাকে ধরে ফেলবে। কাজেই ভোর হতে না হতেই দু' টাকার কুইনিন কিনে তাকে স্টমাকে চালান করতে হবে।

বললাম, 'ঠিক আছে। বাকি আট টাকা কোন অ্যাকাউন্টে চাইছ চাঁদু?'

কোচোয়ান অন্ধকারে তার কালো রঙের কোটিং দেওয়া ট্যারাবাঁকা দাঁতগুলো বার করল, 'সাব, এত রাতে ভদ্দরলোকের বাড়ির লেড়কীকে নিয়ে চুপকে চুপকে আমার গাড়িতে চলেছেন—' বলে একটু থেমে তুখোড় শেয়ালের মতো খিকখিকিয়ে একটু হেসে নিল। তারপর ফের শুরু করল, 'পরে পুলিশ যদি আমাকে ধরে পাছার হাড্ডি ঢিলে করে দ্যায়! মতলব হল,

হাতে কিছু পেলে পিঠমে ডাণ্ডা নিতে আমি রাজি—'

মহাশয়গণ, এই কোচোয়ান মালটিকে একবার দেখুন। শালা মওকা বুঝে কেমন ব্ল্যাকমেল করতে চাইছে! আমার আবার ফালতু ঝামেলা পছন্দ হয় না। এখন যদি মাকড়া মেয়ে ভাগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি বলে হল্লা বাধায় বিশেষ কিছুই হবে না। কারণ কনকচাঁপা নিজের ইচ্ছাতেই আমাদের সঙ্গে এসেছে এবং তার বয়স একুশ। তবু চেঁচামেচি হলে লোক বেরিয়ে পড়বে, নোকলে কবরেজও কি আর টের পাবে না? তখন সব ব্যাপারটায় কিছুদিনের জন্য হলেও জট-টট পাকিয়ে যাবে। আবার তখন শালা কনকচাঁপাকে ভাগাতে নতুন স্ট্র্যাটেজি বার করতে হবে। তার চাইতে এক্সট্রা আটটা টাকা দিয়ে যদি 'পিস' কেনা যায়, কে আর ফালতু গড়বড়ের মধ্যে পা বাড়ায়! হে-হে মহাশয়গণ, আপনারা তো জানেন আমি একজন দারুণ শান্তিপ্রিয় নাগরিক, হে-হে পিসফুল সিটিজেন। আর যে বাড়তি আটটা না দশটা টাকা দিতে হবে সেটাও তো আমার পকেট থেকে যাচ্ছে না। নাসিক প্রেস নোট ছাপিয়েছে। সেই সব নোট লেন বাই - লেন ঘুরে এসেছিল সমাজপতির হাতে। সমাজপতি মারফত একশ আটটা ব্যাঙ্কে এখন আমার নামেই মজুত রয়েছে। তার থেকে দশটাকার একটা নোট বার করে আমি শান্তি কিনে ফেলাটাই ঠিক করে ফেললাম। বললাম, 'তুমি একটি অতি ফার্স্ট ক্লাস হারামী। ঠিক আছে, ওই টাকাটাও দেব।'

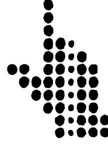
কোচোয়ান মাথাটা আড়াই ফুট হেলিয়ে পাক্কা দশ বার কুর্নিশ করল। তারপর বলল, 'বড়েসাবকা মেহেরবানি—'

আমি উত্তর দিলাম না।

এদিকে ঘোড়াটা যেভাবে গাড়ি টানছে তাতে বাকি রাতের মধ্যে আমরা ব্যারাকবাড়িতে পৌঁছুতে পারব বলে মনে হয় না। পার আওয়ার তার স্পিড আড়াই শ গজের বেশি নয়।

মাঝে মাঝে কোচোয়ান চাবুক হাঁকায়। আর ঘোড়াটা তখন ডার্বির ঘোড়ার মতো জাম্প দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু মহাশয়গণ, যে জন্তুটির কোমরে গেঁটে বাত, চোখে ক্যাটারাক্ট, পসট্রেট গ্ল্যাণ্ডে ডিফেক্ট, কিডনিতে ট্রাবল, বুকে অ্যাজমা তাকে তো আর রেসের ঘোড়া বানানো যায় না। দুটো জাম্প মেরেই মিনিট দশেক জিভ বার করে সেটা রেস্ট নেয়।

আমি ঘোড়াটার কথা ভাবছিলাম না। হে-হে মহাশয়গণ, গ্র্যাণ্ড ফাদার ব্রহ্মার মতো যে নির্বিকার, মানে আমি পিটার স্বয়ম্ভু হোড়, বার বার কনকচাঁপার কথাই চিন্তা করছিলাম। রামায়ণ না মহাভারত,কোথায় যেন সুভদ্রা হরণের মজাদার স্টোরি আছে, আমরাও তেমনি মাঝরাতে অন্ধকার যখন ঝাঁ ঝাঁ করছে সেই সময় নকুলেশ্বর কবরেজের মেয়ে কনকচাঁপাকে হরণ করে নিয়ে চলেছি। শালা, মহাভারতের অর্জুনের মতো একটা হিরো হিরো ভাব আমার ভেতর প্লে করছে।



যাক গে মহাশয়রা, একসময় ঘোড়ার গাড়িটা আমাদের ব্যারাকবাড়িতে পৌঁছে দিয়ে ভাড়া টাড়া বাগিয়ে চলে গেল। যেমন দেখে গিয়েছিলাম, তার কোনো হেরফের হয়নি। সব ঘরেই দরজায় খিল লাগিয়ে মাকড়ারা যে যার বৌকে জড়িয়ে ধরে ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ের শ্লোগানগুলোকে স্রেফ বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছে। ওদের নিয়ে আমার কোনোরকম দুশ্চিন্তা নেই। হে-হে মহাশয়গণ, আপনারা তো জানেন, ওয়ার্ল্ডের কোনো ব্যাপারেই আমি সেভাবে কিছু ভাবি না। কিন্তু এই মুহূর্তে কনকচাঁপা সম্পর্কে ভাবতে হচ্ছে। তাকে নিয়ে তুলব কোথায়?

হে-হে মহাশয়গণ, কনকচাঁপাকে নিয়ে বোদা আর আমার দশ বাই বার ফুট ঘরে তুলতে পারি। কিন্তু সকালবেলা ব্যারাকবাড়ির মাকড়ারা যখন দেখবে আমাদের ঘর থেকে সোফিয়া লোরেন আর হেমা মালিনী পাঞ্চ-করা একখানা ফাস কেলাস ইয়াং ছুকরি বেরিয়ে আসছে তখন ঝামেলা হয়ে যেতে পারে। আমার দিক থেকে মহাশয়গণ, আপনাদের গ্যারান্টি দিতে পারি, ঘরে ঢুকব, বিছানায় টান হয়ে শোব, তক্ষুণি চোখ বুজে যাবে আর নাকে কনসার্ট বেজে উঠবে। কিন্তু বোদার ব্যাপারে কোনোরকম অ্যাসুরেন্স দিতে পারব না। রাত্তির বেলা লাভারকে একই ঘরে দশ ফুট রেডিয়াসের মধ্যে পেলে হারামীটা কি আর ঘুমোবে! শালার বডিতে যদি আচমকা কয়েক ডিগ্রি হিট চড়ে যায় একটা কিছু গড়বড় হয়ে যেতে পারে। মহাশয়গণ, আপনারা যা এক এক খানা মাল, নিশ্চয়ই আমাদের দিকে নজর রাখছেন। আপনারা হয়ত বলবেন, পুরুত-ফুরুত কি ম্যারেজ রেজিস্ট্রার ডাকিয়ে বিয়ে দেবার আগে জোয়ান ছুঁড়িকে জোয়ান ছোকরার ঘরে ঢোকানো কোনোভাবেই ঠিক হবে না। পুরুতের কাছ থেকে লাইসেন্স বাগিয়ে একটা ইয়াং ম্যান যদি একটা ইয়াং গার্লকে নিয়ে শুয়ে পড়ে আপনাদের আপত্তি নেই, কিন্তু শোবার আগে ঐ পারমিটটি তার বাগানো চাই-ই চাই। নইলে আপনারাই বলে বসবেন, বড় ইমমরাল অ্যাণ্ড ইললিগাল কাজ হয়ে গেল হে। আপনাদের মরালিটির আর লিগেলিটির বাউণ্ডারিটা একবার ভেবে দেখুন মহাশয়গণ। একজন পুরুত অশুদ্ধ উচ্চারণে কি মন্তর-ফন্তর আউড়ে যাবে, কিছু লোক বনস্পতিতে ভাজা লুচি বেগুনভাজা, মাছ মাংস, দই মিষ্টি গলা পর্যন্ত বোঝাই করবে। ব্যস, তাতেই একটি ছোকরার যুবতী মেয়ের পাশে শোবার ব্যবস্থা হানড্রেড পারসেন্ট পাক্কা হয়ে গেল।

মহাশয়গণ, আপনারা তো জানেনই, আমি একজন ওয়ার্ল্ড সিটিজেন, শুদ্ধ ভাষায় বিশ্ব-নাগরিক। আপনাদের নিয়ম-ফিয়ম নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। কোনো মেয়ে যদি আমার হার্টে কোনোদিন হিট জেনারেট করতে পারে আমি কিন্তু ম্যারেজ রেজিস্ট্রার কি পুরুতের কাছে দৌড়াব না, স্রেট তাকে নিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে আপনাদের নাকের ওপর দরজা বন্ধ করে দেব। নিজেরা যদি আমরা অনেস্ট আর সিনসিয়ার থাকি তা হলেই যথেষ্ট। আসল কথা হল সততা। মহাশয়গণ, শুদ্ধ বাংলায় অনেস্টিকে সততা বলে না? একটি মেয়ের পাশে শোব, এই

ব্যাপারটা পুরুত ডেকে শোধন করে নিতে আমি একেবারে রাজি না।

যাই হোক, এই মধ্যরাতে আপনারা যখন চোখের তারা ফিক্সড করে আমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন তখন কনকচাঁপার জন্য একটা ব্যবস্থা করতেই হয়। বোদা আর কনকচাঁপার দিকে ফিরে বললাম, 'তোরা একটু দাঁড়া, আমি আসছি।' বলেই সোজা সুমনাদের ঘরের কাছে গিয়ে দরজায় টোকা দিলাম।

সঙ্গে সঙ্গে সুমনার ঘুম জড়ানো ভারি গলা শোনা গেল, 'কে?'

'আমি স্বয়ম্ভু, দরজা খোল—'

আগরপাড়ার এই ব্যারাকবাড়িতে ঢোকার পর একদিনও সুমনাদের ঘরে গেছি কিনা মনে নেই, গেলেও ঘরে ঢুকি নি। ওরা অনেক বার যাবার জন্য বলেছে। কিন্তু হে-হে মহাশয়গণ, আমি হলাম বিশ্ব-নাগরিক, কোথাও আমার মতো মালেদের জড়িয়ে বা ফেঁসে যেতে নেই। তা হলেই শালা ক্যারেক্টারের বারটা বেজে গেল। দরজা খুলে মধ্যরাতে আচমকা আমাকে দেখতে পেয়ে সুমনা দারুণ অবাক। বারকতক চোখ রগড়ে বলল, 'আপনি!'

বললাম, 'এদিকে এস, বলছি।'

আমার সঙ্গে সঙ্গে প্রকাণ্ড চৌকো উঠোনের মাঝখানে চলে এল সুমনা। বোদা আর কনকচাঁপা সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আগরপাড়ার অ্যানোফিলিস আর কিউলেক্স মশাদের কামড় খাচ্ছিল।

মহাশয়গণ, ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একবার বোদাকে, একবার কনকচাঁপাকে, একবার আমাকে চট করে দেখে নিয়ে সুমনা একটু ভয়ে ভয়েই জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার?' তার মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। বোঝার কথাও অবশ্য নয়।

বললাম, 'আমরা গাড্ডায় পড়ে গেছি। তোমার হেল্প চাই।' একটু থেমে তক্ষুণি আবার বললাম, 'কোনো ভয় নেই।'

সমনা কিছু না বলে আমার মুখে দিকে তাকাল। অর্থাৎ কী সাহায্য দরকার সেটাই জানতে চাইছে।

কনকচাঁপাকে দেখিয়ে বললাম, 'একে হরণ করে নিয়ে এলাম। আমার পার্টনার বোদা মাকড়ার সঙ্গে কাল এর বিয়ে হবে। পুরুত মন্তর পড়ে শোধন করে না দিলে একসঙ্গে শোওয়া তো বারণ। আজকের রাতটা কনকচাঁপা তোমার কাছে থাকবে।'

আমার আগের কথাটা ধরে সুমনা এবার বলল, 'হরণ করে নিয়ে এলেন মানে!' উত্তেজনা এবং দুশ্চিন্তায় তার গলা ভীষণ কাঁপছিল।

বললাম, 'হরণ করা মানে জানো না! চুরি করা—চুরি করা। ওর বাবার কাছ থেকে স্রেফ মাথা খাটিয়ে চুরি করে এনেছি।' কিভাবে আনা হয়েছে তার একটা নিখুঁত ডেসক্রিপশনও দিয়ে দিলাম।

ঘুম ছুটে গিয়েছিল সুমনার, চোখের পাতা নড়ছিল না। সে বলল, 'এভাবে নিয়ে এলেন!'

মহাশয়গণ, মাঝরাতে আর ভ্যাজোর ভ্যাজোর করতে ভাল লাগছিল না। বললাম, 'সীতাহরণ হতে পারে, সুভদ্রাহরণ হতে পারে, উষাহরণ বা হেলেনহরণ হতে পারে। আর

যত দোষ বুঝি কনকচাঁপার বেলায়!'

'পুলিশের ঝামেলা হবে না তো?'

'মনে হয় না। হলেও কিছু হবে না। কনকচাঁপার বয়েস একুশ পেরিয়ে গেছে। তা ছাড়া স্কুল ফাইনালের সার্টিফিকেট আর ঠিকুজি, দুটোই নিয়ে এসেছে ও। এজ প্রুফ করতে এতটুকু ট্রাবল হবে না। জানো তো, মেয়েরা অ্যাডাল্ট হয়ে গেলে নিজেদের ইচ্ছামতো বিয়ে করতে পারে কোনো ফাদার তা ঠেকাতে পারে না।'

'জানি। ঠিকুজি আর সার্টিফিকেট আনার পরামর্শটা বুঝি আপনিই দিয়েছিলেন?'

মহাশয়গণ, সুমনা কিরকম তুখোড় খলিফা মেয়ে দেখুন। কয়েক দিন মোটে আমাকে দেখেছে কিন্তু এরই মধ্যে আমার ক্যারেক্টারখানা কিরকম স্টাডি করে ফেলেছে! বললাম, 'তা দিয়েছি। তবে হরণ হবার ব্যাপারে ও আমাদের টেরিফিক হেল্প করেছে।'

সুমনা হেসে ফেলল, 'বুঝেছি।'

বললাম, 'ভীষণ ঘুম পেয়েছে। আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না। কনকচাঁপাকে তোমার কাছে ডিপোজিট করে নাও। আমরা চলি।'

সুমনা কনকচাঁপার একটা হাত ধরে বলল, 'এস ভাই—'

ওরা চলে গেল। আমরা আমাদের ঘরে এসে ট্রাউজার ফাউজার ছেড়ে লুঙ্গি গলিয়ে শুয়ে পড়লাম। বোদাও বিড়ি ধরিয়ে আমার পাশে টান টান হয়ে শুয়ে পড়েছিল। জুট মিলের চিমনির মতো গল গল করে খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে সে ডাকল, 'গুরু—'

বললাম, 'কী বলছিস?'

'সুমনাকে যা বললে ও বাত ক্রিয়া সচ্ হ্যায়?' ফিলিংস এসে গেলে মাঝে মধ্যে হিন্দি ঝেড়ে দেয় বোদা।

'কোন বাত?' আমি তার দিকে ফিরলাম।

'ওই যে বললে না—' ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে বোদা বলতে লাগল, 'কাল কনকচাঁপার সঙ্গে আমার ম্যারেজ চুকিয়ে ফেলব—'

অন্ধকারেই বোদার দিকে লাথি ছুঁড়লাম। বোদা কোঁক করে একটা শব্দ করল। তারপর খ্যাল খ্যাল করে হাসতে হাসতে জিভের ডগায় চুমু খাওয়ার মতো আওয়াজ করে বলল, 'গুরু তোমার লাথিটা কি সুইট! কাল সাদিটা পাক্কা তো?'

'শালা, কনকচাঁপাকে ছাড়া ঘুমোতে পারছ না?'

'না গুরু। বডিটা কিরকম যেন লাগছে!'

'হিট চড়ছে?'

'হ্যাঁ গুরু। নাক দিয়ে মনে হচ্ছে সোডার মতো ঝাঁজ বেরুচ্ছে।'

'ঠিক আছে, কালই বিয়ে হয়ে যাবে। একটা দিন ওয়েট কর। আর বেশি হিট চড়লে বি.টি রোড থেকে বরফ কিনে এনে আজকের মতো বডিতে চাপিয়ে শুয়ে থাক।'

'গুরু তোমার পাটা কোথায়?'

'কেন?'

'বিয়ে দিচ্ছ। তোমার পায়ে একটু চুমু খাব।'

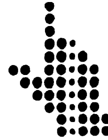
আবার একটা লাথি হাঁকড়ে বললাম, 'ও পাশে কাত হয়ে শো। আর একটা কথা বললে কাল বিয়ে কিচাইন হয়ে যাবে। শালা ঘুমোবার সময় ঘ্যানোর ঘ্যানোর।'

'ঠিক আছে গুরু—' বোদা একটা ভল্ট খেয়ে স্ট্রেট ওধারের দেয়ালের সঙ্গে সেঁটে শুয়ে রইল।

চোখ স্টিকিং গামের মতো জুড়ে এলেও আমার কিন্তু ঠিক ঘুম আসছিল না মহাশয়গণ। আপনারা তো জানেনই, এই ব্যারাকবাড়িটা নিয়ে তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ বছরের লাইফে মোট এক শ সাঁইত্রিশটা ঠিকানা বদলেছি। আমার পার্মানেন্ট কোনো অ্যাড্রেস নেই। গাছ যেমন মাটির তলায় শেকড় ছড়িয়ে এক জায়গায় ফিক্সড দাঁড়িয়ে থাকে, আমি ঠিক তার উল্টো। আমি হলাম স্রেফ শ্যাওলা। কিন্তু মহাশয়গণ, নর্থ বেঙ্গলের সেই অরফ্যানেজ থেকে বেরিয়ে স্রোতের টানে শ্যাওলার মতো ভেসেই চলেছি। মাঝে মাঝে দু-চারদিন কোথাও একটু ঠেক খাই, আবার শালা ভাসতে থাকি। ভাসতে ভাসতে বোদার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ভেবেছিলাম আমরা 'মেড ফর ইচ আদার', অর্থাৎ যুগলবন্দি হয়ে হোল লাইফ ভেসে বেড়াব। মহাশয়গণ, আপনারা বুঝতে পারছেন মাকড়া শেকড় গজিয়ে আগরপাড়ার এই ব্যারাকবাড়িতেই আটকে যাবে। কনকচাঁপার মতো হেভি ওয়েট কাঁধে চড়িয়ে ও আর ভেসে বেড়াতে পারবে না। শালার হয়ে গেল।

আমরা পাশ থেকে বোদা সরে যাবে। সেজন্য আমার আপসোস টাপসোস কিছু নেই। চলতে চলতে কত লোকেই গায়ের সঙ্গে জুড়ে যায়, তারপর কখন একসময় খসেও পড়ে। জুড়বে আর খসবে—এই নিয়েই তো লাইফ।

বোদা এখানে আটকে গেলেও আমি নিশ্চয়ই মাটিতে শেকড় নামিয়ে এক জায়গায় জমে যেতে পারি না। একদিন এখান থেকেও তাঁবু তুলে ফেলব। নইলে এত বছর ধরে ওয়ার্ল্ড সিটিজেনের যে ক্যারেক্টারটা তৈরি করেছি সেটা আর 'আগ মার্কা' বিশুদ্ধ থাকবে না। তবে কবে এখান থেকে সরে পড়ব, এই মুহূর্তে বলা যাচ্ছে না। সেটা দু'দিন পরেও হতে পারে, আবার দু'মাস পরেও হতে পারে। ভাবতে ভাবতে একসময় সত্যি সত্যিই ঘুমিয়ে পড়লাম।



হে-হে মহাশয়গণ, অন্য দিন ঘুম ভাঙলে দেখতে পাই জ্যামিতির প্যারাবোলার মতো শরীরটাকে দুমড়ে মুচড়ে ঘাড়মুখ গুঁজে শুয়ে আছে বোদা। আজ দেখলাম, চা-টা রেডি করে এক কোণে বসে রয়েছে। অন্য দিন আমরা মুখটুখ ধুয়ে বি.টি রোডে গিয়ে টালি-ছাওয়া দরমা-ঘেরা জনতা রেস্তোরাঁয় ফালি বাঁশের বেঞ্চে বসে মাটির খোরায় চা আর লঝঝড় কোনো বেকারির বাসি পাঁউরুটি দিয়ে ব্রেকফাস্ট সেরে আসি। আজ আর বি.টি রোডে দৌড়ুতে হবে না। আমার ঘুম ভাঙার আগেই কেটলিতে করে চা আর ঠোঙায় সিঙাড়া জিলিপি নিয়ে এসেছে বোদা।

প্রথমটা একটু অবাকই হলাম। ব্যাপারখানা কী? তারপরেই মনে পড়ে গেল, কনকচাঁপার সঙ্গে আজই বোদার বিয়ে দেব বলেছি। আর তাতেই এই ম্যাজিকটা ঘটে গেছে। বোদা মাকড়া কাল হোল নাইট ঘুমোয় নি নাকি?

আরেকটা কথা পাশাপাশি মনে পড়ল। আমাদের ঘরে দুটো গেলাস আর একটা কুঁজো ছাড়া অন্য বাসন-কোসন নেই। বোদা তা হলে চায়ের কেটলি পেল কোথায়? সে কথা জিজ্ঞেস করতে বোদা বলল, 'সুমনার কাছ থেকে চেয়ে এনেছি।'

চোখ কুঁচকে বললাম, 'তার মানে কনকচাঁপাকে দেখার একটা চান্স নিয়েছিস?'

বোদা চমকে উঠল। তারপর বত্রিশটা দাঁত বার করে বলল, 'গুরু, তুমি মাইরি টেরিফিক। তোমার চোখে ডাস্ট দেওয়া যায় না। যাও যাও, ঝট করে মুখটা ধুয়ে এস। দেড় ঘন্টা আগে চা নিয়ে এসেছি। ভাড়াটেদের উনুনে এর ভেতর তিন বার গরম করেছি। গরম করছি আর জুড়োচ্ছে, জুড়োচ্ছে আর গরম করছি। তোমার ঘুমই ভাঙছে না। যাও, আমি আরেক বার চা গরম করে আনি।'

মুখ ধুয়ে এসে চায়ে চুমুক দিচ্ছি, বোদা চোখের কোণে তারা দুটো এনে আমাকে লক্ষ করছিল। হঠাৎ ডেকে উঠল, 'গুরু—'

আমি তার দিকে ফিরলাম, 'কী বলছিস?'

বোদা হাত কচলাতে কচলাতে বলল, 'চা-ফা খাওয়া হয়েগেল। এবার কী করবে?'

মাকড়া যা বলতে চাইছে, বুঝতে পারছি। কনকচাঁপার সঙ্গে তার বিয়ের কী হবে আসলে সেটাই তার টার্গেট। কিন্তু মহাশয়গণ, ওকে ওকটু খেলাতে ইচ্ছে করছে। কাল মাঝ রাত্তিরে সীতা হরণ-টরণের মতো একটা ব্যাপার যে করেছি সেটা যেন আমার মনে নেই। মুখটা দারুণ ভালমানুষের মতো করে বললাম, 'কী আবার করব, কাল কলকাতায় যাওয়া হয় নি। চান-ফান করে স্ট্রেট বাসে উঠে এখন কলকাতায় চলে যাব।'

বোদা মেঝের ওপর দিয়ে হড়কে আমার ঘাড়ের কাছে এল। কাঁপা-ধসে পড়া গলায় বলল, 'গুরু, তুমি কলকাতায় গেলে আমার কী হবে?' মুখ দেখে মনে হচ্ছিল তার মাথায় আচমকা কুড়ি টন ওয়েটের ক্রেন ফ্রেন ভেঙে পড়েছে।

'তোর আবার কী হবে! ইচ্ছে হলে আমার সঙ্গে কলকাতায় গিয়ে হুইস্কি টুইস্কিতে সাঁতরাতে পারিস। আর তা না হলে এই টেন্টেই পড়ে থাকবি।'

'কাল রাত্তিরে সুভদ্রা হরণ করে এখন নকশা করছ গুরু! বলেছিলে না, আজই পুরুত-ফুরুত ডেকে কনকচাঁপাকে আমার কাঁধে ঝুলিয়ে দেবে!'

এবার যেন কনকচাঁপার ব্যাপারটা আমার মনে পড়ে গেল। বললাম, 'বলেছিলাম বুঝি?'

বোদা আমার পায়ের ওপর ডাইভ মেরে নাকটা ঘষতে ঘষতে বলল, 'আর কিচাইন কোরো না গুরু। আমার হার্টে শালা ক্যানসার হয়ে যাচ্ছে।'

মহাশয়গণ, প্রচুর খচড়ামো হয়েছে। আর না। চুলের ঝুঁটি ধরে বোদাকে পায়ের কাছে থেকে তুলে বসিয়ে বললাম, 'যা, পঞ্চাননকে ডেকে আন।'

বোদা কয়েক সেকেণ্ড চোখ দুটো গোল করে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, 'হচ্ছে আমার

ম্যারেজের কথা, এর ভেতর আবার পঞ্চাকে ডাকছ কেন গুরু? কাবাবের মধ্যে হাড্ডি ঢোকাবার কোনো মানে হয়!'

মহাশয়গণ, বোদার ঘাড়ে আলতো করে একটা লাথি হাঁকড়ে বললাম, 'মাকড়া বিয়ে করতে যদি চাস, যা বলছি তাই কর।'

বোদা কিছু একটা বুঝতে চেষ্টা করল। তার চোখ দুটো টুনি লাইটের মতো জ্বলে উঠল যেন। তারপরেই দরজার ভেতর দিয়ে রকেটের স্পিডে উড়ে বেরিয়ে গেল এবং দু মিনিটের মধ্যে পঞ্চাননকে সঙ্গে করে ফিরে এল।

পঞ্চানন হাফ নিল ডাউনের মতো আমার সামনে বসে বলল, 'আমাকে ডেকেছেন, কিছু দরকার আছে স্যার?' বলে পকেট থেকে তিন ইঞ্চি লম্বা সাইজের একটা বিড়ি বার করে ধরিয়ে নিল। ওর বিড়িতে গাঁজা পোরা থাকে।

বললাম, 'আজ সন্ধেবেলা একটা বিয়ে লাগাব ভাবছি।'

'কার বিয়ে স্যার?' গল গল করে ব্লু রঙের খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে নড়ে-চড়ে বসল পঞ্চানন।

বোদাকে দেখিয়ে বললাম, 'আমার এই পার্টনারের।'

'কার সঙ্গে বিয়ে?'

'মেয়েটার নাম কনকচাঁপা। কাল রাত্তিরে তাকে এনে সুমনার কাছে ডিপোজিট করে রেখেছি।'

পঞ্চানন উত্তেজিত হয়ে উঠল, 'কই, কিছু জানতে পারি নি তো।'

বললাম, 'তখন তোমরা যে যার বউকে জড়িয়ে ধরে ঘুমোচ্ছিলে।'

'কিন্তু স্যার, আজ কি বিয়ের তারিখ আছে?'

'জানি না। বোধ হয় নেই, তবে যারা বিয়ের তারিখ ফিক্সড করে তাদের কাছ থেকে বোদার জন্য স্পেশাল পারমিশান আনিয়ে নেবে। ওটা নিয়ে তুমি মাথা খারাপ কোরো না। বোদা যা মাল তাতে পাঁজির ডেট দেখে বিয়ে দিলে প্রেসটিজ পাংচার হয়ে যাবে।'

বোঁদা দাঁত বার করে ঘাড় চুলকোতে লাগল। মহাশয়গণ, পঞ্চাননের কাছে গোটা ব্যাপারটাই গোলক ধাঁধার মতো লাগছিল। গাঁজার বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে একবার সে আমার দিকে, আরেক বাব বোদার দিকে তাকাতে লাগল।

মহাশয়গণ, আমি এবার ঘড়ি দেখে পঞ্চাননকে বললাম, 'এখন সকাল আটটা। রাত আটটায় বোদা বিয়ের পিঁড়েতে চড়বে। তার মানে মাঝখানে থাকছে পাক্কা বার ঘন্টা সময়। এর মধ্যে বিয়ের সব অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে পারবে?'

পঞ্চানন তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে কালচে ঝুলে-পড়া ঠোঁট দুটো কুঁচকে বলল, 'একটা বিয়ে কেন স্যার, ক্যাশ পেলে বার ঘন্টায় হোল কলকাতায় যত আনম্যারেড ছোকরা আর ছুকরি রয়েছে সবার বিয়ে লাগিয়ে দিতে পারি।'

'ক্যাশ জরুর পাবে। যত চাই তত পাবে।

বিড়িটা দাঁতে চেপে ক্যাশের ব্যাপারে কমপ্লিট নিশ্চিন্ত হয়ে দু হাত ঝাড়তে ঝাড়তে পঞ্চানন বলল, 'ব্যাস, এবার বলুন বিয়ের জন্যে কী কী অ্যারেঞ্জমেন্ট করব?'

'পুরুতও ডাকবে, আবার ম্যারেজ রেজিস্ট্রারকে খবর দেবে।'

বোদা এতক্ষণ চুপচাপ বসে ছিল। এবার জিরাফের মতো গলা বাড়িয়ে বলল, 'দু-রকম কারবার কেন গুরু?'

তার নাকে একটা টুসকি মেরে বললাম, 'তোমার ফাদার-ইন-ল'টি যা একখানা জিনিস তাতে কোনোদিকে যাতে গর্ত না থাকে তার বন্দোবস্ত করে রাখছি। একটু ছ্যাঁদা পেলেই শালা কিচাইন করে ছাড়বে। ব্যাপারটা ব্রেনে ঢুকল?'

'না, গুরু!'

'মাথায় শালা তোমার স্ক্র্যাপ আয়রণ পোরা। আরে মাকড়া, পুরুত ডাকিয়ে সবার সামনে বিয়েটা হলে কত লোক সাক্ষী থেকে যাবে, ভেবেছিস! আর ম্যারেজ রেজিস্ট্রার আনতে চাইছি কেন? সই-ফই লাগিয়ে বিয়ের ডকুমেন্টখানা যেই সে তোকে দেবে অমনি জানবি ইণ্ডিয়ার হোল ল' মিনিস্ট্রিটাই তোর হাতে এসে গেল। তখন ব্যারাকপুর কোর্ট থেকে দিল্লির সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত যে যেখানেই দৌড়ুক, কোনো ফায়দা নেই। তোর শ্বশুর হিপ চাপড়ে যতই তবলা বাজাক কিসসু করতে পারবে না। কনকচাঁপা তোর কাছে ফিক্সড ডিপোজিট হয়ে থাকবে।'

পঞ্চানন বলল, 'দু'দিক দিয়ে বিয়েটা শোধন করতে চাইছেন স্যার?'

'ইয়েস।' আমি ঘাড়টা দেড় ফুট হেলিয়ে দিলাম।

বোদা বলল, 'তুমি গুরু ডেঞ্জারাস।'

'বলছিস!' আমি বোদার চোখের দিকে তাকিয়ে হাসলাম।

'হাজার বার।'

এদিকে পঞ্চানন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আগের কথার সুতো টেনে আবার বলল, 'পুরুত আর ম্যারেজ রেজিস্ট্রার ঠিক করে ফেলব স্যার। আর কী কী অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে হবে বলে দিন।'

'এ বাড়ির গোটা উঠোন জুড়ে ডেকরেটরকে দিয়ে ফার্স্ট ক্লাস একখানা প্যাণ্ডেল খাটাবে। রাঁধুনী বামুন আব কলকাতার হোটেলের বাবুর্চি আনিয়ে লুচি মাছের কালিয়া থেকে শুরু করে মোগলাই খানা পর্যন্ত সব রেডি করবে। আর চারপাশে যত লোক আছে সবাইকে নেমন্তন্ন করবে। কেউ যেন বাদ না পড়ে।'

'আর কী করব স্যার?'

মহাশয়গণ, আপনারা তো জানেন বিয়ে ফিয়ে আমি করি নি। এই ব্যাপারটা সম্বন্ধে আমার পরিষ্কার কোন আইডিয়া নেই। বললাম, 'তুমি মাকড়া বিয়ে কর নি?'

শরীরটাকে দুমড়ে মুচড়ে বাঁকিয়ে-চুরিয়ে হাত কচলাতে লাগল পঞ্চানন। আর কান্নিক মেরে মেরে আমাকে দেখতে লাগল।

জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হল, জবাব দিচ্ছ না যে?'

পঞ্চানন বলল, 'লজ্জা করছে স্যার?'

মহাশয়গণ, এই খচ্চরটি কী বলে শুনুন, আমার কাছে নাকি তার লজ্জা হচ্ছে! বললাম, 'ঠিক আছে, আমার দিকে পেছন ফিরে বল।'

সত্যি সত্যি মহাশয়রা, আমার কথামতোই ঘুরে বসল পঞ্চানন। তারপর গড়গড়িয়ে যা বলে গেল তা এইরকম। এই ব্যারাকবাড়িতে আসার আগে টালিগঞ্জের এক বস্তিতে থাকত সে। সেখানে এক ভাড়াটের বিধবা বোন ছিল মালতী। টেরিফিক দুঃখী মেয়েটার ওপর দাদা আর বৌদি মিলে হেভি অত্যাচার করত। ঠিকমতো খেতে দিত না। লাল ত্রিকোণকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দাদা-বৌদি হাঁস মুরগির পোলট্রির মতো গাদা গাদা বাচ্চাকাচ্চার জন্ম দিত। তাদের মানুষ করার দায়িত্ব ছিল মালতীর ওপর। এ ছাড়া পান থেকে চুনটুকু স্লাইট খসে গেলে মারধোরও খেতে হত। দেখেশুনে মেজাজটা কিচাইন হয়ে গিয়েছিল পঞ্চাননের। একদিন রাত্রিবেলা সবাই ঘুমোলে মালতীকে নিয়ে সোজা আগরপাড়ায় চলে আসে সে। মালতীর ইচ্ছা ছিল পুরুত ডেকে বিয়ে করে, পঞ্চানন রাজি হয় নি; পুরুতকে যে দক্ষিণা দিতে হবে তাতে তিনদিন ভাল করে পেট ভরে খাওয়া যাবে। কিন্তু চারদিকে হারামীদের তো অভাব নেই। আর তাদের মুখ হল কাঁচা নর্দমার মতো। তাই সবার মুখে ছিপি আটকাবার জন্য নগদ বিশ পয়সা খরচ করে একটা সিঁদুরের প্যাকেট কিনে মালতীর সিঁথিতে আর কপালে পরিয়ে দিয়েছে। পুরুতকে ঘুষ দিয়ে মালতীর সঙ্গে শোবার জন্য ভিসা সে কিনতে চায় না। আসলে নিজের কাছে অনেস্ট থাকলেই হল। মালতী এবং পঞ্চানন সুখী।

হে-হে মহাশয়গণ, আমিও বিয়েটিয়ের ব্যাপারে পঞ্চাননের মতোই ভেবে থাকি। মাইরি বলছি লোকটার ওপর আমার দারুণ শ্রদ্ধা হতে লাগল। বললাম, 'এবার ঘুরে বোসো—'

পঞ্চানন আমার দিকে ফিরে দাঁত বার করল।

বললাম, 'তুমি তো মহাপুরুষ হে—'

পঞ্চানন মুখ কাঁচুমাচু করল, 'স্যার ঠাট্টা করছেন?'

'একেবারেই না। তুমি যা করেছ তাতে পায়ের ধুলো নিতে ইচ্ছে করছে।'

পঞ্চানন আরেক বার দাঁত বার করল, 'এবার বুঝতে পারছেন আমার বিয়ের কোন রকম এক্সপিরিয়েন্স নেই। তা হলে বলুন এখন কী করা দরকার?'

মহাশয়গণ, আমাদের আলোচনাটা মেইন লাইন থেকে লুপ লাইনে চলে গিয়েছিল। পঞ্চানন আবার সেটাকে ঠেলেঠুলে মেইন লাইনে নিয়ে এল। বললাম, 'ঠিক আছে, যারা বিয়ে করেছে তাদের কাছে সব জেনে ব্যবস্থা করে ফেল।'

'সেটাই ভাল।'

পঞ্চানন উঠে পড়েছিল। আমি তাকে থামিয়ে বললাম, 'ক্যাশ না নিয়েই চলে যাচ্ছ যে—'

পঞ্চানন আবার বসে পড়ল।

হে-হে মহাশয়গণ, আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে সমাজপতি আমার নামে একশ আটটা ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলেছেন। চেক-বইগুলো কিছু আছে কলকাতার গড়িয়াহাটের সেই অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে, আর কিছু এই ঘরে—আমার অ্যাটাচি কেসের ভেতর। অ্যাটাচি থেকে আট দশটা চেক-বই আর স্পেসিমেন সিগনেচারের সেই লিস্টটা বার করে পাঁচ হাজারের একেকটা ফিগার বসিয়ে মোট পঞ্চাশ হাজার টাকার দশটা চেক লিখে ফেললাম। তার তলায় সিগনেচার মিলিয়ে সই বসালাম।

বোদা ইংরেজি টিংরেজি পড়তে পারে না। জিজ্ঞেস করল, 'কত টাকা দিলে গুরু?'

বললাম, 'ফিফটি থাউজেন্ড—পঞ্চাশ হাজার।'

আচমকা পাঁজরায় খিঁচ লাগার মতো একটা শব্দ করেই থেমে গেল বোদা। মহাশয়গণ, তার চোখমুখ দেখে মনে হল স্রেফ দম আটকে গেছে। অনেকক্ষণ বাদে ইঞ্জিনের মতো হুস করে খানিকটা হাওয়া ছেড়ে সে বলল, 'পঞ্চাশ হাজার গুরু!'

'ইয়েস। দরকার হলে আরো পঞ্চাশ হাজার দেব।'

বোদা এবার বলল, 'পঞ্চাশে পঞ্চাশে কত হয়?'

'ওয়ান লাখ।'

'এত টাকা!'

'নোট ছেপেছে নাসিক প্রেস। সেগুলো জিগজ্যাগ স্লিপারি রাস্তা ঘুরে এসেছে সমাজপতির কাছে। ভায়া সমাজপতি এসেছে আমার কাছে। টাকাটা ব্যাঙ্কে আটকে না রেখে আমি সার্কুলেট করিয়ে দিচ্ছি। তাতে তোর দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কেন রে মাকড়া?'

বোদা আর কিছু বলল না, ঝিম মেরে বসে রইল। আর চেকগুলো নিয়ে পঞ্চানন হাউই-এর মতো বেরিয়ে গেল। ওগুলো বেয়ারার চেক।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। পঞ্চানন চলে যাবার পর আমি শুয়ে পড়ে পায়ের ওপর পা তুলে নাচাচ্ছিলাম। নাচাতে নাচাতে আচমকা একটা কথা মনে পড়ে গেল আমার। সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসলাম।

বেশ কিছুদিন আগে এখানে যখন অনেকগুলো ফাণ্ড খুলেছিলাম সেই সময় বোদাকে দিয়ে অগুনতি কৌটো, আঠা, কাগজ ইত্যাদি কিনিয়ে আনিয়ে ছিলাম। এক কোণে দেওয়ালের গা ঘেঁষে ফাণ্ডের কৌটোগুলো পাশাপাশি সাজানো রয়েছে। তবে সবগুলো কৌটো তখন দরকার হয় নি। দু-তিনটে খালি কৌটো ফাণ্ডগুলোর পাশে পড়ে রয়েছে। আঠার শিশি আর সাদা কাগজ-টাগজও কিছু থেকে গেছে। বোদাকে বললাম, 'একটা কৌটো, আঠার শিশিটা আর কাগজ নিয়ে আয়।'

বোদা সব নিয়ে এলে কৌটোটার গায়ে কাগজ সেঁটে লিখে দিলাম, 'ফাণ্ড ফর নিউলি-ম্যারেড।' তার তলায় বাংলায় তর্জমা করে দিলাম, 'নব বিবাহিতদের জন্য সাহায্য তহবিল।' তারও তলায় ইংরেজি এবং বাংলায় লিখলাম, 'প্রতি মাসে আড়াই শত টাকা করিয়া ভাতা লওয়া চলিবে। খাতায় নাম, সই ও তারিখ বসাইয়া টাকা লইতে হইবে।'

লেখা হয়ে গেলে বোদাকে বললাম, 'তোর জন্যে ফাণ্ড খুলে ফেললাম। মাকড়া, অটোগ্রাফ তো বসাতে পারা না। দয়া করে বুড়ো আঙুলের টিপসই মেরে টাকা নিও। মাসে একবারের বেশি দু'বার ওই কৌটো ছোঁবে না।'

'ঠিক আছে গুরু।'

মহাশয়গণ, আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমার নামে যখন একশ আটটা ব্যাঙ্কে কম করে পনের কুড়ি লাখ টাকা রয়েছে তখন আমার অ্যাটাচিতে কিছু ক্যাশ ট্যাশ থাকা খুব একটা ইমপসিবল ব্যাপার না। অ্যাটাচি খুলে আপাতত এক হাজার টাকা বার করে 'নব-বিবাহিতদের

ফাণ্ড'-এ রেখে দিলাম। তারপর অন্য ফাণ্ডগুলোর পাশে কৌটোটা বসিয়ে রাখলাম।

বোদা কৌটোটার দিকে তাকিয়ে তার ম্যারেড লাইফ সম্পর্কে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে গেল। তারপরেই ব্রেনে স্পার্ক মারার মতো কিছু একটা মনে পড়ে গেল তার। সে ডেকে উঠল, 'গুরু—'

বললাম, 'কী?'

'এত যখন খরচ করছ তখন যে গাড়িতে চড়ে বিয়ে করতে আসব সেটা সাজানো হবে না? বড়লোকের ছেলেরা মেছো বাজারের ফুলপট্টিতে গাড়ি সাজিয়ে ব্যাণ্ড পার্টি বাজিয়ে বিয়ে করতে যায়। দেখে দেখে আমার টেরিফিক ইচ্ছে হত কোনোদিন বিয়ে হলে ঐ রকম বাজনা বাজিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে যাব।'

'সব ইচ্ছাই পুরণ করা হবে মাকড়া। নইলে 'আমার সাধ না মিটিল আশা না পুরিল' গাইতে গাইতে চিতায় গিয়ে উঠবে, সেটি হতে দেব না। গাড়ি ডেফিনিটলি সাজানো হবে। আরো যা-যা সাধ আছে পঞ্চাননকে বলে দিস। ও সব অ্যারেঞ্জমেন্ট করে দেবে। কিন্তু—'

'কী গুরু?'

'তুই তো এ ঘর থেকে বেরিয়ে পনের গজ হেঁটে উঠোনে বিয়ে করতে যাবি। এর মধ্যে গাড়ি ঢোকাবি কোথায়?'

'গুরু হেঁটে গিয়ে বিয়ে করব!'

'কিন্তু মাকড়া তুমি তো ন'শ পঞ্চাশ মাইল দূর থেকে বিয়ে করতে আসছ না!'

বোদা ঢোক গিলে বলল, 'আমি ভাবছি গাড়ি করে খানিকটা চক্কর মেরে এসে বিয়ের প্যাণ্ডেলে 'ইন' করব।'

বললাম, 'নইলে বিয়ে-বিয়ে ফিলিংসটা ঠিক আসে না, তাই না?'

'কারেক্ট গুরু।'

'ঠিক আছে, সব হয়ে যাবে। তুই টেন্টে থাক। আমি চানটা ঝট করে [illegible] কলকাতা থেকে একটু ঘুরে আসি।'

'আজ আবার তুমি কলকাতায় যাবে!'

'যেতেই হবে! অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। মিস্টার সমাজপতি আমাকে এক জায়গায় নিয়ে যাবেন বলেছেন।'

'কিন্তু গুরু ম্যারেজ বলে কথা! তুমি কাছে না থাকলে আমার হার্টের ডায়নামো ব্রেক ডাউন করে যাবে যে!'

আমি চোখ কুঁচকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ভয় করছে?'

মুখটা বোতলের মতো লম্বা করে বোদা বলল, 'হ্যাঁ গুরু। এর আগে আর বিয়ে করি নি তো।'

'শালা খচড়া—' আমি ধাঁ করে হাতের সামনে থেকে সিগারেটের প্যাকেট তুলে ছুঁড়ে দিলাম।

সট করে প্যাকেটটা লুফে পকেটে পুরে ফেলল বোদা।

আমি আবার বললাম, 'যখন শালা ফুলশয্যা করতে ঢুকবি তখন ডায়নামো ঠিক থাকবে তো? না তোর সঙ্গে আমাকেও ঢুকতে হবে?'

'গুরু, তুমি কনকচাঁপার গুরুজন হও না!'

'শালা, এর বেলায় গুরুজন!'

আমি একটা লাথি হাঁকড়ালাম। মাথাটা সট করে সরিয়ে নিল বোদা। শালা আমাকে না জানিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে কুং-ফু টুং-ফু শিখছে নাকি? যাক গে, বললাম, 'ঘবড়াও মাত। সন্ধেবেলা মাঞ্জা ফাঞ্জা চড়িয়ে রেডি হয়ে থাকবি। আমি ঠিক সময় এসে যাব।'



কিছুক্ষণ বাদে চান ফান করে পবিত্র খালসা হোটেলে লাঞ্চ সেরে বাসে শ্যামবাজার চলে এলাম। সেখান থেকে গড়িয়াহাটার অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে আমার সেই ষোলশ স্কোয়ার ফুটের স্যুইটে যখন ঢুকলাম তখন একটার মতো বাজে। ঢুকতে না ঢুকতেই টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভারটা তুলে 'হ্যাল্লো' বলতেই সমাজপতির গলা ভেসে এল, 'কে, স্বয়ম্ভু?'

গলার স্বরে দেড় কিলো মাখন লাগিয়ে বললাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার—'

'তুমি রেডি হয়ে থাকো। আমি আধ ঘন্টার মধ্যে চলে আসছি।'

'আমি রেডিই আছি।'

মহাশয়গণ, আধ ঘন্টার অনেক আগেই সমাজপতি চলে এলেন। তিনি নিজে ওপরে আসেন নি। গাড়ির ড্রাইভার পাঠিয়ে আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন।

নিচে একটা দামী ইমপোর্টেড ফরেন লিমুজিনের ব্যাক সিটে বসে ছিলেন সমাজপতি। আমাকে দেখেই দরজা খুলে দিলেন। আমি উঠে বসতেই দেড় ফুট পুরু দুর্দান্ত আরামদায়ক গদির ভেতর ডুবে গেলাম। ড্রাইভারও ততক্ষণে ফ্রন্ট সিটে তার জায়গায় উঠে বসেছে। সমাজপতি বললেন, 'বেলেঘাটা চল—'

হে-হে মহাশয়গণ, আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, সমাজপতির গুরুদেব বেলেঘাটায় থাকেন। সেখানেই তাঁর আশ্রম। এটাও নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে, সমাজপতি আগেই আমাকে সেখানে নিয়ে যাবার কথা বলেছিলেন।

রাস্তায় এলোমেলো দু-চারটের বেশি কথা হল না। আধ ঘন্টার ভেতর পার্কসার্কাস, সি-আই-টি রোড, কনভেন্ট রোড হয়ে বেলেঘাটায় সুভাষ সরোবরের কাছে সমাজপতি গুরুদেবের আশ্রমে পৌঁছে গেলাম।

মহাশয়গণ, প্রায় তিন একর জমির ওপর আশ্রম। আশ্রম ঘিরে উঁচু কমপাউণ্ড ওয়াল। মাঝখানে মন্দির, গুরুদেবের থাকার জন্য বাড়ি। এছাড়া গোটা দুই গেস্ট হাউস, কিচেন, প্রেয়ারের জন্য ঘেরা জায়গা, ইত্যাদি ইত্যাদি চোখে পড়ল।

এই দুপুরবেলা লোকজন বিশেষ দেখা যাচ্ছিল না। বাইরের শিষ্য টিষ্যরা খুব সম্ভব এ

সময়টা আসে না। মহাশয়গণ, আপনারা তো জানেনই, গুরুদর্শনের জন্য হাসপাতালের মতো ভিজিটিং আওয়ার্স আছে। এই দুপুরবেলাটা তার মধ্যে বোধ হয় পড়ে না। বাইরের লোকজন না থাকলেও ঘাড়ে-গর্দানে-ঠাসা, মাথা মুড়ানো কিছু ব্রহ্মচারী আর সন্ন্যাসী-টন্ন্যাসী ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তাদের কারো পরনে সাদা লুঙ্গি, কারো গেরুয়া লুঙ্গি। হে-হে মহাশয়গণ, আপনারা তো জানেনই, সাদা ইউনিফর্ম হল অ্যাপ্রেন্টিস সাধুদের ড্রেস, প্রোমোশন পাবার পর তারা গেরুয়া জার্সি পায়। মহাশয়গণ, একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছেন কি, যে ক'জন সন্ন্যাসী টন্ন্যাসী দেখা যাচ্ছে তাদের গা থেকে যেন তেল গড়িয়ে পড়ছে। টের পাওয়া যাচ্ছে, মাকড়ারা তোফা আরামেই আছে এখানে।

প্রথমটা খেয়াল করি নি, এবার হঠাৎ দেখতে পেলাম, দূরে মন্দিরটার গায়ে লাল সিমেন্ট-বাঁধানো হাজার তিনেক স্কোয়ার ফুটের মতো বাঁধানো জায়গা। ওপরে অ্যাসবেস্টসের শেড, কিন্তু চারদিক খোলা। সেখানে চার পাঁচজন সাদা ড্রেস পরা অ্যাপ্রেন্টিস সন্ন্যাসী কোরাসে এক সুরে এক তালে কী যেন গেয়ে যাচ্ছে। সমাজপতি কিছুদিন আগে আমাকে বলেছিলেন, তাঁর গুরুদেবের আশ্রমে অষ্টপ্রহর সংকীর্তন হয়। ডে এ্যাণ্ড নাইট ভক্তির ওয়ার্কশপ চালু রাখার জন্য খুব সম্ভব শিফট ডিউটির ব্যবস্থা আছে। এখন এই দুপুরবেলায় ওই চার পাঁচজন অ্যাপ্রেন্টিসের ডিউটি পড়েছে।

মহাশয়গণ, আপনাবা তো স্টিকিং গামের মতো আমার ঘাড়ের সঙ্গে সর্বক্ষণ জুড়ে আছেন। আপনাদের দেখে মনে হচ্ছে, সমাজপতি গুরুদেবের আশ্রমে ঢুকে কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছেন,আর তাঁর দিকে আপনারা চোখেব তারা সেট করে রেখেছেন। এখানে সবই আছে অথচ কী যেন নেই। আর সেটি না থাকার জন্য গোটা আশ্রমটা কেমন যেন টেস্টলেস আর আলুনি লাগছে!

মহাশয়গণ, আপনারা যে একেকটি কী মাল, আমি জানি, আপনাদের সাইকোলজিটাও বুঝি। আশ্রমের মতো একটা টেরিফিক পবিত্র জায়গায় আপনারা মেয়েমানুষ খুঁজছেন। ফার্স্ট ক্লাস চেহারার কিছু ডাঁটো ইয়াং সন্ন্যাসিনী থাকলে আপনাদের ব্লাড সার্কুলেসন বেড়ে যেত। আপনারা চান আশ্রমেও একটা টেণ্ডার ফেমিনিন টাচ থাকুক। শালা খচ্চরেরা! সব জায়গায় আপনাদের মেয়েমানুষ চাই। মরার পর রৌরব বলে কী একটা নরক-ফরক আছে, স্ট্রেট সেখান থেকে মিউনিসিপ্যালিটির কুকুর-ধরা ভ্যানের মতো একটা ভ্যান এসে টপাটপ সাঁড়াশি দিয়ে আপনাদের ধরে নিয়ে যাবে।

গাড়ি থেকে সমাজপতি আমাকে নিয়ে নেমে পড়েছিলেন। সামনের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বললেন, 'আমার গুরু আচার্য জগৎপতি ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষ। তিরিশ বছর হিমালয়ের গুহায় সাধনা করেছেন।'

'সার্টিফিকেট দেখেছেন?' আচমকা আমার জিভ থেকে শব্দ দুটো বেরিয়ে এল।

'কিসের সার্টিফিকেট?' সমাজপতি দস্তুরমতো অবাক হয়েই আমার দিকে তাকালেন।

'ওই যে উনি সাধনা করেছেন—তার?'

'কে সার্টিফিকেট দেবে?'

'কে আবার, যার সাধনা করেছেন সে দেবে।'

সমাজপতির চোখ একেবারে রাউণ্ড হয়ে গেল, 'সে তো ভগবান—আই মিন গড।'

চোখের পাতাদুটো ঝটপট ড্রপ সিনের মতো বারকয়েক উঠিয়ে নামিয়ে বললাম, 'আমি গডের সার্টিফিকেটের কথাই বলছি।'

সমাজপতি আমার খচড়ামোটা এবার বুঝতে পারলেন। বললেন, 'তুমি একটি সাবলাইম হারামজাদা, আমার গুরুদেবের সামনে একেবারে বদমাইসি করবে না।'

হে-হে মহাশয়গণ, মুখখানা যতটা সম্ভব পবিত্র করে বললাম, 'করব না স্যার। আফটার অল উনি আপনার গুরুদেব।'

'আমার কাছে শুনে তোমাকে উনি ওঁর আশ্রমের কাজে লাগাতে চাইছেন। আমার প্রেসটিজ যেন থাকে।'

'থাকবে স্যার। আপনি তো জানেনই, আপনার প্রেসটিজের জন্যে আমি লাইফ দিয়ে দিতে পারি।'

সমাজপতি একটু ভেবে বললেন, 'দুপুরবেলা ভিড় থাকে না। তাই গুরুদেব তোমাকে এখন নিয়ে আসতে বলেছেন। অন্য সময় এলে ভাল করে কথা বলা যায় না। সকালে আর সন্ধেবেলায় এত শিষ্য-টিষ্য আসে যে কী বলব!'

মহাশয়গণ, তা হলে দেখা যাচ্ছে সমাজপতির গুরুদেবের দুবেলা ভিজিটিং আওয়ার্স। মাঝখানে এই দুপুরবেলাটা ইন্টারভ্যাল।

কথা বলতে বলতে সমাজপতি আমাকে সঙ্গে করে আচার্য জগৎপতি যে বাড়িতে থাকেন, সোজা সেখানে নিয়ে এলেন। বাড়িটা দোতলা, অনেকটা সাঁচী স্তূপের মডেলে তৈরি।

একতলায় জুতো খুলে সিঁড়ি দিয়ে আমরা দোতলায় উঠে এলাম।

মহাশয়গণ, একটা বড় ডিভানের ওপর তিন দিকে ফোমের উঁচু উঁচু নরম তাকিয়ার ভেতর বসে ছিলেন আচার্য জগৎপতি। গুরুদেবদের বয়সের কথা বলতে নেই। তারা নাকি অলমাইটি ভগবানের কনটেমপোরারি। তবে মহাশয়রা, আরো একটা কথা আছে। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, যে সাধুরা হিমালয়ের গুহায় সাধনা করেছে তারা সবাই বলে থাকে তাদের বয়স চারশ পাঁচশ কি হাজার বছর। সাধুদের এজ প্রুফের তো কোনো ব্যবস্থা নেই।

যাই হোক, ভগবান আর মানুষের মাঝখানের মিডলম্যান সমাজপতি এই গুরুদেবটির আগাপাশতলা ঝট করে একবার দেখে নিয়ে আমার মনে হল এর বয়স ষাট থেকে সত্তরের মধ্যে। মাথায় পাটের ফেঁসোর মতো জট-পাকানো চুল, গালে খাপচা খাপচা দাড়ি। গায়ের রংটা এই বয়সেও গন্ধকের রঙের মতো হলদে। চোখদুটো বড় এবং লাল টকটকে। দেখেই টের পাওয়া যায় আচার্য জগৎপতি গাঁজাটা একটু বেশি পরিমাণেই চড়িয়ে থাকেন। পুরনো সিনেট হলের পিলারের মতো হাত-পা। ওয়েট প্রায় দেড় কুইন্টাল। মুখটা লম্বাটে। পরনে মেয়েদের বিকিনির মতো গেরুয়া রঙের নেংটি। চেহারার দিক থেকে গুরুদেব হবার এফিসিয়েন্সি তাঁর আছে। মহাশয়গণ, দুটো সাদা থান-পরা অ্যাপ্রেন্টিস সন্ন্যাসী তাঁর হাত পা ম্যাসাজ করে দিচ্ছিল। যেভাবে তারা ডলাই মলাই করছে তাতে তাগড়া জোয়ান মোষেদেরও

হাড় লুজ হয়ে যাবে।

সমাজপতি স্ট্রেট লম্বা হয়ে শুয়ে জগৎপতির পায়ের ওপর মাথাটা পাক্কা দেড় মিনিট ফেলে রাখল। তারপর উঠে মুখোমুখি একটা বেঞ্চে বসল। ডিভানটার সামনের দিকে শিষ্য বা ভিজিটরদের জন্য অগুনতি বেঞ্চ পাতা।

মহাশয়গণ, সমাজপতি মাকড়াটি আমাকে কিরকম গাড্ডায় ফেলে দিয়েছে একবার ভেবে দেখুন। সে যখন জগৎপতিকে দেড় মিনিট ধরে পেন্নাম ঠুকেছে, আমাকেও তাঁর পায়ের ওপর বডি থ্রো দিতে হল। উঠে বসবার পর জগৎপতি চোখের কোণ দিয়ে কান্নিক মেরে পা থেকে মাথা পর্যন্ত আমাকে একেবারে মেপে নিলেন। তারপন সমাজপতিকে বললেন, 'এই ছেলেটির কথাই তুমি বলেছিলে?'

সমাজপতি জোড় হাতে বাড়ির চাকরের মতো মুখের অ্যাটিচুড করে বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ গুরুদেব।'

মহাশয়গণ, একটা ব্যাপার আপনারা লক্ষ করেছেন কি? সমাজপতির গুরুদেব হল জগৎপতি। নামের মধ্যে কি টেরিফিক একখানা অ্যালিটারেসন রয়েছে, দেখেছেন! একজন হল সমাজের পতি, আরেকজন জগতের পতি। গুরু-শিষ্য মিলে সোসাইটি আর ওয়ার্ল্ডের পতি হয়ে বসে আছে।

জগৎপতি এবার সোজাসুজি তাঁর সার্চ লাইটের মতো চোখদুটো আমার দিকে ফেরালেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি পারবে?'

মহাশয়গণ, জগৎপতির প্রশ্নটা আমি বুঝতে পারি নি। বললাম, 'আপনি কিসের কথা বলছেন গুরুদেব?'

'সমাজপতি তোমাকে কিছু বলে নি?'

এবার আমার মনে পড়ে গেল। বললাম, 'আপনার আশ্রমের ব্যাপারে তো?'

জগৎপতি মাথা নাড়লেন, 'হ্যাঁ।'

আমাদের কথাবার্তার মধ্যে ম্যাসাজ চলছিলই। অ্যাপ্রেন্টিস সন্ন্যাসী দুটো ঘেমে নেয়ে উঠেছিল কিন্তু জগৎপতির কিছুই হচ্ছিল না। তার মাসল আর নার্ভগুলো স্টিলের তৈরি। আমি উত্তর দিতে যাচ্ছিলাম, তার আগেই সমাজপতি আমার পুরনো কথার রেকর্ড বাজিয়ে বলে উঠলেন, 'স্বয়ম্ভু সব পারে গুরুদেব। ওর ব্রেনে প্ল্যানিং কমিশনের পুরো হেডকোয়ার্টারটাই বসানো রয়েছে।'

জগৎপতি চোখ বুজে কিছুক্ষণ পুরো মেডিটেসনের অবস্থায় রইলেন। হয়ত কপালের অদৃশ্য তিন নম্বর চোখ দিয়ে আমার ভেতরটা দেখে নিলেন। তারপর চোখ মেলে বললেন, 'তুমি ঠিক লোককেই নিয়ে এসেছ। ও পারবে। তোমার সিলেকসন ভুল হয় নি।'

হে-হে মহাশয়গণ, গুরুদেবের কথায় একেবারে গলে গেলেন সমাজপতি, 'সবই আপনার কৃপা গুরুদেব। আপনার দয়া ছাড়া একে কখনই পেতাম না।

মহাশয়গণ, ফিল্মস্টার হোক, মিনিস্টার হোক আর এম এল এ, এম পি, ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট-ম্যাজিসিয়ান-পলিটিসিয়ানই হোক, চামচাগিরিতে সবাই খুশি, এমনকি সাধু ফকির নাগা

সন্ন্যাসীরাও ফ্লাটারিতে কাত হয়ে যায়। দেখা যাচ্ছে সব মাকড়াই চামচা চায়। আচার্য জগৎপতি মুখে হাসির জেলি মাখিয়ে শিষ্য সমাজপতিকে একবার দেখলেন। তারপর বললেন,'তুমি কি বৎস স্বয়ম্ভুকে আমার আশ্রমটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিয়েছ?'

সমাজপতি বললেন, 'আজ্ঞে না, সোজা আপনার এখানেই নিয়ে এসেছি।'

বললাম, 'ঘুরিয়ে দেখাবার দরকার নেই। যা দেখবার সব দেখে নিয়েছি। এখানে মন্দির আছে, টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স কেত্তন গাইবার জন্যে অ্যাসবেস্টসের শেড আছে, গেস্ট হাউস আছে। সেই সঙ্গে আরো মাইনর কিছু কিছু জিনিস আছে। তাই না?'

আচার্য জগৎপতি বললেন, 'মোটামুটি সবই প্রায় দেখে ফেলেছ।'

'আমাকে কী করতে হবে সেটা যদি জানিয়ে দ্যান গুরুদেব—'

আচার্য জগৎপতি এবার যা বললেন, সংক্ষেপে এইরকম। ইণ্ডিয়ায় আরো অনেক গুরু আছে। তাদের আছে ইন্টারন্যাশনাল ফেম। আফ্রিকা, আমেরিকা, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া—নানা দেশে তাদের ঝাঁকে ঝাঁকে ডিসাইপল। ইণ্ডিয়া এবং ওয়ার্ল্ডের বড় বড় সিটিতে তাদের আশ্রমের ব্রাঞ্চ রয়েছে। অথচ আচার্য জগৎপতি বেলেঘাটায় এই তিন একর ল্যাণ্ডের ভেতরেই আটকে আছেন। সমাজপতির মতো দু-চারজন বড় ভক্ত তাঁর আছে ঠিকই কিন্তু বেশির ভাগ শিষ্য বাজে লোক, বস্তি কি গ্রামের বাসিন্দা। মোট কথা, গুরু হিসেবে তাঁর গ্লামার নেই। তিনি ফেম চান, গ্ল্যামার চান, ইন্টারন্যাশনাল রেকগনিসন চান। আর এই ব্যাপারে আমার হেল্প তাঁর দরকার।

হে-হে মহাশয়গণ, সমাজপতির গুরুদেব এই মাকড়াটির কারবার দেখুন। হাওয়াই দ্বীপের ছুকরিদের মতো যার কোমরে আড়াই ইঞ্চি গেরুয়া নেংটি, তিরিশ বছর যে হিমালয়ের গুহায় মেডিটেসনে কাটিয়ে এসেছে, ওয়ার্ল্ডের কোনো ব্যাপারে যার অ্যাটাচমেন্ট থাকার কথা নয়, সেই মালটি ফেম চাইছে, গ্ল্যামার চাইছে, ধর্ম বিক্রির জন্য ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট চাইছে। আরো একটা দিকে লক্ষ করুন মহাশয়রা। মর্ডান যোগী টোগীরা আগেকার সেই পর্বত ঋষি, বশিষ্ঠ কি যাজ্ঞবল্ক্য মুনিদের মতো আর ডিস্প্যাসনেট নেই। এখানকার এই মাকড়াদের ভেতর টাফ কমপিটিসান। এ যদি মোম্বাসায় আশ্রম খোলে, ও তা হলে নিউজিল্যাণ্ডে জমি লিজ নেবার জন্য দৌড়য়। একজন আরেক জনের সঙ্গে টেরিফিক একখানা র‍্যাট রেসে নেমে পড়েছে।

আমি পিটার স্বয়ম্ভু হোড়, একজন থার্ড ক্লাস চিট, উৎকৃষ্ট একটি ফোরটোয়েন্টি—খানিক্ষণ চোখের ভুরুদুটোকে এরিথমেটিকের সেকেণ্ড ব্র্যাকেটের মতো করে রাখলাম। তারপর বললাম, 'গুরুদেব, আপনার সারভিসে যদি একটুও লাগতে পারি মরার পর টকাটক স্টেয়ারকেস বেয়ে স্ট্রেট হেভেনে পৌঁছে যাব। কোনো বানচোত ঠেকাতে পারবে না।' বলেই বার ইঞ্চি জিভ বার করে গুরুদেবের পিলারের মতো পা দুটো বুকের কাছে তুলে নিলাম, 'প্রভু, পাপের গারবেজের ভেতর একেবারে ডুবে আছি। জিভ দিয়ে স্লিপ কেটে একটা খিস্তি বেরিয়ে গেছে। সেজন্যে ক্ষমা করুন।'

আচার্য জগৎপতি তাঁর পা-দুটো টানাহ্যাঁচড়া করে ছাড়িয়ে নিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। তুমি যে অনুতপ্ত হয়েছ সেজন্যে আমি খুশি। মানুষ তো ভুল করবেই। তাদের শোধন

কৈরে নেবার জন্যে আমরা আছি।' বলে দাড়িগোঁফ ওলা প্রকাণ্ড মুখে হেভেনলি, শুদ্ধ বাংলায় কী যেন বলে, ও হ্যাঁ—একখানা জমজমাট স্বর্গীয় হাসি ফুটিয়ে তুললেন।

মহাশয়গণ, আপনারা তো আমাকে চেনেন। খিস্তি আওড়াবার জন্য আমি কতটা অনুতপ্ত হয়েছি তাও আপনারা টের পেয়েছেন। যাক গে, মুখে অ্যাঞ্জেলের মতো একখানা ভাব ফুটিয়ে বললাম, 'গুরুদেব, এবার কাজের কথায় আসা যাক—'

আচার্য জগৎপতি টেরিফিক উৎসাহ নিয়ে আমার দিকে ঝুঁকলেন। বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

'তার আগে দু-একটা কথা জানতে চাই।'

'কী কথা?'

'আপনি কী কী ল্যাংগুয়েজ জানেন?'

'ইংরেজি, বাংলা আর হিন্দি।'

'এতেই চলে যাবে।'

মহাশয়গণ, সমাজপতি একধারে বসে আমার দিকে চোখের তারা ফিক্সড করে তাকিয়ে ছিলেন। আচমকা তাঁর চোখ ফ্ল্যাশ লাইটের মতো জ্বলে উঠল। আমার কানের কাছে মুখটা সেট করে জিজ্ঞেস করলেন, 'ব্রেনে কোনো ওয়েভ এসেছে?' মহাশয়গণ, সেই যে একটা প্রোভার্ব আছে না—'সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে' সমাজপতির হয়েছে তাই। আচার্য জগৎপতির সঙ্গে আমার ডায়ালগের স্যাম্পল দেখেই তিনি কিছু একটা সিগনাল পেয়ে গেছেন।

সমাজপতির দিকে চোখ টিপে বললাম, 'মনে হচ্ছে।'

'গুড, ভেরি গুড।'

আমি স্লাইট হেসে আচার্য জগৎপতির দিকে আবার ফিরলাম, 'আপনি ওই তিনটে ল্যাংগুয়েজ জলের মতো বলতে পারেন?'

আচার্য জগৎপতি বললেন, 'বাংলা আর হিন্দিটা পারি। ইংরেজিটা তত ভাল হয় না।'

'একটু ভেবে নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা, আপনার এই আশ্রমে কোনো সন্ন্যাসিনী-টিনী তো চোখে পড়ল না।'

'না। ওসব ঝামেলা আমি রাখি নি। মেয়েমানুষ ঢোকালে আশ্রম একটা প্রবলেমের আড়ত হয়ে উঠবে। তখন সাধনভজন কখন করব, আর কখনই বা ভক্তদের পরকালের কথা ভাবব?'

'বুঝেছি।'

'কী?'

'হাজার রকম প্রবলেমের সলিউসানের জন্যে এখানে আরেকটা 'ইউ এন ও'র হেডকোয়ার্টার বসাতে চান না— এই তো?'

আচার্য জগৎপতি তাঁর দু' পাটি মাড়ি বার করে হাসলেন। ওপরে-নিচে, মহাশয়গণ, তাঁর টোটাল আটখানা দাঁত রয়েছে। বাকি জায়গায় গর্ত। বললেন, 'তোমার কথা শুনে বেশ হর্ষ হয়।'

হে-হে মহাশয়গণ, আমার ডায়ালগ শুনে ওয়ার্ল্ডের এইট্টি পারসেন্ট লোকেরই হর্ষ হয়।

এসব কথা শুনে শুনে আমার কান পচে গেছে। ধর্মগুরু পোপের মতো মুখটা গম্ভীর রেখেই আচার্য জগৎপতির ইন্টারভিউ নিয়ে যেতে লাগলাম। বললাম, 'আপনার কোনো ফরেনার ভক্ত আছে?'

জগৎপতি তাঁর মাথাটা একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে হেলাতে হেলাতে গলায় তিন কে-জি হতাশা ঢেলে বললেন, 'না।'

'ফরনের সঙ্গে আপনার কোনো কানেকসানও নেই?'

'কোথায় আর হল!'

'আপনার আশ্রম থেকে কোনো ম্যাগাজিন বেরোয়?'

'কিসের ম্যাগাজিন?'

'রিলিজিয়াস ম্যাগাজিন। মানে যাতে আপনার বড় বড় স্পিরিচুয়াল বাণী থাকবে, নানা পোজের ছবি থাকবে, এই আর কি—'

'না—' আচার্য জগৎপতি মুখটা টেরিফিক কাঁচুমাচু করে বললেন, 'তেমন কিছু এখান থেকে বেরোয় না। তাতে ক্ষতি হচ্ছে না কি?' শেষ দিকে তাঁকে রীতিমতো উদ্বিগ্ন দেখাল।

মহাশয়গণ, ভয়-উদ্বেগ-দুর্ভাবনা এসব হল আপনাদের মতো ফ্যামিলিম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। কিন্তু চোখের তারা ফিক্সড করে সমাপতির গুরু এই জগৎপতির দিকে স্ট্রেট তাকান। দেখুন সংসার-ছাড়া, শুদ্ধ বাংলায় কী যেন বলে, ও হ্যাঁ—নিরাসক্ত, যোগী, ত্যাগী, আশ্রম-বাসী এই মাকড়াটিও উদ্বেগে দুশ্চিন্তায় কেমন চনমনে হয়ে উঠেছে। বললাম, 'তা স্লাইট হয়েছে।'

ম্যাসাজের কাজটা সমানে চলছিলই। হাসপাতালের এর্মাজেন্সি ওয়ার্ড যেমন দিনরাত খোলা থাকে তেমনি এই ম্যাসাজটাও টোয়েন্টি-ফোর আওয়ার্সই বোধ হয় চলে। জগৎপতি হাতের ইশারায় অ্যাপ্রেন্টিস, সন্ন্যাসী দুটোকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'তুমি কি একটা ম্যাগাজিনের কথা বলছ?'

'ওসব পরে হবে। এখন আমার লাস্ট কোশ্চেনটার উত্তর দিন।'

'কী?'

'আপনার ক্যাপিটাল কিরকম আছে?'

'ক্যাপিটাল বলতে!'

'ক্যাশ—'

জগৎপতি সমাজপতির দিকে চোখের কোণ দিয়ে একবার তাকালেন। ইশারায় জানতে চাইলেন আমাকে উত্তরটা দেওয়া যায় কিনা। মহাশয়গণ, সমাজপতি মাথাটা একটু কাত করে সিগনাল দিলেন, অর্থাৎ আমি যথেষ্টই ডিপেণ্ডেবল। আমাকে বললে ক্ষতির সম্ভবনা নেই। মহাশয়গণ, আচার্য জগৎপতি খানিকটা নিশ্চিন্ত মুখে ফ্ল্যাশ লাইট জ্বালিয়ে দিলেন। বললেন, 'ভক্তরা কিছু কিছু প্রণামী দেয়, তা ছাড়া ইয়ারলি ডোনেশনও আছে।'

বললাম, 'সব মিলিয়ে কি রকম দাঁড়িয়েছে?'

'তেমন আর কোথায়?'

মহাশয়গণ, সমাজপতির সিগনাল সত্ত্বেও জগৎপতি আমাকে যেন হানড্রেড পারসেন্ট ভরসা করে উঠতে পারছিলেন না। বললাম, 'তবু—'

সেই অ্যাপ্রেন্টিস ব্রহ্মচারী দুটো ম্যাসাজ থামিয়ে দিলেও কাছেই বসে ছিল। হাত নেড়ে তাদের চলে যেতে বললেন জগৎপতি। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে হেভেনলি, শুদ্ধ ভাষায় কী যেন বলে—হ্যাঁ, স্বর্গীয় একটু হাসলেন, 'এই পাঁচ সাত লাখ টাকা।'

মহাশয়গণ, এই নেংটি-পরা সন্ন্যাসীটির কারবার দেখুন। বেশি না, মালটি মোটে পাঁচ সাত লাখ টাকার মালিক। জিজ্ঞেস করলাম, 'টাকাটা কোথায় রেখেছেন —ব্যাঙ্কে?'

'না-না, ব্যাঙ্কে রেখে ফেঁসে যাব নাকি? ইনকাম-ট্যাক্সওলারা টের পেয়ে যাবে না?'

হে-হে মহাশয়গণ, সমাজপতি আমাকে কার কাছে এনে ভিড়িয়েছেন, একবার দেখুন। আপনাদের মতো সংসারের পোকা আর অলমাইটি ভগবানের মাঝখানে এই মিডলম্যানটি আশ্রমে থাকলে কী হবে, ইনকাম ট্যাক্স ফ্যাক্সের খরবও রাখে। সাধন-ভজন মেডিটেসনের মধ্যে এত খোঁজ কি করে রাখে জানতে চাইলে আচার্য জগৎপতি বললেন, 'জাগতিক মানুষের কল্যাণের জন্যে আমাকে অনেক কিছু ভাবতে হয়, করতে হয়। তাই পার্থিব ব্যাপারগুলো না জানলে কি চলে!'

চিনে রাখুন মহাশয়গণ, মাকড়াটিকে খুব ভাল করে চিনে রাখুন। ফিউচারে ঢাকনা খুলে সে আরো কী কী ভেলকি দেখাবে আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না। বললাম, 'কিন্তু—'

'কী?'

'প্রণামীর ওপর ইনকাম ট্যাক্স হয়?'

'ওদের বিশ্বাস নেই। গুরু-টুরু মানে না। গোটা দেশটা অধর্ম আর পাপের একটা আড়ত হয়ে উঠেছে।'

'কারেক্ট, কারেক্ট।' চোখের পাতা নাচাতে নাচাতে বলতে লাগলাম, 'এবার বলুন, প্রণামীটা কোথায় রয়েছে?'

'তোমাকে বলতে আপত্তি নেই। আমি যেখানে বসে আছি তার তলায় একটা চোরা কুঠুরি আছে। টাকাটা সেখানেই রেখেছি।'

'আচ্ছা! তা হলে আপনার সাধন-পীঠের ঠিক তলাতেই সেফ ডিপোজিট ভল্ট! ফার্স্ট ক্লাস!'

একটু চুপ।

তারপর মহাশয়গণ, আমিই আবার বললাম, 'আমার ইন্টারভিউ শেষ হয়েছে। আর কিছু জানবার দরকার নেই।'

সমাজপতি তাঁর গলাটা ক্রেনের মতো আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'কী মনে হচ্ছে?'

মহাপুরুষদের পোজে সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে ভরসা দেবার ভঙ্গিতে বললাম, 'দুশ্চিন্তার কিচ্ছু নেই।'

'ব্যাপারটা হোপফুল?'

'টু হানড্রেড পারসেন্ট।'

'ফাইন। এখন কী করতে হবে বল।'

'রাইট নাউ কিছু করার নেই। সব ব্যাপারটা জেনে গেলাম। ইনফ্রাস্ট্রাকচার যা আছে তা খুবই ফেভারেবল। কয়েকটা দিন আমাকে সময় দিন। তার ভেতর আমি প্ল্যানিং, বাজেট, ব্লু-প্রিন্ট সব করে ফেলছি। আমার বেস্ট টেকনিকাল নো-হাউ যা আছে ওতে কাজে লাগিয়ে দেব।'

আচার্য জগৎপতি গলার স্বরে প্যাসিফিক ওসেনের ঢেউ খেলাতে খেলাতে বললেন, 'আমি ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট পাব তো?'

'নিশ্চয়ই।'

সমাজপতি গলায় শরীরের জোর সবটুকু ঢেলে দিয়ে বললেন, 'স্বয়ম্ভু যখন বলেছে তখন আপনি ওয়ার্ল্ডে আন-চ্যালেঞ্জড গুরু হয়ে যাবেন, এটা আমি জোর দিয়ে বলতে পারি। আর কোনো রিলিজিয়াস প্রফেট কম্পিটিসনে আপনার সঙ্গে পেরে উঠবে না।'

হে-হে মহাশয়গণ, এরপর জগৎপতি দু হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে ঝাড়া দশ মিনিট আমাকে বাংলা আর সংস্কৃত ল্যাংগুয়েজের বেস্ট ওয়ার্ডগুলো সাজিয়ে সাজিয়ে আশীর্বাদ করলেন। তারপর বললেন, 'তোমার মতো ধার্মিক আমি বেশি দেখি নি। ধর্মকে চারদিকে ছড়িয়ে দিয়ে পৃথিবীকে পাপমুক্ত হতে সাহায্য কর।'

মহাশয়গণ, মাকড়ার কথাগুলো নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পারছেন। ধর্মকে চারদিকে ছড়ানোর মানে হচ্ছে নিজের ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট তৈরিতে হেল্প করা। মহাশয়গণ, আপনারা তো জানেনই, আমি একজন থার্ড ক্লাস চিট, ফোরটোয়েন্টি, সমাজপতি অবশ্য আদর উথলে উঠলে বলেন, সাবলাইম হারামজাদা বা খচ্চর। আমার জিভে হরদম খিস্তিটিস্তি ফোয়ারার মতে ছুটতে থাকে। মুখটা যে কোনো সময় কাঁচা নর্দমা হয়ে উঠতে পারে। মনে মনে যা বললাম, তার সবগুলো এখানে লিখলে কী সব আইন ফাইন আছে তাতে নির্ঘাত ফেঁসে যাব। মহাশয়গণ, যতই ভদ্রলোকের মুখোস লাগিয়ে পবিত্র পবিত্র ভাব করে থাকুন না, আমি জানি ঐ খিস্তিগুলো আপনারাও জানেন এবং বলার জন্য সর্বক্ষণ আপনাদের জিভ সুড়সুড় করতে থাকে। কিন্তু আপনারা তো আমার মতো খচড়া নন, আপনাদের সোসাল স্ট্যাটাস আছে। ওগুলো তাই উচ্চারণ করতে পারেন না।

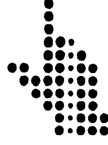
এদিকে সমাজপতি তাঁর গুরুদেবকে বলছিলেন, 'কথা হয়ে গেল। এবার তা হলে আমরা উঠি।'

জগৎপতি দু চোখে আগ্রহের ব্যাটারি চার্জ করে বললেন, 'আবার করে দেখা হচ্ছে?'

সমাজপতি বললেন, 'স্বয়ম্ভু ব্লু-প্রিন্টটা তৈরি করে ফেলুক। তারপর ওকে আবার নিয়ে আসব।'

'আচ্ছা।'

হে-হে মহাশয়গণ, আমরা উঠে বাইরে বেরিয়ে এলাম।



মহাশয়গণ, আচার্য জগৎপতির আশ্রমের বাউণ্ডারি ছাড়িয়ে সমাজপতির দামী ইমপোর্টেড লিমুজিনে করে শেয়ালদার দিকে যেতে যেতে আমাদের মধ্যে কথা হতে লাগল।

সমাজপতি গোটা বডিটাকে ফোমের গদির ভেতর ডুবিয়ে দিয়ে আধশোয়ার মতো করে পড়ে ছিলেন। বললেন, 'গুরুদেব তোমার কাছে একটা কথা গোপন করেছেন।'

মহাশয়রা, আপনারা তো জানেনই আমি কোনো ব্যাপারেই অবাক হই না, কোনো কারণেই নার্ভাস হই না, আমার নার্ভগুলো স্টিলের সরু সরু তার দিয়ে পুরোটাই তৈরি। সামনের উইন্ডস্ক্রিনের বাইরে রাস্তার পাসিং সিনের দিকে তাকিয়ে সমাজপতির সঙ্গে কথা বলছিলাম। এবার আস্তে আস্তে রাইট অ্যাঙ্গেলে ঘাড় ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী?'

সমাজপতি বললেন, 'পাঁচ সাত লাখ টাকার চাইতে বেশিই আছে গুরুদেবের কাছে।'

'টোটাল কত আছে?'

'পঞ্চাশ লাখের মতো হবে।'

মহাশয়গণ, আমার শিরদাঁড়ায় ফোর ফর্টি ভোল্ট বয়ে যাবার কথা। কিন্তু আমি এতটুকু উত্তেজিত বা অস্থির হলাম না। যেন 'এক কাপ চা খাও' কি 'দাঁড়াও একটু পেচ্ছাপ করে আসি' জাতীয় একটা কথা শুনলাম। বললাম, 'তাই নাকি?'

সমাজপতি বললেন, 'হ্যাঁ। তুমি আমার নিজের কনফিডেন্সের লোক, মোস্ট ট্রাস্টেড ফেলো। তোমাকে বলতে আপত্তি নেই। প্রণামীর পাঁচ সাত লাখ টাকা বাদে বাকি টাকাগুলো অবশ্য গুরুদেবের না। সেগুলো আমাদের মতো ওঁর কয়েকজন ভক্তের মানে বুঝতেই পারছ, টাকাগুলো 'শো' করার কিছুটা অসুবিধা আছে, ওগুলো আন-অ্যাকাউন্টেড মানি। তাই গুরুদেবের কাছে রেখে দিয়েছি।' একটু থেমে বললেন, 'ওর মধ্যে আমার আছে দশ লাখ, আই. কে. বাজোরিয়ার পাঁচ, ডি. এন. মেহেতার সাত, অভ্যুদয়ের এগার—এমনি সব।'

বললাম, 'আপনার গুরুটি টেরিফিক—'

'কিরকম?'

'আপনাদের স্পিরিচুয়াল আর মেটিরিয়াল দুই ওয়ার্ল্ডেরই দায়িত্ব নিয়ে বসে আছেন।'

'তবে আর গুরুদেব কিসের? শান্তির জন্যেই তো তাঁর কাছে যাওয়া।'

'একশ বার স্যার। আচ্ছা—'

'বল—'

'এতগুলো টাকা কোথায় রেখেছেন আপনার গুরুদেব আচার্য জগৎপতি? প্রণামীর সঙ্গে তাঁর সাধন-পীঠের তলাতেই কি?

'না।'

'তবে?'

'তুমি একটি সাবলাইম খচ্চর। তোমার সব কিছু জানা চাই। ঠিক আছে, বলেই দিচ্ছি। কিন্তু কারো কাছে 'লিক' করবে না। আমি একাই তো না, অনেকেই এর সঙ্গে ইনভল্‌ভড। আমাদের মধ্যে একটা জেন্টলমেনস এগ্রিমেন্ট রয়েছে। জানাজানি হলে কেউ আর আমাকে বিশ্বাস করবে না। তার ওপর বিপদও আছে।'

'স্যার, আপনি তো আমাকে জানেনই। আমি হলাম একটা সেফ ডিপোজিট ভল্ট। আপনি যা বলবেন তা আমার স্টমাক থেকে কখনো বেরুবে না। আমার ভেতর ঢোকার জন্যে হাজারটা চ্যানেল আছে কিন্তু বেরুবার জন্যে একটাও নেই।'

'জানি জানি, তুমি আশ্রমে ঢুকবার পর একটা ব্যাপার তো মার্ক করেছ।'

'কোন ব্যাপারটা?'

'ঐ যে টোয়েন্টিফোর আওয়ার্স সংকীর্তন চলছে।'

মহাশয়গণ, শুদ্ধ বাংলায় যাকে বলে তৃতীয় নয়ন, আচমকা আমার কপালে সেটা যেন খুলে গেল। বললাম, 'বুঝেছি।'

সমাজপতি কিছুটা অবাক হয়েই আমার দিকে তাকালেন, 'কী বুঝেছ?'

'আপনাদের ঐ ব্ল্যাক মানিটা—স্যরি স্যরি—' আমি পুরো আধ ফুট জিভ কেটে বললাম, 'আপনাদের ওই আন-অ্যাকাউন্টেড টাকাটা নিশ্চয়ই ঐ সংকীর্তনের আসরের তলায় রয়েছে।'

সমাজপতি আমার কাঁধে চাপ দিয়ে বললেন, 'তুমি একটি উৎকৃষ্ট হারামজাদা, হাঁ করলে টের পেয়ে যাও। ঠিক ধরেছ, টাকাটা ঐখানেই আছে। কিন্তু কি করে টের পেলে বল তো?'

'স্যার, এতদিন ধরে আপনার কাছে কাছে থাকছি। আপনার ব্রেনের খানিকটা রেডিও অ্যাকটিভ রে আমার ওপরেও তো এসে পড়েছে।'

সমাজপতি ঠোঁটের ওপর ঠোঁট টিপে ভারিক্কি চালে একটু হাসলেন। বুঝতে পারছি আমার প্রশংসা তাঁর গ্ল্যাণ্ডে সুড়সুড়ি দিয়েছে। যাই হোক, তিনি কিছু বললেন না।

আমি এবার বললাম, 'ওপরে সংকীর্তন, নিচে টাকার মাউন্টেন। কারো ফাদারের ক্ষমতা নেই ধরতে পারে। স্যার, যার মাথা থেকে এই ব্যাপারটা বেরিয়েছে মরার পর তার ব্রেনটা প্রিজার্ভ করা উচিত। আমার কি মনে হয় জানেন স্যার—'

'কী?'

'এটা স্যার আপনার মতো জিনিয়াসেরই কাজ।'

সমাজপতি বাচ্চা ছেলের মতো খিল খিল করে হেসে উঠলেন। বললেন, 'তোমার মতো খচ্চর আমি আর দুটি দেখি নি। ঠিক ধরেছ।'

মহাশয়গণ, সমাজপতির গ্ল্যাণ্ডে তবলার বোল তোলার জন্য আবার বললাম, 'স্যার, আপনার ট্যালেন্টের টাচই আলাদা।'

একসময় আমরা শিয়ালদার মোড়ে এসে গেলাম।

সমাজপতি বললেন, 'এবার তোমার কী প্রোগ্রাম?'

মহাশয়রা, আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে আজ বোদার বিয়ে। মাকড়া আমার জন্য ওয়েট করছে। তা ছাড়া কাল রাত্তিরে সীতা কি হেলেনের মতো কনকচাঁপাকে হরণ করে এনেছি।

তার বাবা নকুলেশ্বর ভিষকরত্ন যা একখানা মাল, হয়ত এর ভেতর একটা ঝামেলা পাকিয়ে বসে আছে। আমার একটু তাড়াতাড়িই আগরপাড়ায় ফেরা দরকার। সেই কথাটা সমাজপতিকে বলতেই কবজি উল্টে তিনি ঘড়ি দেখে বললেন, 'সবে সাড়ে তিনটে, এর ভেতর ফিরবে কি? চল আজকের ব্যাপারটা আগে সেলিব্রেট করা যাক।'

'আজ তো এমন কিছু হয় নি।'

'তুমি আমার গুরুদেবের রেসপনসিবিলিটি নিয়েছ। সেটাই তো একটা সেলিব্রেট করার ব্যাপার। চল হে—'

'কোথায় যাবেন?'

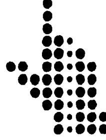
'পার্ক স্ট্রিটে একটা এয়ার-কণ্ডিশানড বার-এ গিয়ে গলাটা একটু ভিজিয়ে নেওয়া যাক।'

'কতক্ষণ লাগবে স্যার?'

'কতক্ষণ আর, পাঁচটা সাড়ে-পাঁচটার মধ্যে তোমাকে ছেড়ে দেব।'

মহাশয়গণ, মনে মনে ভেবে দেখলাম, ছ'টায়ও যদি সমাজপতির হাত থেকে ফ্রি হয়ে যেতে পারি সাড়ে সাতটার মধ্যে আগরপাড়া পৌঁছে যাব। ততক্ষণে নিশ্চয়ই বোদার বিয়েটা কমপ্লিট হয়ে যাবে না। বললাম, 'ঠিক আছে স্যার, পার্ক স্ট্রিটেই চলুন।'

লিমুজিন বাঁ দিকে ঘুরে সারকুলার রোড ধরে তেলের মতো গড়িয়ে যেতে লাগল।



মহাশয়গণ, পার্ক স্ট্রিটের টেরিফিক আরামদায়ক এয়ার-কণ্ডিশানড একটা রেস্তোরাঁয় বসে স্টমাকে চার পেগ হুইস্কি স্টোর করে কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে সাতটায় আগরপাড়ার ব্যারাকবাড়ির কাছে পৌঁছে গেলাম।

মহাশয়বা, বাড়িটা প্রথমে চিনতে পারছিলাম না। চার পেগ হুইস্কি আমার মাথায় রবিশঙ্করের সেতার বাজিয়ে যাচ্ছিল। বার কয়েক চোখ রগড়ে দেখলাম, ঠিক জায়গাতেই এসেছি।

কিন্তু আট ঘন্টা আগে যখন আমি কলকাতায় যাই তখনকার ব্যারাকবাড়িটা যা ছিল তার সঙ্গে এই সাতটা তিরিশ মিনিটের ব্যারাকবাড়ির এতটুকু মিল নেই।

মহাশয়গণ দেখুন, খুব ভাল করে চোখের তারা ফিক্সড করে লক্ষ করুন। বাড়িটাকে নিশ্চয়ই আপনারাও চিনতে পারছেন না। পঞ্চানন মাকড়া এই ক'ঘন্টার মধ্যে মিরাকল ঘটিয়ে ছেড়েছে। চারদিকে হাজার হাজার লাল-নীল সবুজ-হলুদ টুনি লাইট দিয়ে গোটা বাড়িটা সাজানো। সামনে মেইন গেটের একধারে উঁচু সামিয়ানা খাটিয়ে সানাই বসানো হয়েছে। আরেক ধারে বসেছে গোটাকতক মাইক। পাল্লা দিয়ে একবার সানাই বাজছে, তারপরেই সেটা থামিয়ে দিয়ে মাইক থেকে হিন্দি ফিল্মের রগরগে গান সেকেণ্ডে হাজার কিলো মিটার স্পিডে বেরিয়ে এসে কানের পর্দায় ড্রিলিং মেসিন চালিয়ে দিচ্ছে। একধারে ফুলপাতা দিয়ে সাজানো বিরাট একখানা

হুড-খোলা ইমপোর্টেড আমেরিকান গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। হে-হে মহাশয়গণ, আপনারা নিশ্চয়ই টের পাচ্ছেন ওটায় করে এক চক্কর ঘুরে এসে বিয়ের পিঁড়েতে চড়বে বোদা। পঞ্চাননটা টেরিফিক। মহাশয়রা, কয়েক ঘন্টার ভেতর মাকড়া অ্যারেবিয়ান নাইটসের গপ্পে কী সব কারবার আছে না, তাই করে বসে আছে।

সানাই-মাইক, বরের গাড়ি, আলো-ফালো ছাড়া আর যা চোখে পড়ছে তা হল মানুষের গিজগিজে ভিড়। পঞ্চানন শালা বোধ হয় হোল এরিয়ার কাউকে আর বাদ রাখে নি, সবার হাতেই একটা করে ইনভিটেসন কার্ড ধরিয়ে দিয়েছে।

মহাশয়গণ, আর দেরি করলাম না। লম্বা লম্বা পা ফেলে ব্যারাকবাড়ির উঠোনে ঢুকে পড়লাম। আর ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখের তারা হাইজাম্প করে স্ট্রেট কপালে উঠে গেল। উঠোনটার সেভেনটি ফাইভ পারসেন্ট এরিয়া জুড়ে দুর্দান্ত একটা প্যাণ্ডেল তোলা হয়েছে। লাল-নীল-হলুদ-সবুজ, নানা রঙের কাপড় কুঁচিয়ে সেটার চারদিকে হাজার টাইপের নকশা। চারপাশে চমৎকার ঝালর ঝুলছে। নিচে জুটের ম্যাট পেতে তার ওপর হাজার তিন চারেক চেয়ার পাতা, চেয়ারগুলোর সামনের দিকে লম্বা টেবিলের রো চলে গেছে। টেবলগুলোর ওপর রোল-করা কাগজ বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্যাণ্ডেলের সিলিং থেকে চারপাশে কারুকাজ-করা অগুনতি শ্যাণ্ডেলিয়ার ঝুলছে।

প্যাণ্ডেলের আরেক দিকে অনেকটা জায়গা ফাঁকা। সেখানে চৌকোমতো একটা এক্সট্রা শামিয়ানা খাটিয়ে বিয়ের আসর অর্থাৎ ছাঁদনাতলা বানানো হয়েছে। আরেকটা ব্যাপার মহাশয়গণ, চোখে দেখতে পাচ্ছিলাম না কিন্তু বেশ ভালভাবেই টের পাচ্ছি। পোলাও, কালিয়া, রোস্ট, ফ্রাই ইত্যাদির জমজমাট গন্ধ বাতাসে ফিক্সড হয়ে আছে। বিয়েবাড়ির রান্নাবান্না খুব কাছাকাছিই কোথাও হচ্ছে। মহাশয়গণ, গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে আমার কী মনে হচ্ছে জানেন? পঞ্চা হারামী ফোরটিনথ সেঞ্চুরির মোগল বাদশাদের বারটা রসুইখানার সঙ্গে তেত্রিশটা ফাইভ স্টার হোটেলের কিচেন এনে আগরপাড়ার এই ব্যারাকবাড়িতে বসিয়ে দিয়েছে।

হে-হে মহাশয়গণ, প্যাণ্ডেলের ভেতরটাও মানুষে বোঝাই। ছেলে-বুড়ো যুবক-যুবতী লেণ্ডিগেণ্ডি বীজাণুর মতো চারদিকে কিলবিল করছে।

প্রথমটা আমাতে কেউ লক্ষ করে নি। তারপরেই কে যেন দেখে ফেলে গলা ফাটিয়ে স্লোগান হাঁকলো, 'পিটার স্বয়ম্ভু—'

অমনি কয়েক হাজার লোক চেঁচিয়ে উঠল, 'জিন্দাবাদ—'

'পিটার স্বয়ম্ভু—'

'যুগ যুগ জীয়ে।'

'পিটার স্বয়ম্ভু—'

'যুগ যুগ জীয়ে।'

হে-হে মহাশয়গণ, আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, এই মাকড়ারা কেন এরকম গলার শির ছিঁড়ে চেঁচাচ্ছে। আপনাদের চোখমুখের চেহারা দেখে মনে হচ্ছে বুঝতে পারছেন না। আরে মহাশয়রা, এই যে বিয়ের অ্যারেঞ্জমেন্টটা করেছি, তাতে এক পেট ফার্স্ট ক্লাস পোলাও

ফোলাও খেতে পাবে, তার জন্যই এত জয়ধ্বনি। নোট ছাপলো নাসিক প্রেস। সেই নোট সমাজপতির হাত ঘুরে এল আমার কাছে। আসলে ওটা তো পিপলেরই প্রপার্টি। পিপলের টাকা পিপলের বিয়েতে খরচ হচ্ছে অথচ ফোকটে আমি 'জিন্দাবাদ' আর 'যুগ যুগ জীয়ে'গুলো পেয়ে যাচ্ছি। মহাশয়গণ, আপনাদের দেখে টের পাচ্ছি, হিংসেয় জ্বলে যাচ্ছেন। কিন্তু কী করা যাবে! আপানারা তো জানেনই আমি একটা থার্ড ক্লাস চিট' একজন উৎকৃষ্ট ফোরটোয়েন্টি। তবু যদি পিপল আমার নামে 'যুগ যুগ জীয়ে'র স্লোগান দেয়, কী করতে পারি!

স্লোগানের তোড় কমলে পঞ্চানন আর সুমনা কোত্থেকে দৌড়তে দৌড়তে আমার দু'ধারে এসে দাঁড়িয়ে গেল। তার আগেই অবশ্য প্যান্ডেলে যারা ঘোরাঘুরি করছিল আমার চারপাশে সার্কেল করে দাঁড়িয়ে গেছে।

পঞ্চানন বলল, 'কখন এলেন স্যার?'

বললাম' 'এই মাত্র।'

অরেঞ্জমেন্ট কেমন দেখছেন?'

'ফাইন। তুই একটা ডেঞ্জারাস হারামী।'

আদর করে পঞ্চাননের নাকে একটা টুসকি মেরে বলতে লাগলাম, 'তোর যা অর্গানাইজেসানেল পাওয়ার, যে কোনো পলিটিক্যাল পার্টি তোকে পেলে কাঁধে করে নিয়ে গিয়ে প্রেসিডেন্ট বানিয়ে দেবে। এমনিতে পঞ্চাননকে 'তুমি' করে বলি। কিন্তু তার এফিসিয়েন্সি দেখে প্রোমোশন দিয়ে 'তুই'তে নামিয়ে দিলাম।

ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে পঞ্চানন একেবারে গলে গেল, 'কি যে বলেন স্যার, আপনার বাঁ পায়ের নখের ভেতরকার ধুলো হবার এফিসিয়েন্সি আমার নেই।'

মহাশয়গণ, মালটি কিরকম খলিফা একবার বুঝুন। আমাকে তোল্লা দিয়ে ওপরে রাখতে চাইছে। যাক গে, আমি একেবারে অন্য লাইনে চলে গেলাম, 'পুরু রেডি?'

'রেডি স্যার। সাড়ে সাতটার ভেতর এসে পড়বে।'

'ম্যারেজ রেজিস্ট্রার?'

'রেডি স্যার। সাতটা কুড়িতে আসবে।'

'বোদা আর কনকচাঁপার বিয়ের ড্রেস ঠিক করে এনেছিস?'

পঞ্চানন ঘাড়টা এক মিটার হেলিয়ে দিয়ে বলল, 'ওটা কখনও ভুল হয় স্যার! বিয়ের পিঁড়েতে চড়াতে গেলে ড্রেসটাই আগে দরকার।'

'গুড।' একটু ভেবে জিজ্ঞেস করলাম, 'চারপাশের সবাইকে ইনভাইট করেছিস?'

'করেছি স্যার, শুধু একজন বাদ।'

'কে?'

'নকুলেশ্বর কবরেজ। সকালবেলা আপনার সঙ্গে কথা হবার পর শুনলাম, আপনারা কাল রাত্তিরে ওর মেয়েকে সীতাহরণ করে এনেছেন। ভাবলাম খচড়াটাকে নেমন্তন্ন করতে গিয়ে যদি গাড্ডায় পড়ে যাই! ঠিক করি নি?'

মহাশয়গণ, পঞ্চাননের মাথায় গারবেজ পোরা নেই। কিছু ভাল জিনিসই রয়েছে। বললাম,

'হাণ্ড্রেড পারসেন্ট ঠিক। তুমি যা মাল, ঠিক না করে পার। আচ্ছা—'

'কী?'

'নোকলে কোনো ব্যাগোরবাই করে নি তো? মানে থানা-পুলিশ সেট করে দ্যায় নি?'

'এখন পর্যন্ত কিছু করে নি।'

'ঠিক আছে, এখানে আর দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না। একসঙ্গে প্রেসিডেন্ট আর প্রাইম মিনিস্টার হওয়ার মতো তুই একই সঙ্গে বরকর্তা আর কন্যাকর্তা, অনেক রেসপনসিবিলিটি তোর। যা, কেটে পড়—'

যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে গেল পঞ্চানন। বলল, 'আরেকটা কথা—'

'কী?'

'খাওয়া-দাওয়ার যা অ্যারেঞ্জমেন্ট হয়েছে তাতে আরো তিরিশ চল্লিশ হাজার লাগবে।'

'আরো তিন লাখ লাগা না, আই ডোন্ট কেয়ার। ইংলন্ডের রানীর করোনেসনের সময় যে খানাপিনা হয়েছিল আমি সেই মেনু চাই। কোনো শালা খাওয়ার পর যদি স্ট্রেট হেঁটে বাড়ি ফেরে বুঝব তোকে দিয়ে গ্রেট কিছু হবে না।'

'দেখে নেবেন স্যার—' পঞ্চানন দাঁত বার করল, তারপর বড় বড় পা ফেলে তড়বড়িয়ে চলে গেল।

মহাশয়গণ, এতক্ষণ পঞ্চাননের জন্য কিছু বলতে পারছিল না সুমনা, এবার চান্স পেল। বলল, 'একবার আমাদের ঘরে চলুন।'

বললাম, 'কেন?'

'কনকচাঁপা আপনাকে একটা প্রণাম করবে। ও বলে রেখেছিল, আপনি ফিরলেই যেন ধরে নিয়ে যাই।'

মহাশয়গণ, আপনারা তো জানেনই আমি একজন চিট, প্রতারক, ফোরটোয়েন্টি এবং বেজন্মা। লোকে আমাকে ঘেন্না করবে, গায়ে থুতু দেবে, এটাই হল নিয়ম। এগুলো আমি বুঝতে পারি। কিন্তু কেউ প্রণাম করবে শুনলেই আমার নার্ভগুলো কুঁকড়ে যায়, ভীষণ বিশ্রী লাগে। বললাম, 'আমাকে আবার এসব ঝামেলার ভেতর ফেলছ কেন?'

সুমনা কোনো কথা শুনল না, একরকম জোর করেই টানতে টানতে তাদের ঘরে নিয়ে গেল।

অন্য দিন ব্যারাকবাড়ির ঘরে ঘরে হেরিকেন কি কেরোসিনের লম্ফ জ্বলে। আজ সব ঘরেই ইলেকট্রিক বালব জ্বলছে।

মহাশয়গণ, এর আগে কনকচাঁপাকে বার দুয়েক দেখেছি। আপনাদের বলেছিও মেরিলিন মনুরোর সঙ্গে হেমা মালিনীকে পাঞ্চ করলে যা দাঁড়ায় তাই হল কনকচাঁপা। এখন তার গায়ে যদি লাল বেনারসী, চন্দন, আর দামী দামী সেটিং-এর কাজ করা গয়না চাপানো যায় কিরকম দাঁড়ায় ভেবে দেখুন। ওকে এখন দেখলে ফুটপাথের হারামী ছোকরা থেকে মেডিটেসন সেন্টারের গুরু পর্যন্ত সব মাকড়ার মাথা রিল করতে থাকবে। ঘরের একটা বাল্ব চোখের সামনে চারটে হয়ে যাবে।

কনকচাঁপা ঘরের মাঝখানে একটা খাটের ওপর বসে ছিল। তাকে ঘিরে ছিল বেঁটে, মোটা,

ট্যারা, লম্বা, চৌকো, কিশোরী, যুবতী, মিডল-এজেড—এমনি নানা সাইজের, নানা বয়সের, নানা চেহারার কয়েক ডজন মেয়ে এবং মেয়েমানুষ।

আমি দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই কনকচাঁপা উঠে এসে আমার দুই পায়ের ওপর মাথা দিয়ে অনেকক্ষণ পড়ে থাকল। টেরিফিক অস্বস্তি হচ্ছিল আমার। পায়ের পাতা সুড়সুড় করছিল।

হে-হে মহাশয়গণ, কারো কারো পায়ে আমি স্ট্রেট ডাইভ খেয়ে পড়েছি কিন্তু বোদা ছাড়া আমার পায়ে কাউকে আঙুল ঠেকাতে দিই নি। তবে সৃমনা আমার পায়ে কখনও হাত দিয়েছে কিনা, এই মুহূর্তে মনে করতে পারছি না। হ্যাবিট তো নেই, প্রণাম করলে কী বলতে হয় তাও জানি না। ঝুঁকে কনকচাঁপাকে পায়ের কাছ থেকে তুলতে তুলতে বললাম, 'বোদা এতদিন আমার পার্টনার ছিল, এবার তোমার পার্টনার হবে। বাকি লাইফটা যুগলবন্দি হয়ে অর্কেস্ট্রা বাজিয়ে যাও।' বলে আর দাঁড়ালাম না। সোজা নিজের ঘরে চলে এলাম।

মহাশয়গণ, আমার ঘরেও ইলেকট্রিক লাইট জ্বলছিল। দেওয়ালগুলো লাল নীল টুনি লাইটের মালা দিয়ে সাজানো হয়েছে। তার মাঝখানে বসে আছে বোদা।

হে-হে মহাশয়গণ, বোদাকে আজ আর চেনা যাচ্ছে না। ঘাড়ের কাছে ইংরেজি 'ইউ'র মতো শেপ করে চুল ছেঁটেছে, সরু করে গোঁফ রেখেছে। তার গায়ে এখন জলচুড়ি বসানো কুঁচনো ধুতি, গরদের পাঞ্জাবি, সোনার বোতাম, আংটি, বাঁ হাতে দামী রোলেক্স ঘড়ি, কপালে চন্দন, গলায় মোটা যুঁইয়ের মালা।

বোদাকে ঘিরে বসে ছিল ব্যারাকবাড়ির এবং আশেপাশের অনেকগুলো ছোকরা। তাদের গায়ে বরযাত্রীর ইউনিফর্ম মানে ধুতি পাঞ্জাবি-টাঞ্জাবি চড়ানো রয়েছে। বললাম, 'টেরিফিক মাঞ্জা চড়িয়েছিস দেখছি।'

বোদা ভিড়ের ভেতর থেকে উঠে এসে একটু আগে কনকচাঁপা যা করেছিল ঠিক তেমনি করে স্ট্রেট আমার পায়ে বডি থ্রো দিল। মাথাটা দু পায়ের ওপর রেখে দু মিনিট সিনেমার ফ্রিজ শটের মতো পড়ে রইল। তারপর উঠে বলল, 'গুরু, সব তোমার জন্যে। তুমি না থাকলে এ বিয়ে কোনোদিন হত না। আমাকে শালা রাস্তায় রাস্তায় পাছায় তবলা বাজিয়ে লাইফ কাটিয়ে দিতে হত।' বলে দুই ঠোঁট ফাঁক করে বত্রিশখানা হারমোনিয়ামের রিড বার করল। তার চোখেমুখে যা ফুটে উঠেছে শুদ্ধ বাংলায় তাকে বলে কৃতজ্ঞতা।

হে-হে মহাশয়গণ, আপনাদের অনেক বার জানিয়েছি এই কৃতজ্ঞতা-টৃতজ্ঞতা ব্যাপারগুলো আমার কাছে একেবারে অচেনা, কমপ্লিটলি আননোন। এতকাল এ সবের কাছ থেকে ঝাড়া দুহাজার কিলোমিটার দূরে থেকেছি। যাক গে, কিছু না বলে আলতো করে বোদার ঘাড়ে একটা টুসকি মারলাম।

বোদা আবার বলল, 'গুরু, তুমি শালা যা কারবার করেছ, আমি তো স্রেফ ট্যারা হয়ে যাচ্ছি। রাজার ছেলেদেরও এরকম রেলা দিয়ে বিয়ে হয় না।'

আমি হাসলাম, 'বলছিস!'

'হ্যাঁ, গুরু।'

আমাদের কথার ভেতরেই পঞ্চানন দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। জিরাফের মতো গলা বাড়িয়ে বলল, 'স্যার সাতটা পঁয়তাল্লিশে লগ্ন। এখন বর নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হবে। আমি গিয়ে মেয়েদের পাঠিয়ে দিচ্ছি—'

হে-হে মহাশয়গণ, আপনাদের নিশ্চয়ই সেই ব্যাপারটা মনে আছে। বোদা বলেছিল, এঘর থেকে বেরিয়ে উঠোনে নেমে বিয়ের পিঁড়েতে চড়বে না। সাজানো গাড়িতে করে একটা চক্কর মেরে এসে তবে ছাঁদনাতলায় 'ইন' করবে। বললাম, 'ও-কে, পাঠিয়ে দে।'

ছ' মিনিটের ভেতর একগাদা নানা বয়সের এবং নানা সাইজের মেয়ে এসে উলু দিয়ে শাঁখ বাজিয়ে কানের পোকা নড়িয়ে দিল। তারপর বোদার হাতে টোপর দর্পণ ধরিয়ে রাস্তায় সেই গাড়িটা পর্যন্ত পৌঁছে দিল।

মহাশয়গণ, পঞ্চাননের কাজের ভেতর কোনোরকম ফাঁক নেই। মাকড়া ছোট সাইজের এক নিতবরও যোগাড় করে এনেছে। বোদার সঙ্গে সেও গাড়িতে উঠল।

বোদার সঙ্গে আমার যাবার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু সবাই জোর করে তুলে দিল। তিনজন ওঠার পর গাড়িতে যে জায়গা ছিল সেটা আরো কয়েকজন উঠে ফিল-আপ করে ফেলল। আরেক ঝাঁক উলু, শাঁখের আওয়াজ আর মাইকে সানাইয়ের ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিকের মধ্যে আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

হে-হে মহাশয়গণ, যে গাড়িটায় করে আমরা যাচ্ছি সেটা দারুণ। মনে হচ্ছে তেলের মতো চাকা গড়িয়ে যাচ্ছে। এতটুকু জার্ক নেই, ঝাঁকুনি নেই। তার ওপর ডেকরেসনের টাটকা ফুল থেকে ফাইন গন্ধ ভেসে আসছে। বোদাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কিরকম লাগছে রে মাকড়া?'

বোদা বলল, 'গুরু, আমি এখন ড্রিমের ভেতর আছি। কথা বলে কিচাইন কোরো না।'

আমি পা বাড়িয়ে আদরের ভঙ্গিতে একটা লাথি হাঁকালাম।

বি টি রোডে আধ ঘন্টা ঘুরে যখন ব্যারাকবাড়িতে ফিরে এলাম, দেখি গেটের কাছে কয়েক ডজন মেয়ে দুটো রো'তে ভাগ হয়ে বরকে বরণ করার জন্য 'গার্ড অব অনার'-এর স্টাইলে দাঁড়িয়ে আছে।

আমরা নেমে পড়লাম। আর মহাশয়গণ, তখনই চোখে পড়ল, নকুলেশ্বর কবিরাজ রাস্তা থেকে গেটের দিকে এগিয়ে আসছে। তার পেছনে তার পুরো ব্যাটিলিয়ান, অর্থাৎ সেই 'আবার খাব' সন্দেশের দল।

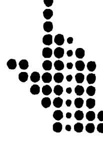
বোদা সট করে আমার পেছনে এসে পিঠের সঙ্গে সেট করে গেল। বলল, 'গুরু, আমি ফিনিশড। নোকলে কবরেজ এসে গেছে!'

বললাম, 'বি স্টেডি।'

ততক্ষণে নকুলেশ্বর ভিষকরত্ন আরো কাছে চলে এসেছে।

॥ দ্বিতীয় পর্ব সমাপ্ত ॥

আমাকে দেখুন
তৃতীয় পর্ব



হে-হে মহাশয়গণ, নকুলেশ্বর ভিষকরত্ন, মানে নোকলে কবরেজকে এই মোমেণ্টে এখানে দেখব, ভাবতে পারি নি। মাকড়ার টাইমিং সেন্সটা একবার দেখুন। এক সেকেণ্ড আগেও নয়, এক সেকেণ্ড পরেও নয়, বোদাকে নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে প্রসেসান করে ছাঁদনাতলার দিকে পা বাড়াতে যাব, সেই সময় খচড়া সিনে 'ইন' করেছে। কিন্তু মহাশয়গণ, আপনারা তো জানেনেই, কোনো কারণেই আমি ঘাবড়াই না, কোনো ব্যাপারেই আমার নার্ভ এতটুকু উইক হয় না। চোখের তারা ফিক্সড করে ওদের ওয়াচ করতে লাগলাম।

নোকলে কবরেজ তার লাইট ইনফ্যান্ট্রি সুদ্ধু কয়েক সেকেণ্ডের ভেতর আমার সামনে এসে পড়ল। আর তখনই ঝট করে একটা কথা মনে পড়ে গেল। বোদার বিয়েটা কিচাইন করার জন্য খচ্চরটা পুলিশ-টুলিশ নিয়ে আসে নি তো? জিওগ্রাফি ক্লাসের গ্লোবের মতো মাথাটা এক রাউণ্ড ঘুরিয়ে চারদিক দেখে নিলাম। না, হাফ কিলোমিটারের ভেতর কোথাও পুলিশ নেই।

নোকলে কবরেজ তার ঘোলাটে চোখে নাইনটিন টুয়েলভ মডেলের রোল্ড গোল্ডের ডাঁটিভাঙা গোল চশমা ঝুলিয়ে স্ট্রেট আমার চোখের দিকে তাকাল। পার্মানেণ্ট সর্দি-বসা ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, 'লোকের কাছে ঘুন্টির বিয়ের খবর পেয়ে দেখতে এলাম।'

ঘুন্টি মানে কনকচাঁপা। নোকলে কবরেজের দিকে আমিও তাকিয়ে ছিলাম। বললাম, 'আপনি না এলে কখনও চলে! আফটার অল, আপনি হলেন গিয়ে কনের ফাদার।'

'শুনলাম হোল এরিয়ার সব লোককে নেমন্তন্ন করা হয়েছে। আমি আর আমার ফ্যামিলি বাদ পড়লাম কেন?'

দেখুন মহাশয়গণ, মালখানাকে একবার আগা-পাশ-তলা মার্ক করুন। মেয়ের বিয়ের ইনভিটেশন পায় নি বলে শালা কেমন চার্জ করছে! বললাম, 'স্লাইট অসুবিধে ছিল।' মনে মনে বললাম, 'তুমি যা একখানা চিজ, আগে থেকে জানাই আর তুমি শালা ম্যারেজটার বারটা বাজাও।'

'আমার মেয়ের বিয়ে, আর আমিই নেমন্তন্নর লিস্ট থেকে বাদ! চমৎকার।' নোকলে কবরেজের গলার স্বর থকথকে কফের ভেতর দিয়ে রাস্তা করে বেরিয়ে আসতে লাগল।

আমি কী বলতে যাচ্ছিলাম, তার আগেই নোকলে কবরেজ বলে উঠল, 'তা ঘুন্টির বিয়ের কী ব্যবস্থা হয়েছে?'

বললাম, 'নিজের চোখেই সব দেখবেন চলুন—'

'ঠিক আছে। ব্যবস্থায় এতটুকু গোলমাল থাকলে আমি কিন্তু কোনো শালাকে ছাড়ব না। হাজার হোক, আমার পয়লা নম্বর মেয়ের বিয়ে।'

শুনুন মহাশয়গণ, শুনুন। শালার মেয়েকে মাঝরাতে আপনাদের উইটনেস রেখে কিডন্যাপ করে নিয়ে এলাম। তারপর মহাভারতের কেষ্টর মতো একশ আটটা ফলস নাম নিয়ে

সমাজপতির যে ব্ল্যাক মানি একশ আটটা ব্যাঙ্কে রেখেছিলাম সেগুলো থেকে এনতার চেক কেটে বিয়ের এই ব্যবস্থা করেছি। নোকলে মাকড়া এতদিন গলা দিয়ে এতটুকু আওয়াজ বার করে নি। এই ব্যারাকবাড়ি থেকে পাঁচশ মিটারের ভেতর থাকে খচ্চরটা। কিন্তু মহাশয়গণ, আপনারা তো আগাগোড়া সব মার্ক করে যাচ্ছেন। কনকচাঁপাকে কিডন্যাপ করেছি রাত্তিরে। তারপর ফর্টি এইট আওয়ার্স পার হয়ে গেছে। ফর্টি এইট আওয়ার্স মানে পাক্কা দুটো দিন। এর মধ্যে নোকলে কবরেজকে একবারও মেয়ের খোঁজ করতে দেখেছেন! এখন সব হয়ে যাবার পর হারামি লম্বা-চওড়া বুকনি ঝাড়ছে। বললাম, 'অ্যারেঞ্জমেন্টে ফাঁক থাকলে আমাকে মাইরি ফায়ারিং স্কোয়াডে নিয়ে গুলি করে মারবেন।'

গলার ভেতর শ্লেষ্মাজড়ানো একটা শব্দ করে নোকলে কবরেজ বলল, 'ঠিক আছে, নিজের চোখে সব দেখে নিই। হ্যাঁ, আসল কথাই তো জিজ্ঞেস করা হয় নি।'

'কী কথা?'

'কার সঙ্গে ঘুন্টির বিয়ে হচ্ছে? ছোকরাটা কে?'

কড়া অ্যাডহেসিভ দিয়ে কাগজে সাঁটার মতো বোদা আমার পিঠের সঙ্গে জুড়ে ছিল। তাকে টানা-হ্যাঁচড়া করে সামনের দিকে নিয়ে এলাম। বললাম, 'একে তো আপনি চেনেন। সেদিন আপনার বাড়ি নিয়েও গিয়েছিলাম।'

বাইফোকাল লেন্সের ওপর এবং নিচ দিয়ে বারকতক বোদাকে দেখল নোকলে কবরেজ। তারপর বলল, 'অঃ, সেই ছোকরাই তা হলে! এই জিনিসটাকে আগে দেখেছি। ঘুন্টির পেছনে অনেক দিন লেগে ছিল। তা সেদিন কথা হয় নি, ছোকরা করে কী?'

নোকলে কবরেজের হাবভাব বা ডায়ালগ শুনে প্রথম থেকেই মনে হয়েছে বিয়েতে বাগড়া দিতে আসে নি। ভেতরে ভেতরে খানিকটা রিলিফ ফিল করলাম। বললাম, 'বোদা আমার পার্টনার।'

'ও সব বুঝি না। কাজকর্ম কী করে সেটাই জানতে চাইছি।'

'বোদা পার্ট টাইম ফোরটোয়েন্টি আর পার্ট টাইম জোকার।'

নোকলে কবরেজের ঘোলাটে চোখ কয়েক সেকেণ্ড পুরো গোল হয়ে রইল। তারপর সে বলল, 'এতে কী রকম ইনকাম-টিনকাম হয়?'

বিরাট প্যাণ্ডেল, বর আনার জন্য ভাড়া-করা সাজানো লিমুজিন, এট্‌সেটেরা দেখিয়ে বললাম, 'যা ইনকাম হয় তাতে এরকম রেলা দিয়ে বিয়ে করা যায়।'

খানিকক্ষণ হাঁ করে থেকে নোকলে কবরেজ বলল, 'অ।'

এরপর কয়েক সেকেন্ড স্পিকটি নট হয়ে রইল সে। আবার যখন কিছু বলতে যাবে সেই সময় বললাম, 'রাস্তায় দাঁড়িয়ে কতক্ষণ ইন্টারভিউ নেবেন? আর দেরি করলে বিয়ের লগ্ন স্লিপ করে বেরিয়ে যাবে।'

'অ। তা হলে ভেতরেই যাওয়া যাক।'

মহাশয়গণ, আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছি তার কয়েক ফুট দূরে ব্যারাকবাড়ির গেট। গেটের মাথায় দুর্দান্ত একখানা নহবতখানা বসিয়েছে পঞ্চানন। সেখানে হ্যারিসন রোড থেকে

সব চাইতে দামী সানাই পার্টি এনে সেট করে দিয়েছে। ভোররাত থেকে সানাইওলারা রিলে রেসের মতো একের পর এক বাজিয়ে চলেছে।

নহবতখানার কাছে এসে নোকলে কবরেজকে বললাম, 'আপনার মেয়ের বিয়েতে সানাই বসেছে। অ্যারেঞ্জমেন্টটা কি রকম লাগছে?'

ঘাড়টা পঁচিশ সেন্টিমিটার বাঁয়ে হেলিয়ে নোকলে কবরেজ বলল, 'মন্দ নয়।'

মহাশয়গণ, আমাদের সঙ্গেসঙ্গে বারকয়েক তো আপনারা নোকলের বাড়িঘর, সোসাল স্ট্যাটাস—সব দেখে এসেছেন। মেয়ের বিয়েতে সানাই বসাবার কথা ওর ফোরটিন জেনারেসন ভাবতে পারে? অথচ মাকড়াটা হিজ হাইনেস দি মহারাজা অফ কাপুরতলার মেজাজে বলল, 'মন্দ নয়!'

নহবতখানার তলা দিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকবার মুখে আচমকা পাক্কা এক ব্যাটালিয়ান মেয়ে চেঁচিয়ে হইচই বাঁধিয়ে এক টেরিফিক কাণ্ড বাধিয়ে দিল, 'বর এসে গেছে রে, বর এসে গেছে—' তারপরেই বেঁটে লম্বা মোটা চৌকো সিড়িঙ্গে হাড়গিলে-মার্কা যুবতী মিডল-এজেড—এমনি নানা সাইজের নানা শেপের নানা বয়সের ঝাঁক-ঝাঁক মেয়ের রেজিমেন্ট দৌড়ে এল। তাদের কেউ শাঁখ বাজাচ্ছিল, কেউ উলুফুলু দিচ্ছিল। ওদের সবার আগে আগে রয়েছে সুমনা। কনকচাঁপার বিয়ের ব্যাপারে মেয়েদের দিক থেকে সে-ই লিডিং রোল নিয়েছে। তার হাতে বরণ-কুলো ফুলো সাজানো রয়েছে। মহাশয়গণ, সুমনা আর তার রেজিমেন্ট যখন বোদাকে বরণ-ফরণ করে নিয়ে যাবে সেই সময় নোকলে কবরেজ আচমকা বলে উঠল, 'আমার একটা প্রস্তাব আছে মশাই।'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকালাম, 'কী?'

'বিয়ে যেমন হচ্ছে হোক, কিন্তু ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের কাছে নিয়ে আরেক বার সরকারি মতে বিয়ে দিতে হবে।' নোকলে কবরেজ ঘড়ঘড়ে আওয়াজ করে বার[illegible]ক কেশে নিয়ে বলে যেতে লাগল, 'মানে আমি চাই কাজটা পাকা হোক। বিয়েটার ওপর গভর্নমেন্টের একটা স্ট্যাম্প পড়ুক। তাহলে এই পার্ট টাইম জোকার পার্ট টাইম ফোরটোয়েন্টি ছোকরাটা সহজে ঘুন্টিকে ফেলে সটকে পড়তে পারবে না।' বলে থ্যাবড়া বেঢপ মোটা আঙুল বাড়িয়ে বোদাকে দেখাল।

দেখুন, মহাশয়গণ দেখুন, এই নোকলে কবরেজ মালটি কিরকম খলিফা! বোদা যাতে বিয়ের পর হড়কে বেরিয়ে যেতে না পারে, তার জন্য আগে থেকেই মাস্টার প্ল্যান করে বসে আছে। অথচ সেই কথাটা নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে। না থাকলে ফের মনে করিয়ে দিচ্ছি। বোদার সঙ্গে কনকচাঁপার বিয়ের ব্যাপারটা যখন ফাইনাল করতে যাই তখন এই নোকলে মাকড়া আমাদের ভাগিয়ে দিয়েছিল। আর এখন কিনা সে-ই এ-বিয়ে যাতে পার্মানেন্ট হয়—মানে ইংরেজিতে কী একটা বুকনি আছে না, 'টিল ডেথ ডু আস পার্ট'—তার জন্য খেপে উঠেছে। হারামীটার পেটের ভেতর কী মতলব পোরা রয়েছে কে জানে। যাক গে ওসব কথা। নোকলের চোখের দিকে তাকিয়ে শুভদৃষ্টি করতে করতে বললাম, 'অ্যারেঞ্জমেন্টে কোনো 'লিক' পাবেন না মাকড়া—' বলেই হাত কচলে মুখটা টেরিফিক কাঁচুমাচু করলাম, 'স্যরি

ভিষকরত্ন মশাই, জিভ থেকে স্লিপ কেটে 'মাকড়া'টা বেরিয়ে এসেছিল। ভেতরে চলুন, দেখবেন ম্যারেজ রেজিস্ট্রার তার জাবদা খাতা-টাতা সাজিয়ে আমাদের জন্যে অফিস সাজিয়ে বসে আছে। আসুন—' বলেই সুমনা এবং তার লাইট ইনফ্যান্ট্রিকে বললাম, 'বরণ-ফরণ যা করবার করে ফেল।'

সঙ্গে সঙ্গে তিন ডজন মেয়ে জিভ নাচিয়ে নাচিয়ে উলু দিয়ে উঠল। আর তিন ডজন মেয়ে শাঁখ বাজিয়ে বাজিয়ে চারদিকে টর্নেডোর আওয়াজ ছুটিয়ে দিল। সানাইওলারা এতক্ষণ ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে ঢিমে তালে বাজিয়ে যাচ্ছিল। আচমকা জেগে উঠে লাংসের সবটুকু জোর দিয়ে সানাইয়ের ফুটোয় একটানা ফুঁ দিতে লাগল। সব মিলিয়ে আমার কানে একসঙ্গে হাজার খানেক তুরপুন আর র‍্যাঁদা চলতে লাগল যেন। আর এই সরু-মোটা-গম্ভীর আর খ্যাসখেসে আওয়াজের টাইফুনের ভেতর বোদাকে বরণ করে ভেতরে নিয়ে গেল সুমনারা।

মহাশয়গণ, ব্যারাকবাড়ির মাঝখানে দেড় হাজার স্কোয়ার মিটারের সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট জুড়ে আছে টেরিফিক এক খানা প্যাণ্ডেল। সেখানে লোক খাওয়াবার জন্য হাজার খানেক চেয়ার আর টেবল পাতা রয়েছে। টেবলগুলোর ওপর রোল পেপার পাতা আর দু-আড়াই ফুট দূরে দূরে বসানো রয়েছে টাটকা রজনীগন্ধার গোছাসুদ্ধু একেকটা ফ্লাওয়ার ভাস। এখনও খাওয়া দাওয়া শুরু হয় নি, তাই একধারে ধবধবে ইউনিফর্ম-পরা পার্ক স্ট্রিটের একটা নাম করা রেস্তোরাঁর বেয়ারারা অ্যাটেনসানের স্টাইলে দাঁড়িয়ে আছে।

প্যাণ্ডেলের একধারে পর্দার পেছন দিকে ক্যাটারারদের স্টোর। সেখান থেকে চাইনিজ থেকে শুরু করে স্প্যানিশ স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান জাপানিজ ইণ্ডিয়ান ইত্যাদি নানা জায়গার বেস্ট ডেলিকেসির গন্ধ উঠে এসে নাকে আর জিভে সুড়সুড়ি দিতে শুরু করেছে।

প্যাণ্ডেলের আরেক দিকে সাটিন আর মখমলের ঝালর-ফালর লাগানো একটা শামিয়ানা খাটানো হয়েছে। সেটা বর বসার জায়গা। দেখুন মহাশয়রা, দেখুন। পেঁচো মাকড়া বোদার বরাসনের জন্য কী টেরিফিক কারবার করেছে! ছ'ফুট উঁচু ফোমের গদির ওপর রুপোর ফুলদানি আর মখমলের কভার-দেওয়া তাকিয়া, তা ছাড়া ফুলের কাজ, শোলার কাজ ইত্যাদি দিয়ে শামিয়ানাটা সাজানো। তার গায়ে লাল-নীল-সবুজ-হলুদ এমনি ডিফারেন্ট কালারের কয়েক হাজার টুনি লাইট সেট করে দেওয়া হয়েছে।

হে-হে মহাশয়গণ, প্যাণ্ডেল শামিয়ানা তাকিয়া পার্ক স্ট্রিটের ক্যাটারারদের বেয়ারা—এসব দেখে আপনাদের নিশ্চয়ই মনে হচ্ছে, আমার পার্টনার বোদা মাকড়ার নয়, কাপুরতলা কি গোয়ালিয়রের প্রিন্সের বিয়ে হচ্ছে।

সুমনা আর তার ব্যাটেলিয়ান বোদাকে শামিয়ানার তলায় নিয়ে বসাল। তারপর ডজন ডজন মেয়ে তাকে ভ্যানভেনে মাছির মতো ছেঁকে ধরে বসে থাকল। দেখুন মহাশয়গণ, বোদাকে একবার দেখুন। হারামীটা ডবকা ডবকা ছুকরিদের সঙ্গে কেমন টেরিফিক জমিয়ে নিয়েছে। এ কি, এ কি, আপনাদের চোখগুলো বেড়ালের মতো ওরকম চকচকিয়ে উঠছে কেন? বুঝেছি মহাশয়গণ, আপনারা যা একেকখানা মাল! নিশ্চয়ই ভাবছেন, বোদার মতো একশ আটটা ফুল সাইজের ইয়াং গোপিনী নিয়ে যদি নিজেরা বসতে পারতেন! ওয়ার্ল্ডে যত পুরুষ আছে সব

শালার মধ্যেই একটা করে দুর্দান্ত খচ্চর ঘাপটি মেরে রয়েছে। কম বয়সের ছুকরি চোখ পড়লেই হল, খচ্চরটি হাই জাম্প দিয়ে বেরিয়ে আসবে।

যাকে গে, আমার চামড়ার সঙ্গে গা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল নোকলে কবরেজ। আর তার চামড়ার সঙ্গে সেঁটে রয়েছে সেই এক কোম্পানি 'আবার খাবো সন্দেশ।' গলা ঝেড়ে কফ সরাতে সরাতে নোকলে কবরেজ বলল, 'সাত পাক ঘুরিয়ে বিয়েটা আগে হবে, না রেজিস্ট্রি করে গভর্নমেন্টের বিয়েটা?'

নোকলে কবরেজ যা একখানা খলিফা, আসল কথাটা কিছুতেই ভুলছে না। আমি কী উত্তর দিতে যাচ্ছিলাম, তার আগেই আচমকা চোখে পড়ল পঞ্চানন হানড্রেড মিটার রেস দেবার মতো দৌড়ে সুমনাদের ঘর থেকে ক্যাটারারদের স্টোরের দিকে যাচ্ছে। একই সঙ্গে সে বরকর্তা অ্যাণ্ড কন্যাকর্তা। এক সেকেণ্ড ওর দাঁড়াবার টাইম নেই। ফ্লাইং সসারের মতো চারদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে। তাকে ডাকতেই সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'এই যে স্যার, আপনি এসে গেছেন। আপনাকেই খুঁজছিলাম।'

বললাম,'আমিও তোকেই খুঁজছি।'

'বলুন স্যার, আপনার কথাটা আগে শুনে নিই।'

'তোর এখন প্রোগ্রাম কি? আগে কোন বিয়েটা হবে? পুরুতের ,না ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের?'

'ম্যারেজ রেজিস্ট্রার এখনও এসে পৌঁছয় নি।'

কবজি উলটে ঘড়ি দেখে বললাম, 'আটটা বেজে গেল। তুই না তখন বললি সাতটা কুড়িতে আসবে।'

'আসার কথা তো তাই ছিল। তবে কোনো খজড়া টাইম রাখে না। এক দেড় ঘন্টা হ্যাণ্ডিক্যাপ দিয়ে রাখতে হয়।' কয়েক সেকেণ্ড থেমে প্যাণ্ডেলের বাতাস থেকে বুকের ভেতর খানিকটা অক্সিজেন টানতে টানতে পঞ্চানন বলল, 'ঘাবড়াবেন না স্যা়ে মাকড়া ঠিক এসে পড়বে।'

আমার ঘাড়ের পাশ দিয়ে নোকলে কবরেজ গলা বাড়িয়ে বলে উঠল, 'আসবে তো?' বলতে বলতে তার ঘোলাটে চোখ দুটো কুঁচকে গেল।

পঞ্চানন গলার স্বর 'বেস' থেকে এক হ্যাঁচকায় তিন পর্দা ওপরে তুলে চেঁচিয়ে উঠল, 'আসবে না মানে! ওর ফোরটিন জেনারেশন লাইন দিয়ে চলে আসবে। টোয়েন্টি রুপিজ অ্যাডভান্সে দিয়ে এসেছি না! আমি টাকা দিলে সেই টাকা চোট দেবে এমন খজড়া ওয়ার্ল্ডে পয়দা হয়নি।' আচমকা নোকলে কবরেজের দিকে চোখ পড়তে থমকে গেল পঞ্চানন। চমকে উঠে তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঝট করে একবার দেখে নিল। তারপর 'আবার খাবো' সন্দেশগুলোকে। পরের মোমেন্টে ঘাড় ঘুড়িয়ে তাকাল গেটের দিকে।

মহাশয়গণ, পঞ্চাননকে একবার লক্ষ করুন। ওর সাইকোলজিটা বুঝতে পারছেন? আসলে নোকলে কবরেজকে এখানে দেখতে পাবে ভাবে নি। পঞ্চাননের হয়ত মনে হয়েছে, শালা বোধহয় পুলিশ কিংবা মস্তান ফস্তান এনে বিয়েটা কাঁচিয়ে দিতে এসেছে। চোখমুখ দেখে মনে হল, ও স্লাইট ভয় পেয়ে গেছে।

পঞ্চাননকে বললাম, 'ঘাবড়াস না পেঁচো। কবরেজ কোনোরকম ঝামেলা ফামেলা করতে আসে নি, মেয়ের বিয়ে দেখতে এসেছে।'

গজালের মতো কুড়ি বাইশটা দাঁত বার করে পঞ্চনন নোকলে কবরেজকে বলল, 'নিজের মেয়ের বিয়ে কাঁচিয়ে দিতে আসেনি, এটা আমাদের ফোরফাদারের লাক।'

হাঁসের ডিমের মতো চোখ করে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকল নোকলে কবরেজ, কিছু বলল না।

পঞ্চানন এবার আমার দিকে ফিরে বলল, 'রেজিস্ট্রারের আসতে লেট হচ্ছে। এই গ্যাপটার ভেতর তা হলে সাত পাকের বিয়েটা ফিনিশ করে ফেলি স্যার?'

বললাম, 'তাই কর। প্রোগ্রামের একটা আইটেম অন্তত চুকে যাক।'

নোকলে কবরেজ এতক্ষণ 'স্পিকটি নট' হয়ে আমাদের কথা শুনছিল। এবার ঠেঁটি ঘাড়টা ছ' ইঞ্চির মতো লম্বা করে বলল, 'হিন্দুমতে, মুসলমান মতে, খ্রিস্টান মতে, জু মতে—যে মতে ইচ্ছে আপনারা বিয়ে দিন, আমার আপত্তি নেই। কিন্তু সরকারি মতো বিয়েটা দিতেই হবে।'

বললাম, 'ভেবে ভেবে ব্লাড প্রেসার চড়াবেন না মাকড়া। বিয়ের ফার্স্ট পার্টটা হয়ে যাক, ডিউ পার্টটা কারেক্ট টাইমে হয়ে যাবে।'

'আজকেই ওটা চুকিয়ে ফেলতে হবে।'

'আজকেই হবে।'

পঞ্চানন এবার বলল, 'স্যার, এবার আমার কথাটা বলি—'

পঞ্চাননের চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'বল।'

'স্যার, টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেণ্ড গেস্টকে ইনভাইট করেছি। এদিকে বিয়েটা হতে থাক, ওধারে লোক খাওয়ানো স্টার্ট করে দিই?'

'হ্যাঁ। এমনিতেই পঁচিশ হাজার মাকড়াকে ব্যাচ বাই ব্যাচ খাওয়াতে হোল নাইট কাবার হয়ে যাবে। আর দেরি করলে আজকের ডিনার আর কালকের লাঞ্চ একসঙ্গে সারতে হবে।'

পঞ্চানন আর দাঁড়াল না, জিরাফের মতো দৌড়ুতে দৌড়ুতে ক্যাটারারদের স্টোর রুমের দিকে চলে গেল। আমি পিটার স্বয়ম্ভু হোড়, ঢাউস প্যাণ্ডেলে গিজগিজে ভিড়ের ভেতর উড়ন্ত চাকির মতো ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। আর ছুঁচের পেছনে সুতোর মতো আমার গায়ের সঙ্গে সেঁটে থেকে নোকলে কবরেজ এবং তার 'আবার খাবো' সন্দেশের ব্যাটালিয়ান ঘুরতে লাগল। রেজিস্ট্রেসন ম্যারেজটা না হওয়া পর্যন্ত মালখানা আমাকে ছাড়বে না। ঠিক আছে শালা, ঘুরতে থাকো।

মহাশয়গণ, আপনাদের আগেই জানিয়ে দিয়েছি, একই সঙ্গে প্রেসিডেণ্ট আর প্রাইম মিনিস্টার হওয়ার মতো বোদার বিয়েতে পঞ্চানন হল গিয়ে বর এবং কন্যাকর্তা। তবে কাজের সুবিধার জন্য সে ডিভিসন অফ লেবার করে নিয়েছে। প্যাণ্ডেল সাজানো থেকে ক্যাটারার ঠিক করা পর্যন্ত 'অনেকগুলো পোর্টফোলিও নিজের হাতে রেখে দিয়েছিল। তবে গেট থেকে বোদাকে বরণ-ফরণ করে সামিয়ানার তলায় নিয়ে যাওয়া, সেখান থেকে লগ্নের টাইম দেখে ছাঁদনাতলায় এনে তাকে আর কনকচাঁপাকে পুরুতের সামনে বসানো, তারপর আলটিমেটলি

ছাঁদনাতলা থেকে বাসর ঘরে এনে দুটোকে সেট করে দেওয়া—এ সবের চার্জে রয়েছে সুমনা। হে-হে মহাশয়গণ, হিন্দু বিয়ের খুঁটিনাটি হাজার গণ্ডা ঝামেলা, তা সামলাতে ফুল সাইজের একটা মিনিস্ট্রি চালু করা যায়। মিনিস্ট্রি ফর দা রিচুয়ালস অফ হিন্দু ম্যারেজ।

মহাশয়গণ, নোকলে কবরেজ অ্যাণ্ড সন্স অ্যান্ড ডটার্সকে গায়ের চামড়ায় জুড়ে নিয়ে ঘুরছিলাম। একেকটা মিনিট কাটছে আর হিউম্যান ওয়েভের মতো চারদিক থেকে ঝাঁক ঝাঁক পুরুষ এবং মেয়েমানুষ তাদের গাদা গাদা লেণ্ডিগেণ্ডিসুদ্ধু প্রসেসান করে ব্যারাকবাড়িতে ঢুকছে। মহাশয়গণ, পঞ্চানন মানে পেঁচোর কারবারটা একবার মার্ক করুন। বোদার বিয়েতে হোল নেশানকে নেমন্তন্ন করে এসেছে। যাক গে, তাতে আমারই বা কী, আপনারই বা কী! কারেন্সি নোট ছেপেছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। সেই টাকা হল গিয়ে ন্যাশনাল প্রপার্টি, মানে জনগণের সম্পত্তি।। জনগণের জিনিস সমাজপতির হাত ঘুরে আমার হাতে এসেছে। আমি জনগণের পয়সায় জনগণকে খাওয়াচ্ছি। এতে কোনো মাকড়ার কিছু বলার নেই।

হে-হে মহাশয়গণ, মিনিট কুড়ি বাইশ প্যাণ্ডেলের ভেতর চক্কর মারার পর আচমকা সানাইয়ের আওয়াজ থেমে গেল। তার বদলে মাইকে পঞ্চাননের গলা ভেসে এল। পেঁচো যে মাইকের অ্যারেঞ্জমেণ্ট করেছে, এটা আমার জানা ছিল না।

পঞ্চানন বলছিল, 'অ্যাটেনসান, অ্যাটেনসান প্লিজ। এখন সাতটা বেজে সাতচল্লিশ। সাতটা উনপঞ্চাশের লগ্নে ছাঁদনাতলায় শ্রীমান বোদার সঙ্গে শ্রীমতী কনকচাঁপার বিবাহ সম্পন্ন হবে। যাঁরা এই বিবাহ স্বচক্ষে দেখতে চান তাঁরা সুশৃঙ্খলভাবে ছাঁদনাতলার চারদিকে বেষ্টন করে দাঁড়ান।'

'বিবাহ', 'স্বচক্ষে', 'সম্পন্ন', 'সুশৃঙ্খলভাবে', 'বেষ্টন'—মহাশয়গণ শুনুন, কানগুলো খরগোসের মতো খাড়া করে পেঁচোর ল্যাংগুয়েজ শুনে যান। মাইক হাতে পেয়ে খচ্চরটা শুদ্ধু বাংলায় কী যেন বলে, ও হ্যাঁ—'ভাবগম্ভীর' ভাষা ঝেড়ে যাচ্ছে।

এদিকে ছাঁদনাতলার দিকে যাবার জন্য কয়েক হাজার ছেলে-বুড়ো-জোয়ান-জোয়ানী-কাচ্চাবাচ্চা হুড়োহুড়ি লাগিয়ে দিল। বানচোতরা, জন্মের পর থেকে কয়েক হাজার করে বিয়ে দেখে আসছে। তবু নতুন কাউকে বিয়ে করতে দেখলে হানড্রেড মিটারের রেস লাগাবার মতো দৌড়ুনো চাই। নইলে লাইফের একটা টেরিফিক 'লস' হয়ে যাবে বোধ হয়। যেভাবে ওরা ছুটছে তাতে স্ট্যামপিড হয়ে কিছু না ফিনিশ হয়ে যায়! কিন্তু হল না। তার আগেই মহাশয়গণ, মাইকে বেলো ফেঁসে যাওয়া হারমোনিয়ামের আওয়াজের মতো পঞ্চাননের গলা শোনা গেল, 'অ্যাটেনসান, অ্যাটেনসান প্লিজ। খাওয়ার জন্য আপনাদের আসতে বলা হচ্ছে। যাঁদের নাম ডাকা হবে তাঁরা এসে প্যাণ্ডেলে আসন গ্রহণ করুন। যাঁদের নাম ডাকা হবে না তাঁরা দয়া করে আসবেন না। এলে আমাদের কাজের বিঘ্ন ঘটবে। নামগুলো ভাল করে শুনুন। ভীমরাজ জয়ধর, পূর্ণশশী জয়ধর, পদ্মলোচন জয়ধর—' হে-হে মহাশয়গণ, স্কুল-কলেজে রোল-কলের মতো কোনো একটা লিস্ট-টিস্ট দেখে নামের পর নাম পড়ে যেতে লাগল সে।

এদিকে যে মাকড়ারা ঝাঁক বেঁধে ছাঁদনাতলার দিকে দৌড়ুচ্ছিল তারা থমকে দাঁড়িয়ে গেল। পঞ্চাননের রোল-কল শুনে খেতে না গেলে চাইনিজ স্প্যানিশ স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান ইণ্ডিয়ান—এত

সব টেরিফিক-টেরিফিক খানা মিস হয়ে যাবে। হোল লাইফে আর তো একরম খাবার দাবার জুটবে না।

মহাশয়গণ, মাইকে যারা নিজেদের নাম শুনল তারা বৌ-বাচ্চা-ফাচ্চার হাত ধরে ছাঁদনাতলার উল্টোদিকে মেইন প্যাণ্ডেলের তলায় গিয়ে খেতে বসে গেল। আর এধারে সুমনা আর তার এক ব্যাটেলিয়ান সখী শাঁখ বাজিয়ে উলু দিয়ে বোদাকে সামিয়ানার পঞ্চাশ ফুট দূরে ছাঁদনাতলায় নিয়ে হাজির করেছে। সেখানে মেয়েপক্ষ এবং ছেলেপক্ষ দু'পক্ষেরই পুরুত ওয়েট করছিল। মহাশয়গণ, পঞ্চানন কোনো অ্যারেঞ্জমেন্টেই এক মিলিমিটার ফাঁক রাখে নি। হোল আগরপাড়া চষে বর এবং কনে দু'পক্ষের জন্যই আশি পঁচাশি বছরের দুটো ছানিপড়া চোখের, জং-ধরা কোঁচকানো চামড়ার কোলকুঁজো, অথর্ব টাইপের দুই বুড়ো পুরুতকে তুলে এনেছে। শালাদের চেহারা দেখে মনে হয় বেদ-ফেদ কিংবা পুরোহিত-দর্পণ লেখার টাইম থেকে এই দুই মাকড়া লাখ লাখ বিয়ে দিয়ে পপুলেশন এক্সপ্লোসানে হেল্প করে আসছে এবং এই মোমেণ্টে ফ্রেশ জনসংখ্যা বাড়াবার জন্য ঘাপটি মেরে বসে আছে।

আমার ঘাড়ের পাশ থেকে নোকলে কবরেজ দুম করে বলে উঠল, 'ছাঁদনাতলার দিকে চলুন। বিয়েটা কিরকম হচ্ছে, দেখা দরকার।'

বললাম, 'সিওর।'

ছাঁদনাতলার দিকে যেতে-যেতে আচমকা কী মনে পড়ে যেতে নোকলে আবার বলল, 'একটা কথা জানা হয় নি।'

'কী?'

'ঘুন্টিকে সম্প্রদান করবে কে?'

মহাশয়গণ, চিজটিকে দেখুন, খুব ভাল করে দেখুন। মেয়ে মাঝরাতে বাড়ি থেকে ভ্যানিশ হয়ে গেল, জনগণ তার বিয়ে ফিয়ের অ্যারেঞ্জমেণ্ট করেছে, এমন কি বর-কনেকে ছাঁদনাতলায় পর্যন্ত চড়ানো হয়েছে—আর এতক্ষণে জন্মদাতা বাপের হঠাৎ খেয়াল হল, মেয়েকে সম্প্রদান করবে কে! বললাম, 'চিন্তা করবেন না বানচোত—' বলেই এগার ইঞ্চি জিভ কেটে চট করে শুধরে নিলাম, 'স্যরি কবরেজ মশাই। বর যখন জুটেছে, খাওয়াদাওয়ার যখন ব্যবস্থা-ফ্যবস্থা হয়ে গেছে, তখন সম্প্রদান করার লোকের জন্য ম্যারেজ আটকায়? এই ক্যালকাটা সিটিতে ক্যাশ দিলে ফাদার ওয়াইফ ব্রাদার ব্রাদার-ইন-ল, সব ভাড়া পাওয়া যায়। আর কনকচাঁপার বাপ মানে আপনার একটা সাবস্টিটিউট পাব না?'

নোকরে কবরেজ বলল, 'আমার সাবস্টিটিউট কে মশাই?'

হে-হে মহাশয়গণ, আপনারা তো জানেনই 'জীবনবীমার বিকল্প নেই'র মতো নোকলে কবরেজের সাবস্টিটিউট হয় না। ওয়ার্ল্ডে এরকম ফিনিশড প্রোডাক্ট এই একটাই তৈরি হবার পর গোটা ফ্যাক্টরিটায় তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার কারণ এমন স্যাম্পল যাতে আর গজাতে না পারে। পঞ্চাননের জবাব নেই। কাজ চালিয়ে দেবার মতো নোকলের একটা সাবস্টিটিউট জুটিয়ে ফেলেছে। কবরেজের জায়গায় ব্যারাকবাড়ির নদেরচাঁদ কনকচাঁপাকে বোদার হাতে পার্মানেন্টলি সম্প্রদান কববে।

নদেরচাঁদকে নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে। হে-হে মহাশয়গণ, সেই যে খচ্চরটা যার ট্যারাবাঁকা ফিগার, পোকায় খাওয়া দাঁত, হোল বডিতে গ্যারগেরে হাড় আর এনতার ধার করে যাওয়া যার প্রফেসান—সেই নদেরচাঁদ সম্প্রদানের ব্যাপারে কনকচাঁপার জন্মদাতা ফাদারের কাজ করবে। নেকলে কবরেজকে বললাম, 'আপনার সাবস্টিটিউট হল নদেরচাঁদ।'

গোল গোল ঘোলাটে চোখে কয়েক সেকেন্ডে তাকিয়ে থেকে কী ভাবল নোকলে কবরেজ। তারপর বলল, 'সে কে?'

'ছাঁদনাতলায় গেলেই নিজের চোখে দেখতে পাবেন।'

হে-হে মহাশয়গণ, প্যাণ্ডেলের তলা থেকে আমরা ছাঁদনাতলার বাউণ্ডারিতে সবে স্টেপ ফেলেছি, মাইকে পঞ্চাননের রোল কল শোনা গেল, 'নকুলেশ্বর সেনশর্মা, ভিষকরত্ন, স্বর্ণলতা সেনশর্মা, হীরককান্তি সেনশর্মা, কন্দর্পকান্তি সেনশর্মা—'

নোকলে কবরেজ তার ব্যাটালিয়ান নিয়ে এগুতে এগুতে সিনেমার ফ্রিজ শট হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হল?'

নোকলে কবরেজ দুই মাড়ির টোটাল দশ বারটা দাঁত বার করে টেরিফিক একখানা হাসির পোজ মারল। তারপর বলল, 'মাইকে নাম ডাকছে কিনা। ভাবছি বিয়ে হতে তো টাইম লাগবে। তার আগেই ওদিকের ব্যাপারটা—'

মহাশয়গণ, ওদিকের ব্যাপারটা মানে যে কী সেটা নিশ্চয়ই এতক্ষণে টের পেয়ে গেছেন। মেয়ের বিয়েটা তো অটোমেটিকালি হয়ে যাবেই, কিন্তু ছাঁদনাতলায় গিয়ে যদি আটকে যেতে হয় আর পঞ্চানন যদি সেকেণ্ড টাইম রোল-কল না করে তা হলে খাওয়ার ব্যাপারটার বারটা বেজে গেল। মেয়ের বিয়ে যত ইমপর্টাণ্ট হোক, পার্ক স্ট্রিটের দামী ক্যাটারারের স্প্যানিশ-চাইনিজ-আইরিশ-রুশি-জাপানি, ন্যাশনাল আর ইণ্টারন্যাশনাল ডিশগুলো নোকলে কবরেজের নাকে বাইশটা বঁড়শি গেঁথে প্যাণ্ডেলের দিকে অনবরত টানছিল।

প্যাণ্ডেলটা দেখিয়ে বললাম, 'যান, ওদিকের ব্যাপারটা ফিনিশ করে আসুন।'

নোকলে কবরেজ বলল, 'আপনি বিয়ের দিকটা দেখবেন। কোনোরকম খুঁত যেন না থাকে।'

আমি পিটার স্বয়ম্ভু হোড় অর্থাৎ একজন চিট, ফোরটোয়েন্টি এবং থর্ড ক্লাশ জুয়াচোরের ওপর বোদা আর কনকচাঁপার জোড় লাগাবার দায়িত্ব দিয়ে নকুলেশ্বর ভিষকরত্ন মেয়ের বিয়েতে নেমন্তন্ন খেতে চলে গেল।

'ম্যারেজ—হিন্দু স্টাইল' যে কী হেভি দুর্ধর্ষ ব্যাপার, ছাঁদনাতলায় এসে, সেটা টের পাওয়া গেল।

বোদা আর কনকচাঁপাকে চিত্তির-করা পিঁড়িতে মুখোমুখি বসিয়ে একটা পুরুত দারুণ স্পিডে স্যাংস্কৃট মন্তর-ফন্তর আউড়ে যাচ্ছিল। 'বেদিক এজ'-এর পর পুরোহিত দর্পণ টর্পণ যখন প্রথম পয়দা হল তখন থেকেই বোধহয় এই মালটি বিয়ে দিয়ে আসছে। ওল্ড হারামীটার কথার নাইনটি নাইন পারসেন্ট বোঝা যাচ্ছে না। মন্তর-ফন্তরের সঙ্গে সাদা ফেনার মতো থুতু উড়ছে।

হে-হে মহাশয়গণ, কারবারটা একবার বুঝতে চেষ্টা করুন। এক শালা প্রফেসানাল পুরুত 'ং' 'ঃ'-লাগানো কিছু সংস্কৃত-ফংস্কৃত ঝাড়ছে আর শালা বোদা অমনি একটা দুধর্ষ চেহারার

ইয়াং ছুকরির সঙ্গে বিছানায় শোবার 'পারমিট' পেয়ে যাচ্ছে। বামুন মালেরা কিরকম একখানা বিজনেস বার করেছে দেখুন। ইনভেস্টমেন্ট নেই, মার্কেটিং-এর ঝামেলা নেই, সেঞ্চুরির পর সেঞ্চুরি স্রেফ 'ং' 'ঃ' ঝেড়ে যুবক-যুবতীকে এক বিছানায় শোবার পাসপোর্ট দিয়ে ফায়দা উঠিয়ে নাও।

মহাশয়গণ, বিয়ে যে স্টাইলেই হোক—ইটালিয়ান, ইংলিশ, স্প্যানিশ, হিন্দু, ক্রিশ্চান, পার্শি, জৈন—আসল ব্যাপারটা হল একটা ছোকরা আর একটা ছুকরিকে এক বিছানায় তোলার অ্যারেঞ্জমেণ্ট করা। যদ্দিন হিন্দু ক্রিশ্চান জৈন পার্শি পুরুতরা এই অ্যারেঞ্জমেণ্টটা করতে পারবে তদ্দিন মহাশয়গণ এই প্রফেসানের মার নেই। আরো হাজার হাজার বছর এই প্রফেসান চালু থাকবে। যদ্দিন নিজের বেডে একজন পুরুষের একজন মেয়েমানুষকে দরকার হবে তদ্দিন একটাই স্লোগান হোল ওয়ার্ল্ডে শোনা যাবে—'পুরুতরাজ জিন্দাবাদ' কিংবা 'পুরুততন্ত্র—চলছে, চলবে।'

মহাশয়গণ লক্ষ করে দেখুন, বোদা কনকচাঁপা আর দু'পক্ষের পুরুতদের ঘিরে অগুনতি যুবক-যুবতী সার্কেল করে রয়েছে।

আমাকে দেখে ভিড়টা সরে সরে ভেতরে যাবার রাস্তা করে দিল। আমি স্ট্রেট বোদার কাছে চলে এলাম।

মহাশয়গণ, বোদা পুরুতের সঙ্গে কমপিটিসন দিয়ে সংস্কৃত মন্তর আউড়ে যাচ্ছিল। তবে শালার জিভে দেড় ইঞ্চি পুরু ময়লা। মাকড়ার উচ্চারণ যা হচ্ছিল তাতে মন্তরগুলো আর সংস্কৃত থাকছিল না, স্রেফ হিব্রু, গ্রিক, জার্মান কিংবা আফ্রিকার বাণ্টুদের ল্যাংগুয়েজ বলে মনে হচ্ছিল।

আমাকে দেখতে পেয়ে বোদা চোখ মেরে তার কাছে গিয়ে বসার সিগনাল দিল। আমি বসতেই মন্তর পড়ার ফাঁকে বলল, 'পুরুত মাকড়াটা সঙোস্কিতো (সংস্কৃত) বলিয়ে বলিয়ে আমার আলটাগরায় ফোস্কা ফেলে দিলে গুরু।'

বললাম, 'যেভাবে স্যাংস্কৃটে ট্রেনিং নিচ্ছিস, এরকম একমাস চললে তুই ব্যাস বাল্মীকি ফাল্মীকির ক্লাসে উঠে যাবি দেখছি।'

'সে মাকড়ারা কারা গুরু?'

মহাশয়গণ, আদরের স্টাইলে বোদার পাছায় একটা কিক হাঁকড়াতে যাচ্ছিলাম। আচমকা খেয়াল হল, শালা বিয়ের পিঁড়িতে বসে আছে। লাথি মেরে ওর প্রেসটিজটা এভাবে পাংচার করে দেওয়াটা ঠিক হবে না। বললাম, 'ওদের বায়ো-ডাটা জানার দরকার নেই। মন দিয়ে এখন স্যাংস্কৃট রিসাইট করে যা।'

'গুরু, বিয়ে করতে হলে এত যে অং বং আওড়াতে হবে তা কোন শালা জানত! একে সঙোস্কিতো, তার ওপর পিঁড়েতে বসে বসে কুঁচকি পটলের মতো ফুলে উঠেছে। গুরু, মাইরি তুমি পুরুত খজড়াটাকে একটু শর্ট কাট করতে বল।'

'বিয়েতে লটকাবার আগে মনে ছিল না! শর্ট কাট, ফর্ট কাট হবে না। ম্যারেজ হিন্দু স্টাইলে যা-যা করার সব করতে হবে। নোকলে কবরেজ এসেছে, সে মালটা ওয়ার্নিং দিয়ে রেখেছে

মেয়ের বিয়েতে স্লাইট ফাঁক থাকলে একসঙ্গে তোর আর আমার ফাদার অ্যাণ্ড গ্র্যান্ড ফাদারের ম্যারেজ দেখিয়ে ছাড়বে। এখন বাপের সুপুত্তুর হয়ে স্যাংস্কৃট আউড়ে যা। ও-কে?'

মহাশয়গণ, দেড় কেজি চিরতার জল খাবার মতো মুখ করে বোদা জিজ্ঞেস করল, 'নোকলে কোথায়?'

'রেজিমেন্ট নিয়ে প্যাণ্ডেলে ঢুকেছে।' পেট দেখিয়ে বললাম, 'এই গো-ডাউন ফিল-আপ করছে।'

বোদা ফাদার-ইন-ল সম্পর্কে একটা টেরিফিক খিস্তি ঝাড়তে যাবে, সেই সময় পুরুতটা খিঁচিয়ে উঠল, 'বিয়ে করতে এসেছ, না আড্ডা মারতে—অ্যাঁ? বিয়েটা ইয়ার্কির ব্যাপার না। এদিকে ফিরে মন্তর বল।'

বোদা ফের ঘাড় ঘুরিয়ে দারুণ বেজার মুখে পুরুতের সঙ্গে ফের 'ং' 'ঃ'-র দ্বৈত সঙ্গীত শুরু করল। আর আমি তার কানের ভেতর মুখ গুঁজে বললাম, 'শালা, আজ রাত থেকে বিছানায় একটা ছুঁড়ি পাবি। এ সব তো একেবারে ফোকটে হয় না। একটু খাটো চাঁদ, একটু খাটো—'

হে-হে মহাশয়গণ, ঘড়ির কাঁটা তো আর ফিল্মের ফ্রিজ শট নয়। সেটা ঘুরেই যাচ্ছে, ঘুরেই যাচ্ছে। আর ঘুরতে ঘুরতে সময়টাকে মাঝরাতের কাছে নিয়ে এল।

এর ভেতর মন্তর আওড়ানো, সাত পাক ঘোরানো, হোম-ফোম—হিন্দু বিয়েতে যত ঝামেলা-টামেলা আছে সব ফিনিশড। ওদিকে রোল-কল করে করে পঞ্চানন ব্যাচের পর ব্যাচ লোক খাইয়ে যাচ্ছিল।

প্রোগ্রামে আছে, ছাঁদনাতলার ব্যাপারটা কমপ্লিট হবার পরই বর-কনেকে বাসর-ঘরে নিয়ে যাওয়া হবে। বাসরটা ব্যারাকবাড়ির কোথায় কার ঘরে সাজানো হয়েছে, জানতাম না। সুমনা বর-কনের গায়ের সঙ্গে জুড়ে দাঁড়িয়েছিল। জিজ্ঞেস করলাম, 'বাসর-ঘরটা কোথায়?'

সুমনা কম্পাসের কাঁটার মতো আঙুল বাড়িয়ে উত্তর দিকটা দেখিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘাড় বোঁ করে সেদিকে ঘুরল। ওখানেও মখমলের ঝালর বসানো,শ্যাণ্ডেলিয়ার ঝোলানো আরেকটা দুর্ধর্ষ সামিয়ানা। সেখানে দামী খাটের ওপর ফোমের গদি চড়িয়ে বর-কনের বিছানা পাতা হয়েছে। তলায় দু'হাজার লোক বসার মতো ঢালাও ফরাস। দেখতে-দেখতে আমার চোখের তারা ফিক্সড হয়ে গেল। বললাম, 'উঠোনের মাঝখানে প্যাণ্ডেল খাটিয়ে বাসর-ঘর বসানোর আইডিয়াটা কার ব্রেনে গজিয়েছে?'

উত্তর দেবার জন্য সুমনা ঠোঁট ফাঁক করতে যাচ্ছিল, তার আগেই পঞ্চাননের গলা শোনা গেল, 'আমার ব্রেনে দাদা। আপনি তো বলেন জনগণের ক্যাশ খরচা করে এই বিয়েটা হচ্ছে। তাই ভাবলাম, জনগণ যাতে মজাটা পুরোপুরি এনজয় করতে পারে তাই ওপেন-এয়ার বাসর-ঘরের অ্যারেঞ্জমেন্ট করে ফেললাম।'

দেখুন মহাশয়গণ, ভাল করে পেঁচোকে দেখে যান। মাকড়া ক'দিন মোটে আমার টাচে এসেছে। আর এর ভেতরেই ওর ব্রেনে কি রকম স্পার্ক মারছে! আর কয়েকটা দিন আমার সঙ্গে থাকলে প্ল্যানিং কমিশনের হেড কোয়ার্টারটা আমার মাথা থেকে স্ট্রেট ওর মাথায় চলে যাবে। আদর করে পঞ্চাননের নাকে টক টক করে তিনটে টোকা মেরে বললাম, 'তোর ব্রেনে

আগমার্কা ভাল মাল আছে। যদি কাল্টিভেট করতে পারিস ওয়ার্ল্ডে কোনো শালা তোকে রুখতে পারবে না।'

খুশিতে পঞ্চাননের বোতলের মতো মুখটায় পাঁচ শ ওয়াটের ব্রাইট একখানা বাল্‌ব জ্বলে উঠল যেন। নিজের ঘাড় আর গলায় আঙুল ঢুকিয়ে কাতুকুতু দিতে দিতে বলল, 'বলছেন স্যার?'

'হানড্রেড টাইমস বলছি।'

ফ্যাসফেসে পুরনো হারমোনিয়ামে 'সা' থেকে 'নি' পর্যন্ত সাতটা রিড একসঙ্গে টিপে চড়া পর্দায় বাজালে যে রকম আওয়াজ বেরোয় পুরুতটা আচমকা সেই রকম চেঁচিয়ে উঠল, 'ছাঁদনাতলার কাজ শেষ। এবার বর-কনেকে বাসরে নিয়ে যাও।'

সুমনা আর তার যুবতী রেজিমেণ্ট চমকে উঠে কোরাসে বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিয়ে যাচ্ছি—'

মহাশয়গণ, এরপর কুইন এলিজাবেথ নাম্বার টু'র করোনেসনের সময় যে রকম হয়েছিল ঠিক তেমনি, শুদ্ধ ভাষায় যাকে বলে কালারফুল প্রশেসান, তাই করে বোদা অ্যাণ্ড কনকচাঁপাকে ওপেন-এয়ার বাসর-ঘরে নিয়ে সেট করে দেওয়া হল।

রেইনি সিজনে পাহাড়ী নদীর কারেণ্ট দেখেছেন তো! আমি যে এক জায়গায দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চারদিকের সিন-ফিন দেখব, তার উপায় নেই। মহাশয়গণ, তিন ডবকা সাইজের ইয়াং গার্ল কনুই, আঙুলি, হাঁটু, উরু এবং মাইরি রবারের বলের মতো খুব সফট্ টাইপের একটা ডেঞ্জারাস জায়গা দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে বাসর-ঘরের সামিয়ানার তলায় বোদার ঘাড়ের সঙ্গে আমাকে পেস্ট করে দিল।

কাঁঠালের গায়ে যেমন লাখ লাখ মাছি সেঁটে থাকে, এই মুহূর্তে বোদা আর কনকচাঁপার সঙ্গে আমার বডিতেও তেমনি গাদা-গাদা ইয়াং গার্ল। বিয়ে মানেই শালা ঝাঁকে ঝাঁকে ছুঁড়ি—ছুঁড়িদের ফ্যাশান প্যারেড। হে-হে মহাশয়গণ, আপনারা তো জানেনই, ছুঁড়ি যেখানে থাকবে, ছুঁচের পেছনে সুতোর মতো ছোকরারাও সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়বে। দেয়ারফোর মহাশয়গণ, স্লাইট লক্ষ করে দেখুন, ছুঁড়িগুলোকে ঘিরে ছোকরাদের পনের কুড়িটা সার্কেল। আর এরই মধ্যে মেক আপে বয়েস টয়েস কমিয়ে কিছু মিডল-এজেড মেয়েমানুষ ভিড়ের চাপে টানেল খুঁড়ে ঢুকে পড়েছে। মহাশয়গণ, অল্প বয়সের ছুকরিদের বডিতে নানারকম মজা ফজা থাকে। দেখুন দেখুন, সেই মজাটি লুটবার জন্য বুড়ো, আধবুড়ো ইত্যাদি বয়সের কিছু কিছু হারামীও ভেতরে 'ইন' করেছে। বাসর-ঘরে ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিক হিসাবে হাজার কয়েক ছুকরি অনবরত মিহি-মোটা-খ্যানখেনে-ফ্যাসফেসে—নানারকম এফেক্ট সাউন্ড করে কখনও কলকলিয়ে কখনও খিলখিলিয়ে হেসে যাচ্ছিল। আর তার ফাঁকে ফাঁকে বোদাকে টার্গেট করে একেক জন একেকটা বুলেট ছুঁড়ছিল।

'শোলে ছবির গব্বর সিং-এর মতো ডায়ালগ বলতে হবে।'

'কিশোরকুমারের একটা গান গাইতে হবে।'

'পি. সি. সরকারের মতো ম্যাজিক দেখাতে হবে।'

'অমিতাভ বচ্চনের মতো অ্যাকসান পিকচারের সিন দেখাতে হবে।'

মহাশয়েগণ, দেখুন দেখুন, ছুকরিদের অর্ডার শুনতে শুনতে বোদার মুখটা বোতলের মতো লম্বা হয়ে যাচ্ছে। মেয়েদের দেখতে দেখতে সে বলল, 'হেমা মালিনীর মতো প্রেমের সিনে ড্যান্স দেখাতে হবে না?'

চারপাশের কয়েক হাজার যুবক-যুবতী, বুড়ো-বুড়ি, আধবুড়ো-আধবুড়ি হৈ-হল্লা বাধিয়ে দিল, 'বর শালা রসিক মাল আছে। নাচ গুরু, হেমা মালিনী হয়ে একখানা নাচই দেখিয়ে দাও।'

বোদা উত্তর না দিয়ে আমার দিকে ফিরল, 'গুরু, বিয়ে করতে হলে একসঙ্গে অমিতাভ বচ্চন, কিশোরকুমার, আমজাদ খান, পি. সি. সরকার আর হেমা মালিনী হতে হবে, কোন হারামী জানত!'

বললাম, 'বোঝো মাকড়া, ঠ্যালাটা হাড়ে হাড়ে এখন মালুম পাও। অমিতাভ, কিশোর দিয়ে স্টার্ট হয়েছে, কোথায় গিয়ে এণ্ড হয় এখন দ্যাখ—'

বোদা চুপ করে রইল। দু সেকেণ্ড পর ঝট করে কী মনে পড়তে আমার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে ফিসফিসিয়ে একদমে বলে গেল, 'গুরু, একটা কথা বিলকুল ভুলে গিয়েছিলাম। শ্লা, এখন যদি ব্যাপারটা ফয়সালা না করে নিই, আমার ফিউচার স্রেফ কিচাইন হয়ে যাবে।'

ভুরু কঁচকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী ভুলে গিয়েছিলি?'

'তুমি গুরু বলেছিলে, যারা বিয়ের ক্যাঁচাকলে ঠ্যাঙ ঢোকাবে তাদের জন্যে একটা ফাণ্ড খুলবে। ফাণ্ডটা না খুললে কম্‌কচাঁপা আর আমাকে স্রেফ মাইরি অনশন-ফনশন করে তোমার কাছে বডি দুটো রেখে ওয়ার্ল্ড থেকে হড়কে যেতে হবে।'

'নিউলি-ম্যারেড'দের জন্য একটা ফাণ্ড খুলব বলেছিলাম। কিন্তু নানা টাইপের ঝামেলার জন্য খোলা হয়ে ওঠে নি। বোদার পিঠে টুসকি মারতে মারতে বললাম, 'ঘাবড়াস না পার্টনার, বাসর-ঘর থেকে বেরিয়ে কাল যখন আমাদের টেণ্টে যাবি দেখবি নাকের ডগায় ফাণ্ডটা ঝুলিয়ে রেখেছি। ও-কে?'

'ও-কে গুরু, তোমার শ্লা জবাব নেই।'

'যদি বলিস, তোর যে লেণ্ডিগেণ্ডি জন্মাবে তাদের জন্যও একটা অ্যাডভান্স ফাণ্ড খুলে দিচ্ছি।'

বত্রিশটা ট্যারাবাঁকা কালচে ক্ষয়া দাঁত বার করে বোদা কচি ছুঁড়ির মতো লাজুক একটু হাসল। তারপর বলল, 'গুরু, তোমার কী চোখের জোর মাইরি। এক বছর পরের ব্যাপার ঠিক দেখতে পাও। ঐ অ্যাকাউন্টের একটা ফাণ্ডও খুলে দাও।'

মহাশয়গণ, নিজের অজান্তেই বোদার পাছায় আলতো করে একটা লাথি হাঁকিয়ে বললাম, 'গভর্নমেণ্টের শ্লোগানটা মনে থাকে যেন মাকড়া। 'হাম দো, হামারা দো'র পর 'হামারা তিন' হলে সেদিনই ফাণ্ডে তালা ঝুলিয়ে দেব আর তোদের হাতে হেরিকেন ধরিয়ে ইণ্ডিয়ার বাইরে চালান করব। ও-কে?'

'ও-কে গুরু। তোমার আশীব্বাদ থাকলে 'হামারা দো'তেই ফুল ইস্টপ হয়ে যাবে। তুমি মাইরি খালি একটু নজর রেখো। দুটো হবার পর রেড সিগনাল দেখিয়ে দিও।'

আমি আদরের স্টাইলে বোদার নাকে একটা টুসকি মারলাম।

হে-হে মহাশয়গণ, বোদা আবার কী বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই আমার কাঁধের কাছ থেকে সর্দি-বসা ঘড়ঘড়ে গলা শোনা গেল, 'এই যে মশাই—'

ঘাড় ফেরাতেই নোকলে কবরেজ অ্যাণ্ড কোম্পানিকে দেখতে পেলাম। মহাশয়গণ, কেউ আর স্ট্রেট দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। সবার পেট এক দেড় ফুট করে সামনের দিকে এগিয়ে এসেছে। স্টমাকে একেক জন কতটা কোয়ান্টিটি লোড করেছে, দেখেই টের পাওয়া যায়। জিজ্ঞেস করলাম, 'খাওয়ার ব্যাপারটা কিরকম হল?'

'ভাল।'

'পার্ক স্ট্রিটের বাবুর্চিরা রেঁধেছে কেমন?'

'ভাল।'

'আপনার আর আপনার ব্যাটালিয়ানের পেট ভরেছে?'

মহাশয়গণ, নোকলে কবরেজ মুখ খোলার আগেই আমার বাঁ গালের পাশ থেকে পঞ্চানন বলে উঠল, 'পেট ভরে নি মানে! ঐ কবরেজ আর তার গ্যাং-এর পেট তো না, একেকটা করে দশ টনের সাইলো। সবাই দুটো করে আস্ত মুরগি, এক ডজন করে ফ্রাই, মটন রোল, দেড় ডজন করে মালাই চিংড়ি, স্প্যানিশ-আফগানি ভেটকি, সাওয়ার-সুইট কই হাওয়া করে দিয়েছে। তার ওপর আছে দই, রাবড়ি, সন্দেশ, আইসক্রিম, রাজভোগ এটসেট্রা।'

নোকলে কবরেজ বলল, 'প্রতিটি আইটেম উৎকৃষ্ট হয়েছে। আরো খাওয়া যেত। তবে রাত করে এতটা রাস্তা হেঁটে বাড়ি ফিরতে হবে কিনা। তাই—'

মহাশয়গণ, মালটিকে আবার ভাল করে দেখুন। অতটা কোয়ান্টিটি দই-সন্দেশ-রাবড়ি-মুরগি-ভেটকি ইত্যাদি পাকস্থলীতে চালান করার পরও বলছে আরো খেতে পারত। মাকড়া যে রেটে খাবার-দাবার টানছে তাতে গভর্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়াকে স্রেফ ব্যাংক্রাপসির খাতায় নাম লেখাতে হবে। বললাম, 'স্টমাকে যখন স্পেস আছে, ওটুকু ফিল-আপ করে নেবেন নাকি? সেকেণ্ড রাউণ্ড হয়ে যাক।'

আরেক বার প্যাণ্ডেলে গিয়ে খেতে বসবে কি বসবে না—কয়েক সেকেণ্ড ভেবে নিল নোকলে কবরেজ। মুখচোখ দেখে টের পাচ্ছি—খাবার-দাবারগুলো ম্যাগনেটের মতো ওকে প্যাণ্ডেলের দিকে টানছে। খচ্চরটা ভেতরে ভেতরে খানিকক্ষণ নিজের সঙ্গে ফাইট করল। তারপর দারুণ অনিচ্ছার ভঙ্গিতে বলল, 'না থাক। রাত করে আর দু'বার খাব না। চরক আর সুশ্রুতের বারণ আছে।'

'কারেক্ট বলছেন?'

'হ্যাঁ, কারেক্ট।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, 'এবার বলুন তো মাকড়া, বাপ হয়ে মেয়ের বাসর-ঘরে কেন 'ইন' করেছেন?'

পঞ্চাননকে দেখিয়ে নোকলে কবরেজ বলল, 'পেঁচো বলছিল, মুক্তাঙ্গন বাসর-ঘর খুলেছে, এখানে যে কেউ ঢুকতে পারে। তবে আমি বাসর-ঘরে মজা দেখতে ঢুকিনি—'

'তা হলে কী জন্যে?'

'আপনার সঙ্গে তখন কথা হল না, হিন্দুমতে বিয়ের পর সরকারি মতে একটা বিয়ে দিতে হবে। ম্যারেজ রেজিস্ট্রার এসে গেছে?'

পার্ক স্ট্রিটের দারুণ দারুণ খাবার দাবার ওড়াবার পরও দেখা যাচ্ছে, খজড়া আসল ব্যাপারটা একেবারেই ভোলে নি। ছাঁদনাতলার ভিড়ভাট্টা, গাদা গাদা ইয়ং গার্ল, বোদা আর পুরুতের পাল্লা দিয়ে স্যাংস্কৃট মন্ত্র আওড়ানো, ইত্যাদি ঝামেলার ভেতর রেজিস্ট্রি ম্যারেজের ব্যাপারটা স্রেফ ভুলে গিয়েছিলাম। পঞ্চাননের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলাম, 'ম্যারেজ রেজিস্ট্রার এসেছে?'

পঞ্চানন ঘাড় কাত করে বলল, 'এসেছে স্যার, আপনার ঘরে বসিয়ে রেখেছি।'

ওধার থেকে নোকলে কবরেজ বলল, 'তাকে এখানে ডেকে আনো। গভর্নমেণ্টের বিয়েটা এই মুক্ত বাসর-ঘরেই হয়ে যাক। ওটা হলেই আমি বাড়ি ফিরতে পারি।'

আমি চোখ দিয়ে সিগন্যাল দিতেই পঞ্চানন জিরাফের মতো লম্বা লম্বা ঠ্যাং ফেলে এক দৌড়ে ম্যারেজ রেজিস্ট্রারকে ধরে নিয়ে এল এবং এনেই ওকে বর-কনের খাটের একধারে প্লেস করে দিল।

মহাশয়গণ, ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের বয়স ষাটের কাছাকাছি। বাঙালি কমেডিয়ান ইন্দু মুখার্জি আর ইণ্টাবন্যাশনাল ট্রাম্প চার্লি চ্যাপলিনকে ফিফটি ফিফটি মেশালে যা দাঁড়ায় লোকটার চেহারা বিলকুল তাই। মাথার ঠিক মাঝখান দিয়ে ইণ্ডিয়া-পাকিস্তান বর্ডারের মতো সিঁথি, তার দু'ধারে পাট-করা কাঁচা-পাকা চুল। গোল চোখে সুতো বাঁধা গোল চশমা। নাকের তলায় চৌকো চ্যাপলিন-মার্কা গোঁফ। পরনে ডবল কাফ দেওয়া ফুল শার্ট আর কাঁধের ওপর দিয়ে গালিস-লাগানো ঢল্‌লা ফুল প্যান্ট। শার্টটা প্যাণ্টের তলায় গুঁজে দেওয়া। পায়ে থ্যাবড়ামুখো বুট।

মহাশয়গণ, আমরা কেউ মুখ খোলার আগেই ম্যারেজ রেজিস্ট্রার বলল, 'আমার নাম প্রজাপতি চাকলাদার। আমার ক্রেডিটে টেন থাউজেণ্ড বিয়ে রয়েছে। হিন্দু, মুসলিম, নো ক্রিশ্চান, শিখ, পার্শি—যে কোনো রিলিজিওন, যে কোনো কাস্টের লোক বলুন, আমি বিয়ে দিয়েছি। এ ব্যাপারে আমার মশাই ইণ্টারন্যাশনাল ফেম।' বলে ক্যানাডিয়ান ইঞ্জিনের মতো হুস করে নাকমুখ দিয়ে কিছু গরম ভেপার বার করে ফের নতুন এনার্জি নিয়ে শুরু করল, 'আমার আরো একটা ক্রেডিট হল, একটা বিয়েও আনসাকসেসফুল নয়। নো ডাইভোর্স, নো সেপারেশন। টিল ডেথ ডু আস পার্ট—দশ হাজার পেয়ার হাজব্যাণ্ড আর ওয়াইফ হ্যাপিলি লাইফ কাটিয়ে দিচ্ছে। হে-হে মশাইরা, আমার নামটা মার্ক করেছেন তো?'

বললাম, 'করেছি, বৈকি আর বুঝতে পারছি সেই বেদ না উপনিষদ কোথাকার যেন গড প্রজাপতি গালিস-দেওয়া ফুলপ্যাণ্ট পরে আমাদের সামনে এখন বসে আছে।'

প্রজাপতি চাকলাদার সাউথ ইণ্ডিয়ানদের মতো মাথাটা ডাইনে বাঁয়ে অনবরত দোলাতে দোলাতে গ্যাদগেদিয়ে হাসতে লাগল, 'হে-হে-হে-হে—'

মহাশয়গণ, আমার কথায় মালটি দারুণ খুশি। বললাম, 'এবার ঝটপট বোদা আর কনকচাঁপার বিয়েটা চুকিয়ে ফেলুন তো।'

জাবদা খাতার মতো একটা বিরাট এক্সারসাইজ বুক আর ম্যারেজ রেজিস্ট্রেসন ফর্ম বার

করে হুড়-হুড় করে কী সব লিখে ফেলতে লাগল প্রজাপতি।

আমি ফের জিজ্ঞাসা করলাম, 'এদের বিয়েটা কেমন হবে?'

খাতার ওপর কলম আর চোখ সেট করে রেখে প্রজাপতি বলল, 'নো ডাইভোর্স, নো সেপারেশন, অ্যাণ্ড টু হানড্রেড পারসেন্ট হ্যাপিনেস গ্যারান্টিড।'

'দেখবেন মাকড়া যা গ্যারান্টি দিলেন তার স্লাইট গড়বড় হলে—'

আমার কথা শেষ হবার আগেই প্রজাপতি চাকলাদার গলার শির হিউম পাইপের মতো ফুলিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'আমাকে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড় করিয়ে দেবেন।' একটু থেমে তক্ষুণি আবার বলল, 'আমি রেডি। আপনাদের উইটনেস-টুইটনেস সব হাতের কাছে আছে তো?'

বললাম, 'উইটনেসের অভাব নেই গড প্রজাপতি। চারপাশের টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড লোক আপনার জন্যে হাত ধুয়ে বসে আছে।'

'পঁচিশ হাজারের দরকার নেই। তিনজন হলেই চলে যাবে। এখন ব্রাইড আর ব্রাইডগ্রুম সিগনেচার করুক।' বলে ম্যারেজ ফর্ম আর পেনটা বোদা আর কনকচাঁপার দিকে এগিয়ে দিল।

মহাশয়গণ, বোদার মুখটা একবার দেখুন। সই করার কথায় খজড়াটার মুখ স্রেফ ঘোড়ার মতো হয়ে গেছে।। কিন্তু মোটে দু-চার সেকেণ্ড। তারপরই কলমের নিবটা আঙুলে ঘষে ঘষে কালো করেই ম্যারেজ ফর্মে একটা টিপসই মেরে পুরো বত্রিশটা দাঁতের পেখম মেলে দিল।

প্রজাপতি চাকলাদার বলল, 'সিগনেচারের বদলে থাম্ব ইম্প্রেসান!'

বললাম, 'সিগনেচারে স্লাইট অসুবিধে আছে। যে কান্ট্রির এইট্টি পারসেন্ট লোক অ-আ-ক-খ, এ-বি-সি-ডি চেনে না সেখানে বোদা সাইন করবে না। হোল লাইফ টিপসই দিয়ে যাবে।' বললাম বটে, কিন্তু মহাশয়গণ, আমার মতো আপনারাও জানেন একটা পেন কোম্পানির এক বছরের পুরো প্রোডাক্ট ওর হাতে তুলে দিলেও সবগুলো কলম বকের ঠোঁটের মতো হাঁ হয়ে যাবে কিন্তু সিগনেচারটা কিছুতেই হবে না।

প্রজাপতি চাকলাদার ঘাড়টা দেড় ফুট হেলিয়ে বলল, 'প্রিন্সিপ্যালটা ভাল।' বলেই ম্যারেজ ফর্মটা কনকচাঁপার দিকে বাড়িয়ে দিল।

মহাশয়গণ, নতুন হাজব্যাণ্ডের প্রেসটিজ রাখার জন্যই খুব সম্ভব বোদার টিপসইয়ের তলায় নিজের বুড়ো আঙুলের টিপসই বসিয়ে দিল কনকচাঁপা।

এরপর সাক্ষীদের পালা। টিপসইয়ের ব্যাপারটা এপিডেমিকের কাজ করল। মহাশয়গণ, আমাকে নিয়ে সতের জন উইটনেস, সাক্ষীর জায়গায় যতটা স্পেস ছিল সবটা ফিল-আপ করার জন্য, পর পর বুড়ো আঙুলের ছাপ বসিয়ে দিল। প্রজাপতি চাকলাদার অতীব তুখোড় মাল। ক্রিমিন্যালদের বেলায় যেমন হয় তেমনি প্রত্যেকটা টিপসইয়ের তলায় উইটনেসের নাম ঠিকানা লিখে বলল, 'আমার ফোর্টি ইয়ার্সের কেরিয়ারে এরকম বিয়ে আর কখনও দিই নি।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কিরকম?'

'দেখছেন না মশাই, গোটা বিয়েটাই হল টিপসইয়ের ওপর। বর কনে থেকে শুরু করে উইটনেস পর্যন্ত সবাই বুড়ো আঙুলের ছাপ মেরে গেল। থাম্ব ইম্প্রেসানের ওপর বিয়ে আমার

লাইফে এই ফার্স্ট দেখলাম। যাক গে, আমার আর কী?' বলতে বলতে চটপট হাত চালিয়ে খাতাপত্তর গুছিয়ে নিল প্রজাপতি চাকলাদার। তারপর বিয়ের ডকুমেন্টটা তুলে ধরল, 'এটা তা হলে আপনারা রেখে দিন। আর আমার ফি-টা চুকিয়ে ফেলুন।'

মহাশয়গণ, বোদা ডকুমেন্টটা ধরবার জন্য হাত বাড়াতে যাচ্ছিল, তার আগেই নোকলে কবরেজ ছোঁ মেরে সেটা একরকম কেড়েই নিল। তারপর ভাঁজ করে ধুসো কোটের পকেটে পুরতে পুরতে বলল, 'এটা আমার কাছেই থাকবে। এটা থাকলে—'বোদার দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলতে লাগল, 'ঐ ছোকরা ঘুন্টিকে ফেলে পালাতে পারবে না। গভর্নমেন্টের পাকা বিয়েটা হয়ে গেল। বিয়ের দলিল আমার পকেটে ঢুকেছে। এবার তা হলে চলি।'

নোকলে কবরেজ তার লাইট মারহাট্টা ইনফ্যান্ট্রি নিয়ে বাড়ি ফেরার জন্য যখন ফরোয়ার্ড মার্চ শুরু করতে যাবে সেই সময় দুম করে একটা কথা ক্যামেরার ফ্ল্যাশ জ্বলার মতো আমার মনে পড়ে গেল। বললাম, 'ওয়েট মশাই, একটু দাঁড়িয়ে যান।'

নোকলে কবরেজ আমার দিকে ফিরল। জিজ্ঞেস করল, 'কিছু বলবেন?'

আস্তে আস্তে মাথা দোলাতে দোলাতে বললাম, 'একটা ব্যাপারে ভীষণ কিউরিওসিটি হচ্ছে।'

'কী?'

'এ বিয়েতে আলটিমেটলি তো এলেন—'

'মেয়ের বিয়েতে আসব না, বলেন কী মশাই!'

'তা হলে বোদাকে নিয়ে আপনার বাড়িতে বিয়ের ব্যাপারটা যেদিন ফাইনাল করতে গিয়েছিলাম সেদিন খজড়ামো করে আমাদের ভাগিয়ে দিয়েছিলেন কেন?'

ফাটা তবলায় এলোপাথাড়ি চাপড় কষালে যেরকম হয় ঠিক সেই টাইপের আওয়াজ করে এক রাউণ্ড হেসে নিল নোকলে কবরেজ। তারপর বলল, 'না ভাগালে এরকম একটা বিয়ে আমার চোদ্দ পুরুষ দিতে পারত? ফোকটে কেমন একখানা বিয়ে হয়ে গেল।'

মহাশয়গণ, আমি যে আমি—পিটার স্বয়ম্ভু হোড়, একজন থার্ড গ্রেডের ফোরটোয়েন্টি, একটা টেবিফিক চিট—নোকলে কবরেজ তার মাথায় পর্যন্ত লাট্টু ঘুরিয়ে দিল।

আমি দু ঠোঁট ফাঁক করে কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, তার আগেই নোকলে কবরেজ ঘড়ঘড়ে গলায় ফের শুরু করে দিল, 'সেদিন রাত্তিরে ঐ ছোঁড়াটা সিটি মেরে ঘুন্টিকে বার করে নিয়ে গেল, যাবার সময় ঘুন্টি আলমারি হাতড়ে ওর কুষ্ঠিটা নিল। শুয়ে শুয়ে সব দেখলাম। দেখি কদ্দূর বাড়তে পার! নাটাই আমার হাতে রয়েছে। উড়ে যাও খানিকটা, তারপর সময় হলে ঠিক গিয়ে হাজির হয়ে যাব। আজ সময় হয়েছে, হাজির হয়ে গেলাম।' একটু থেমে বলল, 'অনেক রাত হল। আচ্ছা চলি।'

আমি শিরদাঁড়া বাঁকিয়ে নোকলে কবরেজের পায়েব দিকে ঝুঁকতে যাচ্ছিলাম, কবরেজ ইলেকট্রিক শক খাওয়ার মতো লং জাম্প দিয়ে দশ ফুট পিছিয়ে গেল। বলতে লাগল, 'করছেন কী মশাই, করছেন কী?'

'তুমি গুরু আমার চাইতেও উৎকৃষ্ট হারামী। তোমার পায়ের ধুলো একটু দাও মাইরি। তা

হলে আমার লাইনে আগাপাশতলা সিদ্ধপুরুষ বনে যাব।'

'কী যে বলেন, কী যে বলেন—' ঘড়ঘড়ে গলায় বগবগিয়ে হাসতে হাসতে নোকলে কবরেজ 'আবার খাবো' সন্দেশের দলকে নিয়ে চলে গেল।

মহাশয়গণ, আরো আধ ঘণ্টা পর বোদা আর কনকচাঁপার ওপেন-এয়ার বাসর-ঘর টেরিফিক জমে উঠল। সেই পন্টা আজিজদের মনে আছে তো? হাইওয়েতে যারা সমাজপতির গাড়ি থামিয়ে হোল্ড-আপ করতে গিয়েছিল? এই মুহূর্তে তারা বঙ্গো, হারমোনিয়াম, ব্যাঞ্জো, ম্যাণ্ডোলিন, সব মিলিয়ে পুরো একটা অর্কেস্ট্রা নিয়ে এসেছে।

দেখতে দেখতে হুল্লোড় শুরু হয়ে গেল। বাজনার সঙ্গে তাল মিলিয়ে নাচ এবং কোরাসে গান। মহাশয়গণ, নাচ কি এক টাইপের—চা-চা-চা, হুলা হুপ, ওয়ালজ, ফক্সট্রটের সঙ্গে পাঞ্চ করে ভরতনাট্যম, কত্থক, কথাকলি, ভোজপুরী, মণিপুরী এটসেট্রা। গানের বেলাতেও তাই। হিন্দুস্থানী, কর্ণাটকী, ধ্রুপদ, ধামার বাউল, ভাটিয়ালী, রামপ্রসাদীর সঙ্গে ওয়েস্টার্ন পপ মিউজিকের ককটেল। সব মিলিয়ে মহাশয়গণ, আগরপাড়ার এই ব্যারাকবাড়িতে প্যাসিফিক ওসেনের টাইফুন বয়ে যেতে লাগল। আর তার শব্দে দশ কিলোমিটার রেডিয়াসের ভেতর মানুষ গরু ছাগল কুকুর বেড়াল শেয়াল ইঁদুর থেকে শুরু করে কাক শকুন মশা মাছি ছুঁচো প্যাঁচা, মানে যত রকমের অ্যানিমেট প্রাণী আছে, তাদের কানের পর্দা ফেটে যেতে লাগল।

মহাশয়গণ, এই হুল্লোড়বাজি আমার নার্ভে র‍্যাঁদা চালিয়ে যাচ্ছিল। সারাদিন হাজার টাইপের ঝামেলা গেছে। আমি আর শিরদাঁড়া খাড়া করে রাখতে পারছিলাম না। মিডিল-এজেড মেয়ে পুরুষ, যুবক যুবতী, অল্প বয়েসের ছোঁড়াছুঁড়ি—সবাই যখন সমবেত ড্যান্স ফ্যান্সে মেতে আছে আমি সেই ফাঁকে সটকে পড়লাম। এখন নিজের ঘরে গিয়ে টান টান হয়ে বিছানায় বডি ফেলে দেওয়া দরকার। কিন্তু মহাশয়গণ, সবার চোখে ধুলো ছিটোতে পারলেও, একজনের চোখে পারলাম না। বোদা এবং কনকচাঁপার বিয়ের একটা বড় পোর্টফোলিও তার হাতে থাকলেও, সুমনা অনেক রকম রেসপনসিবিলিটির ফাঁকে আমার ওপর ঠিক নজরটা রেখে গেছে, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের টেরিফিক যাসুসদের মতো।

হে-হে মহাশয়গণ, ঘরে ঢুকে বিছানায় লাট খেয়ে পড়তে যাব, সুমনা দরজার কাছ থেকে ডাকল, 'একি, আপনি চলে এলেন?'

বললাম, 'আমার বডিটা ব্লাড অ্যাণ্ড ফ্লেশের তো। ঘণ্টাকয়েক ঘুমের দরকার।'

'তার আগে খেয়ে নিন।'

চোখে পড়ল, একটা বড় প্লেট বোঝাই করে অনেক রকম খাবারদাবার নিয়ে এসেছে সুমনা। মহাশয়গণ, আপনাদের আগেই জানিয়ে দিয়েছি, আমার ব্যাপারে ছুকরি মরেছে, বিলকুল ফিনিশড। যাক গে, একজন যদি মরতে চায়, আমি আর কী করতে পারি! বললাম, 'এখন খেতে ইচ্ছে করছে না।'

সুমনা বলল, 'এগুলো আমাদের ঘরের খাবার নয়, জনগণের পয়সায় কেনা জনগণের খাবার। আশা করি, এবার খেতে ইচ্ছে হবে।'

মহাশয়গণ, মেয়েটাকে আপনারা হয়ত ভেবেছিলেন এক টুকরো ভেজা ব্লটিং পেপার। চিজটি আসলে তা না। মাঝে মধ্যে স্পার্ক মারতেও পারে।

এখন আর কথা বলতে ভাল লাগছে না। নোকলে কবরেজ আমার অনেকটা এনার্জি বার করে নিয়েছে। বললাম, 'ঠিক আছে, দাও—'

আমাকে খেতে দিয়ে সুমনা খানিকটা দূরে বসল। বিয়ের অকেসন বলে তার আজ স্পেশাল ড্রেস। খোঁপায় ফুল, চোখে কাজল, পরনে সিল্কের একটা শাড়ি। মহাশয়রা, আপনারা তো জানেনই পঞ্চ 'ম' কারের মধ্যে যে 'ম'টা দিয়ে মেয়েমানুষ হয় সেটাকে আমার দু'শ কিলোমিটারের ভেতরে ঢুকতে দিই না। রাস্তার ল্যাম্পপোস্ট, লেটার বক্স, ঘরের আলমারি, কাপডিশ ইত্যাদি দেখার মতো সুমনার দিকে একবার তাকিয়ে ঘাড় গুঁজে খেতে লাগলাম।



মহাশয়গণ, বোদার বিয়ের পর দিনচারেক কেটে গেছে। এই ব্যারাকবাড়িতে বোদা আর আমি যে ঘরটায় থাকতাম সেটার মাঝখানে কার্ডবোর্ডের পার্টিশান তুলে দু'ভাগ করে নেওয়া হয়েছে। এখন এর একদিকে থাকে বোদা আর কনকচাঁপা, আরেক দিকে আমি।

মহাশয়গণ, একদিন বোদা আর আমি কনট্রাক্ট করেছিলাম, বাকি লাফিটা দু'জনে যুগলবন্দি হয়ে এখানে ওখানে স্রেফ নোম্যাডদের মতো ঘুরে বেড়াব। তেমন দরকার হলে দু-একদিনের জন্য কোথাও তাঁবু ফেলব। ঘুরতে ঘুরতে আর ভাসতে ভাসতে ওয়ান্স আপ অন এ ডে আমরা এই ব্যারাকবাড়িতে এসে টেন্ট খাটিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম দু-চারদিন কি দু-চার উইক এখানে কাটিয়ে একদিন সটকে পড়ব। তারপর ইটার্নাল পেডেস্ট্রিয়ান, মানে শুদ্ধ বাংলায় যাকে বলে চিরকালের পদাতিক হয়ে আবার ফরোয়ার্ড মার্চ করতে-করতে এগিয়ে যাব। কিন্তু মহাশয়গণ, বোদা মাকড়া স্রেফ গাড্ডায় পড়ে গেল। ক্যাঁচাকলে পা ঢুকিয়ে ফেলেছে খজড়াটা, ওই পা আর টেনে বার করতে পারবে না এই লাইফে।

হে-হে মহাশয়গণ, আপনাদের কম করে দেড় লাখ বার জানিয়ে দিয়েছি আমি একটা ফোর টোয়েন্টি, একজন থার্ড ক্লাস চিট, আমার অ্যাকটিভিটি দেখে নিশ্চয়ই তা টের পেয়ে গেছেন। চিটিংবাজি-ফাজি যা-ই করি না কেন, আসলে মহাশয়গণ আমি গীতার সেই মুক্তপুরুষ। এ কি, আপনারা দাঁত বার করে হাসছেন! বুঝতে পারছি আমার মতো ফোরটোয়েন্টির মুখে গীতা ফীতা শুনে আপনাদের পেটের ভেতর হাসি বগবগিয়ে উঠেছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, মুক্তপুরুষ ফুরুষ আর বলছি না। আমাকে বহুরূপী টহুরূপী ভাবতে আপত্তি নেই তো? আপনারা তো জানেনই, চিটিংবাজরা লোকের চোখে ধুলো ছিটোবার জন্যে অনবরত মেক-আপ চেঞ্জ করে থাকে। এই আমাকেই দেখুন না। 'গ্রেট হিমালয়ান বোর্ডিং'-এর ম্যানেজার জয় বাবা তারকনাথ, কি 'মলিন মুক্তি' লম্ভির সেই খচ্চর গাইয়েটা কিংবা বি. টি. রোডের পাবলিক শুঁড়িখানার প্রোপ্রাইটর-কাম-ক্যাশিয়ার বা আমার ছেলেবেলায় আটাগুড়ি অরফ্যানেজ থেকে

কলকাতায় এসে যে সব বানচোতকে 'বাবা' বলেছিলাম তাদের কাছে আমি হলাম একজন অত্যন্ত সুপিরিয়র ক্লাসের ফোরটোয়েন্টি। আবার সমাজপতি আর তার ফ্রেণ্ডদের কাছে জিনিয়াস। সুমনা, বোদা, কনকচাঁপা, পঞ্চানন, নদেরচাঁদ থেকে আরম্ভ করে এই ব্যারাকবাড়ির লোকজন এবং আগরপাড়ার লাখখানেক পপুলেসন—এদের কাছে আমি হলাম স্বয়ং ভগোয়ান, মানে কিনা অলমাইটি গড।

দেখুন মহাশয়, এক আমি নানা টাইপের লোকেদের কাছে কখনও চিট, কখনও জিনিয়াস, কখনও গড। হাজার রকমের রোলে চল্লিশ বছর ধরে প্লে করে যাচ্ছি। ইচ্ছা ছিল বোদাকে পার্টনার করে আরো কয়েক হাজার ভূমিকায় অ্যাক্টিং করতে করতে লাইফের ম্যারাথন রেস কমপ্লিট করব। কিন্তু মহাশয়রা, বোদা ফেঁসে গেল। এখন হাজব্যাণ্ড আর লেণ্ডিগেণ্ডি হলে ফাদার—এই দুই রোলে প্লে করতে করতে শালার হাড়ে শ্যাওলা ধরে যাবে। আমি আর কী করতে পারি বলুন! আমি তো ওকে লাইফের ওপেন থিয়েটারের সামনে টেনে এনেছিলাম কিন্তু মাকড়া পোল ভল্ট মেরে সংসার ফংসারের খাঁচায় ঢুকে স্রেফ একখানা ডোমেস্টিক অ্যানিমাল হয়ে গেল। হাতের ভেতর হোল ওয়ার্ল্ড পেয়ে গিয়েছিলি! সেটাকে ছুঁড়ে ফেলে সংসারের ইঁদুরের গর্তে ঢুকে গেলি! থাকো শালা, ঐ গর্তের ভেতরেই লাইফ কাটিয়ে দাও।

হে-হে মহাশয়গণ, হাজার হাজার বছর আপনারা বিয়ে করছেন, বউর সঙ্গে শুয়ে রাত কাটাচ্ছেন, গাদা-গাদা বাচ্চার জন্ম দিয়ে পপুলেসন এক্সপ্লোসান করছেন। সব খচ্চরই তো সেঞ্চুরির পর সেঞ্চুরি এক কম্ম করে যাচ্ছে। সবাই যা করছে তার আরেকটা কার্বন কপি হয়ে ফায়দাটা কী? মজাটা কোথায়? কিন্তু মানুষ হল ভেড়ার পাল, এক মাকড়া যেদিকে যাবে লাইন দিয়ে বাকিগুলো সেদিকেই যেতে থাকবে। যাক গে, আমার আর কী?

বোদার বিয়ের পর চারদিন কেটে গেছে। এর মধ্যে আপনাদের জানাবার মতো তেমন কোনো ব্যাপার ট্যাপার ঘটে নি। শুধু নিউলি-ম্যারেড মানে নব-বিবাহিতদের জন্য একটা নতুন ফাণ্ড খুলেছি। আরেকটা ইনফরমেলন অবশ্য আপনাদের দেওয়া যেতে পারে। না, আমার মুখ থেকে না শুনে মহাশয়গণ ভাল করে দেখুন, বোদা আর আমি যে ঘরটায় থাকতাম, মাঝখানে ইন্দো-পাকিস্তান বর্ডারের মতো কার্ডবোর্ডের একটা পার্টিশান তোলা হয়েছে। পার্টিশানের একধারে বোদা আর কনকচাঁপা, গ্যাদগেদে ইমোশানের মাথায় যাকে বলে 'সাধের সংসার', তাই ফেঁদেছে। আর এধারে আমি আগের মতোই টেন্ট ফেলে আছি।

মহাশয়গণ, আরেকটা খবর আপনাদের দিয়ে রাখি। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, বিয়ের পর বোদা এখন ঘাঘী ফ্যামিলি ম্যান। পরশু দিন দেখলাম, আমার নাকের ডগা দিয়ে ধর্মপত্নীকে নিয়ে শ্যামবাজার চলে গেল। ঘণ্টা দুই পর ট্যাক্সি বোঝাই করে হাঁড়ি-কুড়ি-ডেকচি-স্টোভ থালা-বাটি-চামচে এটসেট্রা এটসেট্রা, মানে সংসার ফংসার করতে যা যা লাগে সব এনে ওদের দিকটায় ডাঁই করে ফেলল। এখন করমচাঁপা রাঁধে, বোদা পা নাচাতে নাচাতে খায়। হ্যাপি কাপল, শুদ্ধ ভাষায় যাকে বলে সুখী দম্পতি—মহাশয়গণ, ওরা হল তাই। ওদের ফ্যামিলিতে রান্নাবান্না শুরু হবার পর বোদা আর কনকচাঁপা দু'জনেই আমাকে ওদের সঙ্গে খাবার কথা

বলেছে। মানে বোদা, কনকচাঁপা আর আমি—তিনজন মিলে একটা ইউনিট করতে চেয়েছে। কিন্তু মহাশয়গণ, আপনারা তো জানেনই, ইউনিট হয় হাজব্যাণ্ড আর ওয়াইফ এই দু'জনকে নিয়ে। তাব ভেতর আরেক জন ঢুকলেই হে-হে মহাশয়রা, বিলকুল কাবাবকে হাড্ডি। আমি ফ্যামিলি লাইফের দু হাজার কিলোমিটার তফাতে থাকতে চাই। কাবাবের ভেতর হাড় হয়ে ঢুকবার ইচ্ছে আমার একেবারেই নেই।

হে-হে মহাশয়গণ, ওদের সঙ্গে খাবার জন্য প্রথমে রিকোয়েস্ট, তারপর রাগারাগি এবং ফাইনালি আমার দু পা ধরে দু'জনে অনেক কান্নাকাটি করেছে, দেড় কেজি করে চোখের জল ফেলেছে। কিন্তু মহাশয়গণ, আমাকে এক সেন্টিমিটারও ওরা হেলাতে পারে নি। বোদা ভুলে গেলেও আমার ক্লাস ক্যারেক্টর ভুলি নি, যদিও ওয়ার্ল্ডে আমার ক্লাসে আমি ছাড়া সেকেণ্ড আর কেউ নেই। হাজার রকম প্ল্যানিং করে লোকের মাথায় চক্কর লাগিয়ে লাইফ কাটিয়ে দেব। চিটিংবাজি, ফেরেববাজি, ফোরটোয়েন্টিগিরি করে ওয়ার্ল্ডে এক এণ্ড থেকে আরেক এন্ডে নোম্যাডদের মতো ঘুরে বেড়াব—আমার কাছে এটাই হল একমাত্র ফিলজ়ফি, শুদ্ধ বাংলায় ঐহিক এবং পারলৌকিক দর্শন। বোদা মাকড়া এই ফিলজফিতে নাড়া বেঁধে লম্বা ম্যারাথন রেসে আমার সঙ্গে মোটে দশ কিলোমিটার দৌড়েই ঘাড় গুঁজে মুখ থুবড়ে পড়ল। থাকো শালা, পরমানন্দে এখানেই লাট খেয়ে শুয়ে থাকো। সময় হলেই আমি আবার আগরপাড়ার এই ব্যারাকবাড়ি থেকে ফ্লাই-ফ্লু ফ্লোন করব।

যাক গে, যা বলছিলাম। মহাশয়গণ, আমি বোদাদের ক্যাঁচাকলে পা ঢোকাই নি। সেই পবিত্র খালসা হোটেলে রোটি-তড়কা-চাটনি-পেঁয়াজ আর হরা মিরচি দিয়ে প্রোলেটাবিয়েট লাঞ্চ আর ডিনার চালিয়ে যাচ্ছি। আর দুপুরের খাওয়া দাওয়া সেরে সমাজপতির দেওয়া সেই মাল্টি-স্টোরিড বিল্ডিং-এ ষোলশ স্কোয়ার ফুটের ফ্ল্যাটে গিয়ে কয়েক ঘণ্টা করে টাইম কাটিয়ে আসছি।

হে-হে মহাশয়গণ, আজ দুপুরে আগরপাড়া থেকে গড়িয়াহাটার অ্যাপার্টমেন্টে আসতেই হীরা বাহাদুর দরজা খুলে মিলিটারি স্টাইলে প্রথমে একটা স্যালুট হাঁকল। তারপর প্রায় এক দমে বলে গেল, 'সাব, মিতার সাব আপকো ফোন কিয়া।'

মহাশয়গণ, হীরা বাহাদুরের মঙ্গোলিয়ান জিভে মিটার সাহেব মিতার সাব হয়ে দাঁড়িয়েছে। মিটার সাহেব মালটি কে, নিশ্চয়ই আপনারা টের পেয়ে গেছেন। হীরা বাহাদুর অভ্যুদয় মিটারের কথা বলছে।

অভ্যুদয় কেন ফোন করেছেন, সেটা বুঝতে পারছি। হীরা বাহাদুরের পাশ দিয়ে ড্রইং রুমে ঢুকে একটা সোফায় বসলাম। তারপর সেন্টার টেবলের ওপর ঠ্যাং দুটো তুলে দিয়ে ঝাড়া আধ ঘন্টা চোখ বুজে রেস্ট নিয়ে নিলাম।

হীরা বাহাদুর দরজা ফরজার ছিটকিনি লাগিয়ে বাইরের ঘরে চলে এসেছিল। আমাকে চোখ বুজে পড়ে থাকতে দেখে দারুণ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। কানের কাছে মুখ এনে আস্তে করে ডাকল, 'সাব—'

চোখ না মেলেই বললাম, 'বলে ফেল মানিক—'

'মিতার সাব দশ দফে ফোন কিয়া থা।'

'ঘাবড়াস না। দশ বার যখন করেছে, দরকার হলে আরো দশ বার করবে। যাও চাঁদ, এবার গিয়ে বিছানায় বডি থ্রো দিয়ে বিকেল পর্যন্ত ঘুমিয়ে নাও।'

হীরা বাহাদুর চলে গেল। আমি ঠ্যাং নাচাতে নাচাতে দিনের বেলায় ঘুম এনজয় করতে লাগলাম।

মহাশয়গণ, পুরো একটা ঘন্টাও কাটল না, তার আগেই ফোন বেজে উঠল। ঘুমোতে ঘুমোতেই ক্রেডেল থেকে টেলিফোনটা তুলে কানে সেট করে বললাম, 'হ্যালো—'

ওধার থেকে ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট-কাম-পলিটিসিয়ান অভ্যুদয় মিটারের গলা শোনা গেল, 'আরে স্বয়ম্ভু—তুমি! এবার নিয়ে তোমাকে আমি ইলেভেনথ টাইম ফোন করলাম।'

মহাশয়গণ, মুখের চামড়ায় স্লাইট ভাঁজ না ফেলে বললাম, 'স্যার, আমিও আপনাকে দশ-বার বার ধরতে চেষ্টা করেছি। যতবার 'রিং' করছি ততবারই 'এনগেজড' টোন আসছে। আলটিমেটলি আপনাকে ক্যাচ করা গেল।'

'ও, তুমিও ফোন করছিলে? আমার লাইনটা অলমোস্ট সবসময় বিজি থাকে। দেখো দেখি, তোমাকে কী ট্রাবলটা নিতে হল!'

মহাশয়গণ, আমি কতটা ট্রাবল নিয়েছি আপনারা সবাই দেখেছেন। কিন্তু সিম্পল টাইপের দু-একটা ভক্কি মারলে অভ্যুদয় মিটার যদি খুশি হয়ে যান, আমি আর কী করতে পারি। বললাম, 'ট্রাবল আবার কিসের স্যার! আপনার জন্যে দশ বার কেন, দশ হাজার বার ফোন করতে পারি।'

অভ্যুদয় বললেন, 'তোমার সঙ্গে আর্জেন্ট কাজ আছে—'

'বলুন স্যার।'

'ইলেকশান এসে গেল। তিন দিনের ভেতর নমিনেশন সাবমিট করতে হবে। তোমার পাক্কা অ্যাসুয়েরেন্স না পেলে আগরপাড়া কনস্টিটিউয়েন্সি থেকে সাবমিট করতে পারছি না।'

'এক মিনিট আমাকে ভাবতে দিন স্যার—' মহাশয়গণ, আপনারা তো জানেনেই, আমার ব্রেনে প্ল্যানিং কমিশনের পুরো হেড কোয়ার্টারটা বসানো রয়েছে। পুরো এক মিনিট মানে ষাট সেকেণ্ডও লাগল না, পনের সেকেণ্ডের ভেতর সেখানে ফ্ল্যাশ বাল্ব জ্বলে উঠল। বললাম, 'স্যার, আমার একটা সাজেসান আছে।'

'একটা কেন, একশ'টা থাক না। তোমার সাজেসান ছাড়া আমি এক ইঞ্চিও এগুবো না। পলিটিকাল ব্যাপারে তুমি আমার ফ্রেণ্ড, ফিলজফার অ্যাণ্ড গাইড।' অভ্যুদয় মিটার দারুণ উৎসাহের গলায় বলে যেতে লাগলেন, 'তোমার ব্রেন থেকে যখন সাজেসান আসছে তখন সিওর সাকসেস।'

দেখুন মহাশয়গণ, আমার ওপর মাকড়ার কি রকম বিশ্বাস! আমি ওর কতটা ফ্রেণ্ড, ফিলজফার এবং গাইড হব, এতদিনে নিশ্চয়ই মালুম পেয়ে গেছেন। মনে মনে দুর্ধর্ষ গোটাকতক খিস্তি ঝেড়ে নিশ্চয়ই বলছেন, শালা গাইড না মিসগাইড!

অভ্যুদয় মিটার আবার বলে উঠলেন, 'তুমি যেরকম সাজেসান দেবে আমি সেইভাবে চলব। এবার বল—'

'বলছিলাম, আপনি দুটো কনস্টিটিউয়েন্সি থেকে নাম সাবমিট করুন। একটা আরব্যান এরিয়া, আরেকটা রুরাল এরিয়া।'

মহাশয়গণ, আপনারা এতক্ষণে নিশ্চয় কপালে বিরানব্বইটা রিঙ্কল ফেলে ভাবতে শুরু করেছেন, শালার ধান্দাটা কী! স্বয়ম্ভু খজড়াটা দুটো কনস্টিটিয়েন্সি থেকে অভ্যুদয় মিটারকে কেন ঝোলাতে চাইছে! মহাশয়গণ, 'অফ দি রেকর্ড' আপনাদের জানিয়ে রাখছি, অভ্যুদয় মাকড়াকে আমার কমপ্লিটলি ফাঁসিয়ে দেবার ইচ্ছা। কিভাবে ফাঁসাব, সেটা এখন আপনাদের বলছি না। আপনারা শুধু চোখের তারা ফিক্সড করে আমাকে মার্ক করে যান।

অভ্যুদয় মিটার জিজ্ঞেস করলেন, 'দু'জায়গা থেকে সাবমিট করতে বলছ কেন?'

'স্যার, সেকেণ্ড লাইন অফ ডিফেন্স থাকা খুব দরকার। এক জায়গায় হড়কালে আরেক জায়গায় ঠ্যাং রাখতে পারবেন।'

টেলিফোনের ভেতর দিয়ে ঘোড়ার ডাকের মতো একটা শব্দ বেরিয়ে এল, 'হুঁ। গুড সাজেসান। আগরপাড়ায় একটা কনস্টিটিউয়েন্সি তো আমার আছেই। রুরাল এরিয়ার কোত্থেকে দাঁড়ানো যায় বল দেখি?'

মহাশয়গণ, মাকড়া যে কোনো রুরাল কনস্টিউটিয়েন্সি থেকেই দাঁড়াক, রেজাল্ট একই হবে।

দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, সাউথ চব্বিশ পরগনা কি সুন্দরবন—যেখানেই ও দাঁড়াবে, বারটা ওর বাজিয়ে ছাড়বই। এখনই বলতে পারি, 'যেখানে ইচ্ছা দাঁড়ান না—' কিন্তু তাতে মাকড়া সন্দেহ ফন্দেহ করতে পারে। মালকে ফাঁসাবার আগে সাবধানে স্টেপ ফেলাই ভাল। বললাম, 'রুরাল এরিয়াতে কোথায় আপনার 'বেস' স্ট্রং বলে মনে হয়?'

'বার্ডোয়ানে (বর্ধমানে) আমাদের অনেক ল্যাণ্ড প্রপার্টি আছে। ওটা আমাদের অ্যানসেস্ট্রাল হোম। ওখানকার লোকজন আমাকে চেনে। তা ছাড়া নর্থ বেঙ্গলে গোটাকয়েক টি-গার্ডেন রয়েছে। আমার ঠাকুরদা ওগুলো কিনেছিলেন। ছোটবেলা থেকে অনেক বার সেখানে গেছি। ওই এরিয়ার লোকজন আমাকে ভাল করেই চেনে। ওখান থেকে দাঁড়ালে কেমন হয়?'

'ফাস কেলাস স্যার, আগরপাড়া আর নর্থ বেঙ্গলেই দাঁড়িয়ে যান। দু'জায়গায় দাঁড়ালে এক জায়গা থেকে ঠিক কেটে বেরিয়ে যেতে পারবেন।'

'তোমার একবার নর্থ বেঙ্গল গিয়ে আমাদের টি-গার্ডেনগুলো দেখে আসা দরকার। দেখে এসে যদি বল প্রসপেক্ট ভাল তা হলেই দাঁড়াব।'

'ও-কে স্যার, সার্ভে করে আসব। কিন্তু—'

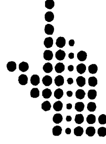
'কী?'

'আরব্যান এরিয়ার ব্যাপারটা ঝুলিয়ে রাখা যাবে না। দু-একদিনের ভেতর মেডিক্যাল ক্যাম্পটা বসিয়ে ফেলতে হবে। ঝট করে তো আর ভোট-ফোট চাওয়া যায় না। ভোটার মাকড়ারা আজকাল টেরিফিক খলিফা হয়ে গেছে। আগে থেকে ওদের ভিজিয়ে নরম করে তারপর হাত পাতলে রেজাল্ট টেরিফিক হবে।'

'আরে বাবা, তোমাকে তো বলেই দিয়েছি, যা করবার করে ফেল। আজই তোমাকে ফার্স্ট

ইনস্টলমেন্ট পঞ্চাশ হাজার পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

মনে মনে দুর্ধর্ষ একটা খিস্তি ঝেড়ে বললাম, 'দাও শ্লা, দিয়ে যাও।' পিপল অর্থাৎ জনগণের ব্লাড চুষে হেভি ব্ল্যাক মানি জমিয়েছ। তার দু-এক পার্সেন্ট পিপলের কাজে লাগুক।' মুখে অবশ্য বললাম, 'থাঙ্ক ইউ স্যার—'



হে-হে মহাশয়গণ, অভ্যুদয় মিটার সেদিনই একটা লোককে দিয়ে ক্যাশ ফিফটি থাউজেণ্ড আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। টাকাটা পেয়েই আমি মাকড়াকে বলেছিলাম, 'স্যার, কোনো বিগ আই স্পেশালিস্টের সঙ্গে আপনার জানাশোনা আছে?'

মহাশয়গণ, কথাটা শুনে অভ্যুদয় নামে খজড়াটার 'ইগো'তে খুব সম্ভব একটা আলপিনের খোঁচা লাগল। তিনি বললেন, 'হোয়াট ডু য়ু মীন? আই স্পেশালিস্ট কেন, ক্যানসার স্পেশালিস্ট, ই-এন-টি স্পেশালিস্ট, হার্ট স্পেশালিস্ট, নার্ভ স্পেশালিস্ট থেকে শুরু করে হিউম্যান বডির সব রকম বেস্ট স্পেশালিস্ট আমার জানা। কাকে তোমার চাই বল?'

শুনতে শুনতে মহাশয়গণ, আমার ব্রেনে ফ্ল্যাশ বালব জ্বলে উঠল। বললাম, 'যতগুলো স্পেশালিস্টকে আপনি চেনেন তাদের সবার সঙ্গে আমার যদি একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করিয়ে দেন—'

'নো প্রবেলম। তবে একদিনে তো এতগুলো বিগ বিজি পার্সনের সঙ্গে কনট্যাক্ট করা সম্ভব না।'

'একদিনে চাইছি না, এক উইকের ভেতর করে দিন। রোজ দু'জন তিনজন করে হলে এক উইকের ভেতর হোল অ্যানাটমির সব স্পেশালিস্ট কমপ্লিট করে ফেলতে পারব।'

'অল রাইট—'

মহাশয়গণ, নিশ্চয়ই এতক্ষণে টের পেয়ে গেছেন কেন এতগুলো স্পেশালিস্টের সঙ্গে দেখা করতে চাইছি। অভ্যুদয় মাকড়াটার ঘাড়ের ওপর দিয়ে গোটা আগরপাড়ার হার্ট ট্রাবল, আই ট্রাবল, কিডনি ট্রাবল, লাংস ট্রাবল, লিভারের ডিজিজ—সব সারিয়ে তুলতে চাই।

অভ্যুদয় মিটার সব অ্যারেঞ্জমেন্ট করে দিয়েছিলেন। এক উইকের ভেতর দস্তুরমত 'ফী দিয়ে ক্যালকাটার টপ স্পেশালিস্টদের সঙ্গে কনট্যাক্ট করে কিভাবে টেম্পোরারি একটা হাসপাতাল খাড়া করা যায়, সেখানে নানা ধরনের অপারেশন থিয়েটার কেমন করে বসানো যাবে—সব ডিটেলে জেনে নিয়েছি। মহাশয়গণ, শুধু তাই না, তাঁদের সবার একটা করে দিন হেভি ক্যাশ দিয়ে কিনে নিয়েছি। সেদিনটা ঐ মালেরা আর কোথাও প্র্যাকটিশ করতে পারবে না। মর্নিং থেকে ইভিনিং পর্যন্ত আমি যা বলব তাই করে যাবে। এই সব অ্যারেঞ্জমেন্ট করে আগরপাড়ায় ফিরে পঞ্চানন অর্থাৎ পেঁচোকে ডেকে বলেছি, 'তো কে একটা কাজ দিচ্ছি—'

পঞ্চানন দাঁত বার করে বলেছে, 'অলওয়েজ স্যার, কী করতে হবে?'

'রাস্তার ওধারে যে ভাঙা মসজিদটা রয়েছে—'

'ইয়েস স্যার—'

'ওটার সামনের মাঠে চারদিনের ভেতর একটা বিগ প্যাণ্ডেল খাটিয়ে হাসপাতাল বসাতে হবে।' হাসপাতাল কী কী মাল থাকবে তা-ও তাকে জানিয়ে জিজ্ঞেস করেছি, 'পারবি তো?'

'স্যার, আপনাকে তো আগেই বলেছি ক্যাশ দিলে মানুষের জেণ্ডার চেঞ্জ করে দিতে পারি—এ তো একটা হাসপাতাল বসানো।'

পেঁচো মালখানা কিরকম, তার একটু আধটু স্যাম্পল আপনারা দেখেছেন। বললাম, 'শ্লা, আমি যখন করতে বলছি তখন ক্যাশটা প্রবলেম নাকি?'

পঞ্চানন পাক্কা বিশ সেন্টিমিটার জিভ বার করে কামড়ে ধরে থাকল। তারপর নিজের কান দুটো মুলে বলল, 'ক্ষমা স্যার, ক্ষমা—ক্যাশের কথা জিভ থেকে হড়কে বেরিয়ে এসেছে।'

দশ হাজার টাকা পঞ্চাননকে দিয়ে বলেছি, 'ও-কে ও-কে, এখন কাজ স্টার্ট করে দে। এই ফার্স্ট ইনস্টলমেন্ট দিয়ে দিলাম।'

মহাশয়গণ, পঞ্চানন সেদিন থেকেই শুরু করে দিয়েছে। ক্যালকাটার সব চাইতে নাম-করা ডেকরেটরকে কনট্রাক্ট দিয়েছে সে। ডেকরেটরের লোকেরা কনট্রাক্ট পাবার পর দিন থেকেই ব্যারাকবাড়ির উল্টোদিকের ভাঙা মসজিদের সামনে বিরাট ফাঁকা মাঠটায় ট্রাক বোঝাই করে করে বাঁশ, তেরপল, ইট, সিমেন্ট, কাঠের খুঁটি, লাল-নীল-হলুদ-সবুজ কাপড়, ইলেকট্রিক তার—এমনি সব মালপত্র এনে ঢালছে তো ঢালছেই। ইট ফিট দিয়ে টেম্পোরারি ঢাউস একটা গো-ডাউনও খাড়া করে তার ভেতর লটবহর ঢুকিয়ে রেখেছে। শুধু তাই না, দু লাখ স্কোয়ার ফুট জুড়ে শ' তিনেক লোক বাঁশ ফাঁশ পুঁতে বিরাট প্যাণ্ডেলও বানাতে শুরু করেছে।

মহাশয়গণ, দেখুন—একবার ভাল করে কারবারটা দেখুন, আর কয়েক দিনের ভেতরেই এখানে মোস্ট মর্ডান একখানা হসপিটাল খাড়া হয়ে যাবে। আপনারা নিশ্চয়ই মনে মনে একশ বার তারিফ করবেন, পেঁচো মাকড়াটা বেশ কাজের লোক, খজড়াটার এলেম আছে।

এদিকে হাসপাতাল বানানো হচ্ছে। আমি কিন্তু ডেইলি রুটিন থেকে এক সেন্টিমিটারও এদিকওদিক নড়ি নি। সেই একই নিয়মে ঘুম, পবিত্র খালসা হোটেলে প্রোলেটারিয়েট লাঞ্চ এবং ডিনার আর দুপুরে কলকাতায় আমার সেই সিক্সটিন হানড্রেড ফুটের ফ্ল্যাটে গিয়ে ঘুম লাগাচ্ছি, ফোনে অভ্যুদয়ের সঙ্গে কামিং ইলেকশানের স্ট্র্যাটেজি নিয়ে টপ লেভেল কনফারেন্স চালিয়ে যাচ্ছি। তারপর সন্ধেবেলা থেকে আগমার্কা পিওর ধান্যেশ্বরী মিনিমাম দশ খোরা স্টমাকে স্টোর করে লাস্ট ট্রেন বা লাস্ট বাসে আগরপাড়ায় ফিরে আসছি।

মহাশয়গণ, অন্য দিনের মতো আজও দুপুরে খালসা হোটেলে রোটি, মাংস, আস্ত আস্ত কড়াইয়ের কালচে ডাল, হরা মিরচি, তেঁতুলের আচার আর গোচা দুই কাঁচা পেয়াজ দিয়ে লাঞ্চ কমপ্লিট করে বি. টি. রোডে গিয়ে বাসে উঠলাম। তারপর ঘন্টা দেড়েকের ভেতর স্ট্রেট আমার সেই ফ্ল্যাটে।

মহাশয়গণ, জুতো ফুতো নিয়ে ডিভানে ফ্ল্যাট হয়ে পড়তেই ফোন এসে গেল। ভেবেছিলাম

অভ্যুদয় মাকড়া রিং করছে। আমি কলকাতায় আসার পর শ্লা মিনিমাম দশ পনের বার ফোন করবেই। ইলেকশানে তার লড়ার ব্যাপারে আমার ব্রেনে নতুন কোন ওয়েভ এসেছে কিনা, হাসপাতালের কতটা প্রোগ্রেস হয়েছে, ডিটেলে সব কিছু মাকড়ার জানা চাই। ক'দিন অভ্যুদয় মিটারের সঙ্গে কম করে লাখদুয়েক ওয়ার্ড আমার এক্সচেঞ্জ হয়েছে। ভ্যাজর ভ্যাজর করতে করতে আমার বডির নার্ভগুলো ঢিলে হয়ে গেছে।

মহাশয়গণ, দুপুরবেলা খেয়েদেয়ে ঘন্টাদেড়েক প্রাইভেট আর স্টেট বাসের ঝাঁকানি খেয়ে বডির হাড় ঢিলে করতে করতে এসেছি। সমাজপতি অবশ্য আমাকে হোল টাইমের জন্য একটা গাড়ি দিতে চেয়েছিলেন। একে তো ষোল শ স্কোয়ার ফুটের একটা খোলের ভেতর সেট করে দিয়ে মাকড়া আমার ক্যারেক্টারের ফিফটি পারসেন্টের বারটা বাজিয়ে দিয়েছে। একটা গাড়ি পিছনে ফিট করে বাকি ফিফটি পারসেন্টে দফা গয়া করতে আর দিই নি। হে-হে মহাশয়গণ, বিশ্বাস করুন, আমি পিপল মানে জনগণের কাছ থেকে নিজেকে আলাদা করে রাখতে চাই না। জনগণের গায়ে স্টিকিং গামের মতোই আটকে থাকতে চাই।

যাক গে, ও সব ভ্যাজভ্যাজানি। মালুম পাচ্ছি আপনারা আমার এসব ভ্যানতাড়া শুনতে শুনতে টায়ার্ড হয়ে যাচ্ছেন। আমার দিকে না, ক্রেডেলে যে টেলিফোনটা রয়েছে, এখন সেটার দিকে তাকান।

ফোনটা কুর কুর করে বেজেই যাচ্ছে। আস্তে সেটা তুলে নিয়ে কানে সেট করে হ্যালো বলতেই—না মহাশয়গণ, অভ্যুদয় মিটার না, সমাজপতির গলা ভেসে এল, 'কে স্বয়ম্ভু?'

অনেক দিন, প্রায় দু উইক বাদে সমাজপতির গলা শুনলাম। মহাশয়গণ, আপনারা ডেফিনিটলি মার্ক করেছেন, সমাজপতির কাছ থেকে লিয়েনে অভ্যুদয় মিটারের ইলেকশান স্ট্র্যাটেজি ঠিক করা এবং তাঁকে রির্টান করিয়ে দেওয়ার কনট্রাক্ট নিয়ে আসার পর সমাজপতি আর ফোন করেননি। বললাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি আপনাদের আগমার্কা সেই পিটার স্বয়ম্ভু হোড়ই। তারপর কেমন আছেন স্যার?'

'ফাইন—' সমাজপতি বলতে লাগলেন, 'একটা দরকারে তোমাকে ফোন করতে হল—'

'বলুন।'

'অভ্যুদয় মিটারের কাজ কতদূর এগুলো?'

'চলছে স্যার। ইলেকশানে যাতে মিটার সাহেব তরে যেতে পারেন তার সলিড ফাউণ্ডেশান তৈরি করছি।'

'মিটারের কেসটা একটু তাড়াতাড়ি কর। তোমাকে খুব তাড়াতাড়ি ইলেকশানের ব্যাপারে আরো অনেকের রেসপনসিবিলিটি নিতে হবে।'

মহাশয়গণ, সমাজপতির কথাগুলো বুঝতে পারলাম না। জিজ্ঞেস করলাম, 'অনেকের রেসপনসিবিলিটি মানে?'

সমাজপতি বললেন, 'আমাদের, মানে বিজনেস আর ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট কমিউনিটির কয়েকজন রিপ্রেজেন্টেটিভকে ইস্টার্ন ইণ্ডিয়া থেকে ইলেকশানে দাঁড় করানো হচ্ছে। ইণ্ডিয়ার অন্য 'জোন'গুলো থেকেও আরো অনেক ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট আর বিজনেসম্যান ইলেকশান

কনটেস্ট করছেন। অন্য জোনের ব্যাপার সেখানকার ট্রেড আর ইণ্ডাস্ট্রি ওয়ার্ল্ড ভাববে। আমাদের ইস্টার্ন ইণ্ডিয়ায় আমার ওপর রেসপনসিবিলিটি দেওয়া হয়েছে যাতে আমাদের ক্যাণ্ডিডেটেরা জিততে পারেন। আমি আবার তোমার ঘাড়ে সেই রেসপনসিবিলিটি চালান করে দিতে চাইছি। ওঁরাও তোমার কথা শুনে ভীষণভাবে তোমাকে চাইছেন। আমি কথা দিয়েছি তুমি তাঁদের হেল্প করবে।'

মহাশয়গণ, আচমকা আমার ব্রেনে অন্য একটা ওয়েভ এসে গেল। বললাম, 'স্যার, মনে যদি কিছু না করেন, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

'একটা কেন, একশ'টা কর।'

'বিজনেসম্যানদের কাজ হল ব্যবসা ট্যবসা করা, ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টদের কারবার হল ফ্যাক্টরি ট্যাক্টরি চালানো। আপনারা স্যার পলিটিকসের ক্যাঁচাকলে ঠ্যাং ঢোকাচ্ছেন কেন?'

সমাজপতি তক্ষুণি কিছু বললেন না। কয়েক সেকেণ্ড চুপচাপ থেকে আচমকা বগবগিয়ে হেসে উঠলেন এবং আচমকাই হাসিতে ব্রেক কষে শুরু করলেন, 'স্বয়ম্ভু তোমার মতো সুপার ক্লাসের হারামজাদার কাছে কিন্তু এমন প্রশ্ন এক্সপেক্ট করি নি।'

আমি যে আমি, একটা চিট, থার্ড ক্লাস ফোরটোয়েন্টি, কোনো ব্যাপারেই যে ঘাবড়ায় না, অবাক হয় না—সে পর্যন্ত হকচকিয়ে গেল। বললাম, 'মানে—মানে—'

'আরে বাবা, প্রত্যেক বছর গভর্নমেন্ট পার্লামেন্টে নতুন নতুন ট্যাক্স বসিয়ে, নতুন নতুন ফ্যাকড়া তুলে ট্রেড আর ইণ্ডাস্ট্রি ওয়ার্ল্ডের বারটা বাজিয়ে দিচ্ছে। আমাদের কাজকর্ম চালানো গ্র্যাজুয়ালি ইম্‌পসিবল হয়ে উঠেছে। তাই ন্যাশনাল লেভেলে মোটামুটি ভাবা হয়েছে ট্রেড আর ইণ্ডাস্ট্রি ওয়ার্ল্ডের লোকেদের পার্লামেন্টে পাঠানো হবে। কান্ট্রির অন্য ব্যাপার সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য নেই কিন্তু ফিসক্যাল পলিসি, লেবার পলিসি, ইণ্ডাস্ট্রি আর কমার্সের পলিসি, এসব ব্যাপারে আমাদের একটা ভাইটাল রোল থাকতেই হবে। আমাদের রিপ্রেজেন্টেটিভ পার্লামেন্টে থাকলে ট্রেড আর ইণ্ডাস্ট্রির স্বার্থ নষ্ট হয় এমন কিছু করা খুব সহজে সম্ভব হবে না। তা ছাড়া আমরা তো ফরেন কান্ট্রি থেকে আসি নি। ইলেকশানে কনটেস্ট করার রাইট আমাদের আছে।'

মাকড়াটা টেরিফিক একখানা লেকচারবাজি করে আমার ব্রেন ঢিলে করে দিয়েছে। তবু হেঁ হেঁ করে গ্যাদগেদে টাইপের হেসে বললাম, 'কিন্তু স্যার—'

'কী হল?'

'আমি তো স্যার অভ্যুদয় মিটারের ব্যাপারটা দেখছি। এ নিয়ে গ্রাউণ্ডে নেমেও পড়েছি। ঘাড়ের ওপর মিটার সাহেবের মতো একখানা হেভি মাল চেপে আছে। এর ওপর এক্সট্রা ওয়েট চাপালে কি পারব?'

'খুব পারবে। তুমি হলে ফার্স্ট র‍্যাঙ্কের একজন সুপারম্যান।'

'আমাকে পাম্প দিয়ে ফোলাচ্ছেন, ভালই লাগছে। কিন্তু স্যার, ইলেকশান মাজাকির ব্যাপার না। একটু এধার ওধার হলে এভরিথিং কিচাইন হয়ে যাবে। ডাইরেক্টলি অন্য ক্যাণ্ডিডেটদের রেসপনসিবিলিটি না নিয়ে একটা কাজ করতে পারি?'

'কী?'

'ইলেকশানের টেকনিক্যাল নো-হাউ আমি ওঁদের সাপ্লাই করব, সব ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করে দেব। ওঁরা সেই ব্লু-প্রিন্ট ফলো করে লোক-ফোক দিয়ে ক্যামপেন স্টার্ট করে দেবেন। মনে হয়, রেজাল্ট খারাপ হবে না এতে।'

সমাজপতি আস্তে আস্তে, খুব সম্ভব চিন্তা-ফিন্তা করতে করতে বললেন, 'নট আ ব্যাড আইডিয়া। তবে তাই হোক। কবে থেকে ব্লু-প্রিন্ট দিচ্ছ?'

'মিটার সাহেবের কাজটা আরেকটু প্রোগ্রেস করুক। তারপর আমি নিজেই আপনাকে ফোন করব—'

'আরেকটা কথা—'

'বলুন স্যার।'

'বেলেঘাটার গুরুদেব তোমাকে খুব চাইছেন। ওখানেও তো তোমার ব্লু-প্রিন্ট দেবার কথা ছিল। সেই অনুযায়ী আশ্রম এক্সপ্যানসান করা হবে, মর্ডানাইজ করা হবে।'

'নেক্সট উইকেই গুরুদেবকে ব্লু-প্রিন্ট দিয়ে দেব। আপনি ভাববেন না স্যার।'

'ঠিক আছে। তা হলে—' বলতে বলতে আচমকা কী মনে পড়ে গেল সমাজপতির, 'ভাল কথা, ঐ ব্যাপারটার দিকে নজর রাখছ তো?'

বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম, 'কোন ব্যাপারটা স্যার?'

গলার ভেতর থেকে সমাজপতি মাকড়া হেঁ হেঁ করে ঘোড়ার ডাকের মতো একটা শব্দ করলেন। তারপর বললেন, 'ঐ যে তোমার দুটো ফ্লোর ওপরে যে থাকে, তার মানে—'

মহাশয়গণ, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন সমাজপতি কার কথা বলছেন। সেই সেক্স বম্ব ডোরা। যার ভাইট্যাল স্ট্যাটিসটিকস হল ছত্রিশ-পঁচিশ-ছত্রিশ। হোল বডিতে তার তিন চারটে এক্সপ্লোসিভের ফ্যাক্টরি যেন পোরা রয়েছে। হে-হে মহাশয়গণ, ডেফিনিটলি আপনাদের মনে আছে ডোরা নামের এই টেরিফিক গার্ল-ফ্রেণ্ডটির ফ্ল্যাটে সমাজপতি ঢোকার পর আমি মিসেস সমাজপতিকে ফোন করে দিয়েছিলাম। মিসেস সমাজপতি তাঁর হাজব্যাণ্ডকে ডোরার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বার করে নিয়ে বডির পার্টস ঢিলে করে দিয়ে পাক্কা সাতটা দিন বিছানায় ফ্ল্যাট করে রেখেছিলেন। তারপর সমাজপতি আর ডোরার অ্যাপার্টমেন্টে 'ইন' করেন নি। বললাম, 'বুঝেছি স্যার।'

'তার ওপর ওয়াচ রেখে যাচ্ছ তো?'

'অফ কোর্স স্যার।'

'দেখো, চারদিকে অনেক শার্ক-টার্ক ঘুরে বেড়াচ্ছে, ডোরাকে যেন হারামজাদাগুলো খেয়ে না ফেলতে পারে।'

'না স্যার, আপনি ছাড়া ওকে কে খাবে! আপনার 'ফুড' হবার জন্যে ওর জন্ম স্যার।'

বগবগিয়ে হেসে উঠলেন সমাজপতি। আমার কথায় মাকড়াটা দারুণ খুশি হয়েছে মনে হল। বললেন, 'তুমি একটা সাবলাইম হারামী। ঠিক আছে, এখন ফোন রাখছি। শিগগির একদিন আসছি।'

বললাম, 'তাড়াতাড়িই আসবেন। বডিতে ফোরফোর্টি ভোল্ট নিয়ে ডোরা আপনার জন্য ওয়েট করছে।'

'খচ্চর কাঁহাকা!' ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট সমাজপতি একটা উৎকৃষ্ট খিস্তি ঝেড়ে হাসতে হাসতে লাইন কেটে দিলেন।

খানিক বাদে কুর কুর করে আবার ফোন বেজে উঠল। ক্রেডেল থেকে টেলিফোনটা তুলে 'হ্যালো' বলতেই ওধার থেকে একট চেনা গলা ভেসে এল, 'আমি ডোরা—'

তিরিশি ফুট ওপর থেকে সমাজপতির গার্ল-ফ্রেণ্ড রিং করছে। মহাশয়গণ, দেখতে পাচ্ছি আপনাদের চোখের তারাগুলো চকচকিয়ে উঠেছে। আপনারা যে এককেটি কী মাল তা তো জানি। একটু ওয়েট করুন মশাইরা, স্লাইট ধৈর্য ধরুন, ডোরার সঙ্গে আমার কী ডায়লগ হয়, সব শুনতে পাবেন।

ডোরার গলা আবার শোনা গেল, 'কী করছেন এখন?'

বললাম, 'কী আর করব। বিছানায় বডি ফেলার জন্য তৈরি হচ্ছি।'

'দুপুরে আপনি ঘুমোন নাকি?' রীতিমতো চমকেই উঠল ডোরা।

মহাশয়গণ, কুড়ি বাইশ বছর ধরে প্রায় বেগুলার ঘুমিয়ে আসছি। দিবানিদ্রাটা আমার হ্যাবিটে দাঁড়িয়ে গেছে। এখন দুটো বাজতে চলেছে। চোখের পাতা দুটো আডেসিভ লাগার মতো জুড়ে আসছে। আর সমাজপতির গার্লফ্রেণ্ড এই খজড়া মেয়েমানুষটা দুটো ফ্লোর ওপর থেকে সমানে ভ্যাজর ভ্যাজর করে চলেছে। মহাশয়রা, আমি এক্ষুনি লাইন কেটে দিয়ে বিছানায় বডি ফেলে দিতে পারি কিন্তু ঝামেলা বেধেছে আপনাদের মতো মালদের নিয়ে। ডোরার মতো একটা ছুকরি, যার পায়ের নখ থেকে চুলের ডগা পর্যন্ত হাই এক্সপ্লোসিভে বোঝাই তার সঙ্গে দু-একটা বার্লি-মার্কা ভ্যাদভেদে কথা বলে লাইন ছেড়ে দিলে আপনারা কি আমাকে ছাড়বেন? যেভাবে চোখের তারাগুলোকে ফিক্সড করে আর কানগুলোকে কুকুরের মতো খাড়া করে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন তাতে আপনাদের মতলব মালুম পেয়ে গেছি। ওয়েট খচ্চরেরা, আপনাদের জন্যই ছুকরিটার সঙ্গে আরো কিছুক্ষণ ডায়লগ চালিয়ে যাই।

ডোরাকে বললাম, 'কী করি বলুন অনেক দিন ধরে এই শ্লা হারামী হ্যাবিটটা হয়ে গেছে।'

ডোরা বলল, 'ব্যাড হ্যাবিট। দুপুরে ঘুমুলে বডিতে ফ্যাট জমে ফিগার নষ্ট হয়ে যায়।'

মহাশয়গণ, আমার ভাল ফিগার রাখার দরকার আছে কী? আমি শ্লা সিনেমাতেও হিরো হতে যাচ্ছি না, অ্যাডভারটাইজমেন্টের মডেলও হব না। আর আপনারা তো জানেনই, মেয়েমানুষের চক্করও আমার নেই যে বডিটা ফিল্ম স্টারদের মতো রেখে তাদের ফ্ল্যাট করে ফেলতে হবে। তবু আপনাদের জানিয়ে রাখি, রেগুলার এত সোনার বাংলা স্টমাকে চালান করছি, দুপুরে মিনিমাম তিন ঘন্টা করে রোজ ঘুমোচ্ছি, এত ভেজিটেবল অয়েল, বাটার, ঘি খাচ্ছি তবু বডিতে এক গ্রাম চর্বি জমছে না। বললাম, 'আমি একটা ওল্ড ভাম, ফিগার ধুয়ে কি জল খাব?'

'আপনি ওল্ড ভাম! বাজে কথা বলবেন না।' ডোরা বলল।

শুনুন মহাশয়গণ, ভাল করে শুনুন। মা দুগ্‌গা, ফাদার শিব, যেশাস ক্রাইস্ট থেকে স্টার্ট

করে ওয়ার্ল্ডের যে কোনো রিলিজিওনের যে কোনো গড এবং গডেসের নামে স্যোয়ার করে বলতে পারি, আমার বয়স ফর্টি ইয়ার্সের এক সেকেণ্ড ও কম না, বরং বেশিই হবে। কিন্তু মহাশয়গণ, ছুঁড়িরা কিছুতেই তা বিশ্বাস করবে না। শ্লা, আমার চেহারাটাই টেরিফিক ডিসেপটিভ। সমাজপতির গার্লফ্রেণ্ড এই ছুকরিটা দেখা যাচ্ছে ফেঁসে গেছে। যাক গে, ডোরাকে বললাম, 'ও-কে ম্যাডাম, আপনি যখন বলছেন আমি একটা ওল্ড খজড়া নই তখন তা-ই। এখন বলুন তো—'

'কী?'

'এই দুপুরবেলা হঠাৎ ফোন করছেন যে? কোনো দরকার আছে?'

'আছে।'

'দরকারটা জানতে পারি?'

'ডেফিনিটলি। কাইণ্ডলি আপনার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে করিডরে চলে আসুন। সেখানে লিফটে ঢুকে ফিফটিনথ ফ্লোরের বোতাম টিপে দিন—'

জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার ওখানে যেতে বলছেন নাকি?'

ডোরা বলল, 'তাই তো মনে হয়। প্লিজ আসুন—'

চোখের কোণ দিয়ে বেডরুমের ছ' ইঞ্চি পুরু ফোমের টেরিফিক কমফোর্টেবল বিছানাটা দেখতে দেখতে দেড় কিলো চিরতার জল খাওয়ার মতো মুখ করে বললাম, 'এখনই যেতে হবে? বিকেলে গেলে হয় না?'

'বিকেলে দরকার হলে তখনই তো ফোন করতাম।'

মহাশয়গণ, মনে মনে ওয়ার্ল্ডের সব চাইতে দুর্ধর্ষ কয়েকটা খিস্তি ঝেড়ে মুখে বললাম, 'ঠিক আছে। যাচ্ছি।'

মহাশয়গণ, শিরদাঁড়া খাড়া করে পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে আমাকে দেখতে থাকুন। দিল্লি দেখো, আগ্রা দেখো, লণ্ডন দেখো, টোকিও দেখো-র মতো হয়ত দুর্দান্ত কোনো ম্যাজিক একটু পরে আপনারা দেখতেও পাবেন। ধৈর্য মহাশয়গণ, স্লাইট ধৈর্য ধরে থাকুন।

পাঁচ মিনিটের ভেতর তিরিশ ফুট ওপরে উঠে একশ আটান্ন নম্বর ফ্ল্যাটের কলিং বেল টেপার সঙ্গে সঙ্গে ডোরা-ই দরজা খুলে সামনে দাঁড়াল।

হে-হে মহাশয়গণ, আমি যে আমি, পিটার স্বয়ম্ভু হোড়, পঞ্চ 'ম'-কারে মধ্যে যে 'ম'-টা দিয়ে মেয়েমানুষ হয় সেটাকে আমি পাঁচ হাজার কিলোমিটার দূরে সরিয়ে রাখি। এসব খবর অনেক আগেই আপনাদের জানিয়ে দিয়েছি। মেয়েমানুষের বডি সম্পর্কে আমার কোনো রকম ইন্টারেস্ট নেই। যেভাবে আপনারা আকাশ দেখেন, ছাগলের নাদি দেখেন, হুবহু সেইভাবেই আমি মেয়েমানুষের অ্যানাটমি দেখি। কিন্তু মহাশয়গণ, এই মোমেন্টে ডোরার পরনে স্রেফ একটা প্যান্টি এবং ব্রা-টাইপের ব্লাউজ ছাড়া আর কিছুই নেই। ওর বডির ডেসক্রিপশান আগেও আপনাদের দিয়েছি। ভাল ভাল ওল্ড উপনা-টুপমা দিয়ে বলি, শ্বেতপাথরের পিলারের মতো উরু ডোরার, এভারেস্ট আর কাঞ্চনজঙ্ঘার মতো দুই বুক, সরু কোমরের তলায় ওলটানো

তানপুরার মতো টেরিফিক কারবার। সব মিলিয়ে দমবন্ধ-করা ব্যাপার। মহাশয়গণ, টের পাচ্ছি, ডোরাকে দেখতে দেখতে আপনাদের নাকমুখ দিয়ে ফেনা বেরিয়ে পড়েছে।

ডোরা বলল, 'কাম ইন প্লিজ—'

তার পেছন পেছন বডিটাকে টানতে টানতে ভেতরে ঢুকে পড়লাম। ডোরা আমাকে স্ট্রেট ওদের ড্রইং রুমে একটা সোফায় সেট করে দিয়ে মুখোমুখি বসল। তারপর বলল, 'কী দিয়ে আপনাকে এন্টারটেন করব—জিন, রাম, হুইস্কি?'

'নো নো প্লিজ, আমি পায়ের তলা থেকে চুলের ডগা পর্যন্ত একজন পেট্রিয়ট, বিলিতি মাল সহজে আমি পায়ের নখ দিয়েও ছুঁই না।'

ডোরার এবার মনে পড়ে গেল, 'ও হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি তো আবার কান্ট্রি লিকার—কী যেন নাম ড্রিঙ্কটার?'

'ধান্যেশ্বরীও বলতে পারেন, সোনার বাংলাও বলতে পারেন।'

'রাইট। ঐ জিনিসটা ছাড়া আপনার আবার চলে না। কিন্তু এক্ষুণি তো—'

'এক্ষুণি কিচ্ছু দরকার নেই। সান ডাউনের আগে আজকাল আমি বিলকুল ব্রহ্মচারী। সূয্যি ডুবলে তবে কালীমার্কার বোতল খুলে বসি।'

'আর কিছু চলবে?'

'যেমন?'

'এল-এস-ডি?'

আমার চোখের তারা স্রেফ গোল্লা পাকিয়ে গেল। বললাম, 'নো ম্যাডাম।'

ডোরা বলল, 'ম্যানড্রেকস?'

আমি যে আমি, পিটার স্বয়ম্ভু হোড়, একটা চিট, মার্কামারা ফোরটোয়েন্টি, যে দু হাজার সাতশ' ঘাটের হোলি আর আর আনহোলি ওয়াটার খেয়েছে, তার ··ডি কয়েক সেকেণ্ডের জন্য লুজ হয়ে গেল। তারপর অবশ্য খুবই নর্মাল গলায় বললাম, 'এইসব মাল আপনার স্টকে আছে?'

'আরো অনেক মাল রয়েছে।'

'আরো কী?'

'হাসিস।'

'ফাইন!'

'ওপিয়াম।'

'টেরিফিক!'

'আওয়াবিল পাখির বাসা—'

চমকে গেলাম। বললাম, 'এই চিজটা কী, মেমসাহাব?'

মহাশয়গণ, আমার মতো একটা খজড়া, যে ওয়ার্ল্ডের কত জায়গায় তাঁবু ফেলেছে, কত টাইপের হারামী নেশাখোর দেখেছে, তার লিস্ট করতে বসলে পাক্কা দশ রিম কাগজ লেগে যাবে। এই হারামীদের কেউ ড্রাঙ্কার্ড, কেউ তেড়েল, কেই গাঁজাখোর, কেউ চণ্ডুখোর, কারো

চরস না হলে চলে না, কেউ জিভের ডগায় সাপের ছোবল খেয়ে ভাম হয়ে পড়ে থাকে। নেশার ওয়ার্ল্ডে আমিও একজন সুপারস্টার। পাক্কা দু পাঁট বাংলা মাল স্টমাকে চালান করার পরও পা আমার এতটুকু টাল খায় না। তবু বলছি মহাশয়রা, আমরা ফর্টি-টু ফর্টি-থ্রি ইয়ার্সের লাইফে আওয়াবিল পাখির নাম কারো কাছে শুনি নি।

ডোরা বলল, 'আন্দামান আইল্যাণ্ডে আওয়াবিল বলে ছোট ছোট এক জাতের পাখি আছে। মুখ থেকে লালা বের করে তারা বাসা বানায়। এই বাসাটা হাইলি ইনটক্সিকান্ট। এর থেকে স্লাইট ভেঙে গরম জলে বা গরম দুধে মিশিয়ে খেলে ফুল ফর্টি এইট আওয়ার্স মাথার ভেতর পিয়ানো বাজতে থাকে আর চোখের সামনে হোল ওয়ার্ল্ড একখানা ড্রিমল্যাণ্ড হয়ে যায়।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি আওয়াবিল পাখির বাসা কখনও খেয়েছেন?'

ডোরা চোখের কোণ দিয়ে এমনভাবে আমার দিকে তাকাল যাতে মনে হয় এমন উদ্ভট কথা লাইফে আগে কখনও শোনে নি। বলল, 'এক দু'বার না, থাইজেণ্ড অ্যাণ্ড ওয়ান টাইমস মিস্টার।'

মহাশয়গণ, ডোরার এই স্যুইটে পা দেবার আগে পর্যন্ত মনে মনে ধারণা ছিল, আমার মতো হারামজাদা হোল সোলার সিস্টেমে আর একটাও পয়দা হয় নি। আমাকে তৈরি করার জন্য খুব সম্ভব শয়তান তার একশ জন কেমিস্টকে দিয়ে একটা কমিটি বসিয়েছিল। আমার জন্য এই কমিটি একটা ফরমুলা বানিয়ে দেয়। যেই আমি জন্মালাম অমনি সেই ফরমুলাটা নষ্ট করে দেওয়া হল। মানে আমার মতো কেউ আর যাতে জন্মাতে না পারে সেই জন্য এই অ্যারেঞ্জমেন্ট। কিন্তু আমার মতো একটা সুপার ক্লাসের মাকড়ার ব্রেনেও চক্কর লাগিয়ে দিয়েছে ডোরা। নেশা ফেশার ব্যাপারে তার কাছে এখনও কয়েক জন্ম আমি ক্লাস করতে পারি।

'সানসেটের আগে পারফেক্ট গুড বয় হয়ে থাকবেন দেখছি।' ডোরা বলতে লাগল, 'তা হলে—'

স্লাইট ভেবে বললাম, 'নেহাতই এন্টারটেইন করত চান? এক কাজ করুন—বিড়ি আছে?'

'বিড়ি!' চোখ দুটো রাউণ্ড করে ঝাড়া মিনিট দুয়েক তাকিয়ে রইল ডোরা।

'ইয়েস ম্যাডাম।' আমি আস্তে আস্তে ঘাড় দোলাতে লাগলাম।

সেই কথাটা আচমকা মনে পড়ে গেল ডোরার। ঠোঁট দুটো ছুঁচলো করে কপাল কুঁচকে সে বলল, 'বুঝেছি। আপনি তো দুর্দান্ত দেশপ্রেমিক। দিশি জিনিস ছাড়া আর কিছু টাচ করতে চান না। ঘরে এখন বিড়ি নেই। ও-কে, এক্ষুণি আনিয়ে দিচ্ছি—'

বেয়ারাকে দিয়ে কিং সাইজের বিড়ি আনিয়ে দিল ডোরা। একটা ধরিয়ে দু'হাতের ফাঁকে গাঁজার কলকের মতো সেট করে ফুক ফুক করে টানতে টানতে আর গালের সাইড দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললাম, 'অনেকক্ষণ এসেছি। এবার স্টমাক থেকে দরকারি কথাটা বার করে ফেলুন।'

ডোরা একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়েছিল। ঠোঁটের কোণে সেটা প্লেস করে দারুণ স্টাইলে টানতে টানতে উঠে পড়ল। তারপর ওধারের একটা বেড রুম থেকে টেপ বার করে এনে আমার হাতে দিতে দিতে বলল, 'আমার ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্সটা একবার মেপে দিন তো।' বলেই

আমার নাকের ডগা থেকে মাত্র পঁচিশ সেন্টিমিটার দূরে দাঁড়াল। মহাশয়গণ, আমার চোখের সামনে দুটো রুপোর বল, তার নিচে সরু কোমর, সরু টানেলের মতো নাভি, আর তার তলায়—না-না, মহাশয়গণ, তার তলাকার ডেসক্রিপশান আপনাদের মতো মালেদের দেব না। দু আঙুলে টেনে টেনে চোখগুলোকে যতটা বড় করা যায় তাই করে আপনারা তো দেখেই যাচ্ছেন। তবে একথা কনফেস করতেই হবে আমাকে, যতই শ্লা চিট, ফোরটোয়েন্টি, ফোরেব্বাজ আর হারামী হই না কেন, যতই মেয়েছেলে সম্পর্কে আমার ইন্টারেস্ট না থাক, তবু আমি একটা মানুষ—হিউম্যান বিয়িং। আমার এই বডি ব্লাড আর ফ্লেশ দিয়ে তৈরি। মহাশয়গণ, আমার নাকের ভেতর দিয়ে কয়েক সেকেণ্ডের জন্য পিওর সোডার মতো ঝাঁঝ বেরিয়ে এল। তার পরেই আবার নর্মাল হয়ে গেলাম।

মহাশয়গণ, আপনাদের ডেফিনিটলি মনে আছে, আগেও একবার এই ছুকরি আমাকে দিয়ে তার ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স মাপিয়ে নিয়েছিল। একবার যখন মেপেছি, আর একবার মাপতে ট্রাবল কী? ফিতেটা খুলে ডোরার বডি মাপতে লাগলাম।

চৌত্রিশ—পঁচিশ—ছত্রিশ।

মাপটা জেনে নিয়ে ডোরা বলল, 'নো চেঞ্জ। তিন বছর ধরে মেজারমেন্ট এক জায়গায়েই ফিক্সড হয়ে আছে। এক মিলিগ্রামও একস্ট্রা চর্বি জমতে দিই নি।'

টেপের কাজ হয়ে গিয়েছিল। সেটা দলামোচড়া করে ওধারের একটা সোফায় ছুঁড়ে দিয়ে বললাম, 'এই জন্যেই কি দুপুরের ঘুমটা কিচাইন করে আমাকে এখানে টেনে এনেছেন?'

'নো মিস্টার—'

'তা হলে?'

একটা চোখ টেরিফিক কুঁচকে, দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে ডোরা বলল, 'ইউ আর আ ব্যাড ওয়াচ ডগ।'

তার কথাগুলো বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম, 'কিরকম?'

'মিস্টার সমাজপতি আপনাকে কী জন্য অ্যাপয়েন্ট করেছে?'

হে-হে মহাশয়গণ, এবার মনে পড়ে গেল। আপনাদেরও নিশ্চয়ই মনে পড়েছে গড়িয়াহাটের এই অ্যাপার্টমেন্টে আমাকে গুঁজে দেবার পর সমাজপতি ডোরার ওপর নজর রাখার একটা সেক্রেড ডিউটি আমার ঘাড়ে চড়িয়ে দিয়েছিলেন। স্লাইট হেসে বললাম, 'আপনাকে অলওয়েজ ওয়াচ করে যেতে!'

ডোরা বলল, 'রেগুলার ডিউটিটা দিচ্ছেন কী?'

হারমোনিয়ামের রিডের মতো পুরো বত্রিশটা দাঁত মেলে দিয়ে বললাম, 'আমার তো মনে হয়—দিচ্ছি। আপনার কী মনে হয়?'

মহাশয়গণ, ডোরা আচমকা ভয়েসটা দশ পর্দা ওপরে তুলে চেঁচিয়ে উঠল, 'ড্যাম লায়ার। আপনার মতো ডিজঅনেস্ট ফাঁকিবাজ মিথ্যাবাদী আমার লাইফে কখনও দেখি নি।'

আমি থতিয়ে গেলাম। বললাম, 'দুপুরবেলা নিজের ফ্ল্যাটে ডেকে এনে খিস্তি ঝাড়ছেন ম্যাডাম?'

ডোরা লজ্জাফজ্জা পেল বলে মনে হল না। ভয়েসটা একই জায়গায় রেখে আরেক বার চেঁচাল, 'শাট আপ। অনেকদিন ধরে ওয়াচ করছি, আপনি আমার ওপর নজর রাখছেন না। আটার নেগলিজেন্স।'

মহাশয়গণ, আমি আবার দাঁত বার করে হাসলাম, 'হেঁ হেঁ—'

ডোরা আরেক বার গলার শিরা ফুলিয়ে ধমকে উঠল, 'শাট আপ। অমন করে হাসবেন না।'

ঝট করে দাঁতের উপর ঠোঁটের ড্রপ সিন ফেলে দিলাম। মহাশয়গণ, আমার ডাউনফলটা একবার দেখুন। শ্লা, আমি একজন চিট, ফোরটোয়েন্টি, সুপার ক্লাসের ফেরেবাজ। সমাজপতির কঁ্যাচাকলে পা ঢুকিয়ে হড়হড়িয়ে কোথায় নেমে এসেছি দেখুন। তার বাঁধা মেয়েমানুষ, শুদ্ধ ভাষায় যাকে রক্ষিতা বলে—তার ধমক খাচ্ছি। আমার ক্যারেকটারের বারটা বেজে গেল মহাশয়রা। যাক গে, ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে বললাম, 'একটা কথা বলব ম্যাডাম?'

'কী?'

'আপনার মতো বিউটিফুল ইয়াং গার্লদের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারলে হার্ট, লাংস আর কিডনি ফ্রেশ থাকে। ব্লাড সারকুলেশন ভাল হয়। কিন্তু—'

'কিন্তু কী?'

'মেয়েমানুষের ব্যাপারটা আমার হেলথে স্যুট করে না। ডাক্তাররা বলেছে, ইয়াং গার্লদের দিকে কন্টিনিউয়াসলি তাকিয়ে থাকলে আমার চোখে গ্লোকুমা হয়ে যাবে।'

'ড্যাম লাই।'

দেবশিশুদের মতো মুখ করে টেরিফিক গলায় বললাম, 'বিশ্বাস করুন ম্যাডাম। তা ছাড়া—'

'তা ছাড়া আবার কী?'

'আপনার দিকে অলওয়েজ যার তাকিয়ে থাকার কথা সে কিন্তু আমি না।'

'কে তা হলে?' চোখ দুটো কুঁচকে আরো ছোট হয়ে গেল ডোরার।

বললাম, 'মিস্টার সমাজপতি।'

সাপের হিসিং সাউণ্ডের মতো ডোরার গলার ভেতর থেকে একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল, 'ব্লাডি বাস্টার্ড।'

'এই বিউটিফুল খিস্তি দুটো আমার ওপর ঝাড়লেন ম্যাডাম?'

'আপনার ওপর ঝাড়ব কেন? ঝাড়লাম ঐ সমাজপতি বাগারটার ওপর।'

মহাশয়গণ, ডোরার সঙ্গে সমাজপতির রিলেশানটা কি ধরনের নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। পারফেক্ট ভাল মানুষের মতো বললাম, 'সমাজপতি সাহেব রেগুলার আপনার এখানে আসছেন না বুঝি?' বুড়ো মাকড়াটা এই অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে আসে কি আসে না, আমার চাইতে কে আর ভাল জানে! তবু যে কথাটা বললাম সেটা প্লেন খজড়ামোর জন্য। মহাশয়গণ, আপনারা ডেফিনিটলি আমার এই খজড়ামোটা অ্যাপ্রিসিয়েট করছেন।

ডোরার গলায় আবার সেই সাপের শিস শোনা গেল, 'তিন উইক আসছে না। অ্যাণ্ড আই ডোন্ট ওয়ান্ট দ্যাট সোয়াইন টু এন্টার মাই স্যুইট এগেন।'

'কেন বলুন তো?'

'জানেন, তিন উইক আগে সমাজপতি আমার এখানে মজা লুটতে এসেছিল?'

'তারপর?'

'সবে ড্রিংকসের বোতল খুলে বসেছি। দু পেগ খাবার পর একটু একটু টিপসি লাগছে, এই সময় মিসেস সমাজপতি আপনাদেব রক্ষাকালীর মতো দরজা টরজা ভেঙে আমার এই অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে পড়ল।'

হে হে মহাশয়গণ, আপনাদের মেমোরি নিশ্চয়ই খুব উইক না। সমাজপতি যে তিন উইক আগে এক রাত্তিরে ডোরার স্যুইটে ঢুকেছিল, আপনারা শ্লা চোখ বড় বড় করে দেখেছেন। সমাজপতি মাকড়া ওখানে 'ইন' করার পর আমিই যে টেলিফোন ডাইরেক্টরি ঢুঁড়ে তাঁর রেসিডেন্সিয়াল ফোন নাম্বার বার করে মিসেস সমাজপতিকে তাঁর হাজব্যাণ্ড সম্পর্কে খবর দিয়েছিলাম তাও আপনাদের জানা। তারপরই মিসেস সমাজপতি মর্টার কি ব্যালিস্টিক মিসাইলের মতো ডোরার অ্যাপার্টমেন্টে চার্জ করেছেন। পরের ব্যাপারটার অনেকটাই আপনারা জানেন, আমিও জানি। সমাজপতির কী হাল হয়েছিল, নিজেরাই তা দেখেছেন। শ্লা, ওল্ড-এজে হাতে-পায়ে টেরিফিক ফ্র্যাকচার হয়ে গিয়েছিল মাকড়ার। হেভি প্ল্যাস্টার চড়িয়ে ঝাড়া তিনটে উইক বিছানায় ফ্ল্যাট হয়ে থাকতে হয়েছে। এই বুড়ো বয়সে খচ্চরটার হাত পায়ের হাড় যে পাউডার হয়ে গিয়েছিল তার কারণ একমাত্র আমি, হে হে মহাশয়গণ, তা আপনারা ছাড়া আর কেউ জানে না। উল্টে সমাজপতি আমাকে তাপ্পি মেরে বলেছিলেন, বাথরুমে পড়ে গিয়ে নাকি তাঁর হাড় ফাড় গুঁড়ো হয়ে গেছে। কারবারটা বুঝুন।

আমি সমাজপতির হাড্ডি ভাঙার ড্রামায় মেইন রোলটাই প্লে করেছি। ওর প্রায় সবটাই আমার জানা। শুধু ডোরার ঘরে ঢুকে মিসেস সমাজপতি কী করেছিলেন সেটা আন্দাজ করতে পারি, কিন্তু নিজের চোখে তো দেখি নি। মহাশয়গণ, আপনারা জানেন, ওয়ার্ল্ডের কোনো ব্যাপারেই আমার কোনো রকম কৌতূহল ফৌতূহল নেই। কিন্তু এই একটা ব্যাপার জানতে ইচ্ছা করছে। যাক গে, মুখে অ্যাঞ্জেল-মার্কা হাসি ফুটিয়ে বললাম, 'তারপর?'

ডোরা বলল, 'তারপর আর কী, মিসেস সমাজপতি রক্ষাকালীর স্টাইলে দাঁড়িয়ে তাঁর হাজব্যাণ্ড আর আমাকে প্রথমে চোস্ত মিনিট পাঁচেক খিস্তি ঝাড়লেন। আমি স্রেফ হাঁ করে শুনতে লাগলাম। শুনবার মতো জিনিস। বস্তির ওঁচা মেয়েমানুষরা দশ বছর এই মহিলাটির কাছে খিস্তির ক্লাস নিতে পারে।'

'প্রসিড ম্যাডাম। তারপর?'

'তারপর সেন্টার টেবল থেকে একটা ড্রিংকের গেলাস তুলে আমার দিকে ছুঁড়ে মারলেন মিসেস সমাজপতি। একসময় ক্রিকেট খেলার প্র্যাকটিশ ছিল, ফার্স্ট স্লিপে ভাল ফিল্ডিং দিতাম। রিফ্লেক্সটা এখনও চমৎকার আছে। বডিটা ডান সাইডে হেলিয়ে দিতেই গেলাসটা কানের পাশ দিয়ে দেয়ালে গিয়ে লাগল। টার্গেট মিস করায় ফায়ার হয়ে গেলেন মিসেস সমাজপতি। সট করে আরেকটা গেলাস তুলে আবার ছুঁড়লেন। বাঁ দিকে বডিটা কাত করে সেটা লুফে ফেললাম এবং বুঝলাম, এখানে বসে থাকাটা খুব স্রেফ নয়। থার্ড গেলাসটা ছুঁড়বার আগেই স্ট্রেট উঠে দাঁড়িয়ে ওধারের একটা ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম। তবে এই ড্রামা কোন দিকে ঘোরে

তা দেখার জন্য জানালার পাশে এসে দাঁড়ালাম।'

'চালিয়ে যান ম্যাডাম।'

'হাজব্যাণ্ডের 'কিপ' হাতের বাইরে বেরিয়ে গেছে। কাজেই মিসেস সমাজপতির পুরো অ্যাটেনশনটা এবার মিস্টার সমাজপতির ওপর এসে পড়ল। কয়েক সেকেণ্ড ফায়ারি চোখে 'হাবি'র দিকে তাকিয়ে সেন্টার টেবল থেকে একটা গেলাস তুলে ছুঁড়লেন। সমাজপতি কোনোদিন ক্রিকেট খেলেন নি, রিফ্লেক্সও ভাল না, বডির ওয়েট পাক্কা দেড় কুইন্টাল। কাজেই বুঝতে পারছেন, এক সেন্টিমিটারও শরীরটাকে এধার ওধার করতে না পারায় গেলাস টার্গেটে লাগল। কাচ ভেঙে হাতে ঢুকে গেল। রক্তে ভেসে যেতে লাগল সোফা কার্পেট। মিসেস সমাজপতি ব্লাড দেখে যেন আরো খেপে উঠলেন। আবার গেলাস ছুঁড়লেন। সব গেলাস শেষ হবার পর খাবারের প্লেট, কাঁটা-চামচ, ট্রে ছুঁড়তে লাগলেন। শেষে ভ্যাট সিক্সটি-নাইনের বোতলটা তুলে এলোপাথাড়ি হাতে পায়ে মারতে লাগলেন। সমাজপতি চেঁচাতে লাগলেন, সেভ মি ডোরা, সেভ মি। আই উইল ডাই।' কে কাকে সেভ করে বলুন! ঐ রক্ষাকালীর সামনে পড়লে আমি কিমা হয়ে যাব না? অনেকক্ষণ মারার পর সমাজপতি যখন প্রায় সেন্সলেস, সেই সময় তাঁর কোট ধরে টেনে হিঁচড়ে বাইরে নিয়ে গেলেন মিসেস সমাজপতি।'

'ফাইন। আপনি লাকি?'

ডোরা ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, 'লাকি।'

বললাম, 'সিওর। লাকি না হলে এরকম একখানা টেরিফিক নাটক কেউ দেখতে পায়। হলিউডের সব চাইতে অ্যাকশান-প্যাকড ফিলিমও এর কাছে সিসু (শিশু)।' একটু থেমে বললাম, 'তবে যা শ্লা ডেসক্রিপশান দিলেন, তাতে চোখের সামনে যেন সব সিনেমার মতো দেখতে পাচ্ছি। ওকে ম্যাডাম, এবার উঠি। দুপুরের ঘুম থেকে পাক্কা একটি ঘন্টা কিচাইন করে দিয়েছেন। এখন গিয়ে শুতে না পারলে স্রেফ ফিনিশ হয়ে যাব।'

ডোরা চোখের তারা ফিক্সড করে আমাকে দেখতে দেখতে বলল, 'সমাজপতি আর মিসেস সমাজপতির অ্যাকশান-প্যাকড ড্রামা শোনাবার জন্য আপনাকে ডেকে এনেছি নাকি?'

'তবে?'

'আপনার সঙ্গে আমার অন্য দরকার আছে।'

হে হে মহাশয়গণ, আমার মতো মাকড়ার সঙ্গে সমাজপতির গার্ল-ফ্রেণ্ডের কী দরকার থাকতে পারে, আপনারা আন্দাজ করতে পারেন? মালুম হচ্ছে, পারেন না। কপালে তিনটে ভাঁজ ফেলে বললাম, 'দেখুন ম্যাডাম, মেয়েমানুষ সম্পর্কে আমার ইন্টারেস্ট নেই।'

ডোরা বলল, 'পুরুষ মানুষ সম্পর্কে আমার কিন্তু ইন্টারেস্ট আছে। বসুন, আমি আসছি।'

'কোথায় যাচ্ছেন?'

'ড্রেসটা চেঞ্জ করে আসি। আমি একটু বেরুব। আপনি আমাকে কম্পানি দেবেন।'

মহাশয়গণ, আমি কি কোনো কাঁ্যাচাকলে পা ঢোকাতে যাচ্ছি? আপনারা মার্ক করতে থাকুন।

যাক গে, এই ড্রইং রুমে বসে আছি তো বসেই আছি। এক মিনিট, দু মিনিট করে ঝাড়া পনেরটা মিনিট কাবার কিন্তু ড্রেস-ফ্রেস চেঞ্জ করে ওধারের বেড-রুম থেকে ডোরা এখনও

বেরুচ্ছে না। বসে থেকে থেকে আমার কোমরের হাড়ে মরচে ধরে যেতে লাগল।

আচমকা সিক্সটিনথ মিনিটের মাথায় কুর কুর করে ফোন বেজে উঠল। এই ঘরে আমি যেখানে বসে আছি সেখান থেকে মোটে আড়াই ফুট দূরে একটা ছোট্ট কাশ্মীরি সাইড টেবলে ডোরাদের মেরুন রঙের টেলিফোনটা সাজানো রয়েছে।

মহাশয়গণ, আমার কী করা উচিত যখন ভাবছি সেই সময় বেডরুম থেকে ডোরা চেঁচিয়ে বলল, 'ফোনটা ধরুন তো মিস্টার।'

পারমিসান পাওয়া গেছে। ফোন তুলে 'হ্যালো' বলতেই সমাজপতির গলা ভেসে এল। একটু অবাক হয়েই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'ইজ ইট ফোর সিক্স এইট টু....' ডোরার পুরো নাম্বারটা এক দমে একটুও না থেমে বলে গেলেন।

বললাম, 'ইয়াস স্যার?'

'হু ইজ অন দা লাইন?' সমাজপতির গলার স্বরে এবার বোমা ফাটার মতো আওয়াজ হল।

সমাজপতির গলা শুনতে শুনতে টের পাচ্ছি, মাকড়া টেরিফিক খেপে গেছে। নিজের এক্সক্লুসিভ মেয়েমানুষের ফ্ল্যাট থেকে অচেনা পুরুষের গলা শুনলে খেপবার কথাই। মালটিকে একটু খেলাবার জন্য বললাম, 'গলা শুনে আমাকে চিনতে পারছেন না?'

সমাজপতি খানিকক্ষণ থতিয়ে রইলেন। তারপর পঁচিশ সেকেণ্ড বাদে আরেক বার বোমা ফাটল, 'কে তুমি?'

'স্যার আপনার কান দুটো একবার ই. এন. টি স্পেশালিস্টকে দেখানো দরকার।'

সমাজপতি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আরে স্বয়ম্ভু, তুমি।'

'হ্যাঁ স্যার। আমাকে চিনতে এতটা সময় লাগবে, ভাবতে পারি নি। আমার ব্যাডলাক।'

মহাশয়গণ, সমাজপতি আমার কথা যেন শুনতেই পেলেন না। বললেন, 'তুমি ডোরার অ্যাপার্টমেন্টে কী করছ?'

দেবশিশুর মতো সরল গলায় বললাম, 'বসে আছি।'

'বসে তো আছই, কিন্তু করছটা কী?' টেলিফোনের রিসিভারের ভেতর দিয়ে সমাজপতির গলার ঝাঁঝ আসতে লাগল।

ঝাঁঝের কারণটা, মহাশয়গণ, আপনারাও টের পাচ্ছেন, আমিও পাচ্ছি। আগের মতোই গলা করে বললাম, 'ডিউটি দিচ্ছি স্যার।'

'ডিউটি মানে?'

'এতক্ষণ 'টেপ' দিয়ে মাদামের ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্সের মাপ নিচ্ছিলাম। তিন উইক আগে যা ছিল তার থেকে এক সেন্টিমিটারও কমে বা বাড়ে নি। তারপর এখন চুপচাপ ড্যাম গুড বয়ের মতো দু পা ক্রস করে বসে আছি।'

'আমি কি তোমাকে ডোরার বডির মাপ নেবার কথা বলেছি?'

'নেভার স্যার।'

'তা হলে?'

'মাদাম আমাকে ফেভার করে এই ডিউটিটা দিয়েছেন। আপনার গার্ল-ফ্রেণ্ড, কী করে 'না'

বলি? তা ছাড়া—'

'কী?'

'আপনি তো মাদামকে চোখে চোখে রাখতে বলেছিলেন যাতে কেউ ওঁর গায়ে দাঁত না বসাতে পারে। চারদিকে হিউম্যান বডি নিয়ে কত শার্ক যে চক্কর মারছে!'

'তাই বলে ডোরার স্যুইটে গিয়ে বসে থাকবে?'

'কী করি স্যার, ডিউটি ইজ ডিউটি। দুটো ফ্লোর নিচে থেকে মাদামকে তো আর চোখে চোখে রাখা যায় না। তবে আপনাকে একটি গ্যারান্টি দিতে পারি, আমি একটা 'আগ'-মার্কা পারফেক্ট ব্রহ্মচারী। আপনি যেভাবে জুতোর সুখতলা কি ছেঁড়া মোজা দেখেন, আমি ঠিক সেইভাবেই মেয়েমানুষের বডি দেখি।'

নাকের ভেতর ঘুঁক ঘুঁক শব্দ করে সমাজপতি হাসলেন না কাশলেন, বোঝা গেল না। বললেন, 'তুমি একটি সুপার ক্লাসের হারামজাদা। এনিওয়ে, ডোরা কোথায়?'

উত্তর দিতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ চোখে পড়ল বেড-রুম থেকে ডোরা বেরিয়ে আসছে। বললাম, 'এই যে স্যার—' বলেই ফোনটা ডোরার হাতে ধরিয়ে দিলাম।

ডোরা ভুরু কুঁচকে দেড় ডজন কুইনাইন ট্যাবলেট চিবিয়ে খাওয়ার মতো মুখ করে বলল, 'কে?'

'আপনার আর আমার দু'জনের প্রভু।'

'সমাজপতি?'

আমি আস্তে মাথাটা বিশ সেন্টিমিটার বাঁ দিকে কাত করে দিলাম।

'কী চায় বিস্টটা?'

'অনেক দিন আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারে নি তো। মনে হচ্ছে ফোনে একখানা টেরিফিক 'লাভ-সঙ্' গেয়ে শোনাতে চাইছে।'

এক নিশ্বাসে সমাজপতি সম্পর্কে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের বেস্ট দশ বারটা খিস্তি ঝেড়ে টেলিফোনে মুখ গুঁজে ডোরা বলল, 'হোয়াট ডু য়ু ওয়ান্ট?'

ওধার থেকে সামজপতি কী বললেন, শোনা গেল না। তবে ডোরা দশ মেগাটন বোমা ফাটানোর মতো হেভি আওয়াজ করে চেঁচিয়ে উঠল, 'হিপোক্রিট, ওল্ড ছারপোকা, তোমার ন্যাকামো শুনবার সময় আমার নেই।' বলেই দুম করে ফোনটা ক্রেডেলে রেখে আমাকে বলল, 'চলুন মিস্টার স্বয়ম্ভু হোড়—'

অগত্যা মহাশয়গণ, বডিটাকে সোফা থেকে টেনে তুলতেই হল। বললাম, 'কোথায় যেতে হবে মাদাম?'

ডোরা ধমকে উঠল, 'ডোন্ট আস্ক এনিথিং। যেতে বলছি, যাবেন। কেউ প্রশ্ন করলে আমার মেজাজ খরাপ হয়ে যায়।'

হে হে মহাশয়গণ, এর পর অ্যাডহেসিভ দিয়ে দুই ঠোঁট জুড়ে ছুঁচের পেছনে সুতোর মতো ডোরার দেড় ফুট পেছনে পেছনে আমি তার স্যুইট থেকে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

ডোরার পরনে এখন জিনস আর শার্ট, পায়ে পুরু সোলের স্পোর্টস শ্যু। হাতে একটা দারুণ

দামী হ্যাণ্ডব্যাগ। ব্যাগটা দস্তুরমতো ভারি মনে হচ্ছে। ডেফিনিটলি ওটার ভেতর প্রচুর মাল রয়েছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা লিফটে করে নিচে নেমে এলাম। পার্কিং এরিয়ার গাদা গাদা গাড়ির ভেতরে থেকে একটা নতুন মডেলের ঝকঝকে জাপানি 'কার' বার করে এনে আমাকে তাতে তুলে ফেলল ডোরা। সে ড্রাইভারের সিটে, আমি তার পাশে।

দশ মিনিট বাদে দেখলাম, আমরা গড়িয়াহাট থেকে সার্কুলার রোডে চলে এসেছি। সেই যে ঠোঁট 'সিল' করে দিয়েছিলাম, তারপর আর ফাঁদ করি নি। জানালার বাইরে তাকিয়ে রাস্তার সিন ফিন দেখে যাচ্ছি।

আচমকা গাড়ির স্পিড থামিয়ে ডোরা ডাকল, 'এই যে মিস্টার—'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকালাম।

ডোরা জিজ্ঞেস করল, 'পরের রক্ষিতার ওপর ওয়াচ রাখার কাজ কত দিন করছেন?'

দাঁত বার করে বললাম, 'থ্রি উইকস ওনলি। মিস্টার সমাজপতির রিকোয়েস্টে এই কাজটা নিয়েছি।'

'সমাজপতিকে কদ্দিন চেনেন?'

'মোটে তিন সপ্তাহ।'

'এই লোকটার সম্পর্কে আপনার কী মনে হয়?'

'সমাজপতি গুরুদেব লোক ম্যাডাম। যদিও মাকড়ার পা থেকে চুলের ডগা পর্যন্ত সবটুকু দেখা হয় নি, তবু যেটুকু দেখেছি, তাতে মনে হয়েছে এরকম টেরিফিক মাল—স্যরি জিনিয়াস, আমার লাইফে আর চোখে পড়ে নি।'

একটু চুপ করে ডোরা চিৎকার করে উঠল, 'লোকটা একটা আস্ত [illegible]ারের বাচ্চা—গাটার স্নাইপ।'

হে হে মহাশয়গণ, আপনারা তো জানেনই, ওয়ার্ল্ডের কোনো ব্যাপারেই আমার এতটুকু কিউরিওসিটি নেই। কিন্তু ডোরার সঙ্গে যখনই দেখা হয় তখনই সমাজপতি সম্পর্কে ইংলিশ আর হিন্দি ল্যাঙ্গুয়েজের উৎকৃষ্ট কিছু খিস্তি ঝাড়ে। ছুকরি যে সমাজপতি মাকড়ার ওপর টেরিফিক খেপে আছে তা মালুম পাওয়া যায়। মহাশয়গণ, আপনাদের সঙ্গে আমার কোনোরকম হাইড অ্যাণ্ড সিক কারবার নেই। আমি যা করি বা যা বলি, সবই আপনাদের জানিয়ে। মহাশয়গণ, এই মোমেন্টে আপনাদের কাছে প্লেন ট্রুথটাই বলি, সমাজপতি আর ডোরার ব্যাপারে আমার স্লাইট কৌতূহল হচ্ছে। বললাম, 'সমাজপতিকে আপনি কতদিন চেনেন?'

'জ্ঞান হবার পর থকে।' ডোরা বলল।

তার কথা বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম, 'মানে?'

'মানে তিন চার বছর বয়েস থেকে।'

'কীভাবে চেনাশোনা হল?'

ডোরা গলার স্বরটা এক ঝটকায় কয়েক পর্দা চড়িয়ে চিৎকার করে উঠল, 'আমি ঝাড়গ্রামের একটা অরফ্যানেজে থাকতাম। আর ঐ গাটার স্নাইপটা ছিল তার প্রেসিডেন্ট।'

মহাশয়গণ, ডোরার শেষ কথাগুলো আমার কানে 'ইন' করল না। নিজের অজান্তেই জিভ থেকে ঝট করে বেরিয়ে এল, 'অরফ্যানেজে ছিলেন।'

'ইয়েস মিস্টার। আপনার কি ধারণা, আমর মতো মেয়েরা ছেলেবেলায় স্বর্গের বাগানে অ্যাঞ্জেলদের সঙ্গে খেলে খেলে বড় হবে? অরফ্যানেজই আমাদের একমাত্র প্লেস। পৃথিবীতে এর চাইতে অনারেবল প্লেস আমাদের জন্যে নেই।'

ব্যাপারটা তবু পুরোপুরি পরিষ্কার হল না। বললাম, 'আপনার মা-বাবা—'এই পর্যন্ত বলে ব্রেক কষলাম।

আমার কথাগুলোর মধ্যে একটা প্রশ্ন আছে। ডোরা বুঝতে পারল। বলল, 'আমারও ঐ একই কথা। এত বড় ভাস্ট ওয়ার্ল্ডে তিনশ কোটি মানুষের ভেতর কারা আমাকে জন্ম দিয়েছে, জানিনা। শুনেছি ঝাড়গ্রামের 'নবজীবন অরফ্যানেজ'-এর লোকেরা আমাকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে ওখানে নিয়ে যায়।

মহাশয়গণ, সমাজপতির রক্ষিতার লাইফ-হিস্ট্রি শুনতে শুনতে চমকে উঠলাম। এ যে আমারই কেস! বললাম, 'ম্যাডাম, তারপর?'

'তারপর আর কী, জ্ঞান হবার পর দেখলাম, আমার মতো অনেক মেয়ে জার্মের কায়দায় অরফ্যানেজে কিলবিল করছে। তাদের সঙ্গে বড় হতে লাগলাম। খুব ন্যাচারালিই নিজের মা-বাপ সম্পর্কে জানার ইচ্ছা হত। যে দুটো সেক্সি বিস্ট আমাকে এই পৃথিবীতে নিয়ে এসেছে তাদের কথা জিজ্ঞেস করতাম। অরফ্যানেজের হেড অমিয়াদি বলতেন, 'তোমরা ঈশ্বরের সন্তান।'

হেহে মহাশয়গণ, আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, নর্থ বেঙ্গলে আমি যে অরফ্যানেজে থাকতাম সেখানকার হেড ফাদারও আমাদের মতো অরফ্যানদের বলতেন 'তোমরা ঈশ্বরের সন্তান।' সব অনাথআশ্রমেই দেখা যাচ্ছে রেকর্ড বাজানো হয়। বললাম, 'ফাইন।'

ভরু কুঁচকে আমার দিকে তাকাল ডোরা। বলল, 'তার মানে?'

'মানে আপনার সঙ্গে আমার টেরিফিক মিল।'

'আপনার কথা বুঝতে পারলাম না তো।' ডোরার ভুরু আরো কুঁচকে গেল।

দাঁত বার করে বললাম, 'ম্যাডাম, আপনার মতো আমিও একজন বেজন্মা।'

ডোরা খেপে গেল। বলল, তামাশা করছেন!'

'তামাশা?'

'নয়তো কী। নিজের লাইফের সব চাইতে দুঃখের আর লজ্জার কথাটা আপনাকে বললাম। আর তা নিয়ে আমাকে 'হার্ট' করে কষ্ট দিচ্ছেন! আই ডিড নট এক্সপেক্ট দিস।'

মহাশয়গণ, আমি যে আমি, একজন থার্ড ক্লাস চিট, ফোরটোয়েন্টি, ফেরেববাজ, কোনো কারণেই যে লজ্জা পায় না, ঘাবড়ায় না, সে পর্যন্ত লাইফে এই প্রথম টেরিফিক হকচকিয়ে গেল। বললাম, 'বিলিভ মি, আমি বেজন্মাই। ওয়ার্ল্ডের যে কোনো রিলিজিওনের যে কোনো

গডের নামে দিব্যি করতে বলুন—করছি। সত্যিসত্যিই আমার মা-বাপের ঠিক নেই।'

ডোরা উত্তর দিল না। চোখের তারা ফিক্সড করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

বললাম, 'হাত মেলান ম্যাডাম।'

'কেন?' বলেও একটা হাত স্টিয়ারিং-এ রেখে অন্য হাতটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিল ডোরা।

আমি তার হাতটা দু'হাতে ধরে বললাম, 'আপনার সঙ্গে আলাপ-ফালাপ হয়ে ভালই হল। আমরা বোধহয় 'মেড ফর ইচ আদার।' মহাশয়গণ, ডোরাকে নিয়ে আমার ব্রেনে কিছু প্ল্যান এসে গেছে।

খানিকক্ষণ চুপচাপ। এর ভেতর ডোরার নতুন মডেলের জাপানি টোয়োটা সার্কুলার রোড ধরে তেলের মতো গড়াতে গড়াতে চৌরঙ্গির কাছাকাছি চলে এসেছে। ডোরার মোমের মতো ধবধবে আর বাটারের মতো সফ্‌ট হাতটা আমার হাতের ভেতর স্লাইট কাঁপছিল। মহাশয়গণ, প্লেন ট্রুথ, মানে শুদ্ধ বাংলায় সরল সত্যি কথাটাই বলছি। টেরিফিক লোভনীয় একটা ইয়াং গার্লের হাত নিজের হাতের চেটোতে পাওয়া সত্ত্বেও আমার কোনোরকম ব্যাড সুড়সুড়ি লাগছিল না, ব্লাড সার্কুলেশনের স্পিড বেড়েও যাচ্ছিল না। তবে অন্যরকম একটা ফিলিং হচ্ছিল।

হে-হে মহাশয়গণ, আপনারা তো জানেনই, ওয়ার্ল্ডের কোনো ব্যাপারেই আমার কোনোরকম কৌতূহল নেই, তবু এই মোমেন্টে ডোরার ব্যাপারে ডিটেলে জানতে ইচ্ছা হচ্ছে। ডোরা এক হাতে স্টিয়ারিং ধরে ছিল, তার অন্য হাতটা কোথায়, তা তো চোখের তারা ফিক্সড করে আপনারা দেখেই যাচ্ছেন। সেই হাতটা স্টিয়ারিং-এর ওপর তুলে দিয়ে বললাম, 'নবজীবন অরফ্যানেজ থেকে সমাজপতি আপনাকে এখানে নিয়ে এল কী করে?'

গাড়ির স্পিড কমিয়ে উইণ্ডস্ক্রিনের বাইরে থেকে চোখ দুটো আমার দিকে এনে ফেলল ডোরা। জিজ্ঞেস করল, 'আপনার বয়েস কত? হাউ ওল্ড আর ইউ?'

এই কথাটা অনেক দিন আগে আরো একবার জানতে চেয়েছিল ডোরা. নিশ্চয়ই আপনাদের তা মনে আছে। বললাম, 'চেহারা দেখে যা মনে হয় আমার বয়েস একজাক্টলি তা-ই।'

'তা হলে বলব, আপনার নাক টিপলে এখন নিশ্চয়ই আর দুধ গলে না।'

'দুধ! কী যে বলেন ম্যাডাম! নাক টিপলে এখন ওনলি একটা জিনিসই বেরুবে।'

উত্তর না দিয়ে তাকিয়ে রইল ডোরা।

হারমোনিয়ামের রিডের মতো বত্রিশটা দাঁত বার করে বললাম, 'সেই জিনিসটা হল সোনার বাংলা।'

ডোরা বলল, 'হোয়াট ইজ সোনার বাংলা?'

'মিনস ধান্যেশ্বরী, মিনস দিশি মাল।'

'কান্ট্রি লিকার?'

'রাইট। আমার পায়ের তলা থেকে চুলের ডগা পর্যন্ত ঐ জিনিসটা দিয়ে ফিলড্‌-আপ।'

নাক কুঁচকে গলার ভেতর অদ্ভুত একটা সাউণ্ড করল ডোরা।

আমি আবার বললাম, 'আমার কথা থাক ম্যাডাম, আপনার কথা বলুন। সমাজপতির ক্যাঁচাকলে কী করে পা ঢোকালেন?'

'এই কথার জবাব দেবার জন্যই আপনার বয়েস জিজ্ঞেস করেছিলাম। দশ বছরের বাচ্চারাও জানে মেয়েদের নাইনটি পারসেন্ট অরফ্যানেজ কারা চালায়, সেই ডেভিলদের পারপাস কী।'

মাথাটা সেমি সার্কেলে একদিক থেকে আরেক দিকে ঘুরিয়ে এনে বললাম, 'কিছু কিছু জানি। অনেক অরফ্যানেজে মেয়েরা বড় হলে তাদের দিয়ে খজড়ারা ডার্টি বিজনেস চালায়।'

'কারেক্ট—' ডোরা ঘাড় কাত করল, 'আমাদের দিয়েও সমাজপতি নানারকম বিজনেস চালাচ্ছে।' কিন্তু একটু থেমে চিন্তা করে ফের শুরু করল, 'হোল ইণ্ডিয়ায় নানা লোকের কোলাবরেশনে চোদ্দ পনেরটা অরফ্যানেজ আছে। যে বাচ্চা মেয়েদের তাদের মা-বাপেরা অন্ধকারে রাস্তায় ফেলে দিয়ে গা থেকে পাপের স্ট্যাম্প মুছে ফেলে, সমাজপতির লোকেরা তাদের তুলে এনে অরফ্যানেজে পুরে দেয়। এই মেয়েরা ন্যাচারাল নিয়মেই একদিন বড় হয়ে ওঠে। তাদের ভেতর যারা রিয়াল বিউটিফুল, সমাজপতি আর তার পার্টনাররা নিজেদের জন্য রাখে। বাকিদের কোথায় পৌঁছে দেওয়া হয়, বুঝতে ডেফিনিটলি আসুবিধা হচ্ছে না?'

'না—' আমি ঘাড় হেলিয়ে দিলাম।

'ঐ প্রসেসেই আমি সমাজপতির গড়িয়াহাটার অ্যাপার্টমেন্টে এসে হাজির হয়েছি। যতদিন না আমার সাবস্টিটিউট কাউকে পাওয়া যাচ্ছে, এই 'হেল'-এই আমাকে থাকতে হবে।'

মহাশয়গণ আমার কৌতূহলটা একেবারেই কিচাইন হয়ে গেল। এর পর জবাব দেবার আর কিছু ছিল না। আমি ঠোঁটে অ্যাডহেসিভ লাগিয়ে বসে রইলাম।

পাঁচ মিনিটও লাগল না, ডোরার জাপানি টোয়োটা পি. জি. হসপিটাল বাঁয়ে রেখে স্ট্রেট রেস কোর্সের বিশাল কম্পাউণ্ডের ভেতর ঢুকে গেল। আমি চমকে উঠলাম।

মহাশয়গণ, মেয়েমানুষ সম্পর্কে আমার অ্যালার্জির কথা আপনারা জানেন। অ্যালার্জি বলাটা বোধহয় ঠিক হল না। বলা উচিত এ ব্যাপারে আমার কোনো ইন্টারেস্ট নেই। ব্লাড, ফ্লেশ, বোন, ভেইন ইত্যাদি দিয়ে তৈরি ফিমেল বডির যে আলাদা কোনো চার্ম বা ম্যাজিক থাকতে পারে, এ নিয়ে আমার কোনোরকম 'হেডএক' নেই। মেয়েমানুষের মতো আরেকটা ব্যাপারেও আমার কোনো আইডিয়া আর ইন্টারেস্ট নেই। সেটা হল রেস বা অন্য কোনো টাইপের গ্যাম্বলিং। হোল ইণ্ডিয়া জুড়ে সাট্টা, মাটকা, তাসের জুয়া, বালা খেলা, ঘোড়ার জুয়া, পনির জুয়া—কত রকম কারবার চলছে। এই দিকটা আমি একেবারেই ডেভলাপ করি নি। বললাম, 'এখানে কী ম্যাডাম?'

ডোরা পার্কিং জোনে তার টোয়োটাটা নিয়ে যেতে যেতে বলল, 'এখানে টাকা ওড়াবার জন্যে এসেছি।'

মহাশয়গণ, এতকাল যে মাকড়াদের রেসের মাঠে দৌড়ুতে দেখেছি তাদের সবাই বলছে, 'ট্রিপল টোট' মারবার জন্য যাচ্ছে। আমার ফর্টি, ফর্টি-ফোর ইয়ারের লাইফে মিনিমাম কয়েক লাখ রেস খেলোয়াড় দেখেছি। সব শ্লা'র ধান্দা ঘোড়ার পেছনে ক্যাশ লাগিয়ে টেন টাইমস তুলে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু ডোরার মুখেই ফার্স্ট শুনলাম, টাকা ওড়াতে সে রেস কোর্সে এসেছে। হে-হে মহাশয়গণ, মেয়েমানুষের ব্যাপারে কৌতূহল না থাকলেও এই ছুকরিটা সম্পর্কে স্লাইট

ইন্টারেস্ট হচ্ছে। আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়াতে নাড়াতে বললাম, 'ফাইন, ফাইন। কত ক্যাশ ওড়াবেন?'

'মিনিমাম টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেণ্ড।'

মহাশয়গণ, ছুকরি সত্যি বলছে, না খজড়ামো করছে, বুঝতে পারছি না। বললাম, 'একসেলেন্ট।'

মিনিট পাঁচেকের ভেতর গাড়ি পার্ক করে ডোরা আমাকে নিয়ে একটা কাউন্টারে চলে এল। হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে ঘোড়ার ছাপ মারা রেসের বই বার করে পাতা উল্টে উল্টে কয়েক সেকেণ্ড কী দেখল। তারপর আমাকে দাঁড় করিয়ে স্ট্রেট কাউন্টারে গিয়ে হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে গোছা গোছা কারেন্সি নোট বার করে কী কিনল। খুব সম্ভব ঘোড়ার বাজির টিকিট। আরো কয়েক মিনিট পর ডোরার পেছন পেছন একটা বিরাট বিল্ডিং-এর গ্যালারিতে এসে উঠলাম। চারদিকে নানা কান্ট্রির, নানা ন্যাশনালিটির, নানা চেহারার, নানা পোশাকের বেঁটে, মোটা, চৌকো, ঢ্যাঙা, হাড়গিলে-মার্কা, চর্বির ঢিপি টাইপের ব্ল্যাক, ব্রাউন, ইয়ালো, হোয়াইট—এমনি অগুনতি মানুষ। ইউনাইটেড নেশনসের হেড কোয়ার্টারটা যেন কোথায়? প্যারিস না লণ্ডন না নিউইয়র্ক না টোকিও—এই মোমেন্টে মনে পড়ছে না। তবে মহাশয়গণ, আমার মনে হয় ওয়ার্ল্ডের বড় বড় মেট্রোপলিসের রেসের গ্যালারি গুলোই ইউনাইটেড নেশনসের হেড কোয়ার্টার হওয়া উচিত। যাক গে, আমার চারপাশের এই মালেদের একটু মার্ক করুন। একবার দেখলেই টের পাওয়া যায়, খচ্চরগুলোর ব্যাঙ্কে লাখ লাখ টাকা রয়েছে। ব্ল্যাক মানিও যে কত তার অ্যাকাউন্ট নেই। প্রায় সবার হাতেই একটা করে বাইনোকুলার। শালারা একটা দূরবীন কোম্পানির হোল ইয়ারের প্রোডাক্ট কিনে যেন এই রেসের মাঠে ঢুকেছে। রেসের মাঠে এত বাইনোকুলারের কী দরকার, কে জানে! আমার অন্তত কোনো আইডিয়া নেই।

হে-হে মহাশয়গণ, নানা টাইপের মানুষের একজিবিশন দেখার পর মুখটা ঘুরিয়ে স্ট্রেট সামনের দিকে তাকালাম। অ্যাবাউট একশ' গজ দূরে ঘোড়দৌড়ের ট্র্যাকটা বিরাট সার্কেলের মতো এক দেড় মাইল জায়গা জুড়ে পড়ে আছে। সবুজ কার্পেটের মতো ঘাসের ট্র্যাকটার দু ধারে ফেন্সিং, মাঝে মাঝে বড় বড় উঁচু বোর্ডে ইংরেজিতে 1 2 3—এমনি সব লেখা আছে। ওগুলো কিসের জন্য, ওদের কী মানে, গড নোজ।

কিছুক্ষণের ভেতর দেখা গেল, গোটা দশেক ঘোড়াকে ট্র্যাকে নিয়ে আসা হল। ঘোড়াগুলো টেরিফিক—তেজী আর টগবগে। সবগুলোর গা থেকে যেন বাটার গড়িয়ে পড়ছে। প্রত্যেকটার পিঠে একজন করে জকি।

ঘোড়াগুলোকে এক লাইনে দাঁড় করিয়ে মুখের সামনে ট্র্যাকের এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত প্লাস্টিক বা রাবারের সাদা নল ধরে দু'জন দাঁড়াল। একজন স্টার্টার হাতে পিস্তল নিয়ে পেছনে স্ট্যাচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

মহাশয়গণ, নিজের মুখটা নিজেরাই এক কাঁধ থেকে আরেক কাঁধ পর্যন্ত সেমি সার্কেলে ঝট করে একবার ঘুরিয়ে নিলাম। এবার দেখা গেল, চারপাশে প্রায় সবার চোখেই বাইনোকুলার উঠেছে। পর পর তিন চারটে বিরাট বিরাট বিল্ডিংয়ের গ্যালারিতে বিশ পঁচিশ হাজার লোকের

চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার চোখ রেস ট্র্যাকের ঘোড়াগুলোর ওপর ফিক্সড হয়ে আছে। মহাশয়গণ, বাইনোকুলারগুলোর ইউটিলিটি এতক্ষণে বুঝতে পারছি। গ্যালারিতে বসে ঘোড়াদের দৌড় তো ক্লিয়ার দেখা যায় না। স্পষ্ট করে দেখার জন্যই মাকড়ারা চোখে বাইনোকুলার ফিট করেছে।

আমি আবার ঘোড়াদের দিকে তাকালাম। তক্ষুণি স্টার্টার পিস্তলসুদ্ধ হাতটা আকাশের দিকে তুলে ফায়ার করল। জন্তুগুলোর মুখের সামনে থেকে রাবার বা প্ল্যাস্টিক রোপের বেড়া সরে গেল। দশটা ঘোড়া বুলেটের মতো ট্র্যাকের ওপর দিয়ে উড়ে যেতে লাগল।

অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেলে ঘাড় ফিরিয়ে এবার দেখলাম, ডোরার চোখেও একটা বাইনোকুলার সেট করা রয়েছে। তা হলে সেও একটা এনেছে!

ঘোড়াগুলো ট্র্যাক ধরে সেমি সার্কেলে ঘুরে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে গ্যালারির কয়েক হাজার বাইনোকুলারও ঘুরছে। মনে হচ্ছে, ঘোড়াগুলোর পায়ের সঙ্গে বাইনোকুলারগুলো যেন অদৃশ্য সুতো দিয়ে বাঁধা রয়েছে।

মহাশয়গণ, ঘোড়াগুলো যত দৌড়ুচ্ছে ততই আমার চারপাশের মাকড়াদের বুকের ভেতর যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে। এক্সাইটমেন্টে একেক জনের গলা দেড় ফুট দু ফুট করে লম্বা হয়ে যাচ্ছে, গলার শিরাগুলো দড়ির মতো ফুলে পাকিয়ে উঠছে।

আমার ডান পাশে রয়েছে ডোরা। তার মুখেচোখে কিন্তু কোনোরকম রিঅ্যাকশান নেই। লোকে যেভাবে রাস্তার ছেঁড়া কাগজ দেখে, আকাশের পাখি বা অন্য সিনফিন দেখে ঠিক সেইভাবেই পারফেক্ট ফিলজফারের মতো ঘোড়দৌড় দেখছে। কিন্তু আমার বাঁ পাশে যে জিনস পরা বাদামী চামড়ার মেয়েমানুষটি রয়েছে, সে হিস্টিরিয়ার রোগীর মতো গলার শির ছিঁড়ে সমানে চেঁচাচ্ছে, 'বাক আপ গোল্ডেন অ্যারো, বাক আপ—'

সামনের গ্যালারি থেকে চর্বির পাহাড়ের মতো একটা নিগ্রো টেরিফিক সরু গলায় চিৎকার করছে, 'চিয়ার আপ মাতাদোর—'

শুধু এই দু'জনই না, চারপাশ থেকে কয়েক হাজার মাকড়া কোরাসে চেঁচিয়ে যাচ্ছে, 'বাক আপ ব্লু হেভেন, চিয়ার আপ সিলভার ফ্ল্যাশ—' ইত্যাদি ইত্যাদি।

মহাশয়গণ, বুঝতেই পারছেন, ব্লু হেভেন, সিলভার ফ্ল্যাশ, মাতাদোর, গোল্ডেন অ্যারো—এ সব হল ছুটন্ত ঘোড়াদের নাম। টের পাচ্ছি এইসব ঘোড়ার ওপর খজড়াগুলো বাজি ধরেছে।

একটু পর ঘোড়াগুলো এক ফার্লং না দু ফার্লং, কে জানে, দৌড়ে ডেস্টিনেশনে পৌঁছে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কয়েক হাজার গলা থেকে চিৎকার উঠে এল, 'ও গস্!' তাদের মুখ দেখে মনে হচ্ছে, এই মাত্র করোনারি আর সেরিব্রাল দুটো অ্যাটাক একসঙ্গে হয়ে গেছে। একটা সিড়িঙ্গে টাইপের শিখ আর পিপে-মার্কা মারোয়াড়ি লাট খেয়ে বাঁ দিকের গ্যালারিতে পড়ে গেল, 'মর গিয়া—বিলকুল ফিনিশড—'

মহাশয়গণ, আমি দেখেই যাচ্ছি, দেখেই যাচ্ছি। আচমকা লাউড স্পিকারে 'ব্লু হেভেন' নামটা কানে আসতেই চারদিকের গ্যালারি থেকে হুড়মুড় করে ক'টা লোক নেমে গেল। আন্দাজ করা গেল, ব্লু হেভেন এই বাজিটা জিতেছে। লাকি উইনাররা তাদের ভাগের ক্যাশ আনতে দৌড়ুল।

আমার পাশ থেকে আস্তে করে ডোরা আচমকা বলে উঠল, 'যাক, পাঁচ হাজারের একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট হল।'

ঘাড় ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কিসের পাঁচ হাজার?'

'এইমাত্র যে বাজিটা হয়ে গেল তাতে বাজি ধরেছিলাম।'

'কোন ঘোড়ার ওপর ধরেছিলেন? ব্লু হেভেন?'

ডোরা ঠোঁটের কোণ দিয়ে ওয়ার্ল্ডের সব চাইতে মিস্টিরিয়াস হাসিটা হাসল। বলল, 'যে ঘোড়া জেতে আমি তার ওপর বাজি ধরি না।'

আমি যে আমি, একটা ফেরেববাজ, একটা টেরিফিক ফোরটোয়েন্টি, সে পর্যন্ত হকচকিয়ে গেল। বাজিতে হারার জন্য কোনো জুয়াড়ি টাকা লাগায়, আমার তা জানা ছিল না। বললাম, 'তাহলে কোন ঘোড়ার ওপর বাজি ধরেন?'

'যেটা রেসে লাস্ট হয়। ঐ দেখুন না, এইমাত্র যে দৌড়টা হয়ে গেল তাতে আমার ঘোড়া টার্গেটে লাস্ট পৌঁছেছে।'

'সব জেনেশুনে বাজিতে হারবার জন্যেই তবে আপনি রেস কোর্সে আসেন?

'অফ কোর্স।'

'এতে কী লাভ?'

'আপনাকে তো আগেই বলেছি, প্রফিটের জন্য আমি এখানে আসি না। আসি লসের জন্য।'

মনে পড়ল, গড়িয়াহাটের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে রেসের মাঠে আসতে আসতে ডোরা কথাটা বলেছিল ঠিকই। মহাশয়গণ, আপনাদেরও নিশ্চয়ই মনে পড়েছে। কিন্তু সত্যি সত্যিই ছুকরি টাকাগুলো ওড়াবার জন্য এখানে আসে, বিশ্বাস হয় নি। আমি আবার কিছু বলার জন্য ঠোঁট ফাঁক করতে যাচ্ছিলাম, তার আগেই ডোরা বলে উঠল, 'মিস্টার , আপনি একটু এখানে থাকুন। আমি দশ মিনিটের ভেতর আসছি।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় যাবেন?'

'কাউন্টারে। আরেক বার বাজি ধরে আসি।'

'এবারও কি যে ঘোড়া লাস্ট হবে তার ওপর ধরবেন?'

'আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না?'

মহাশয়গণ, রিয়ালি বলছি ছুকরিব এই রেসের ব্যাপারটা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। উত্তর না দিয়ে তাকে মার্ক করতে লাগলাম।

ডোরা এবার দস্তুরমত কড়া গলায় বলল, 'আই অ্যাম নট আ লায়ার। ওয়েট করুন, নিজের চোখেই দেখতে পাবেন কোন ঘোড়ার ওপর টাকা লাগাচ্ছি।'

'ও-কে ম্যাডাম, ওয়েটই করছি।'

ডোরা গ্যালারি থেকে নামতে লাগল। কয়েক স্টেপ নেমে ফের উঠে এসে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার অন্য কোথাও অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেই তো?'

'না। কেন?'

'যদি কাজ থাকে, বলে ফেলুন। ভদ্রতা ফদ্রতা করতে হবে না।'

'যেখানে ভদ্রতার সিস্টেম চালু আছে, আমি তার হাজার কিলোমিটারের মধ্যে থাকি না। আর কাজের কথা বলছেন? আমি তো এখন ডিউটিতেই আছি।'

'এখানে আপনার কিসের ডিউটি?'

'আপনার ওপর নজর রাখার। সমাজপতি এই জন্যেই তো আমাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছেন।'

নাক কুঁচকে চাপা গলায় অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ককনিতে একখানা উৎকৃষ্ট খিস্তি ঝাড়ল ডোরা। তারপর বলল, 'তা হলে আপনার সময়ের অভাব নেই?'

'না। তবে—'

'কী?'

'সান-ডাউনের আগে আপনার রেস কোর্সের সেক্রেড ডিউটিটা শেষ হবে তো?'

'অনেক আগেই হবে। এক বাজি ধরেছি, আর চারটে বাজি ধরতে পারলেই আমার কাজ শেষ।'

'তারপর কিন্তু আমার সঙ্গে এক জায়গায় যেতে হবে। যাবেন?'

ডোরার চোখ চকচকিয়ে উঠল, 'অফ কোর্স যাব। আচ্ছা চলি, নেক্সট দৌড়ের সময় হয়ে এল।'

আমি ডোরাকে যেতে দিলাম না। বললাম, 'কোথায় নিয়ে যাব, জানতে চাইলেন না তো?'

'সমাজপতি আমাকে যে 'হেল'-এ এনে তুলেছে সে জায়গাটা তার চেয়ে ডেফিনিটলি বেশি খারাপ হবে না। আপনার সঙ্গে ওয়ার্ল্ডের এনি ড্যাম প্লেসে আমি যেতে রাজি।'

মহাশয়গণ, আমার ওপর ছুকরির বিশ্বাসের স্যাম্পলটা দেখুন। ও তো জানে না আমি কী মাল! যাক গে, কিছুক্ষণ আগে আপনাদের একটা হিন্ট দিয়েছিলাম, ডোরাকে নিয়ে আমি একটা দুর্ধর্ষ প্ল্যান করে ফেলেছি। রেসের মাঠ থেকে বেরিয়ে ওকে সঙ্গে করে হেল না হেভেন, কোন জায়গায় যাব, কোথায় ওকে সেট করব আপনারা নিজের চোখে তা দেখতে পাবেন। আপনাদের কাছে আমার কোনোরকম ঢাক ঢাক গুড় গুড় মানে হাইড অ্যাণ্ড সিক গেম নেই মহাশয়রা। যা কিছু করব, সব আপনাদের চোখের সামনে। তবে ডোরার ব্যাপারে আমার ব্রেনে যা ফ্ল্যাশ করেছে সে সম্বন্ধে কিচ্ছু বলব না। বিদ্যাসাগরের বর্ণ-পরিচয়ের সুবোধ বালক হয়ে আপনারা ওয়েট করতে থাকুন।

বেশিক্ষণ একা একা দাঁড়িয়ে থাকতে হল না। ডোরা ফিরে এল। আমার ডান পাশে নিজেকে সেট করতে করতে বলল, 'অ্যানাদার ফাইভ থাউজ্যাণ্ড লাগিয়ে এলাম।'

জবাব দিলাম না।

আগের মতোই কয়েক মিনিটের ভেতর দশ-বারটা ঘোড়াকে ট্র্যাকের ওপর নিয়ে আসা হল। তাদের মুখের সামনে প্ল্যাস্টিক বা রবারের দড়ি টেনে ধরা হল। পিস্তলওলা স্টার্টার ঘোড়াদের পেছন দাঁড়াল। রেসের রিচুয়ালে যা যা করা দরকার, সবই করা হল। পিস্তল থেকে সাউণ্ড বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে নতুন ঘোড়াগুলো আবার স্পিলন্টারের মতো ছুটল। চারদিকে মাকড়াগুলো সেই রকম কোরাসে চিৎকার করে কানের পর্দা ফাটিয়ে দিতে লাগল, 'বাক আপ,

চিয়ার আপ—' এটসেটেরা।

ঘোড়াগুলো একসময় টার্গেট পৌঁছল। সঙ্গে সঙ্গে কয়েক হাজার মাকড়া আবার লাট খেয়ে গ্যালারিতে বডি ফেলে দিল। কয়েকটা খজড়া দু' হাত তুলে ড্যান্স করতে করতে নিচের দিকে দৌড়ুল।

আমি ডোরার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'এবার রেজাল্ট কী হল?'

ডোরা আগের মতোই ফিলজফারের গলায় বলল, 'এবারও আমার ঘোড়া লাস্ট হয়েছে। এগারটা অ্যানিমালের ভেতর ইলেভেনথ।'

'তার মানে আরো ফাইভ থাউজ্যাণ্ড ফ্লাই-ফ্লু-ফ্লোন হয়ে গেল?'

'কারেক্ট। আপনি প্লিজ একটু ওয়েট করুন। আমি কাউন্টার থেকে ঘুরে আসছি।'

মহাশয়গণ, এইভাবে ডোরা গ্যালারি থেকে কাউন্টারে, কাউন্টার থেকে গ্যালারিতে ক্যারামের ঘুঁটির মতো রিবাউণ্ড খেয়ে যাওয়া আসা করল। প্রত্যেক বারই লাস্ট ঘোড়ার ওপর ফাইভ থাউজ্যাণ্ড করে স্টেক করেছে সে।

পাঁচ বার কমপ্লিট হবার পর ডোরা বলল, 'আজকের মতো এখানকার কাজ শেষ। এবার চলুন কোথায় যেতে হবে।'

মহাশয়গণ, ডোরার হ্যাণ্ডব্যাগটা মার্ক করুন। গড়িয়াহাটার অ্যাপার্টমেন্ট হাউস থেকে যখন বেরিয়ে ছিলাম তখন ওটা বোঝাই ছিল। এখন কমপ্লিট ফাঁকা হয়ে গেছে।

গ্যালারি থেকে নিচে নামতে নামতে জিজ্ঞেস করলাম, 'আজ সবসুদ্ধু টোয়েন্টি-ফাইভ থাউজ্যাণ্ড ওড়ালেন, তাই না?'

'কারেক্ট।' ডোরা ঘাড় কাত করল, 'আপনি হিসেব রেখেছেন দেখছি।'

'এ তো সিম্পল ব্যাপার। পাঁচ বারে ফাইভ ইনটু ফাইভ, টোয়েন্টি-ফাইভ থাউজ্যাণ্ড।'

'এভরি উইকে ঐ অ্যামাউন্টটা আমি ঘোড়ার পেছনে ওড়াই।'

'মাসে তা হলে এক লাখ?'

'রাইট।'

'টুয়েলভ লাখ এভরি ইয়ার?'

'রাইট।'

'আপনার ব্যাঙ্কে কিরকম ক্যাশ আছে ম্যাডাম?'

'কোনো ব্যাঙ্কেই আমার অ্যাকাউন্ট নেই।'

মহাশয়গণ, মুখটা পারফেক্ট সার্কল বানিয়ে কিছুক্ষণ হাঁ করে রইলাম। তারপর বললাম, 'তবে কি দেওয়ালে কি মাটির তলায় গোপন চেম্বার করে ক্যাশ লুকিয়ে রেখেছেন?'

ডোরা আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল, 'নো।'

'নখরা বাজি কেন করছেন খজড়া মেয়েমানুষ?' বলেই পাক্কা দশ ইঞ্চি জিভ বার করে নিজের কান দুটোয় পাক দিতে দিতে ফের স্টার্ট করলাম, 'ক্ষমা ম্যাডাম, ক্ষমা। আমার মুখটা মাঝে মাঝে ড্রেন হয়ে যায়।'

'ও-কে ও-কে—' ডোরা হাত তুলে বুঝিয়ে দিল, খচড়া মেয়েমানুষ বলাতে সে রাগ ফাগ

করে নি।

জিভটা মুখের ভেতর আবার 'ইন' করিয়ে কান থেকে হাত নামালাম।

ডোরা ফের বলল, 'খজড়া মেয়েমানুষ তো ভাল কথা মিস্টার, আমার মতো একটা রক্ষিতাকে দিনরাত সবাই কী ল্যাঙ্গুয়েজে খিস্তি দেয় তা আমি জানি।'

একটু চুপ। তারপর জিজ্ঞেস করলাম, 'ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নেই, ক্যাশ লুকিয়ে রাখেন নি, তবে ইয়ারলি বার লাখ ঘোড়ার পেছনে ওড়াচ্ছেন কী করে?'

ডোরা বলল, 'ইণ্ডিয়ায় ক্যাশের অভাব! নাসিক প্রেস কত হাজার কোটি টাকা ছেপে বাজারে ছেড়েছে, আপনার সে সম্বন্ধে আইডিয়া আছে?'

'স্লাইট আছে।'

'তাতেই চলবে। মিস্টার স্বয়ম্ভু হোড়, রির্জাভ ব্যাঙ্ক হাজার হাজার কোটি টাকা হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়েছে। তার থেকে ওনলি বার লাখ ধরে আমি রেসে স্টেক করতে পারি না?'

'ডেফিনিটলি পারেন। কিন্তু—'

'কী।'

মহাশয়গণ, গলার স্বরটা ঝপ করে অনেকখানি নামিয়ে ফিসফিসিয়ে উঠলাম, 'ক্যাশটা কোথায় উড়ছে, সেই জায়গাটার নাম কাইণ্ডলি জানাবেন ম্যাডাম?'

ডোরা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না। কপালে বারটা ভাঁজ ফেলে কয়েক সেকেণ্ড কী ভেবে নিল। তারপর বলল, 'সমাজপতির চারপাশে।'

ডোরার দিকে অনেকখানি ঝুঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তা হলে ক্যাশটা ভায়া-সমাজপতি আপনার কাছে আসছে?'

'কারেক্ট।'

হে-হে মহাশয়গণ, এ যে দেখছি পারফেক্টলি আমারই কেস। নাসিক প্রেসের নোটগুলো সমাজপতির হাত ঘুরে স্ট্রেট আমার হাতে চলে আসছে। মহাভারতে না বাইবেলে কোথায় যেন লর্ড শ্রীকৃষ্ণ বলে একটা টেরিফিক ক্যারেক্টার আছে। তার মতো একশ আটটা নাম নিয়ে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলে সমাজপতির লাখ লাখ ব্ল্যাক টাকা ডিপোজিট করে রেখেছি। ঐ হেভি ক্যাশ আমি জনগণের পেছনে ওড়াবার অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছি। নাসিক প্রেসের ঐ টাকা সমাজপতির থ্রু দিয়ে আমার কাছে এলেও আসলে ও তো পিপলেরই টাকা। পিপলের ক্যাশ পিপলের জন্য ফুঁকে দিলে কী আর এমন দোষ। তবে ডোরাটা জনগণের ক্যাশ ঘোড়ার পেছনে ওড়াচ্ছে, এইটুকু যা তফাত। সে যাক গে, আমি আর কিছু বললাম না।

কথায় কথায় আমরা গ্যালারি থেকে নেমে পার্কিং জোনের কাছে চলে এসেছিলাম। ডোরা তার টোয়োটায় উঠে বাঁ দিকের দরজা খুলে দিল। আমিও উঠে তার পাশের সিটে নিজেকে 'সেট' করে দিলাম। ডোরা ঘাড় ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যেন আপনার সঙ্গে যেতে হবে?'

বললাম, 'বেলেঘাটা।'

রেস কোর্সের বাইরের রাস্তায় পড়ে নতুন মডেলের জাপানি টোয়োটা পক্ষিরাজের বাচ্চা

হয়ে উড়ে চলল।

মহাশয়গণ, আপনাদের মুখচোখের চেহারা দেখে মনে হচ্ছে, ডোরাকে নিয়ে বেলেঘাটার কোথায় যাচ্ছি, সেটা যেন আন্দাজ করতে পারছেন। রাইট, রাইট। ঠিকই ধরেছেন আপনারা, সমাজপতির এই গার্লফ্রেণ্ডকে নিয়ে আমি তাঁরই গুরুদেবের আশ্রমে ল্যাণ্ড করতে যাচ্ছি।

হে-হে মহাশয়রা, মনে মনে আপনারা ডেফিনিটলি টেরিফিক নার্ভাস হয়ে পড়ছেন। গুরুদেবের কারবারই হল গড মানে ভগবান-টগবান নিয়ে। আর যেখানে ভগবানের নামে রেগুলার টোয়েন্টি ফোর আওয়ার কীর্তন-ফীর্তন হয়, সেইরকম একটা আগমার্কা পবিত্র জায়গায় একটা রক্ষিতাকে সঙ্গে করে 'ইন' করতে যাচ্ছি। এতে নিশ্চয়ই আপনাদের আপত্তি আছে।

কিন্তু মহাশয়রা, একটা কথা আপনাদের ডেফিনিটলি মনে আছে। না থাকলে মনে করিয়ে দিচ্ছি। ওই যে বিগ বিগ সব মহাপুরুষ—হিউম্যান বডি নিয়ে যাঁরা এক একজন গড—তাঁরা কত মাতাল-দাঁতাল ফোরটোয়েন্টি ফেরেববাজ বেশ্যা মার্ডারারকে নরকের একেবারে বটম থেকে চুলের ঝুঁটি ধরে তুলে এনে তরিয়ে দিয়েছেন। আর এই মেয়েটা, আই মিন ডোরার কিছু একটা ব্যবস্থা হবে না? দেখা যাক, সমাজপতির গুরুদেব কত বড় মহাপুরুষ! বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রদের লাইনে কতটা ঐশ্বরিক পাওয়ার টাওয়ার যোগাড় করতে পেরেছেন। হয়ত যোগবলে একটা গতিও করে দিতে পারেন।

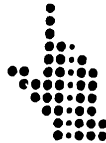
তবে মহাশয়গণ, আপনাদের আগেই জানিয়ে রেখেছি, এই মেয়েটা আর সমাজপতির গুরুদেবকে নিয়ে আমার একটা প্ল্যান আছে। আমি একটা এক্সপেরিমেন্ট করতে চাই। একটু ওয়েট করুন মহাশয়রা, স্লাইট ধৈর্য ধরুন, আর মার্ক করতে থাকুন কী প্রসেসে এই দুটো পুরো অপোজিট ক্যারেক্টারের মালকে নিয়ে মাদারি খেল দেখাই।

আমরা শিয়ালদা স্টেশন বাঁয়ে রেখে বেলেঘাটা ব্রিজের ওপর দিয়ে ওধারের রাস্তায় চলে গিয়েছিলাম। ডোরা জিজ্ঞেস করল, 'বেলেঘাটায় তো এসে গেছি। নাউ?'

বললাম, 'স্ট্রেট লেকের দিকে এগিয়ে যান।'

লেকের কাছে আসতেই বাঁ দিকের একটা রাস্তা দেখিয়ে বললাম, 'ঐদিকে চলুন।'

এই রাস্তারই শেষ মাথায় সমাজপতির গুরুদেবের আশ্রম। দু মিনিটও লাগল না, আমরা আশ্রমের বিরাট কম্পাউণ্ডে 'ইন' করলাম।



মহাশয়গণ, আপনারা তো স্টিকিং গামের মতো হোল ডে অ্যাণ্ড নাইট আমার ঘাড়ের সঙ্গে জুড়ে আছেন। আপনাদের চোখে ধুলো ছিটিয়ে, ভক্কি মেরে একা একা কোথাও আমার যাবার উপায় নেই। যেখানেই যাই, আমার বডির সঙ্গে ঝুলতে ঝুলতে আপনাদের মতো মাকড়ারা সেখানে ঠিক ভিড়ে যায়। আপনাদের ঝেড়ে ফেলার উপায় নেই।

যাক গে, আগেও আপনারা সমাজপতির গুরুদেব আচার্য জগৎপতির এই আশ্রমে আমার সঙ্গেই ঢুকে পড়েছিলেন। মার্ক করুন, কোথাও স্লাইটেস্ট চেঞ্জ হয় নি। আগেও যেমন দেখে গিয়েছিলেন, এখনও হুবহু সেই রকম রয়েছে।

কয়েক জন মাথা মুড়ানো অ্যাপ্রেন্টিস ব্রহ্মচারী সাদা উইনিফর্ম পরে এধারে ওধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যারা ফুল-ফ্লেজেড সন্ন্যাসীতে প্রোমোশন পেয়েছে, তেমন দু-তিন জনকেও দেখা গেল। তাদের পরনে গেরুয়া রঙের জার্সি। দূরে মন্দিরের সামনে সেই বিরাট বাঁধানো চত্বরে অ্যাসবেস্টসের শেডের তলায় সাদা ড্রেসের পনের কুড়িজন অ্যাপ্রেন্টিস সন্ন্যাসী গলায় শির ছিঁড়ে কীর্তন গেয়ে চলেছে।

মহাশয়গণ, আপনারা জানেন এই কীর্তনটা টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স চলতে থাকে। এক সেকেণ্ডের জন্যও থামে না। নন-স্টপ এই কীর্তনের জন্য কারখানা ফারখানার মতো চারটে শিফট চালু আছে। ছ ঘন্টা পর পর শিফট বদল হয়। অ্যাপ্রেন্টিস সন্ন্যাসীরা চারটে গ্রুপে ভাগ হয়ে এককে শিফটে গেয়ে যায়। ফুল-ফ্লেজেড সন্ন্যাসী হবার জন্য বছর চারেকের যে কোর্স এখানে কমপ্লিট করতে হয়, সেই কারিকুলামে এই কীর্তন গাওয়াটা 'মাস্ট'। কীর্তনে ফেল মানে পুরো সন্ন্যাসীতে প্রোমোশন পাওয়া ইমপসিবল। মহাশয়গণ, সন্ন্যাসী হওয়া ইজি ব্যাপার না।

ডোরা গাড়িটা পার্ক করতেই আমি নেমে পড়েছিলাম। ডোরা কিন্তু স্টিয়ারিং-এ হাত রেখে উইণ্ডস্ক্রিন দিয়ে আশ্রমটা দেখছিল। বললাম, 'নেমে পড়ুন ম্যাডাম।'

ডোরা আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এ কোথায় নিয়ে এসেছেন আমাকে!'

'ভেরি সেক্রেড প্লেস ম্যাডাম।'

'আশ্রম মনে হচ্ছে।'

'রাইট ম্যাডাম। ভগবানের যে ক'টা পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস আছে, এই আশ্রম তারই একটা।'

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে রইল ডোরা। তারপর হাজার মেগাটন বোমা ফাটানোর মতো চিৎকার করে উঠল, 'আপনার মতলবটা কি মিস্টার?'

মহাশয়গণ, আমি হকচকিয়ে গিয়ে বললাম, 'মানে?'

'আপনি আমাকে এই আশ্রমে 'নান' টান বানাবার জন্যে নিয়ে এসেছেন নাকি?'

মহাশয়গণ, আপনারা তো জানেনই, আমার ব্রেনের ভেতর প্ল্যানিং কমিশনের একটা হেড কোয়ার্টার বসানো রয়েছে। সেখানে ডোরাকে নিয়ে একটা পরিকল্পনার ব্লু-প্রিন্ট তৈরি হয়ে আছে। সেটা কী, এই মোমেণ্টে ছুকরিকে জানানো ঠিক হবে না। প্লিজ মহাশয়গণ, জোরজার করবেন না, আপনাদেরও ওটা বলব না। একটু ধৈর্য ধরে স্রেফ দেখে যান, আপনাদের পিটার স্বয়ম্ভু হোড় নামক মাকড়াটি এরপর কী করে।

বত্রিশটা দাঁত বার করে বললাম, 'কী যে বলেন ম্যাডাম!'

'তবে কি আমাকে এখানে হিন্দু মাইথোলজির সতী-সাবিত্রীদের মতো শুদ্ধ করতে এনেছেন? জাস্ট টু পিউরিফাই মি?

মনে মনে গোটাকতক টেরিফিক খিস্তি ঝেড়ে, গলায় দেড় কেজি বাটার লাগিয়ে বললাম, 'আপনার পা থেকে চুলের ডগা পর্যন্ত পিউরিটি দিয়ে তৈরি। আপনাকে আবার পবিত্র করার

দরকার কী?'

এবার দশ হাজার মেগাটনের বোমা ফাটাল ডোরা, 'জোক করছেন?'

'না না, একেবারেই না।'

'জানেন, আমার ব্লাডের প্রত্যেকটা ড্রপে একশ'টা করে পাপের ভাইরাস আছে?'

'আপনার যদি একশ'টা করে থাকে, আমার আছে হাজারটা করে।'

'আমার ব্যাকগ্রাউন্ড আপনি তো জানেন।'

'ওরকম ব্যাকগ্রাউন্ড আমারও আছে। ওয়ার্ল্ডের অনেক শাহানশা মালেরই আছে। প্লিজ, নেমে আসুন।'

'কিন্তু—'

'আর কিন্তু নয়।' বলতে বলতে টোয়োটার সামনে দিয়ে ঘুরে ডোরার পাশের দরজাটা খুলে দিলাম, 'প্লিজ, আর কথা নয়, নেমে আসুন।'

তবু ডোরা গাঁইগুঁই করতে করতে নামল।

আমি একরকম জোরজার করেই তাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে ফেললাম। বললাম, 'ওয়ার্ল্ডের একটা সাইডই এতদিন দেখেছেন, এবার অন্য সাইডটা দেখুন। চলুন, আচার্য জগৎপতির সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দিই।'

আমার পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে ডোরা জিজ্ঞেস করল, 'হু ইজ হি?'

'এই আশ্রমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর বলতে পারেন।' বলে একটু থেমে ফের শুরু করলাম, 'আরেকটু ক্লিয়ার করে দিচ্ছি। আচার্য জগৎপতি হলেন আপনার আমার মতো মানুষ আর ভগবানের মাঝখানে মিডিলম্যান। ভগবান ফগবানের সঙ্গে কারবার করতে গেলে ওঁর থ্রু দিয়ে যেতেই হবে।'

'বিগ গ্যায়?'

'রাইট।'

ডোরা খনিকক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর আচমকা বলে উঠল, 'আমার খুব ভয় করছে মিস্টার।'

আমি অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেলে ঘাড় বাঁকিয়ে তাকালাম, 'কেন?'

'এতদিন ব্লাডে পাপের ভাইরাস নিয়ে ছিলাম। ওতেই কন্ডিশানড হয়ে গিয়েছিলাম। এখানে আসার পর যদি দু'চারটে পুণ্যের ভাইরাস শরীরে ঢুকে যায়?'

'ফাইন হবে।'

'কিরকম?' ভুরু কুঁচকে তাকাল ডোরা।

বললাম, 'আপনার ব্লাডে পাপ আর পুণ্যের একটা ফাইট স্টার্ট হয়ে যাবে।'

ডোরা আর কিছু বলল না।

মন্দির আর টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স কেত্তনের জায়গাটা বাঁয়ে রেখে আমরা আশ্রমের হেড কোয়ার্টারে চলে এলাম।

একতলায় জুতো খুলে ডোরাকে নিয়ে দোতলায় আসতেই দেখা গেল, আচার্য জগৎপতি

তাঁর সিংহাসন টাইপের খাটে আটাশ ইঞ্চি গদির ওপর বডি ফেলে রেখেছেন। মহাশয়গণ, সমাজপতির সঙ্গে আগে যে দু'বার এসেছি, তখনও চোখে পড়েছে, মানুষ এবং ভগবানের মাঝখানের এই সোল সেলিং এজেণ্ট ঠিক এইভাবেই কাত হয়ে শুয়ে থেকেছেন। একজন অ্যাপ্রেন্টিস ব্রহ্মচারী তাঁর পা টিপে দিচ্ছে।

আমাদের দেখে আচার্য জগৎপতি হাতের ইশারায় বডির ম্যাসাজ বন্ধ করালেন। তারপর দুই মাড়ির মোট সতেরখানা পোকায়-কাটা ট্যারাবাঁকা দাঁত বার করে হাসলেন। বডির দলাই-মলাইয়ের জন্যে গেরুয়া লুঙ্গি কোমরের কাছাকাছি উঠে এসেছিল। ড্রপসিন ফেলার মতো দারুণ ব্যস্তভাবে সেটাকে গোড়ালি পর্যন্ত নামিয়ে দিয়ে এক ঝটকায় উঠে বসলেন। তাঁর চোখ দুটো চকচকিয়ে উঠল। বললেন, 'আরে তুমি!'

মহাশয়গণ, রামায়ণ কি মহাভারতে কোথায় যেন একটা ছবি দেখেছিলাম ছেলেবেলায়। তাতে বিষ্ণু না ব্রহ্মা, কার নাইকুণ্ডল থেকে একটা পদ্মফুল পারপেণ্ডিকুলারের মতো স্ট্রেট দাঁড়িয়ে ছিল। আর সেই ফুলটার পাপড়ির ভেতর কে যেন বডি ফেলে কাত হয়ে ছিল। আচার্য জগৎপতি অবিকল সেইরকম ঐ সিংহাসন-মার্কা খাটে শুয়ে থাকেন। ক্বচিৎ কখনো উঠে বসেন।

যাই হোক বললাম, 'হ্যাঁ গুরুদেব।' বডি থ্রো দিয়ে স্ট্রেট জগৎপতির পায়ের ওপর পড়লাম। ঝাড়া দেড় মিনিট পা দুটোর ফাঁকে মাথা গুঁজে রেখে উঠে বসলাম, তারপর ডোরার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসিয়ে বললাম, 'আমার মতো গুরুদেবের পায়ে ডাইভ দিন।'

ডোরা ডাইভ অবশ্য দিল না, দু হাত বাড়িয়ে জগৎপতির পা ছুঁল।

জগৎপতি বশিষ্ঠ বা যাজ্ঞবল্ক্যর স্টাইলে হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন, 'শুভম্।' তারপর আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, 'একে তো চিনতে পারলাম না।'

বললাম, 'এঁর নাম ডোরা, আমার ফ্রেণ্ড।'

'ডোরা কী?'

'মিত্র, ব্যানার্জি, আয়েঙ্গার, সোন্ধি, জয়বর্ধন—যা ইচ্ছা একটা সারনেম জুড়ে নিতে পারেন।'

'মানে!'

'মানে উনি একজন বিশ্বনাগরিক। ওয়ার্ল্ডের যে কোনো ক্যান্ট্রিই ওঁর কান্ট্রি, যে কোনো সারনেমই ওঁর সারনেম।'

'বুঝতে পারলাম না।'

'পরে আপনাকে বুঝিয়ে দেব গুরুদেব।'

একটু চুপচাপ। তারপর জগৎপতি বললেন, 'তোমাকে আমার খুব দরকার। তোমাকে খবর দেবার জন্য সমাজপতিকে অনেক বার বলেছি।'

বললাম, 'মিস্টার সমাজপতি আমাকে খবর দিয়েছেন।'

'রোজই তুমি আসবে। আসো নি কেন?'

'এতদিন আপনার জন্য প্ল্যানটা করে উঠতে পারছিলাম না, তাই—'

'প্ল্যানটা হয়ে গেছে?' উত্তেজনায় জগৎপতি বডি বাঁকিয়ে আমার দিকে ঝুঁকে পড়লেন।

বললাম, 'একরকম হয়েই গেছে বলতে পারেন। স্লাইট বাকি, দু'চার দিনের ভেতর সেটুকু

কমপ্লিট করে ফেলব।'

'দেশ বিদেশে আমার আশ্রমের নাম ছড়িয়ে পড়বে তো?'

'ডেফিনিটলি। ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট আপনি পাবেনই। টোকিও থেকে সানফ্রান্সিস্কো, মাদ্রিদ থেকে হংকং—সব জায়গায় আশ্রমের ব্রাঞ্চ যদি খোলাতে না পারি তো আমাকে তেত্রিশটা কিক ঝেড়ে ইণ্ডিয়া থেকে বার করে দেবেন।' বলে খানিকক্ষণ দম নিয়ে ফের স্টার্ট করলাম, 'তবে গুরুদেব—'

'কী?' উদ্বিগ্নভাবে আমার চোখের দিকে তাকালেন আচার্য জগৎপতি।

বললাম, 'গুরুদেব, আপনার এটা তো ব্রহ্মচারীদের গোডাউন। ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট পেতে হলে একজন সাধিকার দরকার হবে।'

জগৎপতি গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন, 'তুমি যা বলছ, বুঝতে পারছি। কিন্তু তেমন একজন কোথায় পাই?'

মহাশয়গণ, হামাগুড়ি দিয়ে জগৎপতির পাশে চলে এলাম। চোখের কোণ দিয়ে ডোরাকে দেখাতে দেখাতে তাঁর কানে মুখটা গুঁজে ফিসফিস করলাম, 'দেখুন তো এঁকে পছন্দ হয় কিনা?'

প্রভু জগৎপতি সোজাসুজি ডোরার দিকে তাকালেন না। থুতনিটা স্লাইট তুলে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘাড়টা ঘুরিয়ে ঝট করে ডোরাকে আরেক বার দেখে নিলেন। গলার স্বরটা একেবারে বটমে নামিয়ে বললেন, 'বেশ ভালই তো। কিন্তু—'

আমি চোখের তারাদুটো জগৎপতির মুখের ওপর ফিক্সড করে রেখেছিলাম। বললাম, 'কী গুরুদেব?'

'ইনি কি আমাদের আশ্রমে আসবেন?'

'কী যে বলেন প্রভু! আপনি শুধু একবার 'ইয়েস' বলুন' কালই ওকে আপনার এখানে সেট করে দিচ্ছি।'

জগৎপতি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন না। ব্রহ্মচারীদের এই আখড়ায় হুট করে ডোরার মতোটেরিফিক একটা ইয়াং গার্লকে 'ইন' করিয়ে দেওয়া ঠিক হবে কিনা সেটাই হয়ত বুঝে উঠতে পারছেন না। চোখ কুঁচকে ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে বললেন 'আমাকে একটু ভাবতে দাও স্বয়ম্ভু—'

বললাম, 'এর ভেতর ভাবাভাবির কিছু নেই প্রভু। ছুকরিটা ঝড়ের স্পিডে ইংরেজি বলতে পারে। তা ছাড়া বেঙ্গলি, হিন্দি, উর্দু আর ফ্রেঞ্চও জলের মতো বলে যায়। তার ওপর মোটে টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স ওল্ড। আর চেহারাটা দেখেছেন প্রভু, একেবারে হাই এক্সপ্লোসিভে ঠাসা।'

'আঃ, স্বয়ম্ভু—' জগৎপতি হাত তুলে আমাকে থামিয়ে দিতে চাইলেন।

'কী হল গুরুদেব?'

'আমার মতো সাধুদের তরুণী মেয়েদের দেহ বর্ণনা শুনতে নেই।'

ফের বত্রিশটা দাঁত বার করে দিলাম, 'প্রভু, আপনার মতো সাধু মহাত্মার কাছে ইয়ং

মেয়েমানুষের বডিও যা, জুতোর সুখতলাও তা-ই। সব কিছু ডিসপ্যাসনেটলি শুনে যান।'

জগৎপতি আর আপত্তি করলেন না, চুপ করে রইলেন।

আমি ফের বললাম, 'এরকম একজন ইয়াং যোগিনী থাকলে রোজগারটা কিরকম হবে, আন্দাজ করতে পারেন প্রভু?'

জগৎপতি আস্তে আস্তে মাথা নাড়তে লাগলেন, 'একটু একটু পারি।'

'হোল ওয়ার্ল্ডের লাখ লাখ ভক্ত দেখেবেন বেলেঘাটার এই আশ্রমে বডি থ্রো দিয়ে পড়বে। আপনি যা চাইছিলেন, মানে ইণ্টারন্যাশনাল মার্কেট, পেয়ে যাবেন।'

'ঠিকই। তবু দু'চারটে দিন সময় আমাকে দাও।'

'তা নিন। তবে ডোরাকে এখানে না নিলে টেরিফিক ভুল করবেন প্রভু।'

জগৎপতি উত্তর দিলেন না। তবে বোঝা গেল, মানুষ আর ভগবানের মাঝখানের এই সোল এজেন্টটা রীতিমত কাৎ হয়ে পড়েছে। চোখমুখ দেখে মনে হচ্ছে, ডোরাকে আশ্রমে ইন করাতে খুব একটা আপত্তি আর নেই। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'ওর কে কে আছে?'

বললাম, 'কেউ না গুরুদেব, একেবারে ঝাড়া হাত-পা। নো পিছুটান—'

'মা-বাবা কি মারা গেছে?'

'মা-বাবা নেই, কোনো কালে ছিলও না। একেবারে আমার মতো মাটি ফুঁড়ে গজিয়ে উঠেছে। ওকে নিয়েই বলতে পারেন, নতুন এক ডাইন্যাস্টির শুরু।'

একটু ভেবে জগৎপতি জিজ্ঞেস করলেন, 'ওকে কোথায় পেলে স্বয়ম্ভু?'

আমি ফের দাঁতের পেখম মেলে দিলাম, 'আমি কোথায় পাব? আপনার কাজে লাগবে বলে অলমাইটি গড পাইয়ে দিয়েছেন। হেভেন-সেণ্ট বলতে পারেন।' একটু থেমে বললাম, 'সবই আপনার লীলা প্রভু।'

ফ্ল্যাটারি, মানে চামচাগিরিতে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-ফিষ্ণু পর্যন্ত ফ্ল্যাট হয়ে যায়, আর এ তো জগৎপতি—ব্লাড অ্যাণ্ড ফ্লেশের একটা মানুষ। ঠোঁট দুটো স্লাইট ফাঁক করে একটু হাসলেন জগৎপতি। বললেন, 'ডোরা কবে থেকে এখানে এসে থাকবে?'

সট করে মনে পড়ে গেল, দু'দিন পর অভ্যুদয় মিটারের পয়সায় আগরপাড়ায় সেই টেম্পোরারি মেডিক্যাল ক্যাম্প বসবে। তার আগে আর কোনো প্রোগ্রাম করা ঠিক হবে না। বললাম, 'ধরুন, নেক্সট উইক থেকে। আমি নিজে ডোরাকে এখানে দিয়ে যাব।'

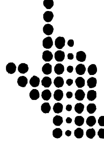
'ঠিক আছে।'

'তা হলে আজ আমরা চলি—'বলিই ফের বডি থ্রো দিয়ে স্ট্রেট জগৎপতির পায়ের ওপর পড়ে গেলাম।

যাজ্ঞবল্ক্যের স্টাইলে হাত বাড়িয়ে জগৎপতি বললেন, 'শুভম্।'

বডিটা তুলে নিয়ে চোখের ইশারায় ডোরাকে জগৎপতিকে প্রণাম করতে বললাম। আশ্রমের অ্যাটমোসফিয়ারে কী যেন আছে, ডোরা হাত বাড়িয়ে আবার জগৎপতির পা ছুঁল।

এবার ঋষ্যশৃঙ্গের স্টাইলে হাত বাড়িয়ে জগৎপতি বললেন, 'স্বস্তি।'



মিনিট পনের বাদে জাপানি টোয়োটায় ডোরার পাশাপাশি বসে গড়িয়াহাটার দিকে ফিরে আসছিলাম। স্টিয়ারিং-এ হাত রেখে উইণ্ডস্ক্রিনের বাইরে তাকিয়ে ছিল ডোরা। আচমকা সে বলে উঠল, 'আপনাদের গুরু জগৎপতির সঙ্গে কী এত ফিসফিস করছিলেন?'

বললাম, 'আপনারই ব্যাপারে ম্যাডাম।'

গাড়ির স্পিড চল্লিশ কিলোমিটার থেকে এক ঝটকায় পনেরতে নামিয়ে মুখটা সেমিসার্কেলে আমার দিকে ঘুরিয়ে ডোরা বলল, 'মানে?'

উত্তর না দিয়ে পালটা প্রশ্ন করলাম, 'তার আগে বলুন, যেখানে নিয়ে গিয়েছিলাম সেই জায়গাটা কেমন লাগল?'

'নট ব্যাড। আশ্রম, মেনোস্টরি—এসব যে রকম হয়, ঠিক সেই রকমই। কোয়ায়েট, পিসফুল। এবার আমার কথার জবাব দিন। আমার সম্বন্ধে কী ডিসকাস করছিলেন?'

ভ্যানতাড়া না করে স্ট্রেট বললাম, 'আপনাকে নিয়ে আমি একটা এক্সপেরিমেন্ট করতে চাই ম্যাডাম।'

'কিসের এক্সপেরিমেন্ট?' ডোরার প্লাক করা ভুরু দুটো কুঁচকে যেতে লাগল।

গুরুদেব জগৎপতি, তাঁর ইণ্টারন্যাশনাল মার্কেট পাওয়ার ইচ্ছা, এ ব্যাপারে ডোরার 'রোল' কী হতে পারে, ইত্যাদি খুব শর্টে জানিয়ে বললাম, 'কী রকম লাগছে ম্যাডাম?'

ডোরা চোখ কুঁচকে গোটা জিনিসটা ভাবতে লাগল।

আমি আবার বললাম, 'কারবারটার মধ্যে টেরিফিক এক্সাইটমেণ্ট আছে, তাই না?'

অন্যমনস্কের মতো ডোরা বলল, 'তা আছে।'

'তবে এর সাকসেসের সবটাই ডিপেণ্ড করছে আপনার ওপর।'

টোয়োটার স্পিড কমে পার আওয়ার পাঁচ কিলোমিটারে নেমে এসেছিল। ডোরার চোখমুখ দেখে মনে হচ্ছিল, আশ্রমের ব্যাপারটা তার ভেতর একটা দারুণ রি-অ্যাকশান ঘটিয়ে দিচ্ছে।

আমি আবার বললাম, 'কী হল, ঠোঁটে স্টিকিং গাম আটকে দিলেন যে?'

ডোরা ফুটপাথের ধার ঘেঁষে এবার গাড়িটা দাঁড় করিয়ে দিল। তারপর বলল, 'আপনি যা বলছেন, সেটা একটা হোল টাইম জব। টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স ওই আশ্রমে পড়ে থাকতে হবে।'

'ইণ্টারন্যাশনাল মার্কেট আর তার ইনফ্রাস্ট্রাকচারের জন্য আপনাকে ভাবতে হবে না। ওটা আমি ঠিক করে রেখেছি। ইণ্ডিয়ান যোগ আর মেডিটেসন কী করে ফরেনে বেচতে হয়, তা আমি জানি। আপনাকে এই সেলসের ব্যাপারে হেল্প করতে হবে শুধু। অবশ্য—'

'কী?'

'গোড়াতেই হোল-টাইমার হয়ে দরকার নেই। মাস দেড় দুই আশ্রমে তিন চার ঘণ্টার জন্যে

পার্ট-টাইম ডিউটি দিয়ে যান। পরে ফুল টাইমের কথা চিন্তা করে দেখবেন।'

'আপনার কথাটা ভেবে দেখি।'

'ভাববার কিস্‌সু নেই ম্যাডাম। আমি বলছি, আশ্রমে স্ট্রেট ডাইভ দিয়ে পড়ুন।' বলে একটু দম নিয়ে নেক্সট মোমেন্টেই ফের স্টার্ট দিলাম, 'আছেন তো এক শ্লা ডিবচ বুড়ো খজড়ার 'কিপ' হয়ে। তার চাইতে আমেরিকান, ব্রিটিশ, জাপানিজ, সুইস, জামাইকান, ফিলিপিনো, ফ্রেঞ্চ, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান, পেরুভিয়ান, ওয়ান্ডের হোয়াইট, ইয়োলো, ব্ল্যাক, ব্রাউন—সব জাতের লোকেদের নাচাতে পারবেন, এটা কী রকম টেরিফিক একটা থ্রিল বলুন তো? যখন ইচ্ছে 'ইয়োগ' সেণ্টার খোলার জন্য নিউ ইয়র্ক, প্যারি, লণ্ডন, রোম, টোকিও করে বেড়াতে পারবেন।'

শুনতে শুনতে ডোরার চোখ দুটো নতুন ব্লেডের মতো ঝকঝক করতে লাগল। বোঝা যাচ্ছে, যে দাওয়াই দিয়েছি তাতে দস্তুরমতো কাজ হয়েছে। এখন ছুকরিকে আরেকটু খেলিয়ে শুধু বেলেঘাটায় নিয়ে জগৎপতির আশ্রমে গেঁথে দেওয়া। বললাম, 'একটা কথা বলব ম্যাডাম?'

'কী?'

'সমাজপতিকে একটা হাই কিক ঝেড়ে আচার্য জগৎপতির সেণ্টারে চলে আসুন।'

'আপনার কথাটা আমার মনে থাকবে। ইটস আ ভেরি গুড সাজেশান।' বলে চাবি ঘুরিয়ে আবার গাড়িটা স্টার্ট দিল ডোরা।

কুড়ি মিনিটও লাগল না, আমরা গড়িয়াহাটার অ্যাপার্টমেণ্ট হাউসে পৌঁছে গেলাম।

পার্কিং এরিয়ায় টোয়োটাটা রেখে ডোরা আমাকে নিয়ে স্ট্রেট লিফট-বক্সে গিয়ে ঢুকল। তারপর থারটিনথ ফ্লোরে আমাকে নামিয়ে দিয়ে, ওপরে উঠে গেল।

নিজের স্যুইটে এসে ড্রইং রুমে সবে 'ইন' করেছি, কুর কুর করে টেলিফোন বেজে উঠল। শ্লা, সেই দুপুর থেকে ডোরার সঙ্গে ছুঁচের পেছনে সুতোর মতো ঘুরে বেড়াচ্ছি। দুপুরের ঘুমের বারটা অনেক আগেই বেজে গেছে। ভেবেছিলাম, এখন কিছুক্ষণ বিছানায় বডি ফেলে রাখব কিন্তু লাইফে পিস নেই।

টেলিফোনটা একটানা বেজে কানের ভেতর অনবরত র‍্যাঁদা ঘষে দিচ্ছে। মনে মনে কয়েকটা খিস্তি ঝেড়ে, ক্রেডেল থেকে সেটা তুলে হ্যালো বলতেই, ওধার থেকে সমাজপতির গলা ভেসে এল, 'কে, স্বয়ম্ভু?'

গলাটা মাখনে চুবিয়ে বললাম, 'আরে, আপনি? বলুন স্যার, আর্জেণ্ট কোনো কারবার আছে?'

'না-না, আর্জেণ্ট কিছু না। এই তোমার সঙ্গে একটু কথা বলতে ইচ্ছা করল, তাই ফোন করলাম।'

শুনুন মহাশয়গণ, কান খাড়া করে শুনে যান। ডোরাকে নিয়ে বেরুবার সময় মাকড়া একবার ফোন করেছিল। পাঁচ ঘণ্টা বাদে ফের কেন যে আমার সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছা হল সেটা আন্দাজ করতে অসুবিধা হচ্ছে না। খজড়াটা নিশ্চয়ই ভেবেছে, ডোরাকে আমি ফাঁসাবার তালে আছি।

দেখা যাক, আমার আন্দাজটা কারেক্ট হয় কিনা।

সমাজপতি আবার বলে উঠলেন, 'তারপর ডোরার সঙ্গে কিরকম ঘুরলে টুরলে?'

হে-হে মহাশয়গণ, যা ভেবেছিলাম, তাই। বললাম, 'ফাইন।'

'কোথায় কোথায় গেলে?'

সমাজপতি বোধহয় অপোনেন্ট পার্টির উকিলের মতো উল্টোপাল্টা প্রশ্ন করে জানতে চাইছেন, ডোরাকে আমি কতটা বাগিয়ে ফেলেছি। বললাম, 'রেসকোর্সে গিয়েছিলাম স্যার—'

সমাজপতি বললেন, 'তা তো আগেই জানিয়েছ। আর কোথাও যাও নি?'

বেলেঘাটার আচার্য জগৎপতির আশ্রমে যাবার কথাটা বলা ঠিক হবে কিনা যখন ভাবছি, সেই সময় সমাজপতি ফের বলে উঠলেন, 'একটা কথা শুনলাম—'

'কী?'

'তুমি বেলেঘাটা গিয়েছিলে। সঙ্গে একজন বিউটিফুল ইয়াং গার্ল ছিল। গার্লটি কে? ডোরা নাকি?'

দেখুন মহাশয়গণ, ভাল করে দেখুন খচ্চরটা আমার পেছনে গোটা স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্কর্ডই বোধহয় লাগিয়ে দিয়েছে। নইলে বেলেঘাটা থেকে বেরুতে না বেরুতেই খবরটা পেল কী করে? আর হাইড-অ্যাণ্ড-সিকের কোনো মানে হয় না। বললাম, 'হ্যাঁ স্যার—'

সমাজপতির গলার স্বরটা ঝপ করে অনেকখানি নেমে গেল। তিনি বললেন, 'তোমাকে আগেও বলেছি, আবারও বলছি—ডোরা আমার ওনলি ওয়ান গার্লফ্রেণ্ড।'

'স্যার, আপনাকে আগেও বলেছি, এখনও বলেছি—মেয়েমানুষের বডি আর জুতোর লেদার, দুটোই আমার কাছে এক।'

সমাজপতি যেন চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। শব্দ করে হাসতে হাসতে বললেন, 'জানি জানি, তোমাকে আমি ওয়ার্ল্ডে সব চাইতে বেশি বিশ্বাস করি। তুমি আমাকে কখনও বিট্রে করবে না।'

আমিও দাঁতের পেখম মেলে দিয়ে বললাম, 'তাই কখনও পারি স্যার? আপনি আমার গডফাদার।'

একটু চুপচাপ।

তারপর সমাজপতি বললেন, 'একটা ব্যাপারে আমার দারুণ কিউরিওসিটি হচ্ছে স্বয়ম্ভু।'

'কী ব্যাপার স্যার?'

'তুমি হঠাৎ এত জায়গা থাকতে, ডোরাকে নিয়ে গুরুদেবের আশ্রমে গেলে কেন?'

এই প্রশ্নটা ডোরাও আমাকে করেছিল। ওকে যা যা বলেছিলাম, সমাজপতিকেও তাই বললাম। অর্থাৎ ডোরাকে নিয়ে আমি একটা টেরিফিক এক্সপেরিমেণ্ট করতে চাই।

সমাজপতি মাকড়া চমকে উঠে বললেন, 'করেছ কী স্বয়ম্ভু!'

নিষ্পাপ দেবশিশুর মতো গলা করে বললাম, 'কী করেছি স্যার!'

'জানো ডোরার ব্লাডে কত ভাইসের জার্ম রয়েছে! তাকে তুমি পবিত্র আশ্রমের মতো একটা জায়গায় প্লেস করতে চাইছ!'

'ভালই তো হল স্যার।'

'কী ভাল?'

'ভাইসের জার্মের সঙ্গে ভার্চুর জার্মের একটা ফাইট বেধে যাবে। যার পাওয়ার বেশি সে টিকে যাবে। সেই মহাভারত-ফহাভারতের টাইম থেকে এই লড়াই চলছেই।'

মহাশয়গণ, আমার প্ল্যানটা সমাজপতির খুব একটা পছন্দ হল না। গাঁইগুঁই করতে করতে বললেন, 'এটা ঠিক করলে না স্বয়ম্ভু। আমার একটাই গার্লফ্রেণ্ড ছিল, তাকে কিনা তুমি যোগিনী বানাবার অ্যারেঞ্জমেণ্ট করে ফেললে!'

বললাম, 'স্যার আপনি যা মাল—' বলেই দশ ইঞ্চি জিভ কাটলাম, 'ক্ষমা করবেন স্যার, জিভ থেকে হড়কে 'মাল'টা বেরিয়ে গেছে—'

সমাজপতি তক্ষুণি ক্ষমা করে দিলেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি কিছু মনে করছি না।'

'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। আপনার গার্লফ্রেণ্ড সম্বন্ধে ভাববেন না। ওকে বেলেঘাটার আশ্রমে যে ফিট করে দিতে যাচ্ছি তাতে আপনার লস নেই। উল্টে—'

'উল্টে কী?'

'টেরিফিক উপকার হবে।'

সমাজপতির মুষড়ে-পড়া ভাবটা কেটে গেল। মাউথপিসের ভেতর মুখটা ঢুকিয়েই যেন ফিসফিসিয়ে বললেন, 'ডোরার ব্যাপারে তোমার ব্রেনে কোন প্ল্যান এসেছে নাকি?'

বললাম, 'নিশ্চয়ই স্যার। আপনার জন্যে টোয়েণ্টি ফোর আওয়ার্স নানা রকম প্ল্যানের চাষ করে যাচ্ছি। যখন যেটা কাজে লাগানো যায় আর কি।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ।'

আমি দাঁত বার করে বললাম, 'ধন্যবাদ দেবেন না স্যার, এটা আমার ডিউটি।'

একটু চুপচাপ। তারপর সমাজপতি স্টার্ট করলেন, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করব স্বয়ম্ভু? মানে খুব কৌতূহল হচ্ছে।'

'কী কথা?'

'ডোরাকে আশ্রমে রেখে আমার কী উপকার করতে চাও?'

'এখন বলব না স্যার। স্লাইট ধৈর্য ধরুন। একমাসের ভেতর জানতে পারবেন।'

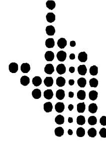
'ও-কে, ও-কে। তা হলে এখন ছাড়ি—'

সমাজপতি লাইনটা কাটতে যাবেন, আচমকা একটা কথা মনে পড়ে গেল আমার। দারুণ ব্যস্তভাবে বলে উঠলাম, 'স্যার, স্যার—'

সমাজপতি বললে, 'কী হল? কিছু বলবে?'

'হ্যাঁ। ডোরা তো সন্ন্যাসীদের গো-ডাউনে ঢুকে যাচ্ছে। আপনি আরেকটা গার্লফ্রেণ্ড কালেক্ট করে ফেলুন।'

সমাজপতি ঘোঁত ঘোঁত করে হাসতে হাসতে বললেন, 'তুমি একটি সাবলাইম হারামজাদা।'



হে-হে মহাশয়গণ, পঞ্চানন মানে পেঁচো মাকড়ার হাতের কাজ এক কথায় টেরিফিক। খজড়াটা ক'দিনের ভেতর ভাঙা মসজিদের সামনের বিরাট মাঠটা কভার করে দুর্ধর্ষ একখানা প্যাণ্ডেল খাটিয়ে তার ভেতর হাসপাতাল বসিয়ে ফেলেছে। ইয়ার, নোজ, থ্রোট, আই থেকে শুরু করে কোনো ডিপার্টমেণ্ট বাদ নেই সেখানে। ব্লাড, স্টুল স্পুটাম, হার্ট, লাঙস, মানে হিউম্যান বডির সব কিছু টেস্ট করার অ্যারেঞ্জমেণ্টও করা হয়েছে। প্যাথোলজির এমন কোনো ব্যাপার নেই যা এখানে পাওয়া যাবে না। এছাড়া রয়েছে অনেকগুলো অপারেশন থিয়েটার। সামনের দিকে নানা রঙের কাপড় দিয়ে বানানো প্রকাণ্ড একখানা গেট। বাকিংহ্যাম প্যালেসের ছবি দেখে ডেকরেটরদের দিয়ে এই গেটটা বানিয়েছে পেঁচো। তার ওপর মোগল আর্কিটেকচারের কায়দায় ক'টা কাপড়ের গম্বুজ সেট করে দিয়েছে। গম্বুজগুলোর মাঝখানে নহবতখানা টাইপের একটা কারবারও রয়েছে। গেটের একপাশে প্যাণ্ডেলের গায়ে একটা বোর্ডে ক্যালকাটার বেস্ট ডাক্তারদের লিস্ট টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। পকেটে ক্যাশ একশ' পঞ্চাশটি টাকা না থাকলে এই সব ডাক্তারদের চেম্বারে 'এন্ট্রি' পাওয়া যায় না। এঁরা কে কোন দিন এখানে বসে পেশেণ্ট দেখবেন তার ডেটও দেওয়া আছে পাশাপাশি।

প্যাণ্ডেলের গেটের মাথায় সেই উঁচু উঁচু গম্বুজগুলোর ওপর লাল সালুর ওপর ঢাউস ঢাউস টাইপে লেখা রয়েছে 'মেডিক্যাল ক্যাম্প'। তার তলায় ছোট টাইপে 'এখানে এক সপ্তাহ ফ্রি চিকিৎসা চলিবে।'

মহাশয়গণ, পেঁচো মাকড়ার কারবারটা একবার দেখুন। শ্লা আগরপাড়ার এই ওঁচা বস্তি ফস্তি মার্কা জায়গায় ইণ্ডিয়ার বেস্ট একটা হাসপাতাল বসিয়ে দিয়েছে।

শুধু তাই না, এ ব্যাপারে আট দশটা ছোকরাকেও সে ফিট করে ফেলেছে। তারা সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত সাইকেল রিকশায় ঘুরে ঘুরে মাইকে গলার শিরা ছিঁড়ে অনবরত চেঁচিয়ে যাচ্ছে, 'চোখের রোগ, কানের রোগ, পেটের রোগ, হাড়ের রোগ, টি. বি, ক্যানসার, লিউকোমিয়া, টাইফয়েড, নিমুনিয়া, ন্যাবা, ম্যালেরিয়া—যে কোনো ডিজিজের পেশেণ্ট মেডিক্যাল ক্যাম্পে এসে রোগ সারিয়ে যান। নতুন, পুরনো, ক্রনিক—যার যা রোগ আছে, এই মওকায় সারিয়ে নিন। এমন চান্স লাইফে আর পাবেন না। দলে দলে আসুন, ঝাঁকে ঝাঁকে আসুন, পালে পালে আসুন। রোগ সারাতে কারো গাঁট থেকে একটা ঘষা পয়সাও খরচা হবে না।'

মেডিক্যাল ক্যাম্প বসবে নেক্সট রবিবার থেকে। অনেকে আগেই তার ক্যামপেন শুরু হয়ে গেছে।

মহাশয়গণ, আজ বুধবার। তার মানে ক্যাম্প চালু হতে এখনও পাক্কা তিন দিন বাকি।

আজ দুপুরে পবিত্র খালসা হোটেলে রোটি-তড়কা পেঁয়াজ আর হরা মিরচি দিয়ে একখানা দুর্দান্ত প্রোলেটারিয়েট লাঞ্চ সেরে গড়িয়াহাটার অ্যাপার্টমেণ্ট 'ইন' করতেই অভ্যুদয় মিটারের

ফোন এল। মহাশয়গণ, আপনারা তো জানেনই দুপুরবেলা ঘুমের টাইমে কেউ বাগড়া দিলে আমার মেজাজ কিচাইন হয়ে যায়। কিন্তু কী আর করা যাবে, অভ্যুদয় মাকড়ার অনেকগুলো ক্যাশ মেডিক্যাল ক্যাম্পে গলিয়ে দিয়েছি। কথা না বললে শ্লা হেভি খারাপ দেখায়। কাজেই টেলিফোনটা কানে সেট করে গলার স্বরটায় জেলি লাগিয়ে বললাম, 'বলুন স্যার—'

অভ্যুদয় জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন কী করছ?'

'তেমন কিছু না।'

'তা হলে এক্ষুণি আমার আলিপুরের গেস্ট হাউসে চলে এস।'

মহাশয়গণ, আলিপুরের এক হাই-রাইজ বিলিডিংয়ে অভ্যুদয় মিটারের যে বিশাল ফ্ল্যাট আছে, সে খবর আপনাদের আগেই জানিয়েছি। আগেকার দিনে মানে নাইনটিনথ সেঞ্চুরি-ফেঞ্চুরিতে ক্যালকাটার বাবুরা বাইজি-ফাইজি রাখবার জন্য গঙ্গার ধারে বাগানবাড়ি বানাতো। এখন পিকচারটা অন্য রকম। আজকালকার পয়সাওলা ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট কি বিজনেসমানরা ফুর্তিফার্তার জন্য অ্যাপার্টমেন্ট কিনে মেয়েমানুষ রাখে। অবশ্য অভ্যুদয় মিটার দারুণ খলিফা। সে সমাজপতির মতো পার্মানেন্ট মেয়েছেলে পোষে না, দরকারমতো কলগার্ল দুটিয়ে এনে রাত কাটায়। সানরাইজের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রফেশনাল ফি মিটিয়ে দিয়ে বার করে দেয়।

বললাম, 'এখনই যেতে হবে, না পরে গেলে হয়?'

অভ্যুদয় বললেন, 'এখনই আসতে হবে।'

'খুব আর্জেন্ট ব্যাপার?'

'হ্যাঁ। মিস্টার সমাজপতি আমার এখানে তোমার জন্যে ওয়েট করছেন।'

মহাশয়গণ, আমি যে আমি—পিটার স্বয়ম্ভু হোড় যে কোনো কারণেই ঘাবড়ায় না, চমকায় না, সে পর্যন্ত স্লাইট অবাক হয়ে গেল। এই দুপুরবেলা সমাজপতি মাকড়া অভ্যুদয়ের গেস্ট হাউসে কেন বডি ফেলেছে বোঝা যাচ্ছে না। শ্লারা ঝামেলা ফামেলা বাধাবার তালে আছে কিনা কে জানে।

অভ্যুদয় ফের বলে উঠলেন, 'শুধু সমাজপতি সাহেবই না, আমার অন্য বিজনেসম্যান আর ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট ফ্রেণ্ডরাও এসেছেন। প্লিজ, তাড়াতাড়ি চলে এস।'

মহাশয়গণ,এবার রিয়ালি আমার চমক লাগল। বিজনেস আর ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্ল্ডের এই সব টাইকুন আজ কী জন্য এই কনফারেন্স বসিয়েছে? খজড়াগুলোর ধান্দাটা কী? বললাম, 'কী ব্যাপার স্যার?'

'ফোনে বলা যাবে না। কুড়ি মিনিটের ভেতর চলে আসতে চেষ্টা কর।'

হে-হে মহাশয়গণ, আমার মতো মাল, ওয়ার্ল্ডের কোনো ব্যাপারেই যার বিশেষ কিউরিওসিটি নেই, সে পর্যন্ত শুদ্ধ বাংলায় খানিকটা কৌতূহলী হয়ে উঠল। এক সেকেণ্ডও দেরি না করে বাইরে বেরিয়ে লিফটে ঢুকে গেলাম। তারপর ঝাঁ করে নিচে নেমে স্ট্রেট পার্কিং এরিয়ায়। এক মিনিটের ভেতর ফরেন লিমুজিনে স্টার্ট দিয়ে চলে এলাম বাইরের রাস্তায়।

আলিপুরে ফিফটিনথ ফ্লোরে অভ্যুদয় মিটারের গেস্ট হাউসে ঢুকে দেখলাম, মাকড়া ধোঁকা

দেয় নি। ন'ইঞ্চি পুরু কাশ্মীরি কার্পেটে মোড়া বিশাল ড্রইং রুমে আড়াই ফুট ফোমের গদি বসানো সোফায় বডি ফেলে বসে আছেন অভ্যুদয়, সমাজপতি, সামতানি এবং আরো কয়েকজন। সামতানিকে এই সেকেণ্ড টাইম আমি দেখলাম। এর আগে সমাজপতি যখন আমার অনারে পার্টি দিয়েছিলেন তখন এই চিজটিকে একবার দেখেছিলাম। অভ্যুদয়, সমাজপতি আর সামতানি ছাড়া এ ঘরের বাকি সবাই আমার অচেনা।

আমি ড্রইং রুমে এন্ট্রি নেওয়া মাত্র সমাজপতি এবং অভ্যুদয় একসঙ্গে ডুয়েটে বলে উঠলেন, 'এস এস স্বয়ম্ভু, তোমার জন্যেই ওয়েট করছি।' তারপর ঘরের অচেনা মালগুলোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তাঁরা হলেন মিস্টার ভট্টাচারিয়া, মিস্টার আগরওয়াল, মিস্টার সোঙ্ঘি, মিস্টার দেশাই, মিস্টার জয়পুরিয়া। সবাই বিজনেসম্যান। কারো ইমপোর্ট এক্সপোর্টের ব্যবসা, কারো গারমেন্টের বিজনেস, কারো ট্রান্সপোর্টের, কারো লেদারের, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এতগুলো মাল আমার সঙ্গে আলাপ ফালাপ করার জন্য একেবারে মুখিয়ে ছিল, ভাবতে খারাপ লাগল না। সমাজপতির সঙ্গে কনট্যাক্ট হবার পর আমি শ্লা একজন টেরিফিক ভি. আই. পি হয়ে উঠেছি, দেখা যাচ্ছে।

সে যাক গে, নতুন মাকড়াদের সঙ্গে পরিচয় হবার পর একটা সোফায় বডি রেখে বললাম, 'স্যার, কী জন্যে আমাকে এখানে ডেকেছেন, যদি কাইণ্ডলি বলেন—'

সবার রিপ্রেজেণ্টেটিভ হয়েই যেন সমাজপতি বললেন, 'নিশ্চয়ই বলব। মিস্টার মিটারের জন্যে যে মেডিক্যাল ক্যাম্প বসাচ্ছিলে তার কাজ কতটা হল?'

সমাজপতি দেখা যাচ্ছে, অভ্যুদয়ের ইলেকশানের খবর রাখেন। বললাম, 'কমপ্লিট—'

'কবে থেকে ক্যাম্প চালু হবে?'

'রবিবার থেকে।'

একটু ভেবে সমাজপতি জিজ্ঞেস করলেন, 'মেডিক্যাল ক্যাম্প বসালে, তাতে কিছু লাভ হবে?'

বললাম, 'মনে হচ্ছে।'

'ওখানকার লোকেরা মিস্টার মিটারের ফেভারে ভোট দেবে?'

হে-হে মহাশয়গণ, অভ্যুদয় মিটার যাতে আধখানা ভোটও না পায় তার প্ল্যান অনেক আগেই করে ফেলেছি। মেডিক্যাল ক্যাম্পের পেছনে খচ্চরটার পাঁচ সাত লাখ টাকা আগে তো খসিয়ে দিই। তারপর কী করতে হবে তা আমিই জানি। মাহাশয়গণ, বুঝতে পারছি আপনারা আমার প্ল্যানটা জানার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছেন। একটু ধৈর্য ধরুন, প্লিজ একটু খানি ধৈর্য। তারপর নিজের চোখেই সব দেখতে পাবেন।

সমাজপতিদের বললাম, 'দেওয়া উচিত। মিটার সাহেব এত ক্যাশ খরচা করছেন। ভোট না দিলে বুঝব মানুষের ক্যারেক্টার হেভি খারাপ হয়ে গেছে। বুঝব ওয়ার্ল্ডে ভাল লোক নেই, সব শ্লা নেমকহারাম, বিট্রেয়ার।'

খুশিতে সমাজপতির মুখেচোখে ফোর-ফর্টি ভোল্টের আলো জ্বলে উঠল যেন। তিনি বললেন, 'তুমি হয়ত ভাবছ, মিটার সাহেবের ইলেকশান নিয়ে আমাদের এত ইন্টারেস্ট কেন?'

'না স্যার, একেবারেই ভাবছি না। কেন আপনাদের এত ইণ্টারেস্ট তা আমি জানি।'

'কী জানো?'

গভর্নমেণ্ট ট্যাক্স-ফ্যাক্স লাইসেন্স-টাইসেন্সে নিয়ে আপনাদের, মানে বিজনেসম্যান আর ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টদের সব সময় রগড়ে দিচ্ছে। যাতে বেশি টাইট না দিতে পারে সেই জন্যে পলিটিক্যাল পাওয়ার হাতে থাকা দরকার। মিটার সাহেব যদি ভোটের মাকড়াদের কবজা করে অ্যাসেম্বলি কি পার্লামেণ্টে 'ইন' করতে পারেন, আপনাদের টেরিফিক সুবিধে।' বলে সামনে ঝুঁকে চোখের তারা ফিক্সড করে সমাজপতির দিকে তাকালাম, 'এই জন্যেই তো আপনাদের এত ইন্টারেস্ট, তাই না স্যার?'

ঘরে আর্থকোয়েক ঘটিয়ে সমাজপতি হাসতে লাগলেন। টগবগিয়ে দুধ ফোটার মতো তাঁর দেড় কুইন্টাল ওয়েটের বডিটা উথলে উথলে উঠতে লাগল। হাসতে হাসতেই বললেন, 'তুমি একটি উৎকৃষ্ট বজ্জাত। আসল ব্যাপারটা ঠিক ধরে ফেলেছ।'

আমিও বত্রিশখানা দাঁত বার করলাম।

হাসির তোড় খানিকটা কমলে সমাজপতি এবার বললেন, 'মাস্টার প্ল্যান যখন তোমার ব্রেন থেকে বেরিয়েছে তখন দুশ্চিন্তার কারণ নেই। তবু তোমার পারমিশান নিয়ে একটা কথা জিজ্ঞেস করছি।'

মহাশয়গণ, আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, সমাজপতি অ্যাণ্ড কোম্পানির সঙ্গে আমার একটা কনট্রাক্ট হয়েছিল। আমি ওঁদের যে কাজ নেব, কমপ্লিট না হওয়া পর্যন্ত সে একটা ব্যাপারে ওঁরা কোনোরকম কিউরিওসিটি দেখাতে পারবেন না। কিন্তু সমাজপতি যে কী টাইপের ডিপ্লোম্যাট তা তো আপনারা জানেনই। আগেই পারমিসান-ফারমিসান নিয়ে সব কিছু তিনি জেনে নিতে চাইছেন।

ঠিক আছে, এক-আধবার মাকড়ার কৌতূহল-ফৌতূহল মেটানো যাক। বললাম, 'পারমিসানের কথা বলে আমাকে স্যার লজ্জা দেবেন না। কী জিজ্ঞেস করবেন, করুন।'

'মেডিক্যাল ক্যাম্প তো বললে রবিবার থেকে চালু হচ্ছে। ঐ দিন কী ফাংশান করছ?'

'আপনি কি উদ্বোধনী, মানে ইনঅগারাল ফাংশানের কথা বলছেন?'

'রাইট—'তেত্রিশ কেজি ফ্যাটের ঠাসা ঘাড়টা ডান দিক থেকে রাইট অ্যাঙ্গেলে একবার ঘোড়ালেন সমাজপতি।

মহাশয়গণ, আপনাদের জানিয়ে রাখি, ক্যাম্পে উদ্বোধনীর-ফুদ্বোধনী ব্যাপারে আমি কিছু ভাবিই নি। আসলে এই ব্যাপারটা আমার মাথাতেই আসে নি। বললাম, 'স্যার, আগরপাড়ার পেশেন্টদের রোগ সারানো হবে ক্যাম্পে। এর ভেতর ইনঅগরেশন ফিনঅগরেশনের ঝামেলা ঢুকিয়ে কী লাভ?' সমাজপতি কী জন্যে উদ্বোধনের কথা বলছেন, সেটা একটু আধটু বুঝতে পারছি কিন্তু ওটা অ্যাভয়েড করতেই হবে। শ্লা, তুমি যাও ডালে ডালে, আমি পাতায় পাতায় চরে বেড়াই।

'তুমি ভেবে দেখ স্বয়ম্ভু, এরকম একটা চান্স মিস করা ঠিক হবে কিনা?'

সব বুঝেও জিজ্ঞেস করলাম, 'কিসের চান্স?'

'গ্র্যাণ্ড একখানা ফাংশান করে ক্যাম্প উদ্বোধনের দিনে আগরপাড়ার লোকেদের কাছে মিস্টার মিটারকে ইনট্রোডিউস করা যায়। তাদের জানিয়ে দিতে পার, এই ক্যাম্প মিস্টার মিটারের পয়সাতেই হচ্ছে। তাতে মিটার সাহেব সম্পর্কে ওদের ইম্প্রেসান ভীষণ ভাল হয়ে যাবে। আল্টিমেটলি এতে আমাদের সবার ভাল হবে। মানে মিটার চোখ বুজে ঐ কনস্টিটিউয়েন্সিটা থেকে রিটার্ন করে যাবেন।'

মহাশয়গণ, এতক্ষণে সমাজপতির ধান্দাটা নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পেরেছেন। মাকড়া যে ইনঅগরাল ফাংশানটা অভ্যুদয়ের ইলেকসান ক্যাম্পেনের ফার্স্ট স্টেপ হিসাবে ক্যাশ করতে চাইছে সেটা আমি অনেক আগেই মালুম পেয়ে গেছি। কিন্তু তা হবে না, অভ্যুদয়ের মতো মালের হাতে কিছুতেই পলিটিক্যাল পাওয়ার তুলে দেওয়া যায় না। কিছুতেই না, কিছুতেই না, কিছুতেই না। কিন্তু সমাজপতিকে এই মুহূর্তে একটু ভক্কি মারা দরকার। আমার পেটের ভেতর যে প্ল্যানটা আছে, খচ্চরটা যাতে তা টের না পায়, সে ব্যাপারে দারুণ কেয়ারফুল থেকে হেসে হেসে বললাম, 'ইনঅগরাল ফাংশান একটা হতে পারে। কিন্তু তাতে মিটার সাহেব গেলে অসুবিধা হবে।'

'কী অসুবিধা?' চোখে কুঁচকে সমাজপতি জানতে চাইলেন।

বললাম, 'আপনাকে এক্ষুণি বুঝিয়ে দিচ্ছি।'

সমাজপতি চোখের তারা ফিক্সড করে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

আমি এবার বললাম, 'মিটার সাহেবের নাম শুনলেই আগরপাড়ার লোক খেপচুরিয়াস হয়ে যায়। হট করে ওঁকে ওখানে সবার সামনের দাঁড় করিয়ে দিলে সব কিচাইন হয়ে যাবে।'

সমাজপতি আস্তে আস্তে সাউথ ইণ্ডিয়ানদের মতো মাথা নাড়তে লাগলেন। নাড়তে নাড়তেই বললেন, 'হুঁ। মিটার সাহেব আগে থেকেই ওখানে গণ্ডোগোল করে রেখেছেন। তুমি ঠিকই বলেছ, হঠাৎ ওঁকে ওখানে দেখলে ফার্স্ট রিঅ্যাকশানটা খা[illegible] হবে।'

মহাশয়গণ, মনে মনে যে প্ল্যানটা করে রেখেছি, দেখুন সেটা কীভাবে কাজে লাগিয়ে দিলাম। অভ্যুদয় মাকড়াকে কিছুতেই আগরপাড়ায় ভিড়তে দেব না। দাঁত বার করে বললাম, 'রাইট স্যার, ভেরি রাইট। মিটার সাহেবের থোবড়া এখন ওখানে না দেখানোই ভাল।'

সমাজপতি তক্ষুণি কিছু বললেন না। কপালে ছত্রিশটা ভাঁজ ফেলে চোখ কুঁচকে একসময় বললেন, 'কিন্তু স্বয়ম্ভু একটা কথা ভেবে দেখেছ?'

'কী স্যার?'

'মিটার সাহেব এতগুলো টাকা মেডিক্যাল ক্যাম্প বসিয়ে খরচ করলেন। অথচ—'

সমাজপতির কথা শেষ হতে না হতেই বাকিটা তার মুখ থেকে ক্যাচ করে নিয়ে বললাম, 'অথচ ইলেকশানের ব্যাপারে অত ক্যাশ কোনো কাজে লাগল না, একটু পাবলিসিটিও হল না—এই তো?'

'একজাক্টলি।'

'স্যার, ঘাবড়ে যাবেন না। এই হিউজ ইনভেস্টমেন্টটা নষ্ট হতে দেব না। ফোকটে আগরপাড়ার খজড়াগুলো রোগ সারিয়ে নেবে, তা কখনও হয়?'

অভ্যুদয় এই সময় বলে উঠলেন, 'কিন্তু কিভাবে মেডিক্যাল ক্যাম্পটা আমার ফেভারে কাজে লাগাবে, কিছুই তো বুঝতে পারছি না স্বয়ম্ভু।'

বললাম, 'আমার ওপর আপনার ভরসা আছে তো?'

মহাশয়গণ, অভ্যুদয় গলার ভলিউমটা তিন গুণ চড়িয়ে দিলেন, 'নিশ্চয়ই আছে।'

'তা হলে স্যার ধৈর্য ধরে থাকুন। মুরগির পেটের ভেতর ডিম তৈরি হতে টাইম লাগে। তাড়াহুড়ো করে টাইমের আগে ডিম বার করতে গেলে মুরগিটার বারটা বাজে, ডিমও পাওয়া যায় না।'

সমাজপতি ওধার থেকে বলে উঠলেন, 'কারেক্ট, কারেক্ট। সব জিনিসেরই একটা নিয়ম আছে। একটু সময় দিতেই হবে মিস্টার মিটার।'

আমি এধার থেকে অভ্যুদয়কে বললাম, 'স্যার, আমি আগেই প্ল্যান করে রেখেছি। মেডিক্যাল ক্যাম্পটা হয়ে যাক। তারপর আস্তে আস্তে আগরপাড়ায় আপনাকে ভিড়িয়ে দেব।'

খানিকক্ষণ চুপচাপ।

তারপর সমাজপতি বললেন, 'তা ক্যাম্প ইনঅগারেশনের ব্যাপারটা হচ্ছে তো?'

গলায় জোর দিয়ে বললাম, 'সিওর স্যার, সিওর। আপনি প্রিজাইড করবেন।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ।'

বোঝা যায়, সমাজপতি মাকড়া টেরিফিক খুশি হয়েছে। আমি কিছু বললাম না।

সমাজপতি আবার বললেন, 'মিটার সাহেব তো ইনঅগারেশনের দিন মেডিক্যাল ক্যাম্পে যেতে পারছেন না। আমার অন্য বন্ধুরা যেতে পারবেন তো?'

'ডেফিনিটলি স্যার। আপনারা সবাই গিয়ে দেখে আসবেন, মিটার সাহেবের অতগুলো ক্যাশ আমি হজম করে দিয়েছি, না রিয়ালি কাজে লাগিয়েছি।'

'তোমার অনেস্টি সম্বন্ধে আমাদের এতটুকু ডাউট নেই। থাকলে নিজেদের এত সিক্রেট তোমাকে বলি, না লাখ লাখ টাকা তোমার হাতে তুলে দিই? ইউ আর আওয়ার মোস্ট ট্রাস্টেড ফ্রেণ্ড, ফিলজফার অ্যাণ্ড গাইড।'

মহাশয়গণ, আমার মতো একটা চিট, ফোরটোয়েণ্টি এবং উৎকৃষ্ট ফেরেববাজ সমাজপতি অ্যাণ্ড কোম্পানির কিরকম বন্ধু আর কিরকম গাইড, তার কিছু কিছু স্যাম্পল নিশ্চয়ই আপনারা দেখেছেন। যাই হোক, এই টাইপের কথার উত্তরে যা বলতে হয় তাই বললাম, 'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। মেনি মেনি থ্যাঙ্কস।'

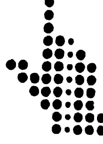
সমাজপতির দেড় কুইন্টাইল ওয়েটের প্রকাণ্ড বডিটা নড়েচড়ে উঠল। সামনের দিকে ঝুঁকে বললেন, 'তুমি একটা লাভেবল খচ্চর। কেন যে মাঝে মাঝে সন্দেহের কথা তুলে আমাদের সঙ্গে হারামিগিরি কর!'

মহাশয়গণ, সমাজপতি বিরাট বিরাট অনেকগুলো কোম্পানির চেয়ারম্যান, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, হ্যান-ত্যান আরো কত কী যেন। মাকড়া কিন্তু বস্তিতে যে সমস্ত টেরিফিক টেরিফিক খিস্তি চালু রয়েছে তার সবই জানে। আর মাঝে মাঝে আদর করে সেগুলো আমার ওপর ঝেড়ে যায়। সে যাক, আমি দাঁত বার করে হেসে বললাম, 'স্যার, ঐ কথাই তা হলে ফাইনাল রইল।

এখন তিনটের মতো বাজে। দুপুরের ঘুমটা তো কিচাইন করেই দিয়েছেন। ট্রাই করে দেখি যদি গড়িয়াহাটে ফিরে গিয়ে বিছানায় বডি ফেলা যায়।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, যাও।'

আমি উঠে পড়লাম।



অভ্যুদয় মিটারদের ক্যাঁচকল থেকে বেরিয়ে সত্যি সত্যি গড়িয়াহাটে এসে ঘণ্টাদুয়েক ঘুমিয়ে নিলাম। তারপর উঠে ভাজা মুরগির চাট দিয়ে পাক্কা এক পাঁট সোনার বাংলা স্টমাকে চালান করে লাস্ট ট্রেনে ফিরে এলাম আগড়পাড়ার ব্যারাকবাড়িতে।

এত রাতে বাড়িটা কোনোদিনই জেগে থাকে না। প্রায় সব ঘরেই দরজা বন্ধ করে হারামীগুলো ইণ্ডিয়ার পপুলেশন বাড়াবার প্ল্যান করতে থাকে।

সব ঘরে হুড়কো পড়লেও একটা ঘরের দরজা কিন্তু বন্ধ হয় না। সেটা সুমনাদের। রাত শ্লা যতই হোক, একটা-দুটো-তিনটে, আমি যতক্ষণ না ফিরছি, বারান্দায় হেরিকেন জ্বালিয়ে বসে থাকে সুমনা। আমাকে দেখার পর একটা কথাও না বলে চুপচাপ ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়ে।

আজও এই প্রোগ্রামে এতটুকু চেঞ্জ হল না। মহাশয়গণ, আগেও আপনাদের দু'হাজার সাতশ সাতাত্তর বার জানিয়েছি, ছুকরি আমার ব্যাপারে ফেঁসেছে। শ্লা, এর কোনো মানে হয়! কত বার সুমনাকে বলেছি, মেয়েছেলের কারবারে আমি নেই। কিন্তু মেয়েটা আমার কথা কানেই ঢোকায় না। থাকো বাওয়া, মিডনাইট পর্যন্ত আমার জন্য বারান্দায় বসে বসে মশার কামড় খাও। এতেই যদি সুখ হয়, আমি আর কী করতে পারি!

সুমনা হেরিকেন নিয়ে ওদের ঘরে ঢুকে যাবার পর আমি নিজের ঘরে ঢুকে পড়লাম।

পার্টিশানের এধারে, মানে আমার দিকটায় রোজই সন্ধেবেলায় বোদার বউ কনকচাঁপা একটা হেরিকেন ধরিয়ে নিভু নিভু করে রেখে যায়। মানে সোনার বাংলা চড়িয়ে রাত্তিরে ফিরে এসে আমার যাতে অসুবিধা না হয়—এই আর কী।

ঘরে ঢুকতেই শুনতে পেলাম, চাপা গলায় বোদা আর কনকচাঁপা প্রেমের ডায়ালগ চালাচ্ছে আর থেকে থেকে হেসে উঠছে। হাসো মাকড়ারা, হাসো।

মহাশয়গণ, সবে হারামী দুটোর বিয়ে হয়েছে তো। হাজার হাজার বছর ধরে নতুন বিয়ের পর হাজব্যাণ্ড আর ওয়াইফ যা যা করে অর্থাৎ জেগে জেগে নাইট ডিউটি দেয়, ওরাও তাই করছে। এর ভেতর নাথিং নিউ। ওরা এখন যা করছে, যা বলছে, আপনারাও একদিন তাই করেছেন, তাই বলেছেন, মানে পুরনো রেকর্ড বাজিয়ে যাওয়া আর কী। মহাশয়গণ, আমার শ্লা ওল্ড রেকর্ড শুনতে ভাল্লাগে না।

প্রথমেই জুতো খুলে হেরিকেনের চাবি ঘুরিয়ে লাইটের ভোল্টেজ বাড়িয়ে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে ওধার থেকে বোদার গলা শোনা গেল, 'গুরু, ফিরলে নাকি?'

কার্ডবোর্ডের পার্টিশানের ফাঁকগুলোতে আচমকা আলোটা জোরালো হয়ে উঠতে দেখে আমি যে ফিরেছি, বোদা টের পেয়েছে। পায়ের জুতো খুলতে খুলতে বললাম, 'হ্যাঁ?'

'গুরু, আজ কলকাতায় তোমার কী প্রোগ্রাম ছিল?' কলকাতা থেকে ফিরলে রোজই বোদা এই প্রশ্নটা করে, আজও করল।

মহাশয়গণ, আপনারা তো জানেনই, ঘরের এক কোণে আমার পার্মানেণ্ট বিছানা সেট করা আছে। শুদ্ধ ভাষায় যাকে অনন্তশয্যা বলে তাই আর কি। সেটার ওপর কেজি পাঁচেক ধুলো রয়েছে। আর লাখ দেড়েক ছারপোকা ফ্যামিলি প্ল্যানিং-ফ্ল্যানিংকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ওদের পপুলেশান বাড়িয়ে চলেছে। ইচ্ছা করলে ডি. ডি. টি বা ফ্লিট-ট্লিট ছড়িয়ে ওদের জেনোসাইড করে দিতে পারি। কিন্তু জৈন না কারা যেন একটা পোকাকেও মারে না, আমিও তাদের মতোই। ছারপোকাদের টাচ পর্যন্ত করি না। তা ছাড়া ওদের কামড় না খেয়ে আমার ঘুমই আসতে চায় না। যাক গে, জুতো খুলে বিছানায় বডি ফেলতে ফেলতে আজ কলকাতায় যা যা করেছি, বোদাকে জানিয়ে দিলাম।

একটু চুপ করে থেকে বোদা বলল, 'গুরু, তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল।'

'বলে ফেল।'

'কাজ ফাজ না করে করে বডির নাটবল্টুগুলোতে জং ধরে যাচ্ছে গুরু। এর পর শ্লা বিছানায় ফ্ল্যাট হয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই করতে পারব না। এক আধটা ডিউটি-ফিউটি দাও। বডিটা চালু রাখি।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কদ্দিন বিয়ে হয়েছে তোর?'

বোদা বলল, 'আট দিন গুরু।'

মহাশয়গণ, নিউলি-ওয়েড, মানে যারা সবে বিয়ের কঁ্যাচকলে পা ঢুকিয়েছে—তাদের জন্যে একটা ফাণ্ড খুলে দিয়েছি। ভেবেছিলাম, বোদা শালার হয়ে গেল। এই ব্যারাকবাড়িতে কনকচাঁপার আঁচলের তলায় বাকি লাইফটা সে তাঁবু ফিট করে পড়ে থাকবে। নট নড়নচড়ন, নট কিচ্ছু। আমার সঙ্গে ম্যারাথন রেস শুরু করেছিল, কয়েক মিটার দৌড়েই লাট খেয়ে গেল।

কিন্তু মহাশয়গণ, দেখা যাচ্ছে মাকড়টার লাংসে এখনও দম আছে। আবার শ্লা রেসে ফিরে আসতে চাইছে। বোদাটাকে এই মোমেন্টে দারুণ ভাল লেগে গেল। বললাম, 'এর ভেতরেই ডিউটি চাইছিস?'

বোদা আগের কথাটাই ল্যাংগুয়েজ পালটে আবার বলল, 'কী করব গুরু, বেকার বসে থেকে থেকে বডির বল-বিয়ারিংগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কাল থেকে আমার ডিউটি চাই।'

'কাল থেকেই?'

'হ্যাঁ। আমি ডিউটি বুঝে নিতে আসছি।।'

'এত রাত্তিরে নতুন বউকে বিছানায় একা রেখে আসতে নেই।'

'কে বললে?'

'উপনিষদ-ফিষদে লেখা আছে।'

'তুমি গুরু খজড়ামো করছ। আমি আসবই।'

বোদাকে ঠেকানো গেল না। কার্ডবোর্ডর ওয়ালের ওধার থেকে সট করে উঠে এল। মহাশয়গণ, কারবারটা একবার ভাবুন। মিডনাইটে বিয়ের আট দিনের মাথায় আপনাদের কেউ নতুন বউকে ছেড়ে উঠে আসতে পেরেছেন? আপনাদের মুখচোখ দেখেই মালুম পাচ্ছি—পারেন নি। বোদা যা সংযম-ফংযম দেখাল, ওয়ার্ল্ডের টপ-ক্লাস যোগী-টোগীরাও পারে নি। এক লং জাম্পে বোদা ঋষিদেরও ছাড়িয়ে গেল। হারামীটার পা থেকে দেড় কেঁজি ধুলো নিয়ে মাথায় চাপাতে ইচ্ছে করছে।

বোদা স্ট্রেট আমার গায়ের সঙ্গে স্টিকিং গামের মতো জুড়ে বসে পড়ল, 'কী ডিউটি দিচ্ছ বল—'

বললাম, 'ডিউটি ফিউটি নিয়ে খেপে উঠেছিস কেন? সবে বিয়ে করলি। ক'টা দিন চুটিয়ে লদগালদগি করে নে। তারপর—'

'তোমার কোনো বাহানা শুনতে চাই না। তুমি গুরু এখন আমাকে একদম দেখছ না। সব টেরিফিক টেরিফিক কাজ পেঁচো শালাকে দিয়ে করাচ্ছ। আমার বিয়েতে টেন লাখ খরচা করলে। অত বড় প্যাণ্ডেল হল, ডজন ডজন সানাইওলা আর ব্যাণ্ডপার্টি এল, হোল আগরপাড়া কবজি ডুবিয়ে চাইনিজ-জাপানিজ-ফ্রেঞ্চ-ইংলিশ খানা খেয়ে গেল—এ সব অ্যারেঞ্জমেন্ট করল পেঁচো। তখন কিছু বলি নি। নিজের বিয়েতে কে আর প্যাণ্ডেল বাঁধে, সানাইওয়ালা ডাকতে যায়? টেরিফিক লজ্জার ব্যাপার। মগর গুরু—'

'কী?'

'এখন ভাঙা মসজিদের সামনের মাঠে অত বড় মেডিক্যাল ক্যাম্প বসাচ্ছ, সে ডিউটিটাও দিলে পেঁচোকে। আমাকে তোমার লাইফ থেকে ঘ্যাচাং করে উড়িয়ে দিলে নাকি?'

মহাশয়গণ, পুরো জেলাসি—ভাল বাংলায় যাকে বলে ঈর্ষা। পেঁচোর ওপর খচ্চরটার হিংসে হয়েছে। বললাম, 'ধুস, তাই কখনো পারি! ভেবেছিলাম, সবে বিয়ে হল। ক'টা দিন বউর আঁচলের তলায় লেপটে থাকবি। সে যাক গে, এখন তোকে কী ডিউটি দিই বল তো?'

বোদা বলল, 'গুরু তুমি তো হরবখত বল, তোমার মাথায় প্ল্যানিং কমিশনের হেড অফিস বসানো রয়েছে। একটা প্ল্যান বার করে ফেল না আমার জন্যে।'

বোদার কথা শুনতে শুনতে ব্রেনে একটা ফ্ল্যাশ খেলে গেল। বডিটা আস্তে আস্তে বিছানা থেকে তুলে উঠে বললাম। একটা সিগারেট ধরিয়ে বললাম, 'একটা কাজ করতে পারবি?'

বোদা বলল, 'তুমি বললে পারব না, এমন কাজ ওয়ার্ল্ডে পয়দা হয় নি। কী করতে হবে বল।'

মহাশয়গণ, কাজের ব্যাপারে স্লাইটেস্ট ছুঁচিবাইও নেই বোদার। দু আঙুলের ফাঁকে নতুন ব্লেড রেখে ভিড়ের গ্যাঞ্জামে ট্রামবাসে লোকের পকেট কাটা, সিনেমার টিকেট ব্ল্যাক করা আর আখড়ায় ঢুকে অষ্টপ্রহর কেত্তন গাওয়া—সবই তার কাছে সমান। সব কাজকেই সে সমান রেসপেক্ট দেয়। 'ডিগনিটি অফ লেবার' কথাটা বোদার জন্যই বোধহয় ম্যানুফ্যাকচার করা হয়েছে। বললাম, 'ওয়ালিং।'

'ওয়ালিংটা কী গুরু?'

'দেয়াল লিখন। নানা পার্টির লোকেদের দেয়ালে রংফং দিয়ে লিখতে দেখিস নি?'

মুখটা কাঁচুমাচু করে ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে এগোছা রোঁয়াই উপড়ে ফেলল বোদা। বলল, 'হেভি লজ্জা দিলে গুরু।'

বললাম, 'কিসের লজ্জা?'

'তুমি তো জানোই ঐ লেখাপড়ার কারবারটা—হেঁ হেঁ—'

খেয়াল ছিল না। সত্যিই তো, বোদার হাতে কলম ধরিয়ে কিছু লিখতে বললে নিবটা হাঁ হয়ে একটা মুখ যাবে সাউথ পোলে, আরেকটা নর্থ পোলে। টিপসই মেরে যে বিয়ে করেছে, তাকে আমি দেয়ালে লিখতে বলছি!

বোদা ফের বলে উঠল, 'ঐ লেখা ফেখার ঝামেলাটা বাদ দিয়ে আর যা বলবে—'

তার কথা শেষ হবার আগেই দরজার কাছ থেকে একটা গলা ভেসে এল, 'না-না, দাদা যখন বলেছেন তখন দেয়ালে লিখতেই হবে।'

ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম কনকচাঁপা। পার্টিশানের ওধার থেকে কখন যে সে উঠে এসেছে, টের পাওয়া যায় নি।

বোদা ঢোক গিলে বলল, 'লেকেন ক লিখতে আমার হাতে যে ক্যানসার হয়ে যায়।'

কনকচাঁপা বলল, 'ঘাবড়িও না। আমি তোমাকে হেল্প করব।' বলতে বলতে ঘরে ঢুকে আমাদের সামনাসামনি বসে পড়ল। তারপর আমার মুখের দিকে স্ট্রেট তাকিয়ে বলল, 'কী লিখতে হবে দাদা?'

'সব বলে দেব। তার আগে ক'টা কথা শুনে নাও।'

'বলুন।'

'দিনের বেলা ওয়ালিং চলবে না। রাত্তিরে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে রঙের বালতি নিয়ে তোমরা বেরুবে। তোমরা যে লিখছ, কেউ যেন টের না পায়।'

বোদা বলল, 'তুমি যখন বলছ গুরু, আগরপাড়ার কোনো খচড়া জানতে পারবে না।'

বললাম, 'টপ সিক্রেট কিন্তু। কারো সঙ্গে এই নিয়ে একটা কথাও বলা চলবে না।'

'ঘাবড়াও মাত, ঠোঁট দুটো স্টিকিং গাম দিয়ে জুড়ে রাখব। এবার কী লিখতে হবে বলে দাও—'

একটা কাগজে খস খস করে কিছু লিখে কনকচাঁপার হাতে দিতে দিতে বললাম, 'খুচরো খরচের জন্যে যে ফাণ্ডটা রয়েছে সেখান থেকে রং তুলি ফুলি কেনার জন্যে টাকা নিয়ে যেও।'

বোদা বলল, 'কাল রাত থেকেই তা হলে ফিল্ডে নেমে যাই গুরু?'

'নো। কাল হল ফ্রাইডে। তার পরের ফ্রাইডে থেকে লেগে যাবি।' বলতে বলতেই আচমকা একটা ব্যাপারে ব্রেনে ঝিলিক মারল। কয়েক সেকেণ্ড ভেবে নিয়ে বললাম, 'আরেকটা ডিউটি তোকে দেব।'

বোদা আমার দিকে তাকাল।

আমিও চোখের তারা ফিক্সড করে তাকে দেখতে দেখতে বললাম, 'কলকাতার প্রেস থেকে একটা হ্যাণ্ডবিল ছাপিয়ে আনবি। ব্যাপারটা খুব সিক্রেট। কেউ যেন টের না পায়।'

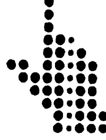
বোদা বলল, 'কোনো শালা পাবে না। লেকেন হ্যাণ্ডবিলটা কিসের গুরু?'

'কাল সকালে জানতে পারবি।'

'ও-কে, কাল সকাল পর্যন্তই ঝুলে থাকি।'

বললাম, 'অনেক রাত হয়ে গেছে, হেভি ঘুম পাচ্ছে। এবার বউকে নিয়ে হড়কে যা মাকড়া।'

বোদা আমার বিছানা থেকে বডি তুলে কনকচাঁপাকে সঙ্গে করে পার্টিশানের ওধারে চলে গেল।



পরের দিন ঘুম থেকে উঠে মুখ ফুক ধুতে না ধুতেই মোড়ের চায়ের দোকানের ছোকরাটা মাটির ভাঁড়ে চা, লেড়ো বিস্কুট আর ডিমের ওমলেট দিয়ে গেল। বোদার বিয়ের পরই ছোকরাটাকে ফিট করে ফেলেছি। সকাল হলেই সে ব্রেকফাস্ট সাপ্লাই করে।

মহাশয়গণ, কাল রাত্তিরে বোদাকে হ্যাণ্ডবিলের কথা বলেছিলাম। তাতে কী ছাপা হবে, চা-ফা খেতে খেতে কাগজ কলম নিয়ে তার একটা ড্রাফট করে ফেললাম।

পার্টিশানের ওপার থেকে চা তৈরির আওয়াজ আসছে। বোদা আর কনকচাঁপার গলাও শুনতে পাচ্ছি। এইসব শুনতে শুনতে আচমকা সমাজপতির গুরুদেব আচার্য জগৎপতির মুখটা ফ্রিজ শটের মতো আমার চোখের সামনে ফুটে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে মাথার ভেতর প্ল্যানিং কমিশনের হেড কোয়ার্টারে এই সকালবেলাতেই টেরিফিক অ্যাক্টিভিটি শুরু হয়ে গেল।

মহাশয়গণ, আপনারা সবাই জানেন সাইমালটেনিয়াসলি, মানে শুদ্ধ ভাষায় যাকে বলে যুগপৎ, দুটো দুর্ধর্ষ কেস আমি হাতে নিয়েছি। ফার্স্ট, আচার্য জগৎপতির জন্য ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট জুটিয়ে দিতে হবে আর অভ্যুদয় মিটারকে ইলেকশানে তরাতে হবে। স্পিরিচুয়াল আর পলিটিক্যাল—এই দুটো হেভি ঝামেলার জিনিস নিয়ে এখন আমি ব্যালেন্সের খেলা খেলছি। দেখা যাক, শেষ পর্যন্ত কারবারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। পার্টিশানের দিকে মুখ ফিরিয়ে ডাকলাম, 'বোদা—'

ওধার থেকে বোদার গলা কানে এল, 'বল গুরু।'

'একবার এদিকে আসতে পারবি?'

'এ কি বলছ গুরু, তুমি বললে এক্ষুণি গিয়ে মনুমেন্টের মাথায় চড়তে পারি।' বলতে বলতে চায়ের কাপ হাতে করে বোদা এধারে এসে মেঝেতে বসে পড়ল।

হ্যাণ্ডবিলের যে ড্রাফটটা করেছিলাম, বোদার হাতে সেটা দিতে দিতে বললাম, 'খুচরো খরচের ফাণ্ড থেকে ক্যাশ নিয়ে যা। কালকের ভেতর ওটা নিয়ে আসবি।'

ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে বোদা বলল, 'গুরু মালটা কী লিখেছ, একবার পড়ে শোনাও।'

মহাশয়গণ, আপনাদের চোখমুখ দেখে মনে হচ্ছে হ্যাণ্ডবিলের ড্রাফটটা শোনার জন্য কান খাড়া করে আছেন। লেকেন ওটা এখন টপ সিক্রেট। নেক্সট শুক্কুরবারের আগে ওটা বোদা,

আমি আর যে প্রেস ছাপবে, তারা ছাড়া আর কোন মাকড়াকে জানানো হবে না। বোদার ডান কানটা নিজের মুখের কাছে এনে ফিসফিস করে ড্রাফট্‌টা পড়ে গেলাম।

সবটা শুনে বোদার চোখ দুটো একেবারে সার্কেল হয়ে গেল। শিস টানার মতো একটা শব্দ করে সে বলল, 'উরি ফাদার, তোমার শ্লা পেটের ভেতর এত কারবার। পায়ের ধুলো দাও গুরু—'

পা দুটো বোদার দিকে বাড়িয়ে বললাম, 'এই নে। কিন্তু কথাটা মনে রাখিস।'

'টপ সিক্রেট তো?'

'রাইট।'

'ঘাবড়িও না গুরু, দশ মেগাটনের পেটো ঝাড়লেও আমার পেট থেকে কেউ কিস্‌সু বার করতে পারবে না।' বলে আমার পা ছুঁয়ে সট করে ডান হাতের তিনটে আঙুল জিভে ঠেকাল বোদা।

বললাম, 'এবার এক কাজ কর। পল্টাদের ডেকে নিয়ে আয়।'

মহাশয়গণ, আজিজ পল্টা অ্যাণ্ড কোম্পানিকে নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে। সেই যে সমাজপতির গাড়িতে হাইওয়ে রবারি করতে গিয়ে আমার সঙ্গে যাদের একটা মক ফাইট হয়ে গিয়েছিল তাদের কথাই বলছি। পরে এই ছোকরাগুলোর জন্য 'ফর দ্য আন-এমপ্লয়েড' নাম দিয়ে একটা ফাণ্ড খুলেছি।

বোদা জিজ্ঞেস করল, 'পল্টাদের কোনো ডিউটি দিচ্ছ নাকি গুরু?'

'ডেফিনিটলি। মাকড়ারা বসে বসে রেগুলার বেকার-ভাতা নিয়ে যাবে, সেটা কিছুতেই চলবে না।'

'কী ডিউটি দিচ্ছ?'

'সেটা তোকে দিয়ে হবে না। ওটার জন্য স্লাইট পড়াশোনা দরকার, বুঝলে চাঁদু?'

খ্যাসখ্যাস করে একটু হেসে হাতে হাত ঘষতে ঘষতে বোদা বলল, 'তুমি মাইরি সুপার ক্লাসের হারামী। আমরা বেশ চালাচ্ছিলাম, এর ভেতর আবার পড়াশোনার ঝামেলা ঢোকাতে গেলে কেন?'

বোদার পাছায় আলতো করে একটা কিক হাঁকড়ে বললাম, 'কত লোকের কত কনট্রাক্ট নিয়েছি জানিস! এইসব লোকের মধ্যে অনেক লেখাপড়া জানা মাল রয়েছে যে। যা, দেরি হয়ে যাচ্ছে। পল্টাদের খবরটা দিয়ে আয়।'

আধঘন্টার মধ্যে দরজার সামনে পল্টা অ্যাণ্ড কোম্পানির মুণ্ডুগুলো দেখা গেল। পল্টা সবার সামনে। চোখাচোখি হতেই দাঁত বার করল সে, 'ভেতরে 'ইন' করব গুরু?' বোদার দেখাদেখি ওরাও আমাকে গুরু ডাকে।

বললাম, 'কর।'

ভেতরে ঢুকে সেমিসার্কেলে আমার মুখোমুখি বসল সবাই। পল্টা বলল, 'আমাদের ডেকেছ কেন?'

'বসে বসে সাবসিসটেন্স অ্যালাওয়েন্স নেওয়া আর চলবে না। এবার থেকে তোদের ডিউটিতে জুড়ে দেব।'

'সিওর গুরু। কী করতে হবে, স্রেফ অর্ডার দিয়ে দাও।'

'ক্যালকাটায় রোজ কত ফরেন ট্যুরিস্ট আসে জানিস?'

'বহোত।'

'কোথায় কোথায় তারা থাকে?'

অনেকগুলো থ্রি-স্টার ফোর-স্টার ফাইভ-স্টার হোটেলের নাম করে পন্টারা জানালো, 'এইসব জায়গায়।'

বললাম, 'ফাইন। এইসব বিগ বিগ হোটেল ঘুরে ইটালিয়ান আমেরিকান ব্রিটিশ কানাডিয়ান জাপানিজ ফিলিপিনো ফ্রেঞ্চ স্প্যানিশ স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান—যাকে পাবি তাকেই ইণ্ডিয়ান 'ইয়োগ' সম্পর্কে লেকচার ঝাড়বি। বলবি, ওয়ার্ল্ডের সব প্রবলেম, সব সাফারিং, সব ঝামেলার একমাত্র মেডিসিন হল ইণ্ডিয়ান 'ইয়োগ'। আর ইণ্ডিয়ান ইয়োগীদের মধ্যে বেস্ট হলেন আচার্য জগৎপতি।'

পন্টা জিজ্ঞেস করল, 'আচার্য জগৎপতি কে গুরু?'

'পরে জানতে পারবি।'

'ও-কে গুরু, ইয়োগ সম্পর্কে ফরেন ট্যুরিস্টদের ব্রেনে যত পারি জ্ঞান ঠেসে দেব। তারপর?'

'শুধু ইণ্ডিয়ান ইয়োগ না, ইয়োগীদের ভেতর যিনি এম্পারার তাঁকেও ঠেসে দিতে হবে।'

'সিওর।'

আমি এবার বললাম, 'এমনভাবে বাতেল্লা ঝাড়বি যাতে ফরেনাররা কাত হয়ে যায়। আর—'

পন্টা অ্যাণ্ড কোম্পানি কোরাসে জিজ্ঞেস করল, 'আর কী?'

'আচার্য জগৎপতিকে দেখার জন্যে যেন ম্যাড হয়ে যায়।'

'সব ব্যবস্থা করব গুরু। স্রেফ একটা কথার জবাব দাও তো।'

'কী কথা?'

'ইয়োগ আর জগৎপতিকে নিয়ে এত খেপে উঠলে কেন?'

'একটু ধৈর্য ধর মাকড়ারা, সব জানতে পারবি।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর পন্টা একসময় স্টার্ট করল, 'গুরু ট্যুরিস্ট মালেরা যদি জগৎপতিকে দেখতে চায়, কোথায় ডেসপাচ করে দেব?'

জগৎপতির বেলেঘাটার ঠিকানাটা জানিয়ে বললাম, 'ওখানকার আশ্রমে।'

'আচার্য জগৎপতি কবে দর্শন দেবেন?'

মহাশয়গণ, এই ব্যাপারটা ভেবে দেখি নি। ক্যালকাটার ট্যুরিস্ট ট্রাফিক যে এবার থেকে হুট করে বেলেঘাটায় গিয়ে হাজির হতে থাকবে, আচার্য জগৎপতিকে এখনও তা জানানো হয় নি। ফরেনারদের থাকা ফাকার জন্য আশ্রমের কিছু রেনোভেশন দরকার, এয়ার কুলার

ফুলারও বসাতে হবে। তা ছাড়া ফরেনারদের ট্যাকল করার জন্য জগৎপতিকে দিনকয়েক ট্রেনিংও দিয়ে নিতে হবে। আচমকা ক্যানাডিয়ান অস্ট্রেলিয়ান ডাচ বৃটিশ স্প্যানিশ জাপানিজদের ওখানে দেখলে জগৎপতির করোনারি অ্যাটাক হয়ে যেতে পারে। তা হলে সব কিচাইন হয়ে যাবে। এদিকে আবার রবিবার থেকে মেডিক্যাল ক্যাম্প চালু হচ্ছে। আমাকে ডে অ্যাণ্ড নাইট টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স এখানেই বডি ফেলে থাকতে হবে। জগৎপতির পেছনে একটা উইক একেবারেই টাইম দিতে পারব না। তবে আজই বেলেঘাটায় গিয়ে ফরেনারদের সম্পর্কে আমার প্ল্যানের খবরটা দিয়ে আসতে হবে। এনিওয়ে, পল্টাদের বললাম, টু উইকস বাদে জগৎপতি বিদেশি ভক্তদের দর্শন দেবেন। তবে তোরা ইয়োগের আর জগৎপতির মহিমা নিয়ে লাগাতার ক্যাম্পেন করে যা।'

'ঠিক হ্যায় গুরু।'

'আরেকটা কথা—'

'বল গুরু।'

'তোদের ভেতর ভাল ইংরেজি কে লিখতে পারে?'

পল্টারা গলা মিলিয়ে একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, 'রাজেন। ও ইংলিশ অনার্সে সেকেণ্ড ক্লাস সেকেণ্ড হয়েছিল। টেরিফিক ইংরেজি বলে, লেখে তার চাইতে ফার বেটার।'

রাজেনকে বললাম, 'আচার্য জগৎপতির একটা বায়োগ্রাফি লিখতে হবে। হেভি গ্যাস-ফ্যাস দিয়ে ফুলিয়ে মাকড়াকে বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র টাইপের একটা কিছু খাড়া করে দিবি, বুঝলি?'

রাজেন বলল, 'বুঝলাম। মগর গুরু তোমার ঐ জগৎপতির ব্যাপারে কিছুই তো জানি না। মেটিরিয়াল ফেটিরিয়াল না পেলে কিছু লেখা যায় নাকি?'

'তোর মাথায় দেখছি একেবারে স্ক্র্যাপ আয়রন পোরা রয়েছে।'

'মানে?'

'আরে বাবা, ইণ্ডিয়ার বেস্ট বেস্ট যোগী ফোগী যারা আছে তাদের লাইফ থেকে ভাল ভাল জিনিসগুলো বেছে নে। সেগুলো জগৎপতির সঙ্গে জুড়ে দে। লিখবি কনটিনিউয়াস হানড্রেড ইয়ার্স দা গ্রেট হিমালয়েজের গত্তের ভেতর তপস্যা ফপস্যা করেছেন জগৎপতি।'

'হানড্রেড ইয়ার্স তপস্যা করলে ওঁর বয়েস কত লিখব?'

'ভগবানের আবার বয়েস আছে নাকি? দুশ,' পাঁচশ', হাজার—যত বছর ইচ্ছা বসিয়ে দিস। আর তিনটে কী কী যুগ যেন আমরা পেরিয়ে এই কলিযুগে ইন করেছি?'

'সত্য, ত্রেতা ফ্রেতার কথা বলছ?'

'রাইট।'

'লিখবি, এই তিন যুগেই জগৎপতি প্রেজেন্ট ছিলেন। এই কলিযুগটাও পার করে তারপর যে যুগ আসবে সেটাও পার করবার ইচ্ছা।'

'ঠিক আছে, আমি একটা মাল খাড়া করে আনি। তারপর তুমি দেখে দিও।'

'ফাইন। জগৎপতির বায়োগ্রাফিটা দামি আর্ট পেপারে অফসেটে ছবি দিয়ে ছাপা হবে। মিসেলেনিয়াস ফাণ্ড থেকে ক্যাশ নিয়ে যাবি। বেস্ট প্রোডাকশান হওয়া চাই। খরচার জন্য

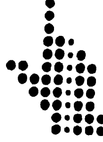
ঘাবড়াস না।'

'জগৎপতির ছবি পাব কোথায়?'

'আমি সাপ্লাই দেব। কথাবার্তা ফিনিশড, এবার সবাই হড়কে যাও।'

পল্টারা চলে গেল।

তারপর আবার বিছানায় বডি থ্রো দিলাম। বেলা এগারটা পর্যন্ত আমি পুরোপুরি বেকার। শুয়ে শুয়ে পায়ের ওপর পা তুলে নাচাতে লাগলাম।



দুপুরে পবিত্র খালসা হোটেলে প্রলেটারিয়েট লাঞ্চ সেরে ক্যাপিটালিস্ট সমাজপতির গড়িয়াহাটার অ্যাপার্টমেন্টে অন্য দিনের মতো আজও ডিউটি দিতে চলে এলাম। মহাশয়গণ, আমার ডিউটি যে কী, তা আপনারা খুব ভাল করেই জানেন। তবে আজ আমি একটা ডেফিনিট ধান্দা নিয়ে এসেছি।

অ্যাপার্টমেন্টে পা ফেলতে না ফেলতেই হীরা বাহাদুর চাপা কুতকুতে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে ব্যস্তভাবে বলল, 'স্যাব আপকা তেলিফোন আয়া। দশ দফে—তেন তাইমস।' তার মঙ্গোলিয়ান জিভে হিন্দি ল্যাংগুয়েজটা শুনতে ভালই লাগে।

বললাম, 'কে ফোন করেছে?'

ডান হাতের একটা আঙুল সিলিংয়ের দিকে তুলে হীরা বাহাদুর বলল, 'উপরসে মেমসাব।'

তার মানে ডোরা। বললাম, 'ঠিক হ্যায়।'

'আপকো ফোন করনে বোলা।'

মহাশয়গণ, ডোরার নাম শুনেই আপনাদের মুখচোখ চকচকিয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে ব্লাড প্রেসার আচমকা একটা ডেঞ্জারাস পয়েন্টে পৌঁছে গেছে। আরে মাকড়ারা, আপনারা তো জানেনেই পঞ্চ 'ম'-কারের ভেতর একটা 'ম'-এরই আমি সাধনা করে থাকি। সেটা মদ। বাকিগুলো বরবাদ। আর ডোরার সঙ্গে আমার যা ডায়ালগ হয় বা তার সঙ্গে কোথায় কোথায় যাই, সবই আপনারা জানেন। আপনাদের চোখে ধুলো ছিটিয়ে কিছুই করবার উপায় নেই। আপনারা যা মাল একেকখানা!

যাক গে, হীরা বাহাদুরকে আর কিছু না বলে স্ট্রেট ড্রইং রুমে গিয়ে ঢুকলাম। ইন ফ্যাক্ট, আজ আমি যে ধান্দাটা নিয়ে এখানে এসেছি সেটা ডোরারই ব্যাপার। ভেবেছিলাম, এখানে এসেই তাকে ফোন করব। দেখা যাচ্ছে, আমি আসার আগে ডোরাই ফোন করে বসে আছে।

ডায়াল করে একবারেই লাইন পেয়ে গেলাম। বললাম, 'আপনি আমাকে ফোন করেছিলেন?'

'হ্যাঁ'

'কী ব্যাপার?'

'বেলেঘাটায় আচার্য জগৎপতির আশ্রমে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে। কাইণ্ডলি আপনিও আমার সঙ্গে চলুন।'

মহাশয়গণ, ডোরাকে নিয়ে সেদিন যখন জগৎপতির কাছে গিয়েছিলাম তখন থেকেই পাপ আর পুণ্যের ব্যাকটেরিয়াগুলো একটা ওয়ারের জন্য কোমরে বেল্ট বাঁধতে শুরু করেছিল। এখন দেখা যাচ্ছে, ফাইটটা স্টার্ট হয়ে গেছে আর পুণ্যের ব্যাকটেরিয়াগুলো ফার্স্ট রাউণ্ডে বোধহয় জিতেই গেছে। বললাম, 'সিওর সিওর, কখন যাবেন বলুন।'

ডোরা বলল, 'এক্ষুণি।'

ক'দিন ধরেই দুপুরের ঘুমটা কিচাইন হয়ে যাচ্ছে। মেজাজটা একেবারে ছানাকাটার মতো হয়ে গেল। বললাম, 'বিকেলে গেলে হয় না?'

দশ বছরের নেকি ছুকরিদের মতো আদুরে গলায় ডোরা বলল, 'না না, এক্ষুণি যেতে হবে।'

আজও দুপুরের ঘুমের বারটা বাজল। শ্লা, কী আর করা যাবে! দেড় কেজি কুইনিন গেলার মতো মুখ করে বললাম, 'তা হলে রেডি হয়ে আমার এখানে চলে আসুন। আপনি এলেই বেরিয়ে পড়ব।'

মিনিট পনের বাদে ডোরা যখন আমার অ্যাপার্টমেণ্টে ঢুকল, মহাশয়গণ তার দিকে তাকিয়ে আমার চোখের তারা দুটো স্ট্রেট এক হাই জাম্পে কপাল ভুরু টুরু টপকে একেবারে ব্রহ্মতালুতে গিয়ে ঠেকল। এমন ড্রেসে ডোরাকে আগে আর কখনও দেখি নি। হে-হে মহাশয়গণ, আপনারাও তো টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স আমার বডিতে বডি ঠেকিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আপনারাও দেখেছেন কি?

ডোরার পরনে এই মোমেণ্টে সিল্কের গেরুয়া লুঙ্গি আর পাঞ্জাবি। পাঞ্জাবিটার গলায় এবং হাতায় নানা রঙের সিল্কের সুতো দিয়ে ফুল লতাপাতার নকশা। চুলগুলো উঁচু করে গেরুয়া রিবন দিয়ে বাঁধা। পায়ে হালকা ফোমের স্লিপার। গয়না ফয়না বলতে কিচ্ছু নেই। গলায় শুধু একটা লম্বা রুদ্রাক্ষের মালা ঝুলছে।

মহাশয়গণ, আমি যে আমি, একটা থার্ড ক্লাস চিট, একজন উৎকৃষ্ট ফোরেটোয়েন্টি—কোনো কারণেই যে ঘাবড়ায় না, চমকায় না, তার পর্যন্ত চোখের তারা ফিক্সড হয়ে গেল। এমন সন্ন্যাসিনীর ড্রেসে ডোরাকে দেখব, এ আমি ভাবতেও পারি নি।

ডোরা চোখ কুঁচকে হেসে জিজ্ঞেস করল, 'কী দেখছেন?'

চোখের ওপর ড্রপসিন পড়ল না। একদৃষ্টে ডোরাকে দেখতে দেখতে বললাম, 'আপনাকে।'

'কিরকম দেখছেন?'

'টেরিফিক। আচার্য জগৎপতির আশ্রমে যাবার জন্য এই ইউনিফর্মটা বানিয়েছেন—তাই না?'

'রাইট। হট প্যাণ্ট আর টি-শার্ট পরে তো সব জায়গায় যাওয়া যায় না। একেক জায়গার জন্যে একেক রকম ড্রেস।'

'একজ্যাক্টলি।'

'এবার তাহলে যাওয়া যাক।'

মহাশয়গণ, ডোরাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। তারপর আধঘণ্টাও লাগল না, স্ট্রেট আচার্য জগৎপতির আশ্রমে চলে এলাম।

জগৎপতি তাঁর পার্মানেন্ট অনন্তশয্যায় ফ্ল্যাট হয়ে পড়ে ছিলেন। দুটো রেসলার টাইপের অ্যাপ্রেন্টিস সন্ন্যাসী ময়দা ঠাসার মতো তাঁর বডিটাকে দলাই মলাই করছিল। এরকম দৃশ্য আগেও আমার চোখে পড়েছে, আপনারাও দেখেছেন।

মহাশয়গণ, আমাদের দেখে হাত তুলে জগৎপতি সিগনাল দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অ্যাপ্রেন্টিস সন্ন্যাসীরা মাসাজ থামিয়ে দিল। জগৎপতি তাদের বললেন, 'তোমরা এখন যাও, এঁদেব সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে।'

জোড়া সন্ন্যাসী চলে যেতেই বললাম, 'প্রভু, এঁকে আপনার আশ্রমে সেট করে দেবার জন্য নিয়ে এলাম।'

'খুব ভাল, খুব ভাল।' বলে কাশীদাসী মহাভারত ফারতে ব্রহ্মার বর দেবার যে ছবি দেখা যায় অবিকল সেই পোজে হাত তুলে জগৎপতি বললেন, 'তোমার কল্যাণ হোক।'

আমি বডি থ্রো দিয়ে জগৎপতির পা থেকে কয়েক গ্রাম ধুলো খুঁটে মাথায় ঠেকালাম। দেখাদেখি ডোরাও তাই করল।

জগৎপতি বললেন, 'শুভম।' তারপর চোখের ওপর অর্ধেক ড্রপসিন নামিয়ে খানিকক্ষণ কী ভেবে একসময় শুরু করলেন, 'ডোরাকে সব বলে টলে দিয়েছ তো?'

'কী প্রভু?' জগৎপতির চোখের দিকে তাকিয়ে আমি জানতে চাইলাম।

'কী জন্য সে এখানে আসছে, মানে—'

'এখনও সেভাবে কিছু বলি নি। দু'-চার দিন আপনার আশ্রমে অ্যাপ্রেন্টিস হয়ে ঘোরাফেরা করুক। এখানকার মালেদের—' বলেই পাক্কা পনের সেন্টিমিটার জিভ বাব করে দু'হাতে কান মুলতে মুলতে বললাম, 'ক্ষমা প্রভু, ক্ষমা। আমার মুখটা একেবারে ওঁচা নর্দমার মতো হয়ে গেছে। এখানকার লোকজন বলতে মাল বলে ফেলেছি।'

জগৎপতি অসীম উদারতায় হাত তুলে বললেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। এর জন্য আমি কিছু মনে করছি না।'

মহাশয়গণ, বুঝতেই পারছেন জগৎপতি জিনিসটি কী টাইপের খলিফা। যে তাঁকে ইণ্টারন্যাশনাল মার্কেট পাইয়ে দিতে যাচ্ছে তার উপর চটে ওঠা সম্ভব না। আমি এখন যা বলব, প্রভু জগৎপতির কানে তা ওয়ার্ল্ডের বেস্ট সিমফোনির মতো শোনাবে।

বলতে লাগলাম, 'ডোরা এখানকার লোকজনদের ক'দিন দেখুক, অ্যাটমসফিয়ারটা বুঝে নিক। তার ভেতর আমি ঠিক ট্রেনিং দিয়ে দেব। আপনি গুরু নার্ভাস হবেন না।'

'না না, নার্ভাস হব কেন? তুমি দায়িত্ব নিয়েছ, আমার কোনোরকম দুশ্চিন্তা নেই।'

মহাশয়গণ, স্রেফ দেখে যান, প্রভু জগৎপতি—যিনি নাকি শুদ্ধ ল্যাঙ্গুয়েজে হিমালয়বাসী কৌপীনবস্ত গৈরিক নিষ্কাম টাইপের সন্ন্যাসী, যিনি ওয়ার্ল্ডের কোনো ব্যাপারই পরোয়া করেন না, তিনি কিনা আমার মতো চিট ফোরটোয়েন্টিকে রেগুলার বাটার লাগিয়ে যাচ্ছেন।

আমি বললাম, 'প্রভু সবই আপনার কৃপা। আমি কি আর রেসপনসিবিলিটি নিয়েছি!

আপনিই আমার কাঁধে ওটা চাপিয়ে লীলা করছেন। আপনার যখন ইচ্ছা হয়েছে, দেখবেন এই বেলেঘাটার আশ্রমে জাপান থেকে আরম্ভ করে গুয়াটেমালা পর্যন্ত সব কান্ট্রিকে টেনে নিয়ে আসব। বেলেঘাটা কী হয়ে উঠবেন জানেন?'

মহাশয়গণ, ক'টা সোনা-বাঁধানো ওরিজিন্যাল আর বাদবাকি ফলস দাঁত বার করলেন জগৎপতি। হেভেন আর আর্থের মাঝখানে যে কাজকারবার চলে তার মিডলম্যান এই আচার্যটির দাঁত দেখে বোঝা গেল, তিনি বেজায় খুশি হয়েছেন। হেসে হেসে বললেন, 'কী হবে স্বয়ম্ভু?'

'ইউনাইটেড নেশানসের হেডকোয়ার্টার।'

দু'চোখে ফ্ল্যাশ বালব জ্বলে উঠল জগৎপতির। মুখে কিছু বললেন না তিনি। তবে গলার ভেতর থেকে ঘুঁতঘুঁত করে একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল। এটা টেরিফিক আনন্দের এক্সপ্রেসান।

আমি আবার বললাম, 'এ ব্যাপারে আমি অন্য দিক থেকে কাজ স্টার্ট করে দিয়েছি।'

আগ্রহে জগৎপতি তাঁর দু কুইন্টাল ওজনের বডিটাকে হাইজাম্পের স্টাইলে উড়িয়ে আমার কাছে নিয়ে এসে বললেন, 'কী কাজ স্বয়ম্ভু?'

'ওটা স্যার আমার ট্রেড সিক্রেট। কখন কিভাবে কাকে দিয়ে কী কাজ করব, সেটা আগে থেকে আমি কাউকে জানাই না।'

'ও-ও-ও—'জগৎপতির মুখটা ফিউজ মেরে গেল।

তাঁকে দেখে মনের ভেতর কিরকম একটা রি-অ্যাকশন যেন হল। বললাম, 'কাউকে না জানালেও আপনাকে জানাচ্ছি।' বলে পল্টাদের সঙ্গে তাঁর পাবলিসিটির ব্যাপারে কী কী কথা হয়েছে সব ডিটেলে বললাম।

শুনতে শুনতে জগৎপতির চোখের তারা টেনিস বলের মতো গোল আর বড় হয়ে গেল। বললেন, 'স্বয়ম্ভু, তোমার তুলনা নেই।'

'ঠিক বলেছেন লর্ড। ভগবান বা শয়তান আমাকে বানিয়েই সেই ছাঁচটা ভেঙে ফেলেছে। তাই আমার মতো আরেকটি মাল ওয়ার্ল্ডে কোথাও পাবেন না। আমার জোড়া নেই।' বলে দম নেবার জন্য একটু থেমে আবার শুরু করলাম, 'একটা কথা বলুন তো প্রভু, মানে আমার কয়েকটা খবর জানা দরকার।'

'নিশ্চয়ই । কী জানতে চাও বল।'

আপনি ইংরেজি বলতে পারেন?'

'আগেও এই নিয়ে তোমার সঙ্গে কথা হয়েছে। খুব যে একটা পারি তা নয়, তবে কাজ চালিয়ে নিতে পারি।'

'মনে পড়ছে, আপনি এই কথাটা বলেছিলেন। ডোরা তো এখন থেকে রেগুলার এখানে আসছে, হোল ডে থাকবে। ওর সঙ্গে কথা বলে বলে ইংলিশ কনভারসেসনটা অভ্যাস করে ফেলবেন।'

'নিশ্চয়ই।'

'শুধু একটা কথা মনে রাখবেন, ইণ্ডিয়ান ইয়োগী আর গুরু যারা ইন্টারন্যাশনাল ফেম আর ফলোয়ার পেয়েছে তারা চোস্ত ইংরেজি বলতে পারে। ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে ঢুকতে হলে ইংলিশটা হচ্ছে পাসপোর্ট। কথায় যত ম্যাজিক ফোটাতে পারবেন, ভক্ত ফক্ত ততই বেড়ে যাবে।'

'আজ থেকেই ডোরার সঙ্গে ইংরেজির ব্যাপারটা শুরু করে ফেলব। আর কী করতে হবে?'

'ইংলিশের পর স্যাংস্কৃট। গীতা, উপনিষদ—এসব মুখস্থ আছে?'

'ঝাড়া কণ্ঠস্থ।'

'ফরেন শিষ্যদের কাছে যখন ধর্ম ফর্ম নিয়ে বাণী ঝাড়বেন তার ফাঁকে ফাঁকে স্যাংস্কৃট শ্লোক ফ্লোকের ফ্লাড বইয়ে দেবেন। তা হলে আপনার কেস খুব জোরদার হবে। স্যাংস্কৃট আর ইংলিশ যে গুরু কবজা করেছে তাকে কোনো মাকড়া—স্যরি, কেউ কিছু করতে পারবে না। ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট সে পাবেই।'

একটু চুপ করে আচার্য জগৎপতি জিজ্ঞেস করলেন, 'আর কিছু করতে হবে?'

বললাম, 'অনেক কিছুই করতে হবে।'

'তার লিস্ট দাও।'

একটু ভেবে বললাম, 'প্রভু যদি অপরাধ না নেন, একটা কথা জিজ্ঞেস করব? মানে আপনি আমি দু'জনে একটা বিগ প্রোজেক্টে নেমেছি। কিছু ওপেন টক হওয়া দরকার।'

জগৎপতি বললেন, 'কোনোরকম সঙ্কোচ করো না। যা ইচ্ছা জিজ্ঞেস করতে পার।'

'আপনি হাত সাফাই জানেন?'

'মানে?'

'এই ধরুন, হাতের কায়দায় কোনো জিনিস হাপিস করে দিলেন, আবার হাওয়া থেকে কোনো জিনিস বার করে আনলেন।'

জগৎপতির ভুরু কুঁচকে গেল। কিছু ভাবতে লাগলেন তিনি। বললেন, 'ম্যাজিকের কথা বলছ?'

ঘাড়টা আধ মিটার হেলিয়ে দিয়ে বললাম, 'রাইট প্রভু।'

এধার ওধারে তাকিয়ে জগৎপতি দেখে নিলেন ডোরা এবং আমি ছাড়া কেউ আছে কিনা। পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হয়ে গলার স্বরটা তিন ফুট খাদে ঢুকিয়ে ফিসফিসিয়ে বললেন, 'সন্ন্যাসী হবার পর আগের কথা মনে রাখতে নেই। তবু বলছি, সাধন ভজনের লাইনে আসার আগে আমার ম্যাজিকের দল ছিল। তিরিশ চল্লিশ বছর আগে আমার চাইতে ব্ল্যাক আর্টের বড় আর্টিস্ট ওয়ার্ল্ডে আর কেউ ছিল না।'

'দাঁড়ান, দাঁড়ান—' চোখ বুজে ঠোঁট টিপে খানিকক্ষণ ভাবলাম। তারপর চোখটা অর্ধেক ফাঁক করে বললাম, 'আপনিই কি জাদুকর অবলোকিতেশ—'

'ছিলাম—' আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন জগৎপতি, 'অতীতকে মুছে ফেলেছি, তবে তোমার যাতে কাজে লাগে সেজন্য গর্ত থেকে সেটাকে দু'চার মিনিটের জন্য তুলে আনছি। উধাও করার কথা বলেছিলে না?'

'হ্যাঁ, প্রভু।'

'স্টেজে দাঁড়িয়ে পায়রা-গরু-ভেড়া-উট-ঘোড়া থেকে শুরু করে হাতি পর্যন্ত ভ্যানিশ করে দিয়েছি। আবার স্রেফ হাওয়া থেকে রাজকুমারী পেড়ে এনে অডিয়েন্সের তাক লাগিয়েছি।'

শুনতে শুনতে মহাশয়গণ, শুদ্ধু ভাষায় যাকে বলে রোমাঞ্চিত হওয়া—তাই হচ্ছিলাম। বললাম, 'গুরু আপনার মতো জিনিস—স্যরি জিনিয়াস, আমি আগে খুব বেশি দেখি নি।'

বাটার লাগাতে আচার্য জগৎপতি একেবারে গলে গেলেন। বিনয়ে হাত কচলাতে কচলাতে বললেন, 'কী যে বল স্বয়ম্ভু, তোমার সঙ্গে কি আমার কমপ্যারিজন হয়!'

উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আর কী কী বিভূতি আপনি দেখাতে পারেন প্রভু?'

'ধর, মাটির তলায় আটচল্লিশ ঘন্টা থাকতে পারি। যোগের সব রকম আসন আর কসরৎ দেখাতে পারি। কাঁটার বিছানার ওপর পাক্কা সাত দিন শুয়ে থাকতে পারি।'

হে-হে মহাশয়গণ, আমি এবার চিৎকার করে উঠলাম। 'আচার্য জগৎপতি, যুগ যুগ জিও। প্রভু, আপনার হোল বডি যে সব মেটিরিয়াল দিয়ে ঠাসা তাতে ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট কেউ রুখতে পারবে না।'

জগৎপতি দাঁতের পেখম মেলে সমানে হেসে যেতে লাগলেন।

বললাম, 'প্রভু, একটা কাজ করুন।'

'কী?'

'যে সব লীলার কথা বললেন, অনেক দিন সেগুলো নিশ্চয়ই করেন নি?'

'না।'

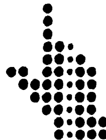
'সময় করে প্র্যাকটিশ করে যান।'

'কিছু লাভ হবে?'

'সিওর। এগুলো দিয়েই তো হোল ওয়ার্ল্ডকে কবজা করতে হবে।'

জগৎপতি নড়েচড়ে বসলেন। বললেন, 'আজ থেকেই প্র্যাকটিশ শুরু করে দেব। দু'চারদিন করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

হাতের চাড় দিয়ে বডিটাকে তুলতে তলতে বললাম, 'প্রভু ডোরা রইল, আমি উঠলাম। আর্জেন্ট একটা কাজ আছে।'



মহাশয়গণ, আজ রবিবার। আগরপাড়ার সেই ব্যারাকবাড়ির উল্টো দিকে ভাঙা মসজিদের সামনের ফাঁকা মাঠটা এখন আর চেনা যাবে না। আপনাদের আগেই বলেছি, পেঁচো মাকড়া ওখানে দুর্ধর্ষ এক কারবার করে ফেলেছে। প্লা, কোয়ার্টার স্কোয়ার মাইল জুড়ে বিরাট প্যাণ্ডেল খাড়া করে মেডিক্যাল ক্যাম্প বসিয়েছে। আজ তার ইনঅগারশন।

দশটা থেকে ক্যাম্প চালু হবে। তার আগে একটা ফাংশন আছে। গ্রেট সমাজপতি ফাংশনে প্রিসাইড করবেন। চিফ গেস্ট হবেন তাঁর আরেক ফ্রেণ্ড বিজনেসম্যান ব্রিজনাথ আগরওয়াল। সামতানি স্পেশাল গেস্ট। এঁরা ছাড়া ওঁদের আরো কয়েক জন বন্ধুও আসবেন। শুধু অভ্যুদয় মিটার বাদ। মিটার খজড়াটা এখানে আসার জন্য খেপে উঠেছিলেন। কালও আমাকে খুব ধরেছিলেন। শ্লার কয়েক লাখ টাকা খসিয়ে কী কারবার করেছি, জানার জন্য ওঁর মাথা খারাপ হয়ে আছে। আমি কালও ওঁকে বলেছি, উনি যদি আগরপাড়ায় এই মোমেন্টে গিয়ে নিজের থোবড়া দেখান, কেস পুরো কিচাইন হয়ে যাবে। এই করে অভ্যুদয়কে ঠেকিয়েছি।

প্রেসিডেন্ট, চিফ এবং স্পেশাল গেস্টের বক্তৃতা ফক্তৃতা হয়ে যাবার পর কাঁচি দিয়ে ফিতে কেটে সমাজপতি ক্যাম্প উদ্বোধন করবেন।

এখন ন'টা কুড়ি। মেডিক্যাল ক্যাম্পের মেইন গেটের সামনে বোদা, পঞ্চানন, থেকে শুরু করে আগরপাড়ার কয়েক হাজার লোক দাঁড়িয়ে আছে। হে-হে মহাশয়গণ, এই ক্রাউডের মধ্যে চিট ফোর-টোয়েন্টি পিটার স্বয়ম্ভু হোড়ও আছে। শুধু তাই নয়, ইয়াং মেয়েদের একটা ব্যাটালিয়ান হলুদ শাড়ি পরে হাতে শাঁখ আর ফুল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সভাপতি ফভাপতিরা এলে ওরা শাঁখ বাজাবে, ফুল ছিটোবে। শ্লা, কোথাও এতটুকু ফাঁক থাকতে দেব না। এই মেয়ে বাহিনীর জেনারেল হল সুমনা।

আমরা কেন পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি জানেন? সমাজপতি তাঁর রেজিমেন্ট নিয়ে এখনও এসে পৌঁছন নি। ওঁরা এলে রিসিভ করতে হবে তো।

কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে ন'টায় সমাজপতিদের চারটে ঝকঝকে ইম্পোর্টেড লিমুজিন এসে মেডিক্যাল ক্যাম্পের সামনে থামল।

আমরা দৌড়ে এগিয়ে গেলাম।

এর মধ্যে সমাজপতি অ্যাণ্ড কোম্পানি দরজা খুলে লিমুজিনগুলো থেকে নেমে পড়েছেন।

গলার স্বরটাকে পিওর মধুতে চুবিয়ে বললাম, 'আসুন স্যার, আসুন।' শুধু সমাজপতিকেই না, তাঁর রেজিমেন্টকেও আসতে বললাম। তারপর সুমনাদের দিকে তাকালাম।

সুমনা চোখের তারা ফিক্সড করে একদৃষ্টে সমাজপতির জিগরি দোস্ত বিজনেসম্যান সামতানির দিকে তাকিয়ে আছে। মহাশয়গণ, আচমকা কেউ ভয় পেলে যে রকম হয় অবিকল সেই রকম চোখমুখের চেহারা তার। ভয় পাবার মতো কী এমন কারবার হল, বুঝতে পারছি না। পরে জেনে নেওয়া যাবে।

খানিক তাকিয়ে থাকতে চোখাচোখি হয়ে গেল। তক্ষুণি সিগনাল দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে সুমনা আর তার ছুকরি বাহিনী গার্ড অফ অনার দেবার পোজে দাঁড়িয়ে শাঁখে ফুঁ দিল, পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগল।

মহাশয়গণ, রিসেপশানের অ্যারেঞ্জমেন্ট আর মেডিক্যাল ক্যাম্পের প্যাণ্ডেল ট্যাণ্ডেল দেখে সমাজপতি এবং তাঁর রেজিমেন্ট প্রচণ্ড খুশি। সমাজপতি বললেন, 'দারুণ ব্যাপার করেছ দেখছি।'

দাঁত বার করে বললাম, 'স্যার, ভেতরে 'ইন' করে আগে সবটা দেখুন। তারপর কমেন্ট

করবেন।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, চল।'

প্যাণ্ডেলের ভেতরে একধারে ফুল লতাপাতা আর লাল শালু দিয়ে একটা দুর্দান্ত মঞ্চ বানানো হয়েছে। সামনে হাজারখানেক ফাঁকা চেয়ার। এখানেই ইনঅগারেশনের আগে একটা মিটিং হবে।

সমাজপতিদের ডায়াসে উঠিয়ে পঞ্চাননকে বললাম, 'এবার লোকজন ডাক।'

পঞ্চানন মাইকের সামনে গিয়ে বলতে লাগল, 'ভাই সব, এবার আমদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হচ্ছে। যাঁরা এই মিটিং শোনার জন্য কার্ড পেয়েছেন তাঁরা একে একে, হুটপাট বা হুল্লোড়বাজি না করে গেটে কার্ড দেখিয়ে ভেতরে আসুন। মনে রাখবেন, বিরাট বিরাট গ্রেট ম্যানরা এখনে এসেছেন। কোনোরকম খজড়ামো করবেন না, তাতে গ্রেট ম্যানদের ইনসাল্ট হবে। সেই সঙ্গে এই লোকালিটিরও হেভি বদনাম হয়ে যাবে।'

মহাশয়গণ, পাঁচ মিনিটের ভেতর এক হাজার চেয়ার ভর্তি হয়ে গেল।

পঞ্চানন মাইকের সামনে থেকে সরে যায় নি। সে আবার বলল, 'এইবার সভার কাজ শুরু হচ্ছে।'

সভাপতি, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি ইত্যাদি মালেদের গলায় মালা এবং কপালে চন্দনের ফোঁটা পরাবার জন্য ছোট ছোট ক'টা মেয়েকে ফিট করে রেখেছে পঞ্চানন। সেই সঙ্গে উদ্বোধনী সঙ্গীত গাইবার জন্য একটা বড় সাইজের মেয়েকে। হারমোনিয়াম-টারমোনিয়ামও ডায়াসের একধারে এনে রাখা হয়েছে। তাদের পরনে একই রকমের ইউনিফর্ম—নীল স্কার্ট আর সাদা ব্লাউজ।

পঞ্চানন আগে থেকেই রির্হাসাল দিয়ে রেখেছে। ইশারা করতেই ছোট মেয়েগুলো সটাসট সমাজপতিদের মালাচন্দন পরিয়ে দিল। তারপর বড় সাইজের মেয়েটা হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গাইল।

মহাশয়গণ, এই সব ফর্মালিটি-টর্মালিটি হয়ে যাবার পর পঞ্চানন বলল, 'এবার সভাপতিমশাই, ইণ্ডিয়ার টপমোস্ট একজন ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট আপনাদের কাছে বাণী দেবেন।'

· সমাজপতি চেয়ার থেকে উঠে মাইকের সামনে এসে দাঁড়ালেন।। বললেন, 'যে কোনো মিটিংয়ে সভাপতির আগে চিফ গেস্ট আর স্পেশাল গেস্টরা বক্তৃতা দিয়ে থাকেন। এটাই নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ভদ্রমহোদয় আর ভদ্রমহোদয়ারা, আপনারা সবাই জানেন, বক্তৃতা শোনার মতো কষ্টের ব্যাপার আর কিছু নেই। পলিটিক্যাল নেতাদের ভাষণ শুনে শুনে নিশ্চয়ই আপনাদের অ্যালার্জি হয়ে গেছে। তাই ঠিক করেছি, যা বলবার দু'মিনিটের ভেতর শেষ করে ফেলব। আমি একাই শুধু বলব, আমার বন্ধু প্রধান অতিথি আর বিশেষ অতিথি কিছুই বলবেন না। আপনাদের নার্ভের ওপর টরচার করে কী লাভ।'

'এই যে বিরাট মেডিক্যাল ক্যাম্প বসানো হয়েছে তার সবটুকু কৃতিত্ব একজনেরই। তার নাম পিটার স্বয়ম্ভু হোড়। এমন মানবদরদী মানুষ পৃথিবীতে খুব বেশি জন্মায় নি। তাকে আমি দু'হাত তুলে আশীর্বাদ আর অভিনন্দন জানাচ্ছি। তবে আরো একজন এর পেছনে রয়েছেন।

তাঁর নাম এই মুহূর্তে করতে পারছি না। এই মেডিক্যাল ক্যাম্পের পেছনে তাঁর অবদানের কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতেই হবে।'

এই সময় অডিয়েন্সের ভেতর থেকে দু'চারজন বলে উঠল, 'তিনি কে?'

সমাজপতি বললেন, 'আগেই বলেছি, তাঁর নাম আমার পক্ষে বলা একেবারেই সম্ভব না। ক্যাম্প শেষ হবার পর স্বয়ম্ভু আপনাদের জানিয়ে দেবে। যাই হোক, এই দুই দেশহিতৈষী মহান মানুষর জন্য মেডিক্যাল ক্যাম্প বসেছে। আপনাদের যার যা অসুখ বিসুখ আছে, এই সুযোগে সারিয়ে নিন। আর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন, স্বয়ম্ভু আর আপনাদের অজানা সেই গ্রেট মানুষটি যেন রোগহীন দীর্ঘজীবন লাভ করে আপনাদের সেবা করার সুযোগ পান।

'আরেকটা কথা, স্বয়ম্ভুর মতো মানুষ কলিযুগে আর জন্মায় নি। সত্য ত্রেতা এবং দ্বাপরেও তার জুড়ি পাবেন না। সে হল অ্যাঞ্জেল—দেবদূত। আপনাদের জন্য এই যে মেডিক্যাল ক্যাম্প বসিয়েছে, এর পেছনে তার কোনো স্বার্থ নেই। সবটুকুই সে নিঃস্বার্থভাবে করেছে। তবে মেডিক্যাল ক্যাম্পের পেছনে অন্য যে মানুষটি রয়েছেন, যাঁর নাম এখন আমি করতে পারছি না, আপনাদের কাছে তাঁর একটা আবেদন আছে। ক্যাম্প শেষ হবার পর তিনি আপনাদের সবার বাড়ি বাড়ি গিয়ে নিজের কথা বলবেন। স্বয়ম্ভু তাঁর সঙ্গে থাকবে। দয়া ক'রে তাঁকে হতাশ করবেন না। আপাতত আমার আর কিছু বলার নেই। রোগ সারিয়ে আপনারা সবাই সুস্থ হোন, শতায়ু হোন—ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করি।'

মহাশয়গণ, সমাজপতি বেশ ভালই বলেন। তাঁর বক্তৃতা শেষ হতেই ঝাড়া পাঁচ মিনিট চটরপটর করে হাততালি চলল। আগরপাড়ার লোকজনেরা তাঁর লেকচার শুনে টেরিফিক খুশি হয়েছে।

হে-হে মহাশয়েরা, সমাজপতি যে কিরকম খলিফা, নিশ্চয়ই আপনারা মার্ক করেছেন। বক্তৃতার ফাঁকে ফাঁকে মালটা অভ্যুদয় মিটারের জন্য গ্রাউণ্ড তৈরি করে যাচ্ছিল। কিন্তু তুমি যাও ডালে ডালে, আমি যাই পাতায় পাতায়। অভ্যুদয় মিটারকে যতই আগরপাড়ার ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা কর না, আমি তা হতে দিচ্ছি না। খজড়াটা যাতে এখান থেকে ইলেকশানে না দাঁড়াতে পারে তার প্ল্যান করে ফেলেছি। শুধু তাই না, এ ব্যাপারে কনকচাঁপা আর বোদাকে ফিট করে দিয়েছি।

এদিকে পেঁচো সমাজপতির কাছে গিয়ে বলল, 'স্যার, কষ্ট করে এবার ওদিকটায় একটু যেতে হবে।' বলে বাঁ দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেখায়।

'ওদিকে কী?' সমাজপতি জানতে চাইলেন।

'রিয়েল উদ্বোধনটা তো ওখানেই স্যার।'

মহাশয়গণ, মার্ক করুন, বাঁ দিকেও এক ব্যাটালিয়ন টেরিফিক টেরিফিক চেহারার ইয়াং গার্ল লালপাড় শাড়ি পরে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেখানে একটা রেশমি পর্দা ঝুলছে। পর্দার সামনে সবুজ ফিতে বাঁধা রয়েছে।

সমাজপতি আর কিছু না বলে বাঁ দিকে এগিয়ে গেলেন। একটা মেয়ে রুপোর থালায় ছোট্ট নতুন কাঁচি নিয়ে তাঁর কাছে এগিয়ে এল।

আমিও সমাজপতির সঙ্গে ডায়াস থেকে নেমে এসেছিলাম। তাঁর ঘাড়ের পাশ থেকে গলা বাড়িয়ে বললাম, 'থালা থেকে কাঁচি তুলে ফিতেটা কেটে ফেলুন স্যার।'

সমাজপতি ফিতে কাটতেই পেঁচো পাশের কাঠের খুঁটিতে একটা সুইচ দেখিয়ে বলল, 'এবার এটা টিপুন স্যার।'

সুইচ টিপতেই পর্দা সরে গেল। ভেতরে দেখা গেল দুর্ধর্ষ কারবার। পর পর নানারকম ডিপার্টমেন্ট। আই ডিপার্মেন্টি, ইয়ার-নোজ-থ্রোট ডিপার্টমেন্ট, পেডিয়াট্রিকস, ডার্মাটোলজি, এক্স-রে ইউনিট, অপারেশন থিয়েটার—একটা হাসপাতালে যা যা থাকে, পেঁচো সব অ্যারেঞ্জমেন্ট করে ফেলেছে।

সমাজপতিদের নিয়ে ভেতরে ঢুকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব ডিপার্টমেন্ট দেখাতে লাগলাম। যা-ই দেখেন তাতেই সমাজপতি অ্যাণ্ড কোম্পানি গদগদ হয়ে যান। সবাই কোরাসে বলতে থাকেন, 'বাঃ, ফাইন।'

মহাশয়গণ, সমাজপতিদের সঙ্গে পঞ্চানন, পল্টারা বা আমিই শুধু ঘুরছি না, পেঁচো যে ছুকরি বাহিনী জুটিয়েছে তারাও ঘুরছে। আচমকা আমার খেয়াল হল, এতগুলো মেয়ের ভেতর সুমনা নেই। ছুঁড়িটা গেল কোথায়?

এবার ওধারে তাকাতেই চোখে পড়ল ই-এন-টি ডিপার্টমেন্টের গা ঘেঁষে যে বিরাট ওয়াটার কুলারটা রয়েছে, তার আড়ালে থেকে ভীতু চোখে সামতানিকে দেখছে সে। একটু আগেও নজরে পড়েছে, মেয়েটা ঠিক এইভাবেই সামতানিকে মার্ক করছিল।

মহাশয়গণ, কেসটা কিরকম গড়বড় মনে হচ্ছে! সামতানিকে দেখে সুমনার ঘাবড়াবার কারণটা কী? এই মোমেন্টে কিছু বুঝতে পারছি না। ঠিক আছে, পরে ছুঁড়িটাকে এ নিয়ে জিজ্ঞেস করা যাবে।

ঘুরে ঘুরে সব দেখে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মেডিক্যাল ক্যাম্প সম্পর্কে অনেক কিছু জেনে নিয়ে, নতুন করে আমাদের কয়েক হাজার বার ধন্যবাদ দিয়ে সমাজপতি তাঁর রেজিমেন্ট নিয়ে চলে গেলেন ওঁদের লিমুজিনগুলো রাস্তার মোড়ে ঘুরতে না ঘুরতে আমি লম্বা লম্বা পায়ে সুমনার কাছে চলে এলাম। বললাম, 'কারবারটা কী বল তো।'

মহাশয়গণ, আপনারা সকলেই জানেন ওয়ার্ল্ডের কোনো ব্যাপারেই আমার কোনোরকম কিউরিওসিটি নেই। কিন্তু সুমনা আর সামতানির কেসটা না জানা পর্যন্ত কেন যেন অস্বস্তি হচ্ছে।

সুমনা আমার দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিল। আবছা গলায় বলল, 'কিসের কারবার?'

'সামতানিকে দেখবার পর থেকেই হড়কে হড়কে বেড়াচ্ছ। মনে হচ্ছে মালটাকে দেখে টেরিফিক ভয় পেয়েছ।'

সুমনা উত্তর দিল না।

আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, 'খচ্চরটাকে চেনো নাকি?'

সুমনা ঘাড়টা স্লাইট হেলিয়ে দিল। তার মানে—চেনে।

বললাম, 'কী করে চেনাশোনা হল?'

মহাশয়গণ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না সুমনা। চোখের তারা দুটো মাটির দিকে ফিক্সড করে রেখে আস্তে আস্তে ফিসফিসিয়ে বলল, 'মনে আছে, পার্ক স্ট্রিটের ওধারে একটা বাড়িতে মাঝরাত্তিরে পুলিশ রেইড হয়েছিল।'

'তা আর মনে থাকবে না! তোমার কি ধারণা, আমার মেমোরিটা থার্ড ক্লাস রদ্দি মাল দিয়ে তৈরি? কিছুই আমি ভুলি না।' একটু থেমে ফের বললাম, 'ঐ বাড়িটার পাশের গলিতে একটা ফায়ার বক্সের পেছনে তুমি নিজেকে সেট করে দাঁড়িয়ে ছিলে। ওখানেই তোমার সঙ্গে আমার ফার্স্ট শুভদৃষ্টি হয়েছিল, তাই না?'

সুমনা কাঁপা গলায় বলল, 'সেদিন আপনি আমার যা উপকার করেছিলেন, জীবনে ভুলতে পারব না।' বলতে বলতে তার চোখ জলে ভরে যেতে লাগল।

মহাশয়গণ, আমি একটা চিট, ফোরটোয়েন্টি। খিস্তিখাস্তা, খজড়ামো—এ সব নিয়েই চল্লিশ বিয়াল্লিশ বছর কাটিয়ে দিলাম। এগুলো বাদ দিলে লাইফে যে নানা টাইপের ভাল ভাল কারবার আছে—যেমন ধরুন স্নেহ মায়া কৃতজ্ঞতা—তা নিয়ে আমার মাথাব্যাথা নেই। এই সব ক্যাঁচাকলে একবার ঠ্যাং ঢোকালে আমি কি আর এতকাল ধরে একটা উৎকৃষ্ট ফোরটোয়েন্টি থাকতে পারতাম? আমার ক্যারেক্টারটারই বারটা বেজে যেত।

সুমনা ফের বলতে লাগল, 'আপনার ঋণ কোনোদিন শোধ করতে পারব না। আপনি—'

'হল্ট হল্ট—' হাত তুলে সুমনাকে থামিয়ে দিতে দিতে বললাম, 'গলা কাঁপিয়ে চোখে ফ্লাড বইয়ে কৃতজ্ঞতা টৃতজ্ঞতার কথা বললে আমার খারপ লাগে। মনে হয়, জামার ভেতর হাজারখানেক পোকা মার্চ করছে। তুমি সামতানির কথা বল।'

হাতের সাইড দিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে ভারি গলায় সুমনা বলল, 'আমার কোনো ব্যাপার আপনি সিরিয়াসলি নেন না।'

'আমি একটা মাকড়া ফোরটোয়েন্টি। আমার লাইফে সিরিয়াস কোনো কারবারই নেই। সামতানির কেসটা কী?'

আমার চোখে চোখ সেট করে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সুমনা। তারপর বলল, 'যে বাড়িটায় পুলিশ সেদিন রেইড করেছিল, সামতানি ওখানে মেয়েদের নিয়ে খারাপ ব্যবসা চালায়।'

মহাশয়গণ, আমার খুব একটা চমক ফমক লাগল না। সমাজপতি খজড়াটার চারপাশে যে হারামীগুলো জুটেছে তাদের ক্যারেক্টার যে সোনা দিয়ে বাঁধানো নয় তা আগেই টের পেয়েছিলাম। বললাম, 'ফাইন ফাইন, মাকড়াটা তা হলে মেয়েমানুষের বিজনেসে ভিড়েছে!' বলতে বলতে মনে পড়ল, সামতানিও আমার কাছে হেল্প চায়। কিছুদিন লিয়েনে তার কাছেও কাজ করতে হবে।

হে-হে মহাশয়গণ, সামতানির মতলবটা কি আপনারা আন্দাজ করতে পারছেন? আমি ত চিটিংবাজ, শুদ্ধ বাঙলায় যাকে বলে প্রতারক। সামতানি কি আমার কাছ থেকে টেকনিক্যাল নো-হাউ নিয়ে মেয়েছেলের বিজনেসটা বাড়াতে চাইছে? দেখাই যাক। মহাশয়গণ, আপনারা তো জানেন, ওয়ার্ল্ডে কোনো ব্যাপারেই আমার কোনোরকম কিউরিওসিটি নেই। কিন্তু

সামতানি ব্যাপারে স্লাইট কৌতূহল হচ্ছে। অভ্যুদয় মিটার আর প্রভু জগৎপতির কেস দুটো কমপ্লিট করার পর সামতানির কেসটা টেক-আপ করতে হবে।

সুমনা বলল, 'ঐ লোকটা আমাকে চেনে। দেখতে পেলেই আমাকে পার্ক স্ট্রিটে টেনে নিয়ে যাবে।'

'ওর কাছ থেকে অনেক ক্যাশ ট্যাশ নিয়েছিলে নাকি?'

'হ্যাঁ। তখন ভীষণ অভাব যাচ্ছিল। বাবা হঠাৎ মারা গেলেন—'

বাবার কথা যখন এসে গেছে তখন নিশ্চয়ই সুমনা আবার একটা ট্রাজেডির গল্প ইন করিয়ে দেবে। ঝটপট তাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, 'কত ক্যাশ অ্যাডভান্স নিয়েছিলে?'

সুমনা বলল, 'এক হাজার।'

'ও-কে। দু একদিনের ভেতর মিসেলিনিয়াস ফাণ্ড থেকে ঐ টাকাটা নিয়ে সামতানি মাকড়ার নামে মানি অর্ডার করে দিও।'

কৃতজ্ঞতায় আবার চোখে জল এসে গেল সুমনার। ছুকরির চোখে বোধ হয় একটা অটোমেটিক ওয়াটার ট্যাপ রয়েছে। ইচ্ছে করলেই হুড়হুড় করে সে জল বার কবতে পারে।

বললাম, 'অ্যাই অ্যাই, কেঁদো না। কান্নাকাটি আমার টেরিফিক খারাপ লাগে। চোখের জল দেখলে আমার হার্ট ট্রাবল হয়ে যায়।'

সুমনা ধরা ধরা গলায় বলল, 'আপনার কাছ থেকে কত টাকা যে নিচ্ছি—'

'আমার টাকা! টাকা কারো নিজের হয় নাকি! ওসব জনগণের ক্যাশ। নাসিক প্রেস নোট ছাপিয়েছে। আমার হাত ঘুরে সেই টাকা তোমার কাছে যাচ্ছে। তার মানে পিপলের টাকা পিপলের কাছেই যাচ্ছে। নো লজ্জা, নো সঙ্কোচ, যত ইচ্ছা ক্যাশ তুমি ফাণ্ড থেকে নিতে পার।'

একটু চুপ করে থেকে সুমনা বলল, 'কিন্তু—'

'নো কিন্তু।'

মহাশয়গণ, অভ্যুদয় মিটারের ক্যাশ খসিয়ে এই যে মেডিক্যাল ক্যাম্প চালু হল, তারপর চারটে দিন কেটে গেছে। এর মধ্যে আগরপাড়ার সেই ব্যারাকবাড়িটাকে ঘিরে দশ কিলোমিটার রেডিয়াসের গাদা গাদা টি. বি, উদরী, চোখের ছানি, পেটের আলসার, সিরোসিস, লেপ্রসি, সূতিকা ইত্যাদি হাজার হাজার ডিজিজের পেশেন্ট ট্রিটমেন্ট করিয়ে গেছে। আরো কয়েক হাজার মাকড়া ওয়েটিং লিস্টে পড়ে আছে। তাদেরও চিকিৎসা ফিকিৎসা হবে।

হে-হে মহাশয়গণ, একটা কারবার মার্ক করেছেন? এই আগড়পাড়া এরিয়াতেই যদি এত পেশেন্ট থাকে, হোল ওয়েস্ট বেঙ্গলে কত থাকতে পারে, একবার ভেবে দেখুন। তারপর ওয়েস্ট বেঙ্গলের ফিগারটার কত গুণ বেশি হবে যদি পুরো ইণ্ডিয়ার পেশেন্টদের কথা ভাবি? লাখ লাখ, কোটি কোটি লোক টেরিফিক সব রোগ নিয়ে গ্রামে গঞ্জে সিটিতে মেট্রোপলিসে জার্মের মতো কিলবিল করে বেড়াচ্ছে। কে এক পোয়েট লিখেছিল, 'আমরা নাকি মারী নিয়ে ঘর করি।' ফাইন লিখেছিল লোকটা। মেডিক্যাল ক্যাম্প না খুললে এই ব্যাপারটা লাইফে জানতে পারতাম না।

যাক গে, মহাশয়গণ, আমি একটা থার্ড ক্লাস চিট, একজন লঝঝড় ফোরটোয়েন্টি—ইণ্ডিয়ার লোকজনের দুঃখকষ্ট ডিজিস ফিজিস নিয়ে আমার হেড-একের কোনো কারণই নেই। তা নিয়ে ভাববে সোসিওলজিস্টরা, মন্ত্রীরা, লিডাররা। এ ব্যাপারে 'ইন' করার কোনো রাইটই আমার নেই।

এই চার দিনে আরো একটা কারবার হয়েছে। সুমনার সেই দিদি, যার চোখে পলিথিনের শিটের মতো ক্যাটারাক্ট হয়ে গিয়েছিল, তা ইণ্ডিয়ার একজন বেস্ট আই স্পেশালিস্ট কেটে দিয়েছেন। আর নীট রেজাল্ট হয়েছে এই, সুমনা আমার দুই পায়ে তার কপালটা ঝাড়া হাফ অ্যান আওয়ার ঠেকিয়ে রেখে পড়ে ছিল। তারপর যখন সে উঠল, পা দুটোতে স্রেফ চোখের জলের ফ্লাড বয়ে গেছে। উঠে দাঁড়িয়ে সে কাঁপা ধরা গলায় বলেছে, আমার ঋণ নাকি হোল লাইফে শোধ করতে পারবে না।

মহাশয়গণ, আপনারা তো জানেন, মানে আগেই আপনাদের জানিয়ে দিয়েছি, কৃতজ্ঞতা আর ঋণ-ফিনের কথা বললে আমার কিরকম একটা 'নসিয়া' মতো হয়, গায়ের চামড়া কুঁকড়ে যেতে থাকে। সুমনার কথা শুনতে শুনতে আমি স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে ছিলাম।

এই চার দিনে আরেকটা ব্যাপার হয়েছে। অভ্যুদয় মিটার মেডিক্যাল ক্যাম্পটা একবার দেখিয়ে দেবার জন্য ঘ্যানর ঘ্যানর করে আমার কানের পর্দা ফাঁসিয়ে দিয়েছে। আমি অনেক বার বুঝিয়েছি, এখন আগরপাড়ায় তিনি গেলে পুরো ব্যাপারটা কিচাইন হয়ে যাবে। কিন্তু মাকড়া কোনো কথাই শুনতে রাজি না।

কাজেই মহাশয়গণ, আমি আর কী করতে পারি! একদিন সন্ধেবেলা এয়ার কণ্ডিশানড একটা লিমুজিনে অভ্যুদয়কে তুলে আগরপাড়ায় নিয়ে এসেছিলাম। গাড়িটার জানালা দরজা সব বন্ধ ছিল। একটা কণ্ডিশান করেছিলাম অভ্যুদয়ের সঙ্গে, কোনোমতেই তিনি লিমুজিন থেকে নামতে পারবেন না।

ডে অ্যাণ্ড নাইট, টোয়েন্টিফোর আওয়ার্স মেডিক্যাল ক্যাম্প চালু থাকে। দূরে গাড়ি পার্ক করিয়ে জানালার নীল কাচের ফাঁক দিয়ে অভ্যুদয় মিটারকে ক্যাম্পটা দেখাতে দেখাতে বলেছিলাম, 'ঐ দেখুন, আপনার টাকায় কী কারবার করেছি। একটা পয়সাও চোট দিই নি।'

অভ্যুদয় দাঁত বার করে বলেছেন, 'কী যে বল! পয়সা চোট দেবার কথা কখনও তোমাকে বলেছি! তবে কিনা, সব কিছু নিজের চোখে তো একটু দেখতে ইচ্ছে করে।'

'ক্যাম্প দেখে আপনি খুশি তো?'

'এত খুশি আমি লাইফে কখনও হই নি। একটা রিকোয়েস্ট করব স্বয়ম্ভু?'

'কী?'

'ক্যাম্পের ভেতরে একটি বার যাব।'

'আপনার সঙ্গে কী কণ্ডিশান ছিল?'

শুনে অভ্যুদয় মিটারের মুখটা ফিউজ হয়ে গেছে।

বলছিলাম, 'নিজের ফিউচারের বারটা যদি বাজাতে চান, যেতে পারেন। তা হলে আপনার ইলেকশানের ব্যাপারে আমি আর থাকতে পারব না।'

অভ্যুদয় বলেছেন, 'তুমি ভীষণ ক্রুয়েল স্বয়ম্ভু।' একটু থেমে ফোঁস করে নাকের ভেতর থেকে গরম ভেপার বার করে ফের স্টার্ট করেছেন, 'ঠিক আছে, নামব না। তবে তোমার সেই কথাটা মনে আছে তো?'

'কোনটা?'

'ক্যাম্প শেষ হলে, মানে আর তিন দিন বাদে আমাকে এখানকার পাবলিকের সামনে আসতে দেবে?'

মনে মনে বলেছি, এ লাইফে আর তোমাকে আগরপাড়ার এই রিজিওনে 'ইন' করতে হবে না। তার পাক্কা অ্যারেঞ্জমেন্ট আমি করে দিচ্ছি। তবে গলাটা মাখনে চুবিয়ে হেসে হেসে বলেছি, 'ডেফিনিটলি। তিন দিন পর আপনাকে জনগণের সামনে প্রেজেন্ট করে দেব।'

'ঠিক আছে।'



মেডিক্যাল ক্যাম্প শেষ হতে আর একদিন মোটে বাকি। মহাশয়গণ, আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, বোদা আর তার ওয়াইফ কনকচাঁপাকে 'ওয়ালিং', মানে দেয়ালে লেখার রেসপনসিবিলিটি দিয়েছিলাম।

রোজ রাত্তিরে এখানকার জনগণ বিছানায় বডি ফেললে বোদা অ্যাণ্ড কনকচাঁপা আলকাতরার বালতি আর পাটের ফেঁসোর ব্রাশ নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। কনকচাঁপা আগরপাড়ার দেয়ালে লিখে যাচ্ছে ঃ

'জনগণ হুঁশিয়ার! অভ্যুদয় মিটার এখান থেকে ইলেকশানে নামার মতলব করছে।' বোদার পেটে বাইশটা মলোটভ ককটেল চার্জ করলেও 'ক' বেরুবে না। তাই কনকচাঁপা লেখে, বোদা কাছে দাঁড়িয়ে তাকে গার্ড দেয়।

মহাশয়গণ, কনকচাঁপা ছুকরিটা দারুণ তুখোড়। ক'দিনের মধ্যে আগরপাড়ার ফিফটি পারসেন্ট দেয়াল সে বোঝাই করে ফেলেছে। আর এখানকার লোকেরা লেখাগুলো পড়ে দুর্দান্ত এক্সাইটেড। অভ্যুদয়কে সবাই চেনে।

এখন আগরপাড়ার এই দিকে চায়ের স্টলে, মুদি দোকানে, হোমিওপ্যাথ ডাক্তারের রদ্দি চেম্বারে বা বাজার ফাজারে কান খাড়া করলেই অভ্যুদয় আর 'রাইটিং অন দা ওয়াল' সম্বন্ধে নানারকম কমেন্ট শোনা যাবে।

'অভ্যুদয় খচ্চরটা আবার এখান থেকে ভোটে নামতে চাইছে রে।'

'মাকড়াটা তলায় তলায় কী প্ল্যান করে এখানে ঢুকতে চাইছে, কে জানে। সবাইকে সাবধান থাকতে হবে।'

'শালাকে ভাল করে রগড়ান দিতে হবে—' ইত্যাদি ইত্যাদি।

মহাশয়গণ, বুঝতেই পাবছেন, ওয়ালিং-এর রেজাল্টটা ফাইন হয়েছে। মানে আমি যা চাই,

সেই ডিরেকশানেই সব কিছু এগিয়ে চলেছে। অভ্যুদয় মাকড়াকে এখানে আর ল্যাণ্ড করতে হবে না।

কনকচাঁপা আর বোদাকে ডেকে একদিন বললাম, 'টেরিফিক কাজ করেছিস।'

বোদা বলল, 'বলছ গুরু?'

'একশ'বার। আগরপাড়ার সব ওয়াল দখল করে লিখে যা। একদম ইন্টারভ্যাল দিবি না।'

'ঠিক আছে গুরু।'

'সেই সঙ্গে আরেকটা কাজ করতে হবে।'

'কী?'

একটু ভেবে বললাম, 'ওয়ালিং দেখে লোকেরা কী বলছে?'

বোদা বলল, 'অভ্যুদয় মিটারের চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করে দিচ্ছে।'

'ফাইন। একটা টেপ রেকর্ডার নিয়ে জনগণের কমেন্টটা তুলে রাখবি। টেক কেয়ার। লুকিয়ে লুকিয়ে কারবারটা করতে হবে। কেউ যেন টের না পায়।'

'পাবে না গুরু। লেকেন আমার তো টেপ রেকর্ড নেই।'

'মিসলেনিয়াস ফাণ্ড থেকে ক্যাশ তুলে আজই কলকাতার গিয়ে কিনে আনবি।'

'ও-কে। তবে—'

'তবে কী?'

'খজড়াগুলোর কথা টেপ করে কী ফায়দা গুরু? তার চাইতে যদি কিশোরকুমারের—'

'ফায়দা আছে মানিক। যা বলছি তাই করবি। নো বাকোয়াস।'

'অল রাইট। তুমি যখন অর্ডার দিয়েছ, করতেই হবে।'

হে-হে মহাশয়গণ, চার দিন হল মেডিক্যাল ক্যাম্প শেষ হয়েছে। প্যাণ্ডেলওলারা এখন বাঁশ, তেরপল ফেরপল খুলে নিয়ে যাচ্ছে।

এক উইকের এই ক্যাম্পে অভ্যুদয় মাকড়ার কত ক্যাশ খসে গেছে জানেন? ঝাড়া সেভেন লাখ ফিফটি থাউজাণ্ড। যে কারবারের জন্য ক্যাম্পটা খুলেছিলাম তা মোটামুটি সাকসেসফুল। আগরপাড়া এরিয়ার কয়েক হাজার পেশেন্ট ফ্রি-তে ট্রিটমেন্ট করিয়ে গেছে। কিন্তু মহাশয়গণ, আপনারা নিশ্চয়ই টের পেয়ে গেছেন, অভ্যুদয় যে পারপাসে এই ক্যাম্পের জন্য সাড়ে সাত লাখ বার করে দিয়েছেন তাতে ফুটো পয়সাও বেনিফিট পাবেন না। তাঁর অ্যাঙ্গেল থেকে পুরো ক্যাশটা জলে গেছে, তবে মাকড়া এখনও তা টের পায় নি।

এনিওয়ে, ক্যাম্প উঠে যাবার পর থেকেই অভ্যুদয় মিটার আমার লাইফ একেবারে পটাসিয়াম করে দিচ্ছেন। এক্ষুণি, এক সেকেণ্ডও দেরি না করে আগরপাড়ার জনগণের কাছে হাজির করে দিতে হবে। ইলেকশান এসে যাচ্ছে। আর টাইম নষ্ট করলে ভোট ফোট পেতে হবে না, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি বলেছি, 'স্যার, দু-একটা দিন ওয়েট করুন। তারপর আপনাকে একখানা টেরিফিক সারপ্রাইজ দেব।'

অভ্যুদয় জিজ্ঞেস করেছেন, 'গুড অর ব্যাড?'

'সে স্যার আপনি বুঝে নেবেন।'

'তুমি দেখছি আমাকে ঝুলিয়ে রাখলে।'

'তা স্যার একটু ঝুলে থাকুন।'

মহাশয়গণ, মাকড়াকে দু-একদিন ঝোলার কথা বলেছিলাম। কিন্তু ইচ্ছা করেই ঝাড়া চারটে দিন ভোগালাম। আরো কয়েক দিন পারতাম, তাতে খজড়াটার থ্রম্বসিস হয়ে যেত। যাক গে, অভ্যুদয়কে বলেছি আজ দুপুরে তাঁর আলিপুরের ফ্ল্যাটে যাব, দয়া করে তিনি যেন সেখানে চলে আসেন।

সকাল ন'টায় চান ফান চুকিয়ে, বোদার কাছ থেকে সেই টেপ রেকর্ডারগুলো নিয়ে, একটা অ্যাটাচি কেসে পুরে স্ট্রেট পবিত্র খালসা হোটেলে গিয়ে প্রোলেটারিয়েট লাঞ্চ সেরে প্রাইভেট বাসে জনগণের সঙ্গে ঝুলতে ঝুলতে কলকাতায় চলে এলাম। তারপর আলিপুরের 'পশ' লোকালিটিতে সেই হাই-রাইজ বিল্ডিংয়ে যখন অভ্যুদয় মিটারের অ্যাপার্টমেন্টের সামনে এসে দাঁড়ালাম তখন একটা বেজে বাইশ।

বেয়ারা ফেয়ারা নয়, বেল টিপতে স্বয়ং অভ্যুদয় মিটার দরজা খুলে দিলেন। ভি-আই-পি'দের যেভাবে রিসেপশান দেওয়া হয় অবিকল সেইভাবে বললেন, 'এসে স্বয়ম্ভু, এস—'

মনে হল, মাকড়াটা খুব সম্ভব রাত কাবার হতে না হতেই আমার জন্য এখানে এসে ওয়েট করছে।

ভেতরে ঢুকে আমরা ড্রইং রুমে চলে গেলাম। মুখোমুখি সোফায় বসে সেন্টার টেবলে অ্যাটাচি কেসটা রাখলাম।

মহাশয়গণ, খচ্চরটা ভাল করে নিশ্বাসও ফেলতে দিল না, তার আগেই বলে উঠল, 'কী সারপ্রাইজ দেবে যেন বলেছিলে—'

মুখ থেকে একটা কথা না খসিয়ে অ্যাটাচি কেস খুলে তিনটে টেপ রেকর্ডার বার করে টেবলের ওপর সাজিয়ে রাখলাম।

অভ্যুদয় বললেন, 'এগুলো কী?'

বললাম, 'আপনার সারপ্রাইজ।'

চোখের তারা ফিক্সড করে অভ্যুদয় বললেন, 'মানে!'

বোতাম টিপে ব্যাটারি সেটের টেপ রেকর্ডার চালিয়ে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে আগরপাড়ার জনগণের গলা ভেসে আসতে লাগল।

'অভ্যুদয় মিটার ইলেকশানে জেতার জন্য মেডিক্যাল ক্যাম্প খুলেছিল। খচ্চরটা ঘুষ দিয়ে ভোট পেতে চায়। শালার বাপের নাম ভুলিয়ে ছাড়ব।'

'হারামিটার ফোরটিন জেনারেশানের মুখে ঝামা ঘষে দেব।'

অভ্যুদয় খ্যাপা জানোয়ারের মতো আচমকা চিৎকার করে উঠলেন, 'স্টপ ইট, স্টপ ইট, স্টপ ইট।'

বোতাম টিপে টেপ বন্ধ করে দিলাম।

অভ্যুদয় জিজ্ঞেস করলেন, 'এই সারপ্রাইজ দিতে চেয়েছিলে!'

ঘাড়টা পাক্কা দেড় ফুট হেলিয়ে বললাম, 'ইয়েস স্যার।'

ভুরু কুঁচকে টেপ রেকর্ডারটা দেখতে দেখতে অভ্যুদয় বললেন, 'গোটা রেকর্ডারটা এই সব দিয়ে বোঝাই নাকি?'

'আরো টেরিফিক খিস্তি আছে। আপনার ওপরের ফোরটিন জেনারেশান আর নিচের ফোরটিন জেনারেশান, মানে টোয়েন্টি এইট জেনারেশানকে উদ্ধার করে দিয়েছে।'

অন্য টেপ রেকর্ডার দুটো দেখিয়ে অভ্যুদয় জানতে চাইলেন, 'ও দুটোতে কী আছে?'

বললাম, 'স্যার, একই মাল রয়েছে।'

'তুমি এ সব কমেন্ট রেকর্ড করে এনেছ কেন?'

'আপনি ওখানে কী রকম গুডউইল তৈরি করেছেন, সেটা নিজের কানে না শুনলে তো বিশ্বাস করতেন না।'

অভ্যুদয়ের চোয়াল যেন 'লুজ' হয়ে ঝুলে পড়ল। তিনি বললেন, 'তা হলে তো ঝামেলা হল দেখছি।'

বললাম, 'টেরিফিক ঝামেলা।'

'তুমি বলছ, ইলেকশানে দাঁড়ালে ওখানে জেতা যাবে না?'

'তাই মনে হচ্ছে স্যার। ভেবেছিলাম মেডিক্যাল ক্যাম্পটা খুলে হারামীগুলোকে ভেজাতে পারব, পারলাম না। সাড়ে সাত লাখ টাকা স্রেফ কিচাইন হয়ে গেল।'

'এখন তোমার কী সাজেশান?'

'আগরপাড়াটা আপনি ছেড়ে দিন। বলেছিলেন নর্থ বেঙ্গলে ল্যাণ্ড প্রোপার্টি আছে?'

'আছে।'

'নর্থ বেঙ্গলে যখন আপনাদের বেস আছে, ওখানেই দাঁড়িয়ে যান।'

'নট আ ব্যাড আইডিয়া। আরবান এরিয়া তো আমার সঙ্গে বিট্রে করল। দেখা যাক রুরাল এরিয়া কী করে?'

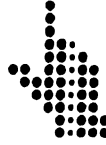
মনে মনে বললাম, 'মাকড়া তুমি যেখান থেকেই দাঁড়াও, ভিলেজ বা সিটি, হেভেন বা হেল, কোনো জায়গা থেকেই তোমাকে ইলেকশানে জিততে দিচ্ছি না। তোমার মতো মাল এম. এল. এ হলে ইণ্ডিয়ার বারটা বেজে যাবে।' মুখে অবশ্য বললাম, 'রুরাল এরিয়ায় গেলে আপনি ঠিক জিতে যাবেন স্যার।'

'ভরসা দিচ্ছ?'

'আমি ভরসা দেবার কে? জনগণ দেবে।'

'তা হলে একবার গিয়ে নর্থ বেঙ্গল ঘুরে এস। সব দেখে শুনে ক্যামপেন শুরু করে দাও। হাতে আর তো বেশি সময় নেই।'

'হ্যাঁ স্যার, শিগগিরই সার্ভে করতে যাব।'



মহাশয়গণ, আগরপাড়ায় অভ্যুদয় মিটারের কেস তো পুরোপুরি কিচাইন হয়ে গেছে। ঠিক করেছি, নেক্সট মাসে নর্থ বেঙ্গল যাব। তার আগে বেলেঘাটায় প্রভু জগৎপতির দিকে একটু নজর দেওয়া যাক।

আমি যখন মেডিক্যাল ক্যাম্প নিয়ে ব্যস্ত, সেই সময় পল্টা অ্যাণ্ড কোম্পানি জগৎপতির ফেভারে এয়ারপোর্টে, ট্যুরিজমের অফিসে আর বড় বড় হোটেলগুলোতে ফরেনারদের কাছে গিয়ে ক্যামপেন চালিয়ে যাচ্ছে। কনট্রাক্ট নিয়েছি, যেভাবেই হোক তাঁকে বিদেশি ভক্ত ফক্ত আর ইন্টার ন্যাশনাল মার্কেট পাইয়ে দিতেই হবে।

আজ দুপুরে আলিপুরের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে আর গড়িয়াহাটার অ্যাপার্টমেন্টে গেলাম না। স্ট্রেট চলে এলাম বেলেঘাটায়—প্রভু জগৎপতির আশ্রমে।

প্রভু তাঁর চেম্বারেই ছিলেন। রামায়ণ না মহাভারত, কোন একটা বইয়ে যেন একটা ছবি দেখেছিলাম। তাতে ব্রহ্মা না বিষ্ণু, কার নাইকুণ্ডুল থেকে একটা পদ্মফুল বেরিয়ে এসে পারপেণ্ডিকুলারের মতো দাঁড়িয়ে আছে, আর তাতে কাত হয়ে নারায়ণ বা শিব, কেউ একজন শুয়ে রয়েছেন। হুবহু সেইরকম পোজ মেরে জগৎপতি পড়ে আছেন। শুধু এখনই না, টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্সের মধ্যে পনের ষোল ঘন্টা এভাবেই তাঁকে দেখা যায়। আগেও আপনাদের তা জানিয়ে দিয়েছি দুটো অ্যাপ্রেন্টিস ব্রহ্মচারী তাঁকে ম্যাসাজ করছে।

যেভাবে ডলাই মলাই চলছে তাতে মনে হয় প্রভু জগৎপতি আগের জন্মে নির্ঘাৎ ওয়েলার ঘোড়া ফোড়া ছিলেন। মানুষ হয়ে এবারে জন্মালেও লাস্ট লাইফের হ্যাবিটটা থেকে গেছে। নইলে দিনে আট দশ ঘন্টা করে কেউ বডিতে ময়দা ঠাসার মতো ব্যাপার সহ্য করতে পারে!

ওঁরা তিনজন ছাড়া জগৎপতির চেম্বারে আর কেউ নেই। আমি ঢুকতেই দেড় কুইন্টাল ওয়েটের বডিটা তুলে অ্যাপ্রেন্টিস সন্ন্যাসীদের হাতের সিগনাল দিলেন। তারা বেরিয়ে গেলে আমার দিকে ফিরে বারটা আসল আর আঠারটা বাঁধানো দাঁত বার করে টেরিফিক হাসলেন। বললেন, 'এস এস—বসো স্বয়ম্ভু—'

মুখোমুখি বসতেই প্রভু জগৎপতি বললেন, 'এ ক'দিন তোমাকে দেখি নি কেন? অনেক দরকারি কথা আছে।'

বললাম, 'গুরুদেব, মিস্টার সমাজপতির কাছে নিশ্চয়ই শুনেছেন আমি অনেক রকম কাজের কনট্রাক্ট নিয়ে বসে আছি। একটা পলিটিক্যাল কেস নিয়ে লাস্ট উইকে দারুণ বিজি ছিলাম।' একটু থেমে ফের স্টার্ট করলাম, 'ডোরা রেগুলার আসছে?'

'নিশ্চয়ই। তুমি বলে দিয়েছ, না এসে পারে?'

'আজ এসেছে?'

'এখনও আসে নি। তবে এসে পড়বে।'

'এখানে কী ধরনের কাজটাজ করছে ডোরা?'

'আপাতত কিছু করছে না। ঘুরে ঘুরে আশ্রমের লাইফ দেখছে।'

একটু ভেবে বললাম, 'ওকে কাজে লাগিয়ে দিন।'

জগৎপতি বললেন, 'কী কাজে লাগাব, বুঝতে পারছি না। এজন্যে তোমার পরামর্শ দরকার।'

ভুরু কুঁচকে বললাম, 'এত বড় আশ্রম চালাচ্ছেন, আর একটা মেয়েকে নিজের ইন্টারেস্টে কিভাবে কাজে লাগাবেন জানেন না!' মনে মনে বললাম, 'মাকড়া।'

'আমাদের আশ্রম হল সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী-মানে পুরুষদের জন্যে। আগে তো আর কখনও কোনো মহিলাকে এখানে কাজে লাগাবার কথা ভাবা হয় নি।'

একটু চুপচাপ।

তারপর বললাম, 'এক কাজ করুন লর্ড।'

'বল—'জগৎপতি প্রায় দম বন্ধ করে আমার দিকে তাকালেন।

'ডোরার জন্য একটা আলাদা চেম্বার, মানে সাধনপীঠের অ্যারেঞ্জমেন্ট করে দিন।'

'আজই দেব। আমার ঘরের পাশের ঘরটা খালিই পড়ে আছে। ওটা সজিয়ে গুছিয়ে দেওয়া হবে।'

'ওর একটা নাম দেওয়া দরকার।'

'কিসের নাম?'

'আপনাদের সাধন ওয়ার্ল্ডে নানারকম নাম ফাম দেওয়া হয় না?'

'বুঝেছি. কিন্তু কী নাম দেওয়া যায় বল তো?'

'ভেবে বলতে হবে।'

'তুমিও ভাবো, আমিও ভাবি।'

হে-হে মহাশয়গণ, প্রভু জগৎপতি এবং আমি, দু'জনেই চোখ বুজে ধ্যানে বসে গেলাম। কারবারটা একবার ভেবে দেখুন—আমার মতো একটা ফেরেববাজ, ফোরটোয়েন্টি আর চিট কিনা সাধন ভজনের ওয়ার্ল্ডে ঢুকে প্রভু জগৎপতির মতো একজন ঘাঘী আশ্রম-ডিক্টেটরের সঙ্গে এমন একটা নাম চিন্তা করছি যা সাধক সাধিকাকে মানায়। মহাশয়গণ. আমার ক্যারেক্টারের একেবারেই 'সত্যনাশ' হয়ে গেল, না কি বলেন?

অনেকক্ষণ চিন্তা ফিন্তা করার পর বললাম. 'পেয়েছি গুরুদেব, ডোরার নাম দিন জগৎপালিকা ধ্যানসীনা মা—'

চোখের ওপর থেকে ড্রপসিন তুলে জগৎপতি খুশির গলায় বললেন, 'চমৎকার নাম ভেবেছ। তবে—'

'কী?'

'আমার নাম জগৎপতি, আর ডোরার নামও যদি জগৎপালিকা রাখি লোকে খারাপ অর্থ করতে পারে, না কী বল? প্রথমত, পুরুষদের আশ্রমে মহিলা ঢুকেছে. সেটাই আমার এনিমি পার্টিরা ভাল নজরে দেখবে না। তারপর দু'জনের নামের মধ্যে যদি মিল পায়. কী রকম ঝড়

উঠবে, নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পারছ।'

'সাধু সন্ন্যাসীদের শত্রু থাকে?'

'থাকে স্বয়ম্ভু, থাকে সাধনের পথ বড়ই দুর্গম!'

'তা হলে জগৎপালিকার জায়গায় পৃথিবীপালিকা করে দিন।'

'পৃথিবীর মধ্যেও জগৎ থেকে যাচ্ছে যে।'

'তা হলে প্রভু ওটা চরাচরপালিকা করে দিন।'

উৎসাহে চেঁচিয়ে উঠলেন জগৎপতি, 'সেই একই কথা হল। ঠিক আছে, আর কিছু যখন তোমার মাথা থেকে বেরুচ্ছে না, ঐ নামই চালু করা যাক।'

'এবার পল্টাদের কথা বলুন। ওরা কিরকম কাজ টাজ করছে?'

জগৎপতি বললেন, 'অসামান্য। মাঝে মাঝে আমেরিকান, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান, জাপানি কি কানাডিয়ান সাহেব-মেম ধরে নিয়ে আসছে। আজও সন্ধেবেলা কয়েক জনকে আনবে।'

'ফাইন সাহেব-মেমরা এলে আপনি কী করছেন?'

'যোগ, ভারতীয় ধর্ম আর দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা দিচ্ছি।'

আচমকা আমার ব্রেনের ভেতর ফ্ল্যাশ লাইটের মতো কিছু খেলে গেল। বললাম, 'ওতে হবে না গুরুদেব। লোকে হেভিওয়েট বাণী কম শুনতে চায়।'

জগৎপতি স্লাইট নার্ভাস হয়ে বলল, 'তা হলে কী করতে হবে?'

'বিভূতি দেখাতে পারবেন?'

'কিরকম?'

'এই ধরুন হাওয়া থেকে হাত বাড়িয়ে সোনার হার বা আংটি ফাংটি এনে ভক্তদের দিলেন। হাততালি দিতেই ঘর চাঁপা ফুলের গন্ধে ভরে গেল। এইরকম আর কি—'

'খুব পারব, তোমাকে তো সেদিনই বললাম, একসময় আমি ম্যাজিক দেখাতাম।'

'তবে আর দেরি করা চলবে না। আজ থেকেই শুভকাজ স্টার্ট করে দিন। সন্ধেবেলা যে সাহেব-মেমরা আসবে, তাদের দিয়েই বিভূতি দেখানোর ইনঅগারেশন হোক।'

'অনেক দিন প্র্যাকটিশ নেই। হঠাৎ ওসব কবতে গেলে যদি ধরা পড়ে যাই?'

'যাবেন না। ক্যাচ যাতে না হন, তার অ্যারেঞ্জমেন্ট আমি করব।'

'তুমি সাহস দিলে নিশ্চয়ই পারব।'

'ও-কে, এখন এক কাজ করুন। গোটাকয়েক ছোট সোনার হার, মা কালীর ছবি দেওয়া লকেট আর আংটি কিনিয়ে আনান।'

জগৎপতি যে জায়গায়টায় বসে আছেন তার একধারে একটা কলিং বেল রয়েছে। সেটা টিপতেই বাইরে থেকে একজন অ্যাপ্রেন্টিস ব্রহ্মচারী দৌড়ে এল। তার কানে কানে হার ফার কিনে আনার কথা বলে ফোমের গদির তলা থেকে একশ'টাকার একটা বাণ্ডিল বার করলেন। সেটা ব্রহ্মচারীর হাতে দিয়ে বললেন, 'এতে পনের হাজার টাকা আছে। এখন ক'টা বাজে স্বয়ম্ভু?'

মহাশয়গণ, একটা ব্যাপার মার্ক করুন, সংসার ফংসারের সঙ্গে কামনা বাসনা পুড়িয়ে যে

সন্ন্যাসী হয়েছে তার বিছানার তলা থেকে কিরকম নোটের বাণ্ডিল বেরুচ্ছে! যাক গে, কবজি উল্টে ঘড়ি দেখে বললাম, 'দুটো দশ।'

আচার্য জগৎপতি ব্রহ্মচারীটাকে বললেন, 'পাঁচটার ভেতর জিনিসগুলো নিয়ে ফিরে আসবে।'

'যে আজ্ঞে গুরুদেব।' ব্রহ্মচারী চলে গেল।

আমি বললাম, 'ফরেন মালেরা আসার আগে একটা অ্যাটমসফিয়ার বানিয়ে নিতে হবে।'

জগৎপতি জিজ্ঞেস করলেন, 'কিরকম অ্যাটমসফিয়ার?'

'ফুল টুল দিয়ে আপনার এই চেম্বার সাজিয়ে ফেলতে হবে। তারপর দামি সেন্টেড ধূপ জ্বালিয়ে পবিত্র ভাব আনতে হবে।

'কোনো অসুবিধা নেই। এত ধূপ জ্বালাব যে ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় এই চেম্বার একেবারে অন্ধকার হয়ে যাবে। আর নিউ মার্কেটে যত গোলাপ আর রজনীগন্ধা উঠেছে সব এক্ষুণি কিনিয়ে আনাচ্ছি। আধ মাইল দূরের বাতাস পর্যন্ত গন্ধে ভরে যাবে।'

'গ্র্যাণ্ড।'

আর কী করতে হবে বল?'

'এখন আর কিছু করতে হবে না। ডোরা আসার পর যা করার আমি করব।'

'কী করবে?'

'ডোরা আগে আসুক।'

হে-হে মহাশয়গণ, ডোরার জন্য আমরা ওয়েট করতে লাগলাম। আপনারাও করতে থাকুন।

ঘন্টাখানেক বাদে ডোবা এসে হাজির। মহাশয়গণ, ছুকরির ড্রেসটা একবার মার্ক করুন. সিল্কের গেরুয়া চড়িয়ে এসেছে। গলা থেকে পা পর্যন্ত ম্যাক্সি টাইপের লুজ আলখাল্লা তার পরনে। অনেকটা আপনাদের ঠাকুমা দিদিমাদের সেমিজ ফেমিজের মতো।

জামাটা খুবই ফিনফিনে। বডির যে সব পার্টস দেখলে ব্লাড প্রেসার চড়ে যায়, নাকমুখ দিয়ে সোডার ঝাঁঝ বেরুতে থাকে, সেগুলোর সেভেনটি পারসেন্ট দেখা যাচ্ছে। মনে হয় ব্রা-ট্রা কিছুই পরে নি ডোরা, ব্লাউজও না। প্যান্টি-ফ্যান্টি পরলেও পরতে পারে। গলায় রুদ্রাক্ষ ঝুলছে, হাতেও রুদ্রাক্ষ। কপালে সিঁদুর দিয়ে ত্রিশূল আঁকা।

পায়ের আঙুল থেকে চুলের ডগা পর্যন্ত ঝট করে একবার দেখে নিয়ে বললাম, 'ফ্যান্টাস্টিক দেখাচ্ছে আপনাকে। মনে হচ্ছে, ব্রহ্মা কি বিষ্ণু নিজের হাতে মেক-আপ চড়িয়ে আপনাকে এই মাত্র অমরাবতী থেকে এখানে নামিয়ে দিয়ে গেল।'

ঠোঁটের ড্রপসিন তুলে সাত আটটা দাঁত বার করে হাসল ডোরা। তারপর আমার মুখোমুখি একটা সোফায় বসতে বসতে বলল, 'কখন এসেছেন?'

'অ্যাবাউটট থ্রি আওয়ার্স। আপনার জন্যেই ওয়েট করছি।'

'কী ব্যাপার?'

'খুব আর্জেন্ট। তার আগে আপনার সম্বন্ধে দু-একটা খবর জানতে হবে।'

'আমার বায়ো-ডাটা তো আপনাকে আগেই জানিয়ে দিয়েছি। আমি একটা বাস্টার্ড,আমার মা-বাপের—'

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিতে দিতে বললাম, 'স্টপ, স্টপ, এ সব না। আপনি গাইতে পারেন?'

ডোরা বলল, 'এক সময় ওয়েস্টার্ন পপ শিখেছিলাম। এখনও ট্রাই করলে হয়ত পারব।'

'ফাইন। ড্যান্স?'

'ফক্সট্রট আর চা-চা-চা।'

'নাইস।'

'নাচ গান দিয়ে কী হবে?'

'সব বলব। তার আগে আমার আরো ক'টা ব্যাপার জানার আছে।'

ডোরা এবার কিছু না বলে আমার দিকে তাকাল।

বললাম, 'সাধুদের ভাবাবেশ হয়—দেখেছেন?'

'ট্রান্সের কথা বলছেন?'

'রাইট। ঐরকম ট্রান্স দেখাতে পারবেন?'

'আমি কি রিয়াল সন্ন্যাসিনী হতে পেরেছি যে পারব! তবে অ্যাক্টিং করে দেখাতে পারি।'

মহাশয়গণ, খুশিতে আমার দু হাত দু পা তুলে ট্যাঙ্গো-ফ্যাঙ্গো নাচতে ইচ্ছা করছে। বললাম, 'আপনি টেরিফিক মাল--স্যরি—জিনিয়াস।'

ডোরা বলল, 'কিন্তু—'

'আবার কী হল?'

'আমি তো এতকাল অন্য লাইনে ছিলাম, সাধুদের ডেনে এই সবে এন্ট্রি নিয়েছি। ট্রান্সের অ্যাক্টিং দেখাতে গিয়ে গোলমাল করে ফেলতে পারি। তবে—'

'কী?'

'মারিজুয়ানা কি এল-এস-ডি খেয়ে নিতে পারলে ভাবাবেশটা পারফেক্ট দেখাতে পারব।'

'আপনার মতো জিনিস ওয়ার্ল্ডে জন্মায় নি। ভাবাবেশের জন্যে যা চাই সব সাপ্লাই দেওয়া হবে।' বলে প্রভু জগৎপতির দিকে তাকালাম, 'লর্ড, ডোরা যা যা চাইছে, সব দিতে পারবেন তো?'

খুনের আসামীর মতো পোজ লাগিয়ে জগৎপতি বললেন, 'আজ কি ঐ সব যোগাড় করা যাবে? অবশ্য—'

'বলুন।'

'গাঁজাতে কাজ চললে আনানো যেতে পারে।'

আমার মুণ্ডুটা সেমি-সার্কেলে ডোরার দিকে ঘুরে গেল। ভুরু দুটো আড়াই সেন্টিমিটার তুলে বললাম, 'চলতে পারে?'

ডোরা ঘাড় কাত করে বলল, 'সিওর। যতই হুইস্কি রাম কনিয়াক চণ্ডু চরস এল-এস-ডি

তাড়ি থাক না, পিওর গাঁজার মতো নেশা হয় না। গড শিব শুনেছি খুব পছন্দ করেন।'

'আপনি গাঁজা টেস্ট করেছেন?'

'জিভের ডগায় চীনাপট্টির ছোবলটা ছাড়া আর সবই টেস্ট করে দেখেছি। গাঁজাটা খেলে মনে হয়, ওয়ার্ল্ড থেকে অ্যাবাউট দু হাজার মাইল ওপরে উঠে গেছি।'

'কয়েক দিন পর পর খেলে একেবারে হেভেনে পৌঁছে যাবেন।'

'নো জোক। যা ফিলিং হয়েছে তাই বললাম।'

'হেভেনলি, মানে একেবারে স্বর্গীয় ফিলিং। ও-কে, এবার আসল কথায় আসা যাক। আজ সন্ধেবেলা গাঁজা ফাঁজা খেয়ে আপনাকে এখানে নাচতে হবে।'

'নাচতে হবে!' দারুণ অবাক হল ডোরা। চোখের তারা দুটো একেবারে ফিক্সড হয়ে গেল তার।

'ইয়েস ম্যাডাম—' মাথাটা ডান দিকে দেড় মিটার হেলিয়ে বললাম, 'নাচটা একটু ডিফিকাল্ট, তবে আপনার কাছে নাথিং।'

'কী নাচ?'

'ফক্সট্রটের সঙ্গে মণিপুরী আর কথক মিশিয়ে দু হাত তুলে তুলে ট্রান্সের ঘোরে নাচতে হবে। আর পপের সঙ্গে কেত্তন মিশিয়ে একটা গানও গাইতে হবে।'

'এ রকম গান আমি লাইফে গাই নি, অমন নাচের কথাও শুনি নি।'

'আমি শিখিয়ে টিখিয়ে রিহার্সাল দিইয়ে নেব।'

একটু চুপচাপ।

তারপর ডোরা বলল, 'একটা ব্যাপার আমি বুঝতে পারছি না, কাইণ্ডলি ক্লিয়ার করে দেবেন?'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কী ব্যাপার?'

'হঠাৎ আজ নাচগানের ফাংশান করছেন কেন?'

ডোরাকে যা বললাম সংক্ষেপে এইরকম। আজ সন্ধেবেলা অনেক ফরেন ট্যুরিস্ট আসবে। প্রভু জগৎপতি তাদের বিভূতি দেখাবেন। ডোরাকে ভাব-সমাধির পোজ দিয়ে নাচতে এবং গাইতে হবে। এ সবের পর জগৎপতি জগৎ, জীবন, দর্শন, যোগ এটসেট্রা সম্বন্ধে বাণী দেবেন। দেখেশুনে সাহেব মেমরা যদি খুশি হয়, কোনো শ্লা প্রভু জগৎপতির ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট রুখতে পারবে না।

ডোরা আস্তে আস্তে সমঝদারের মতো মাথা নাড়াল, 'গুড আইডিয়া। প্ল্যানটা খুব ভাল করেছেন।'

নিজের মাথায় আলতো করে গোটা তিনেক টোকা মেরে বললাম, 'এটা কী জানেন? প্ল্যানিং কমিশনের হেড কোয়ার্টার। আইডিয়াটা এখান থেকে বেরিয়েছে।'

এর পর পাক্কা দু ঘন্টা নাচ আর গানে ডোরাকে রিহার্সাল দেওয়ালাম। ধর্ম ফর্ম সম্বন্ধে জগৎপতি ফরেন মাকড়াদের সামনে যে বাণী ঝাড়বেন, সেটা লিখে তাঁর হাতে দিতে দিতে বললাম, 'এটা কমা সেমিকোলনসুদ্ধু ঝাড়া মুখস্থ করে ফেলুন।'

প্রভু জগৎপতি দাঁত বার করে বললেন, 'এই বুড়ো বয়সে স্কুলের ছেলেদের মতো খাটাবে?'

মহাশয়গণ, মনে মনে দুর্ধর্ষ ক'টা খিস্তি ঝেড়ে গলার স্বরটাকে মাখনে চুবিয়ে বললাম, 'এখন একটু খাটুন প্রভু। পরে ডিভিডেণ্ড পাবেন।'

হে হে করে খানিকটা হেসে জগৎপতি বললেন, 'তোমার ওপর আমার অনেক ভরসা।'

আচমকা একটা কথা মনে পড়তে ডোরার দিকে ফিরে বললাম, 'আপনি তো আশ্রম টাশ্রমের লাইনে 'ইন' করেছেন। এখানে কিন্তু পুরনো নাম চলবে না।'

'আপনার কথা বুঝলাম না।' ডোরা বলল।

'এই প্রভু জগৎপতির কথাই ধরুন। যখন ফ্যামিলি লাইফে ছিলেন তখন অন্য নাম ছিল। এখন জগৎপতি হয়েছেন। আপনাকেও ডোরা নাম ঝেড়ে ফেলে আশ্রমের স্পিরিটের সঙ্গে মিলিয়ে অন্য নাম নিতে হবে।'

'কী নাম?'

'চরাচরপালিকা ধ্যানাসীনা মা।'

খানিক্ষণ হাঁ হয়ে রইল ডোরা। তারপর বলল, 'ওহ্ মাই গড!'

সন্ধে হবার আগেই জগৎপতির স্পেশাল চেম্বার থেকে চেয়ার টেবল সোফা-টোফা সরিয়ে মেঝেতে ছ ইঞ্চি পুরু জয়পুরী কার্পেট পেতে দেওয়া হল। দু'জন অ্যাপ্রেন্টিস ব্রহ্মচারী নিউ মার্কেট থেকে চার-পাঁচশ' টাকার জুঁই, রজনীগন্ধা, বেল, পদ্ম আর লাল গোলাপের 'বুকে', মালা ইত্যাদি কিনে এনেছিল। আর এনেছিল অভ্র বসানো টেরিফিক টেরিফিক শোলার চাঁদমালা। চেম্বারটাকে এসব দিয়ে সাজিয়ে ফেলা হল। টুনি লাইট-ফাইটও চারদিকে ঝুলিয়ে দেওয়া হল। তারপর অন্ধকার নামতে না নামতেই মাইশোরের গোছা গোছা পিওর আগরবাতি ধূপ জ্বালানো হল। ধূপ, ফুল, আলো, সব মিলিয়ে জগৎপতির স্পেশাল চেম্বারে এখন দারুণ পবিত্র পবিত্র অ্যাটমসফিয়ার।

এখনকার প্রোগ্রামটাও ঠিক করে রেখেছি। আচার্য জগৎপতি এবং ডোরা, মানে চরাচরপালিকা ধ্যানাসীনা মা প্রথমে এই চেম্বারে থাকবেন না। ফরেন ট্যুরিস্টরা এলে আশ্রমের সন্ন্যাসীরা তাদের নিচের কার্পেটে বসাবে। ওরা খানিকক্ষণ ওয়েট করার পর জগৎপতি এবং চরাচরপালিকা এসে দর্শন দেবেন।

বিদেশি মাকড়ারা এসেই যদি জগৎপতির দর্শন পেয়ে যায়, তার ইমপর্টান্স থাকে না। প্রভুকে কোনোমতেই 'চিপ' হতে দেওয়া যায় না।

প্ল্যান অনুযায়ী জগৎপতি আর ডোরাকে আশ্রমের অন্য ঘরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। জগৎপতি কী টাইপের ড্রেস চড়িয়ে আজ ফরেনারদের দর্শন দেবেন, সেটা সিলেক্ট করে দিয়েছি। তিনি এখন মেক-আপ চড়াচ্ছেন।

মহাশয়গণ, ঘড়ির কাঁটায় যখন সাতটা, সেই সময় বাইরে একটা গাড়ি থামার আওয়াজ হল। জানালা দিয়ে মুখ বাড়াতেই চোখে পড়ল নিচে নুড়ির রাস্তায় একটা ইমপোর্টেড স্টেশন ওয়াগন দাঁড়িয়ে আছে। সেটার দরজা খুলে পন্টা অ্যাণ্ড কোম্পানির সঙ্গে গাদা গাদা বিদেশি

ছেলেমেয়ে নামছে।

হে-হে মহাশয়গণ, আমি আর প্রভু জগৎপতির স্পেশাল চেম্বারে ওয়েট করলাম না। সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে একসঙ্গে তিনটে করে সিঁড়ি টপকে নিচে নেমে স্ট্রেট স্টেশন ওয়াগনটার কাছে চলে এলাম।

এতক্ষণে সবগুলো ফরেন ছোকরা-ছুকরি নেমে পড়েছে। পল্টা আর তার অ্যাসিস্টান্টরা একধারে দাঁড়িয়ে ছিল। আমাকে দেখে পল্টা বলল, 'গুরু, মাকড়াদের নিয়ে এলাম।'

বললাম, 'তা তো দেখেছিই। তোরা রিয়ালি টেরিফিক।' বলেই বিদেশি ছোকরা ছুকরিদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলাম, 'ওয়েলকাম, ওয়েলকাম টু দি অ্যাবোড অফ পিস। এই থার্ড ক্লাস ওয়ার্ল্ডে যদি কোথাও হেভেন থাকে তা লর্ড জগৎপতির এই বেলেঘাটার আশ্রমে। আসুন আপনারা, আসুন।'

সবাই কোরাসে বলে উঠল, 'থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ—'

এবার পল্টা ওদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। ওদের কেই ফ্রেঞ্চ, কেউ আমেরিকান, কেউ বেলজিয়ান, কেউ স্প্যানিশ, কেউ ইতালিয়ান, ইত্যাদি।

আমি যে আমি—একটা থার্ড ক্লাস চিট, ফোরটোয়েন্টি—কোনো কারণেই যে অবাক হয় না, চমকায় না, কয়েক সেকেণ্ডের জন্য তারও চোখের তারা ফিক্সড হয়ে গেল। বললাম, 'শালারা, করেছিস কী রে! একেবারে হোল ইওরোপ আর আমেরিকাকে নিয়ে এসেছিস!'

পল্টা এবার বলল, 'গুরু, তোমার অর্ডার ছিল যে।'

এদিকে ফরেনারদের ভেতর যে ছুকরিটার মাথা অন্য সবাইকে ছাড়িয়ে মিনিমাম চার পাঁচ ইঞ্চি ওপরে উঠে আছে, যার মুখটা হুবহু বোতলের সাইজের, লম্বা লম্বা হাত-পা, পরনে লাল পাজমার ওপর হলদে গুরু পাঞ্জাবি—সে আমাকে দেখিয়ে পল্টাকে জিজ্ঞেস করল, 'এঁর পরিচয় তো পেলাম না।'

পল্টা কিছু বলার জন্য ঠোঁট ফাঁক করতে যাচ্ছিল। তার আগেই বলে উঠলাম, 'গীতা পড়েছ?'

'ইউ মিন হিন্দু রিলিজিয়াস টেক্সট?'

'ইয়েস।'

'না, পড়া হয় নি।'

'পড়লে বুঝতে পারতে লর্ড শ্রীকৃষ্ণ ওখানে অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন।'

'রিয়ালি! হোল ওয়ার্ল্ড?' ঠোঁট দুটো সরু হয়ে গেল ছুকরির।

আস্তে আস্তে মাথা ঝাঁকিয়ে বললাম, 'হোল ইউনিভার্স। লর্ড কৃষ্ণের মতো আমার মধ্যেও ইউনিভার্সের সব লীলা রয়েছে।'

'হোয়াট ইজ লীলা?'

'মুখে বলে কতটুকু আর বোঝাতে পারব। সবে তো আমাকে দেখলে। যদি কয়েক বছর মন দিয়ে আমার অ্যাক্টিভিটি মার্ক করতে পার, বুঝতে পারবে আমি মাকড়াটি কী। এখন এস আমার সঙ্গে—'

মহাশয়গণ, হোল ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডকে সিঁড়ির দিকে নিয়ে গেলাম। তারপর তাড়িয়ে তাড়িয়ে লর্ড জগৎপতির স্পেশাল চেম্বারে ঢুকিয়ে ফেললাম।

সেণ্টেড ধূপের ধোঁয়া, রজনীগন্ধা, জুঁই আর গোলাপের গন্ধে ঘরটা ভরে আছে। পবিত্র পবিত্র এই অ্যাটমসফিয়ারটা আগেই তৈরি করা হয়েছিল।

ফরেনারদের বসিয়ে বললাম, 'তোমরা একটু বিশ্রাম কর। লর্ড জগৎপতি এখন মেডিটেশনে আছেন। মেডিটেশন ভাঙার পর তোমাদের দর্শন দেবেন।'

সেই বকের মতো ঢ্যাঙা ছুকরি ক্রেনের মতো গলা বাড়িয়ে বলল, 'লর্ডের দর্শনের জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলাম।'

এই সময় চার পাঁচটা অ্যাপ্রেন্টিস ব্রহ্মচারী অনেকগুলো শ্বেতপাথরের থালায় সন্দেশ-ফন্দেশ সাজিয়ে আর গেলাসে সিদ্ধি এবং বাদাম মেশানো দইয়ের সরবত নিয়ে এখানে এসে ঢুকল। মহাশয়গণ, আপনারা আগেই মার্ক করেছেন, ব্রহ্মচারীগুলোকে আগেই ট্রেনিং দিয়ে রেখেছিলাম, ফরেনাররা এখানে ঢোকার পাঁচ মিনিটের মধ্যে যেন সন্দেশ সরবত-ফরবত নিয়ে আসে। ওদের টাইমিং সেন্স রীতিমত ভাল। যেমন শিখিয়েছি, ঠিক তেমনই স্টেজে 'ইন' করেছে।

ট্রেইনি সাধুরা ফরেনারদের হাতে হাতে একেকটা করে পাথরের থালা ধরিয়ে দিল। ফরেনারদের একজন জিজ্ঞেস করল, 'এসব কী?'

বললাম, 'প্রসাদ। খেয়ে নাও।'

ওরা যখন খাচ্ছে আমি উঠে পড়লাম। বললাম, 'একটু আসছি। কিছু মনে করো না।'

সবাই গলা মিলিয়ে জানালো, 'না না, কিছু মনে করব না। আপনি ঘুরে আসুন।'

পল্টা অ্যাণ্ড কোম্পানি আমাদের সঙ্গে স্পোশাল চেম্বারে এসেছিল। তাদের বললাম, ফরেনারদের আরাম-ফারামের দিকে যেন নজর রাখে। ব্রহ্মচারীদের বললাম, 'আরো শ পাঁচেক ধূপকাঠি জ্বালিয়ে দিন। ধুনুচি আছে?'

একটা ব্রহ্মচারী বলল, 'আছে।'

'ক'টা?'

'দশ বারটা।'

'গুড। ধুনুচিতে টিকে ধরিয়ে সেণ্টেড ধুনো আর গুগ্‌গুল দিয়ে নিয়ে আসুন। পনের থেকে কুড়ি মিনিটের ভেতর ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় এই ঘর এমনভাবে ভরে দেবেন যাতে পাঁচ ফুট দূরে কাউকে চেনা না যায়। পারবেন?'

'নিশ্চয়ই।'

'ফাইন।'

আমি স্পেশাল চেম্বারের বাইরে বেরিয়ে এলাম। মহাশয়গণ, কোথায় যাচ্ছি বলতে পারেন? আপনাদের মুখচোখ দেখে বুঝতে পারছি, ধরে ফেলেছেন। যা একেকখানা জিনিস আপনারা, ধরে তো ফেলবেনই। আপনাদের ধোঁকা দিয়ে কিছু করবার মতো মাল ওয়ার্ল্ডে খুব তো বেশি জন্মায় নি। এনিওয়য়ে, আমি এই মোমেণ্টে যাচ্ছি প্রভু জগৎপতি এবং ডোরার কাছে।

স্টেজে নামানোর আগে মাকড়া দুটোর মেক-আপ থেকে শুরু করে সব কিছু চেক-আপ করে নেওয়া দরকার।

স্পেশাল চেম্বার থেকে বেরিয়ে ডান দিকের লম্বা বারান্দা দিয়ে খানিকটা গেলেই বাঁয়ে পর পর দুটো ঘর। সামনের ঘরটায় মুখ বাড়াতে চোখে পড়ল লর্ড জগৎপতি মেক-আপ নিয়ে বসে আছেন। পরনে পায়ের পাতা পর্যন্ত লাল টকটকে ঢোলা আলখাল্লা, পেট পর্যন্ত সোনার চেইনে গাঁথা তিন থাক রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে রুদ্রাক্ষের তাগা, কপালে সিঁদুর এবং চন্দনের তিলক।

জগৎপতির পা থেকে চুলের আগা পর্যন্ত ঝট করে একবার দেখে নিলাম। জগৎপতি নার্ভাস গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'ঠিক আছে?'

ঘাড়টা এক ফুট কাত করে বললাম, 'পারফেক্ট। তবে—'

'কী?'

'চোখ দুটো ঢুলুঢুলু করতে হবে।'

'কিরকম ঢুলুঢুলু?'

'এই ধরুন পাক্কা দু বোতল বাংলা মাল খাবার পর যেমন হয় সেই রকম। তবে মুখে গন্ধ থাকবে না।'

চোখ দুটো করুণ করে জগৎপতি বললেন, 'ভারি বিপদে ফেলে দিলে তো স্বয়ম্ভু।'

বললাম, 'কিসের বিপদ লর্ড?'

'আমি তো বাংলা মদ খাই না।'

'খেতে বলছি না। অ্যাক্টিংটা অন্তত করতে হবে। মনে হবে আপনি এই ওয়ার্ল্ডের মানুষ না, ব্রহ্মা বিষ্ণু কি মহেশ্বরের কোল থেকে হাইজ্যাম্প মেরে এখানে নেমে এসেছেন।'

ভুরু কুঁচকে একটু কী ভেবে নিলেন জগৎপতি। তারপর বললেন, 'তুমি তুরীয় ভাব আনার কথা বলছ?'

আমি প্রায় চেঁচিয়েই উঠলাম, 'একজাক্টলি লর্ড। ঐ ভাব চোখেমুখে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করবেন। মনে রাখবেন, আজ আপনার সামনে টেরিফিক টেস্ট। আজ যদি হার্ডল্ পেরুতে পারেন, ইণ্টারন্যাশনাল মার্কেট কোনো মাকড়া আটকাতে পারবে না।'

'অনেক কাল যোগ-টোগ করেছি তো। তুরীয় ভাবটা ফোটাতে পারব বলেই মনে হচ্ছে।'

কথা বলতে বলতে আমার ব্রেনে দুর্ধর্ষ প্ল্যান খেলে গেল। বললাম, 'একটা ব্যাপার করতে পারলে কারবারটা ফ্যান্টাসটিক জমে যাবে লর্ড।'

'কী কারবার?'

'তার আগে বলুন, আপনার স্পেশাল চেম্বারে যেখানে আপনি সিংহাসনের মতো চেয়ারে বডি রাখেন, তার ওপরের ছাদটা কংক্রিটের?'

'না। কেন?'

'কিসের তৈরি ওটা?'

'অ্যাসবেস্টসের। তার তলায় পাতলা প্লাইউডের প্যানেল রয়েছে।'

'কয়েক মিনিটের মধ্যে অ্যাসবেস্টসটা সরানো যাবে?'

'নিশ্চয়ই যাবে। কিন্তু—'

মহাশয়গণ, আমি জগৎপতির কানের ভেতর মুখটা ঢুকিয়ে আমার প্ল্যানটা জানিয়ে দিলাম। জগৎপতি উৎসাহে প্রায় চার ফুট লাফিয়ে উঠলেন। বললেন, 'গ্র্যাণ্ড, দুর্দান্ত প্ল্যান করেছ।'

হে-হে মহাশয়গণ, আমি এবার জগৎপতিকে বললাম, 'এক্ষুণি কাউকে ডেকে ছাদের অ্যাসবেস্টস আর কাঠের প্যানেল খোলার অর্ডার দিন।'

জগৎপতির প্রচণ্ড উৎসাহ। এক লং জাম্পে দরজার কাছে গিয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কাকে যেন ডাকলেন। পাঁচ সেকেণ্ডের ভেতর একটা অ্যাপ্রেন্টিস ব্রহ্মচারী সামনে চলে এল। কী করতে হবে, প্রভু জগৎপতি তাকে বুঝিয়ে দিলেন। ব্রহ্মচারী আর দাঁড়াল না, চোখের পাতা পড়তে না পড়তে ভ্যানিশ হয়ে গেল।

জগৎপতি আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, 'আর কিছু করতে হবে?'

'নিশ্চয়ই। একটা দড়ির দোলনা বানাতে হবে। আছে?'

'আছে।'

'বেশ মজবুত তো? মানে আপনার মতো একখানা হেভিওয়েট মালকে—'বলেই পাক্কা ছ ইঞ্চি জিভ কেটে বললাম, 'স্যরি লর্ড। মুখটা আমার একেবারে পচা ড্রেন হয়ে গেছে।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, যা বলছিলে বলে যাও।' বলে জগৎপতি স্লাইট হাসলেন।

'আপনার ওয়েট দোলনাটা নিতে পারবে তো?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।'

'ফাইন। এখন বলুন ডোরা কোথায় আছে?'

'পাশের ঘরে।'

আমি আর দাঁড়ালাম না, পাশের ঘরে চলে এলাম।

ডোরা আগই সিল্কের গেরুয়া পরে এসেছিল। তার ওপর রুদ্রাক্ষ চড়িয়েছে। কপালে এক টাকার কয়েনের সাইজের সিঁদুরের টিপ এঁকেছে। চোখে পুরু করে কাজল টেনেছে একেবারে কান পর্যন্ত। মাথার চুলগুলো চুড়ো করে বাঁধা।

ডোরা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'মেক-আপ ঠিক আছে?'

ঘাড়টা এক ফুট হেলিয়ে বললাম, 'পারফেক্ট।'

'আর কোনো ইনস্ট্রাকশান আছে?'

প্রভু জগৎপতিকে যা ইনস্ট্রাকশান দিয়েছিলাম, ডোরাকেও তাই দিলাম। অর্থাৎ চোখেমুখে তুরীয় ভাব ফুটিয়ে তুলতে হবে।

ডোরা বলল, 'ঠিক আছে।'

'নিজের নতুন নামটার কথা মনে আছে তো?'

'সিওর। চরাচরপালিকা ধ্যানাসীন মা।'

'ফাইন, আমি এখন যাই। লর্ডের স্পেশাল চেম্বারে অন্য সব অ্যারঞ্জমেণ্ট করতে হবে।'

ডোরার কাছ থেকে আমি স্ট্রেট গ্রাউণ্ড ফ্লোরে নেমে এলাম। বিরাট শেডের তলায় যেখানে

তিন শিফটে ডে অ্যাণ্ড নাইট কেত্তন হয় সেখানে যেতেই চোখে পড়ল বারটা তাগড়া চেহারার ব্রহ্মচারী কোরাসে গেয়ে চলেছে, 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে—'

অনেকক্ষণ ধরে তারা গাইছে বলে গলা খানিকটা ঝিমিয়ে পড়েছে। বললাম, 'এভাবে হবে না।'

একটা ব্রহ্মচারী কেত্তন থামিয়ে আমার দিকে তাকাল। অন্য সবাই খোল-কত্তাল এটা-সেটা বাজিয়ে গেয়ে চলল।

যে গাইছে না, তাকে বললাম, 'ফরেন থেকে অনেক মাল এসেছে। ভয়েসটা আরো উঁচুতে তুলে গেয়ে যান। ফরেনার মাকড়ারা যেন মনে করে কোনো তপোবন-ফপোবনে এসে পড়েছে।'

পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যে সমস্ত অ্যাটমসফিয়ারটা চেঞ্জ করে গেল। প্রচণ্ড স্পিডে খোল-কত্তালের অর্কেস্ট্রা বেজে উঠল। আর ব্রহ্মচারীরা গলায় শিরা ছিঁড়ে এমন কেত্তন জুড়ে দিল, যাতে পাঁচ কিলোমিটারের ভেতর যত কাক উড়ছিল কুকুর ঘোরাঘুরি করছিল, চমকে দৌড়ুতে দৌড়ুতে বেলেঘাটার বাউণ্ডারি ছাড়িয়ে চলে গেল।

গাইতে গাইতেই ব্রহ্মচারীরা আমার দিকে তাকাল। ঘাড়টা কয়েক সেন্টিমিটার হেলিয়ে বললাম, 'ঠিক আছে। এই মোশানে চালিয়ে যান।' বলে আর ওয়েট করলাম না। তিরিশটা সিঁড়ি টপকে প্রভু জগৎপতির স্পেশাল চেম্বারে চলে এলাম।

সেণ্টেড আগরবাত্তি-ধূপের ধোঁয়ায় ঘরটা ভরে গেছে। ফুলের আর ধূপের গন্ধে অ্যাটমসফিয়ার পবিত্র হয়ে উঠেছে। ধোঁয়া-ফোঁয়ার মধ্যে দেখতে পেলাম ফরেন ছোকরা-ছুকরিগুলোর প্রসাদ খাওয়া কমপ্লিট। আমাকে দেখেই গ্লোবের মতো গোল মুখওলা ইটালিয়ান একটা ছোকরা জিজ্ঞেস করল, 'লর্ড জগৎপতি কখন দর্শন দেবেন?'

মহাশয়গণ, সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথাটা সোম-সার্কেলে ডাইনে ঘুরে যেখানে লর্ড জগৎপতির সিংহাসন টাইপের আসনটা রয়েছে, তার ওপরে সিলিংয়ে আটকে গেল। আর তক্ষুণি বডিতে ফোর-ফর্টি ভোল্টের কারেণ্ট খেলতে লাগল। ধূপের ধোঁয়ার মধ্যেও টের পেলাম, সিলিংয়ের অ্যাসবেস্টসটা ফাঁক করা রয়েছে। জগৎপতিকে মনে মনে বার দশেক স্যালুট করলাম। এই ক'মিনিটের ভেতর ব্রহ্মচারীদের দিয়ে ছাদের অ্যাসবেস্টস খুলে দিয়েছেন। একটু পর ইটালিয়ান ছোকরাটার দিকে ফিরে বললাম, 'দশ পনের মিনিটের ভেতর প্রভুর দর্শন মিলবে। মন পবিত্র করে তাঁর ধ্যান কর।'

এই স্পেশাল চেম্বারের প্রতিটি দরজায় দু তিনটে করে ব্রহ্মচারী দাঁড়িয়ে আছে। তাদের ডেকে আরো দশ ডজন মোটা মোটা আগরবাতি জ্বালিয়ে দিতে বললাম। এক মিনিটও লাগল না, পুরনো ধোঁয়ার সঙ্গে ফ্রেশ ধোঁয়া মিলে গেল।

হে-হে মহাশয়গণ, আপনারা তো জানেনই, আমি একটা ফোরটোয়েন্টি-ফার্স্ট ক্লাস চিট, ওয়ার্ল্ডের কোনো ব্যাপারেই আমি ঘাবড়াই না, নার্ভাস হই না। তবু লর্ড জগৎপতিকে নিয়ে যে প্ল্যানটা করেছি, সে সম্বন্ধে স্লাইট ভয় আছে। মাকড়া যদি গড়বড় করে ফেলে, সব কিচাইন হয়ে যাবে। সেই জন্য যতটা পারা যায় ধোঁয়ার অ্যারেঞ্জমেণ্ট করেছি। ফরেনারেদের ধোঁকা দিতে হবে তো।

বিদেশি ছোকরা-ছুকরিগুলো আর কিছু করল না। ঘার উঁচু করে, শিরদাঁড়া স্ট্রেট রেখে চুপচাপ বসে রইল।

দশ পনের মিনিট ফরেনারদের ওয়েট করতে বলেছিলাম। কিন্তু অতটা সময় লাগল না। তার আগেই দেখা গেল, ছাদের সেই বড় ফোকরটা দিয়ে প্রভু জগৎপতি নেমে আসছেন। তঁর একটা হাত আগেকার মুনী-ঋষিদের স্টাইলে সামনে দিকে বাড়িয়ে দেওয়া। যেন ওয়ার্ল্ডের সবাইকে আশীর্বাদ করছেন।

এ ভাবে শূন্য থেকে যে নেমে আসতে পারে তার স্পিরিচুয়াল পাওয়ার যে দুর্দান্ত তা বুঝতে ফরেনারদের হাফ সেকেণ্ডও লাগল না। তাদের চোখের তারা ফিক্সড হয়ে গেল।

এদিকে ব্রহ্মচারীরা উন্মাদের মতো চেঁচাতে লাগল, 'প্রভু জগৎপতিকি—'

'জয়।'

'প্রভু জগৎপতিকি—'

'জয়।'

মহাশয়গণ, এই ট্রেনিংটাও ব্রহ্মচারীদের আগেই দিয়েছিলাম। ফরেনার শালারা যেন হিপনোটাইজড হয়ে গিয়েছিল। তারাও ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে কোরাসে চিৎকার করল, 'প্রভু জগৎপতিকি—'

'জয়।'

হে-হে মহাশয়গণ, আপনারা তো এককেটি খলিফা। আপনারা ডেফিনিটলি টের পেয়েছেন, জগৎপতি অ্যাসবেস্টস ফুটো করে ব্রহ্মা বিষ্ণু-ফিষ্ণুর মতো নামতে পারেন না। তাঁকে দড়ির দোলনায় বসিয়ে ব্রহ্মচারীরা ছাদ থেকে ঐ ফোকর দিয়ে নামিয়ে দিয়েছে। যাতে দড়ির দোলনা দেখা না যায়, তাই ডজন ডজন ধূপকাঠি জ্বালিয়ে ধোঁয়ায় ঘর ভরে দেওয়া হয়েছে।

ওভাবে ছাদ ফুটো করে প্রভু জগৎপতির নেমে আসার রিঅ্যাকশান হয়েছে দুর্দান্ত। ফরেনার ছোকরা-ছুকরিগুলো ধরেই নিয়েছে, এই মালটি ব্রহ্মা-টহ্মার মতো পাওয়ারফুল। তারা চোখের তারা গোল করে তাকিয়েই ছিল। আমি ফিসফিস করে তাদের কানে কানে বললাম, 'প্রভুকে প্রণাম কর।'

ছোকরা-ছুকরিরা বডি থ্রো করে জগৎপতির পায়ের ওপর ফ্ল্যাট হয়ে পড়ল। জগৎপতি ডান হাতটা সামনের দিকে বাড়িয়ে বললেন, 'জয়স্তু।'

ফরেনারগুলো উঠে বসতেই আমি সবার সঙ্গে জগৎপতির পরিচয় করিয়ে বললাম, 'প্রভু, এরা ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড থেকে একটু পিসের, মানে শান্তির জন্যে আপনার কাছে লং জাম্প করতে করতে চলে এসেছে। ওদের হেভি ক্যাশ আছে কিন্তু আনন্দ নেই। ওরা কি আপনার করুণা পাবে প্রভু?'

হে-হে মহাশয়গণ, জগৎপতিকে একটু মার্ক করুন। কালো কালো হেভি ঠোঁটে আর গাঁইতির মতো ট্যারাবাঁকা দাঁতগুলোতে হেভনলি, মানে শুদ্ধ ভাষায় যাকে স্বর্গীয় বলে, সেই রকম হাসির ঝিলিক মারছে। হাত ঘুরিয়ে সিলিংয়ের দিকটা দেখিয়ে জগৎপতি দুর্ধর্ষ একখানা

পোজ মেরে বললেন, 'আমি কে? সবই ঈশ্বরের করুণা। এই যে এঁরা আমার কাছে এসেছেন, সবই তাঁর নির্দেশে।'

মহাশয়গণ, দেখুন দেখুন, জগৎপতি চিজটি কী মারাত্মক! মাকড়া যেন ওয়ার্ল্ডের বেস্ট ফিলোজফার আর ধর্মগুরু—বুদ্ধ ক্রাইস্ট আর শঙ্করাচার্যের কম্বিনেসন। আমি বাঁই করে মাথা সেমি-সার্কেলে ঘুরিয়ে ফরেনারদের দিকে তাকালাম। শালারা একেবারে মেসমেরাইজ্ড হয়ে গেছে। তারা ফিসফিসিয়ে আমাকে বলল, 'এত বড় 'ইয়োগী' আর রিলিজিয়াস লিডার আমরা আগে আর দেখি নি। মনে হচ্ছে, প্রভু জগৎপতির মধ্যে দিয়ে আমরা রিয়াল ইণ্ডিয়াকে ডিসকভার করতে পারব।'

জগৎপতির মধ্যে এই ফরেনারগুলো কোন রিয়াল ইণ্ডিয়াকে দেখবে, তা আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। কিন্তু আসল কথাটা লিক করে দিয়ে জগৎপতির ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট পাওয়ার ব্যাপারটা তো কিচাইন করে দেওয়া যায় না। ভয়েসটা কয়েক পর্দা চড়িয়ে দুর্দান্ত উৎসাহে বলে উঠলাম, 'সিওর, সিওর মাকড়ারা—'

ফোর-ফর্টি ভোল্ট মার্কা কানাডিয়ান ছুঁড়িটা বলল, 'হোয়াটস মাকড়া?'

মহাশয়গণ, আপনারা তো জানেনই কখনও কোনো ব্যাপারেই আমি ঘাবড়াই না, চমকাই না, কোনো কারণেই আমার ব্লাড প্রেসারের রাইজ বা ফল হয় না। বললাম, 'মাকড়া একটা হেভি ব্যাপার। সবে তো ইণ্ডিয়ায় এলে। কিছুদিন এখানে থাকো। আমাদের মতো সাবলাইম খজড়া—স্যরি, সাবলাইম গ্রেট ম্যানদের সঙ্গে মেলামেশা কর। তখন বুঝতে পারবে মাকড়া কী চিজ।'

চোখ দুটো পুরোপুরি সার্কেল বানিয়ে কানাডিয়ান ছুকরিটা বলল, 'আই সি—'

আমি আর তার দিকে না তাকিয়ে স্ট্রেট জগৎপতির দিকে ফিরলাম। বললাম, 'লর্ড, কয়েক হাজার কিলোমিটার পেরিয়ে এই ছেলেমেয়েরা ইণ্ডিয়ায় এসেছে। এরা আপনার কাছে থেকে কিছু গসপেল, আই মিন বাণী টাণী শুনতে চায়। কৃপা করে যদি জিভ থেকে কিছু ভাল ভাল কথা খসান—'

জগৎপতি বললেন, 'বাণীর আগে অন্য একটা কাজ আছে।'

'কী লর্ড?'

'পরমেশ্বরের নির্দেশ এসেছে, আমার বিদেশি পুত্রকন্যাদের কিছু দিতে হবে।'

আমি যে আমি—একটা ফোরটোয়েন্টি, একটা থার্ড ক্লাশ চিট—সে পর্যন্ত চমকে গেল। মাকড়া কখন যে অলমাইটি গডের সিগনাল পেয়েছে, আমিও টের পাই নি। বললাম, 'অল রাইট লর্ড, অল রাইট। আগে তা হলে দিয়েই নিন।'

এই স্পেশাল চেম্বারের প্রতিটা দরজায় দুটো তিনটে করে ব্রহ্মচারী দাঁড়িয়ে ছিল। হেভেন আর আমাদের এই ওয়ার্ল্ডের মাঝখানের মিডলম্যান প্রভু জগৎপতি চোখে কাম্নিক মেরে তাদের কাছে ডেকে ফিসফিসিয়ে বললেন, 'আস্তে আস্তে খোল-কত্তাল বাজিয়ে কেত্তন গাইতে শুরু কর। গলা ফাটিয়ে চেঁচাবে না। আর বেশি করে ধূপকাঠি জ্বলিয়ে দাও।'

'ঠিক আছে গুরুদেব—' অ্যাপ্রেন্টিস ব্রহ্মচারীরা ঘাড় হেলিয়ে চলে গেল।

এবার জগৎপতি আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। এই মোমেন্টে মাকড়া ঠিক কী প্ল্যান করেছে বুঝতে পারছি না। অগত্যা আমিও দাঁত বার করলাম, অর্থাৎ হাসলাম।

কয়েক মিনিট বাদে কীর্তন স্টার্ট হল। আর ধূপের ফ্রেশ ধোঁয়ায় স্পেশাল চেম্বারের সব কিছু ঝাপসা হয়ে যেতে লাগল।

আমার চোখ দুটো জগৎপতির মুখের ওপর ফিক্সড হয়ে ছিল। মহাশয়গণ, দেখুন দেখুন, জগৎপতির মুখটা কত তাড়াতাড়ি চেঞ্জ করে যাচ্ছে। শুদ্ধু ল্যাঙ্গুয়েজে যাকে দিব্যজ্যোতি বলে, তাকে ঘিরে তা-ই ফুটে উঠেছে।

জগৎপতি অনেক ক্ষণ সিলিংয়ের দিকে উর্ধনেত্র হয়ে তাকিয়ে রইলেন। হাত দুটো কোলের ওপর এমন পোজে পড়ে রইল যা বুদ্ধ, চৈতন্য থেকে শুরু করে যেশাস ক্রাইস্টও ভাবতে পারে না।

ব্যাকগ্রাউণ্ডে কেত্তন, খোল-কত্তালে অর্কেস্ট্রা ছাড়া এখন আশেপাশে আর কোনো শব্দ নেই। ফরেনার ছোকরা-ছুকরিগুলো আমারই মতো দম বন্ধ করে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। আমি তাদের কানে কানে বললাম, 'লর্ডের ট্রান্স হচ্ছে।'

ছেলেমেয়েগুলো আস্তে ঘাড় কাত করল, আমার কথা তারা বিশ্বাস করেছে।

পনের কুড়ি মিনিট সিলিং দেখার পর কয়েক সেকেণ্ড চোখ বুজে রইলেন জগৎপতি। তারপর এক ঝটকায় চোখ খুলে ফরেনারদের দিকে তাকালেন। তাঁর চোখে-মুখে-ঠোঁটে-থুতনিতে-দাঁতে এবং গালের কষে ব্রহ্মামার্কা একটি হাসি আস্তে আস্তে ফুটে উঠতে লাগল। তারপর প্রথম যে ছুকরিটা বসে ছিল, তাকে হাত নেড়ে ডাকলেন, 'কাম হিয়ার, মাই চাইল্ড।'

হে-হে মহাশয়গণ, গলা শুনে চমকে উঠলাম। মনে হচ্ছে এই স্পেশাল চেম্বারে নয়, দেড় হাজার কিলোমিটার দূর থেকে প্রভু জগৎপতির গলা ভেসে আসছে। মাকড়া ডেফিনিটলি কোনো সময় ভেনট্রিলোকুইজম প্র্যাকটিশ করত।

ছুকরিটা আস্তে আস্তে উঠে জগৎপতির পায়ের কাছে গিয়ে বসল। জগৎপতি তাঁর মাথায় একখানা হাত রেখে বললেন, 'তোর মনে বড় দুঃখ?'

'হ্যাঁ লর্ড—' মেয়েটা তক্ষুণি ঘাড় হেলিয়ে দিল।

'মা-বাপের কাছ থেকে খুব কষ্ট পেয়েছিস?'

'হ্যাঁ লর্ড।'

'কত দিন মা-বাবাকে দেখিস না?'

'আপনি বলুন না।'

প্রভু জগৎপতি চোখ বুজে বিশ সেকেণ্ড সমাধিস্থ হয়ে থাকেন। তারপর এক ঝটকায় চোখের ড্রপসিন তুলে বলেন, 'টোয়েন্টি ইয়ার্স, তাই না?'

মহাশয়গণ, দেখুন দেখুন, ছুকরিটা একেবারে লাট খেয়ে পড়েছে। চোখ দুটো রাউণ্ড করে পাক্কা দু মিনিট হাঁ হয়ে রইল সে। তারপর চেঁচিয়ে উঠল, 'ফ্যান্টাস্টিক। কুড়ি বছরই মা-বাবাকে দেখি নি।'

'তোর মা ক'বার বিয়ে করেছে?'

'সাত বার। আপাতত একজন বিজনেসম্যানকে বিয়ে করে ফ্র্যাঙ্কফুর্টে আছে। মা এখন জার্মান ন্যাশনাল। সারা বছরে খ্রিস্টমাসের সময় একবার মোটে গ্রিটিং কার্ড পাঠায়। সেই সঙ্গে কিছু উপহার।'

'আর বাবা?'

'বাবা আট বার বিয়ে করেছে। লাস্ট বিয়ে এক স্প্যানিশ ট্রাভেল এজেন্টের সঙ্গে। মায়ের মতো বাবাও ন্যাশনালিটি চেঞ্জ করে মাদ্রিদে আছে। থ্যাঙ্ক গড, আমার বার্থ ডে'টা বাবার মনে আছে। প্রত্যেক জন্মদিনে বাবা কিছু প্রেজেন্টেসনের সঙ্গে ব্লেসিং পাঠায়।'

'পুওর চাইল্ড! মা-বাবার কম্পানি যে না পায় তার দুঃখ রাখার জায়গা ত্রিভুবনে কোথাও নেই।' বলেই জগৎপতি মাকড়া আবার চোখ বুজে ধ্যানস্থ হয়ে গেলেন। তারপর সোজা ঘরের সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে ডান হাতটা তুলে নাড়তে নাড়তে স্যাংস্কৃটে কী যেন মন্ত্র-ফন্ত্র ঝাড়তে লাগলেন। মহাশয়গণ মার্ক করুন, ভাল করে মার্ক করুন, জগৎপতির চোখেমুখে কিরকম সুপার-ন্যাচারাল আলো পাঁচশ' পাওয়ারের বাল্বের মতো ফ্ল্যাশ দিচ্ছে।

পেছনে ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিক আর কেত্তন চলছে সমানে। হঠাৎ ওপর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে জগৎপতির বডিটা একেবারে স্টিফ হয়ে গেল। হাত নাড়াটাও থেমে গেছে। দু'এক মিনিট পরেই তাঁর শরীরে ইলেকট্রিক চার্জ হওয়ার মতো কিছু একটা কারবার ঘটে গেল যেন। টেরিফিক কাঁপতে লাগলেন জগৎপতি। তার মধ্যেই স্রেফ হাওয়া থেকে কী যেন পেড়ে এনে ফরেনার ছুকরিটার দিকে বাড়িয়ে বললেন, 'নে। সব সময় এটা সঙ্গে রাখবি। এটা থাকলে সব দুঃখকষ্ট ঘুচে যাবে।'

মহাশয়গণ, দেখুন দেখুন, হাওয়া থেকে লকেটওয়ালা একটা সরু সোনার চেইন পেড়ে এনেছেন জগৎপতি। দু'হাত পেতে ছুকরিটা সেটা নিয়ে আরেক বার বডি থ্রো দিয়ে জগৎপতির পায়ের ওপর পড়ল।

একটা ব্যাপারে আমার ব্রেনেও চক্কর লেগে গিয়েছিল। জগৎপতি ছুকরির মা-বাবা সম্বন্ধে এভাবে বলল কী করে? পরে জেনে নিতে হবে। যাই হোক, এ রকম একটা সুপার-ন্যাচারাল কারবার দেখে অ্যাপ্রেন্টিস ব্রহ্মচারীরা দুর্ধর্ষ স্পিডে খোল-কত্তাল বাজাতে শুরু করল। গলার স্বর আচমকা দশ পর্দা চড়িয়ে দু মাইল রেডিয়াসের সব কাক-চিল উড়িয়ে দিতে লাগল।

'জয় প্রভুর জয়—
জয় প্রভুজির জয়।
এ সংসারে এমন প্রভু আর কি হবে?
কে দেখেছে এমন গুরু এ পোড়া ভবে!
জয় প্রভুজির জয়—'

ফরেনাররাও সেই কোরাসে গলা মেলাল।

কিন্তু আমি যে আমি—পিটার স্বয়ম্ভু হোড়, একটা চিট, প্রতারক, থার্ড ক্লাস ফোরটোয়েন্টি, ছেলেবেলা থেকে লোকের মাথায় চরকি ঘুরিয়ে আসছি—সেই আমাকেও জগৎপতি বিলকুল 'থ' বানিয়ে দিয়েছেন। এরকম ম্যাজিক লাইফে খুব বেশি দেখি নি। জগৎপতি মাকড়া সাধন-

ফাধনের লাইনে না এসে ম্যাজিকের লাইনে প্র্যাকটিশ চালিয়ে গেলে হুডিনির নাকে ঝামা ঘষে দিতে পারতেন। তাঁর পজিসান অনেক আগেই ঢিলে হয়ে যেত।

আমি ছুকরিটার হাত থেকে সোনার চেইনটা নিয়ে ঝট করে একবার দেখে নিলাম। লকেটের তলায় বউবাজারের এক নাম-করা জুয়েলারি দোকানের স্ট্যাম্প মারা। হে-হে মহাশয়গণ, নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে, দুপুরে একজন অ্যাপ্রেন্টিস ব্রহ্মচারীকে হার-ফার কেনার জন্যে পাঠানো হয়েছিল। প্রভু জগৎপতি তারই একটা হাওয়া থেকে নামিয়ে এনে ছুঁড়িটাকে দিলেন। আমি আর এক সেকেণ্ডও ওয়েট করলাম না। হারটা ছুঁড়িটাকে ফেরত দিয়ে ডাইভ মেরে জগৎপতির পায়ের তলায় লাট খেয়ে পড়লাম। দু পায়ের দুই বুড়ো আঙুল সাঁড়াশির মতো চেপে ধরে অনবরত বলতে লাগলাম, 'লর্ড, এমন কারবার লাইফে কখনও দেখি নি। প্রভু, এ কী লীলা দেখালেন! এ কী দেখলাম!'

জগৎপতি স্বর্গীয় হাসি হাসলেন। তারপর অনেকখানি ঝুঁকে আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিসিয়ে বললেন, 'পা ছাড়ো, আঙুলে তোমার নখ ঢুকে গেছে। ভীষণ ব্যথা লাগছে।'

এক্সাইটমেন্টের ঝোঁকে এত জোরে যে জগৎপতির পা ধরেছি, বুঝতে পারি নি। তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিয়ে নিজের জায়গায় ফিরে এসে বসলাম।

প্রভু জগৎপতি এবার আমেরিকান একটা ছোকরাকে ডাকলেন, 'কাম হিয়ার মাই চাইল্ড।'

ছোকরা কাছে যেতেই জগৎপতি বললেন, 'তোর কপাল দেখে বুঝতে পারছি, তোর বড় কষ্ট রে, বড় কষ্ট।'

ছোকরা উত্তর দেবার আগেই আমি বলে উঠলাম, 'কিসের কষ্ট প্রভু?'

'অ্যাফ্লুয়েন্সের। ওদের প্রচুর প্রপার্টি, ব্যাঙ্কে কোটি কোটি ডলার। এত পয়সা যে কিছুই করার নেই। অ্যাফ্লুয়েন্সের ভেতর থেকে থেকে ছেলেটা হাঁপিয়ে উঠেছে। তাই দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায়।' বলে মুখে করুণ একটা 'পোজ' ফুটিয়ে তুললেন প্রভু জগৎপতি, 'ছেলেটার জন্যে বড় দুঃখ হয়।'

ছোকরা চেঁচিয়ে উঠল, 'আনাথিঙ্কেবল। এরকম সুপার-ন্যাচারাল পাওয়ার কোনো মানুষের ভেতর আমি আগে দেখি নি।'

ছোকরাকে শুধরে দিয়ে বললাম, 'মানুষ না, প্রভু ইজ অলমোস্ট গড। আমাদের সৌভাগ্য যে তিনি আমাদের ভেতর মানুষের চেহারা নিয়ে দর্শন দিয়েছেন।'

ছোকরা ভীষণ ব্যস্তভাবে বলল, 'ইয়েস ইয়েস, হি ইজ গড। লর্ড যা বলেছেন তা টু হানড্রেড পারসেন্ট কারেক্ট। রিয়ালি আমার কিছুই করার নেই।'

আবার প্রভু জগৎপতি সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। তারপর হাওয়া থেকে একটা আংটি পেড়ে এনে ছেলেটাকে দিতে দিতে বললেন, 'এটা সব সময় সঙ্গে রাখবি। নানা দেশে তো ঘুরে বেড়াস। কখন কী বিপদে পড়ে যাবি। এটা কাছে থাকলে কেউ তোর ক্ষতি করতে পারবে না।'

ছোকরা জগৎপতির দুই পায়ের ভেতর নাক ঢুকিয়ে খানিকক্ষণ পড়ে রইল। তারপর উঠে বসে জিজ্ঞেস করল, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করব লর্ড?'

'নিশ্চয়ই।'

'আপনি এই সব হার আংটি কিভাবে হাওয়া থেকে নামিয়ে আনছেন?'

উত্তর না দিয়ে হাসলেন জগৎপতি।

মহাশয়গণ, ছোকরা একেবারে নাছোড়বান্দা টাইপের মাল। জগৎপতির পায়ের সঙ্গে অ্যাডহেসিভের মতো জুড়ে থেকে বলতে লাগল, 'বলুন না লর্ড, দয়া করে মিস্ট্রিটা বলুন না।'

জগৎপতি সেই·স্বর্গীয় হাসিটা আরেক বার হেসে বলেন, 'মিস্ট্রি কিছুই নেই। যা করেছি, সবই যোগবলে।'

'ইউ মিন ইয়োগা?'

'ইয়েস, মাই চাইল্ড।' আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে প্রভু জগৎপতি বলতে লাগলেন, 'যোগের যে কী পাওয়ার, বলে বোঝানো যায় না। যোগের শক্তিতে বাতাসকে জমাট বাঁধিয়ে সোনা করেছি।'

ছোকরার চোখ দুটো একেবারে পারফেক্ট সার্কেল হয়ে গেল। অনেকক্ষণ হাঁ করে থাকার পর সে বলল, 'লর্ড, আমি শুনেছিলাম হাওয়া থেকে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন নিয়ে জল বানানো যায়। কিন্তু সোনার মতো মেটাল বানানো যায়, এ কথা কখনও শুনি নি।'

জগৎপতি বললেন, 'ভারতীয় যোগে সব সম্ভব, মাই চাইল্ড।'

মহাশয়গণ, আপনারা তো জানেনই, আমি একটি উৎকৃষ্ট হারামি, একটা ফোরটোয়েন্টি। অ্যাঞ্জেল মার্কা একটি হাসি ফুটিয়ে ডাকলাম, 'লর্ড—'

ফর্টিফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘাড়টা বাঁকিয়ে আমার দিকে তাকালেন জগৎপতি। বললেন, 'বল বৎস।'

'হাওয়া দিয়ে আপনি ডায়মণ্ড, প্ল্যাটিনাম বানাতে পারেন?'

কপালের ঘাম-টাম মুছবার পোজ করে চোখ কুঁচকে করুণ একটু হাসলেন জগৎপতি। হাসিটার মধ্যে একটা সিগনাল ছিল। আমি সেটা ঝট করে বুঝে নিলাম। জগৎপতি মাকড়া বোঝাতে চাইছেন, উল্টোপাল্টা কথা জিজ্ঞেস করে আমি যেন তাঁকে ক্যাঁচাকলে না ফেলি। আমিও চোখের কান্নিক মেরে তাঁকে জানিয়ে দিলাম, ডায়মণ্ড প্ল্যাটিনামের ব্যাপারে অ্যানসারটা পেয়ে গেলেই আর কোনো প্রশ্ন করব না।

জগৎপতি বললেন, 'হাওয়া দিয়ে আমি ডায়মণ্ড আর প্ল্যাটিনাম বানাতে পারি।'

মহাশয়গণ, জগৎপতির গলা শুনে টের পাচ্ছি, মাকড়া নার্ভাস হয়ে গেছে। আমি আচমকা দু'হাত তুলে কেত্তনের স্টাইলে চেঁচিয়ে উঠলাম :

'জয় জয় জয় প্রভু, জয় জয় জয়
তোমা বিনা এ ওয়ার্ল্ডে সব নয় ছয়
প্রভু জগৎপতি হে।'

আমার গানটা থামার পর জগৎপতি আবার ফরেনারদের দিকে তাকালেন। বললেন, 'ভারতীয় যোগের শক্তিতে হাওয়া দিয়ে যে কোনো মেটাল তৈরি করা যায়। ধুলো দিয়ে যে কোনো প্রেসাস স্টোন বানানো যায়।'

মহাশয়গণ, বিদেশি ছোকরা-ছুকরিরা দম বন্ধ করে শুনে যেতে লাগল।

একটা দুর্ধর্ষ সেক্সি চেহারার আইরিশ মেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এই ইণ্ডিয়ান 'ইয়াগো'র পাওয়ার কি আমরা ফরেনাররা পেতে পরি?'

গলায় প্রচণ্ড জোর দিয়ে জগৎপতি বলে উঠলেন, 'নিশ্চয়ই পার। তবে তার জন্যে অনেক বছরের সাধনা দরকার।'

আমি পাশ থেকে বলে উঠলাম, 'লর্ডকে যদি ধরে থাকতে পার, যা চাইবে তাই পাবে। উনি তোমাদের বিশ্বরূপ দর্শন করিয়ে ছাড়বেন।'

'হোয়াট ইজ বিশ্বরূপ?'

মহাশয়গণ, মহাভারত না বাইবেল, কোথায় যেন আছে শ্রীকৃষ্ণ না কার্তবীর্যার্জুন ওদের কে যেন স্যামসন না অর্জুনকে হোল ওয়ার্ল্ড, শুদ্ধ ভাষায় যাকে স্বর্গ-মর্ত-পাতাল বলে, তাই দেখিয়েছিল। আমি সেই ব্যাপারটা গোটা চারেক সেনটেন্সে বলে দিলাম।

ফরেনারগুলো দারুণ অবাক হয়ে কোরাসে চেঁচিয়ে উঠল, 'ইজ ইট! ইজ ইট!'

'ইয়েস। লর্ডের গায়ে আঠার মতো আটকে থাকো। সব পাবে।'

'সিওর।'

থার্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘাড়টা কাত করে সট করে একবার জগৎপতিকে দেখে নিলাম। মাকড়ার মুখের হাসিটা আরো স্বর্গীয় হয়ে উঠেছে। জগৎপতি বুঝতে পেরেছেন, ইণ্টারন্যাশনাল মার্কেট পাবার রাস্তাটা তাঁর ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে।

যাই হোক, জগৎপতি আবার তাঁর ম্যাজিক স্টার্ট করে দিলেন। যে ক'টা ছোকরা ছুকরি বাকি ছিল, হাওয়া থেকে তাদের সবাইকে একটা করে গোল্ড চেইন বা আংটি দিতে লাগলেন।

যখন জগৎপতির হাতের খেলা চলছে, সেই সময় একটা অ্যাপ্রেন্টিস ব্রহ্মচারী পা টিপে টিপে আমার কাছে এসে কানের ভেতর মুখটা 'ইন' করিয়ে গুজগুজ করে বলল, 'চরাচরপালিকা ধ্যানাসীনা মা অস্থির হয়ে উঠেছেন। তিনি কি এখন এখানে আসবেন?'

বললাম, 'সার্টেনলি। চরাচরপালিকাকে বলবেন, যেভাবে বলেছি, ঠিক সেইভাবে সেই পোজে যেন তিনি চলে আসেন।'

ব্রহ্মচারী চলে গেল। তারপর তিন মিনিটও কাটল না। ঝম ঝমাঝম খোল-কত্তালের ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিক বেজে উঠল। আর দু' হাত তুলে ভরতনাট্যমের সঙ্গে ট্যাঙ্গো মিশিয়ে নাচতে নাচতে আর গাইতে গাইতে জগৎপতির এই চেম্বারে এসে ঢুকল ডোরা। সেণ্টেড ধূপের গাঢ় ধোঁয়ায় গেরুয়া আলখাল্লার ভেতর তার হাই ভোল্টেজ বডি এই ঘরে এক্সট্রা হিট ছড়িয়ে দিচ্ছে।

হে-হে মহাশয়গণ, আপনারা তো একেকটি সাবলাইম হারামজাদা। ডেফিনিটলি বুঝতে পেরেছেন, ডোরার পরনে ব্রা বা অন্য কোনো আণ্ডার-ওয়ার নেই। ফরেনার ছোকরাগুলোর চোখের সামনে যেন চরকি ঘুরে যাচ্ছে, এমনভাবে তারা তাকিয়ে আছে। হারামীগুলোর চোখে ড্রপসিন পড়ছে না।

ডোরা গাইছিল :

'ইটেস জয় ইন ইওর বডি,
ইটস জয় ইন ইওর মাইণ্ড,
সার্চ ইওর জয় ইন বডি অ্যাণ্ড মাইণ্ড।

ওয়াঙ্গ অল রোডস লেড টু রোম,
নাউ অল রোডস লিড টু বেলিয়াঘাটা।
হ্যাভ ফেইথ ইন লর্ড জগৎপতি
লর্ড উইল শো ইউ পাথ টু ইটার্নাল জয়
টেক শেলটার ইন লর্ড।'

গান শুনতে শুনতে একটা কানাডিয়ান ছোকরা আমার মুখে চোখ সেট করে জিজ্ঞেস করল, 'ইনি কে?'

বললাম, 'ইনিই তো আসল। মূলাধার বলে একটা জিনিস আছে, জানো?'

'না তো।'

'ওটা জানতে হলে হিন্দু রিলিজিওনের টেক্সটগুলো পড়ে তোমাকে ডাইজেস্ট করে ফেলতে হবে। তবে এটুকু জেনে নাও, এই বেলেঘাটা আশ্রমের উনিই মূলাধার এবং অলমাইটি।'

কানাডিয়ান ছোকরা ভ্যাবলার মতো চোখ বড় বড় করে আমার দিকে তাকিয়ে বোঝাল যে সে কিছুই বোঝে নি।

মহাশয়গণ, মনে মনে টেরিফিক একখানা খিস্তি ঝেড়ে বললাম, 'মাকড়ারা, তা কেন বুঝবে!' মুখে বললাম, 'তোমরা ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডের মাল, হিন্দু ফিলজফির এই সব টেরিফিক ব্যাপারগুলো ঠিক বুঝতে পারবে না। সে সব বুঝতে হলে ইণ্ডিয়ায়, স্পেশালি এই বেলেঘাটায় লর্ড জগৎপতির পায়ের কাছে দশ বছর বডি ফেলে রাখতে হবে। তবে শর্ট-কাটে একটা কথা জেনে নিতে পার।'

কানাডিয়ানটা জিজ্ঞেস করল, 'কি কথা?'

'এই যাঁকে গান গেয়ে নাচতে দেখছ, উনি হচ্ছেন একটা বিগ ওয়ার্ল্ড পাওয়ার—'বলে চোখের তারা দুটো কর্নারে এনে কানাডিয়ান মাকড়াটাকে দেখতে লাগলাম।

ছোকরা এবার জিজ্ঞেস করল, 'বিগ ওয়ার্ল্ড পাওয়ার বলতে তো আমরা বুঝি আমেরিকা, রাশিয়া—এই সব কান্ট্রিকে।'

বত্রিশটা দাঁত মেলে ডাইনে এবং বাঁয়ে আস্তে আস্তে মাথা নাড়লাম। বললাম, 'ইনি তার চাইতেও বড় পাওয়ার। আণ্ডারস্ট্যাণ্ড?'

ঢ্যাঙা কানাডিয়ান ছোকরার মুখটা হঠাৎ ঘোড়ার মতো লম্বা হয়ে গেল। হাঁ করে পুরো সাড়ে তিন মিনিট আমার দিকে তাকিয়ে রইল সে। তারপর যখন কিছু বলতে যাবে, সেই সময় হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিলাম। শুদ্ধ ভাষায় যাকে স্বর্গীয় বলে, তেমন একটি হাসি ফুটিয়ে বললাম, 'পঞ্চাশ ডিভিসন সোলজার, দশ হাজার ট্যাঙ্ক, দেড় লাখ অ্যাটম বোমা, আশি হাজার

হাইড্রোজেন বোমা, দশ লাখ টর্পেডো, দেড় কেটি নাপাম বোমা, আড়াই কোটি ফাইটার প্লেন—এদের যত ক্ষমতা, ওঁর স্ট্রেংথ তার চাইতে বেশি।'

কানাডিয়ান মাকড়াটার হাঁ আরো চার ইঞ্চি বেড়ে গেল। চোখের তারা দুটো একেবারে ফিক্সড হয়ে গেছে। অনেকক্ষণ পর হুস করে নিঃশ্বাস ফেলে সে বলল, 'মাই গড! আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না।'

মহাশয়গণ, আমি আবার দাঁত বার করলাম। ছোকরার কাঁধে আস্তে করে টুসকি মারতে মারতে বললাম, 'এত সহজে বোঝা যাবে না। আমাদেরই বুঝতে টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স লেগে গেছে। তুমি তো সবে আজই দেখলে!'

ছোকরা এবার জিজ্ঞেস করল, 'একটু বুঝিয়ে বলবেন?'

'ইচ্ছা করলে উনি আমাদের এই ওয়ার্ল্ডকে টোটালি ধ্বংস করে দিতে পারেন, আবার ইচ্ছা করলে এই রকম দু-চারটে ওয়ার্ল্ড ম্যানুফ্যাকচার করতে পারেন।'

'এতটা স্ট্রেংথ ওঁর?'

'ইয়েস—' এবার আমার মাথাটা বাঁ দিকে দেড় মিটার হেলিয়ে দিয়ে বললাম, 'স্পিরিচুয়াল স্ট্রেংথ—'

সেক্সি চেহারার সেই দুর্ধর্ষ আইরিশ ছুঁড়িটা এতক্ষণ চুপচাপ আমাদের কথা শুনছিল। এবার বলে উঠল, 'স্পিরিচুয়াল শক্তি দিয়ে এত সব করা যায়!'

মহাশয়গণ, ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে মুখে মিস্টিরিয়াস হাসি ফুটিয়ে তুললাম। বললাম, 'ইণ্ডিয়ানরা স্পিরিচুয়াল স্ট্রেংথ দিয়ে কী করতে পারে তা ভাবতে পারবে না।'

আমাদের কথাগুলো অন্য ছোকরা ছুকরিরাও শুনছিল। তারা সবাই এবার নিজেদের মধ্যে গুজগুজ করে চাপা গলায় একটা কনফারেন্স করে নিল। তারপর ওদের রিপ্রেজেণ্টেটিভ হিসাবে সেই কানাডিয়ান ছোকরা বলে উঠল, 'ইণ্ডিয়ান ইয়োগীদের অনেক ক্ষমতা আছে শুনেছি। কিন্তু তুমি যেরকম ক্ষমতার কথা বললে, অতটা শুনি নি।'

'কী করে শুনবে? লর্ড জগৎপতি আর চরচরপালিকা ধ্যানাসীনা মা তো সবে কিছুদিন হল গ্রেট হিমালয়াজের গুহা থেকে সাধনা কমপ্লিট করে নেমে এসেছেন। তাঁদের নামের এখনও পাবলিসিটি হয় নি। তাই তোমরা শোন নি।'

'হু ইজ চরাচরপালিকা ধ্যানাসীনা মা?'

ডোরাকে দেখিয়ে বললাম, 'উনি।'

ছোকরা বলল, 'লর্ড জগৎপতি আর চরাচরপালিকার মধ্যে রিলেশান কী?'

বললাম, 'দু' জনে মিলে একটা ইউনিট। স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ডে টেরিফিক রেভোলিউশান ঘটাবার জন্য ওঁরা হাত মিলিয়েছেন। ওঁরা ইস্ট-ওয়েস্ট-নর্থ-সাউথ—হোল ওয়ার্ল্ডকে জয় করার জন্য জয়েন্ট ভেঞ্চার নিয়েছেন। যোগী আর যোগিনী এক হলে কিচাইন হয়ে যায়।'

'হোয়াট ইজ কিচাইন?'

'একটা টেরিফিক ব্যাপার। সে সব বুঝতে হলে লর্ড জগৎপতি আর চরাচরপালিকা ধ্যানাসীনা মায়ের শিষ্য হয়ে মিনিমাম দশটা বছর কাটিয়ে দিতে হবে। পারবে?' বলে চোখের

তারা দুটো কোণের দিকে এনে কান্নিক মেরে ফরেনার মালগুলোর দিকে তাকালাম।

মহাশয়গণ, আবার ছোকরা ছুকরিগুলো নিজেদের মধ্যে গুজগুজ করে আরেক রাউণ্ড কনফারেন্স করে নিল। তারপর আমার দিকে ফিরে প্রায় কোরাসেই বলে উঠল, 'অলমোস্ট আমরা ঠিকই করে ফেললাম, প্রভু জগৎপতি আর চরাচরপালিকা ধ্যানাসীনা মায়ের শিষ্য হব। আমরা ক্যালকাটায় এখনও দশ বার দিন আছি। তার ভেতর আপনাকে আমাদের ফাইনাল ডিসিসানটা জানিয়ে যাব। ও-কে?'

'আমাকে জানাতে হবে না—' চোখের তারা দুটো দুর্ধর্ষ স্পিডে একবার ডাইনে আরেক বার বাঁয়ে এনে ডোরা এবং জগৎপতিকে দেখিয়ে বললাম, 'প্রভু আর মাকে জানিয়ে দিলেই হবে।'

'অলরাইট।'

'আরেকটা কথা—'

'কী?'

'মা আর লর্ডের শিষ্য হলেই চলবে না কিন্তু—'

'কি করতে হবে?'

'তোমাদের কান্ট্রিতে প্রভু আর মায়ের গসপেল প্রচারের জন্য বেলেঘাটা আশ্রমের ব্রাঞ্চ খুলতে হবে।'

'সিওর, সিওর।'

'থ্যাঙ্কস।'

বলে হামাগুড়ি দিয়ে জগৎপতির কাছে এগিয়ে গেলাম। আমি মুখ খুলবার আগেই প্রভু আমার কানের ভেতর মুখ রেখে সেকেণ্ডে দশটা করে ওয়ার্ড ঢুকিয়ে দিতে লাগলেন, 'তোমার জবাব নেই স্বয়ম্ভু। ওয়ার্ল্ডে তোমার জুড়ি আমি আর দেখি নি। তুমি ইচ্ছা করলে যা খুশি করতে পার। আম যে তোমার কাছে কতখানি কৃতজ্ঞ, বলে বোঝাতে পারব না।'

বললাম, 'বোঝাতে হবে না লর্ড। ও ব্যাপারটায় জিভে ব্রেক কষে দিন। আপনাকে কথা দিয়েছিলাম, ইণ্টারন্যাশনাল মার্কেট পাইয়ে দেব। ইওরোপ আর আমেরিকা আপনার পায়ে বডি থ্রো দেবার জন্যে রেডি। এই মালগুলোকে ভাল করে খেলিয়ে তুলুন। নিজের কানেই তো শুনলেন, ওরা স্পেনে কানাডায় সুইজারল্যাণ্ডে ইতালিতে—হোল ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে আপনার জন্য ব্রাঞ্চ খুলবে।'

জগৎপতি গুজগুজিয়ে বললেন, 'আমি কি এত সব পারব? তুমি এতটা করলে, বাকিটুকুও তোমাকে করে দিতে হবে স্বয়ম্ভু।'

মহাশয়গণ, জগৎপতি কিরকম খলিফা, একবার মার্ক করুন। তাঁর জন্য এতটা কারবার করলাম, এখন বলে কিনা হোল ইণ্টারন্যাশনাল মার্কেটটা তাঁর হাতের মুঠোয় এনে দিতে হবে।

ডাইনে এবং বাঁয়ে—দু'ধারে মাথা দোলাতে দোলাতে বললাম, 'ইমপসিবল লর্ড।'

'ইমপসিবল কেন?'

'আমার আরো ডজন ডজন অ্যাসাইনমেণ্ট আছে। আপনার মতো আরো অনেক

মাকড়া—স্যরি লর্ড—মাকড়া কথাটা হড়কে আমার জিভ থেকে বেরিয়ে এসেছে। জানেনই তো, আমি একটা থার্ড ক্লাস খজড়া, আমার মুখটা একটা পচা ড্রেন। এই আপনার পায়ে ধরছি—'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। তুমি আমার এত উপকার করেছ। ঐ কথাটা বলার জন্য আমি কিছুই মনে করছি না। কিন্তু তুমি হাত গুটিয়ে নিলে আমি কি সব গুছিয়ে নিতে পারব?'

বললাম, 'খুব পারবেন। ইণ্টারন্যাশনাল মার্কেটের জন্য সব ইনফ্রাস্ট্রাকচার বানিয়ে দিয়েছি। এবার ফায়দা তুলে ফেলুন। অনেক ক্ষণ এসেছি, আর থাকতে পারব না।'

উঠতে যাচ্ছিলাম, জগৎপতি চোখের সিগনাল দিয়ে বসিয়ে দিলেন। বললেন, 'যদি আমি সব দিক ম্যানেজ করে নিতে না পারি?'

'তখন আমাকে ডাকবেন।'

'আসবে তো?'

'সিওর। তা হলে লর্ড এবার পারমিসান দিন—আমি যাই।'

পাঁচশ' গ্রাম কুইনিন গেলার পর যেমন হয়, সেরকম মুখ করে জগৎপতি বললেন, 'থাকতে যখন চাইছ না, তখন আর কী বলব! যাও—'

আমি উঠতে উঠতে বললাম, 'ফরেনারগুলো আপনার লীলা-টীলা দেখে এমনিতেই কাত হয়ে আছে। আরেকটু ম্যাজিক-ফ্যাজিক দেখিয়ে আর বাণী-টাণী ঝেড়ে ওদের একেবারে শুইয়ে দিন। তা ছাড়া টেন থাউজ্যাণ্ড ভোল্টের একখানা জিনিস আপনাকে সাপ্লাই করেছি—' বলে কান্নিক মেরে ডোরাকে দেখিয়ে দিলাম।

ডোরার দিকে এক সেকেণ্ড তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিলেন প্রভু জগৎপতি। স্লাইট লজ্জা পেলেন যেন। তারপর বললেন, 'তা অবশ্য দিয়েছ। ডোরা আমাকে যথেষ্টই সাহায্য করতে পারবে বলে মনে হয়।'

'ডোরা বলে গোটা ব্যাপারটা কিচাইন করে দেবেন না লর্ড, বলুন চরাচরপালিকা ধ্যানাসীনা মা—'

জগৎপতি একেবারে হকচকিয়ে গেলেন। দারুণ ব্যস্তভাবে বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, চরাচরপালিকা—'

'চরাচরপালিকা আর আপনি, দু'জনে মিলে ফরেনারগুলোকে এবার কমপ্লিট ফ্ল্যাট করে ফেলুন। আমি চলি—'

আমি আর বসলাম না, স্ট্রেট দাঁড়িয়ে পড়লাম। তারপর বিদেশি ছোকরা ছুকরিগুলোকে 'গুড-বাই' করে বেলেঘাটা আশ্রম থেকে বেরিয়ে এলাম।

আধঘণ্টা বাদে গড়িয়াহাটার অ্যাপার্টমেণ্টে সবে ডিভানে বডি ফেলে একটু রেস্ট নিচ্ছি, টেলিফোন বেজে উঠল। মহাশয়গণ, এখন কে আবার ফোন করতে পারে? অভ্যুদয় মিটার কি? তার এম. এল. এ হবার বারটা তো বাজিয়েই দিয়েছি। অবশ্য মকড়া এখনও রুরাল এরিয়া, মানে গ্রাম-ট্রাম থেকে ইলেকশানে নামতে চাইছে। ঠিক আছে, নামো শ্লা, তারপর কী করে তোমার বজা ঢিলে করে দিতে হয়, তা আমার জানা আছে। কিন্তু অভ্যুদয় কি এত তাড়াতাড়ি

আবার ইলেকশানের জন্য খেপে উঠবে?

চোখ কুঁচকে টেলিফোনটা শেষ পর্যন্ত তুলেই নিলাম। 'হ্যালো' বলতেই লাইনের ওধার থেকে সমাজপতির গলা ভেসে এল, 'কে, স্বয়ম্ভু? '

'হ্যাঁ স্যার।'

'তুমি কী করছ এখন?'

'রেস্ট নিচ্ছি।'

'কষ্ট করে এক্ষুণি আমার এখানে চলে এস। এখানেই রেস্ট নিও। খুব জরুরি দরকার।'

'স্যার, খানিকক্ষণ আগে আমার নার্ভের ওপর দিয়ে সাইক্লোন বয়ে গেছে। তিন খোরা সোনার বাংলা না খেয়ে এখন কোথাও বেরুতে পারব না।'

'এখানে তোমার জন্য সোনার বাংলার অ্যারেঞ্জমেণ্ট করে রেখেছি।'

'আপনার জবাব নেই স্যার। আপনি একটা টেরিফিক হারামী—'বলেই ঝ ট করে ছ ইঞ্চি জিভ কেটে ফেললাম। বললাম, 'এক্সকিউজ মাই ল্যাঙ্গুয়েজ স্যার—'

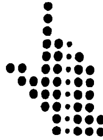
সমাজপতি বস্তির ছোকরাদের মতো বললেন, 'আর খজড়ামো না করে চলে এস।' মেজাজে থাকলে তার স্টমাক থেকে দু চারটে উৎকৃষ্ট খিস্তি ফিস্তি সোডার গ্যাসের মতো বেরিয়ে আসে।

'ঠিক আছে স্যার—' তারপর ফোনটা ক্রেডেলে রাখতে গিয়ে সট করে কী মনে পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, 'স্যার, আপনার ওখানে, মানে আপনার বাড়ি যাব কী?'

সমাজপতি বললেন, 'ঐ দেখ, তাড়াহুড়োয় আসল কথাটাই বলতে ভুলে গেছি। তুমি থিয়েটার রোডে আমার সেই ফ্ল্যাটে চলে এস।'

'আচ্ছা স্যার।'

টেলিফোন নামিয়ে ডিভান থেকে বডিটা টেনে তুললাম। সমাজপতি আবার কী ঝামেলায় ফেলবেন, কে জানে।



মহাশয়গণ, আমি যখন থিয়েটার রোডে সমাজপতির আরেক অ্যাপার্টমেণ্ট হাউসে হাজির হলাম, রাস্তায় ক্যালকাটা কর্পোরেশনের আলোগুলো জ্বলে উঠেছে। আধ ঘণ্টা আগে সন্ধে নেমে গিয়েছিল। এখন সাড়ে ছটা বাজে।

আপনাদের ডেফিনিটলি মনে আছে, কয়েক মাস আগে সমাজপতি থিয়েটার রোডের এই হাই-রাইজ বিল্ডিংয়ের ফোরটিনথ ফ্লোরের এই স্যুইটে আমার জন্য একটা টেরিফিক পার্টি থ্রো করেছিল। আমি স্ট্রেট কমপাউণ্ডের ভিতর আমার লিমুজিনটাকে পার্ক করে লিফট বক্সে ঢুকে তের নম্বর বোতাম টিপে দিলাম। পুরো দু মিনিটও লাগল না, পনের তলায় এসে কলিং বেলে আঙুলের প্রেসার দিতে না দিতেই দরজা খুলে সামনে দাঁড়াল একটা দারুণ স্মার্ট চেহারার

নেপালি বেয়ারা।

নেপালিটার দুর্দান্ত মেমোরি। এই স্যুইটে আমি বেশি আসি নি কিন্তু দেখামাত্রই সে চিনতে পারল। লম্বা একটা স্যালুট হাঁকিয়ে বলল, 'আইয়ে সাহাব—'

দরজার ওপারে প্যাসেজ। সেখান থেকে পুরু পার্সিয়ান কার্পেট পাতা। পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই আট ইঞ্চির মতো ঢুকে গেল। প্যাসেজ ধরে কয়েক ফুট যেতেই বিশাল ড্রাইং রুম। হে-হে মহাশয়গণ, আপনারা এই ড্রইং রুমটা আগেই দেখেছেন। কাজেই আরেক বার ড্রেসক্রিপশান দেবার মানে হয় না।

এখানে সমাজপতি মাকড়া তাঁর ফ্রেণ্ডদের নিয়ে বসে আছেন। এঁদের সবাইকেই আপনারা চেনেন। যেমন অভ্যুদয় মিটার, সামতানি, আগরওয়াল, এটসেট্রা। এঁরা ছাড়া একটা ইয়াং ছোকরাকেও দেখা গেল। দুর্দান্ত চেহারা, ছ'ফুটের মতো হাইট, বয়েস টোয়েন্টি-ফাইভ টোয়েন্টি-সিক্স, বডিতে এক মিলিগ্রাম বাজে ফ্যাট নেই, নাকমুখ শার্প। যে স্যুটটা পরে আছে তার মার্কেট প্রাইস কম করে দেড় থেকে দু হাজার টাকা। মহাশয়গণ, এই মালটাকে আগে আর কখনও দেখি নি।

আমাকে দেখেই সমাজপতি অ্যাণ্ড কোম্পানি কোরাসে চেঁচিয়ে উঠল, 'ওয়েলকাম, মোস্ট ওয়েলকাম—'

'থ্যাঙ্ক ইউ মাই বসেস—' বলে খালি সোফায় বডি ফেলে দিলাম।

সামতানি বললেন, 'সমাজপতি সাহেবের কাছে শুনলাম, তুমি একটা সুপার্ব কাজ করছ।'

এই খজড়াটাকে দেখলে পার্ক স্ট্রিটের সেই বিরাট বাড়িটার কথা মনে পড়ে যায়। ওখানেই বোদা আর আমি এক মিড-নাইটে পুলিশের ফাঁদ থেকে বাঁচিয়ে সুমনাকে আগরপাড়ার ব্যারাক বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলাম। ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী কাজ স্যার?'

'আমাদের গুরুদেব প্রভু জগৎপতিকে ইণ্টারন্যাশনাল মার্কেট পাইয়ে দিয়েছ। য়ু আর গ্রেট।'

সামতানির মুখে ফ্ল্যাটারিটা খারাপ লাগল না। বললাম, 'থ্যাঙ্ক য়ু স্যার। কিন্তু—'

'কী?' সামতানি চোখের কর্নার দিয়ে আমাকে দেখতে লাগলেন।

'জগৎপতি কি আপনারও গুরুদেব?'

সমাজপতিকে দেখিয়ে সামতানি বললেন, 'স্যারের যখন গুরুদেব তখন আমাদেরও গুরুদেব হতে বাধ্য। তাঁর সঙ্গে যাঁর যা রিলেশান, আমাদের সঙ্গেও ঠিক সেই রিলেশান।'

মাকড়া বলে কি! সমাজপতির সঙ্গে মিসেস সমাজপতির যা সম্পর্ক, সামতানি হারামীটা তা ক্লেম করে বসবে নাকি? বললাম, 'এই রিলেশান থেকে মিসেস সমাজপতি নিশ্চয়ই বাদ।'

সামতানি প্রথমটা বুঝতে পারেন নি। ঠিক পাঁচ সেকেণ্ড বাদে সোফা থেকে প্রায় তিন ফুট লাফিয়ে উঠলেন। জিভ কেটে কানে হাত দিয়ে বললেন, 'উনি আমাদের মায়ের মতো—অ্যাজ গুড অ্যাজ আওয়ার মাদার।'

সমাজপতি দারুণ মজা পেয়ে গিয়েছিলেন। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে, এক

চোখ বুজে ফিচলেমির ভঙ্গিতে আমাকে বললেন, 'তুমি একটি উৎকৃষ্ট হরামী স্বয়ম্ভু।'

মহাশয়গণ, এত বড় একটা কমপ্লিমেণ্ট পাবার পর উত্তর দেবার আর মানে হয় না। আমি চুপ করে রইলাম।

এদিকে সেই নেপালি বেয়ারাটা ট্রে-তে করে গেলাসে স্কচ নিয়ে এসেছে। তবে আমার জন্য দুর্ধর্ষ একটা জাপানি প্লেটের ওপর মাটির খোরায় সোনার বাংলা বোঝাই করে এনেছে। মাস দুই তিন হল আমি সমাজপতি অ্যাণ্ড কেম্পানির সঙ্গে কারবার করছি। এর মধ্যে ওরা জেনে গেছে আগ-মার্কা সোনার বাংলা বা ধান্যেশ্বরী ছাড়া আমার ঠিক জুত হয় না।

বেয়ারাটা ঘুরে ঘুরে ড্রিংক আর চাট সার্ভ করে গেল। খেতে খেতে সমাজপতিকে ডাকলাম, 'স্যার—'

সমাজপতি আমার দিকে তাকালেন, 'বল।'

'কী একটা আরজেণ্ট ব্যাপারের জন্য যেন ডেকেছিলেন—'সেনটেন্সটা কমপ্লিটা না করে থেমে গেলাম।

সমাজপতির মনে পড়ে গেল। রীতিমত ব্যস্তভাবে বললেন, 'রাইট রাইট।' বলতে বলতে তক্ষুণি উঠে দাঁড়ালেন এবং কয়েক স্টেপ সামনের দিকে এগিয়ে এসে সেই দুর্দান্ত স্মার্ট চেহারার ইয়াং ছোকরাটার কাছে গিয়ে বললেন, 'এস মহেশ।'

মহেশ ড্রিংকের গেলাস পাশের টেবলে নামিয়ে উঠে পড়ল। সমাজপতি সোজা তাকে সঙ্গে করে আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, 'লুক স্বয়ম্ভু। এ হল মহেশ—মহেশ সামতানি। আমাদের ফ্রেণ্ড গিরীশ সামতানির ওনলি সান। হি ইজ আ ব্রাইট ইয়াং ম্যান, লণ্ডনে বিজনেস করছে। রিসেণ্টলি ক্যালকাটায় এসেছে। আজকের এই পার্টি ওরই অনারে।'

মহাশয়গণ, সমাজপতি আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। কাজেই মাটির খোরায় যে সোনার বাংলাটুকু পড়ে ছিল, ঝট করে স্টমাকে চালান করে উঠে পড়তে হল। বাঁ হাতের চেটো দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বললাম, 'নাইস, নাইস, ভেরি নাইস।'

সমাজপতি থামেন নি, সমানে বলে যেতে লাগলেন, 'এই পার্টির একটা পারপাস আছে।'

'কী পারপাস?'

'তোমার সঙ্গে ওর আলাপ করিয়ে দেওয়া।' বলে মহেশের দিকে ফিরলেন সমাজপতি, 'মহেশ, নাউ মিট পিটার স্বয়ম্ভু হোড়। স্বয়ম্ভুর কথা তোমাকে আগেই বলেছি।'

মহেশ আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। আমিও হাত বাড়িয়ে তার হাতটা ক্যাচ করলাম। মহেশ বলল, 'গ্ল্যাড টু মিট যু—'

আমিও তার গলা নকল করে বললাম, 'ইটস আ প্লেজার টু মিট যু—'

'সমাজপতি আঙ্কল, আমার ড্যাডি, মিটার আঙ্কল, আগরওয়াল আঙ্কেল—এবার ক্যালকাটায় এসে এঁদের সবার কাছে আপনার কথা শুনলাম। সবাই জানালেন, আপনি একটা রিয়াল জিনিয়াস, আ সুপারম্যান।'

খজড়ামো করে ঘাড়টা ঝুঁকিয়ে বললাম, 'ওঁরা আমাকে স্নেহ করেন, তাই বাড়িয়ে বলছেন। আমি জিনিয়াস ফিনিয়াস নই, একজন থার্ড ক্লাস মাকড়া।'

'হোয়াট ইজ মাকড়া?'

আমি উত্তর দেবার আগেই সমাজপতি বলে উঠলেন, 'সবে ক্যালকাটায় এসেছ। ক'দিন থাকো, মাকড়া কী চিজ, ঠিক বুঝতে পারবে। এনিওয়ে স্বয়ম্ভু—'সমাজপতির চোখ দুটো এবার আমার মুখের ওপর ফিক্সড হল।

'বলুন স্যার—' আমিও স্ট্রেট সমাজপতির চোখের দিকে তাকালাম।

'মহেশ তোমার সঙ্গে শুধু আলাপ করতে চায় না, ওর বিজনেসে তোমার অ্যাকটিভ হেল্প চায়।'

মহাশয়গণ, সিজমোগ্রাফ বলে একরকম মেশিন আছে। তাতে আমাদের এই ওয়ার্ল্ডের মাটি স্লাইট কাঁপলেও নাকি ধরা পড়ে। আমার ভেতরেও ঐ টাইপের একটা কিছু আছে। মহেশ সামতানি এমন কিছু কারবার করে যা ফেয়ার নয়, রীতিমত আণ্ডার ওয়ার্ল্ডের ব্যাপার। তা না হলে আমার মতো একটা ফোরটোয়েন্টি, একটা থার্ড ক্লাস চিটের হেল্প চাইবে কেন? নার্ভগুলো টান টান করে জিজ্ঞেস করলাম, 'জুনিয়ার সামতানি কী বিজনেস করেন?'

সমাজপতি বললেন, 'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা হয় না। লেটস টেক আওয়ার সিটস। ড্রিংক সিপ করতে করতে কথা হোক।'

সবাই বসে পড়লাম। বেয়ারা খোরা বোঝাই করে আবার সোনার বাংলা দিয়ে গেল। সেই সঙ্গে চিজ পকোড়া, ফিশ ফিঙ্গার, কাবাব এবং কাজু বাদাম, ইত্যাদি ইত্যাদি।

খেতে খেতে সমাজপতি বললেন, 'মহেশের বিজনেস সম্পর্কে তোমাকে আইডিয়া দেওয়া দরকার।'

'সিওর স্যার—'টেরিফিক উৎসাহ দেখিয়ে বললাম, 'নইলে ওঁকে হেল্প করব কী করে?'

সমাজপতি একটা কাবাবের পুরোটা কোঁত করে গিলে তিন চুমুক স্কচ খেলেন। আগেও মার্ক করেছি, পাকস্থলীতে এক দেড় পেগ মাল ঢুকতে না ঢুকতেই হারামীটা টিপসি হয়ে যায়। আজও দেখলাম, দু পেগ ফিনিশ করার আগেই তার চোখ লালচে হয়ে উঠেছে, মাথা অল্প অল্প টলছে। তবে এর পর দশ পেগ টানলেও আর কোনো এক্সট্রা রিঅ্যাকশান হবে না। দু পেগেও যা, আঠার পেগেও তাই।

সমাজপতি গলা খাঁকরে এক সময় স্টার্ট করলেন, 'তোমাকে আগেই বলেছি, মহেশ ইজ বেসড অ্যাট লণ্ডন। লণ্ডনে হেড কোয়ার্টার হলেও ওর বিজনেসের নেটওয়ার্ক হোল ইউরোপ আর আমেরিকা জুড়ে।' একটু থেমে কিছু ভেবে আবার শুরু করলেন, 'ওর বিজনেসের নাম 'এক্সচেঞ্জ প্রোজেক্ট'।

'কী এক্সচেঞ্জ করেন উনি?' আমি পিটার স্বয়ম্ভু হোড়, ওয়ার্ল্ডের কোনো ব্যাপারেই যার এতটুকু আগ্রহ নেই, তারও কৌতূহল মহেশের কাজ-কারবার সম্পর্কে। তাই ফস করে প্রশ্নটা করে বসলাম।

হাতটা তুলে আঙুল নাচাতে নাচাতে সমাজপতি বললেন, 'আই অ্যাম কামিং টু দ্যাট পয়েন্ট। মহেশের বিজনেস হল ইণ্ডিয়ার পুরনো আর্ট-অবজেক্ট নিয়ে।'

'কাইণ্ডলি একটু পরিষ্কার করে বলুন।'

'সিওর।'একটা সিম্পল উদাহরণ দিই। হাজার, দেড় হাজার বছর আগে আমাদের কান্ট্রিতে সেই হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত হাজার হাজার টেম্পল তৈরি হয়েছে। সেই সব টেম্পলের গায়ে সেকালের আর্টিস্টরা, স্কালপটররা ছোট বড় নানারকম বিউটিফুল মূর্তি তৈরি করেছে। দেবদেবীর মূর্তি, যক্ষিণীর মূর্তি, নর্তকীর মূর্তি—'

সমাজপতির লাস্ট সেনটেন্সটা আর শেষ করতে দিলাম না। মাঝামাঝি জায়গাতেই চেঁচিয়ে উঠলাম, ' বুঝেছি—বুঝেছি স্যার।'

সমাজপতি একটু বিরক্তই হলেন, 'কী বুঝেছ?'

'ঐ সব মূর্তি লোক লাগিয়ে খুলে বা ভেঙে এনে ফরেনে পাচার করে দেন জুনিয়র সামতানি। এই বিজনেসই তো ওঁর?'

সমাজপতি এবার দারুণ খুশি হলেন। বললেন, 'রাইট, রাইট। ঠিক ধরেছ।' মহেশকে বললেন, 'দেখলে তো, কেন ওকে জিনিয়াস বলেছিলাম। কেউ হাঁ করলে ও তার তলপেটের লাস্ট বাউণ্ডারি পর্যন্ত দেখতে পায়। ফ্যানটাস্টিক।'

'আচ্ছা স্যার, ইণ্ডিয়ার টেম্পলগুলোর বারটা বাজাবার জন্যে ক' স্কোয়াড্রন লোক লাগিয়েছেন জুনিয়র সামতানি?'

'দু'শ লোক তো বটেই।'

'ফাইন। আপনি বললেন, জুনিয়র সামতানির বিজনেসটা এক্সচেঞ্জের। উনি ইণ্ডিয়ার মূর্তিটুর্তির বদলে ডেফিন্টিলি ইউরোপ আমেরিকার পুরনো আর্ট অবজেক্ট কালেক্ট করেন?'

'নো, নো—' জোরে জোরে ডাইনে এবং বাঁয়ে মাথা ঝাঁকালেন সমাজপতি।

'তা হলে?' সারা মুখে নিষ্পাপ অ্যাঞ্জেল মার্কা একটা ভাব ফুটিয়ে তাকিয়ে রইলাম।

সমাজপতি বললেন, 'মহেশ আমাদের এইসব মূর্তিটুর্তির সঙ্গে এক্সচেঞ্জ করে কী নেয় জানো?'

'কী?'

সমাজপতি মাকড়া এবার আমার কানের কাছে মুখ এনে ডিফেন্সের কোনো সিক্রেট প্ল্যান ফাঁস করার মতো ফিসফিসিয়ে বললেন, 'মার্ক, ডলার, পাউণ্ড, লিরা, এটসেট্রা। এবার ক্লিয়ার হয়েছে তো?'

আমি ঘাড়টা পঞ্চাশ সেন্টিমিটার হেলিয়ে দিলাম। বললাম, 'হানড্রেড পারসেণ্ট।'

মুখটা আমার কানের কাছ থেকে সরিয়ে শিরদাঁড়া পারপেণ্ডিকুলারের মতো স্ট্রেট করে বসলেন সমাজপতি। তিরিশ সেকেণ্ডর ভেতর আরেকটি পুরো পেগ স্কচ, এক ডজন ফিশ ফিঙ্গার, চারটে কাবাব পাকস্থলীতে চালান করে বললেন, 'ব্যাপারটা কি জানো স্বয়ম্ভু, আমাদের কান্ট্রিতে আর্টের ভাল সমঝদার নেই। কনয়েসিয়ার যদি চাও তবে তোমাকে ডেফিনিটলি ইয়োরোপ আমেরিকায় যেতে হবে। আর্ট টার্টের কদর দিতে ওরা জানে।'

'ইণ্ডিয়ার মূর্তিগুলোর জন্যে খুব দাম দেয় বুঝি?'

'ডেফিনিটলি। এত পয়সা দেয় যে তুমি ভাবতে পারবে না।'

হে-হে মহাশয়গণ, সমাজপতির ব্যাগুওয়াগনে যে মালেরা আছে, তাদের কারবারটা বুঝতে

পারছেন তো। হারামীগুলো ইণ্ডিয়ার গোল্ডেন গ্লোরিয়াস অতীতকে ইয়োরোপ আর আমেরিকার কাছে ঝেড়ে দিচ্ছে। বললাম, 'আমাদের কান্ট্রি থেকে কত মূর্তি ফরেনে হাপিস করেছেন?'

সমাজপতির বডি সেমি-সার্কেলে মহেশ সামতানির দিকে ঘুরে গেল। বললেন, 'হাউ মেনি মহেশ?'

পুরো হিসেব মহেশের মেমোরিতেই আছে। এক সেকেণ্ডও না ভেবে সে বলল, 'টু হানড্রেড ফিফটি ওয়ান।'

শুনুন মহাশয়গণ, স্রেফ শুনে যান। সমাজপতি অ্যাণ্ড কোম্পানি যেভাবে চালিয়ে যাচ্ছে, তাতে এই সেঞ্চুরির মধ্যেই আপনারা দেখতে পাবেন হোল ইণ্ডিয়ান কালচার বিক্রি হয়ে গেছে। টোটাল সেল আউট।

খানিকক্ষণ চুপচাপ।

তারপর দুম করে কিছু মনে পড়ে যেতে সমাজপতি বলে উঠলেন, 'তুমি হয়ত ভাবছ, আমরা অ্যান্টি-ন্যাশনাল, দেশের কুলাঙ্গার। দেশের ভাল ভাল জিনিস ফরেনারদের হাতে তুলে দিচ্ছি। আমরা রাসকেল, বাস্টার্ডস, কুকুরের পাল—'

'নো, নো, নো—' আঙুল তুলে মাকড়াকে থামিয়ে দিলাম।

সমাজপতি হকচকিয়ে গেলেন। চোখ কুঁচকে আমাকে দেখতে দেখতে বললেন, 'কী হল?'

'আপনারা বাস্টার্ড, অ্যান্টি-ন্যাশনাল বা কুকুরের পাল না।'

'তা হলে কী আমরা?'

মহাশয়গণ, সারা মুখে ওয়ার্ল্ডের আগ-মার্কা পবিত্র হাসিটি ফুটিয়ে বললাম, 'আপনারা ইণ্ডিয়ান নন।'

সমাজপতি ফের জিজ্ঞেস, করলেন, 'তবে আমরা কী?'

'আপনারা স্যার একেবারে ওয়ার্ল্ড সিটিজেন। আপনাদের কোনো ন্যাশনালিটি নেই। আপনারা একেকখানা ইন্টারন্যাশনাল মাল। ওয়ার্ল্ডের যে কোনো কান্ট্রিই আপনাদের কান্ট্রি আপনাদের কাছে ইণ্ডিয়ার ফ্যানটাস্টিক মূর্তিগুলো মহাবলীপুরম বা ভুবনেশ্বরে থাকাও যা, সানফ্রান্সিসকো কি রোমে কি বার্লিনে থাকাও তাই।'

'আরেকটু ক্লিয়ার করে বল।'

'ইণ্ডিয়ার ঐ সব ভাল ভাল মূর্তিগুলোর মালিক একা ইণ্ডিয়া হতে পারে না। ওগুলো হোল ওয়ার্ল্ডের প্রোপার্টি। আপনারা এখানকার মাল ওখানে পাচার করে মানুষকে টেরিফিক সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছেন।'

সমাজপতি আসল আর নকল মিলিয়ে বত্রিশটা দাঁত বার করে টেনে টেনে হাসতে লাগলেন। বললেন, 'ফাইন বলেছ, আমরা রিয়ালি ইন্টারন্যাশনাল, অ্যাণ্ড ওয়ার্ল্ড সিটিজেন।'

'এবার কাইগুলি বলুন জুনিয়র সামতানিকে আমি কিভাবে হেল্প করব?'

সমাজপতি যা উত্তর দিলেন তা এইরকম। ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট আজকাল পুরনো মন্দির টন্দিরগুলোর ওপর কড়া নজর রাখছে। তাদের চোখে ধুলো ছিটিয়ে মূর্তি-ফুর্তি নিয়ে আসা

খুবই মুশকিল। তবে জুনিয়র সামতানির যে স্কোয়াড আছে, তারা রীতিমত ট্রেনইড্ দুর্দান্ত এফিসিয়েন্ট। তারা মন্দির থেকে মূর্তি ঠিকই খসিয়ে আনছে। কিন্তু এগুলো কন্ট্রির বাইরে পাচার করা আরেক ঝামেলা। পোর্টে, এয়ারপোর্টে আর বর্ডারগুলোতে ভিজিলান্সের লোকেরা ডে অ্যাণ্ড নাইট নজর রাখছে।

সমাজপতি বললেন, 'কিভাবে এই সব আর্ট অবজেক্ট ইণ্ডিয়ার বাইরে চালান করা যায়, তার একটা মাস্টার প্ল্যান তোমাকে করতেই হবে।'

'ও-কে স্যার, নো প্রবলেম।' এক সেকেণ্ডও না ভেবে আমি ঘাড় কাত করলাম।

'ফাইন. ফাইন।' সমাজপতি মহেশের দিকে ফিরে বললেন, 'মহেশ, তোমার আর কোনো চিন্তা নেই। স্বয়ম্ভু যখন রেসপনসিবিলিটি নিয়েছে, ইণ্ডিয়ার টেম্পলগুলো থেকে তোমার স্কোয়াড যত পারে মূর্তি খুলে আনুক, ও ঠিক বর্ডার পার করে তোমার কাছে পৌঁছে দেবে।'

এবার আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কবে থেকে আমায় এই নতুন অ্যাসাইনমেণ্টটা নিতে হবে?'

'অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল। তবে মহেশ বেশ কিছুদিন এখন পার্সোনাল কাজে ইণ্ডিয়ায় থাকবে। তুমি পরে ওর সঙ্গে এ নিয়ে ডিসকাস করে নিতে পার।'

এদিকে অভ্যুদয় মিটার চুপচাপ ছ'সাত পেগ স্কচ স্টমাকে স্টোর করে ফেলেছ। মহাশয়গণ, এই খচ্চরটা মাল খেয়ে মোটেই হইচই করে না, বা ভায়োলেণ্ট হয়ে পড়ে না। একেবারে ঘাড় গুঁজে ভাম হয়ে থাকে। শালাকে এই সময় দেখলে মনে হবে ওয়ার্ল্ডের বেস্ট ফিলোজফার।

হঠাৎ বুকের কাছ থেকে থুতনিটা তুলে অভ্যুদয় খ্যাসখেসে গলায় ডেকে উঠলেন, 'সমাজপতি স্যার—'

সমাজপতি বাঁ দিকে ঘাড় ফেরালেন, 'বলুন মিটার সাহেব।'

'স্বয়ম্ভু আমার একটা অ্যাসাইনমেণ্ট নিয়েছে। আরবান এরিয়া থেকে ইলেকশানে নেমে সুবিধা হবে না, এখন ও আমার জন্য রুরাল এরিয়াতে ক্যামপেন করতে যাবে। মহেশের কাজটা নিলে আমার প্রোগ্রামটা ডিসটার্বড হয়ে যাবে না?'

'স্বয়ম্ভু ইজ আ সুপারম্যান। ও একসঙ্গে বাইশটা অ্যাসাইনমেণ্ট নিতে পারে। আপনি চিন্তা করবেন না।'

খানিকক্ষণ চুপচাপ।

ড্রিংক সেসান পুরাদমে চলেছে। আচমকা কী মনে পড়তে সমাজপতি বলে উঠলেন, 'বুঝলে স্বয়ম্ভু, মহেশ এবার যে পার্সোনাল কাজের জন্য এসেছে, সেটা কী জানো?'

এর ভেতর সাত খোরা সোনার বাংলা আমার বডিতে ঢুকে গেছে, মাথায় টুংটাং করে অর্কেস্ট্রা বেজে চলেছে। মুখটা তুলে বললাম, 'না স্যার।'

'হি ইজ অ্যান একসেলেণ্ট ইয়াং ফেলা। হি নিডস এ লাইফ পার্টনার। একেবারে ম্যারেজ চুকিয়ে ও লণ্ডনে ফিরবে।' বলতে বলতে একটু থামলেন সমাজপতি। পরক্ষণে আবার স্টার্ট দিলেন, 'বিজনেসের ব্যাপারে ও ইণ্টারন্যাশনাল কিন্তু আর সব ব্যাপারে কমপ্লিটলি ইণ্ডিয়ান। পেট্রিয়টও বলতে পার। ভারতীয় মেয়ে ছাড়া ও বিয়ে করবে না।'

'নাইস। বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে?'

'না। পছন্দমতো মেয়ে এখনও পাওয়া যায় নি। এনিওয়ে, তোমার তো অনেক জানাশোনা। ভাল পেডিগ্রিওলা অ্যারিস্টোক্র্যাট ফ্যামিলির কোনো মেয়ের খোঁজ থাকলে জানিও তো।'

মহাশয়গণ, আপনারা তো জানেনই আমি একটা ফোরটোয়েন্টি, ওঁচা হারামী এবং চিট। আগেও মার্ক করেছেন, ইমপসিবল বলে কোনো কথা আমি জানি না। স্রেফ হাওয়া দিয়ে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মতো একটা বিল্ডিং বানিয়ে দিতে পারি। আচমকা একটা মুখ ফ্ল্যাশ বাল্বের মতো আমার চোখের সামনে জ্বলে উঠল। বললাম, 'আমার স্টকে একটি মেয়ে আছে স্যার। শি ইজ আ প্রিন্সেস।'

'প্রিন্সেস! রাজকুমারী।'

'রাইট।'

'কিন্তু—' ভুরু কুঁচকে সমাজপতি বললেন, 'এখন তো নেটিভ স্টেট আর নেই। তবে রাজকন্যাটি এল কোত্থেকে?'

বললাম, 'এক্স-কিংয়ের মেয়েকে কী বলব?'

'ও-কে, প্রিন্সেসই বলা যাক। কোথাকার প্রিন্সেস?'

'সব বলব। তার আগে আমার কিছু জানবার আছে।'

'অফ কোর্স। কী জানতে চাও বল?'

'জুনিয়র বা সিনিয়র সামতানি যেন কিছু মনে না করেন, আমি স্ট্রেট জিজ্ঞেস করছি, জুনিয়ার সামতানির ক্যারেক্টার কেমন? আই মিন, রাজকুমারীদের তরফ থেকে একটা কণ্ডিশন আছে, আগ-মার্কা বিশুদ্ধ চরিত্রের পাত্র না হলে ওঁরা মেয়ের বিয়ে দেবেন না।'

সমাজপতি গলার স্বরে এক্সট্রা প্রেসার দিয়ে বললেন, 'স্পটলেস ক্যারেক্টার আমাদের মহেশের। এত বছর লণ্ডনে আছে সে, ফ্রি মিক্সিং-এর দেশ, পুরো পারমিসিভ সোসাইটি, কিন্তু মহেশের একজন গার্ল ফ্রেণ্ডও নেই।'

'একসেলেণ্ট।'

'অবশ্য একটা কথা খোলাখুলিই অ্যাডমিট করব, মহেশ ড্রিংকটা একটু বেশিই করে থাকে। হি ড্রিংকস লাইক আ ফিশ। শীতের দেশে থাকে তো। তবে গ্যারান্টি দিতে পারি, দশ পেগ খাবার পরও সে আউট হয় না, মাটির ওপর পারপেণ্ডিকুলারের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে স্যার।'

'এবার বল প্রিন্সেসটি কোন নেটিভ স্টেটের?'

'প্রতাপরুদ্রগড়ের।'

'নামটা দুর্দান্ত। রাজস্থান রাজস্থান গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।'

'নো স্যার, মধ্যপ্রদেশের।'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়তে লাগলেন সমাজপতি। বললেন, 'মে বি। মে বি, মধ্যপ্রদেশেও অগুনতি নেটিভ স্টেট ছিল। এনিওয়ে, প্রিন্সেসের এবং তাঁর ফ্যামিলির সঙ্গে আমাদের আলাপ-পরিচয় হওয়া দরকার।'

বললাম, 'আগে ওঁদের খবর দিই। শুনে কী বলেন আপনাদের জানাবো।'

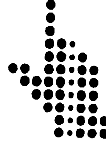
'বেশি দেরি করো না। যত তাড়াতাড়ি পার ওঁদের সঙ্গে একটা যোগাযোগ করিয়ে দাও।'

মহাশয়গণ, আমার মাথায় যে প্ল্যানিং কমিশনের হেড কোয়ার্টার রয়েছে, সেখানে এখন টেরিফিক অ্যাক্টিভিটি চলছে। কিন্তু সমাজপতি যত তাড়াতাড়ি চাইছেন তত তাড়াতাড়ি প্রিন্সেসের সঙ্গে ওঁদের আলাপ করানো ইমপসিবল। মাকড়াদের একটু খেলিয়ে নিতে হবে। বললাম, 'চেষ্টা করব স্যার।'

'সিনসিয়ারলিই চেষ্টা করো।'

'অফ কোর্স।'

এরপর এই টপিক নিয়ে আর কোনো ডিসকাসান হল না। ড্রিংক সেসানের পর ডিনার শুরু হল। হোল ব্যাপারটা কমপ্লিট হতে হতে বেশ রাত হয়ে গেল।



থিয়েটার রোডের ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে নিচে নামতেই একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেলাম। যে লিমুজিনটা করে গড়িয়াহাটের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে এসেছিলাম, সেটা এখানকার পার্কিং এরিয়াতেই থেকে গেল।

ট্যাক্সিওলা জিজ্ঞেস করল, 'কঁহা যায়েগা সাব?'

বললাম, 'শিয়ালদা স্টেশন।'

মহাশয়গণ, আপনাদের মুখচোখ দেখে টের পাচ্ছি, প্রিন্সেসের ব্যাপারে দারুণ কিউরিয়াস হয়ে উঠেছেন।

আমার হোল ব্যাকগ্রাউণ্ড আর বায়ো-ডাটা আপনাদের মিনিমাম এক হাজার বার জানিয়েছি। আমি একটা চিট, ফোরটোয়েন্টি, উৎকৃষ্ট প্রতারক। ওয়ার্ল্ডের নানারকম মালের সঙ্গে আমার কনট্যাক্ট রয়েছে। কিন্তু প্রতাপরুদ্রগড়ের মতো একটা নেটিভ স্টেটের প্রিন্সেসের সঙ্গে কবে কোথায় আমার দেখা হল, এটা ভাবতে গিয়ে আপনাদের ব্রেনে ডেফিনিটলি চক্কর লেগে যাচ্ছে। আমার মতো একটা রাস্তার পোকার সঙ্গে একজন রাজকুমারীর পরিচয়-ফরিচয় থাকতে পারে, এটা কোনো নরম্যাল লোক ভাবতে পারে না। রিয়ালি বলছি, প্রতাপরুদ্রগড় নামে নেটিভ স্টেট ওয়ার্ল্ডের কোথাও আছে কিনা, আমি নিজেই জানি না। কুইন এলিজাবেথ নাম্বার টু যখন রাজকুমারী ছিলেন তখন নিউজপেপারে একবার ছবি দেখেছিলাম। এছাড়া জ্যান্ত কোনো রাজকন্যা আমার লাইফে দেখি নি।

হে-হে মহাশয়গণ, আপনাদের ভুরু টেরিফিক কুঁচকে যাচ্ছে। ওয়েট, ওয়েট। কিঞ্চিৎ ধৈর্য ধরুন। মুখ দিয়ে যখন প্রিন্সেসের কথা ফট করে বেরিয়ে পড়েছে তখন একটা প্রিন্সেস ঠিক আপনাদের সামনে দাঁড় করিয়ে দেব।

শিয়ালদায় এসে দেখা গেল, লাস্ট ট্রেন চলে গেছে। অগত্যা সামনের রাস্তায় চলে এলাম।

আগরপাড়ার লাস্ট বাসও চলে গেছে। এখন অবশ্য একটা ট্যাক্সি ক্যাচ করে গড়িয়াহাটার অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে রাত কাটিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু তক্ষুণি এই ভাবনাটা স্ট্রেট ছাঁটাই করে দিলাম।

মহাশয়গণ, আমি একটা ওয়ার্ল্ড সিটিজেন, ফ্রি ম্যান। সমাজপতি আর সুমনার সঙ্গে আলাপ হবার আগে বেয়াল্লিশ তেতাল্লিশ বছর যেখানে ইচ্ছা চষে বেড়িয়েছি। কিন্তু এখন শ্লা আমার পুরোপুরি রুটিন লাইফ। কলকাতায় ষোল শ স্কোয়ার ফুটের একটা ফ্ল্যাট আর আগরপাড়ার ব্যারাকবাড়ির মধ্যে ক্যারোমের ঘুঁটির মতো ক'মাস ধরে ছোটাছুটি করছি। আমার ফ্রিডম নেই, আমি একটা ছক-কাটা লাইফের স্লেভহয়ে গেছি। আমার ক্যারেক্টারের বারটা বেজে যাচ্ছে।

মহাশয়গণ, আমার ব্লাডের ভেতর কেউ যেন রিভোল্ট করে উঠল। আমি আজ আগরপাড়াতেও যাব না, গড়িয়াহাটাতেও না। আমার যেখানে ইচ্ছা সেখানে রাতটা কাটিয়ে দেব। আগের মতোই আমাকে ফ্রি ম্যান হতে হবে। শুদ্ধ ভাষায়—স্বাধীন, বন্ধনহীন মানুষ।

শিয়ালদা স্টেশন বাঁয়ে রেখে আমি বেলেঘাটার দিকে হাঁটতে লাগলাম।

মহাশয়গণ, এলোপাথাড়ি স্টেপ ফেলতে ফেলতে বেলেঘাটা রেল ওভারব্রিজের মাথায় এসে উঠলাম। আমি এখন আজাদ চিড়িয়া, অর্থাৎ ফ্রি বার্ড। অনেকদিন পর নিজের ক্যারেক্টারটা খুঁজে পেয়েছি। আমার স্টামকে মিনিমাম তিন লিটার ধান্যেশ্বরী স্টোর করা আছে। কাজেই মাথার ভেতর ঝমর ঝমর করে একখানা অর্কেস্ট্রা বেজে চলেছে।

ওভারব্রিজের এই মাথা থেকে বাঁ দিকে শিয়ালদা সাউথ সেকশনের প্ল্যাটফর্মগুলো দেখা যাচ্ছে। ওগুলো প্রায় ফাঁকা। এ লাইনের লাস্ট ট্রেনও চলে গেছে। তবে কিছু ভিখারী, সাউথ চব্বিশ পরগনার কিছু ল্যাণ্ডলেস লোক, কিছু ভেণ্ডার আর হকার এখন প্ল্যাটফর্মগুলোর দখল নিয়েছে। এই মালগুলো ফাঁকা প্ল্যাটফর্মের পার্মানেণ্ট বোর্ডার। ওদের কেউ কেউ ফ্ল্যাট হয়ে শুয়ে পড়েছে, কেউ প্যাকিং বাক্সের কাঠফাঠ জ্বালিয়ে ভাত রাঁধছে, কেউ ঠ্যাং ছড়িয়ে বিড়ি ফুঁকছে। গাদা গাদা কাচ্চাবাচ্চাও চোখে পড়ছে। মহাশয়গণ, ভাল করে মার্ক করুন, এই প্ল্যাটফর্মগুলো ইটর্নাল মেটার্নিটি হোম। শিয়ালদা লাইনে যাতায়াত করতে করতে ডেফিনিটলি আপনাদের নজরে পড়েছে, পাল পাল বাচ্চা এই সব প্ল্যাটফর্মে জন্মায়। লাস্ট সেন্সাস রিপোর্টে নাকি বেরিয়েছে, ইণ্ডিয়ার পপুলেশন গ্রোথ আড়াই পার্সেন্ট। কিন্তু শিয়ালদার এই প্ল্যাটফর্মগুলোতে পা দিলে মনে হবে, পপুলেশন টু হাণ্ড্রেড পার্সেন্ট করে বেড়ে যাচ্ছে। এভাবে বাড়তে থাকলে স্টেশন আর প্ল্যাটফর্মগুলোই শুধু নয়, রেললাইনগুলো পর্যন্ত দখল হয়ে যাবে। মাকড়ারা তার ওপর তাঁবু খাটিয়ে কলোনি বসিয়ে ফেলবে।

যাক গে, বেফায়দা ভেবে ভেবে মাথার ঘাম বার করে আমার কী প্রফিট? নাথিং নাথিং। গভর্নমেণ্ট আছে, বড় বড় পলিটিক্যাল লিডাররা রয়েছে, সোসিওলজিস্টরা রয়েছে। তারা এই হিউজ পপুলেশন এক্সপ্লোসনের কথা ভেবে ইনসমনিয়ায় ভুগতে থাক। আমি পিটার স্বয়ম্ভু হোড়—একজন ফোরটোয়েন্টি, চিট, থার্ড ক্লাস এক প্রতারক, এসব বিগ বিগ টেরিফিক চিন্তা ব্রেন থেকে ঝেড়ে ফেলে বেলেঘাটা ওভারব্রিজ থেকে ওধারে নেমে গেলাম।

এত রাত্তিরে রাস্তা প্রায় ফাঁকাই। দু'একটা ট্রাক-ট্যাক্সি আর রিকশা-ফিকশা চোখে পড়ছে।

একটা রিকশায় দেখলাম এক শ্লা মাতাল কাত হয়ে লাট খেয়ে পড়ে আছে। সন্ধে থেকে মাঝরাত পর্যন্ত মাল খেয়ে এখন রত্নগভ্ভা মা কি সতী-সীমন্তিনী বউয়ের কাছে ফিরে যাচ্ছে। কেন যে খজড়াগুলো এভাবে মাল খেয়ে আউট হয়ে যায়!

ওয়ার্ল্ডে যার যা ইচ্ছা তার তা করার রাইট আছে। আমি একটা ফোরটোয়েন্টি, এসব নিয়ে আমার ব্রেনে চক্কর লাগাবার দরকার কী? স্ট্রেট বেলেঘাটা ব্রিজ পেরিয়ে ওপারে চলে গেলাম।

দু'ধারে টালি আর খাপরার বস্তি টাইপের বাড়ি। রাস্তায় পচা আবর্জনা ডাঁই হয়ে আছে। সেগুলো থেকে যা গন্ধ বেরুচ্ছে, তাতে যে কোনো লোকের স্টমাক থেকে অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসবে। সি. এম. ডি. এ একশ' বছর দাঁতে দাঁত দিয়ে চেষ্টা করলেও কলকাতা থেকে এই বস্তি, আবর্জনা আর গন্ধ হটাতে পারবে বলে মনে হয় না। এনিওয়ে, এর মধ্যেই মহাশয়গণ, আমরা জার্মের মতো টিকে আছি আর থাকবও।

রাস্তার পানের দোকান ফোকান একটাও খোলা নেই। এই মিডনাইটে আমি এক ফেরেববাজ চিট, ঘুমন্ত কলকাতাকে পায়ের তলায় মাড়াতে মাড়াতে এগিয়ে চলেছি।

কিন্তু মহাশয়গণ, একা একা কতক্ষণ আর ঘোরা যায়? টের পাচ্ছি, আগরপাড়ার ব্যারাকে আর গড়িয়াহাটার পশ অ্যাপার্টমেন্টে থেকে থেকে আমার ক্যারেক্টারের তেরটা বেজে এসেছে। আগে সোনার বাংলা খেয়ে হোল নাইট চারদিক চষে বেড়াতে পারতাম। এখন বডি আরাম চাইছে, ঘুমে চোখ জুড়ে আসছে। কোথাও ফ্ল্যাট হয়ে পড়তে হবে। কিন্তু কোথায়?

এখনই একটা ট্যাক্সি বা রিকশা ডেকে শিয়ালদায় গিয়ে কোনো হোটেলে ওঠা যায়। সেখানে এয়ার-কুলার বসানো কোনো ঘরে রাতটা কাটিয়ে দিতে এতটুকু অসুবিধা নেই। কিন্তু আমি আজ শ্লা আগেকার পুরোনো হ্যাবিটে ফিরে যেতে চাই। হোটেল না, ঘরের কমফোর্ট না, এই রাস্তাতেই বডি রাখার একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করে ফেলতে হবে। ওল্ড হ্যাবিট নষ্ট করা মানেই আমার ডেথ।

আরো খানিকটা যাবার পর আচমকা বাঁ দিকে বিরাট ফাঁকা জায়গা চোখে পড়ল। সেখানে প্রায় হাফ মাইল জুড়ে সি. এম. ডি. এ'র হাজার হাজার বাহাত্তর ইঞ্চি পাইপ পড়ে আছে। বোঝা যাচ্ছে, এদিকের রাস্তা-ফাস্তা খুঁড়ে এই সব পাইপ পুরে দেওয়া হবে।

মহাশয়গণ, ফ্ল্যাশ বাল্বের ঝলকের মতো মাথার ভেতর একটা প্ল্যান এসে গেল। আজ রাত্তিরে একটা পাইপের ভেতর 'ইন' করে বডি ফেলব। কাজেই বাঁ দিকের মাঠে নেমে একটা পাইপ বেছে হামাগুড়ি দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লাম। আর ঢুকেই মেজাজটা খুশি হয়ে গেল।

ভেতরে টেরিফিক কারবার। হাওয়া-বালিশ আর চাদর দিয়ে কেউ বিছানা পেতে রেখেছে।

হে-হে মহাশয়গণ, আমার মতো সি. এম. ডি. এ'র পাইপে রাত কাটাবার মাল আরো অনেক আছে, দেখা যাচ্ছে। কিন্তু বিছানাটা কোন মাকড়ার, কে জানে! যারই হোক, শালা ঠিকই একসময় এসে পড়বে। যখন ইচ্ছা আসুক, আমি তো এখন লাট খেয়ে পড়ি। হাঁটতে হাঁটতে পায়ের জোড় আলগা হয়ে গেছে। এখন শুতে না পারলে নার্ভগুলো ছিঁড়ে পড়বে।

শুয়েই পড়লাম। তারপর পকেট হাতড়ে সিগারেট আর লাইটার বার করে মেজাজে ধরিয়ে নিলাম।

বাহাত্তর ইঞ্চি পাইপের সিলিং আমার নাকের ডগা থেকে মোটে পঁচিশ তিরিশ ইঞ্চি ওপরে। তবে ফাঁকা দুটো মুখ দিয়ে হুড়হুড় করে হাওয়া ঢুকে যাচ্ছে। ফাইভ স্টার হোটেলে এর চাইতে বেশি আরাম নেই।

শুয়ে থাকতে থাকতে একটা ব্যাপার মাথায় এসে গেল। কি কারবার দেখুন মহাশয়রা, আমার একটা বিছানার দরকার ছিল। ঠিক শ্লা এক হারামী সেটি পাইপের ভেতর সেট করে রেখেছে। আরেক দিনের কথা কি আপনাদের মনে আছে? যেদিন বোদা তার শোভাবাজারের সেই ধসে-পড়া বাড়িতে নিয়ে ঢুকেছিল? সেখানেও ভাঙাচোরা পুরনো বাড়িতে এইরকম রাত্তিরে গিয়ে বডি ফেলেছিলাম। ওয়ার্ল্ডে কে যে কোথায়, কার জন্যে বিছানা পেতে রাখে, কে জানে!

রগের ভেতর বাংলা মাল এখনও অর্কেস্ট্রা বাজিয়ে চলেছে। চোখ দুটো বুজে আসছে। এক মিনিটের ভেতর আমি ঘুমিয়ে পড়ব কিন্তু তার আগেই পায়ের ওপর হাত এসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে একটা গলা শোনা গেল, 'কে, কে রে এখানে?'

এক ঝটকায় ঘুমের কিচাইন হয়ে গেল। বুঝতেই পারছি, যার বিছানা সে এখন পাইপে 'ইন' করেছে। বললাম, 'তুই কে?'

'তোর বাপ রে শালা—'

'আমার বাপকে কোনোদিন দেখি নি। আমি একটা বেজন্মা—বাস্টার্ড। তুই যখন আমার বাপ হবার ক্লেম করছিস, তখন তোর থোবড়া দেখতে ইচ্ছে করছে।'

এই পাইপের ভেতর উঠে বসবার জায়গা নেই। পকেট হাতড়ে লাইটার বার করে জ্বালিয়ে নিলাম। সঙ্গে সঙ্গে পায়ের দিকে একটা চব্বিশ পঁচিশ বছরের ছোকরার মুখ চোখে পড়ল। কপালের ওপর তার ঝাঁপিয়ে পড়া চুল, গালে চাপ চাপ দাড়ি। মুখটা রাউণ্ড শেপের। চোখ দুটো লম্বাটে। বাঁ হাতে স্টিলের একটা মোটা বালা, মস্তানরা যেরকম পরে থাকে, ডান হাতে ঢাউস রিস্টওয়াচ। পরনে ফুলপ্যান্ট আর ঢল্লা শার্ট।

ছোকরা খ্যাসখেসে গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'হট শালা, এখান থেকে ফোট।'

বললাম, 'এত রাত্তিরে কোনো ঝুট-ঝামেলা করছিস চাঁদু? পাইপের ভেতরে বিছানা দেখে বডি ফেলেছি। এখন আর উঠতে-ফুটতে পারব না।'

'তোর বাপ উঠবে।'

'আমার বাপ উঠুক, লেকেন আমি উঠছি না।'

এবার ছোকরা ঝাড়া এক মিনিট আমার দিকে তাকিয়ে রইল। এর মধ্যে একবারও তার চোখের পাতা নড়ল না। মহাশয়গণ, আমি যে এভাবে বলতে পারি, সে যেন বিশ্বাসই করে উঠতে পারছে না।

আমি আবার বললাম, 'এক কাজ কর। চারদিকে আরো কত পাইপ আছে। একটার ভেতর ঢুকে লেটে পড়। টেরিফিক টায়ার্ড হয়ে আছি। আমাকে ঘুমোতে দে।'

ছোকরা দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'নিজের বিছানা তোকে দিয়ে আমি অন্য পাইপে যাব! শালা হারামীর বাচ্চা—'

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, 'স্টপ-স্টপ-স্টপ। খিস্তি ফিস্তি বেশি দিস না। আমার স্টকে তোর চাইতে অনেক বেশি খিস্তি আছে। স্টার্ট করলে হোল নাইট চালিয়ে যেতে পারব। তার চাইতে যা বলছি তাই কর। এখান থেকে হড়কে যা, কাল সকালে তোর বিছানা তোকে দিয়ে আমি 'টা-টা' করব।'

ছোকরা তাকিয়েই ছিল। বলল, 'বেলেঘাটায় তুই নতুন 'ইন' করেছিস, না?'

মহাশয়গণ, আপনারা তো জানেনই, এই ক্যালকাটা মেট্রোপলিসে একেকটা এরিয়ায় মিনিমাম দু'হাজার বার করে আমি চক্কর মেরেছি। আজও দুপুরে বেলেঘাটা লেক, মানে সুভাষ সরোবরের কাছে প্রভু জগপতির 'ডেন'-এ কয়েকটা ঘণ্টা কাটিয়ে গেছি। কিন্তু ছোকরাকে তা জানিয়ে কী হবে? ওকে নিয়ে খানিকক্ষণ খেলানো যাক। বললাম, 'বিলকুল নয়া মাল, ফ্রেশ ইমপোর্ট।'

'আমারও তাই মনে হয়েছে। নইলে—'

'নইলে কী?'

'তোর এত সাহস হত না।'

'তাই নাকি?' নাকের ভেতর শব্দ করে একটু হাসলাম। বললাম, 'তুই কে? আই-জি, না পুলিশ কমিশনার, না চিফ অফ দি আর্মি স্টাফ?'

ছোকরার চোখে আগুন জ্বলে উঠল যেন। বোঝা যাচ্ছে, মাকড়া দারুণ খেপে গেছে। চাপা গলায় সে বলল, 'আমি কে জানলে তোর প্যান্ট হড়কে কোমর থেকে হাঁটুর কাছে নেমে যেত।' একটু থেমে গলাটা ঝট করে কয়েক পর্দা উঁচুতে তুলে চেঁচাল, 'আমার নাম শুনলে বেলেঘাটার লোকদের হার্টে স্ট্রোক হয়ে যায়।'

চোখ কুঁচকে জিভে চক চক আওয়াজ করে বললাম, 'আমার হার্ট স্টিল দিয়ে তৈরি।'

'মাজাকি হচ্ছে!' সট করে কোমরের কাছ থেকে একটা বার ইঞ্চি ছোরা বার করে আস্তে আস্তে হাতের ভেতর ঘোরাতে ঘোরাতে দাঁতে দাঁত ঘষতে লাগল ছোকরা, 'আমি কে, বুঝতে পারছিস?'

মহাশয়গণ, আপনারা তো জানেনই, কখনও কোনো অবস্থাতেই আমার নার্ভ ফেল করে না। বললাম, 'থোড়া থোড়া।'

ছোকড়া বলল, 'পেটের ভেতর এটা ঢুকিয়ে দিলে পুরোটা বুঝতে পারবি।'

লাইটের আলোয় ছোরার ফলাটা ঝকঝক করছে। দেখেই টের পাওয়া যায়, মালটা দারুণ ধারালো। বডিতে টাচ করে স্লাইট প্রেসার দিলে সবটা ঢুকে যাবে। বললাম, 'ডেফিনিটলি—'

এর পর তিন চার সেকেণ্ডও কাটল না, আমার পা দুটো স্প্রিংয়ের মতো ছোকরার চোয়ালের দিকে ছুটে গেল। অটোমেটিক রিঅ্যাকশনের মতো ওর গলা দিয়ে ক্যাঁক করে একটা আওয়াজ বেরুল। তারপরেই দেখা গেল, ছোকরার বডি রকেটের স্পিডে বাহাত্তর ইঞ্চি পাইপের বাইরে ঠিকরে বেরিয়ে গেছে।

কিক যখন একটা খেয়েছে, ছোকরা আমাকে সহজে ছাড়বে না। আমিও নিজের বডিটাকে এক ঝটকায় পাইপের বাইরে নিয়ে গেলাম।

আকাশে চকচকে সিলভারের থালার মত রাউণ্ড একখানা চাঁদ। এখন খুব সম্ভব পূর্ণিমা-ফুর্ণিমা হবে, জোছনায় চারদিক ভেসে যাচ্ছে।

চোখে পড়ল, ছোকরা ফ্ল্যাট হয়ে পড়ে আছে। তার পাশে সেই ড্যাগারটা। আমাকে দেখামাত্র বডিতে একটা মোচড় দিয়ে ছোরাটা তুলে উঠে দাঁড়াল ছোকরাটা। তার চেহারা দেখে মনে হল, শরীরের সব ব্লাড তার মাথায় গিয়ে চড়েছে। আমাকে মার্ডার না করে সে আজ শোবে না।

ছোকরা বলল, 'শালা খজড়া, আমার মুখে তুমি কিক ঝেড়েছ! তুমি কত মায়ের দুধ খেয়েছ, এবার আমি দেখব।'

দাঁত বার করে আমি বললাম, 'মায়ের দুধ আমি লাইফে খাই নি। অরফ্যানেজের ডেয়ারির দুধ খেয়ে বড় হয়েছি। মা আমায় জন্ম দিয়ে রাস্তায় ফেলে দিয়েছিল।'

'যার দুধই খাস, তোর স্টমাক থেকে আজ পাম্প করে বার করব।' বলেই ছোরাটা সামনের দিকে স্ট্রেট বাগিয়ে ধরে এগিয়ে আসতে লাগল। তার টার্গেট আমার পেট।

ছোকরা উত্তর দিল না। ঘাড় গুঁজে এগুতে এগুতে আচমকা স্পিড বাড়িয়ে দিল। ও যখন তিন ফুটের মধ্যে এসে গেছে, সেই সময় আমার বডিটা সেমি-সার্কেলে বাঁকিয়ে ক্যারাটের স্টাইলে জাম্প করে বাঁ পা'টা ছোকরার ডান হাতের দিকে হাঁকালাম। ঐ হাতই ড্যাগারটা ধরা আছে।

চোখের পাতা পড়বার আগেই ড্যাগারটা ছোকরার হাত থেকে মিনিমাম তিরিশ ফুট ছিটকে বেরিয়ে গেল। আর সে যখন ব্যালান্স রাখতে না পেরে টাল খেয়ে পড়ে যাচ্ছে, ঠিক তখনই দু'হাত বাড়িয়ে তাকে ধরতে গেলাম। পড়ে হাড়-ফাড়ে চোট লেগে ফ্র্যাকচার হোক, এটা আমি চাই না। কিন্তু মহাশয়গণ, ছোকরা বোধ হয় ভাবল, ওকে ধরে আমি ভাল করে রগড়ে দেব। লাট খেতে খেতে ও মুখটা ঘুরিয়ে নিল। তার নিট রেজাল্ট হল এই—আমার বাঁ হাতটা গিয়ে পড়ল ওর মুখে, ডান হাতটা জামার কলারে।

নিজেকে ছাড়াবার জন্যে ছোকরা মুখ-মাথা-হাত-পা জোরে জোরে ঝাঁকাতে লাগল। আর তাতেই একটা টেরিফিক কারবার হয়ে গেল। মুখে থেকে চড়চড় করে দাড়ি উঠে গিয়ে তেলতেলে মশৃণ দুটো গাল বেরিয়ে পড়ল। এদিকে শার্ট আর গেঞ্জ ছিঁড়ে ফর্দাফাই হয়ে ভেতরে ব্রার লেস দেখা গেল।

কী আশ্চর্য! এ তা হলে ছেলে নয়, পুরোপুরি একটা গার্ল। স্রেফ পুরুষদের মেক-আপ নিয়ে আছে! আমি যে আমি, একটা ফেরেববাজ এবং চিট—ব্যাপার দেখে তারও মাথায় চক্কর লেগে গেল।

চোখের তারা ফিক্সড করে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। তারপর বললাম, 'উরে শ্লা, কী ম্যাজিক দেখালে ফুলটুসি!'

যতই গালে দাড়ি চড়িয়ে ট্রাউজার্স-শার্ট পরে ঘুরুক, তবু ও একটা মেয়েই। পাক্কা ইণ্ডিয়ান গার্ল। কাজেই বডি অ্যাণ্ড মাইণ্ডে লজ্জা-ফজ্জা প্রচুর কোয়ান্টিটিতে রয়েছে। একটু আগের রোয়াবি আর তড়পানি, কিচ্ছু নেই। দুটো হাত আড়াআড়ি প্লেস করে বুক ঢাকতে চাইছে সে।

লজ্জায় জড়সড় হয়ে নিজেকে কোথায় লুকিয়ে ফেলবে, বুঝতে পারছে না।

ডাকলাম, 'এই ছুঁড়ি—'

মেয়েটা উত্তর দিল না।

বললাম, 'আমার পেটে তো ড্যাগার ঢোকাতে চাইছিলি। এবার—'

আচমকা এক কাণ্ডই করে বসল মেয়েটা। স্ট্রেট আমার পায়ে বডি থ্রো দিয়ে পড়ল। বলল, 'মাপ করে দিন। আমার ক্ষতি করবেন না।'

গলার স্বর পালটে গেছে মেয়েটার। ভীষণ কাঁপছে সে। ও কী ক্ষতির কথা বলল, বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না। মেয়েমানুষদের বডির ড্যামেজটাই সব চাইতে বড় ড্যামেজ। তাকে টেনে তুলে ওধারের একটা বাহাত্তর ইঞ্চি পাইপে পাশাপাশি বসলাম। অন্য মেয়েদের যা বলি, এই মেয়েটাকেও তাই বললাম। মেয়েদের বডি সম্পর্কে আমার কোনো অ্যাট্রাকসান নেই। তাদের বডি আর জুতোর সুকতলা দুটোই আমার কাছে সমান। আমার দিক থেকে ওয়ার্ল্ডের কোনো ছুকরির ভয়ের এতটুকু কারণ নেই। এক নিশ্বাসে এই খবরটা দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোর নাম কী?'

'রুম্বা মাস্তান।' মেয়েটা মুখ না তুলে উত্তর দিল। হয়ত আমার কথা সে বিশ্বাস করেছে। তার কাঁপুনি অনেকটা কমে গেছে এর মধ্যে।

বললাম, 'যখন গালে দাড়ি চাপিয়ে প্যাণ্ট-ফ্যাণ্ট চড়িয়ে থাকিস তখন তো তুই রুম্বা মাস্তান।'

কী বলতে চাই ঠিক আন্দাজ করতে না পেরে মেয়েটা বলল, 'হ্যাঁ।'

'আর দাড়ি উঠে গেলে যখন ছুঁড়ি হয়ে যাস, তখন তোর কী নাম?'

'টুনি।'

'আসলে তুই তো টুনিই। রুম্বা মাস্তানটা তো ফল্‌স।'

মুখ নামিয়ে টুনি বলল, 'হ্যাঁ।'

'টুনি থেকে রুম্বা মাস্তান হলি কী করে?'

টুনি চুপ।

আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, 'ছোকরার মেক-আপ চড়িয়ে থাকিস কেন?'

টুনি চাপা নিচু গলায় এবার বলল, 'নিজেকে বাঁচাবার জন্যে।'

মহাশয়গণ, আপনাদের দু হাজার একত্রিশ বার জানিয়েছি, ওয়ার্ল্ডের কোনো ব্যাপারেই আমার কৌতূহল নেই। তবু এই মোমেণ্টে টুনির লাইফ-হিস্ট্রি জানবার জন্যে টেরিফিক আগ্রহ হচ্ছে। বললাম, 'তার মানে?'

'মানে বলতে হলে অনেক কথা বলতে হয়। আনেক সময় লাগবে।'

'হোল নাইট লাগুক না, আমি শুনব।'

মিনিটখানেক চুপ করে থেকে টুনি স্টার্ট করল। তার লাইফ-হিস্ট্রির গোড়ার দিকটায় তেমন কিছুই নেই। ক্যালকাটা মেট্রোপলিসে যে দশ বার লাখ লোক ফুটপাথে থাকে তাদের লাইফ স্কেচের সঙ্গে টুনির লাইফের টেরিফিক মিল।

ছুকরি মেদিনীপুর থেকে তিন চার বছর বয়সে ক্যালকাটায় তার মা-বাপের সঙ্গে এসেছিল। তার পর কুড়ি বাইশ বছর কেটে গেছে। বাপ গ্রামে থাকতে ছিল ল্যাণ্ডলেস পেজান্ট—ভূমিহীন কৃষাণ। ক্যালকাটায় এসে কিছুদিন কাজের ধান্দা-ফান্দা করে এবং কিছুই জোটাতে না পেরে শেষ পর্যন্ত হোল টাইম ভিখিরি হয়ে যায়।

বাপ-মা আর মেয়ে—তিনজনের এই ইউনিট সকাল থেকে বেলা বারটা পর্যন্ত বাড়ি বাড়ি ভিক্ষে করত। এ শহরে তাদের কোনো পার্মানেণ্ট অ্যাড্রেস ছিল না। বারটার পর যে কোনো রাস্তার যে কোনো ফুটপাথে একটু ফাঁকা জায়গা পেলে কাঠ ফাট জ্বেলে ভাত চাপিয়ে দিত কিংবা রুটি বানিয়ে নিত।

বারটা থেকে চারটে পর্যন্ত ইণ্টারভ্যাল, তারপর আবার ভিক্ষে। ভিক্ষের পর রাত্রিবেলা ফের ফাঁকা জায়গা দেখে রান্নাবান্না এবং বডি ফেলে দেওয়া—মানে ঘুমনো।

এইভাবে কয়েক বছর কাটল। তারপর একদিন দুম করে মা মরে গেল। তাতে ফ্যামিলি মেম্বর কমল, তখন বাপ আর মেয়ে ভিক্ষে করতে বেরিয়ে পড়ত।

আগের ডেইলি রুটিন অনুযায়ী সব কিছু চলছিল। আরো কয়েক বছর বাদে বাপও একদিন মরে গেল। তখন তার বয়স আঠার। সেই থেকে টুনি এই ক্যালকাটা শহরে একেবারে একা।

এই সিটি এমন ডেঞ্জারাস যে একা একটা ইয়াং গার্লের পক্ষে টিকে থাকা ইমপসিবল। সমাজপতি টাইপের হাজার হাজার জন্তুজানোয়ার মানুষের শেপ নিয়ে এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নিজেকে এদের হাত থেকে বাঁচাতে হবে। কিন্তু কিভাবে? আচমকা টুনির ব্রেনে একটা দুর্দান্ত আইডিয়া খেলে গেল। ভিক্ষে করে কিছু ক্যাশ জমেছিল। তাই দিয়ে ফলস দাড়ি আর প্যাণ্ট -ফ্যান্ট যোগাড় করে সে পুরুষের মেক-আপ নিল। কিন্তু ঐ মেক-আপে ভিক্ষে করা যায় না।

হাতে যে ক'দিন ক্যাশ ছিল, কোনোরকমে চালিয়ে গেল। তারপরেই হেভি গাড্ডো। এই সময়টা সিনেমার টিকেট ব্ল্যাক করেছে সে, রেলের টিকেট ব্ল্যাক করেছে। এইসব করতে করতে দারুণ সাহস বেড়ে গেল। পরে ব্ল্যাকের ঝামেলা ছেড়েছুড়ে স্ট্রেট সে ছিনতায়ের লাইনে চলে এল। দশ ইঞ্চি ড্যাগার কি টয় রিভলবার বাগিয়ে গলির মোড়ে দাঁড়াতেই অন্য লোকের পকেটের মাল তার পকেটে ঢুকে যেতে লাগল। নতুন লাইনে নতুন মেক-আপে আসার পর নিজের নামটাও চেঞ্জ করে নিয়েছে টুনি। এখন সে রুস্বা মাস্তান। বেলেঘাটার তিন চার স্কোয়ার মাইল এরিয়া তার ভয়ে আজকাল কাঁপে।

বোদার সঙ্গে টুনির ক্যারেক্টারের অনেক মিল রয়েছে। আসলে ক্যালকাটা মেট্রোপলিসের ফুটপাথে যারা থাকে, তাদের ক্যারেক্টার একই ছাঁচ থেকে বেরিয়ে আসে। তাদের মডেল একটাই।

টুনির লাইফ-হিস্ট্রির লাস্ট চ্যাপ্টারে যে ড্রামা আর চমক আছে তার কারণ একটাই—সে মেয়ে, ইয়াং গার্ল। এই ক্যালকাটায় যেখানে প্রতিটা রাস্তায়, ব্লাইণ্ড লেনে নানা টাইপের নানা ক্যারেক্টারের মানুষের আর্ট-গ্যালারি সাজানো, সেখানেও টুনির মতো একটা মাল খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

যাই হোক, ছিনতাইয়ের লাইনে আসার পর টুনি সি. এম. ডি. এ'র বাহাত্তর ইঞ্চি পাইপের ভেতর শিফট করেছে। যদ্দিন না পাইপগুলো মাটির তলায় ঢোকানো হয়, সে এখানেই থাকবে।

ঘণ্টাখানেক ধরে নিজের লাইফ-হিস্ট্রি শুনিয়ে টুনি বলল, 'আপনার খুব খারাপ লাগল তো?'

বললাম, 'সার্টেনলি না। তোর মতো জিনিস খুব বেশি দেখি নি। অনেক রাত হল, এবার শুয়ে পড়। তুই তোর সুড়ঙ্গে 'ইন' কর। আমি আরেকটা পাইপে ঢুকছি। ভীষণ ঘুম পেয়েছে।'

'কিন্তু—'

'কী?'

'আপনি কে, বুঝতে পারলাম না তো।'

'মুখে নিজের সম্বন্ধে কতটুকু আর বলতে পারব! আমার লাইফ-হিস্ট্রি লিখলে মহাভারতের সাইজের পঞ্চাশটা বই হয়ে যাবে।'

টুনি হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

বললাম, 'বিশ্বাস কর, যা বলেছি তার একটা ওয়ার্ডও ফলস না। যা, শুয়ে পড়।'

টুনি উঠল না, আমার পাশে বসেই রইল। মনে হয় ছুকরি আমাকে কিছু বলতে চায়। জিজ্ঞেস করলাম, 'কি রে, কিছু বলবি?'

'হ্যাঁ।'

'বলে ফেল। কুইক।'

'আমি যে মেয়ে, সেটা কাউকে জানাবেন না—' বলতে বলতে টুনির চোখ দুটো আর ভয়েসটা করুণ হয়ে গেল।

বললাম, 'ধুস, তাই কখনও বলি! বললে ভালচারের পাল তোকে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে।' বলেই উঠে আর একটা পাইপে যেই ঢুকতে যাব, টুনি বলে উঠল, 'না—'

'কী রে?'

'আপনি আমার বিছানায় গিয়ে শোন। আমি অন্য পাইপে শুচ্ছি।'

'না না।'

টুনি আমার কোনো কথা শুনল না, জোরজার করতে লাগল।

অগত্যা কী আর করা, টুনির সেই পাইপটায় ঢুকতে গিয়ে আচমকা একটা কথা মনে পড়ে গেল। হাতে রুস্বা মস্তানের সেই ফল্‌স দাড়ি-ফাড়ি ধরা ছিল। সেগুলো টুনির দিকে বাড়িয়ে বললাম, 'তোর মালগুলো আগে ধর।'

টুনির হাতে তার জিনিস গুঁজে দিয়ে আমি সট করে পাইপের ভেতর ঢুকে পড়লাম।

টুনি কয়েক মিনিট স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে অন্য একটা পাইপে ঢুকে বডি ফেলল।

মহাশয়গণ, শোবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হল অ্যাডেসিভ দিয়ে কেউ চোখ দুটে জুড়ে দিচ্ছে। আমি যখন ঘুমের ভেতর ডুবে যাচ্ছি, আচমকা পাশের পাইপ থেকে টুনির গলা ভেসে এল, 'ঘুমিয়ে পড়লেন?'

ঘুমের সময় কেউ ডিসটার্ব করলে আমার মেজাজ কিচাইন হয়ে যায়। বললাম, 'না, শুয়ে শুয়ে আমি তোমার স্বপ্ন দেখছি। শালী খজরি—'

আমার খিস্তিগুলো এক কান দিয়ে ঢুকিয়ে আরেক কান দিয়ে বার করে দিল টুনি। বলল, 'আপনার মতো লোক আমি আগে আর কখনও দেখি নি।'

'আমার সঙ্গে যার দেখা হয়, সে ওই একই ডায়লগ ঝাড়ে। তোর ধান্দাটা কি রে ছুকরি? এই মিডনাইটে প্রেমের ফ্লাড বইয়ে দিবি নাকি?'

টুনি উত্তর দিল না।

আমি আবার স্টার্ট করলাম, 'দ্যাখ চাঁদবদনী, আমি মাল শ্লা হেভি খারাপ। তবে একজন ফার্স্ট কেলাস ব্রেহ্মচারী। আকাশে চাঁদ উঠেছে, চারদিকে জ্যোৎস্নার কারেণ্ট বইছে। মুডের মাথায় হট করে আমার পাইপে এসে ঢুকো না।'

টুনি যেন দারুণ চমকে উঠল, 'না না, কী যে বলেন! যেটুকু আপনাকে দেখেছি তাতে মনে হয়েছে আপনার মতো মানুষ আর হয় না।'

'ঠিক আছে। এখন মুখে ব্রেক কষে দাও তো মানিক। ঘুমোতে দাও।'

পরের দিন অন্ধকার থাকতে থাকতেই ঘুম ভেঙে গেল। শুয়ে শুয়েই ডাকলাম, 'টুনি।'

সঙ্গে সঙ্গে পাশের পাইপ থেকে টুনির সাড়া পাওয়া গেল, 'কী বলছেন?'

ছুকরি কি হোল নাইট ঘুমোয় নি? ভগোয়ান মালুম। পাইপের মুখ দিয়ে ভোর রাতের ফ্যাকাশে আলো এসে ঢুকেছে। দু চারটে তারাও দেখা যাচ্ছে আকাশে। বললাম, 'ভোর হয়ে এল। এবার আমাকে এখান থেকে হড়কে যেতে হবে।'

'এখনই চলে যাবেন?'

'হ্যাঁ। এখন গেলে ফার্স্ট ট্রেনটা ধরতে পারব।' বলতে বলতে হামাগুড়ি দিয়ে পাইপ থেকে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

ওদিকে টুনিও বেরিয়ে এসেছে। তার গালে ফের দাড়ি দেখা যাচ্ছে। খুব সম্ভব রাত্রে শুয়ে শুয়েই ছুকরি রুস্বা মস্তানের মেক-আপ চড়িয়েছে। মহাশয়গণ, আমাকেই শুধু না, ছুঁড়িটাকেও দেখুন। এই সিটিতে টিকে থাকার জন্য কী টেরিফিক কারবারটাই না তাকে করতে হচ্ছে!

টুনি বলল, 'আপনার সঙ্গে আর দেখা হবে না?'

বললাম, 'বলা মুশকিল। আমি হলাম ওয়ার্ল্ড সিটিজেন। কখন কোথায় থাকি, তার ঠিক নেই।' একটু ভেবে বললাম, 'তুই ওই পাইপগুলোতেই এখন থাকবি তো?'

'হ্যাঁ।

'লাট খেতে খেতে যদি এদিকে কখনও চলে আসি, তোর পাইপে ঢুকে পড়ব।'

'যেদিন ইচ্ছা আসবেন। তবে রাত্তিরে এলেই ভাল হয়।'

'ও-কে—'

'আপনার সম্বন্ধে কিন্তু কিছুই বললেন না।'

মার্ক করলাম ছুঁড়ির চোখে-মুখে হেভি কৌতূহল। বললাম, 'বেশি জেনে কী লাভ!

মাথাটাকে জ্ঞানের গোডাউন না করলে কি পেটের ভাত ডাইজেস্ট হচ্ছে না?'

'না, মানে—'

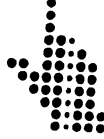
'মানে ফানে নেই। আমার সম্পর্কে বেশি জানতে হবে না। আচ্ছা, চলি।'

'একটু দাঁড়ান।'

'কেন রে?'

টুনি আর কিছু বলল না। আচমকা হাঁটু গেড়ে বসে আমার পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করল।

মহাশয়গণ, আপনারা তো জানেনই আমার মতো একটা ফেরেববাজ, জোচ্চোর, ফোরটোয়েন্টিকে কারো প্রণাম-ট্রণাম করা উচিত না। কেউ আমার পায়ে হাত বা মাথা ঠেকালে দারুণ সুড়সুড়ি লাগে। তবে আগেও সুমনা বোদা আর কনকচাঁপা আমার পায়ে বারকয়েক বডি থ্রো দিয়েছে। তাই টুনি মাথা ঠেকাতে অতটা সুড়সুড়ি আর লাগল না।



হে-হে মহাশয়গণ, সামতানির ছেলে লণ্ডন-বেসড মহেশের জন্যে প্রতাপরুদ্রগড়ের প্রিন্সেস জুটিয়ে দেবার মহান দায়িত্ব ঘাড়ে তুলে নিয়েছি। আপনাদের ডেফিনিটলি তা মনে আছে।

সেই যে সেদিন মহেশের অনারে পার্টি দেওয়া হয়েছিল, তারপর পাক্কা একটা উইক পার হয়ে গেছে। এই সাত দিনে প্রতাপরুদ্রগড়ের প্রিন্সেসকে দেখার জন্য মিনিমাম তের বার আমাকে ফোন করেছেন সমাজপতি।

হে-হে মহাশয়গণ, আমি যে আমি, পিটার স্বয়ম্ভু হোড়—একটা ফেরেববাজ, ফোরটোয়েন্টি, চিট—যে কিনা হাওয়া দিয়ে তিন সেকেণ্ডে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মতো একটা টেরিফিক কারবার বানিয়ে ফেলতে পারে, তার পক্ষেও একটা প্রিন্সেস যোগাড় করতে কিছুটা টাইম লাগবে। অবশ্য একটা রাজকুমারী আমার ব্রেনের ভেতর আছে।

কিন্তু রাজকুমারী থাকলেই তো হয় না। তার জন্য একখানা দুর্দান্ত প্যালেস চাই, ডজনখানেক চাকর-বাকর, দারোয়ান, বয়, বাবুর্চি ইত্যাদি চাই, চাই গণ্ডাখানেক ফোরেন লিমুজিন। চাই, ওয়েলার ঘোড়া আর ফিটন। আসলে একটা অ্যাটমসফিয়ার তৈরি করতে না পারলে সমাজপতি মাকড়ারা প্রিন্সেস বলে কোনো ছুকরিকে অ্যাকসেপ্ট করবে না।

কাজেই মহাশয়গণ, প্রিন্সেস দেখাবার আগে আপাতত আমি প্যালেস জোটাবার ধান্দায় আছি।

সেদিন পার্টি থেকে ফিরে একটা নাইট বেলেঘাটার সেই বাহাত্তর ইঞ্চি পাইপের ভেতর কাটিয়ে পরের দিন মর্নিং-এ আগরপাড়ার ব্যারাকে ফিরে আসি। ফিরেই গ্রেট পঞ্চানন অর্থাৎ পেঁচোকে ডাকিয়ে আনি।

পঞ্চানন আমার ঘরে ঢুকে গোড়ালিতে গোড়ালি ঠেকিয়ে মিলিটারি স্টাইলে একটা স্যালুট ঝেড়ে বলল, 'গুড মর্নিং স্যার।'

'গুড মর্নিং—' বলে পঞ্চাননকে বসতে বললাম।

'হাফ নিল-ডাইন' হবার পোজে আমার মুখোমুখি বসল পঞ্চানন। তাকে বললাম, 'কাঁধে একটা হেভি রেসপনসিবিলিটি ঝুলিয়ে বসেছি পেঁচো।'

'কী রেসপনসিবিলিটি স্যার?'

'পরে শুনিস। এখন তোকে একটা কাজ করতে হবে।'

'একটা কেন, আপনি বললে জান লড়িয়ে একশ বত্রিশটা কাজ করতে পারি। কী করতে হবে সেটাই বলুন।'

'থিয়েটার রোড কি ক্যামাক স্ট্রিট বা আলিপুর ফালিপুরে পুরানো নেটিভ স্টেটের রাজাদের বড় বড় কমপাউণ্ডওলা অনেক বাড়ি আছে।'

'আছে স্যার।'

'ঐ রকম একটা প্যালেসিয়াল বিল্ডিং কিনতে চাই।' বলেই দুম করে একটা কথা মনে পড়ল। যদিও সমাজপতির কয়েক মিলিয়ন টাকা একশ' আটটা নামে একশ' আটটা ব্যাঙ্কে রেখেছি আর তা থেকে ঐ রকম একটা বিল্ডিং কিনে ফেলা একেবারেই ইমপসিবল নয়। কিন্তু ঝামেলা রয়েছে অন্য জায়গায়। প্রতাপরুদ্রগড়ের প্রিন্সেসকে মহেশের সঙ্গে জুড়ে দেবার পর ঐ বাড়িটার ইউটিলিটি আর থাকছে না। তা ছাড়া সত্তর আশি লাখ ক্যাশ একসঙ্গে বার করে দিলে ইনকাম ট্যাক্স, সি. বি. আই. থেকে শুরু করে গভর্নমেণ্টের দেড়শ' ডিপার্টমেণ্ট প্যারেড করে এসে ছেঁকে ধরবে। খানিকক্ষণ চিন্তা-ফিন্তা করে বললাম, 'না না, কেনার দরকার নেই। লিজ নিলেই হবে।'

পঞ্চানন বলল, 'নো প্রবলেম স্যার।'

'নিউজপেপারের 'রিয়াল প্রপার্টি' কলমে রবিবার বাড়ি-ফাড়ির ব্যাপারে অনেক অ্যাডভার্টাইজমেণ্ট বেরোয়।'

'দেখেছি।'

'তার থেকে একটা চুজ করে নিতে হবে।'

'নো প্রবলেম স্যার।'

পেঁচো মাকড়ার আজকাল এই এক কারবার হয়েছে। শ্লা'র গলা দিয়ে পাঁচটা ডায়লগ বেরুলে তার একটা 'নো প্রবলেম'। সব ব্যাপারেই খজড়াটার নিজের ওপর দুর্দান্ত ভরসা। বললাম, 'লিজের ব্যাপারটা ফাইনাল করতে কদ্দিন লাগবে?'

পঞ্চানন বলল, 'কদ্দিনের ভেতর করতে হবে বলুন?'

'ম্যাক্সিমাম এক মাস।'

'ও-কে স্যার, নো প্রবলেম। ক্যাশ খরচা করলে ক্যালকাটায় হয় না, এমন কোনো ব্যাপারই নেই।'

'ফাইন। এবার এখান থেকে ফুটে যা।'

পঞ্চাননের সঙ্গে রাজকুমারীর প্যালেসের কথা ফাইনাল করে আমার সেই অনন্তশয্যায় লাট খেয়ে পড়লাম।

মহাশয়গণ, মাসখানেক মাসদেড়েক আগরপাড়ার ব্যারাকবাড়িতে আর সমাজপতির গড়িয়াহাটার অ্যাপার্টমেণ্টে থেকে হ্যাবিট খারাপ হয়ে গেছে। সি. এম. ডি. এ'র পাইপে কাল রাত্তিরে ভাল ঘুম ফুম হয় নি।

ঝাড়া তিনটে ঘন্টা ঘুমিয়ে যখন উঠলাম, বারটা বেজে গেছে।

কার্ডবোর্ডের পার্টিশানের ওধারে বোদা আর কনকচাঁপার গলা পাওয়া যাচ্ছে। মাকড়া দুটো চুটিয়ে সংসার করে যাচ্ছে।

মহাশয়গণ, একটা ব্যাপার ডেফিনিটলি আপনারা মার্ক করেছেন, বিয়ের পর থেকে বোদা হারামীটা হোল্ড ডে অ্যাণ্ড নাইট কনকচাঁপার গায়ে অ্যাডেসিভের মতো জুড়ে আছে। এক মিনিটের জন্যও দুটোকে সেপারেট করা যায় না। থাকো মানিক, জুড়েই থাকো। কিন্তু কদ্দিন? চোখ থেকে নেশাফেশা ছুটে যাক, তারপর দেখব এত লদগা-লদগি কোথায় থাকে?

শুয়ে শুয়ে ওদের গ্যাদগেদে ডায়লগ শুনতে শুনতে আচমকা ব্রেনে হাজার ওয়াটের বাল্ব জ্বলে উঠল। ডাকলাম, 'বোদা অ্যাণ্ড কনকচাঁপা—'

'ইয়েস গুরু—'সঙ্গে সঙ্গে বোদা সাড়া দিল।

'কদ্দিন তোদের বিয়ে হয়েছে?'

'বাইশ দিন গুরু।'

'বাইশ দিনে দু'জনে যা কথা বলেছিস তা লিখলে বাহান্ন হাজার পাতার দশখানা বই হয়ে যায়।'

'হে-হে-হে-হে মাইরি গুরু, তোমার ডায়লগের জবাব নেই। হে-হে-হে—' খ্যাক খ্যাক করে হাসতে লাগল বোদা।

বললাম, 'নিজেদের ডায়লগে ইন্টারভ্যাল দিয়ে একবার আমার তাঁবুতে আসতে পারবি?''

'সিওর গুরু, এক্ষুণি আসছি।'

এক মিনিটও লাগল না, বোদা আর কনকচাঁপা পার্টিশানের এধারে এসে আমার পার্মানেন্ট অনন্তশয্যার কাছে পাশাপাশি বসল।

চোখের তার দুটো অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেলে এনে বললাম, 'তোদের একটা ব্যাপার মার্ক করছি বোদা।'

'কী ব্যাপার?'

'বাইশ দিন কনকচাঁপার কাছ থেকে নড়িস নি, বাইরে গেলেও ওকে ঘাড়ে ঝুলিয়ে নিয়েছিস।'

'সিওর গুরু। আমার নিউ ওয়াইফ। এখন মিনিমাম ছ'মাস এরকম চলবে।'

'চলুক। লেকেন—'

'লেকেন কী?'

'বহোত হুঁশিয়ার।'

'কেন গুরু?'

'গভর্নমেন্ট বলে দিয়েছে দো আউর তিন বাচ্চে, তারপর ফুল ইস্টপ। বেশি ভোটার বাড়িও

না মানিক।'

'গুরু, আমি এমনিতে হারামী হলেও গুড বয়। গবরমেন্ট যা বলবে তাই শুনব।'

'ফাইন। এবার মন দিয়ে শোন, একটা কাজ করতে হবে তোদের।'

'অর্ডার দাও।'

'তুই তো হিন্দি বলতে পারিস।'

ট্যারাবাঁকা বত্রিশটা দাঁত বার করে হাসল বোদা। বলল, 'গুরু, মায়ের পেট থেকে ওয়ার্ল্ডে পড়ার পরই কী করেছিলাম জানো?'

বোদাকে দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী?'

'এক দৌড়ে স্ট্রেট সিনেমা হল-এ গিয়ে হিন্দি ছবি দেখার জন্য লাইন দিয়েছিলাম।'

'শ্লা খজড়া—'আলতো করে বোদার পিঠে এক কিক ঝাড়লাম।

'হ্যাঁ গুরু, বিশ্বাস কর। আমার আটাশ বছরের লাইফে কমসে কম হাজার চারেক হিন্দি সিনেমা দেখেছি। আমার বডির চামড়া সরালে দেখবে হেমা ধর্মেন্দ্র অমিতাভ রেখা আমজাদ থেকে স্টার্টকরে অশোককুমার দিলীপকুমার রাজকাপুর শাম্মীকাপুর নিম্মি শাকিলা মীনাকুমারী মধুবালা নূতন—সবার পেন্টিং ঝুলছে। কোন বইয়ের হিরো, হিরোইন, না ভিলেন—কার ডায়লগ শুনতে চাও? এখনই ঝেড়ে দিচ্ছি।' বলতে বলতে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল বোদা। টেরিফিক ফিলিংসের মাথায় সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে বলতে লাগল, 'একটা পিকচারে পয়সাবালা বাপের একমাত্র মেয়ে এক গরিব ছোকরাকে মহব্বত করে বিয়ে করতে চলেছে। বাপ রাজি না। বাপ বলছে, বচপনসে ম্যায় হুঁ তেরে বাপ, তেরে মা—'

হাত তুলে বোদাকে থামিয়ে দিলাম, 'স্টপ, স্টপ—বুঝেছি হিন্দিটা তুই রিয়ালি জানিস।'

বোদা দাঁত বার করতে করতে বসে পড়ল।

এবার কনকচাঁপার দিকে তাকালাম, 'তুমি হিন্দি জানো?'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল কনকচাঁপা। বলল, 'ভাল জানি না। তবে বুঝতে পারি।'

'হিন্দিটা তো ঝটপট শিখতে হবে।'

কনকচাঁপা কিছু বলার আগেই বোদা বলে উঠল, 'কদ্দিনের ভেতর?'

বললাম, 'ধর মাসখানেক।'

'ফিকর মাত কিজিয়ে জনাব। আজসে মেরা ধরম পত্নীকা হিন্দিমে পুরা তালিম শুরু হো যায়েগা।' বলেই বোদা কনকচাঁপার দিকে ফিরল, 'শুনো পত্নীজি, আজসে বাংলা-উংলামে বাতচিত পুরা বন্ধ। সিরিফ হিন্দিমে ডায়লগ চলেগা। সমঝি?'

কনকচাঁপা তক্ষুণি ঘাড় হেলিয়ে দিল, 'সমঝি মহারাজ।'

বোদা আমাকে বলল, 'মার্ক কর গুরু, এক মিনিটের তালিমে আমার ধরমপত্নীর গলা দিয়ে কেমন হিন্দি বার করে আনলাম।'

'ফাইন।'

বোদা এবার ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেলে আমার দিকে তাকিয়ে ঠোঁট কামড়াতে লাগল।

কয়েক সেকেণ্ড তাকে দেখে বললাম, 'কিরে শ্লা, কিছু বলবি?'

'হ্যাঁ।'

'বলে ফেল।'

'হিন্দিতে ভাল করে তালিম দিতে হলে কনকচাঁপাকে ডেইলি দুটো করে হিন্দি সিনেমা দেখাতে হবে।'

'দেখাবি।'

'সিনেমার পর রেস্টুরেন্টে খাওয়াতে হবে।'

'খাওয়াবি।'

'লেকেন তোমার কাছ থেকে যে অ্যালাউয়েন্স পাই, তাতে স্রিফ সংসারটাই চলে।' বলে ব্রেক কষল বোদা।

মাকড়া কী বলতে চায়, বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়। বললাম, 'সিনেমা আর রেস্টুরেন্টের জন্য এক্সট্রা অ্যালাউয়েন্স পাবি।'

আমার পায়ে নাক ঘষাতে ঘষাতে বোদা বলল, 'গুরু তোমার মতো দাতা কর্ণ ওয়ার্ল্ডে আর পয়দা হয় নি।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। এবার বডি তুলে উঠে পড়।'

বোদা উঠে বসল। বললাম, 'আরেকটা কাজ করতে হবে তোকে।'

'বল।'

'আজিজ পল্টাদের বলবি কাল মর্নিং-এ আমার সঙ্গে যেন দেখা করে।'

'ও-কে গুরু। লেকেন—'

'কী রে?'

'ওদেরও হিন্দি শিখতে বলবে নাকি?'

এই বোদা মাকড়াটার চোখে ধুলো দিয়ে কিছু করবার উপায় নেই। কেউ হাঁ করলে ও তার পেটের তলা পর্যন্ত দেখতে পায়। বলল, 'কেন গুরু, এতগুলো মালকে হিন্দিতে তালিম নিতে বলছ কেন? জরুর তোমার কোনো ধান্দা আছে।'

বললাম, 'সিওর। তোরা সব প্রতাপরুদ্রগড়ের রাজকুমারীর বেয়ারা ড্রাইভার বাবুর্চি সখী ফখী হবি। প্রতাপরুদ্রগড়টা কোথায় জানিস?'

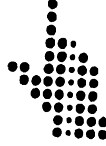
'না।' ডাইনে এবং বাঁয়ে জোরে জোরে মাথা নাড়তে লাগল বোদা।

'মধ্যপ্রদেশে। মধ্যপ্রদেশের প্রিন্সেসের বয়-বাবুর্চিরা তো আর বাংলায় কথা বলবে না। বলবে হিন্দিতে। সমঝা?'

'সমঝা। আবার নেহি সমঝা। মধ্যপ্রদেশের প্রিন্সেসটা আবার কোত্থেকে জুটল গুরু?'

'ওয়েট, ওয়েট। থোড়েসে সবুর কর। তারপর সব জানতে পারবি। এখন এখান থেকে দু'জনে হড়কে যা।'

চোখের তারা খানিকক্ষণ ফিক্সড হয়ে রইল বোদার। তারপর কনকচাঁপাকে সঙ্গে করে সে বেরিয়ে গেল।



মহাশয়গণ, পেঁচো মাকড়া মানে পঞ্চানন একেবারে ম্যাজিক দেখিয়ে ছাড়ল। পুরো তিনটে উইকও কাটল না, তার আগেই লোয়ার সার্কুলার রোডে নর্থ ইণ্ডিয়ার এক মহারাজার প্যালেস তিন বছরের 'লিজে' বাগিয়ে ফেলল। ডিডস-ফিডস কমপ্লিট করার পর সে আমাকে বলল, 'স্যার প্যালেসটা একবার দেখবেন চলুন।'

সবে ঘুম থেকে উঠে তুড়ি দিয়ে দিয়ে হাই তুলছিলাম। কাল রাত্তিরে সোনার বাংলাটা একটু বেশিই খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। মাথার ভেতর তার ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিকটা বেজেই যাচ্ছে। হ্যাং-ওভার কাটতে এখনও ঝাড়া একটা ঘণ্টা লেগে যাবে। ঠিক এই সময় পেঁচো আমার ঘরে 'ইন' করেছে।

বললাম, 'বোস।'

আমার বিছানা থেকে আড়াই ফুট দূরে মেঝের ওপর বসল পঞ্চানন। তারপর বিগ সাইজের একটা বিড়ি ধরিয়ে গাঁজার কলকের কায়দায় ফুঁকতে লাগল। এটাই ওর বিড়ি বা সিগারেট ফোঁকার স্টাইল।

আবার জিজ্ঞেস করলাম, 'কবে বাড়ি দেখাতে চাস?'

'এনি ডে। আজ বললে আজই।'

একটু ভেবে বললাম, 'ঠিক আছে, আজই যাব।'

পেঁচো বলল, 'কখন স্যার?'

'দুপুরে। সাড়ে বারটায় চলে আসিস।'

'ও-কে।'

পঞ্চানন বডি তুলে বেরিয়ে গেল।

আরো আধ ঘণ্টা তুড়ি বাজিয়ে আর হাই তুলে খোয়ারি কাটালাম। তারপর ডাকলাম, 'বোদা—'

পার্টিশানের ওধার থেকে সঙ্গে সঙ্গে বোদার গলা পাওয়া গেল, 'ইয়েস গুরু।'

'তোর থোবড়াটা একবার দেখতে চাই।'

'আতা হ্যায়।'

বোদা দরজার সামনে আসতেই বললাম, 'ভেতরে ঢুকতে হবে না। সুমনাকে ডেকে নিয়ে আয়।'

গলার স্বরটা ঝট করে অনেকটা নামিয়ে বোদা বলল, 'গুরু, কারবারটা কী? কোনোদিন তো ঐ মেয়েটাকে ডাকো না—' বলে একটা চোখ কুঁচকে ঠোঁট কামড়াতে লাগল।

হে-হে মহাশয়গণ, আপনারা সবাই জানেন বোদা একখানা প্রথম শ্রেণীর হারামী। সুমনার যে আমার সম্বন্ধে স্লাইট উইকনেস আছে, মাকড়া তা জানে। বললাম, 'খজড়ামো না করে যা

বলছি তাই করে ফেল।'

মুখে একটা সাসপিসাস হাসি ফুটিয়ে কান্নিক মারতে মারতে বোদা উঠোনে নেমে গেল। একটু পর সুমনাকে সঙ্গে করে ফিরে এসে বলল, 'গুরু আমি কি এন্ট্রি নেব, না আউট হয়ে যাব?'

'আউট হয়ে যা।'

বোদা চলে গেল। সুমনা ঘরে ঢুকে একধারে দাঁড়িয়ে রইল। তার চোখের তারা আমার ওপর ফিক্সড হয়ে আছে।

বললাম, 'স্ট্যাচু হয়ে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বোস।'

একটা কথাও না বলে আমার মুখোমুখি বসে পড়ল সুমনা। তার চোখেমুখে প্রচণ্ড বিস্ময়।

বললাম, 'খুব অবাক হয়ে গেছে, তাই না?'

'তা হয়েছি—' সুমনা আস্তে আস্তে মাথাটা ডান দিকে পনের সেন্টিমিটার হেলিয়ে দিল, 'কোনোদিন তো ডাকেন না। ভাবছি, হঠাৎ আমার এত সৌভাগ্য হল কেন?'

সুমনার ভয়েসটা কাঁপা-কাঁপা। শুদ্ধ ভাষায় যাকে অভিমান বলে তাই বোধহয় মাখানো আছে। মহাশয়গণ, আপনারা তো জানেনই আমি ফোবটোয়েন্টি, দুর্ধর্ষ ফেরেববাজ, কোনোরকম সেন্টিমেন্ট ফেন্টিমেন্টের ধার ধারি না। সেন্টিমেন্ট হল এক রকমের ক্যাঁচাকল, তার ভেতর ঠ্যাং ঢুকিয়েছি কি ফেঁসে গেছি। আমি এসব ঝামেলায় নেই। বললাম, 'তোমার সঙ্গে একটা আর্জেন্ট কারবার আছে।'

'বলুন—' দারুণ আগ্রহ নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল সুমনা।

কিভাবে স্টার্ট কবব, বুঝতে পারছি না। মনে মনে একটু গুছিয়ে নিয়ে ঝট করে বলে ফেললাম, 'তোমাকে প্রতাপরুদ্রগড়ের প্রিন্সেস হতে হবে।'

ঝাড়া দু মিনিট হাঁ করে রইল সুমনা, কিন্তু তার গলা দিয়ে একটা আওয়াজও বেরুল না। তারপর প্রায় চেঁচিয়েই উঠল সে, 'প্রিন্সেস!'

'ইয়েস ম্যাডাম, বাংলা ভাষায় যাকে রাজকুমারী বলে।'

নিজের বুকে একটা আঙুল ঠেকিয়ে সুমনা বলল, 'আমি রাজকুমারী হব!'

'রাইট।'

'কিন্তু আমি—'

ডায়লগটা ফিনিশ করতে দিলাম না সুমনাকে। মাঝখানে তাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, 'জানি। তোমার ফোরটিন জেনারেশনে কেউ কোনোদিন রাজা ফাজা ছিল না। তুমি নেহাতই লোয়ার মিডল ক্লাস ফ্যামিলির মেয়ে। তাতে কিছু যায় আসে না।' দুই আঙুলে টাকা বাজাবার ভঙ্গি করে বললাম, 'এথি থাকলে যে কেউ প্রতাপ রুদ্রগড়ের কেন, হোল ওয়ার্ল্ডের এম্পারার হতে পারে। তোমার নামে কয়েক কোটি টাকা ব্যাঙ্কে ডিপোজিট করে দেব। একটা প্যালেসেরও ব্যবস্থা করে ফেলেছি।'

সুমনার চোখ দুটো বিরাট দুই সার্কেল হয়ে গেল। ঢোক গিলতে গিলতে সে বলল, 'কয়েক কোটি! প্যালেস!'

আমি দাঁত বার করলাম। চোখ কুঁচকে হাসতে হাসতে বললাম, 'কয়েক কোটি তো কিসসু না, নাথিং নাথিং। আমার কাছে যখন এসেই গেছ, তোমাকে সসাগরা পৃথিবী না কী যেন বলে, তার মাথায় বসিয়ে দেব।'

'কিন্তু—'

'আবার কী?'

'আমার ভীষণ ভয় করছে।'

'কিসের ভয়?'

'কোনো বিপদে পড়ে যাব না তো?'

'ফুঃ! আমি যখন আছি তখন কেউ তোমার চামড়া টাচ করতে পারবে না।'

সুমনা চুপ করে রইল।

বুঝতে পারছি, ছুকরির মন থেকে ভয়টা পুরোপুরি কাটছে না। বললাম, 'আমার ওপর বিশ্বাস আছে তো?'

গাঢ় গলায় সুমনা বলল, 'নিশ্চয়ই। আপনি আমাকে নরক থেকে তুলে এনেছেন। আপনার কাছে আমাদের ফ্যামিলির কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।'

আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল সুমনা। হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিলাম, 'ব্যাস, ব্যস। কৃতজ্ঞতা-ফৃতজ্ঞতা বললে আমার শরীর খারাপ হয়ে যায়।'

সুমনা এবার কিছু বলল না।

আমি আবার বললাম, 'তোমার জন্যে লোয়ার সার্কুলার রোডে একটা বাড়ি নিয়েছি! এই উইকের ভেতর সেখানে যেতে হবে।'

সুমনা জিজ্ঞেস করল, 'আমি একাই যাব?'

'এখন একাই যাবে। পরে তোমার ফ্যামিলিকে ওখানে শিফট করিয়ে দেব। ও-কে?'

এক সেকেণ্ড কী ভাবল সুমনা। তারপর বলল, 'ঠিক আছে। আপনি যা বলবেন তা-ই করব।'

'কথা হয়ে গেল। এখন ঘরে যাও।'

সুমনা আর বসল না, উঠোন পেরিয়ে নিজেদের ঘরের দিকে চলে গেল।

হে-হে মহাশয়গণ, এতক্ষণ আপনারা ডেফিনিটলি দমবন্ধ করে ছিলেন। ভাবছিলেন, আলটিমেটলি আমি তো স্রেফ হাওয়া দিয়ে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল কি তাজমহলের মতো টেরিফিক কারবার করে ফেলতে পারি, একটা প্রিন্সেস জোটানো আমার পক্ষে কোনো ব্যাপারই না। আপনাদের জানিয়ে রাখি, সুমনাকে এক দেড় মাসের ভেতর সমাজপতি অ্যাণ্ড কোম্পানির কাছে প্রতাপরুদ্রগড়ের রাজকুমারী হিসেবে প্রেজেন্ট করব।

তারপর কী হবে? থোড়েসে ওয়েট করুন মহাশয়রা। আমি ফিউচারের পুরো প্রোগ্রাম ঠিক করে রেখেছি। পরে সব জানতে পারবেন। ততদিন ধৈর্য ধরে থাকুন।



মহাশয়গণ, অভ্যুদয় মিটার আমাকে কিন্তু ছাড়ছেন না। মাকড়া একেবারে অ্যাডেসিভের মতো আমার বডিতে সেট করে আছে। সামতানির লণ্ডন-বেসড ছেলের জন্য সুমনাকে যে প্রতাপরুদ্রগড়ের প্রিন্সেস বানাবার প্ল্যান করেছি, তা তো আপনারা জানেনই। ব্যাপারটা খুব ইজি না। এই নিয়ে মিনিমাম দু-তিন মাস ডে-অ্যাণ্ড-নাইট লেগে থাকা দরকার। কিন্তু অভ্যুদয় আমাকে নিঃশ্বাস ফেলতে দিচ্ছেন না। রোজ দুপুরে গড়িয়াহাটার অ্যাপার্টমেন্টে এলেই আমাকে কম করে চার পাঁচটা ফোন করছেন।

আজও দুপুরে পবিত্র খালসা হোটেলে একখানা পবিত্র লাঞ্চ সেরে ক্যালকাটায় আসতেই অভ্যুদয়ের ফোন এল। মনে মনে বাছা বাছা গোটাকয়েক উৎকৃষ্ট খিস্তি ঝেড়ে গলায় অনেকখানি মবিল লাগিয়ে বললাম, 'বলুন স্যার।'

'কী ব্যাপার, তুমি আমার কেসটা ভুলে গেলে নাকি?'

'না না, ভুলব কেন?'

'না ভুললে আমকে হাওয়ায় ঝুলিয়ে রেখে সামতানির কেসটা তো দিব্যি টেক-আপ করে ফেললে!'

'স্যার, সামতানি সাহেবের ছেলে কয়েক মাস পর লণ্ডন চলে যাবে। তার জন্যে একটা কনে জোগাড় না করে দিলে খুব খারাপ দেখায়। আমরা থাকতে দেশে এসে ছেলেটা বিয়ে করে ফিরে যেতে না পারলে আমাদেরই লজ্জা। স্যার, কাউকে তখন আমার থোবড়া দেখাতে পারব না। সামতানি সাহেবের কেসটা টেরিফিক আর্জেন্ট। তাই—'

আমাকে আর কিছু বলার চান্স না দিয়ে প্রায় চেঁচিয়েই উঠলেন অভ্যুদয়, 'আর আমার কেসটা বুঝি কম আর্জেন্ট? জানো, এম. এল. এ হবার জন্য তোমাদের ঐ আগরপাড়ায় কত টাকা ইনভেস্ট করেছি?'

বললাম, 'জানি স্যার, অ্যাবাউট সেভেন এইট ল্যাখ। নিজের হাতেই তো ঐ ক্যাশটা খরচ করলাম।'

'টাকাটা স্রেফ জলে চলে গেল। অবশ্য সাত আট লাখের জন্য আমি মরে যাচ্ছি না। আরো দশ বিশ লাখ যাক, আই ডোণ্ট কেয়ার। কিন্তু আমার এতদিনের একটা ইচ্ছে, এত বড় একটা অ্যাম্বিশান তুমি থাকতে ফুলফিল হবে না স্বয়ম্ভু?'

মনে মনে বললাম, 'হওয়াচ্ছি শালা। আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি তোমাকে পিপলস রিপ্রেজেণ্টেটিভ হতে দিচ্ছি না। তোমার মতো মাল এম. এল. এ, এম. পি কি মিনিস্টার হলে ইণ্ডিয়ার ফিউচার ঝাঁঝরা হয়ে যাবে।' মুখে অবশ্য বললাম, 'নিশ্চয়ই হবে স্যার। আপনার জন্যে আমি লাইফ দিয়ে দেব। স্রেফ ক'টা দিন ধৈর্য ধরে থাকুন। সামতানি সাহেবের ছেলের ব্যাপারটা ফাইনাল করে এনেছি। ওটা হয়ে গেলেই আপনাকে নিয়ে স্ট্রেট নর্থ বেঙ্গলে চলে যাব। যদ্দিন

না ইলেকশান হচ্ছে আর কারো কেস নেব না।'

'কথা দিলে?'

'ডেফিনিটলি স্যার।'

'সামতানির ছেলের ব্যাপারটা কবে নাগাদ শেষ হবে বলে মনে করছ?'

'ম্যাক্সিমাম দু'মাস।'

'অলরাইট। দু'মাস পর আর কোনো কথা শুনব না কিন্তু।'

মহাশয়গণ, সামতানির সঙ্গে কথাবার্তার পর ঝাড়া আড়াই ঘণ্টা টানা ঘুম লাগালাম। যখন ঘুমটা ভাঙল, সাড়ে চারটে বেজে গেছে। উঠে মুখ ধুয়ে ঠিক করলাম, আগরপাড়ায় ফেরার আগে আজ তিনটে সলিড কাজ করে যাব। নাম্বার ওয়ান, গড়িয়াহাটের এই অ্যাপার্টমেন্ট থেকে প্রথমে যাব লোয়ার সার্কুলার রোডের সেই প্যালেসটায়, পঞ্চানন তিন বছরের জন্য যেটা লিজ নিয়েছে। এখন সেখানে ডে অ্যাণ্ড নাইট রেনোভেশনের কাজ চলছে। নাম্বার টু, প্যালেস দেখার পর দু নম্বর যে কাজটা হবে সেটা হল, একজন করে ভাল স্পোকেন ইংলিশ আর স্পোকেন হিন্দির টিচার যোগাড় করা। কাল টেলিফোন ডাইরেক্টরি দেখে দু'জনের অ্যাড্রেস টুকে নিয়েছি। আজ তাঁদের সঙ্গে কনট্যাক্ট করতে হবে। নম্বার থ্রিটা ভেরি ইমপর্টান্ট। পেঁচি বা খেঁদিকে প্রিন্সেস বললেই তো আর প্রিন্সেস হয়ে যায় না। রাজকুমারীর কথা বলার স্টাইল, চলাফেরা, ওঠাবসা, আদবকায়দা, সব কিছুই আলাদা। সুমনার চেহারায়, চালচলনে আগরপাড়ার ব্যারাকবাড়ি পার্মানেন্ট স্ট্যাম্প মেরে রেখেছে। সেটাই ন্যাচারাল। সে ওখানে জন্মেছে, তারপর তেইশ চব্বিশটা বছর ওখানেই কাটিয়ে দিয়েছে। তার গা থেকে ঘষে ঘষে আগড়পাড়ার গন্ধ তুলে রাজকুমারীর পালিশ ফোটানো সহজ না। মহাশয়গণ, সেই জন্য মনপুরার এক্স-দেওয়ানের সঙ্গে কাল দুপুরে একটা অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করেছি। আজ সন্ধে সাতটায় আলিপুরে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হবে। সুমনাকে এঁর হাতে তুলে দেব। আগরপাড়ার এক বস্তির ছুকরিকে এক মাসের ভেতর প্রতাপরুদ্রগড়ের প্রিন্সেস বানিয়ে তুলতে হবে। অ্যাপয়েণ্টমেণ্টটাই করেছি, কিন্তু এখনও এক্স-দেওয়ানকে কাজের ব্যাপারটা জানানো হয় নি। সেটা সামনাসামনি বলব।

প্রোগ্রাম ঠিক করে আর এক মিনিটও বসে থাকলাম না, স্ট্রেট লিফটে ঢুকে গ্রাউণ্ড ফ্লোরে নেমে এলাম। রাস্তায় আসতেই সঙ্গে সঙ্গে ট্যাক্সি পাওয়া গেল। সেটা ধরে প্রায়োরিটি অনুযায়ী এলাম লোয়ার সার্কুলার রোডে।

নর্থ ইণ্ডিয়ার এক ওল্ড নেটিভ স্টেটের এক্স-রাজার বিরাট প্যালেসের কাছে আসতেই চোখে পড়ল, এই মোমেন্টে মিনিমাম দু'শ লেবারার কাজ করছে।

গেটের কাছে পঞ্চাননের সঙ্গে দেখা। মহাশয়গণ, এ বাড়ি 'লিজ' নেবার পর থেকে মাকড়া এখানেই তাঁবু ফেলেছে। লাস্ট পনের কুড়ি দিন সে একবারও আগরপাড়ায় ফেরে নি। শালা টেরিফিক সিনসিয়ার, কোনো কাজের মধ্যে 'ইন' করে গেলে বাহ্যি-পেচ্ছাপের কথা পর্যন্ত ভুলে যায়।

আমাকে দেখে পঞ্চানন দৌড়ে কাছে এল। বলল, 'আসুন স্যার, আসুন—'

ট্যাক্সি ভাড়া চুকিয়ে পঞ্চাননের পেছন পেছন প্যালেসে গিয়ে ঢুকলাম। বিরাট তেতলা রাজবাড়িটা সে আমাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাতে লাগল।

ভেতরের ওয়াল বা সিলিং-এ যে সব জায়গা ভেঙেচুরে গিয়েছিল, সব সারিয়ে ফেলা হয়েছে। ফ্লোরের ফাটা টাইলসের জায়গায় নতুন টাইলস বসানো হয়েছে। দেয়াল ডিসটেম্পার করে দুর্ধর্ষ রং করিয়েছে পঞ্চানন। বাথরুমে নতুন শাওয়ার, কমোড আ বাথ টাব বসিয়েছে।

রিপেয়ারের কাজ কমপ্লিট হবার পর এখন ইনটেরিয়র ডেকরেটরদের কাজ চলছে। তারা কার্পেট পাতছে, দামি ইলেকট্রিক ফিটিংস লাগাচ্ছে। সিলিং থেকে প্রতিটি কামরায় ঝুলিয়ে দিচ্ছে শ্যাণ্ডেলিয়ার। দরজায় জানালায় পর্দা লাগানো হচ্ছে। বার্নিশ দিয়ে নতুন নতুন আলমারি আর ওয়ার্ডরোব ঝকঝকে করা হচ্ছে।

ভেতরে যখন ইনটেরিয়র ডেকরেটরদের কাজ চলছে, বাইরে দু'শ মেসন মানে রাজমিস্তিরি ভারা বেঁধে ভাঙাচোরা দেযাল রিপেয়ার করছে।

সব দেখাতে দেখাতে পঞ্চানন বলল, 'কাজ কেমন হচ্ছে স্যার?'

বললাম, 'টেরিফিক। শ্লা, তোর মতো একটা কোহিনূর ডায়মণ্ড আগরপাড়ার বস্তিতে কেন যে পড়ে আছে, কে জানে। তোর হাতে হোল ইন্ডিয়ার সব কনস্ট্রাকশনের রেসপনসিবিলিটি তুলে দেওয়া উচিত।'

'হে-হে, কী যে বলেন স্যার—' আমার মুখে প্রশংসা-ফ্রশংলা শুনে পেঁচো মাকড়া একেবারে গলে গেল।

বললাম, 'সব কাজ কমপ্লিট হতে আর কত দিন লাগবে?'

'ম্যাক্সিমাম পনের দিন। তবে আপনি যদি অর্ডার করেন, এক উইকের ভেতর শেষ করে দেব। আর শ' খানেক লেবারার লাগাতে হবে শুধু।'

'দরকার নেই। পনের দিনের ভেতর কমপ্লিট করতে পারলেই হবে। তুই লেবারারদের কাজ দ্যাখ, আমি হড়কে যাই।'

প্যালেস থেকে বেরিয়ে প্রথমে গেলাম কিড স্ট্রিটে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মিস মেবি হ্যারয়েটের স্পোকেন ইংলিশ স্কুল 'টিউলিপ'-এ। সুমনাকে ইংরেজি শেখাবার কথা বলতেই মধ্যবয়সিনী মিস হ্যারিয়েট জানালেন, গ্ল্যাডলি তিনি এ দায়িত্ব নেবেন এবং দু মাসের ভেতর সুমনাকে এমন তালিম দেবেন, যাতে চোখ বুজে তার ইংরেজি শুনলে মনে হবে, অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজে পড়া খাস ব্রিটিশ যুবতী কথা বলছে। তবে—'

জিজ্ঞেস করলাম, 'তবে কী ম্যাডাম?'

মিস হ্যারিয়েট বললেন, 'বুঝতেই পারছেন, বস্তির এক মহিলার জিভে ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট ফোটাতে হবে। কাজটা ট্রিমেণ্ডাস—'

মেয়েমানুষটা কী সিগনাল দিচ্ছে, একটু একটু বুঝতে পারছি। বললাম, 'ডেফিনিটলি ম্যাডাম। এটা অলমোস্ট বোবার মুখে বোল ফোটাবার মতো হার্ড টাস্ক।'

'সেই জন্যেই বলছিলাম, আমার ফি-টা একটু বেশিই দিতে হবে। মানে আমার লেবারের

কথা বিবেচনা করে—'

'নো প্রবলেম ম্যাডাম। আপনি যা এক্সপেক্ট করছেন তার চাইতে মিনিমাম ওয়ান থাউজেণ্ড বেশি পাবেন। তবে আমি যা চাই সেটা কিন্তু হতে হবে। এক মাস পর আপনার ছাত্রীর জিভ থেকে পারফেক্ট অ্যাকসেণ্ট বেরুতেই হবে।'

মিস হ্যারিয়েট হাত তুলে অ্যাসুয়েরেন্স দেবার স্টাইলে বললেন, 'নো প্রবলেম স্যার—'

কিড স্ট্রিটের 'টিউলিপ' থেকে বেরিয়ে এবার গেলাম কলাকার স্ট্রিটে বদ্রীনারায়ণ চৌবের কাছে। একটা কলেজের হিন্দির হেড অফ দি ডিপার্টমেন্ট চৌবেজি আমার আসার কারণটা জেনে বললেন, 'চিন্তা না কিজিয়ে হোড়জি—আপনি কী চান, বলুন।'

'কী চাই মানে?'

'যে মেয়েটির কথা বললেন তার মুখে খড়ি বুলি বসাব, না বিহারী ছেকাছেনি, না লক্ষ্ণৌর উর্দু মেশানো হিন্দি? যদি বলেন দিল্লির গুরুমুখী মেশানো হিন্দি, কি বোম্বাই-এর খিচড়ি হিন্দি, বা বারাণসীর বিশুদ্ধ হিন্দিও বসিয়ে দিতে পারি।'

মহাশয়গণ, আমার ব্রেনে চক্কর লেগে গেল। এতগুলো হিন্দি থেকে কোনটা বেছে নেব, ঠিক করে উঠতে সময় লাগল। আচমকা মনে পড়ল সুমনা যে নেটিব স্টেটের প্রিন্সেস হবে সেটা এম. পি, মানে মধ্যপ্রদেশে। বললাম, 'মধ্যপ্রদেশের হিন্দি শেখাতে হবে চৌবেজি।'

'চিন্তা না কীজিয়ে হোড়জি। এম. পি, রাজস্থান, ইলাহাবাদ, যেখানকার হিন্দি চাইবেন, ব্যবস্থা হয়ে যাবে। এখন কথা হচ্ছে, মধ্যপ্রদেশের কোন রিজিয়নের হিন্দি শেখাবো বলুন। ভূপাল, না বিলাসপুর, না জব্বলপুর—কাঁহাকা?'

মাকড়া বার বার আমাকে ঝামেলায় ফেলে দিচ্ছে। ঘাঘী উকিলদের মতো এমন সব কোশ্চেন করছে যে চুল খাড়া হয়ে উঠছে। একটু ভেবে মরিয়ার মতো বললাম, 'ভূপালের হিন্দিই সুমনার জিভে বসিয়ে দেবেন।' ভূপাল যখন মধ্যপ্রদেশের ক্যাপিটাল তখন ওখানকার হিন্দিটাই স্ট্যাণ্ডার্ড হবে বলে আমার ধারণা।

চৌবেজি বললেন, 'চিন্তা না কীজিয়ে। ভগোয়ান বিষ্ণুকা কিরপাসে সব ঠিক হো যায়েগা। লেকেন—' বলে হাত কচলাতে লাগলেন।

বিষ্ণুভক্ত চৌবেজির 'লেকেন' কথাটায় আর হাত কচলানোর ভঙ্গিতে একটা সিগনাল ছিল। সেটা বুঝতে এতটুকু অসুবিধা হল না। বললাম, 'লেকেন কী?'

'এই কাজটায় খুবই পরিশ্রম। আমার পারিশ্রমিকটার কথা দয়া করে মনে রাখবেন।'

মিস হ্যারিয়েটকে যা বলেছি, চৌবেজিকেও হুবহু তা-ই বললাম। অর্থাৎ আমাকে খুশি করে দিতে পারলে চৌবেজি যে টাকা আশা করেন তার চাইতে আরো এক হাজার এক্সট্রা পাবেন।

দু'জনের সঙ্গে কথাবার্তা ফাইনাল করে এবার চলে এলাম আলিপুরে। মনপুরা স্টেটের এক্স-দেওয়ান রামরতন উপাধ্যায় তাঁর বিরাট কমপাউণ্ডওলা তেতলা বাড়ির বিরাট লন-এ গার্ডেন আমব্রেলার তলায় গোল বেতের চেয়ারে বসে ছিলেন।

বাড়ির চেহারা, গেটের গোর্খা দারোয়ান আর লন ফন দেখে টের পাওয়া যায়, মাকড়া মনপুরা স্টেটকে ফাঁকা করে ছেড়েছে।

দারোয়ান আমাকে রামরতনের কাছে পৌঁছে দিয়ে ফের গেটে চলে গেছে। রামরতন আমাকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে বিশুদ্ধ বাংলায় বললেন, 'বসুন মিস্টার হোড়।'

আমি বসার পর রামরতন বসলেন। তাঁর বয়স সত্তর পেরিয়ে গেছে। এত বয়সেও পিঠ নুয়ে পড়ে নি, বডি বল্লমের ফলার মতো স্ট্রেট, হাইট ছ ফুটের ওপরে, টকটকে রং, কাঁচাপাকা চুল ব্যাক-ব্রাশ করা, গাল নিখুঁত কামানো। পরনে এক্সপার্ট টেলরের তৈরি দামি স্যুট। লোকটা পা থেকে চুলের ডগা পর্যন্ত পারফেক্ট সাহেব।

উপাধ্যায় বললেন, 'বলুন আপনার জন্য কী করতে পারি।'

জানালাম, একটি মেয়েকে আদবকায়দা শিখিয়ে পুরোপুরি প্রিন্সেস বানিয়ে দিতে হবে।

চোখ দুটো কুঁচকে গেল উপাধ্যায়ের। সোজা হয়ে বসে সন্দিগ্ধভাবে বললেন, 'কী ব্যাপার বলুন তো? একটা অর্ডিনারি মেয়ে হঠাৎ রাজকুমারী হতে যাবে কেন?'

মহাশয়গণ, আপনারা তো জানেনই, কোনো ব্যাপারেই আমি নার্ভাস হই না। সব সময়ই আমি স্টেডি। বললাম, 'আমি একজন ফিল্ম ডিরেক্টর, একটা ছবি করতে যাচ্ছি। তাতে একটা প্রিন্সেসের রোল আছে। কিন্তু—'

দেবশিশুর মতো মুখ করে অ্যাঞ্জেল-মার্কা একটা হাসি ফুটিয়ে যেভাবে ডায়ালগগুলো ঝাড়লাম তাতে পুরোটা বিশ্বাস করলেন উপাধ্যায়। আস্তে আস্তে আবার হেলান দিয়ে বসতে বসতে বললেন, 'বুঝেছি। যাতে রাজকুমারীর চালচলন কথাবার্তা, সব বিশ্বাসযোগ্য হয় সে জন্যে তাকে আমার তালিম দিতে হবে, এই তো?'

যে খচ্চরটা অত বড় নেটিভ স্টেট চালিয়েছে, কেউ কথা বললে সে যে তার পেটের লাস্ট বাউণ্ডারি পর্যন্ত দেখতে পাবে, সেটাই তো ন্যাচারাল। বললাম 'হ্যাঁ স্যার, আমরা তো রাজা-মহারাজাদের কারবার জানি না। শুনেছি আপনি অনেক দিন বিরাট একটা নেটিভ স্টেট চালিয়েছেন—'

'হ্যাঁ, অ্যাবাউট ফর্টি ইয়ার্স।'

'তাই আপনার কাছে ছুটে এলাম।'

এই সময় একটা বেয়ারা সামনে এসে দাঁড়াল।

উপাধ্যায় বললেন, 'আপনাকে কী দিতে বলব-হুইস্কি, জিন, না রাম?'

মহাশয়গণ, আপনারা জানেন, সান-ডাউনের পর সোনার বাংলা ছাড়া আমি আর কোনো লিকুইড টাচ করি না। কিন্তু যে প্রিন্সেস বানাবার কনট্রাক্ট নিয়ে এসেছে, প্রথম দিনই যদি সে ধান্যেশ্বরী খেতে চায় তার স্ট্যাণ্ডার্ড সম্বন্ধে টেরিফিক খারাপ আইডিয়া করে বসবেন উপাধ্যায়। তা ছাড়া এরকম হানড্রেড পারসেন্ট সাহেবের বাড়িতে কালীমার্কা বাংলা মাল থাকার কথা ভাবাই যায় না। দাঁত বার করে বললাম, 'ও সব আমার চলে না স্যার।'

উপাধ্যায়ের মুখ চোখ দেখে মনে হল, ঝামেলায় পড়ে গেছেন। বললেন, 'আমি তো এ সময়টা একটু ড্রিংক করি। কিন্তু আপনাকে কী দেওয়া যায়?' একটু ভেবে বললেন, 'ঠিক আছে,

তা হলে একটু কফিই খান।'

বেয়ারাকে কফি আর হুইস্কি আনতে বলে আমার দিকে ফিরলেন উপাধ্যায়, 'এবার কাজের কথায় আসা যাক।'

বললাম, 'চল্লিশ বছর নেটিভ স্টেট চালিয়ে রাজা ফাজাদের হাড়ের ভেতর পর্যন্ত তো আপনার জানা হয়ে গেছে।'

'সিওর। তবে—'

মিস হ্যারিয়েট আর চৌবেজির মতোই উপাধ্যায়ের কথায় সেই সিগনালটা রয়েছে। বললাম, 'বলে ফেলুন স্যার—'

আমাদের ডায়ালগের মধ্যেই বেয়ারা কফি আর হুইস্কি নিয়ে এসেছিল। হুইস্কিতে চুমুক দিয়ে উপাধ্যায় বললেন, 'একটা অর্ডিনারি মেয়েকে প্রিন্সেস বানানো ভেরি টাফ জব। তবে ফর্টি ইয়ার্সের এক্সপেরিয়েন্স আমার আছে। আপনি যা চাইছেন তাই পাবেন। মেয়েটিকে এমন ট্রেনিং দেব যাতে ইণ্ডিয়ার যে কোনো ফর্মার স্টেটের প্রিন্সেসের রোল চোখ বুজে করে যাবে। সে জন্যে আমার ফি আড়াই হাজার।'

'নো প্রবলেম স্যার—'

'টাকাটা কিন্তু আমার অ্যাডভান্স চাই।'

'কালই পেয়ে যাবেন।'

'থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ।'

যখন স্টমাকে দু বোতল ধান্যেশ্বরী চালান করার কথা সেই সময় কি না কফি! দেড় কিলো চিরতা খাওয়ার মতো মুখ করে এক চুমুকে এক কাপ কফি ফিনিশ করে উঠে পড়লাম।

মহাশয়গণ, প্রতাপরুদ্রগড়ের প্রিন্সেসের বিয়ের জন্য এখন আপনারা ওয়েট করতে থাকুন।

।। তৃতীয় পর্ব সমাপ্ত ।।

আমাকে দেখুন
চতুর্থ পর্ব



হে-হে মহাশয়গণ, আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, সুমনাকে প্রতাপরুদ্রগড়ের প্রিন্সেস বানাবার প্ল্যান কমপ্লিট করে ফেলেছিলাম। এখন সেই কাজটাই ফুল স্পিডে চলছে।

লোয়ার সার্কুলার রোডে নেটিভ স্টেটের সেই রাজবাড়িটার রিপেয়ারের কাজ প্রায় শেষ করে এনেছে পঞ্চানন। আর কয়েক দিনের ভেতর ওটা বাকিংহ্যাম প্যালেসের কমপিটিটর হয়ে উঠবে। পেঁচো মাকড়া টেরিফিক মাল। শালা ম্যাজিক জানে।

এদিকে সুমনাকে রোজই কলকাতায় আসতে হচ্ছে। দু'দিন কিড স্ট্রিটে মেরি হ্যারিয়েটের কাছে স্পোকেন ইংলিশ শেখে। দু'দিন কলাকার স্ট্রিটে বদ্রীনারায়ণ চৌবের কাছে শেখে মধ্যপ্রদেশের খানদানি হিন্দি। আর তিনদিন আলিপুরে যায় মনপুরা এস্টেটের এক্স-দেওয়ান রামরতন উপাধ্যায়ের কাছে প্রিন্সেস হবার আদবকায়দা শিখতে। কার সঙ্গে কথা বলার সময় ক' সেন্টিমিটার ঠোঁট ফাঁক করবে, চা খাবার সময় জিভে এমন ভাবে সাইলেন্সার লাগাতে হবে যাতে এতটুকু সাউণ্ড না হয় বা পার্টিতে যেতে হলে কী কসমেটিকস লাগাবে কিংবা শাড়ির কুঁচি কেমন হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি তালিম নিতে নিতে তার লাইফ একেবারে হেল হয়ে যাচ্ছে।

মহাশয়গণ, প্রথম প্রথম কয়েকটা দিন দারুণ রিভোল্ট করেছিল সুমনা। বলেছিল, 'আমি এসব পারব না। আমার রাজকন্যা হয়ে দরকার নেই।'

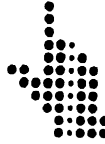
দরকার নেই বললেই হবে! এটা আমার একটা দুর্দান্ত চ্যালেঞ্জ। এক্সপেরিমেন্টও বলতে পারেন মহাশয়েরা। অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে ছুকরিকে শেষ পর্যন্ত কবজা করেছি।

প্রথম কয়েকটা দিন আমিই সঙ্গে করে কিড স্ট্রিটে, কলাকার স্ট্রিটে বা আলিপুরে পৌঁছে দিয়েছি। এখন আর ইঞ্জিনের বগি টানার মতো সুমনাকে টেনে নিয়ে যেতে হয় না। কলকাতা তো তার অচেনা জায়গা নয়। এ শহরের হাড়ের ভেতর পর্যন্ত সে চেনে। আমার সঙ্গে আলাপটালাপ হবার ঢের আগেই টেন মিলিয়ন মানুষের মেট্রোপলিসে সে চষে বেড়িয়েছে। আজকাল সুমনা নিজে নিজেই মেরি হরিয়েট, চৌবে এবং উপাধ্যায়ের কাছে চলে যায়।

মহাশয়গণ, সার্কুলার রোডের বাড়িটা সাজানো ফাজানো হয়ে গেলে আমার প্ল্যানের সেকেণ্ড ফেজের কাজ স্টার্ট করে দেব। শুধু সুমনাকে তালিম দিলেই চলবে না, তার মা বোন ফোনদেরও নানারকম কায়দা ফায়দা আর এটিকেট শেখাতেই হবে। সুমনা প্রিন্সেসের স্টাইলে ডায়লগ ঝাড়বে, স্টেপ ফেলবে, আর তার মা-বোনদের গায়ে আগরপাড়ার বস্তির গন্ধ লেগে থাকবে, তা তো আর হয় না। বাড়িটার রিপেয়ারের কাজ কমপ্লিট হলে সুমনাদের হোল রেজিমেন্টটাকে স্ট্রেট এখানে এনে তুলব। প্যালেসের অ্যাটমসফিয়ার আনতে হলে বয়-বাবুর্চি-ড্রাইভার-দারোয়ান-কেয়ারটেকার-গভর্নেস ইত্যাদি হাজার টাইপের মাল যোগাড় করতে হবে। সে সব অ্যারেঞ্জমেন্টও মোটামুটি হয়ে গেছে। আগরপাড়ার ব্যারাকবাড়ি থেকে বেছে বেছে কয়েকজনকে সার্কুলার রোডের প্যালেসে নিয়ে যাব। তা ছাড়া ভন্টা, পন্টা, আজিজরা তো

আছেই। তারাও কিছুদিন রামরতন উপাধ্যায়ের কাছে ট্রেনিং নেবে। মুখ থেকে কথা খসালেই রাজকুমারী টাজকুমারী হওয়া যায় না। তার অনেক ঝামেলা।

মহাশয়গণ, এ সব কারবার যখন চলছে তখন আমি—পিটার স্বয়ম্ভু হোড়—কিন্তু আগের মতোই চালিয়ে যাচ্ছি। আপনারা তো জানেনেই, সকালে ঘুম থেকে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে টী-স্টল থেকে ভাঁড়ে চা আর কড়কড়ে বিস্কুট দিয়ে যায়। দুপুরে পবিত্র খালসা হোটেলে প্রোলেটারিয়েটা লাঞ্চ সেরে স্ট্রেট কলকাতায় চলে আসি। সমাজপতির অ্যাপার্টমেণ্টে সন্ধে পর্যন্ত কাটিয়ে সাত-আট খোরা আগমার্কা ধান্যেশ্বরী স্টমাকে চালান করে লাস্ট ট্রেনে আগরপাড়ায় ফিরি। ডিনারটা ক্যালকাটার কোনো হোটেলে চুকোতে হয়। সারা দিনের যে কয়েকটা ঘণ্টা সমাজপতির অ্যাপার্টমেণ্টে কাটাই তার মধ্যে অভ্যুদয় মিটার কি স্বয়ং সমাজপতি বা তাঁর ফ্রেন্ডরা আমাকে ফোন টোন করেন। মোটামুটি ডেইলি সেই পুরনো রুটিনটাই চালিয়ে যাচ্ছি।



আজ দুপুরে গড়িয়াহাটার অ্যাপার্টমেন্টে আসতেই অভ্যুদয় মিটারের ফোন এল। বললাম, 'বলুন স্যার, আপনার জন্যে কী সারভিস দিতে পারি—'

অভ্যুদয় বললেন, 'নতুন সারভিসের দরকার নেই। তুমি আমাকে এম.এল.এ বানাবার রেসপনসিবিলিটি নিয়েছিলে—মনে আছে?'

'নিশ্চয়ই আছে স্যার।'

'মনে থাকলে আমাকে এভাবে নেগলেক্ট করতে পারতে না স্বয়ম্ভু।'

অভ্যুদয়ের গলায় কয়েক কেজি অভিমান মাখানো। মাকড়াকে স্লাইট বাটার লাগানো দরকার। বললাম, 'আপনার ধারণা, আপনার কেসটা মেইন লাইন থেকে আমি সাইডিংয়ে পুশ করেছি—এই তো?'

'ডেফিনিটলি—' অভ্যুদয় বলতে লাগলেন, 'তা না হলে আমার কাজ ফেলে সামতানির ছেলের বিয়ের অ্যাসাইনমেন্টটা নিতে না। আমি খুব দুঃখ পেয়েছি স্বয়ম্ভু।'

গলার স্বরে এবার কয়েক ইঞ্চি মালাই লাগিয়ে বললাম, 'স্যার, আপনি আমাকে টেরফিক মিসআন্ডারস্ট্যান্ড করেছেন। অন্যের অ্যাসাইনমেন্ট নিলেও ডে অ্যান্ড নাইট আপনার জন্যেই প্ল্যান করে যাচ্ছি।'

'তার নমুনা কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না।'

'পাবেন স্যার, পাবেন।'

'কবে পারব তার একটা ডেফিনিট ডেট দিতে পার? তুমি যেভাবে অন্যের ঝামেলায় এনগেজড হয়ে যাচ্ছে তাতে এ জন্মে আমার আর এম. এল. এ হওয়া হয়ে উঠবে না।'

অভ্যুদয়ের অভিমান করার হানড্রেড পারসেন্ট রাইট আছে। অভিমান করারই না, টেরিফিক খচে যাওয়ারও। মেডিক্যাল ক্যাম্প বসিয়ে এর আগে মাকড়ার কয়েক লাখ টাকা খসিয়ে দিয়েছি। আরো কয়েক লাখ খসাবার অ্যারেঞ্জমেন্ট করে ফেলতে হবে। এই সব মালেরা পিপলস রিপ্রেজেন্টেটিভ হয়ে অ্যাসেম্বলি কি পার্লামেন্টে যাবে, তা কখনই হতে দেওয়া যায় না।

ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে কয়েক সেকেণ্ড ভেবে নিলাম। সুমনাকে কমপ্লিট প্রিন্সেস বানাতে এখনও কিছুদিন লেগে যাবে। এই সময়টা বেকার বসে থেকে ফায়দা নেই। ব্রেনের ডায়নামো চালু না রাখলে সেটা বিগড়ে যাবে। এই টাইমটা অভ্যুদয় মাকড়াকে একটা চরকি কলে ঢুকিয়ে নাচিয়ে নেওয়া যাক।

বললাম, 'ও. কে স্যার, আপনার কেসটা নেক্সট উইক থেকেই আবার স্টার্ট করে দেব।'

খুশিতে অভ্যুদয়ের গলার স্বর হাই জাম্প দিয়ে অনেকটা উঁচুতে উঠে এল যেন। বললেন, 'রিয়ালি স্বয়ম্ভু?'

'রিয়ালি স্যার। তবে একটা কথা—'

'কী?'

'তার আগে আপনার সঙ্গে আমার একটা ডিসকাসান হয়ে যাওয়া দরকার।'

'সিওর সিওর। কবে ডিসকাসানটা করতে চাইছ বল—'

চোখ কুঁচকে একটু ভেবে নিলাম। তারপর বললাম, 'শুভ কাজ ফেলে রাখতে নেই। তাতে হেভি বাগড়া পড়ে যায়। আমার ইচ্ছে আজই আপনার আমার প্রাইভেট ডায়ালগটা হয়ে যাক। আপনার টাইম হবে তো?'

'নিশ্চয়ই হবে।' হেভি উত্তেজনায় গলার শির যেন ছিঁড়ে গেল অভ্যুদয়ের, 'পলিটিক্যাল পাওয়ার আমার চাই-ই। কখন ডিসকাসান করতে চাও, বল—'

মনে মনে উৎকৃষ্ট ক'টি খিস্তি ঝেড়ে মালাইতে চেবানো গলায় বললাম, 'আই অ্যাম অলওয়েজ অ্যাট ইওর সারভিস স্যার। আপনি যখন বলবেন তখনই আমি রাজি।'

'ফাইন।' অভ্যুদয় বলতে লাগলেন, 'এখন তোমার কোনো কাজ নেই তো?'

'কাজ তো স্যার সব সময়েই থাকে। আমার মতো মাকড়ার কি এক সেকেণ্ডও বেকার বসে থাকার উপায় আছে? তবে আপনার জন্যে সব ঝেড়ে ফেলে দিচ্ছি।'

'একসেলেন্ট। একটু কষ্ট করতে পারবে?'

'নিশ্চয়ই পারব স্যার। আপনি জিভথেকে অর্ডারটা একবার খসিয়েই দেখুন না—'

অভ্যুদয় বললেন, 'তা হলে আমার নিউ আলিপুরের অ্যাপার্টমেন্টে চলে এসো। আমিও ওখানে চলে যাচ্ছি। এখন তিনটে বাজে। আশা করি চারটেয় আমাদের দেখা হচ্ছে।'

'ডেফিনিটলি।' গলায় রীতিমত জোর দিয়েই বললাম, তার পর টেলিফোনটা ক্রেডেলে রাখতে গিয়ে আচমকা আসল কথাটা মনে পড়ে গেল। ঝট করে বললাম, 'আমার সোনার বাংলার ব্যাপারটা মনে আছে তো? ওটা ছাড়া ডায়লগ কিন্তু জমবে না স্যার।'

'সব মনে আছে। আমি কিছুই ভুলি না। তোমার জন্যে দশ বোতল ধেনো সব সময় আমার

আলিপুরের অ্যাপার্টমেন্টে স্টোর করা থাকে। যখনই আসবে তখনই পেয়ে যাবে। ও. কে?'

'ও. কে স্যার। মেনি মেনি থ্যাঙ্কস। আমার কিন্তু ভাল ক্রকারি চলে না। মাটির ভাঁড় ছাড়া সোনার বাংলা জমবে না।'

'পাঁচ শো ভাঁড় তোমার জন্যে মজুত রয়েছে।'

'মাইরি স্যার, আপনার মতো এমন গ্রেট খজড়া আমার লাইফে আর দেখিনি।' বলতে বলতে সট করে আধ হাত জিভ কেটে বললাম, 'স্যরি স্যার, স্যরি। জিভ থেকে স্লিপ কেটে 'খজড়া'টা বেরিয়ে গেছে। ক্ষমা করে দেবেন। এই কান মুলছি, এই নাক মুলছি। বলেন তো পঞ্চাশ মিটার নাকখতও দিতে পারি।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে।' অভ্যুদয় হাসতে হাসতে লাইন কেটে দিলেন।

ঘড়ির কাঁটায় যখন চারটে ঠিক সেই সময় অভ্যুদয় মিটারের আলিপুরের অ্যাপার্টমেন্টে চলে এলাম। অভ্যুদয় আমার জন্য ওয়েট করছিলেন। বললেন, 'ওয়েলকাম। তোমার দেখছি বৃটিশ পাংচুয়্যালিটি।'

উত্তর না দিয়ে হারমোনিয়ামের রিডের মতো বত্রিশটা দাঁত বার করলাম।

বিরাট ড্রইং রুমের দু ফুট পুরু গদিওলা সোফায় আমাকে বসিয়ে অভ্যুদয় মুখোমুখি বসলেন। বললেন, 'আগে ডিসকাসান, পরে ড্রিংকস, না পরে ডিসকাসান, আগে ড্রিংকস?'

বললাম, 'সোনার বাংলা ছাড়া ব্রেনে আমার ব্যাটারি চার্জ হয় না। ড্রিংকসের সঙ্গে ডিসকাসানটা চালু করলেই এনার্জি পেতাম স্যার।'

'অল রাইট।' বেয়ারাকে ডেকে অভ্যুদয় নিজের জন্যে হুইস্কি আর আমার জন্যে ধান্যেশ্বরী আনতে বললেন।

পাঁচ মিনিটের ভেতর কাট গ্লাসের বৌলে হুইস্কি আর মাটির খোরার সোনার বাংলা দিয়ে গেল বেয়ারা। সেই সঙ্গে চাট হিসেবে কাবাব, ফিশ ফিঙ্গার, ফ্রায়েড প্রন ইত্যাদি।

হুইস্কিতে হাল্কা চুমুক দিয়ে গলা ভেজাতে ভেজাতে অভ্যুদয় বললেন, 'এবার তা হলে শুরু করা যাক।'

'সিওর স্যার।' এক চুমুকে খোরার অর্ধেকটা স্টমাকে চালান করে বললাম, 'আপনার সঙ্গে ইলেকশানের ব্যাপারে লাস্ট যা কথা হয়েছিল মনে আছে?'

'কোন কথাটা বল তো?'

'ঐ যে বলেছিলাম, শহরে মানে আরব্যান এরিয়ায় আপনার আর আশা নেই। আপনাকে রুরাল এরিয়া থেকে এবার দাঁড়াতে হবে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে।'

'আপনাদের কোন ডিস্ট্রিক্টে যেন বাড়ি?'

'টোয়েন্টি ফোর পরগণাসে। তবে বর্ধমানে আর নর্থ বেঙ্গলেও অনেক ল্যান্ড প্রপার্টি রয়েছে।'

'কোথায় আপনাদের ইনফ্লুয়েন্স বেশি?'

'ইনফ্লুয়েন্স বলতে?'

'এই লোকে আপনাদের বেশি অয়েল-টয়েল মারতে চায়, মানে খাতির ফাতির করে। মুখ থেকে অর্ডার খসালে তক্ষুনি তা করে দেবে—'

হুইস্কির গেলাসটা সেন্টার টেবিলে নামিয়ে রেখে ঠোঁট টিপে কী চিন্তা করলেন অভ্যুদয়, তারপর বললেন, 'গ্রামে আমার তেমন যাওয়া হয় না। বিজনেস-টিজনেস নিয়ে এত ঝামেলায় থাকতে হয় যে দেশের বাড়িতে গিয়ে যে দু'দিন কাটিয়ে আসব তা আর পেরে উঠি না।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'চব্বিশ পরগণা বা বর্ধমানে লাস্ট কবে গিয়েছিলেন?'

চোখ কুঁচকে হেভি চিন্তা ফিন্তা করে আভ্যুদয় বললেন, 'চব্বিশ পরগণায় লাস্ট গিয়েছিলাম ছ'বছর আগে আর বর্ধমানে গিয়েছিলাম—না, একেবারেই মনে করতে পারছি না।'

'ফাইন, ফাইন—' আচমকা উঠে দাঁড়িয়ে কোমরের বল বেয়ারিং ঘুরিয়ে কয়েক পাক নেচে ফের বসে পড়লাম।

অভ্যুদয় দারুণ অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। চোখদুটো পারফেক্ট সার্কল বানিয়ে বললেন, 'কী হল স্বয়ম্ভু, নাচলে যে?'

'আনন্দে স্যার, আনন্দে।' বলতে লাগলাম, 'ইচ্ছে হচ্ছে আজ হোল ডে ট্যাঙ্গো নেচে যাই।'

'তোমার ব্যাপার স্যাপার কিছুই বুঝতে পারছি না।' মুখচোখ দেখে মনে হল, অভ্যুদয় মিটার দস্তুরমতো হকচকিয়ে গেছেন।

মাকড়াকে আর ঝুলিয়ে রাখা ঠিক হবে না। বললাম, 'স্যার, ছ' বছর আগে লাস্ট গ্রামে গেছেন। ভিলেজ পিপলকে চেনেনই না বলতে গেলে। অথচ মাইরি তাদেরই রিপ্রেজেন্টেটিভ হতে চাইছেন। আপনার শ্লা জবাব নেই। আপনার মতো দু নম্বরী মাল—' বলেই জিভ কাটলাম, 'স্যার, ক্ষমা করে দিন। জিভটা একেবারে কাঁচা ড্রেন হয়ে গেছে।'

হাত তুলে অভ্যুদয় তক্ষুনি আমাকে ক্ষমা করে দিলেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে।'

বললাম, 'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। কিন্তু—'

'কী?'

'কোন জন্মে ভিলেজে গেছেন, মনেও নেই। ভিলেজের লোকেরা আপনার থোবড়া দ্যাখে নি। তারা আপনাকে ভোট দেবে কেন?'

'লোকে যাতে লাইন দিয়ে ভোট দেয়, সেই জন্যেই তো তোমার মতো জিনিয়াসের হেল্প চাইছি। তোমাকে যে এত মাথায় তুলে রাখি, সে তো এই কারণেই।'

কয়েক সেকেণ্ডের জন্য গড়বড় করে ফেলেছিলাম। অভ্যুদয় মাকড়ার যে আরো কয়েক লাখ খসাতে হবে তা ভুলে গিয়ে ভোটের ব্যাপারে মুখ দিয়ে আসল কথাটা হড়কে বেরিয়ে এসেছিল। এবার বললাম, 'নিশ্চয়ই স্যার, আপনি ভোট না পেলে আমার মতো মাল আছে কী করতে? প্রসেসান করে ভোটার শ্লাদের আপনার জন্যে ধরে নিয়ে আসব। আপনার অপোনেন্টের জামানত যদি না ফরফিট করিয়ে দিতে পারি, দাঁতে করে আপনার জুতো নিয়ে হোল ক্যালকাটা ঘুরে বেড়াব।'

খুশিতে অভ্যুদয়ের চোখদুটো টুনি বাল্বের মতো জ্বলতে লাগল। মুখ থেকে স্বর্গীয় লাইট

যেন ঠিকরে বেরুচ্ছে। বললেন, 'তোমার ওপর আমার অনেক ভরসা। আমি জানি, একমাত্র তুমিই আমাকে ইলেকশানে জিতিয়ে পলিটিক্যাল পাওয়ার আমার হাতে তুলে দিতে পার।'

'কারেক্ট। এই মাকড়ার ওপর আপনি ভরসা রেখেছেন স্যার। একদম ঘাবড়াবেন না।'

'এখন বল কোত্থেকে দাঁড়ালে ভাল হয়। টোয়েন্টিফোর পরগণাস না বার্ডোয়ান (বর্ধমান) ডিস্ট্রিক্টে?'

'বার্ডোয়ানে এ জন্মে কবে যে গেছেন মনেই করতে পারছেন না। টোয়েন্টি ফোর পরগণাসে তবু ছ' বছর আগে গেছেন। সেদিক থেকে এই ডিস্ট্রিক্টটার সঙ্গে আপনার রিলেশান অনেক বেশি। আমার মনে হয়, টোয়েন্টিফোর পরগণাস থেকে দাঁড়ালে রেজাল্ট পাওয়া যাবে।'

'গুড অ্যাডভাইস। তা হলে কবে থেকে কাজ শুরু করতে চাও, বল—' অভ্যুদয় মিটার টেরিফিক উৎসাহিত হয়ে উঠলেন।

মাকড়াকে উস্‌কে দেবার জন্যে বললাম, 'শুভ কাজ ঝুলিয়ে রাখতে নেই স্যার। দু'একদিনের মধ্যেই স্টার্ট করে দেবো।'

'ফাইন।'

'তার আগে আপনার কনস্টিটিউয়েন্সিটা একবার দেখে আসা দরকার। মানে জায়গাটা দেখা থাকলে ক্যাম্পেনের স্ট্র্যাটেজি করতে সুবিধে হবে। ওখানকার ভোটার মালগুলো কেমন, কী করলে খজড়াগুলোকে ফাঁদে ফেলা যাবে, এসব খবর ফবর নিয়ে এমন একটা প্ল্যান করব যে শ্লারা লাইন দিয়ে এসে আপনার সিম্বলে স্ট্যাম্প মেরে যাবে।'

ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন অভ্যুদয়। বললেন, 'ও, তুমি অন-দি-স্পট স্টাডি করতে চাও—তাই তো?'

'রাইট স্যার।'

'ঠিক আছে, কিন্তু—'

অভ্যুদয়ের মুখটা ভাল করে মার্ক করতে মনে হল, মাকড়া ভেতরে ভেতরে কিছু একটা ভাবছে। হয়ত কোথাও একটা খটকা লাগছে। বললাম, 'কিন্তু কী স্যার?'

অভ্যুদয় যা উত্তর দিলেন তা এইরকম। আগরপাড়ায় মেডিক্যাল ক্যাম্প বসিয়ে কয়েক লাখ টাকা তিনি ইনভেস্ট করেছিলেন। কিন্তু নীট রেজাল্ট যা হয়েছে তা টেরিফিক ব্যাড। অতগুলো টাকা স্রেফ নষ্ট হয়ে গেল। এবার যেন টাকা বরবাদ না হয়। অবশ্য দু-পাঁচ লাখ খরচ করতে তাঁর আপত্তি নেই। কিন্তু স্বয়ম্ভু যেন তাঁকে যেভাবে পারে নেক্সট ইলেকশানে এম. এল. এ বানিয়ে দেয়। এই এম. এল. এ হওয়ার সঙ্গে তাঁর প্রেসটিজ জড়িয়ে আছে।

যতই মাকড়া মুখে বলুক না টাকা খরচা করতে আপত্তি নেই, ভেতরে ভেতরে আগরপাড়ার ব্যাপারে দারুণ চোট খেয়েছে। একটা দুটো পয়সা না, মিনিমাম ষোলো লাখ টাকা! শোকে শ্লা যে হার্ট ফেল করেনি, এতেই হেভি অবাক হয়ে যাবার কথা। কিন্তু মহাশয়গণ, আপনারা তো জানেনই, ওয়ার্ল্ডের কোনো ব্যাপারেই আমি চমকাই না, ঘাবড়াই না, অবাকও হই না। বললাম, 'এবার স্যার আপনাকে যদি এম. এল. এ বানিয়ে দিতে না পারি, হাই কিক মেরে আমার

কোমরের বল-বেয়ারিং তুবড়ে দেবেন। আমার ওপর বিশ্বাস রাখুন স্যার।' মনে মনে বললাম, 'হারামী তোমার ব্ল্যাক মানি থেকে আরো কয়েক লাখ যদি খসিয়ে দিতে না পারি তোর ফোর-টোয়েন্টিগিরি ছেড়ে ব্রহ্মচারী হয়ে কোনো মঠে ভিড়ে যাব।'

আমার শেষ কথাটা ক্যাচ করে অভ্যুদয় বললেন, 'তোমার ওপর আমার সেন্ট পারসেন্ট বিশ্বাস আছে স্বয়ম্ভু।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। এই বিশ্বাসটা আমার লাইফের অ্যাসেট।' বলতে লাগলাম, 'আপনি তো বিজনেসম্যান। কত বিজনেসে কত টাকা লাগান। সব ইনভেস্টমেন্টেই কি প্রফিট হয়? দু-চারটে হড়কেও তো যায়।'

'তা তো যায়ই।'

'আগরপাড়ার ব্যাপারটা ব্যাড ইনভেস্টমেন্ট ধরে নিন। মন থেকে ওটা ঝেড়ে ফেলে দেবেন। আপনার লাখ লাখ ব্ল্যাক মানি। তার থেকে স্লাইট যা গেছে তা নিয়ে একেবারেই মাথা ফাথা ঘামাবেন না।'

'আরে না না, ঘামাচ্ছিনা। এখন কী করতে হবে বল।'

'আমাকে কালই আপনার কনস্টিটিউয়েন্সিতে পাঠিয়ে দিন। দু-চারদিন ওখানে থেকে আসি।'

'ঠিক আছে, আমিও কি তোমার সঙ্গে যাব?'

'না। আমি আগে যাই, আপনাদের টোয়েন্টি-ফোর পরগণাসের অ্যাড্রেসটা দিন।'

অভ্যুদয় ঠিকানা দিলেন। পলাশডাঙা, সাউথ চব্বিশ পরগণা। বুঝিয়ে দিলেন, শিয়ালদা থেকে ইলেকট্রিক ট্রেনে উঠলে মোটে দেড় ঘণ্টার রাস্তা। ওখানে সার্কিট হাউসে থাকা যাবে। অভ্যুদয় অথরিটিকে চিঠি লিখে ব্যবস্থা করে দেবেন। ঠিক হল, দু'দিন পর আমি স্ট্রেট সার্কিট হাউসে চলে যাব। তার আগেই সব অ্যারেঞ্জমেন্ট হয়ে থাকবে।

কথাবার্তা ফাইনাল হবার পর অভ্যুদয় পকেট থেকে পার্স বার করে ক'টা কড়কড়ে একশো টাকার নোট গুনে আমার হাতে দিতে দিতে বললেন, 'এগুলো রাখো।'

বললাম, 'কত আছে?'

'এক হাজার।'

'থাকব সার্কিট হাউসে—ফ্রিতে, খাব প্রোলেটারিয়েট লাঞ্চ আর ডিনার। ড্রিংক বলতে সোনার বাংলা। এত টাকা নিজের জন্যে লাগবে না। তবে কখন কী দরকার হয়, আপনি হাজার পাঁচেক দিন।'

অভ্যুদয় আরো অনেকগুলো নোট পার্স থেকে বার করে আমাকে দিতে দিতে বললেন, 'এই নাও।'

উত্তর না দিয়ে বত্রিশটা দাঁত বার করলাম। তারপর টাকাগুলো হিপ পকেটে গুঁজে এক চুমুকে ভাঁড়ের শেষ মালটুকু খেয়ে বললাম, 'কাজ তো হয়ে গেল, এবার বডি তুলি?'

উঠতে যাব, ফোন বেজে উঠল। অভ্যুদয় টেলিফোনটা তুলে বললেন, 'হ্যালো ...কে, ও আচ্ছা...বলুন বলুন...অ্যাঁ—ইনকামট্যাক্সওলারা রেইড করতে পারে..অ্যালার্ট তো থাকতেই

হবে। ...স্বয়ম্ভু আমার কাছেই আছে। কথা বলবেন নাকি?...দিচ্ছি।' ফোনটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে অভ্যুদয় বললেন, 'কথা বল। মিস্টার সমাজপতি—'

টেলিফোন কানে লাগিয়ে বললাম, 'মিটার সাহেবকে ইনকাম-ট্যাক্স রেইডের কথা কী যেন বলছিলেন স্যার—'

সমাজপতি বললেন, 'আর বলো না, একজন নতুন ইনকাম-ট্যাক্স কমিশনার এসেছে। দুর্দান্ত স্ট্রিক্ট। এতদিন আমেদাবাদে ছিল। ওখানকার ট্রেড আর ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সার্কেলকে জ্বালিয়ে মেরেছে। যা খবর পাচ্ছি, রীতিমত ভয়ই করছে। লোকটা কখন কোথায় রেইড চালাবে, আগে থেকে বোঝা যায় না। ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট আর বিজনেসম্যানরা একেবারে তটস্থ হয়ে পড়েছে।'

'কেস তা হলে টেরিফিক গড়বড়?'

'হ্যাঁ। এ নিয়ে তোমার সঙ্গে বসতে হবে স্বয়ম্ভু।'

'অলওয়েজ অ্যাট ইওর সারভিস স্যার।'

'তুমি মিটার সাহেবের ওখানে কী করছ?'

কী করছি, জানিয়ে দিলাম।

সমাজপতি বললেন, 'ও সব ইলেকশান ফিলেকশান এখন ছাড়ো। আমাদের ঘাড়ের ওপর যে ডেঞ্জার এসে পড়েছে সেটা কীভাবে সামলানো যায়, আগে তার প্ল্যান করো। নিজেদের ট্রেড-ইণ্ডাস্ট্রি বাঁচলে হোল লাইফ ইলেকশানে নামা যাবে। তুমি চট করে থিয়েটার রোডের অ্যাপার্টমেন্টে চলে এসো। অনেক ডিসকাসান আছে।'

মহাশয়গণ, ইনকাম-ট্যাক্স রেইডের ব্যাপারে সমাজপতি মাকড়া যে হেভি ঘাবড়ে গেছে, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। তাকে ভরসা দেবার ভঙ্গিতে বললাম, 'অত নার্ভাস হচ্ছেন কেন? তাড়হুড়ো করে আজই ডিসকাসানের দরকার নেই। দু-চারদিন পর করলেও চলবে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন স্যার।'

'কিন্তু—'

'আবার কী?'

'ঐ কমিশানারকে তুমি চেনো না। আজই আমেদাবাদ থেকে আমার এক ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট ফ্রেন্ড ট্রাঙ্ক কলে সাবধান করে দিয়েছেন। আমিও এখানকার বন্ধুবান্ধবদের অ্যালার্ট করে দিচ্ছি।'

একটু ভেবে জিজ্ঞেস করলাম, 'ঐ ডেঞ্জারাস কমিশনারটা কবে কলকাতায় এসেছে?'

সমাজপতি বললেন, 'দিন সাতেক।'

'ডোন্ট ওরি স্যার। এত তাড়াতাড়ি ওই মাল কিছু করবে না। আমার কথা মিলিয়ে নেবেন।' বলতে বলতে একটু থেমে ফের শুরু করলাম, 'আগে ওকে ভালো করে গেড়ে বসতে দিন। সব কিছু জেনে বুঝে নিক। এত বড় সিটি, এত ট্রেড, এত ইণ্ডাস্ট্রি। না দেখে না বুঝে হুট করে ও কিছু করবে না—আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি।'

'ও এমন লোক, যখন যা খুশি করতে পারে। হী ইজ মোস্ট আনপ্রেডিক্টেবল অফিসার।'

'আমি আপনাকে বলছি, দেড় দু'মাসের আগে ও কিসসু করবে না। আর করলেও ক্যালকাটায় আরো হাজার হাজার বিজনেসম্যান থাকতে বেছে বেছে আপনার ঘাড়ে জাম্প

করবে কেন?'

যে কোনো কারণেই হোক, আরো খানিকক্ষণ ভ্যানতাড়া করে আমার কথাটা যেন মেনে নিলেন সমাজপতি। বললেন, 'তুমি যখন বলছ তখন ঠিক আছে। তবে আগে থেকে ডিসকাসানটা হয়ে থাকলে কিন্তু খুব ভালো হতো।'

বললাম, 'পলাশডাঙা থেকে ফিরে এসেই আপনার সঙ্গে এ নিয়ে বসে যাব। ডোন্ট ওরি।'

'পলাশডাঙায় তা হলে যাবেই?'

'মিটার সাহেবের সঙ্গে কনট্রাক্ট হয়ে আছে, তাঁকে ইলেকশান পার করিয়ে দেব। কনট্রাক্টটা তো ব্রেক করা যায় না। আফটার অল আমি একটা জেন্টেলম্যান।' বলে কপাল কুঁচকে, একটা চোখ ছোট করে হাসলাম।

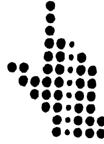
মহাশয়গণ, আপনারা নিশ্চয়ই হাসছেন। ভাবছেন একটা থার্ড ক্লাস চিট, ফোরটোয়েন্টি এবং বেজন্মা নিজেকে জেন্টেলম্যান বলছে! এর চাইতে বড় মাজাক আর কী হতে পারে! আমি যে ভদ্রলোক না, একটা দুর্ধর্ষ হারামী তা আপনারা ভালো করেই জেনে গেছেন। ওটা স্লিপ অফ টাং, জিভ থেকে হড়কে বেরিয়ে এসেছে। মহাশয়রা ক্ষমা করে দেবেন।

সমাজপতি বললেন, 'ঠিক আছে। কনট্রাক্ট যখন হয়েই গেছে তখন কী আর করা! পলাশডাঙায় কতদিন থাকছ?'

'ম্যাক্সিমাম চারদিন।'

'তার বেশি থেকো না।'

'নেভার স্যার। এ ক'দিন মিটার সাহেবের ইলেকশানের সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের ইনকাম ট্যাক্সের ব্যাপারটা নিয়েও একটা প্ল্যান করে ফেলব।'



হে হে মহাশয়গণ, অভ্যুদয় মাকড়ার ক্যাশ যখন খসাতেই হবে তখন আর লেট করার মানে হয় না। পরের দিন সকালেই বোদাকে সঙ্গে করে শিয়ালদায় এসে ট্রেনে উঠলাম। কী জন্য পলাশডাঙা যাচ্ছি, তাকে আগে বলিনি। তার ঘাড়ে একটা ডিউটি চাপাব, এইটুকুই জানে বোদা। কনকচাঁপাও আমাদের সঙ্গে জুড়ে যেতে চেয়েছিল। তাকে কাটিয়ে দিয়েছি। জায়গাটা আগে সার্ভে করে আসি। যদি ফিমেল স্কোয়াড দরকার হয় তখন ওকে পলাশডাঙায় ভিড়িয়ে দেব।

বিয়ের পর বোদাকে অনেক দিন ডিউটি ফিউটি দিই নি। নতুন বউ নিয়ে খজড়া মাসকয়েক উড়ুক, ফুর্তিফার্তা করুক—এই রকমই ইচ্ছে ছিল আমার। নতুন বিয়ের ফেনা এখন মরে এসেছে, এবার শ্লাকে কাজে লাগানো যেতে পারে।

শিয়ালদার যে সেকসনেই যান না, ট্রেনগুলোর দাঁত বার-করা হাড্ডিসার চেহারা। সেই

যে ইণ্ডিয়ান রেলওয়েজ থেকে একখানা বিজ্ঞাপন ঝাড়া হয়েছিল, 'রেল আপনার নিজস্ব সম্পত্তি,' এদিকের প্যাসেঞ্জাররা তাতে বেজায় খুশি। পার্সোনাল প্রপার্টি ধরে নিয়ে বেশির ভাগ মালই উইদাউট টিকেটে ট্র্যাভেল করছে। শুধু তাই না, প্লাইউডের শীট, ফ্যান, বাল্ব, মেঝের স্টিলের পাত—সব খুলে নিয়ে গেছে।

সীট ফীট নেই, লোহার যে ফ্রেম রয়েছে তার ওপর কোনরকমে পাছা সেট করে বোদা আর আমি মুখোমুখি বসে আছি। ডাউনের দিকের এই ট্রেনটায় খুব একটা ভিড় ফিড় নেই। এধানে ওধারে কিছু প্যাসঞ্জার ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। দু-চারটে মাকড়া কোমর পর্যন্ত কাপড় তুলে ঘসর ঘসর করে লিকলিকে উরু ফুরু চুলকে যাচ্ছে। মেঝেতে যেদিকে তাকানো যাক, বাদামের খোসা, মশলামুড়ির ঠোঙা, পানের পিক, মশলামুড়ির ঠোঙা, থুতু আর ভনভনে মাছি।

ইলেকট্রিক ট্রেন স্টেশনের পর স্টেশনে মিনিট খানেক থেমে আবার দৌড় লাগাচ্ছে। লইফে এদিকে আগে আর আসিনি। আমার ধারণা ছিল যাদবপুর, ফাদবপুরের পর স্রেফ ধানখেত, তারপর আর কিস্‌সু নেই। কিন্তু যত এগুচ্ছি ততই চোখে পড়ছে দু'ধারে খালি বাড়ি, আর বাড়ি, এলোপাথাড়ি সব টাউনশিপ গজিয়ে উঠেছে। ক্যালকাটা যেভাবে বডি ছড়িয়ে দিচ্ছে তাতে হোল ওয়েস্ট বেঙ্গলটাই একদিন ক্যালকাটা হয়ে যাবে।

একেকটা স্টেশনে ট্রেন থামে আর গাদা গাদা হকার উঠে পড়ে। পান-বিড়ি-সিগারেট, লজেন্স-বিস্কুট, ডাব, মশলামুড়ি, চা, শস্তা লেমোনেড, চানাচুর থেকে আধন্যাংটা মেয়েমানুষের ছবিওলা চটকদার ম্যাগাজিন, কবিরাজি ওষুধের বই, ইঁদুর-মারা বিষ, উকুন-মারা তেল—এমনি হাজার টাইপের মাল নিয়ে লোকগুলো গলার শিরা ছিঁড়ে চেঁচিয়ে যাচ্ছে। শ্লা এ লাইনে প্যাসেঞ্জারের চাইতে হকার বেশি।

জানালার বাইরে তাকিয়ে আছি। সটাসট গাছপালা, বাড়িঘর পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে দু-এক টুকরো সুবজ খেত, লম্বা মজা খাল, কিছু পাখি ফাখিও চোখে পড়ছে। তবে কিছুদিনের ভেতর এসবও থাকবে না। কংক্রিটের জঙ্গলে বোঝাই হয়ে যাবে।

বোদা একসময় ডেকে উঠল, 'গুরু—'

মুখ না ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী বলছিস?'

'পলাশডাঙায় গিয়ে আমাদের কী করতে হবে?'

'ভোটার ক্যাচ করতে হবে।'

বোদা চোখের তারা আমার মুখের ওপর ফিক্সড করে বলল, 'গুরু, কী বলছ ব্রেনে ঢুকছে না।'

কী কারণে আমাদের পলাশডাঙায় যাওয়া , এবার পরিষ্কার করে জানিয়ে দিলাম। বোদা একটা চোখ কুঁচকে, আরেকটা চোখ গোল্লা পাকিয়ে, দাঁত বার করে বলল, 'বুঝেছি গুরু—'

'কী?'

'এবার অভ্যুদয় মাকড়ার কিরকম ক্যাশ খসাবে?'

বোদা শ্লা টেরিফিক। কেউ দু ঠোঁট ফাঁক করলে স্টমাকের ভেতর পর্যন্ত দেখতে পায়। অভ্যুদয়কে যে নতুন করে ফাঁসাতে যাচ্ছি, ঠিক ধরে ফেলেছে। তার নাকের ডগায় টুসকি মেরে

বললাম, 'খজড়া কাঁহাকা—'

বোদা সেকেন্ডে পাঁচ বার চোখ পিট পিট করতে করতে বলল, 'গুরু, তোমার ধান্দাটা কী বল এ তো?'

'কিসের ধান্দা?'

'মালটার ক্যাশ খসিয়ে খসিয়ে কি তেরোটা বাজিয়ে দিতে চাও?'

'ও শ্লাদের এত হেভি ব্ল্যাক মানি, তেরোটা বাজাতে তোর আমার ফোরটিন জেনারেশান লেগে যাবে।'

বোদা আর কিছু বলল না, জানালার বাইরে তাকিয়ে সিনারি ফিনারি দেখতে লাগল। এখন বাড়ি ফাড়ি অনেক কমে এসেছে। যতদূর চোখ যায় শুধু ধানখেত, পাখি, খালের ওপর বাঁশের সাঁকো, সাঁকোর খুঁটিতে বক কি মাছরাঙা চোখ বুজে মুনি ফুনিদের স্টাইলে বসে আছে। লোকজনও কিছু কিছু দেখা যাচ্ছে।

একসময় ঝট করে মুখটা ফিরিয়ে বোদা বলে উঠলো, 'গুরু, নতুন জায়গায় খাপ খুলতে যাচ্ছি। ওখানকার কিস্‌সু জানি না, কাউকে চিনি না। কী করে ভোট ফোটের কাজ স্টার্ট করবে? পলাশডাঙার মাকড়ারা আমাদের কথা শুনবে কেন?'

স্ট্রেট বোদার চোখের দিকে ঝাড়া দু মিনিট তাকিয়ে রইলাম। তারপর নিজের মাথায় একটু আঙুল ঠেকিয়ে বললাম, 'এই খোপরির ভেতর কী আছে জানিস না?'

ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে বোদা স্রেফ তোতলা হয়ে গেল, 'গুরু, মা-মা-মা-নে—'

'শ্লা, এর মধ্যে ভুলে মেরে দিলি! বিয়ে করে তোর ব্রেনে একেবারে রাস্ট ধরে গেছে।'

বোদা তো তো করতে লাগল, 'মাইরি গুরু, আমি না শ্লা বৌর আঁচলের তলায় বেকার বসে থেকে থেকে একখানা লজ্‌ঝড় মাল হয়ে উঠেছি। বলে দাও গুরু, তোমার খোপরির ভেতর কোন চীজ রয়েছে! এবার শুনলে আর লাইফে ভুলব না।'

বোদার কোমরের লেফট সাইডে আলতো করে একটা কিক হাঁকিয়ে, খিস্তি ঝেড়ে বললাম, 'প্ল্যানিং কমিশনের হেড কোয়ার্টার রে শ্লা। মনে পড়েছে?'

ব্যাটারি চার্জ করলে যেমন হয়, বোদার চোখ দুটো ঠিক সেই ভাবে ফ্ল্যাশ মেরে উঠল, 'পড়েছে গুরু।'

বললাম, 'এই খোপরি থেকে অ্যায়সা প্ল্যান বার করব যে পলাশডাঙার মালেরা আমার গায়ে ফেভিকলের মতো সেঁটে যাবে। আমি বললে লাইন দিয়ে অভ্যুদয় খজড়াটাকে ভোট দিতে লাইন লাগাবে।'

'লেকেন—' বলে হেঁচকি তোলার মতো একটা আওয়াজ করল বোদা।

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিতে দিতে বললাম, 'তারপরে আরেকটা প্ল্যান করে মালেরা যাতে ভোট না দেয় তার অ্যারেঞ্জমেন্ট ফাইনাল করে ফেলব। ও কে?'

'ও. কে বস্‌।'

'আর কিছু জানার আছে?'

'নেহী গুরু।'

ঘাড়টা তেরছা করে ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে বললাম, 'পলাশডাঙায় ল্যাণ্ড করে চোখ দুটো আর কান দুটো স্রেফ ওপেন রাখবি। যা সব দেখবি চোখে ক্যাচ করে রাখবি। আর যা শুনবি সব কানে টেপ করে ফেলবি। সমঝা?'

'সমঝা গুরু।'

'দেখাশোনা কমপ্লিট হবার পর আপসেই ব্রেনে প্ল্যান গজিয়ে যাবে। আর একটা কথা—'

'বল—'

'আমরা কী জন্যে পলাশডাঙায় 'ইন' করছি, কোনো মাকড়াকে বলবি না। শ্লা'রা যেন টের না পায়। তা হলে সব কিচাইন হয়ে যাবে। এ সব টপ সিক্রেট ব্যাপার।'

'গুরু, গলা কেটে ফেললেও এতটুকু সাউণ্ড বেরুবে না। তুমি দেখে নিও।'

'ফাইন।' আমি বাঁ পা বাড়িয়ে বোদার পাছায় আরেক বর ছুঁইয়ে দিলাম।

বোদা বত্রিশটা দাঁত বার করে হাসল। সে জানে, এটা আমার আদর করার স্টাইল।

কয়েকটা স্টেশন পেরিয়ে যাবার পর একটা ট্যারাবাঁকা চেহারার আখাম্বা টাইপের ছোকরা আমাদের কম্পার্টমেন্টে উঠল। মহাশয়গণ, খজড়াটার চোয়াল ভাঙা, গালে খাপচা খাপচা দাড়ি, থ্যাবড়া থুতনি, ধুলোয় জট পাকানো লালচে চুল কাঁধ পর্যন্ত নেমে এসেছে। নাক বলতে বিশেষ কিছুই নেই তার, একটা উঁচু মাংসের ঢিবির তলায় দুটো বড় সাইজের ফুটো, তার ভেতর দিয়ে শ্বাস ফাসের কারবারটা সে চালিয়ে নেয়। গোল গোল ঘোলাটে চোখ। পরনে তালি-মারা রং-জ্বলে-যাওয়া টাইট ফুলপ্যান্ট আর ময়লা চিটচিটে জামা। জামাটাতেও অনেকগুলো তাপ্পি, পায়ে টায়ার্-কাটা স্যাণ্ডেল, কাঁধে একটা পুরনো সুতো ওঠা সাইড ব্যাগ।

ছোকরা যে ক'টা প্যাসেঞ্জার রয়েছে, সবার হাতে হাতে একটা করে ছাপানো হ্যাণ্ডবিল ধরিয়ে দিল। বোদা আর আমাকেও একটা করে দিয়েছে। ওতে কী লেখা আছে, না পড়েও বলে দিতে পারি। এটা ভিক্ষে করার নতুন ইণ্ডিয়ান স্টাইল। হ্যাণ্ডবিলে ডেফিনিটলি লেখা রয়েছে, ছোকরা বোবা কিংবা জিভ ফিভ নেই, দয়া করে তাকে যেন হেল্প করা হয়। আমরা হ্যাণ্ডবিল হাতে নিয়ে ছোকরার মুভমেন্ট আর অ্যাকটিভিটি মার্ক করতে লাগলাম।

প্রথমে হ্যাণ্ডবিল গছাবার পর সে এবার সবার কাছ থেকে ফেরত নিতে নিতে হাত পাততে লাগল। কেউ কেউ বিশ পয়সা করে দিল, কেউ কিছুই দিল না।

শেষ পর্যন্ত ছোকরা আমাদের কাছে এল। স্রেফ তার চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'শ্লা, তুই সত্যি সত্যি বোবা?'

ছোকরা বাছুরের মতো আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল।

আবার সেই আগের প্রশ্নটা করলাম।

আমার ঠোঁটের মুভমেন্ট লক্ষ করে ছোকরা তার গলা আর কান দেখিয়ে বোঝাতে চাইল সে বোবাই শুধু না, কালাও।

মহাশয়গণ, আপনারা তো জানেনই আমি একটা টেরিফিক হারামী এবং ফোরটোয়েন্টি। আমাকে ভড়কি মেরে কাত করা খুব সোজা ব্যাপার নয়। আমিও ছোকরার মুখে চোখের তারা ফিক্সড করে বললাম, 'তুমি যদি মাকড়া বোবা-কালা হও, আমি তা হলে কমপ্লিট ব্লাইণ্ড—'

আমার লিপ-মুভমেন্ট লক্ষ করে ছোকরা তার ডান কানে হাতের ঘের দিয়ে মাথাটা সামনে ঝুঁকিয়ে আনল। ভুরুদুটো তুলে বোঝাতে চাইল, আমি যা বলছি তার একট বর্ণও শুনতে পাচ্ছে না।

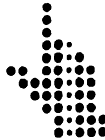
বললাম, 'খজড়া, তুমি একখানা টেরিফিক অ্যাক্টর। শ্লা, মাইমের দলে ভিড়লে ভিক্ষে করে যা পাও তার হাজার গুণ ইনকাম করতে পারতে।'

ফের থুতনি নাচিয়ে ছোকরা জানালো আমার কথা তার কানে কিছুই ঢুকছে না।

আমি তার গালে টুসকি মেরে এবার বললাম, 'শ্লা, কারবারটা টেরিফিক বার করেছিস। টোয়েন্টি রুপিজ ইনভেস্ট করে চোতা কাগজে হ্যাণ্ডবিল ছাপিয়ে নিয়েছিস। এতে লেবার কম, চেঁচিয়ে লোকের কাছে ভিক্ষে চাইতে হয় না। গলাটা রেস্ট পায়। এদিকে কাজের কাজও হয়ে যায়।'

ছোকরার চোখে সেই বাছুরের চাউনি। আমার কোনো কথাই তার মাথায় ঢুকছে বলে মনে হয় না। এবার একটু খাটকাই লাগল, শ্লা সত্যিসত্যিই কি ডেফ অ্যাণ্ড ডাম্ব? যদি তা না হয় তা হলে বলতেই হবে ছোকরা যে কোনো অ্যাক্টরের নাকে ঝামা ঘষে দিতে পারে। দেখুন দেখুন মহাশয়গণ, এই খজড়াটা ভিক্ষের ব্যাপারটাকে কোন প্রফেশনাল হাইটে নিয়ে গেছে। পকেট থেকে একটা টাকা বার করে তার হাতে দিয়ে তার থুতনি নাড়তে নাড়তে বললাম, 'নাও চাঁদু, এবার হড়কে যাও।'

টাকাটা সাইড ব্যাগে পুরে আমার হাঁটু ছুঁয়ে প্রণাম করল ছোকরা, তারপর হ্যাণ্ডবিলের কাগজটা সযত্নে ভাঁজ করে বুক পকেটে রেখে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। নেক্সট স্টেশনে ট্রেন থামলে সে নেমে যাবে, ডেফিনিটলি অন্য কম্পার্টমেন্টে হানা দেবে। শ্লা উইদাউট টিকিটে ঘুরে ঘুরে ভাল বিজনেস বার করেছে।



দুপুরবেলা বোদা আর আমাকে পলাশডাঙায় নামিয়ে দিয়ে লোকাল ট্রেনটা পুরো এক মিনিটও দাঁড়াল না, লাইনের ওপর স্লিপ করে বেরিয়ে গেল।

সূর্য খাড়া মাথার ওপর উঠে এসেছে। স্টমাকের ভেতর খিদেটা অনবরত ব্লেড চালিয়ে যাচ্ছে যেন। এখন আমাদের ফার্স্ট কাজটি হবে একটা হোটেল ফোটেল খুঁজে বার করা। স্টমাকে কিছু সাপ্লাই দেবার পর গেস্ট হাউসে যাওয়া যাবে।

এই লাইনের স্টেশনগুলো যেরকম হয়, পলাশডাঙা তার থেকে আলাদা কিছু নয়। দু'ধারে

লম্বা প্ল্যাটফর্ম। মান্ধাতার ফোরফাদারের আমলে প্ল্যাটফর্ম দুটোয় চৌকো চৌকো পাথরের স্ল্যাব বসানো হয়েছিল। স্ল্যাবগুলোর বেশির ভাগই নেই। বোঝা যায়, চারপাশের লোক শাবল ফাবল চালিয়ে সে সব তুলে নিয়ে গেছে। যা দু-চারটে এখনও টিকে আছে সেগুলোও ভাঙা-চোরা, এখানে ওখানে হলদে ঘাস গজিয়ে রয়েছে। কয়েকটা পিপুল আর কৃষ্ণচূড়া গাছও চোখে পড়ছে।

আমরা যে দিকটায় নেমেছি সেখান প্ল্যাটফর্মের মাঝামাঝি একটা লাল রংয়ের ছোট স্টেশন বিল্ডিং। ব্রিটিশ পিরিয়ডে যখন এখানে রেল লাইন চালু হল তখন এই বিল্ডিংটা বানানো হয়। বানাবার পর সেই যে রং লাগানো হয়েছিল সেটাই ফার্স্ট এবং সেটাই লাস্ট। মহাশয়গণ, তারপর আশি বছরে কেউ এক পোচ রং লাগায় নি। বিল্ডিংটার গা থেকে পলেস্তারা চটে গিয়ে একজিমার মতো দেখাচ্ছে।

প্ল্যাটফর্মের এক সাইডে অ্যাসবেস্টসের শেড, তার তলায় খানকতক কাঠের বেঞ্চ। বেঞ্চগুলোর তক্তা ফক্তা কারা খুলে নিয়ে গেছে, শুধু লোহার ফ্রেমগুলো কোনোরকমে পড়ে আছে। দুই প্ল্যাটফর্মের পাশ দিয়ে উঁচু পাঁচিল স্ট্রেট চলে গেছে। সে দুটোর গায়ে বড় বড় ফোকর। উইদাউট টিকেটের মালেরা গাঁইতি ফাইতি চালিয়ে ওগুলো বানিয়ে রেখেছে।

আমাদের সঙ্গে পঁচিশ তিরিশটা লোক নেমেছিল। তারা স্টেশনের গেট দিয়ে না বেরিয়ে পাঁচিলের গর্তের ভেতর দিয়ে হাওয়া হয়ে গেল।

বোদা বলল, 'গুরু এবার?'

বললাম, 'চল, আগে বাইরে যাই। হোটেল ফোটেল কিছু একটা মিলবেই।'

'ঠিক বলেছ গুরু, পেটে কিছু ডিপোজিট করতে না পারলে আমি শ্লা ফেইণ্ট হয়ে যাব।'

গেটের কাছে একটা কালো কোট-পরা টিকেট কালেক্টার একা দাঁড়িয়ে একটা গোঁয়ার টাইপের মাছি তাড়াচ্ছিল। মাছিটা টেরিফিক খজড়া। শ্লা, একবার টিকেট কালেক্টারের ডান গালে বসে, আবার তাড়া খেয়ে উঠে যায় বাঁ গালে।

মার্ক করলাম, লোকটার হাত একেবারে ফাঁকা। তার মানে মাকড়া একখানা টিকেটও কালেক্ট করতে পারে নি। পারবে কোত্থেকে? যে হারামীগুলো ট্রেন থেকে নেমেছে তারা তো আর এ ধার মাড়ায় নি। সুট সাট পাঁচিলের ফোকর দিয়ে হড়কে গেছে।

আমাদের দেখে মাছি তাড়ানো পোস্টপন করে ভুরু কুঁচকে তাকাল টিকেট কালেক্টর। তার হাতে দু'খানা টিকেট জমা দিতেই ঝাড়া দু মিনিট চোখের তারা ফিক্সড করে তাকিয়ে রইল। তার মনের কথাটা বুঝতে পারছিলাম। এই স্টেশনে কেউ টিকেট কেটে আসে, সে বোধ হয় এই ফার্স্ট দেখল।

হে-হে মহাশয়গণ, ইণ্ডিয়ান রেলের দু'খানা টিকেটের দাম চারটে টাকা মেরে আমার প্রফিট আর কতটুকু? আপনারা তো জানেনেই, আমার আস্তিনের ভেতর সমাজপতি রয়েছে, সামতানি রয়েছে, অভ্যুদয়ের মতো মালেরা রয়েছে। কৃষ্ণের মতো এক শ আট নাম নিয়ে এক শ আটটা ব্যাঙ্কে তাদের কয়েক কোটি আমি ডিপোজিট করে রেখেছি। ইচ্ছে করলে হাওয়ায় যে লাখ লাখ টাকার নোট উড়িয়ে দিতে পারে গভর্নমেন্টের চারটে টাকা মেরে তার কী আর হবে?

মহাশয়গণ আমি একজন থার্ড ক্লাস ফোরটোয়েন্টি হতে পারি, কিন্তু ইণ্ডিয়ান সিটিজেন তো।

পাক্কা দু মিনিট পর টিকেট কালেক্টার বলল, 'আপনারা এখানে নতুন এসেছেন নিশ্চয়ই।'

দাঁত বার করে বললাম, 'কারেক্ট। আমরা পলাশডাঙায় বিলকুল ফ্রেশ।'

'তাই।' আস্তে ঘাড়টা ডান দিকে কয়েক সেন্টিমিটার হেলিয়ে দিল টিকেট কালেক্টার। বলল, 'এখানকার লোকদের তো ট্রেনের টিকেট কাটার হ্যাবিট নেই। আপনাদের দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।'

বললাম, 'আমরা গভর্নমেন্ট গেস্ট হাউসে যাব। জায়গাটা এখান থেকে কতদূর বলতে পারেন? কিভাবে যাওয়া যায়?'

'বেশি দূর না, মাইল দুয়েক হবে। স্টেশনের বাইরে সাইকেল রিকশা পাবেন। যেতে মিনিট পনের লাগবে।'

'এখানে কাছাকাছি হোটেল ফোটেল আছে?'

'স্টেশনের বাইরে সাইকেল রিকশা স্ট্যাণ্ডের গায়ে একটা ভাতের হোটেল আছে। কিন্তু—' আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার স্ক্রুটিনি করতে করতে আচমকা থমকে গেল টিকিট কালেক্টর।

জিজ্ঞেস করলাম, 'কিন্তু কী?'

'ওই হোটেল কি আপনাদের চলবে? ভীষণ ডার্টি।'

মাকড়া আমাদের ভেবেছে কী? মহাশয়গণ, সে তো জানে না, সেভেন স্টার শেরাটন হোটেল থেকে শুরু করে রাস্তার ধারের 'ধাবা' পর্যন্ত কোনো কিছুতেই আমার আপত্তি নেই। তাজমহল হোটেলের বেস্ট সুইটেও আমি যে আরামে বেস্ট লাঞ্চ খাব, ঠিক সেই আরামই লাগবে সি. এম. ডি. এ-র বাহাত্তর ইঞ্চি পাইপের ভেতর বডি ফেলে ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে ওঁচা বেকারির সাতদিনের বাসি রুটি চিবোতে। বললাম, 'আমাদের সব চলে। খবরটা দেবার জন্যে বহোত বহোত সুক্রিয়া।'

টিকেট কালেক্টারের পাশ দিয়ে আমরা বাইরে বেরিয়ে এলাম। আসতে আসতে চোখে পড়ল লব্ঝঝড় স্টেশন বিল্ডিংটার গা ঘেঁষে রেলেরই একটা চায়ের দোকান। এই ঝাঁ ঝাঁ দুপুরে একটা খদ্দেরও সেখানে নেই। দোকানদার একটা নড়বড়ে ট্যারাবাঁকা তক্তাপোষে বসে প্রেমসে ঝিমোচ্ছে। নিচে দশ-বারোটা বেওয়ারিশ রাস্তার কুকুর আর তিন চারটে ভিখিরিদের ছেলে গাদাগাদি করে শুয়ে আছে। কুকুরগুলোর আবার গণোরিয়া কি সিফিলিস।

বাইরে আসতেই চোখে পড়ে, একটা খোয়ার রাস্তা এঁকে বেঁকে লাট খেতে খেতে সামনের দিকে চলে গেছে। রাস্তাটায় কম করে দেড় ফুট পুরু ধুলো। সেটার দু'ধারে খানকতক দোকান। কোনোটা পানবিড়ির, কোনোটা মনিহারি, কোনোটা মুদিখানা, একটা রদ্দি-মার্কা সেলুন, এমনি পনের কুড়িটা। বিশ পঁচিশ মিটার দূরে অনেকগুলো ঝাড়ালো রেইন-ট্রি। সেগুলোর তলায় সাইকেল রিকশার স্ট্যাণ্ড। রিকশার হুড তুলে দিয়ে রিকশাওলারা গাড়ির ভেতর ফাইন ঘুম লাগাচ্ছে।

রিকশা স্ট্যাণ্ডের উল্টোদিকে একটা ফুটোফাটা টিনের চালার তলায় হোটেল চোখে পড়ল।

সেটার মাথায় সাইনবোর্ড। হোটেলের 'হ'-এর ওয়ান-ফোর্থ আর 'ল'-এর ওয়ান-থার্ড ছাড়া আর কিছুই পড়া যাচ্ছে না।

এই স্টেশনটা যখন বানানো হয় সেই সময় এই হোটেলটাও করা হয়েছিল। সেই যে আশি পঁচাশি বছর আগে সাইনবোর্ডটা চড়ানো হয়েছিল, সেটা আর পাল্টানো হয় নি। এত বছরের ঝড় বৃষ্টি আর রোদে রংফং উড়ে সাইনবোর্ডের বারোটা বেজে গেছে।

বোদাও হোটেলটা দেখতে পেয়েছিল। বলল, 'চল গুরু, ওখানকার কারবারটা ফিনিশ করে আসি।'

'চল—'

মাঝে মাঝে এই দুপুরবেলায় উল্টোপাল্টা দমকা হাওয়া দিচ্ছিল। রাস্তায় নামতেই ধুলো উড়ে আমাদের হোল বডিতে দেড় ইঞ্চি পাউডার লাগিয়ে দিল।

হোটেলে 'ইন' করতেই দেখতে পেলাম, মেঝেটা মাটির। একধারে ছোট ভাঙা তক্তাপোষে প্রোপ্রাইটর-কাম-ক্যাশিয়ার কোলের কাছে টিনের ক্যাশ বাক্স নিয়ে বসে আছে। লোকটার গায়ের চামড়ায় ভুষো কালি যেন মাখানো। রাউণ্ড মুখ, গোল লালচে চোখ। শ্লা বোধহয় রেগুলার গাঁজা ফাঁজা টানে, চুল চামড়া ঘেঁষে ছাঁটা, চাঁদির ওপর আলপিনের মতো সাদা-কালো চুল খাড়া দাঁড়িয়ে আছে। পরনে খাটো ধুতির ওপর ফতুয়া। দু-হাতে গোমেদ-পলা-ক্যাটস আই মিলিয়ে সোনা-রুপোর চার পাঁচটা আংটি। গলায় কালো কারে রুপো-বাঁধানো ঢাউস আমড়ার আঁটি ঢোলের মতো ঝুলছে।

মেঝেতে লাইন দিয়ে চাটাইয়ের আসন পেতে খাওয়ার ব্যবস্থা। এই দুপুরবেলা অনেক লোক খেতে বসেছে। দেখেই বোঝা যায়, এরা আশেপাশের দোকানদার ক্লাসের লোক, আর গেঁয়ো টাইপের কিছু মানুষ।

আমাদের দেখে প্রোপ্রাইটর-কাম-ক্যাশিয়ার একখানা গ্র্যাণ্ড রিসেপশান দিয়ে বলল, 'আসুন আসুন—'

বোদার এবং আমার চেহারা কিছুদিন ধরে তোয়াজে এবং আরামে থাকায় মোটামুটি খোলতাই হয়েছে। এইরকম চেহারার মালেরা খুব সম্ভব এই থার্ড ক্লাশ হোটেলে ঢোকে না। তাই এত খাতির।

গোটা কতক আসন এখনও ফাঁকা পড়ে রয়েছে। বোদা আর আমি দুটো আসনে নিজেদের সেট করে ফেললাম।

প্রাপ্রাইটার তক্ষুনি চেঁচিয়ে ঠাকুরকে ডেকে বলল, 'এই দুই বাবুকে মাছের মুড়ো, মাংস, ভাজা, লাউয়ের ঘন্ট, বেগুনভাজা দাও—'

তোবড়ানো অ্যালুমিনিয়ামের থালায় গাবের দানার মতো মোটা মোটা লাল চালের ভাত, রংচটা কলাইয়ের বাটিতে মাছ মাংস ফাংস নিয়ে ঠাকুর তক্ষুনি আমাদের সামনে রেখে গেল।

মহাশয়গণ, খোলা দরজা-জানালা দিয়ে হাওয়ায় ধুলো উড়ে আসছে। ভাত ফাতের ওপর কয়েক সেকেণ্ডে এক সেন্টিমিটার ধুলোর একখানা লেয়ার পড়ে গেল। তা ছাড়া এখানে যেটা খুব বেশি করে চোখ পড়ছে তা হল মাছি। কয়েক হাজার মাছির একটা রেজিমেন্ট যারা খেতে

বসেছে, তাদের পাতের ওপর ভন ভন করছে। কাছাকাছি কোথাও ডেফিনিটলি মাছিদের অগুনতি মেটার্নিটি হোম রয়েছে। নইলে ঝাঁকে ঝাঁকে এত এসে ঢুকছে কী করে?

বোদা ফিসফিসিয়ে বলল, 'গুরু, এ কোথায় আমরা 'ইন' করলাম?'

আমি ডাল দিয়ে ভাত মাখতে মাখতে বললাম, 'কেন রে, কী হয়েছে?'

'শ্লা, ধুলো আর মাছি দেখেছ! এখানে খাওয়া যায়! খেলেই নির্ঘাত কলেরা।'

মহাশয়গণ, দেখুন দেখুন বোদা মাকড়ার ক্যারেক্টর কিরকম খারাপ হয়ে গেছে! হারামীটা কোথায় কোথায় পড়ে থাকত! তারপর আগরপাড়ায় এসে কনকচাঁপার সঙ্গে জুড়ে যাবার পর আরামে থেকে থেকে এখন মাছি আর ধুলো দেখে সিঁটিয়ে যাচ্ছে।

চোখের কোণ দিয়ে বোদাকে দেখতে দেখতে বললাম, 'হারামী, তোর আর আমার এমন চীজ দিয়ে তৈরি, যা-ই খাই না—কলেরা পক্স হার্ট-অ্যাটাক ক্যানসার, কিস্সু হবে না। চোখ বুজে খেয়ে যা শ্লা। ওই যে নীলকণ্ঠ ফীলকণ্ঠ কী বলে, আমরা হলাম তা-ই। সাপের বিষ খেলেও আমরা ডাইজেস্ট করে ফেলব।'

গাঁইগুঁই করতে করতে খাওয়া স্টার্ট করল বোদা।

প্রোপ্রাইটর-কাম-ক্যাশিয়ার চিল্লাচিল্লি বাধিয়ে আমাদের জন্য আরো মাছ আরো মাংস আনাতে লাগল। আমরা যত 'না' 'না' করি, মাকড়া কিছুতেই ছাড়বে না। খজড়াটা গন্ধ পেয়েছে, আমাদের কাছে মালকড়ি আছে। সেটা খসাবার এমন চান্স আর হয়ত পাবে না।

মিনিট দশেক খাওয়ার পর পাঁজরায় কনুইয়ের আলতো গুঁতো খেয়ে ঘাড় ফেরাতেই চোখে পড়ল, বোদা আমার দিকে তাকিয়ে আছে। চোখাচোখি হতেই ইশারায় বাঁ দিকের 'রো'য়ের লাস্ট খদ্দেরটাকে দেখিয়ে দিল। ট্রেনের সেই ডেফ অ্যান্ড ডাম্ব ছোকরা ওখানে খেতে বসেছে। আর মাঝে মাঝেই চেঁচিয়ে উঠছে, 'ঠাকুর, আরেকটু ডাল দিয়ে যাও,' কি 'লাউয়ের ঘণ্ট এক বাটি—'

বোদা বলল, 'দেখলে গুরু, হারামীটা কেমন বোবা আর কালা!'

মহাশয়গণ, আপনাদের আগেই জানিয়েছি, ওই শ্লা আমার চোখে ধুলো দিতে পারে নি। ও যে একখানা টেরিফিক মাইম অ্যাক্টর, ঠিক ক্যাচ করে ফেলেছিলমা। বললাম, 'ব্লাডি ব্যাগারটা বুঝতে পারে নি, আমরা এখানে বসে খাচ্ছি।'

'হুঁ।'

'ওর দিকে তাকাস না। আমাদের দেখলে স্লিপ করে বেরিয়ে যাবে।'

'মালটাকে ধরবে নাকি?'

'হুজরুর।'

'ঝটপট খাওয়াটা ফিনিশ করে দাম-ফাম দিয়ে বাইরে বেরিয়ে ওয়েট করব। শ্লা বেরুলেই খ্যাঁচ করে ক্যাচ করব।'

মিনিট পাঁচেকের ভেতর খাওয়া হয়ে গেল। প্রোপ্রাইটার-কাম-ক্যাশিয়ারকে দাম দিয়ে বেরুতেই চোখে পড়ল বিশ ফুট দূরে একটা মোটা কড়ি গাছ। বোদাকে নিয়ে সেটার আঁড়ালে গিয়ে দাঁড়ালাম।

বোদা বলল, 'ওকে যে ধরতে চাইছ, ফোর টোয়েন্টিগিরি করে পয়সা নিয়েছে বলে কড়কে দেবে নাকি?'

'ধুস!'

'তা হলে?'

'মনে হচ্ছে ওই শ্লা আমাদের লাইনের মাল। একখানা আগমার্কা ফোর টোয়েন্টি। স্লাইট টোকা মেরে দেখি, যদি কোনো কাজে ফাজে সেট করে দেওয়া যায়।'

'গুরু, তোমার জবাব নেই।'

মিনিট সাতেক চড়া রোদে দাঁড়িয়ে থাকার পর দেখা গেল সেই ছোকরা কাঁধে হ্যাণ্ডব্যাগ ঝুলিয়ে মৌরি চিবুতে চিবুতে বেরিয়ে এল। শ্লাকে আমাদের পাশ দিয়েই যেতে হবে।

ছোকরা কড়ি গাছের কাছে এসে থেমে গেল। ব্যাগ ঝেড়ে আধ পোড়া বিড়ি আর দেশলাই বার করে ধরিয়ে নিয়ে টেরিফিক টান দিল। তারপর নাকমুখ দিয়ে গল গল করে নীলচে ধোঁয়া ছেড়ে একটা হিন্দি গানের চটকদার সুর ভাঁজতে ভাঁজতে আবার স্টেপ ফেলে এগিয়ে এল। ছোকরা স্টমাক বোঝাই করে ধুলো এবং মাছির চাট দিয়ে প্রোলেটারিয়েট একটি লাঞ্চ খেয়ে টেরিফিক মৌজে রয়েছে।

'লা-লা-লা-লা' করতে করতে ছোকরা যখন কড়ি গাছ পেরিয়ে চার স্টেপ এগিয়ে গেছে, বোদাকে সঙ্গে করে বেরিয়ে এলাম। ডাকলাম, 'এই যে চাঁদু—'

ছোকরা থমকে মুখ ফেরাতেই একেবারে পিরামিডের নিচের মমির মতো ফ্যাকসে মেরে গেল। গানটা তক্ষুনি বন্ধ হয়ে গেছে। শ্লা আমাদের ঠিক চিনতে পেরেছে। মনে হল, দৌড় লাগিয়ে আমাদের চোখের সামনে থেকে বিলকুল হাওয়া হয়ে যাবে। কিন্তু কেউ যেন অ্যাডহেসিভ ল্যাগিয়ে পা দুটো মাটিতে সেঁটে দিয়েছে তার।

বললাম, 'থামলে কেন মানিক, গাও গাও—যা গলা বানিয়েছ, ফিল্মে নামলে কিশোরকুমারের হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাবে।'

ছোকরা ভুরু এবং থুতনি নাচিয়ে মাইম অ্যাক্টিং করে বোঝাতে চাইল সে হানড্রেড পারসেন্ট বোবা এবং কালা। আমি তার থুতনিতে আঙুল ঠেকিয়ে চুক চুক আওয়াজ করে বললাম, 'নকশাবাজি ছাড় তো মাকড়া। হোটেলে বসে তোকে চেল্লাতে দেখেছি। ঘাবড়ানেকা কোঈ বাত নেহী। তুই যে কানে শুনিস, তোর গলায় যে বড়ে গুলাম আলির সুর খেলে, কাউকে জানাবো না। আমাদের সঙ্গে ভিড়ে যা, ক্যাশ ফ্যাশ ভালই মিলবে।'

ছোকরা দু' পাটির সবগুলো দাঁত বার করে হাসল। বলল, 'দাদা যখন ধরেই ফেলেছেন তখন আপনার পায়ে বডি ফেলে দেব। ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেলে আমার বিজনেসের তেরোটা বেজে যাবে।'

তার পিঠে আস্তে আস্তে চাপড় মারতে মারতে বললাম, 'কোঈ ডর নেহী। ওয়ার্ল্ডের কোনো মাকড়া আমাদের কাছ থেকে তোর ব্যাপারে কিস্সু জানতে পারবে না।' একটু থেমে বললাম, 'আমরাও তোর লাইনেরই লোক—সমঝা?'

আমার শেষ কথাটা ছোকরার মাথায় 'ইন' করে নি। সে হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

তার নাকটা এবার টিপে দিয়ে বললাম, 'বুঝতে পারলি না তো? দু-একমাস আমাদের সঙ্গে সেঁটে না থাকলে পারবি না। তোর নাম কি?'

'লগেন। সবাই ডাকে লগা।'

লগেন, অর্থাৎ নগেন। জিভের কেরামতিতে 'ন'টা 'ল' হয়েছে। বললাম, 'থাকিস কোথায়?'

লগা জানালো, কাছেই। পলাশডাঙার পর ছোট একটা গাঁ আছে, সেখানেই লগার বাড়ি।

বললাম, 'রোদটা টেরিফিক চড়ে গেছে। এখানে আর দশ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকলে চাঁদি ফেটে যাবে। পলাশডাঙার সরকারি গেস্ট হাউসটা কোথায় জানিস?'

'জানি।'

'কতদূর?'

'হেঁটে গেলে আধ ঘণ্টা লাগবে।'

'শ্লা, তোমাদের ঘড়ি ঘণ্টায় দশ মিনিট চলে। তার মানে মিনিমাম পাঁচ ছ ঘণ্টা লেগে যাবে। এক কাজ কর—'

'বলুন—'

'দুটো সাইকেল রিকশা ডেকে আন।'

'মাইরি বলছি আধ ঘণ্টার বেশি লাগবে না। শুধু শুধু দুটো রিকশার ভাড়া তিনটে টাকা দেবেন?'

'তোর কি মনে হয়ে গচ্চাটা আমার পকেট থেকে দেবো?'

ছোকরা তো তো করে কিছু একটা বলতে চাইল।

বললাম, 'আরে বাবা, গচ্চাটা তোর পকেট থেকেও যাচ্ছে না, আমার পকেট থেকে যাবেও না। এখান থেকে গেস্ট হাউসে রিকশায় যাই, এয়ার-কণ্ডিশানড গাড়িতে যাই কি হেলিকপ্টারেই যাই—তার ভাড়া দেবার জন্যে লোক আছে।

'কে?'

'আছে আছে। আমাদের সঙ্গে জুড়ে থাক। সব জানতে পারবি। আর একটাও কথা নয়। যা, ঝট করে রিকশা নিয়ে আয়।'

লগা দৌড়ে রিকশা স্ট্যাণ্ডে চলে গেল।

লগার টাইম সম্বন্ধে আইডিয়াটা খারাপ না। অন্তত ভিলেজ ফিলেজে যারা থাকে তাদের তুলনায় অনেক ভাল। সে বলেছিল, হেঁটে গেলে আট ঘণ্টায় গেস্ট হাউসে পৌঁছুনো যাবে। আধঘণ্টা না, আমার ধারণা মিনিট চল্লিশেক লাগে। সাইকেল রিকশায় লাগল পাক্কা ন'মিনিট।

গেস্ট হাউসটা দারুণ নিরিবিলি জায়গায়। চারদিকে প্রচুর গাছপালা আর পাখি-টাখি। মাঝখানে টালির চালের দুর্দান্ত বাড়ি। সামনে লম্বা লাউঞ্জ। লাউঞ্জের ধার ঘেঁষে নকশা-করা রেলিং। দেখে মনে হল, গেস্ট হাউসটায় খানচারেক ঘর রয়েছে। এ ছাড়া বিশাল কম্পাউণ্ডেব ভেতর বাগান, কেয়ার-টেকার এবং অন্য সব এমপ্লয়িদের কোয়ার্টার।

মহাশয়গণ, এই দুপুরবেলায় রোদ যখন স্ট্রেট চাঁদির ওপর তখন কোথাও কোনো শব্দ ফব্দ নেই। কোনো লোকজনও চোখে পড়ছে না। শুধু গাছ-ফাছের ডালে বসে কাকে ডাকছে। কখনও

বা শ্রাদ্ধ বাড়ির লোকেদের করুণ বিলাপের মতো ঘুঘুরা ককিয়ে উঠছে।

রিকশা থামিয়ে ভাড়া চুকিয়ে আমরা গেস্ট হাউসের কম্পাউণ্ডে ঢুকে হল্লা করে কেয়ারটেকারকে বার করলাম। মাকড়া দুপুরবেলা খেয়ে দেয়ে তোফা একখানা ঘুম লাগিয়েছিল। চোখমুখ দেখে মনে হল, কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে দেবার জন্য দারুণ খচে গেছে। ভুরু কুঁচকে খেঁকিয়ে উঠল, 'কী চাই?'

কেয়ারটেকারের চোখের দিকে তাকিয়ে দেবশিশুর মতো মুখ করে বললাম, 'দুপুরবেলা ঘুমোবার জন্যে গভর্নমেণ্টে বুঝি আপনাকে স্যালারি দেয়?'

কেয়ারটেকার আমার চোখের দিকে এমনভাবে তাকাল যাতে মনে হয় পুড়িয়ে আমাকে একেবারে পাউডার করে ফেলবে।

আমি এবার পি ডপ্লু ডি-র অথরিটির কাছ থেকে অভ্যুদয় মিটার আমার জন্য যে চিঠিটা বাগিয়ে এনেছিলেন, সেটা পকেট থেকে বার করে কেয়ারটেকারের হাতে জমা দিলাম। বললাম, 'স্লাইট কষ্ট করে চিঠিটা পড়তে হবে।'

চিঠিটা পড়তে পড়তে কেয়ারটেকারের মুখের ওপর দিয়ে কত রকমের কালার যে খেলতে লাগল, মহাশয়গণ লাংগুয়েজ দিয়ে তা বোঝাতে পারব না। ঝট করে হাতজোড় করে মাথাটা স্রেফ নাইনটি ডিগ্রিতে হাঁটু পর্যন্ত ঝুঁকিয়ে বলল, 'আমার একটা কলিকের পেইন আছে স্যার। সেটা যখন চাগাড় দিয়ে ওঠে তখন একেবারে পেড়ে ফেলে। আজও আপনারা আসার আগে ব্যথায় কাটা ছাগলের মতো কাতরাতে কাতরাতে শুয়ে পড়েছিলাম। তারপর ঘুমটা এসে গেল। দয়া করে ক্ষমা করে দেবেন স্যার। কোনো অপরাধ নেবেন না।'

আমি তক্ষুনি ক্ষমাও করে দিলাম, অপরাধও নিলাম না। কেয়ারটেকারের কাঁধ ধরে পারপেণ্ডিকুলারের মতো তাকে দাঁড় করিয়ে বললাম, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। বডিটা ওরকম বেঁকিয়ে কোমরের বল বেয়ারিংয়ের বারোটা বাজাতে হবে না। শ্লা, তুমি গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি, যখন ইচ্ছে ঘুমোবার রাইট আছে তোমার। যত পারবে ঘুমোবে।'

মহাশয়গণ, হেঁচকি তোলার মতো আওয়াজ করে কেয়ারটেকার মালটা এবার আমার পায়ে বডি থ্রো করে পড়ল। বলল, 'না না স্যার, আমি একজন ডিউটিফুল গভর্নমেন্ট সারভেন্ট। কোনোদিন এর আগে আমি দুপুরে ঘুমোই নি। আজকেই শুধু—স্যার, আমার ওপরওলারা জানতে পারলে হেভি ক্ষতি হয়ে যাবে।'

'কেউ জানতে পারবে না রে মাকড়া।' ফের কেয়ায়টেকারকে মাটি থেকে তুলে দাঁড় করাতে করাতে বললাম, 'এবার একটু মেহেরবানি করে আমাদের ঘর না দেখিয়ে দিলে স্রেফ রোস্ট হয়ে যাব।'

কেয়ারটেকার দম আটাকানো গলায় বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই স্যার। আসুন আসুন—'

আমাদের তিনজনকে একটা টেরিফিক সাজানো ঘরে নিয়ে গেল কেয়ারটেকার। নিজের হাতে ফ্যান চালিয়ে দিয়ে বলল, 'আপনারা বসুন স্যার। রেস্ট নিন।' অ্যাটাচড বাথের দরজা দেখিয়ে বলল, 'ইচ্ছে করলে স্নান টানও করে নিতে পারেন। আমি আপনাদের লাঞ্চের ব্যবস্থা

'লাঞ্চ আমরা সেরেই এসেছি। আমাদের জন্যে ভেবে ভেবে ব্লাড প্রেসার ফল করাতে হবে না। মাথা থেকে চিন্তা ফিন্তা ঝেড়ে ফেলে বিছানায় বডি ফেলে দাও গিয়ে। বিকেলে চা-ফা পাঠিয়ে দিলেই হবে। ও.কে?'

কেয়ারটেকার তবু খুঁত খুঁত করতে করতে লাগল। বলল, 'দুপুর বেলা এলেন। কিছু না খেলে—'

মাকড়ার ব্রেনে কিছুই ঢোকে না দেখছি। বললাম, 'খেয়ে এসেছি। এখন আর কিস্‌সু দরকার নেই। ঘাবড়িও না চাঁদু, তোমার নামে আমি রির্পোট করব না। এখন হড়কে যাও। পাঁচটার আগে তোমার থোবড়া যেন আর না দেখি।' লগাকে দেখিয়ে বলালাম, 'এর সঙ্গে এখন আমাদের 'সামিট কনফারেন্স'আছে। ও.কে?'

আর কিছু বলতে সাহস করল না কেয়ারটেকার। টেরিফিক একখানা করুণ 'পোজ' দিয়ে আস্তে আস্তে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। আচমকা একটা ব্যাপার মনে পড়তে ডাকলাম, 'এই যে মিস্টার—'

ধড়মড় করে এক লং জাম্প মেরে আবার আমাদের কাছে ফিরে এল কেয়ারটেকার। জিজ্ঞেস করল, 'কিছু বলবেন স্যার?'

কেয়ারটেকার আমার চাইতে ঢের ছোটই হবে। আগেও তাকে তুমি ফুমি করে বলেছি। কাজেই আপনি টাপনিতে রির্টান করা ঠিক হবে না। বললাম, 'তোমার নামটা কী?'

'চন্দ্রকিরণ সেন।' চোখ নামিয়ে লজ্জা-লজ্জা মুখ করে জবাব দিল কেয়ারটেকার।

এমন ফ্যান্টাস্টিক নাম আমার ফোরটিন জেনারেশানে কেউ কোনোদিন শোনে নি। বললাম, 'কে দিয়েছিল নামটা? নিজেই নাকি?'

'না না, আমার ঠাকুরদা।'

'পোয়েট ফোয়েট ছিল বুঝি?'

'হ্যাঁ স্যার।'

'ঠিক ক্যাচ করেছি। চাঁদের আলো, এবার হাওয়া হয়ে যাও।'

চন্দ্রকিরণ চলে গেল ঠিকই, কিন্তু মহাশয়গণ, লগার সঙ্গে জম্পেশ করে শীর্ষ সম্মেলন স্টার্ট করার আগে আবার ফিরে এল। এবার তার সঙ্গে গেস্ট হাউসের একটা বেয়ারা। বেয়ারাটার হাতে একটা বড় ট্রেতে তিন গেলাস ঘোলের সরবত। সরবতের মাথায় আইসবার্গের চুড়োর মতো বরফের কুচি ভাসছে।

চন্দ্রকিরণ হাত কচলাতে কচলাতে বলল, 'স্যার ক্ষমা করবেন, আবার একটু বিরক্ত করতে এলাম। অ্যাট লিস্ট সরবতটুকু না খেলে আমার ভীষণ কষ্ট হবে স্যার।'

ডান চোখের ভুরু কয়েক সেন্টিমিটার ওপরে তুলে, বাঁ চোখটা বুজে ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে বললাম, 'ও.কে, সরবত রেখে যাও। তবে—'

'কী?'

'আমাদের বাটার লাগাবার দরকার ছিল না। আগেই তো জানিয়ে দিয়েছি, আমরা তোমার ড্যামেজ করব না।'

গ্যারগেরে গলায় হেঁ হেঁ করতে করতে চন্দ্রকিরণ সঙ্গের বেয়ারাটাকে বলল, 'ট্রেটা টেবলে নামিয়ে রাখ হরে—'

বেয়ারা অর্থাৎ হরের বয়েস বাইশ তেইশ। অস্ট্রেলিয়ার ম্যাপের মুখ, গাঁটপাকানো চেহারা। গালে খাপচা খাপচা পাতলা দাড়ি, পরনে ইউনিফর্ম। তবে ফুল শার্টটা দলা-মোচড়া করা, নোংরা। ওপরের জামাটা ধবধবে সাদা।

ট্রেটা সেণ্টার টেবলে নামিয়ে রেখে প্যারা মিলিটারি স্টাইলে একখানা সালুট লাগাল হরে।

চন্দ্রকিরণ বলল, 'এবার আমরা যাই স্যার। যখন যা দরকার হয়, বেল বাজাবেন। দেখবেন এখানে আমরা কিরকম সার্ভিস দিই।' বলে কলিং বেলের সুইচ দেখিয়ে দিল।

'ও-কে—'

চন্দ্রকিরণরা চলে গেল।

ঘরটা বেশ বড় মাপের। কম করে চারশ স্কোয়ার ফিট তো হবেই। কাছাকাছি দুটো ফোম-বসানো সিঙ্গল-বেড খাট, তার ওপর সাদা ধবধবে বিছানা। দুই বেডের মাঝখানে নিচু স্ট্যান্ড ল্যাম্পশেড, ছোট সাইড টেবল। আরেক ধারে কার্পেট-মোড়া ফ্লোরে সোফা-টোফা সাজানো।

বোদা আর আমি দুটো সোফায় বসে পড়েছিলাম। লগা দাঁড়িয়ে ছিল। সে কাঁধের সাইড ব্যাগ নামিয়ে নিচে বসতে যাবে, আমি একটা ফাঁকা সোফা দেখিয়ে বললাম, 'নিচে নয় রে মাকড়া, ওপরে সোফায় বস।'

লগা খানিকটা কুঁকড়ে গিয়ে বলল, 'ঐ রকম দামি সিটে বসব! কেউ তো আমার মতো—'এই পর্যন্ত বলে থমকে গেল।

বুঝতে পারছি, লগার মতো মালেদের কেউ এমন খাতির করে সোফায় বসতে বলে না। সেটাই জানাতে গিয়ে সে থেমে গেছে। বললাম, 'তোকে তো আগেই বলেছি, তুই আর আমরা এক লাইনের লোক। ও সব লজ্জা ফজ্জা ঝেড়ে ফেলে সোফায় পাছা ঠেকা তো চাঁদবদন। তারপর ঘোলের সরবত স্টমাকে চালান করে দে।'

লগা ডাইনে এবং বাঁয়ে হান্ড্রেড এইটি ডিগ্রিতে মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমাকে আর বোদাকে একবার দেখে নিল। আমরা কী ধরনের চীজ ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। হে-হে মহাশয়গণ, না বুঝবারই কথা। আপনারা আমাকে অনেক দিন ধরে দেখছেন, হাড়ের ভেতর পর্যন্ত চিনে গেছেন। কিন্তু এই শ্লা তো আজই পয়লা দেখল, তাই পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছে না। তার ভয় হয়তো কোনো কঁ্যাচাকলে ঢুকিয়ে দেব।

সে যাক গে, শেষ পর্যন্ত নার্ভগুলো টান টান করে সোফায় বসল। লগা তার 'বাটক' খানা গদিতে ঠেকল কি ঠেকল না।

সরবত টরবত খাওয়ার পর খানিকক্ষণ এলোমেলো ভ্যানতাড়া চলল। তারপর কাজের কথায় 'ইন' করলাম, 'এবার বল তুই থাকিস কোথায়?'

'ফুলেলপুরে।'

'সেটা কতদুর?'

লগা জানালো, এখান থেকে ধানখেতের ওপর দিয়ে আড়াআড়ি পশ্চিমে মাইল তিনেক

গেলে যে গ্রামটা পড়বে সেটাই হল ফুলেলপুর।

জিজ্ঞেস করলাম, 'সেখানে কে কে আছে তোর?'

'বুড়ো বাপ আর মা। বাপটা বিছানা থেকে উঠতে পারে না, একটা দিক পড়ে গেছে।'

'ভাইবোন?'

'নেই।'

'বিয়ে ফিয়ে করে বসিস নি তো মাকড়া?'

গলার ভেতর হিক্কা তোলার মতো আওয়াজ করে লগা বলল, 'পাগল হয়েছেন দাদা, তিনটে পেট চালাতে বাপের নাম হরিপদ হয়ে যাচ্ছে, তার ভেতর আবার বউ এনে ঢোকালে দেখতে হবে না। অনশনের কমপিটিশান লেগে যাবে।'

হে-হে মহাশয়গণ, লগাকে মার্ক করুন। শ্লা, গাঁয়ের চীজ হলেও আমাদের মতো শহরের খজড়াদের স্টাইলে কথা বলতে পারে। বললাম, 'যাক বাবা, ঘাড়ের ওপর যে একটা ওয়াইফ এনে ঝোলাওনি, এটাই তোমার মা-বাপের ফোরটিন জেনারেশানের ভাগ্যি।'

লগা চোখ দুটো পারফেক্ট সার্কল বানিয়ে বলল, 'মা-বাপের ভাগ্যি কেন দাদা?'

'বউ এলে পয়লাই তো তাদের দু'জনের বাটকে দু'খানা হেভি ওয়েটের কিক ঝেড়ে ভাগিয়ে দিতিস।'

'বাটকটা কী স্যার?'

বুঝতে পারছি লগার স্টকে দু-চারটের বেশি ইংরেজি ফিংরেজি নেই। বাঁ পা'টা তার পাছায় ঠেকিয়ে বললাম, 'এইটা—'

মাড়িশুদ্ধু দাঁত বার করে হাসল লগা।

বললাম, 'ল্যান্ড ফ্যান্ড কিছু আছে?'

লগা হাঁ করে তাকিয়ে রইল। এই ইংরেজিটারও মানে সে জানে না। বললাম, 'জমি রে জমি—'

ডাইনে বাঁয়ে মাথাটা স্লো মোশানে ঝাঁকিয়ে লগা বলল, 'না, জমি-ফমি থাকলে কি আর ভাবনা ছিল?

'লেখাপড়া করেছিস কিছু?'

'না স্যার, প্রাইমারি ইস্কুলে বছর দেড়েক যাতায়াত করেছিলাম।'

'তারপর?'

তারপর লগা তার লাইফ হিস্ট্রিটা যা বলে গেল তা এইরকম। তার বাপ একজন ল্যান্ডলেস পেজান্ট, অন্যের জমিতে কাজ করত। বারোমাস তো আর এই টাইপের মালেদের কাজকর্ম থাকে না। এটা সেটা হ্যান ত্যান করে পেট চালাতে হতো। এই যার বাপের হাল তার পক্ষে কদ্দিন আর ইস্কুল ফিস্কুলে যাওয়া সম্ভব? বাপের অ্যাপ্রেন্টিস হয়ে লগা খেতে কাজ করতে লাগল, লোকজনের গরু ছাগল চরাতে লাগল, ঘরামির কাজে ট্রেনিং নিল।

এইভাবে বছর কয়েক চলার পর বাপ বিছানায় বডি ফেলে দিল। সারাদিন খাটার পর একার ইনকামে তিনটে পেট চালানো ইমপসিবল হয়ে উঠল লগার পক্ষে। প্রথম কিছুদিন দিনের বেলা

কাজটাজ করে রাত্তিরে পার্টটাইম চুরি করতে লাগল। কিন্তু বার তিনেক ধরা পড়ে অ্যায়সা আড়ং ধোলাই খেল যে তিন বারে দশ দিন করে বিছানায় বডি ফেলে রাখতে হল। একবার ধোলাইটা এমনিই বেশি হয়ে গিয়েছিল যে ভয় হচ্ছিল আর বোধহয় উঠে দাঁড়াতে হবে না। স্ট্রেট অন্যের কাঁধে চড়ে শ্মশানে চলে যেতে হবে।

কিন্তু চুরি ফুরির লাইন খুব রিস্কি। শেষ পর্যন্ত এক মাদ্রাজিকে দেখে কিছু হ্যান্ডবিল ছাপিয়ে এখনকার প্রফেসানটা ধরেছে লগা। এতে লাইফের ঝুঁকি ফুঁকি নেই। ইনভেস্টমেন্ট বলতে হ্যান্ডবিল ছাপানোর গোটা বিশেক টাকা। তবে বছর দুয়েকের বেশি ছাপানো কাগজগুলো টেকে না, ভাঁজে ভাঁজে ছিঁড়ে যায়। আবার নতুন করে বিশটা টাকা গচ্চা। তবে বোবা-কালার মাইম অ্যাক্টিংটা ভাল করে করত হয়। আগে আগে একটু আধটু গড়বড় হয়ে যেত, নিজের অজান্তে কথা বেরিয়ে আসতে চাইত গলার ভেতর থেকে। তারপর অবশ্য কয়েক বছরের হ্যাবিটে অ্যাক্টিংটা পারফেক্ট হয়ে গেছে। লোকজন বেয়াড়া কমেন্ট ফমেন্ট করলে এখন সে স্রেফ বাছুরের মতো তাকিয়ে থাকতে পারে। তার মুখ দেখে কোন শ্লা বলবে, লগা রিয়েল ডেফ অ্যান্ড ডাম্ব নয়।

মাকড়া আরো জানালো, শুধু এই লাইনেই না, হ্যান্ডবিল নিয়ে সে হাওড়া লাইনেও চলে যায়। শিয়ালদা নর্থেও যায়। এমন কি মাঝে মাঝে বিহার আসাম ওড়িষা মধ্যপ্রদেশেও হানা দেয়। সে জন্য এক মাস্টারমশাইকে ধরে হ্যান্ডবিলের বয়ানটার ইংলিশ ট্রানস্লেশনও করিয়ে ছাপিয়ে নিয়েছে। কেননা অন্য প্রভিন্সে বাংলা তো আর চলবে না। ব্যাপারটা তার কাছে খুব একটা রেসপেক্টেবল প্রফেসান বলে মনে হয়। কোনো রকম ঝুট ঝামেলা নেই, মারধোর খাবার রিস্ক নেই। কাজটা পারফেক্ট আর্টিস্টের—মহান শিল্পীর। শিল্পী হিসেবে সে লোকজনের কাছ থেকে স্লাইট ফী নিয়ে থাকে। এটা তার প্রাপ্য।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কিরকম ইনকাম হয় তোর?'

লগা বলল, 'আগে তো ভালই হত। এখন এ লাইনেও অনেক ঘুঘু ঢুকে পড়েছে।'

'হ্যাঁ, শ্লা সব লাইনের টেরিফিক কমপিটিশন। তবু এই সব কমপিটিশনের পরও কেমন থাকে, সেইটা বল।'

একটু চিন্তা করে বলল, 'ধরুন, পনের কুড়ি ডেইলি।'

বললাম, 'খুব খারাপ না।'

'তবে শরীরটা খারাপ টারাপ হয়ে গেলে খুব গড়বড় হয়ে যায়। তখন ইনকাম বন্ধ, চোখে সেই সময়টা সর্ষে ফুল দেখি।'

'তোর লাইনে এই এরিয়ার আর কে কে আছে?'

'আর কেউ নেই। তবে—'

'কী?'

'অন্য লাইনে ফোরটোয়েন্টিগিরি করে কেউ কেউ টু পাইস কামিয়ে নেয়।'

'কিরকম?'

'এই ধরুন গুরুদশার ড্রেস পরে অনেকে হাতে সরা নিয়ে ট্রেনে ট্রেনে ঘুরে কিছু কিছু

কামায়।'

বোদা এতক্ষণ ঘাড় কাত করে মন দিয়ে সব শুনে যাচ্ছিল, এবার বলে উঠল, 'আমিও একসময় এই লাইনে কাজ করেছি। তবে বেশি দিন এই প্রফেসানটা চালানো মুশকিল। ধরা পড়ে যেতে হয়।'

আস্তে আস্তে মাথা ঝাঁকিয়ে বললাম, 'হ্যাঁ। দু-চারদিন কি দু-চার মান্থ এভাবে চালানো যায়। তারপরেই লোকে ক্যাচ করে ফেলে।' একটু থেমে জিজ্ঞেস করলাম, 'গুরুদশার লাইনের মালেরা সবই কি পলাশডাঙার?'

'হ্যাঁ।'

'তুই তাদের চিনিস?'

'চিনব না? এখানকার হারামীরা আমার চোখে ধুলো দিয়ে ফোরটোয়েন্টিগিরি করে বেড়াবে, তাই কখনো হয় স্যার!'

'এরকম ক'জন আছে?'

'হবে আট দশ জন।'

'ফাইন।'

এতগুলো ফোরটোয়েন্টি পলাশডাঙায় থাকায় কেন আমি খুশি, লগা বুঝতে পারছে না। সে স্ট্রেট আমার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল।

'অন্য লাইনে ফোরটোয়েন্টিগিরি করছে, এরকম আর কেউ আছে?'

এক সেকেণ্ডও না ভেবে লগা বলল, 'বোবা-কালা আর গুরুদশা ছাড়া আর কোনো ফোরটোয়েন্টি লাইনে অন্য কেউ আছে কিনা জানি না।'

'ফাইন। ওদের ইনকাম কিরকম?'

'রোজ আট দশ টাকার মতো।'

মহাশয়গণ, আমার মাথায় একটা প্ল্যান এসে গিয়েছিল। লগাকে আমাদের সঙ্গে ভিড়িয়ে নিতে হবে। এই টাইপের লোকাল একখানা মাল হাতে থাকলে আমাদের কাজটা ফার্স্ট ক্লাস এগিয়ে যাবে, কোথাও এতটুকু আটকাবে না। বললাম, 'লগা, একমাসের জন্যে তোকে ট্রেনে ট্রেনে ঘুরে ডেফ অ্যান্ড ডাম্বের অ্যাক্টিং স্টপ করতে হবে।'

লগা গলার ভেতর হেঁচকি তোলার মতো একটা আওয়াজ বার করে বলল, 'আরি বাপ, তা হলে খাব কী স্যার? তিন তিনটে পেট—'

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, 'একমাসের জন্যে তিনটে পেটের রেসপনসিবিলিটি আমার। তোদের স্টমাকে যা ঢোকাতে চাস—ভাত, ডাল, চপ, কাটলেট, বিরিয়ানি, মুরগ মসল্লম থেকে প্রাণে যা যা চায় সব সাপ্লাই দিয়ে যাব। তা ছাড়া—'

'তা ছাড়া?'

'ডেইলি কুড়ি টাকা করে অ্যালাওন্স পাবি।'

লগার চোখের তারা ভুরু টপকে এক হাই জাম্পে চাঁদিতে গিয়ে ঠেকল। ঝাড়া তিন চার মিনিট শ্বা দম আটকে তাকিয়ে রইল। মনে হল, স্ট্রোক হয়ে যাবে। তারপর আঁক করে একটা

আওয়াজ বার করে শুধু বলতে পারল, 'আঁ-আঁ-আঁ-আঁ—'

আমি তার চাঁদিতে হাত বুলোতে বুলোতে বললাম, 'অমন করতে নেই। সুখের মুখ দেখার আগেই অক্কা পেয়ে গেলে বহুৎ আপসোসকি বাত। নিশ্বাসটা আটকে রাখিস না, আস্তে আস্তে বার করে দে—

স্টিম ইঞ্জিনের মতো হুস করে নাকমুখ দিয়ে অনেকটা হাওয়া বার করে লগা বলল, 'স্যার, শুধু আমাদের এত খাওয়াবেন, অতগুলো করে টাকা দেবেন! আমার মাথায় কিচ্ছু ঢুকছে না।'

'শুধু শুধু কি আর কেউ মুখ দেখে পয়সা দেয় রে শ্লা! তার ওপর তোমার থোবড়াখানা যা, তা দেখলে ফোরটিন জেনারেশানের অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসবে। পয়সা পাবি তোর গুণে।'

অনেকক্ষণ লগা পেল্লায় বড় হাঁ করে রইল, যেন লক-জ হয়ে গেছে। তারপর বলল, 'আমার মতো ওঁচা ফোরটোয়েন্টির আবার কী গুণ আছে যে এত পয়সা দেবেন!'

'তুই জানিস না কত বড় জিনিয়াস তুই।'

জিনিয়াস ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারল না লগা, সে সোজা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি পার্স বার করে চারখানা কুড়ি টাকার পাত্তি লগার হাতে দিয়ে বললাম, 'তোর দু'দিনের অ্যালাওন্স আর তিনজনের র‍্যাশনের দাম অ্যাডভান্স পেমেন্ট করলাম। আজ থেকেই আমাদের সঙ্গে নিজেকে সেট করে ফ্যাল।'

একসঙ্গে এতগুলো টাকা নিজের চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছে না লগা, যেন দিনের বেলা জেগে জেগে একখানা দুর্ধর্ষ স্বপ্ন দেখছে। একসময় কাঁপা কাঁপা হাত বাড়িয়ে কড়কড়ে নোট চারটে খামচে ধরে ফেলল সে। উত্তেজনায় আর খুশিতে তার চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসবে। খ্যাসখেসে গলায় জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে কী করতে হবে স্যার?'

'আজ থেকে তুই আমাদের পাবলিক রিলেশানস ম্যানেজার। ওখানকার জনসংযোগটা তোকেই করতে হবে।'

এমন উদ্ভট কথা লাইফে বোধ হয় শোনে নি লগা। সে জিজ্ঞেস করল, 'সেটা কী স্যার?'

'লোকজনের সঙ্গে আমাদের আলাপ ফালাপ করিয়ে দিবি।'

'তার জন্যে এত পয়সা!'

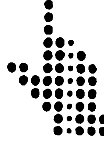
আমরা কাঁকের পাগলা গারদ থেকে স্ট্রেট বেরিয়ে এসেছি কিনা, সেটাই দু'জনকে মার্ক করতে করতে বুঝতে চেষ্টা করছিল লগা। বললাম, 'শ্লা, তোকে কী আর দিয়েছি! কলকাতার বড় বড় অফিসে গিয়ে দ্যাখ, পি. আর ম্যানেজাররা কী স্টাইলে থাকে! পাবলিক রিলেশানটা কমপ্লিট করে দে। তারপর দেখবি, আরো কত কী পাস।'

টাকাটা সাইড ব্যাগে পুরতে পুরতে লগা বলল, 'স্যার, ঝামেলায় ফেঁসে যাব না তো?'

বুঝতে পারছি, মাকড়া আমাকে একেবারেই বিশ্বাস করতে পারছে না। মহাশয়গণ, বিশ্বাস না করারই কথা। হুট করে অচেনা কেউ যদি আপনাদের হাতে ক্যাশ গুঁজে দেয়, আপনাদেরও

মনে হবে নিশ্চয়ই হেভি গড়বড় কিছু রয়েছে। বললাম, 'তুই আমাদের চিনিস না তো, তাই নার্ভাস হয়ে যাচ্ছিস। দু'দিন সঙ্গে সঙ্গে লেগে থাক, তখন মনে হবে হোল লাইফ এদের সঙ্গে জুড়ে থাকি। আর টাকাটা যে দিলাম সেটা আমার বাপের টাকা নয়। এটা জনগণের ক্যাশ। তোদের টাকা তোদেরই দিলাম।'

মহাশয়গণ, লগার চোখমুখ দেখে মনে হচ্ছে, তার মাথায় একখানা নাগরদোলা ঘুরপাক খাচ্ছে। আমার কথা কিছু বুঝতে পারছে না। বললাম, 'আর একটা কথাও না। এখন ঝাড়া দু ঘন্টা রেস্ট। লেটে যা লগা, বোদা তুইও বডি ফেল।' বলতে বলতে একটা খাটে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লাম। বোদাও টান টান হয়ে আরেকটা খাট দখল করল। আর নিচে কার্পেটের ওপর কুঁকড়ে একটা হাত চোখের ওপর সেট করে লগা হয়ত ভাবতে লাগল, এ শ্লা কাদের পাল্লায় পড়ল!



মহাশয়গণ, পাক্কা দু ঘন্টা পর আমরা লগাকে সঙ্গে করে গণসংযোগ করতে বেরুলাম। তার আগে অবশ্য চন্দ্রকিরণ আমাদের হাই-টী খাইয়ে দিয়েছে।

মহাশয়গণ আপনারা তো জানেনই, আমরা কী পারপাসে এখানে হানা দিয়েছি। গ্র্যাসরুট লেভেলে না গেলে কি ভোট ফোট ক্যাচ করা যায়? অভ্যুদয় যাতে ইলেকশানে দাঁড়ালে তার নামে একটা ভোটও না পড়ে সেই জন্যও গ্র্যাসরুটের তলা পর্যন্ত জানা দরকার। এই জায়গাটা আর এখানকার লোকজনেদের না জানলে অভ্যুদয় মাকড়ার বারোটা বাজাব কী করে?

গেস্ট হাউস থেকে বেরিয়ে লগাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এখন কোথায় গেলে অনেক লোকজন একসঙ্গে পাওয়া যাবে?'

লগা একটু ভেবে বলল, 'ইস্টিশানের কাছে যে দোকানগুলো আছে, সেখানে বিকেলবেলা রোজ বাজার বসে। ওখানে গেলে অনেক লোক দেখা যাবে।'

'ফাইন।'

টেরিফিক অবাক লগা জানতে চাইল, 'এত লোকজন দিয়ে কী হবে?'

'লোক নিয়েই তো আমার কারবার রে।'

বিকেল হয়ে গেছে। রোদ্দুরের ঝাঁঝ মরতে মরতে এখন ম্যাড়মেড়ে হয়ে এসেছে। ফাইন হাওয়া ছেড়েছে দক্ষিণ দিক থেকে। আমরা সাইকেল রিকশায় গেস্ট হাউসে এসেছিলাম। এবার বিকেলের হাওয়া গায়ে লাগিয়ে হাঁটতে হাঁটতে স্টেশনে চলে এলাম।

সত্যিই স্টেশনের তলায় সাইকেল রিকশা স্ট্যান্ডের গা ঘেঁষে ছোটোখাটো একখানা বাজার বসেছে। কেউ নিয়ে বসেছে লাউ কুমড়ো, কেউ আলু পেঁয়াজ, কেউ কচু ঘেঁচু ইত্যাদি আনাজপাতি। দু-চারজন বসেছে তিলাপিয়া আর চারাপোনা নিয়ে। তাছাড়া প্লাস্টিকের পুতুল,

সস্তা চা, হাতা-খুন্তি-কড়াই, সচিত্র কোকশাস্ত্র, শনি-সত্যনারায়ণের পাঁচালি, বিদ্যাসাগরের প্রথম ভাগ দ্বিতীয় ভাগের দোকানও রয়েছে। দোকান আর কি, পুরনো খবরের কাগজ কি চট বিছিয়ে এই সব জিনিস সাজিয়ে বসেছে দোকানদারেরা।

দোকানদারগুলোর চেহারা ভাঙাচোরা। প্রোটিন, ভিটামিন—এসবের সঙ্গে তাদের কোনোকালেই সম্পর্ক নেই। চোখগুলো হলদে হলদে, ঘোলাটে। পরনে তালি-মারা ময়লা জামা কাপড়। দেখেই বোঝা যায়, হোল লাইফ খজড়াগুলোর কাঁধে ফেমিন ভর করে আছে।

বেচাকেনা তেমন একটা হচ্ছিল না। সবাই খদ্দেরের আশায় ঘাপটি মেরে বসে আছে।

লগাকে জানালাম, 'আমি দোকানদারদের সঙ্গে কনফারেন্স করতে চাই।'

কনফারেন্স কথাটা বাপের জন্মে শোনে নি লগা। সে জিজ্ঞেস করে, 'মানে কী স্যার?'

'বাতচিত করতে চাই। তুই ব্যবস্থা করে দে।'

এবার বুঝল লগা। বলল, 'এক্ষুনি। এক মিনিটের ভেতর ব্যবস্থা হয়ে যাচ্ছে।'

আমরা বাজারটা থেকে কুড়ি পঁচিশ ফুট দূরে দাঁড়িয়ে আছি। লগা দোকানদারদের কাছে গিয়ে হাত-পা নেড়ে বক্তৃতা ফক্তৃতা দেবার স্টাইলে জানালো, কলকাতা থেকে একজন খুব বড় মানুষ এসেছেন, তিনি দোকানদারদের সঙ্গে একটু কথা বলতে চান। তাঁর সঙ্গে কথা বললে দোকানদারদের লাভই হবে।

মহাশয়গণ, আচমকা উইদআউট নোটিশে কেউ এসে গায়ে পড়ে আলাপ টালাপ করতে চাইলে হকচকিয়ে যাবার কথা। দোকানদাররা জানতে চাইল, কে কথা বলতে চাইছে।

লগা আঙুল বাড়িয়ে আমাদের দেখিয়ে দিল, 'এঁরা—'

ভুরু কুঁচকে সন্দিগ্ধ চোখে আমাদের দিকে তাকালো দোকানদারেরা। মহাশয়গণ, আপনারা তো জানেনই, আমার চেহারাটা খুবই ডিসেপটিভ। হলিউডের গোড়ার দিকের ছবি ফবি যাঁরা দেখেছেন তাঁদের ডেফিনিটলি সেই হীরোর, যাঁর নাম ভ্যালেণ্টিনো—চেহারা চোখের সামনে ফ্ল্যাশ দিয়ে উঠবে। মাকড়া দুর্দান্ত দেখতে। আমাকে দেখে অনেকে বলে ভ্যালেণ্টিনো আর আমি নাকি এক ছাঁচ থেকে বেরিয়ে এসেছি। আমাকে দেখতে দেখতে অনিবার্য প্রশ্নটা করে বসল দোকানদারেরা, 'আমাদের সঙ্গে ওই বাবুর কী দরকার?'

'কথা বললেই বুঝতে পারবে।'

সন্দেহটা যাচ্ছে না। দোকানদাররা বলল, 'আমাদের মতো গরিব লোকদের সঙ্গে ওইরকম কলকাতার বাবুরা কথাবাত্তা বলে কী সুখ পাবেন?'

লগা হেভি নাছোড়বান্দা। আমাদের রিয়েল পাবলিক রিলেশানস ম্যানেজার। সে বলল, 'কথা বলেই দেখ না—'

'কিন্তু এখন আমাদের বিক্রিবাটার সময়। কথা বলতে গেলে খদ্দের ভেগে যাবে। ক্ষেতিটা কে পুষিয়ে দেবে বল—'

মহাশয়গণ, এতক্ষণ আমি উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম, এবার স্টেজে 'ইন' করতেই হল। ওদের সামনে গিয়ে বললাম, 'তোমাদের কোনোরকম 'লস' হবে না। যার যা মাল আছে,

আমি সব কিনে নিচ্ছি। হিসেব করে বল, কাকে কী দিতে হবে।'

আমার মতো আজব চীজ আগে আর কখনও দ্যাখে নি হারামীগুলো। চোখের তারা ফিক্সড করে তারা পাক্কা দু মিনিট আমাকে মার্ক করল। তারপর টেরিফিক হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। কে যেন দৌড়ে গিয়ে দুটো হাতল-ভাঙা চেয়ার নিয়ে এসে আমাকে এবং বোদাকে খাতির ফাতির করে বসালো। তারপর মুখে মুখে হিসেব কষে জানালো কুড়িজন দোকানদারের কাছে টোটাল সাতশো বারো টাকা পঁয়ষট্টি পয়সার মাল রয়েছে। আমি পার্স বার করে পুরো টাকাটা দিয়ে বললাম, 'আলাদা আলাদা করে দেবার মতো অত খুচরো টাকা আমার কাছে নেই। পুরোটাই দিয়ে দিচ্ছি, তোমরা ভাঙিয়ে যার যার শেয়ার বুঝে নিও। কার হাতে দেব বল।'

একটা ক্ষয়াটে বুড়ো টাইপের দোকানদারকে দেখিয়ে অন্য দোকানদারেরা বলল, 'এই চাচার হাতে দিন। পরে আমরা ভাগ করে নেব।'

লোকটা মুসলমান। বোঝা গেল সে এই দোকানদারদের লিডার। সবাই তাকে বিশ্বাস এবং খাতির করে। আমি তার হাতে টাকাটা দিলাম।

দোকানদারেরা আমার পায়ের কাছে গোল হয়ে বসল। বিনা লেবারে এতগুলো টাকার মাল দশ মিনিটে বিক্রি হয়ে যাবে, ওদের হোল লাইফে এমন ঘটনা আর কখনো ঘটে নি। আমার দিকে তারা এমনভাবে তাকালো যেন আকাশ থেকে প্যারাসুটে করে স্ট্রেট তাদের মাঝখানে একজন দেবদূত নেমে এসেছে।

কিন্তু চাচার সংশয়টা কাটছে না। সে আমাকে স্লাইট বাজিয়ে নিতে চাইল। বলল, 'শুদু শুদু এতগুলোন টাকার বাজে জিনিস কিনলেন কেন? আপনাদের মতো লোকের এ সব জিনিস কোন কাজে লাগবে?'

'আমি কি তোমাদের থেকে আলাদা কিছু? আমাকে তুমি কী ভেবেছ—ফোর্ড, না রকফেলার, না ওনাসিস, না খাশোগি?'

চাচা হাঁ করে রইল। ফোর্ড বা রকফেলার কী বস্তু, তার চোদ্দ পুরুষে কেউ জানে না। বললাম, 'চাচা, আমি প্রোলেটারিয়েট ক্লাসের লোক—ঠিক তোমাদেরই মতো। ওই সব জিনিস আমার ভীষণ দরকার।'

চাচা আস্তে আস্তে অন্য দোকানদারদের গা ঘেঁষে বসে পড়ল। তবে আমার কথা যে টোটালি বিশ্বাস করে নি, সেটা তার মুখচোখ দেখেই আন্দাজ করা গেল। বিশ্বাস করুক আর না-ই করুক, নগদ ক্যাশ টাকা হাতে পাওয়ায় তারা হকচকিয়ে গেছে, তেমনি খুশিও হয়েচে। এখন আমি যা বলব খজড়াগুলো ঠিক শুনবে।

বললাম, 'এই যে ভাই তোমরা যে দোকান ফোকান সাজিয়ে বসো, তাতে রোজ কিরকম লাভ হয়?'

'কী আর হয় বাবু, পাঁচ ছ' টাকার বেশি থাকে না। চারপাশে গরিব চাষাভুষোর গাঁ। তাদের হাতে পয়সা কোথায় যে জিনিস কিনবে!'

'রাইট রাইট—' ডাইনে বাঁয়ে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে আচমকা একটা কথা মনে পড়ে গেল আমার। চোখের কোণ দিয়ে লগাকে কাছে ডেকে ফিসফিসিয়ে বললাম, 'ওই চায়ের দোকানে

গিয়ে বল, সবার জন্যে চা-বিস্কুট যেন দিয়ে যায়।'

একে তো অতগুলো টাকা গচ্চা দিয়ে লব্ঝড় কিছু মাল কিনেছি। তার ওপর দোকানদারগুলোকে চা-ফা খাওয়াতে চাইছি। এই অপচয় তার পছন্দ হচ্ছিল না। সে বলল, 'অনেক খরচা হয়ে যাবে যে! শুদু শুদু—'

'চাঁদবদন, এ সব তোমার আমার বাপের টাকা নয়। নাসিক প্রেস নোট ছাপছে, আলিপুর মিন্ট রেজকি বানাচ্ছে—এ সবই জনগণের মাল। আমার হাত দিয়ে দু-চারটে পাত্তি ডিস্ট্রিবিউট হচ্ছে, তাতে তোমার এত কষ্ট কেন? যা, কুইক চায়ের অর্ডার দিয়ে আয়।'

এক সেকেণ্ডও আর দাঁড়াল না লগা, দৌড়ে সামনের চায়ের দোকানটায় চলে গেল।

পনের মিনিটের ভেতর চা-বিস্কুটের সাপ্লাই এসে গেল। খেতে খেতে আমাদের কনফারেন্স জমে উঠতে লাগল।

বললাম, 'এখানকার লোকজনের পয়সা ফয়সার খুব অভাব—না?'

'হ্যাঁ, খুব।' একটা শুঁটকো চেহারার মাঝবয়সী দোকানদার তক্ষুনি ঘাড় কাত করে সায় দিল, 'পয়সা থাকবে কোত্থেকে? এমনিতেই বেশির ভাগ মানুষের জমিজমা নেই। অন্যের খেতে খেটে খায়। তা এক বছর খরা হয় তো আরেক বছর বন্যা। এ বছর খরা গেছে। লোকে কাজ পায় নি। কাজ নেই তো রোজগারও নেই। রোজগার যখন নেই তখন পেটে দানাও নেই।'

আমার চোখের সামনে অদৃশ্য টিভির পর্দায় হাজার হাজার না-খেতে-পাওয়া, আধমরা, হেজে-যাওয়া মানুষের মুখ ফুটে উঠল। খেতে না পাক, পয়সা না থাক, একটা করে ভোট তো আছে তাদের। ইণ্ডিয়ান ডেমোক্র্যাসি আর কিছু দিতে পারুক, আর নাই পারুক, একুশ বছরে পা দিলেই একটি ভোট দেবার রাইট দিয়ে দিয়েছে। অভ্যুদয় মিটারের জন্য এই ভোটগুলো কবজা করা দরকার। কিন্তু এই মোমেন্টে সে সব কথা থাক।

জিভের ডগায় চুক চুক আওয়াজ করে বললাম, 'এখানকার লোকজনের হেভি কষ্ট দেখছি।'

সবাই কোরাসে সায় দিল, 'হ্যাঁ বাবু।'

আরো কিছুক্ষণ ভ্যানতাড়া করার পর বোদাকে নিয়ে উঠে পড়লাম। বললাম, 'তোমাদের সঙ্গে কনফারেন্স করে হেভি আনন্দ হল। চল রে বোদা।' লগার দিকে ফিরে বললাম, 'তুইও চল—'

লোকগুলো যেন স্ট্রেট ভগবানের সঙ্গে কথা বলছে, এমন ভঙ্গিতে বলল, 'এখুনি চলে যাবেন? আপনার মতো মানুষের কাছে বসে দুটো কথা বললে পুণ্যি হয়। গরিবগুর্বোর দুঃখু বোঝে, এমন মানুষ আগে আর কখনো দেখি নি।'

হে হে মহাশয়গণ, মাকড়াগুলোর কথা শুনুন একবার। আমাকে দেখলে নাকি পুণ্যি হয়। আপনারা তো জানেন আমি একটা বেজন্মা, ফোরটোয়েন্টি, চিট। আমার রিয়েল আইডেনটিটিটা জানলে এরা খেপে উঠে হয়ত খুনই করে ফেলবে। কিন্তু সে সব ব্যাপার ওদের জানালে আমার প্ল্যানের বারোটা বাজিয়ে ছাড়বে। আমি শ্লা যেরকম ভগবান আছি তেমন ভগবানই থেকে যাই।

চাচা বলল, 'আপনার সঙ্গে আমাদের আর কি দেখা হবে না?'

ভয়েসে জোর দিয়ে বললাম, 'ডেফিনিটলি হবে। রেগুলারলি তোমাদের সঙ্গে এখন আমার

জন-সংযোগ হওয়া দরকার। আচ্ছা চলি—'

বোদা এবং লগাকে নিয়ে কয়েক স্টেপ এগিয়েছি, দোকানদারেরা একসঙ্গে হাঁ হাঁ করে উঠল, 'বাবু, বাবু—'

পায়ে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়লাম, 'কী হল?'

'আপনি যে মালগুলো কিনলেন, সেগুলো নিয়ে যান। আমরা সব বেঁধে টেধে ঠিক করে দিচ্ছি।'

মহাশয়গণ, হেভি ঝামেলায় পড়া গেল দেখছি। এই শ্লা লোহার হাতা-খুন্তি-কড়াই, প্ল্যাস্টিকের পুতুল ফুতুল এখন কোথায় নিয়ে তুলব? তা ছাড়া ওই সব রদ্দি চীজ দিয়ে আমার হবেই বা কী? পাবলিক রিলেশানসের জন্য আমি কিছু টাকা ইনভেস্ট করেছি শুধু। মহাশয়গণ, আপনারা তো জানেনই কোনোরকম প্রবলেমে পড়লে সলিউসানে পৌঁছুতে আমার এক সেকেণ্ডও লাগে না। বললাম, 'জিনিসগুলো এখন তোমাদের কাছেই থাক। পরে দরকার মতো নিয়ে যাব।'

লগা আমার কাঁধের পাশ থেকে খুঁত খুঁত করতে লাগল, 'আমাদের অতগুলোন টাকার মাল! ওদের হাতেই ফেলে রেখে যাবেন? শালারা কিন্তু ফের ঝেড়ে দেবে। ডবল লাভ।'

মহাশয়গণ, আমিও তা-ই চাই। দু'বার করে একই মাল বেচার চান্স দিলে শ্লা'রা আমার পোষা কুকুর হয়ে থাকবে। তখন যা বলব তা-ই ওদের দিয়ে করিয়ে নেওয়া যাবে। কিন্তু এ কথা তো লগাকে বলা যায় না। যা বললাম তা এই রকম, 'ওরা লোক ভাল। আমি থোবড়া দেখলে চিনতে পারি। দেখিস একটা মালেরও এদিক ওদিক হবে না।'

সন্ধে হয়ে গিয়েছিল। স্টেশনের গায়ের পার্মানেন্ট দোকানগুলোতে আলো ফালো জ্বলে উঠেছে। আমরা হাঁটতে হাঁটতে ফের গেস্ট হাউসের দিকে এগিয়ে গেলাম।

আমার ডাইনে বাঁয়ে দু'খানা থার্ড ক্লাশ ফোরটোয়েন্টি। ডান পাশ থেকে লগা বলে উঠল, 'এবার আমরা কী করব স্যার? আমাকে আর কোনো ডিউটি দেবেন?'

'না, আজ তোর ছুটি। এখন বাড়ি কেটে পড়। কাল সকালে গেস্ট হাউসে চলে আসবি।'

'ঠিক আছে স্যার।' বড় রাস্তার মাঝখানেই এক ফুট ধুলোর ওপর স্ট্রেট বডি ফেলে দিয়ে আমার পা ছুঁয়ে একখানা প্রণাম ঠুকে দিল লগা।

মহাশয়গণ, আপনারা তো জানেনই, আমার মতো বাস্টার্ডের প্রণাম নেওয়া খুব খারাপ দেখায়। আমি লং জাম্প মেরে কয়েক ফিট সরে গিয়ে বললাম, 'এ কী করছিস রে মাকড়া—'

লগা ধুলো সুদ্ধু উঠে দাঁড়িয়ে দাঁত বার করল, 'স্যার, আমাকে আপনার মতো এত পয়সা কেউ আর কখনো দ্যায় নি। এত যত্ন করে কেউ কাছে বসিয়ে খাওয়ায় নি। তাই বাড়ি যাবার আগে আপনাকে একটা পেন্নাম করতে ইচ্ছে হল।'

'আজ যা করেছিস করেছিস, লাইফে আর কক্ষনো আমার পায়ে হাত ঠেকাবি না। চাঁদবদন, আমি তোমার জন্যে কিসসু করি নি। ইন্ডিয়ায় এমন সব খজড়া আছে তাদের কাছে তোদের অনেক ক্যাশ জমা রয়েছে। আমি তার থেকে দু-চারটে পয়সা হাতিয়ে তোকে দিয়েছি মাত্র। আমাদের সঙ্গে এঁটে থাক। আরো অনেক কিছু পাবি। কাল সাতটার ভেতরে চলে আসবি

কিন্তু—'

'তার আগেই চলে আসব।'

আমরা রাস্তায় যেখানে দাঁড়িয়ে আছি তার বাঁ দিক দিয়ে একটা ফ্যাকড়া পথ বেরিয়ে ধানখেতের ভেতর দিয়ে অন্ধকারে লোপাট হয়ে গেচে। লগা সেই দিকে চলে গেল।

আমরাও আর দাঁড়িয়ে থাকলাম না, স্ট্রেট গেস্ট হাউসের দিকে এগিয়ে গেলাম।

পরের দিন সকালে সূর্যটা দিগন্তের তলা থেকে তখনও দিনের দৌড় স্টার্ট করে নি, লগা এসে হাজির। মহাশয়গণ,মাকড়ার সেন্স অফ রেসপনসিবিলিটিটা টেরিফিক।

বোদা আর আমার সবে ঘুম ভেঙেছে। বেডে শুয়ে শুয়েই আরামসে আমরা চা খাচ্ছি। গেস্ট হাউসের বেয়ারাটা চা দিয়ে দরজাটা হাফ খুলে রেখে গিয়েছিল। লগা তার ভেতর দিয়ে ঘরে 'ইন' করল।

এখনও ছ'টা বাজে নি। বললাম, 'তোকে না সাতটার সময় আসতে বলেছিলাম!'

ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে লগা বাটকখানা কার্পেটে সেট করে বসে পড়ল।

'চা খাবি?'

'পেলে তো ভালই হতো।'

'ভালই হোক।' কলিং বেল টিপে বেয়ারাকে দিয়ে চা আনালাম এবং জানিয়ে দিলাম আধ ঘণ্টা পর ব্রেকফাস্ট চাই।

বেয়ারা চলে গেল।

চায়ে চুক চুক করে কয়েকটা চুমুক দিয়ে লগা বলল, 'আজ আমার কী ডিউটি দেবেন স্যার?'

'অত হুড়োহুড়ির কী আছে? ব্রেকফাস্ট টাস্ট খা, তারপর প্রোগ্রাম টিক করা যাবে।'

খানিকক্ষণ এলোপাথাড়ি ভ্যাজরং ভ্যাজরং করার পর ব্রেকফাস্ট এসে গেল। এবার শুধু বেয়ারাই না, তার সঙ্গে চন্দ্রকিরণও চলে এসেছে।

ব্রেকফাস্টটা টেরিফিক। ডাবল ডিমের অমলেট, প্রচুর টোস্ট, বাটার, মার্মালেড, কলা, আঙুর, কর্ণফ্লেকস, জেলি, এটাসেটা এটসেট্রা।

চন্দ্রকিরণ গলায় মাখন লাগিয়ে বলল, 'স্যার, আপনারা দয়া করে আরম্ভ করুন। পরে চা দিচ্ছি।'

'ঠিক আছে। কষ্ট করে বিয়ের আসরের মেয়ের বাপের মতো এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না। আমাদের লজ্জা ফজ্জা নেই। স্টমাকে যা ধরে তার থেকে এক গ্রাম কম খাব না। অন্য কাজ ফাজ দেখো গিয়ে।'

'আচ্ছা স্যার—আচ্ছা স্যার—' যেতে গিয়েও কী ভেবে দাঁড়িয়ে পড়ল চন্দ্রকিরণ। বলল, 'দুপুরে কী ধরনের লাঞ্চের অ্যারেঞ্জমেন্ট করব—বেঙ্গলি না ইউরোপিয়ান?'

'কিসসু করতে হবে না। দুপুরে আমরা বাইরে কোথাও প্রোলেটারিয়েট লাঞ্চ করে নেব।'

এমন বিদঘুটে লাঞ্চের নাম আগে আর কখনও চন্দ্রকিরণ শুনেছে বলে মনে হয় না। কয়েক সেকেণ্ড আমার দিকে তাকিয়ে সিনেমার ফ্রিজ শটের মতো দাঁড়িয়ে রইল। তারপর একটি

কথাও না বলে দরজার বাইরে বেরিয়ে গেল। তার পেছন পেছন বেয়ারাটাও চলে গেল।

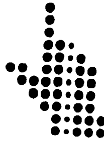
ব্রেকফাস্ট শেষ হবার পর লগাকে একটা সিগারট দিলাম। সে সেটা ধরিয়ে কড়ে আর তার পাশের আঙুলের ফাঁকে গুঁজে এক টানে অর্ধেক পুড়িয়ে ফেলল। নাকমুখ দিয়ে গল গল করে ধোঁয়া বার করতে করতে বলল, 'আজ আমাকে কী ডিউটি দেবেন স্যার?'

'কালকের মতো আজও আমি পাবলিক রিলেশানস করতে চাই। কোথায় গেলে একসঙ্গে অনেক লোক পাওয়া যাবে?'

চোখ কুঁচকে দু সেকেণ্ড ভেবে লগা জানালো, হাট-বাজার ছাড়া একসঙ্গে অনেক লোক পাওয়া অসম্ভব। এখান থেকে আড়াই মাইল দূরে একটা মজা নদীর ধারে উইকে তিন দিন হাট বসে—রবি, বুধ আর শুক্কুরবারে। আজ বুধবার। সেখানে গেলে কমসে কম তিন চার হাজার লোককে একসঙ্গে পাওয়া যাবে। তবে একটাই ঝামেলা, এখান থেকে হাটে যেতে হলে ধানখেতের ওপর দিয়ে স্রেফ দু'খানা পায়ের ওপর ভরসা করে হেঁটে যেতে হবে। ওদিকে যাবার মতো পাকা-কাঁচা কোনোরকম রাস্তা ফাস্তা নেই। কাজেই রিকশা ফিকশা যাবে না।

বললাম, 'আড়াই মাইল কেন, পাবলিক রিলেশানের জন্যে দরকার হলে দশ মাইল পাহাড় ডিঙিয়ে কি জল সাঁতরে চলে যাব। এখন বডি তুলে ফ্যাল মাকড়া।' বলতে বলতে উঠে পড়লাম।

দেখাদেখি বোদা এবং লগাও উঠল।



আড়াই মাইল না, ধানখেতের ট্যারাবাঁকা এবড়োখেবড়ো আলের ওপর দিয়ে ঝাড়া মাইল চারেক হাঁটিয়ে লগা আমাদের একটা হতচ্ছাড়া টাইপের হাটে নিয়ে এল। সত্যিই সেটার পাশ দিয়ে এক্কেবারে মজা একটা নদীর খাত পড়ে আছে। লগাই জানিয়ে দিল, পঁচিশ তিরিশ বছর আগে ওখানে নাকি টেরিফিক তোড়ে জলের স্রোত বয়ে যেত, এখন শুধুই বালি। বোঝা যায়, একসময় হাটটা নদীর ধারে উঁচু জায়গায় বসত। এখন সেটা বেড়ে বেড়ে বালির খাতে নেমে এসেছে।

যেদিকেই তাকানো যাক, বাঁশের নড়বড়ে খুঁটির ওপর ভাঙাচোরা টিন ফিন কি টুটো ফুটো হোগলার চাল। তার তলায় দোকানীরা তাদের মাল ফাল সাজিয়ে বসেছে। কাল স্টেশনের গায়ে যে বাজারটা দেখেছিলাম এটা প্রায় সেই ধরনেরই। তবে সাইজে অনেক বড়। বেচাকেনার জন্য মালপত্রের ভ্যারাইটিও অনেক বেশি। চাল ডাল তেল নুন ধান কলাই থেকে মাছ এবং কাঁচা আনাজ, লুঙ্গি গামছা তরল আলতা সিঁদুর ইত্যাদি ইত্যাদি।

দোকানদার এবং খদ্দেরদের চেহারাগুলো স্রেফ এক ক্লাসের। মহাশয়গণ, দেখে মনে হয় একই টাইপের ডাইস থেকে ঢালাই হয়ে মালেরা বেরিয়ে এসেছে। চোখ হলদে হলদে, কারো

বুকই আটাশ ইঞ্চির বেশি না, ডিগডিগে পেট, গালে খাপচা খাপচা দাড়ি, ভাঙাচোরা মুখ, সবারই গায়ে মাংসের চাইতে হাড়ফাড় বেশি। মহাশয়গণ, দেখামাত্রই টের পাওয়া যায়, য়্যারা দিনে দুটো স্কোয়ার মিল তো স্বপ্ন ফপ্নর ব্যাপার, পেট পুরে একবারও খেতে পায় কিনা সন্দেহ।

বেশির ভাগেরই পরনে তালিমারা জামা কি ফতুয়া আর জ্যালজেলে ধুদ্ধুরে তেলচিটে ময়লা খাটো কাপড়, সেগুলোর ঝুল হাঁটু পর্যন্ত নেমে থমকে গেছে।

'আদার হাফ ডাইজ—' বলে একটা বইয়ের নাম শুনেছি। সেখানে নাকি ইস্টার্ন ওয়ার্ল্ডের হাভাতে মানুষদের কথা আছে, তাদের গায়ের সঙ্গে দুর্ভিক্ষ ফেভিকলের মতো এঁটে আছে। মাকড়াদের সারা গায়ে নিউট্রিশান আর খেতে না পাওয়ার ছাপ। আগরপাড়ার সেই বস্তিটার মতো আমি আরেকটা রিয়েল জিওগ্রাফি অফ হাঙ্গারে 'ইন' করেছি।

মহাশয়গণ, আমার এখানে আসার মিশনটা ডেফিনিটলি আপনাদের মনে আছে। প্রাইম মিনিস্টার, চিফ মিনিস্টার, বিগ বিগ ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট আর বিজনেস টাইফুনদের মতো এই খজড়াগুলোরও একটা করে ভোট আছে। সেই সব ভোট অভ্যুদয় মিটারের জন্য আমাকে ক্যাচ করতে হবে। অবশ্য—

আমার মাথায় যে ভাবনাটা চলছিল সেটা কমপ্লিট হবার আগেই লগা বলে উঠল, 'স্যার, আপনি কি ওদের সঙ্গে কথা বলবেন? তা হলে একটা ফাঁকা চালার তলায় আপনারা বসুন। আমি চোঙা ফুঁকে ওদের ডেকে এনে আপনার কাছে জমা করে দিই। আর চায়ের দোকানে বলে আসি যেন সবার জন্যে চা-বিস্কুট দিয়ে যায়।'

লগা কাল আমার যা 'মেডাস অপারেণ্ডি' দেখেছিল, ভেবেছে সেটাই আজও কাজে লাগাবে। কিন্তু এই সব হারামীর সাইকোলজি তো জানি। চায়ের কথা বললে অ্যায়সা প্যান্ডেমোনিয়াম লাগিয়ে দেবে যে রায়ট বেধে যাবে। তা ছাড়া এখানে যে ক'টা চায়ের দোকান আছে তাতে একসঙ্গে চার হাজার লোককে চা খাওয়াবার মতো কাপ বা গেলাস নেই। সবাইকে খেপে খেপে চা খাওয়াতে হলে রাত কাবার হয়ে যাবে। তাতে চা খাওয়ানোই শুধু হবে, কাজের কাজ কিসসু হবে না।

লগাকে বললাম, 'না, চায়ের দরকার নেই।' তারপরই আচমকা একটা কথা মনে পড়তে জিজ্ঞেস করলাম, 'চোঙা ফুঁকে লোক ডাকবি বললি। চোঙাটা পাবি কোথায়?'

সেই সাইড ব্যাগটা থেকে একটা টিনের চোঙা বার করে লগা বলল, 'এই তো। যদি দরকার হয় তাই সঙ্গে করে এনেছি।

মহাশয়গণ, দেখুন দেখুন মাকড়া একটি প্রথম শ্রেণীর জিনিয়াস। বোদা, পেঁচো এবং লগাদের মতো হারামীদের নিয়ে একটা স্কোয়াড তৈরি করলে ওয়ার্ল্ড জয় করা যায়। বললাম, 'না, কাউকে ডাকতে হবে না। আমি ঘুরে ঘুরে হাটটা আর এখানকার মাকড়াদের দেখব।'

'ঠিক আছে স্যার।'

আমরা চুলে চিরুনি চালানোর মতো লোকজনের ভেতর দিয়ে এলোপাথাড়ি ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। কেনাকাটা যে হচ্ছে না তা নয়, টেরিফিক দরাদরি করে কেউ হয়তো একটা গামছা কিনল, কেউ কাঁচা কুমড়ো, কেউ দেড় শ গ্রাম চুনো মাছ, কেউ এক পালি গাবের দানার মতো

মোটা লালচে চাল, ইত্যাদি। কারো সঙ্গে একটা কথাও না বলে আমি শুধু মালগুলোকে অবজার্ভ করতে লাগলাম।

ঝাড়া ঘণ্টা তিনেক ঘোরা ঘুরির পর হাটেরই একধারে একটা রদ্দি হোটেলে তিনজন প্রোলেটারিয়েট লাঞ্চ সেরে বললাম, 'চল, এবার ফেরা যাক।'

মহাশয়গণ, গেস্ট হাউসে যখন ফিরলাম, সন্ধে হয়ে গেছে। লগাকে বললাম, 'তুই বাড়ি চলে যা, কাল মর্নিংয়ে আসিস। এখানে এসে ব্রেকফাস্ট করবি।'

'আচ্ছা স্যার।' লগা চলে গেল।

পরের দিনটা লগার সঙ্গে গেলাম পলাশডাঙা হেলথ সেন্টারে। এটাও পাবলিক রিলেশানসের একটা বড় জায়গা।

মহাশয়গণ, হেলথ সেন্টারের চেহারা দেখেই মালুম হয়ে যাবে, এখানকার মানুষের হেলথ কেমন। একতলা বাড়িটার দেয়াল খসে পড়েছে। মেঝের ছালবাকলা উঠে ভেতরকার ইট দাঁত বার করে রয়েছে।

গাদা গাদা পুরুষ আর মেয়েমানুষ কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে বসে আছে—কখন ডাক্তারের কাছ থেকে ডাক আসে সেই আশায়। এত লোকের সামনে দিয়েই ফড় ফড় করে আরশোলা উড়ছে, ইঁদুর এবং ছুঁচোর স্কোয়াড্রন সার্চ করতে করতে চলে যাচ্ছে ইচ্ছেমতো।

মহাশয়গণ; খবর নিয়ে জানা গেল, দশ মাইল রেডিয়াসের ভেতর এই একটাই হেলথ সেন্টার, এখানে একজন মাত্র ডাক্তার, দু'টি নার্স আর ক্লাস ফোর স্টাফ চারজন। অথচ দশ মাইলের মধ্যে লোক হচ্ছে মিনিমাম আশি নব্বই হাজার। এই পপুলেশানের ওয়ানফোর্থ বারো মাসই কোনো-না-কোনো ডিজিজে ভুগে চলেছে। আরো জানা গেল, এখানকার ডাক্তার একবার ছুটি নিলে একমাসের ভেতর এদিকের রাস্তা বিলকুল ভুলে যায়। তখন ডেডবডির প্রসেসান চলতে থাকে শ্মশানের দিকে।

লগা আমার ডান কাঁধের পাশ থেকে ফিসফিসিয়ে উঠল, 'স্যার, এদের সঙ্গে কথা বলবেন?' বলে রোগীর পালকে দেখাল।

বললাম, 'না। আমার দরকার ডাক্তরকে। তোরা একটু ওয়েট কর। আমি ভেতর থেকে আসছি।'

স্টেশনের ওয়েটিং রুমের মতো একটা জায়গায় রোগীরা বসে আছে। পেছন দিকে একটা ঘরে ডাক্তারের চেম্বার, দরজায় জ্যালজেলে ময়লা পর্দা ঝুলছে। ক্লাস ফোর স্টাফের এক ছোকরা সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রোল কলের মতো এক এক করে রোগীদের ডাকছে, তারা পর পর ভেতরে গিয়ে ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করছে। বোঝাই যায়, রোগীরা অনেক আগে, হয়তো সেই ভোরবেলায় এসে নাম লিখিয়ে ওয়েট করছে।

আমি দরজার কাছে যেতেই ছোকরা বলল, 'ভেতরে যাবেন না, এখন রুগী দেখা হচ্ছে।'

একখানা দু'টাকার নোট তার বুক পকেটে এমনভাবে গলিয়ে দিলাম যাতে সে ছাড়া আর কেউ টের পেল না। ছোকরা বত্রিশটা দাঁত বার করে বলল, 'স্যার একটু দাঁড়ান। ভেতরের বেরিয়ে যাক। তারপর আপনাকে ডাক্তারবাবুর কাছে নিয়ে যাব।'

'ঠিক আছে।'

মিনিট তিনেকের মধ্যে একটা চিমসে টাইপের আধবুড়ো লোক ডাক্তারের চেম্বার থেকে ধুঁকতে ধুঁকতে বেরিয়ে এল। আর আমি পর্দা তুলে ভেতরে 'ইন' করলাম।

মাঝবয়সী, দু কুইন্টাল ওয়েটের টেরিফিক চর্বিওলা ডাক্তার ডবল সাইজের একটা চেয়ারে জাম হয়ে বসে ছিল। মহাশয়গণ, কনট্রাস্টটা লক্ষ করুন। যেখানে রোগীদের গায়ে শুধু ক'খানা টিলে হাড় ছাড়া আর কিছু নেই সেখানে এর বডিতে মাংসের পাহাড় জমেছে।

ডাক্তার ভুরু কুঁচকে, খুব বিরক্ত চোখে আমাকে দেখতে লাগল। মহাশয়গণ, আপনারা তো জানেনই হোল লাইফে আমার একদিনের জন্য মাথা ধরে নি, পেট কামড়ায় নি, জ্বর হয় নি, দাঁত কনকন করে নি। পায়ের তলা থেকে চুলের ডগা পর্যন্ত পিওর স্টিল দিয়ে আমার বডিটা তৈরি। আমাকে দেখে কেউ রোগী বলে ভাববে না।

ডাক্তার জিজ্ঞেস করল, 'কী চান?'

বললাম, 'আমি একজন জার্নালিস্ট। আপনার সঙ্গে দু-একটা কথা বলতে চাই। ম্যাক্সিমাম পাঁচ মিনিট টাইম নেব।'

জার্নালিস্ট শুনে নড়েচড়ে বসল ডাক্তার। মুখের চেহারাটা এক সেকেণ্ডে পাল্টে গেল। সামনের একটা চেয়ার দেখিয়ে রীতিমত খাতির টাতির করে বলল, 'বসুন, বসুন।'

আমি বসার পর জানতে চাইল, কোন কাগজে কাজ করি।

বললাম, 'নিউ ইয়র্ক পোস্ট-এ।'

চোখের তারা ফিক্সড করে ঝাড়া দু মিনিট সিনেমার ফ্রিজ শটের মতো তাকিয়ে রইল ডাক্তার। তারপর বলল, 'আপনি বাঙালি, অথচ বলছেন নিউ ইয়র্কের কাগজে কাজ করেন। ব্যাপারটা বুঝলাম না।'

'আমি ঐ কাগজটার ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার করেসপনডেন্ট।'

'তা আমার কাছে কী দরকারে—মানে—'

আমেরিকার ওয়ার্ল্ড ফেমাস এক ডেইলি পত্রিকার একজন করেসপনডেন্ট কোন মহৎ উদ্দেশ্যে ওয়েস্ট বেঙ্গলের এক রদ্দি ভিলেজের হেলথ সেন্টারে এসে ঢুকেছে, সেটাই ডাক্তারের মাথায় ঢুকছে না। অন্তত তার মুখচোখ দেখে তাই মনে হল। বললাম, 'এখানকার ভিলেজের লোকজনের স্বাস্থ্য কেমন, সে সম্পর্কে আমাদের কাগজে একটা রিপোর্ট তৈরি করতে হবে। যে সব ডাক্তার এই রিজিওনের পেশেন্টদের ট্রিটমেন্ট করেন, তাঁদের ছবিও রিপোর্টের সঙ্গে বেরুবে। নেক্সট উইকে একজন ফোটোগ্রাফার পাঠিয়ে দেব। সে আপনার ছবি তুলে নিয়ে যাবে।'

মহাশয়গণ, আপনারা তো জানেনই, আমি একজন চিট, থার্ড ক্লাস ফোরটোয়েন্টি। হেলথ সেন্টারের ডাক্তার সেটা ধরতেই পারে নি। আমাকে দেখে আমার ডায়লগ শুনে ভেবে নিয়েছে আমি ডেফিনিটলি নিউ ইর্য়ক পোস্ট-এর একজন জেনুইন করেসপনডেন্ট। তার ওপর বিশ্ববিখ্যাত কাগজে তার ছবি বেরুবে, এটা শোনার পর চোখে মুখে ফ্লুরোসেন্ট লাইট জ্বলতে

শুরু করেছে যেন। ডাক্তার বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

'কখন ফোটোগ্রাফার পাঠালে আপনার অসুবিধে হবে না?'

'যখন ইচ্ছে, পাঠাবেন। আমার সব সময়ই সুবিধে।'

'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। এখন আমার সঙ্গে একটু সহযোগিতা করুন।'

'বলুন, কী সহযোগিতা চান।'

'আমি কয়েকটা প্রশ্ন করব, আপনি উত্তর দেবেন।'

'অবশ্যই। শুরু করুন।'

প্রশ্ন করে জানা গেল, পাঁচ বছর এই হেলথ সেন্টারে কাজ করছে ডাক্তার। এই রিজিওনের, মানে দশ মাইল রেডিয়াসের ভেতর যত গ্রাম রয়েছে, সে সব জায়গার প্রায় এইটি পারসেন্ট লোককে চেনে। কেননা, এরা তার পেশেন্ট। এদের বেশির ভাগ টি বি রোগী। অন্য ডিজিজ যে নেই তা নয়। তবে তার পার্সেন্টেজ কম।

এত লোকের টিবি হবার কারণ একটাই। খেতে না পাওয়া এবং ম্যালনিউট্রিশান। হে হে মহাশয়গণ, এ ব্যাপারটা অনেক আগেই ক্যাচ করে ফেলেছিলাম।

যাক গে, পাঁচ মিনিট টাইম চেয়েছিলাম। কিন্তু কোশ্চেন-অ্যানসারে ঝাড়া ন' মিনিট তিরিশ সেকেন্ড লেগে গেল। তারপর ডাক্তারকে গুড বাই জানিয়ে বেরিয়ে এলাম।

ডাক্তার দেড় কুইন্টালের হেভি বডিখানা তুলে আমার সঙ্গে হেলথ সেন্টারের বাইরের রাস্তা পর্যন্ত এল। বোদা আর লগা এল পেছন পেছন।

আমরা যখন ডাক্তারের দিকে হাত নেড়ে গেস্ট হাউসের দিকে হাঁটতে শুরু করেছি সেই সময় মাকড়া আবার ফোটোগ্রাফারের কথাটা মনে করিয়ে দিল। আমি বললাম, 'এ নিয়ে একেবারে দুশ্চিন্তা করবেন না, ঠিক সময়ে ফোটোগ্রাফার চলে আসবে।'

মহাশয়গণ, আপনারা তো জানেন আমি কী মাল! নিউ ইয়র্ক পোস্ট নামে কোন ডেইলি পেপার আছে কিনা আমি জানি না। থাকো ডাক্তার মাকড়া, আশা নিয়ে, হেলথ সেন্টারে বসে থাকো। হোল লাইফে কোনো ফোটোগ্রাফার কোনোদিনই তোমার কাছে আসবে না।

দুপুরে গেস্ট হাউসে ফিরে তিনজন ফুল কোর্সের দুর্ধর্ষ একখানা লাঞ্চ খেলাম। তারপর ঘণ্টা দুই ফার্স্ট ক্লাস দিবানিদ্রা দিয়ে ফের বেরিয়ে এলাম। এখান থেকে স্ট্রেট স্টেশনে চলে যাব। পলাশডাঙার সার্ভে কমপ্লিট হয়ে গেছে। আপাতত আমাদের কলকাতায় ফিরতে হবে।

মহাশয়গণ, আপনারা তো জানেনই, আমার মাথায় প্ল্যানিং কমিশনের একখানা হেড কোয়ার্টার বসানো আছে। অভ্যুদয় মিটারকে ফাঁসাবার জন্য কী দরকার তার একটা ব্লু-প্রিন্ট মনে মনে তৈরি করে ফেলেছি।

আমরা যে আজই চলে যাব, লগাকে আগে জানাই নি। স্টেশনে এসে যখন বালিগঞ্জের দু'খানা টিকেট কাটলাম তখন লগা চমকে উঠল, 'চলে যাচ্ছেন স্যার?'

বললাম, 'হ্যাঁ রে। এখানকার কাজ শেষ হয়ে গেছে।'

দু'দিন একসঙ্গে ঘোরাঘুরি করে মাকড়ার ডেফিনিটলি আমাদের পছন্দ হয়ে গিয়েছিল। তা ছাড়া ক্যাশ ফ্যাশ আর ভাল লাঞ্চ টাঞ্চও পেয়েছে। মুখ দেখে মনে হল, ভীষণ হুতাশ হয়ে পড়েছে। বলল, 'আর কি দেখা হবে না?'

'জবুর দেখা হবে। ঠিক দশ দিন বাদে যে রবিবারটা পড়ছে সেদিন মর্নিংয়ে চলে আসব। তুই স্টেশনে আমাদের জন্যে ওয়েট করিস। এবার যখন আসব, অনেক দিনের কাজ পাবি। অ্যাট লিস্ট পনের কুড়ি দিন।'

খুশিতে লগার দু চোখে টুনি বাল্ব জ্বলে উঠল। বলল, 'নিশ্চয় আসব স্যার, রবিবার ভোর রাত থেকে আপনাদের জন্যে ইস্টিশানে এসে দাঁড়িয়ে থাকব।'

'আরেকটা কথা,' তোর সেই ফোরটোয়েন্টি ফ্রেন্ডগুলোর কথা বলেছিলি না?'

লগা ঠিক বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করল, 'কারা স্যার?'

মনে করিয়ে দিলাম, 'ঐ যে, যারা গুরুদশার ইউনিফর্ম পরে ট্রেনে ট্রেনে ভিক্ষে করে বেড়ায়।'

'ও হ্যাঁ হ্যাঁ। তাদের কাছে কিছু দরকার আছে?'

'হ্যাঁ। খবর দিয়ে রাখবি, ওদেরও কাজে লাগিয়ে দেব।'

মালকড়ি শেয়ার হয়ে যাবে, এই ভয়ে লগা হিক্কা তোলার মতো আওয়াজ করে বলে উঠল, 'স্যার, আমিই তো আছি। যা অর্ডার করবেন, তক্ষুনি করে দেব। এর ভেতর আর ঐ হারামীগুলোকে ডাকবেন না।'

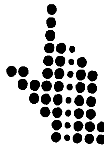
লগার কাঁধে আস্তে আস্তে টোকা মারতে মারতে বললাম, 'ঘাবড়াস না মাকড়া, তোর ক্যাশ বাড়িয়ে দেব। মনে মনে এখানকার জন্যে যে প্ল্যানটা করেছি সেটা একজনকে দিয়ে হবে না, অনেক লোক দরকার। সমঝা?'

দুশ্চিন্তা নাইনটি পারসেন্ট কেটে যায় লগার। সে ঘাড়টা কোয়ার্টার মিটার হেলিয়ে জানায়, বুঝেছে। তারপর জিজ্ঞস করে, 'ওদের কি রবিবার ইস্টিশানে আসতে বলব?'

'না। বিকেলে যেন ওরা গেস্ট হাউসে চলে আসে।'

'আচ্ছা স্যার।'

আমাদের কথাবার্তার মধ্যেই কলকাতার ট্রেন এসে গেল। লগাকে গুড বাই জানিয়ে আমরা উঠে পড়লাম।



হে হে মহাশয়গণ, আপনাদের চোখমুখ দেখে মনে হচ্ছে পলাশডাঙার ব্যাপারে আমার ব্রেনে যে ওয়েভটা চলছে সেটা না জানা পর্যন্ত আপনাদের স্টমাকের ভাত হজম হবে না। এতই যখন জানার জন্য খেপে উঠেছেন তখন কী আর করা। বলেই ফেলা যাক।

আরে মহাশয়গণ, আপনারা তো জন্মের পর থেকেই আমাকে মার্ক করে আসছেন। এই যে দু'দিন ধরে ওয়াচ করে গেলেন, তাতে ডেফিনিটলি টের পেয়েছেন পলাশডাঙার মাকড়াদের ব্যাপরে যে সার্ভেটা চালালাম তাতে একটা ইনফরমেশানই ফিলটার করে বার করে এনেছি। সেটা হল, ওখানে একটা পার্মানেন্ট ফেমিন লেগে আছে। লোকের কাজ নেই, এমপ্লয়মেন্টের অপরচুনিটি নেই, তাই পয়সাও নেই। পয়সা না থাকলে স্কোয়ার মীল জুটবে কোত্থেকে? শ্লা, হোল এরিয়া জুড়ে যা চলছে তা হল স্টারভেশান। আনাহারের খোঁজে আর আফ্রিকা টাফ্রিকা দৌড়ুবার দরকার নেই, ইন্ডিয়ায় দু'পাঁচদিন ঘোরাঘুরি করলে চোখে পড়বে।

আপনাদের তো আগেই জানিয়ে দিয়েছি, অভ্যুদয় মিটারকে লার্জ স্কেলে ফাঁসিয়ে দেব। তাই ভাবছি এখানে মাসখানেকের জন্য একটা বিগ সাইজের লঙ্গরখানা খুলবন ফুড ফর ভোট। তারপর ভোটটা কীভাবে কাঁচিয়ে দেওয়া যায় তার প্ল্যানটাও তৈরি করে ফেলেছি। তবে সেটা এখন জানাচ্ছি না। সে জন্য আপনাদের তিন চার উইক ওয়েট করতে হবে।

বালিগঞ্জ স্টেশনে নামার পর বোদা জিজ্ঞেস করল, 'গুরু', আমাকে এখানে নামালে যে?'

বললাম, 'আজ রাতটা আমার সঙ্গে গড়িয়াহাটার অ্যাপার্টমেন্টে থেকে যা। কাল মর্নিংয়ে আগরপাড়ায় চলে যাস. আমি রাত্তিরে ফিরব।'

'ইঁহা কোঈ জরুরত হ্যায়?'

'হ্যায়। দু'দিন যে বাইরে গিয়ে সার্ভে করে এলাম তার রিপোর্টটার জন্যে অভ্যুদয় শ্লা দম আটকে ওয়েট করছে। তাকে আগে সব জানাবো। তা ছাড়া আরো অনেকের খবর ফবর নিতে হবে।'

ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে বোদা বলল, 'গুরু, আমার তো আজ এখানে কোনো ডিউটি নেই। আমি না হয় আগরপাড়ায় হড়কে যাই। যদি বল, কাল মর্নিংয়েই চলে আসব।'

মহাশয়গণ, বোদার মতলবটা আপনারা ডেফিনিটলি টের পেয়ে গেছেন। বললাম, 'কদ্দিন তোর বিয়ে হয়েছে রে?'

আমরা প্রশ্নটা আদৌ খুব সিম্পল কিনা বুঝতে চেষ্টা করল বোদা। চোখ কুঁচকে সন্দিগ্ধভাবে বলল, 'কেন গুরু?'

'যা বললাম তার উত্তর দে।'

আমার মুখের ওপর নজর রেখে বোদা বলল, 'তা শ্লা, হবে অনেকদিন।'

বাঁ পা দিয়ে বোদার ফ্ল্যাট মাংসহীন পাছায় একটি কিক হাঁকড়ে বললাম, 'এতদিন বিয়ে হয়েছে, তবু বউয়ের গায়ের গন্ধ না পেলে ঘুম হয না!'

বোদা পাঁচ ফুট দূরে লম্বা হয়ে পড়ে গিয়েছিল। উঠে জামা-প্যান্টের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে দাঁত বার করে হাসল, 'গুরু, যা বলেছ! এই দু'দিন শ্লা রাত্তিরে কতবার যে ঘুমটা চটকে গেছে। গেস্ট হাউসে হাত বাড়িয়ে কনকচাঁপাকে টানতে গিয়ে দেখি একটা পাশ বালিশ এগিয়ে এল। বউটা আমার হ্যাবিট বিলকুল খারাপ করে দিয়েছে।'

'চল শ্লা—হ্যাবিট খারাপ হওয়াচ্ছি।'

গড়িয়াহাটার অ্যাপার্টমেন্টে পা গলাতে না গলাতেই ফোন বেজে উঠল। রিসিভারটা কানে ঠেকাতে অভ্যুদয়ের গলা লাইনের এপার থেকে ভেসে এল। গলাটা মধুতে চুবিয়ে বললাম, 'বলুন স্যার—'

অভ্যুদয় বললেন, 'আজ দুপুর থেকে তোমাকে আটবার ফোন করেছি, নাইনথ টাইমে ধরা গেল। কখন ফিরেছ পলাশডাঙা থেকে?'

'জাস্ট পাঁচ মিনিট আগে। আমিই ফোন করতে যাচ্ছিলাম, তার আগেই আপনি কষ্ট করে—'

আমার কথা শেষ হবার আগেই মাকড়া প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'কষ্ট আবার কি! আগে পলাশডাঙার খবর দাও। সার্ভে কেমন হল?'

'ফার্স্ট ক্লাস।'

'ডিটেলে বল।'

'ধরুন দশ মাইল রেডিয়াসের ভেতর যত ভিলেজ রয়েছে তার পপুলেশনের হাফ মীট করেছি।'

'বল কী হে! এই দু'দিনের ভেতর?'

'ইয়েস স্যার।'

'এত লোকের সঙ্গে এত কম সময়ে মীট করলে কী করে?'

'সেটা স্যার আমার প্রফেশানাল সিক্রেট। ওটা জানতে চাইবেন না।—প্লিজ।'

'যাক গে, সিক্রেট যখন জানাতে চাও না তখন প্রেসার দেব না। তা কী বুঝলে?'

মনে মনে টেরিফিক কিছু খিস্তি আউড়ে বললাম, 'স্যার, জাঁতিকল চেনেন?'

অভ্যুদয় বললেন, 'মানে যা দিয়ে ইদুঁর টিদুঁর ধরে?'

'রাইট স্যার। ঐরকম অনেক আনসীন জাঁতিকল পলাশডাঙায় পেতে রেখে এসেছি। ভোটার মাকড়াদের সেখানে লাইন দিয়ে পা গলাতে হবেই।'

'ফাইন ফাইন—' খুশিতে ফেটে পড়তে গিয়ে আচমকা ব্রেক কষলেন অভ্যুদয়, 'আগরপাড়ায় যেবার কনটেস্ট করতে নামি সেবারও তো তুমি বলেছিলে, লোকে লাইন দিয়ে এসে আমাকে ভোট দেবে। কিন্তু কিরকম বিশ্রী ব্যাপারটা হল তা তো তুমি জানোই।'

'স্যার, আপনার উইনের সব অ্যারেঞ্জমেণ্ট পাক্কা করেই তো ফেলেছিলাম কিন্তু ক্যালকাটায় আপনার যে এত এনিমি কী করে বুঝব! স্রেফ স্ক্যাণ্ডাল করে আপনাকে ঝুলিয়ে দিল।'

'সেটা অবশ্য ঠিক।' অভ্যুদয় কথাটা মেনে নিয়ে বললেন, 'যাক, এখন আমাকে কী করতে হবে সেটাই বল।'

'নাথিং। শুধু লাখ পাঁচেক টাকার ব্যবস্থা করে দিতে হবে।'

'পাঁচ লাখ!' টেলিফোনের ভেতর দিয়ে অভ্যুদয়ের গলা থেকে হেঁচকি তোলার মতো একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল।

'স্যার, আপনি এম. এল. এ হবেন, তারপর মিনিস্টার হবেন, তার জন্যে আপনার ব্ল্যাক-

মানি থেকে এই ফিগারটা খসলে টেরই পাবেন না। ফোকটে সব কিছু কি পাওয়া যায়?'

'না না, তা বলছি না। তবে কিনা আগরপাড়ায় কতগুলো টাকা জলে গেল! ভেবে দেখ ব্যাপারটা।'

জিভের ডগায় চুক চুক আওয়াজ করে বললাম, 'ঐ টাকাটার শোক এখনও ভুলতে পারছেন না মাকড়া।' বলেই পাক্কা এগার ইঞ্চি জিভ কেটে বললাম, 'স্যরি স্যার—আমার জিভটা একেবারে খাটা পায়খানা। কখন যে স্লিপ করে কী বেরিয়ে পড়ে।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে।'

আমার দু-চারটে খিস্তি ফিস্তি নিয়ে অভ্যুদয়রা আদৌ মাথা ঘামান না। হে হে মহাশয়গণ, আপনারা তো জানেনই, এঁরা সবাই আমাকে একখানা সুপারম্যান ধরে নিয়েছে। ওঁদের মতে এই ওয়ার্ল্ডে যার যে টাইপের প্রবলেমই থাক না, একমাত্র আমিই তা সলভ্ করে দিতে পারি। তাই একটু আধটু খিস্তি করলে এক কান দিয়ে ঢুকিয়ে আরেক কান দিয়ে বার করে দেন।

অভ্যুদয় বলতে লাগলেন, 'তুমি যখন বলছ পাঁচ লাখ অ্যারেঞ্জ করে দিচ্ছি। এবার কেসটা সিওর তো?'

'টু হান্ড্রেড পারসেন্ট সিওর স্যার।'

'আমার একটা ব্যাপারে কৌতূহল হচ্ছে। ইচ্ছে হলে সেটা মেটাতে পারো।'

'একটা কেন, যতগুলো ব্যাপার জানতে চান বলুন না।'

'পাঁচ লাখ টাকা কী দিয়ে করবে?'

'পলাশডাঙায় লঙ্গরখানা খুলব।'

'তার মানে?'

'ওখানে হাঙ্গারটা খুব বেশি কিনা। মাকড়াগুলোর পেটে ভাত নেই। দু-চার দিন খাওয়াতে পারলে—'

মহাশয়গণ, আমার কথা শেষ হবার আগেই ভয়েসটা সাত পর্দা চড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন অভ্যুদয়, 'আবার—আবার—'

জিজ্ঞেস করলাম, 'আবারটা কী?'

'একবার মেডিক্যাল ক্যাম্প খুলে টাকার শ্রাদ্ধ করলে। এবার লঙ্গরখানা খুলে কিছু লাভ হবে কি?'

আমি এবার আলতো করে অভ্যুদয়ের সেন্টিমেন্টে সুড়সুড়ি দিলাম, 'স্যার, আমার ওপব আপনার কনফিডেন্সটা বোধ হয় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তা হলে তো এই অ্যাসাইনমেন্টটা আমার না নেওয়াই উচিত।'

অভ্যুদয়ের গলা থেকে হিঁক করে একটা আওয়াজ বেবিয়ে এল। তারপর তিনি বলতে লাগলেন, 'না না, একেবারেই না। কবে তোমার টাকাটা চাই বল।'

'ইলেকসানের এখনও মাস চারেক বাকি। টেম্পো ফেম্পো কিসসু ওঠে নি। কিন্তু এখন থেকেই আমরা গ্রাউণ্ড ওয়ার্কটা করে রাখতে চাই।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, গুড আইডিয়া।'

'ভাবছি দু উইকের মধ্যেই ওয়ার্ক স্টার্ট করব। টাকাটা তখনই নেব।'

'একসঙ্গে পুরোটা চাই?'

'না। ইনস্টলমেন্টে দেবেন। ফার্স্ট লাখখানেক দিয়ে স্টার্ট করব। তারপর যেমন দরকার হবে, চেয়ে নেব। ও.কে?'

'ও-কে।' কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকার পর অভ্যুদয় বললেন, 'লঙ্গরখানা তো খুলবে, কিন্তু আমার সঙ্গে ভোটারদের কনট্যাক্ট করিয়ে দেবে কবে? আমি যে তাদের ওয়েল-উইশার, ফ্রি কিচেন খুলে দিয়েছি, এ সব তো জানানো দরকার। তবেই তো আমার ওপর সিমপ্যাথি এসে যাবে। বুঝতেই পারছ, কাকে কী কারণে ভোট দিচ্ছে, লোকগুলোর জানা উচিত।'

'সার্টেনলি স্যার। তবে স্টার্টিংয়ের সময় না। তা হলে হারামীগুলো আপনাকে ক্যাচ করে ফেলবে। ভাববে, ভোটের জন্যে আপনি লঙ্গরখানা খুলেছেন। তাতে রি-অ্যাকশানটা টেরিফিক খারাপ হয়ে যাবে। ফিক্‌র্ মাত কীজিয়ে। কারেক্ট টাইমে আপনাকে স্টেজে নামিয়ে দেব।'

'ঠিক আছে। তোমার ওপর কমপ্লিট আস্থা রয়েছে। আশা করি এবার তোমার অ্যাটেমপ্ট সাকসেসফুল হবে।'

'ডেফিনিটলি স্যার। থ্যাঙ্ক ইউ।' মুখে এই চারটে ওয়ার্ড আউড়ে মনে মনে বললাম, 'ক'দিন ওয়েট কর খজড়া, তোমার মাথায় কিরকম চরকি ঘুরিয়ে দিই দেখো।'

আরো দু-একটা কথা বলে অভ্যুদয় ফোন নামিয়ে রাখলেন। তিরিশ সেকেণ্ড কাটল না, ফের ওটা কুর কুর করে বেজে উঠল। মহাশয়গণ, ঝাড়া হাফ অ্যান আওয়ার অভ্যুদয়ের সঙ্গে ভ্যাজর ভ্যাজর করে চোয়াল ব্যথা হয়ে গিয়েছিল। এখন আর ফোন ধরতে ইচ্ছে করছে না। বোদাকে বললাম, 'দ্যাখ তো কোন শ্লা আবার জ্বালাতে চাইছে—'

বোদা ফোনটা তুলে খাঁটি আই. সি. এস-দের স্টাইলে 'হ্যালো' বলতেই লাইনের ওপার থেকে কী উত্তর শুনে হাই-জাম্প মেরে আমার কাছে চলে এল। তার মুখের জিওগ্রাফি একেবারে পালটে গেছে। চাপা গলায় বলল, 'সমাজপতি সাহেব। তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে।'

আমি যে পলাশডাঙা থেকে এইমাত্র কলকাতায় 'ইন' করেছি, মাকড়াটা টের পেল কী করে? সে যাক গে, বোদার হাত থেকে ফোনটা নিয়ে গলার স্বরে মালাই মাখিয়ে বললাম, 'বলুন স্যার—'

'তুমি স্বয়ম্ভু তো?'

'সার্টেনলি স্যার!'

'একটু আগে অন্যরকম একটা গলা শুনলাম।'

'হ্যাঁ, ও আমার কনফিডেন্সিয়াল সেক্রেটারি বোদা। বোদাই ফোনটা ধরেছিল কিনা—'

সমাজপতি বোদাকে চেনেন। বললেন, 'ও আচ্ছা। তোমাকে আজ সকাল থেকে কম করে আঠার বার ফোন করেছি। এতক্ষণে ধরতে পারলাম।'

জানালাম, আমরা এই সবে পলাশডাঙা থেকে কলকাতায় ফিরে এসেছি।

'তুমি পলাশডাঙায় যাবার আগে ফোনে যা জানিয়েছিলাম সেটা এখন টোটালি কনফার্মড।

আমাদের ঘাড়ের ওপর এবার খাঁড়া এসে পড়ল বলে। কী যে করব বুঝতে পারছি না।'

সমাজপতি আমাকে কী বলেছিল, মনে পড়ছে না। বেমালুম সব ভুলে মেরে দিয়েছি। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী যেন বলেছিলেন স্যার—'

'অভ্যুদয় মিটারকে নিয়ে তুমি এমন মেতে আছ যে আমার কথা তোমার একেবারেই মনে থাকে না আজকাল—' সমাজপতির গলা থেকে কয়েক কেজি অভিমান ঝরে পড়তে লাগল।

বললাম, 'একটু শুধু ক্যাচ করিয়ে দিন স্যার, এক্ষুনি মনে পড়ে যাবে। দুটো দিন পলাশডাঙায় হেভি ঘুরেছি, ব্রেনের ভেতর সব গড়বড় হয়ে গেছে। ক্ষমাটমা করে দেবেন স্যার—'

মহাশয়গণ, গলার স্বরটা ঝপ করে তিন ফুট নামিয়ে দিয়ে সমাজপতি বললেন, 'ভেরি রিলায়েবল সোর্স থেকে আজই শুনেছি, এই মাসের ভেতর আমাদের ওপর ইনকাম ট্যাক্স রেইড হবে। সেটা শোনবার পর থেকে অনবরত তোমাকে ধরতে চেষ্টা করছি। আজ তোমাকে না পাওয়া গেলে কাল সকালেই পলাশডাঙায় লোক পাঠাতাম।'

'এর আগেও আপনি আমাকে রেইডের কথা বলেছিলেন। ওটা যে হবেই, সে ব্যাপারে আপনি সিওর হচ্ছেন কী করে?'

গলাটা আরও নামিয়ে দিয়ে সমাজপতি ফিস ফিস করে বলতে লাগলেন, 'ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টে আমাদের লোকও তো আছে। তারাই খবরটা দিয়েছে।'

'আই সি—' একটু চিন্তা ফিন্তা করে বললাম, 'কবে রেইডটা হবে জানতে পেরেছেন?'

'না। আমাদের লোক ডেট বলতে পারল না, তবে অ্যালার্ট করে দিয়েছে। আমরা যেন মালপত্র সরিয়ে ফেলি। মালপত্র কী নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ।'

'তা আর পারব না? ক্যাশের কথা বলছেন তো?'

'রাইট কিন্তু ওভাবে বলো না। তোমার সেক্রেটারিটি বেশ ট্রাস্টওয়ার্দি তো? মানে যে সব কথা তার সামনে হচ্ছে, সেগুলো বাইরে জানাজানি হয়ে গেলে আমাদের ভীষণ বিপদ।'

'স্যার, আপনার জিভ থেকে স্লিপ করে এসব সিক্রেট বেরুতে পারে, কিন্তু আমি না' বলে দিলে বোদার পেটে হাইড্রোজেন বোমা ঝাড়লেও কিসসু বেরুবে না।'

'গুড। এখন কী করা দরকার সেটা বল।'

'বেশি ভেবে ভেবে ব্লাড প্রেসার চড়িয়ে ফেলবেন না স্যার। আমি যখন আছি তখন কিছু একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করে ফেলবই। কয়েকটা দিন শুধু টাইম দিন।'

'একটা দিনও টাইম পাবে না।'

'কিন্তু মিটার সাহেবের অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে ফেলেছি। পলাশডাঙার কেসটা পনের কুড়ি দিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। তারপর এই ব্যাপারটা ধরব। আশা করি, এর ভেতর রেইডটা হবে না। গভর্নমেন্টের যা কারবার তাতে এদের এইটিন মান্থে বছর। ঝট করে কিসসু করবে না।'

সমাজপতি গলার শির ছিঁড়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'হ্যাং ইওর পলাশডাঙা। আমরা এদিকে ডুবতে বসেছি, আর তুমি কিনা এই মারাত্মক টাইমে পলাশডাঙা নিয়ে পড়েছ! একবার ধরা পড়লে আমাদের অবস্থাটা কী হবে, ভাবতে পারো?'

'তা একটু একটু পারি স্যার।' বলতে লাগলাম, 'এই রেইডের কথাটা আপনার বন্ধুদের জানিয়েছেন?'

'এখনও জানাই নি। তোমার সঙ্গে পরামর্শ করার পর জানাব, ভেবেছিলাম। এবার জানানো উচিত, কী বলো?'

'সার্টেনলি। আজই সবাইকে জানিয়ে দিন।'

'তা না হয় দিলাম কিন্তু মালপত্রগুলো নিয়ে আমরা কী করব, সে ব্যাপারে অ্যডভাইস দাও।'

হে হে মহাশয়গণ, আপনারা তো জানেনই আমার ব্রেনের ভেতর স্বয়ংক্রিয় না কী যেন বলে, সেরকম একখানা কমপিউটার দিনরাত টোয়েন্টি-ফোর আওয়ার্স চালু রয়েছে। সমাজপতির সঙ্গে যখন ডায়লগ চালাচ্ছি তখন সেটা ফুল স্পিডে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। টেরিফিক একখানা ফ্ল্যাশ এসে গেল। বললাম, 'বেলেঘাটার গুরুদেবের আশ্রমে যেখানে পার্মানেন্ট কেত্তনের আসর বসে, তার তলায় মাটির নিচে একটা চেম্বার আছে না?'

সমাজপতি বললেন, 'আছে। কেন?'

'আপনার আর আপনার বন্ধুদের যত মাল আছে সব সেটার ভেতর ঢুকিয়ে দিন। আশ্রমে, আই মীন, যেখানে সাধন ভজন হয়, যেখানে ডে-অ্যান্ড-নাইট স্পিরিচুয়াল কারবার চলছে সেখানে ইনকাম ট্যাক্স রেইড হবে না।'

সমাজপতির গলা থেকে এবার বগবগিয়ে স্নেহ বেরিয়ে আসতে লাগল, 'তুমি একখানা জিনিয়াস স্বয়ম্ভু। এ ব্যাপারটা তো আমার মাথায় আসে নি। জগৎপতির ওখানেই তো আমাদের সেফেস্ট আশ্রয়। থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ, মেনি মেনি থ্যাঙ্কস।'

মনে মনে বাছা ক'টি খিস্তি ঝেড়ে মুখে বললাম, 'স্যার এতবার ধন্যবাদ দিয়ে আমাকে লজ্জা ফজ্জা দেবেন না। আই অ্যাম অলয়েজ অ্যাট ইওর সারভিস। আপনাদের সেবার জন্যেই আমার জন্ম। সেটা করতে পারলেই শুদ্ধু বাংলায় কী যেন বলে—জীবনটা সার্থক।'

সমাজপতি আমার কথাগুলো বোধ হয় শুনতে পেলেন না। অনেকটা সলিলকির স্টাইলে বলতে লাগলেন, 'আজই মালপত্র সরিয়ে ফেলতে হবে। আচ্ছা, এখন ফোন রাখছি। তুমি পলাশডাঙায় অনেক খেটে এসেছ। এবার রেস্ট নাও। গুড নাইট।'

'গুড নাইট।' বলে ফোনটা নামিয়ে রাখলাম। তারপর মনে মনে ভাবলাম, রাখো খজড়ারা, যার যা মাল আছে ওখানে নিয়ে জড়ো করো। এতগুলো বিজনেসম্যান আর ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের সব ব্ল্যাক মানি একজায়গায় পেয়ে যাব। আমার ব্রেনে সট করে আরেকটা ফ্ল্যাশ এসে গেছে। এই কোটি কোটি টাকা একসঙ্গে পেলে কী করা যায় সেটা এক সেকেণ্ডে ঠিক করে ফেললাম।

মহাশয়গণ, আমি কী ভেবেছি তা জানার জন্যে আপনারা নিশ্চয়ই অস্থির হয়ে উঠেছেন। ভাবছেন একটা বেজন্মা ফোরটোয়েন্টি ডেফিনিটলি টাকাগুলো হাতাবার তালে আছে। মাকড়ারা, যা ইচ্ছে আপনারা ভাবতে পারেন, আমার তাতে আপত্তি নেই। তবে এখন আমার পেট থেকে এ ব্যাপারে একটা কথাও বার করতে পারবেন না। ওয়েট করুন, ধৈর্য ধরুন। যখন টাইম হবে নিজেদের চোখে সব দেখতে পাবেন। আমাকে আর কিছু জানাতে হবে না। ডায়লগে কতটুকু আর বোঝাতে পারব। তার চাইতে চোখের সামনে সিনেমা দেখা ভাল না?

মহাশয়গণ, অভ্যুদয় মিটার বা সমাজপতির সঙ্গে কথা বলতে বলতে অনেকক্ষণ ধরেই মার্ক করছিলাম, বোদা হারামীটা উসখুস করে খালি এধারে ওধারে তাকাচ্ছে। ওর ধান্দাটা বুঝতে পারছিলাম। বললাম, 'শ্লা, মালের জন্যে গলা খুচখুচ করছে—তাই না রে?'

বত্রিশটা ট্যারাবাঁকা দাঁত বার করে বোদা হাসল, 'তুমি মাইরি ভগবান, ঠিক পেটের কথা টের পেয়ে যাও। দু'দিন গলায় কিছু পড়ে নি, আলজিভ পর্যন্ত শুকিয়ে একেবারে মরুভূমি হয়ে গেছে গুরু।'

'যা, ওখানে সোনার বাংলা আছে। দুটো মাটির খোরা নিয়ে আসবি।' বলে নেপালি বেয়ারাটাকে ডেকে প্রন কাটলেট আর শিক কাবাব আনতে বললাম। মালের সঙ্গে চাট তো দরকার।

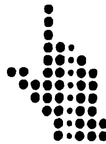
'আবি লাতে হ্যায় সাব।'

বেয়ারাটার কাছে কিছু ক্যাশ দেওয়া আছে। খুচরো খাচরা খরচ সেখান থেকেই হয়ে যায়। ফুরিয়ে গেলে আবার দু-চারশো টাকা তার কাছে ডিপোজিট করে দিই। ছোকরা অর্ডার নিয়েই রকেটের স্পিডে বেরিয়ে গেল।

বোদা ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে বলল, 'গুরু, আগরপাড়ায় বাংলা ছাড়া আর কিছু মেলে না। অনেক দিন হুইস্কি ফুইস্কি স্টমাকে পড়ে নি। তোমার স্টকে তো—'বলতে বলতে থেমে গেল।

'শ্লা, জন্মেছ তো ভিখিরি হয়ে। জিভখানা একেবারে ফোর্ড রকফেলারের ঘরের বাচ্চাদের মতো করে ফেলেছ। যাও, ওখানে স্কচের বোতলও আছে।'

বোঁ করে ঘুরে আমার পায়ে চুমু খেয়ে স্কচ এবং সোনার বাংলার বোতল আর মাটির খোরা, কাট গ্লাসের লম্বা গেলাস, ফ্রিজ থেকে বরফ এটসেট্রা নিয়ে এল বোদা। আমাকে সোনার বাংলা দিয়ে নিজে কাচের গেলাসে চুক চুক করে স্কচে দু-তিনটে চুমুক দিতে না দিতেই বেয়ারাটা শিক কাবাব এবং প্রন কাটলেট নিয়ে ফিরে এল।



মহাশয়গণ, দুটো দিন হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে লগা আমার আর বোদার কোমরের বলবেয়ারিং লুজ করে দিয়েছে। সমাজপতির সঙ্গে কনট্যাক্ট হবার পর থেকে এত হাঁটাহাঁটির হ্যাবিট নষ্ট হয়ে গেছে। তাই রাত্তিরে এসপ্ল্যানেডের এক ফাইভ-স্টার হোটেলে ডিনার সেরে এসেই বিছানায় বডি থ্রো দিয়েছিলাম। ফার্স্ট ক্লাস একটি ঘুমে বোদা এবং আমার রাত কাবার হয়ে গেছে।

সকালে ওঠার পর বোদাকে আর রোখা গেল না। মুখ ফুখ ধুয়ে ব্রেকফাস্ট চুকিয়েই সে আগরপাড়ায় চলে গেল। তাকে বললাম, 'আজ রাত্তিরে আমি ওখানে ফিরব। সুমনাকে থাকতে বলিস।' বলেই আবার বিছানায় টান টান হয়ে পড়লাম।

এবার উঠলাম বেলা দুটোয়। রাতে এবং দিনে, দু শিফটে সাত ঘণ্টা সাত ঘণ্টা মোট ফোরটিন আওয়ার্স ঘুমোবার পর বডি একেবারে ফেদার ওয়েট, মানে পালকের মতো হালকা হয়ে গেল। শাওয়ারে স্নান ফান করে, ড্রেস পালটে যখন চুল আঁচড়াচ্ছি, হীরা সিং এসে অ্যাটেনশানের স্টাইলে পেছনে দাঁড়াল। আয়নায় তার মোঙ্গোলিয়ান মুখ দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করলাম, 'কুছ জরুরত হ্যায়?'

হীরা সিং বলল, 'দুফারমে লাঞ্চা ক্যা হোগা?' মানে দুপুরে আমি কী খাব সেটাই জানতে চাইছে।

সকালে হেভি ব্রেকফাস্ট করেছি, এখনও খিদে পায় নি। বললাম, 'কোঈ জরুরত নেহী। আমি এখন বেরুচ্ছি। সন্ধেবেলা ফিরব। তুমি খেয়ে নিও। ঠিক হ্যায়?'

'ঠিক হ্যায় সাব।'

মহাশয়গণ, সন্ধে পর্যন্ত আমার ঠাসা প্রোগ্রাম। এই ক্যালকাটা সিটিতে অনেকগুলো জায়গায় আমাকে টুঁ মারতে হবে। আপনারা স্টিকিং গামের মতো আমার গায়ে সেঁটে থেকে স্রেফ মার্ক করে যান।

গড়িয়াহাটের এই হাই-রাইজ অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের গ্যারাজে সমাজপতির একটা ইমপোর্টেড ফিয়াট আর একটা জাপানি টোয়োটা রয়েছে আমি কোনোটাই ইউজ করি না। ও দুটো পড়েই থাকে। শুধু যেদিন যেদিন সুমনা আলিপুরে উপাধ্যায়ের কাছে প্রিন্সেস হবার তালিম নিতে যায় সেই সেই দিন টোয়োটাটা তাকে সেখানে পৌঁছে দেয়।

দুটো ফরেন কারের জন্য দু'জন শোফার আছে। তারা এই গড়িয়াহাটের অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে সারভেন্ট-কাম-ড্রাইভারস কোয়ার্টার্স থাকে। টোয়োটার শোফারের সঙ্গে সুমনার আলাপ করিয়ে দিয়েছি। তাকে বলাই আছে, উইকে দু'দিন সে বিকেল চারটেয় গাড়ি নিয়ে শিয়ালদা স্টেশনে চলে যাবে। ঐ সময় সুমনা ট্রেনে আগরপাড়া থেকে আসবে। তাকে নিয়ে শোফার যাবে আলিপুরে। যতক্ষণ না ট্রেনিং কমপ্লিট হচ্ছে সে ওয়েট করবে। তারপর সুমনাকে আবার শিয়ালদা পৌঁছে দিয়ে গড়িয়াহাট ফিরে আসবে।

সারভ্যান্টস-কাম ড্রাইভারস কোয়ার্টার্সে গিয়ে ইটালিয়ান ফিয়াটের শোফারের কাছ থেকে চাবি নিয়ে সোজা চলে এলাম আন্ডারগ্রাউন্ড গ্যারাজে। শোফার রামপেয়ার অবশ্য ড্রাইভ করে আমি যেখানে যেখানে যেতে চাই সেই সব জায়গায় নিয়ে যেতে চেয়েছিল। মহাশয়গণ, আমি কোথায় কোথায় যাব, তার উইটনেস রাখব কেন? ওসব কারবারে আমি নেই।

ফিয়াটটা বার করে প্রথমে চলে গেলাম কিড স্ট্রিটে মিস মেরি হ্যারিয়েটের স্পোকেন ইংলিশ স্কুল 'টিউলিপ'-এ।

মাগুর মাছের গায়ে ছাই মাখালে যেমন হয় অবিকল সেই রকম গায়ের রং, মিডলএজেড, টেরিফিক হেফটি, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মেয়েমানুষ মেরি হ্যারিয়েট। তার বাটকের সারকামফারেন্স হচ্ছে মিনিমাম ছ'ফুট—সি. এম. ডি. এ-র বাহাত্তর ইঞ্চি পাইপের সাইজ। গলা বলতে কিছু নেই, বিশাল মাথাটা স্রেফ ঠেসে তার ধড়ের ওপর বসিয়ে দিয়েছে।

মহাশয়গণ, সুমনাকে এখানে ভর্তি করে দেবার পর খবর পেয়েছিলাম, মেয়েমানুষটা বার

চারেক বিয়ের পর চার বারই ডিভোর্স করে এখন আবার কুমারী নাম নিয়ে বসেছে। যদিও চার বিয়ের হার্ভেস্ট হিসেবে তার মোট ছ'টি ছেলেমেয়ে। তাদের কেউ কেউ থাকে মিস হ্যারিয়েটের ভূতপূর্ব হাজব্যান্ডদের কাছে, কেউ থাকে মায়ের কাছে।

সে যাক গে, 'টিউলিপ-এ মিস হ্যারিয়েটের সাজানো চেম্বারে 'ইন' করে দেখা করলাম। মেয়েমানুষটা আমাকে দু'বার মোটে আগে দেখেছে। তারপর পাক্কা দু'টি মাস কেটে গেছে। তবু আমাকে দেখেই চিনতে পারলেন। হে হে মহাশয়গণ, আমার চেহারাটা তো আপনারা জানেনই। চল্লিশ বছর আগে জন্মালে হলিউডের ভ্যালেন্টিনোর বারোটা বাজিয়ে ছাড়তাম।

মিস হ্যারিয়েট কালো পুরু রবারের মতো দুই ঠোঁট ফাঁক করে ধবধবে সাদা দাঁত বার করে হাসলেন। একেবারে ঢলে-পড়া পোজে বললেন, 'হাউ আর ইউ মিস্টার হোড়?'

মহাশয়গণ, একটা কথা আপনারা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন এই অ্যাংলো মেয়েমানুষটার চেহারা যেমনই হোক, কথা বললে গলার ভেতর যেন পিয়ানো বেজে ওঠে। বললাম, 'ফাইন। আপনি?'

'একসেলেন্ট।'

'বসুন বসুন—'

গ্লাস-টপ সেমি-সার্কুলার একটা টেবিলের এধারে ফোমে-মোড়া ফ্যাশবেনল চেয়ারে বসে পড়লাম। মুখোমুখি টেবিলের ওধারে মিস হ্যারিয়েট। তিনি বললেন, 'অনেক দিন পর কিন্তু এলেন মিস্টার হোড়।'

বললাম, 'হ্যাঁ, আর্জেন্ট কাজে ভীষণ আটকে গিয়েছিলাম। তাই আসতে পারিনি। তারপর বলুন ম্যাডাম, আপনার ছাত্রী কিরকম প্রোগ্রেস করছে।'

'শী ইজ আ ব্রিলিয়ান্ট গার্ল। সুমনা ইজ ডুইং ফাইন। ওর জিভে আমি ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট বসিয়ে দিয়েছি। আপনি কি ওর ইংরেজি বলা শুনেছেন?'

'না।'

'শুনে দেখবেন। য়ু উড বী চার্মড সিম্পলি।'

মুলতানি মোষের সাইজের মিস হ্যারিয়েট কথা বলছেন ঠিকই, তবে গোল গোল চোখের কোণ দিয়ে তিরছি নজরে আমার দিকে শুদ্ধ ভাষায় কটাক্ষ না কী যেন বলে তাই বর্ষণ করে চলেছেন। ষোল বছরের ছুকরিদের মতো অকারণ লজ্জায় তাঁর রং বেগুনি হয়ে উঠছে মাঝে মাঝে।

এ সব কিসের সিগনাল, বুঝতে পারি। মহাশয়গণ, আমার চেহারাটা অ্যাঞ্জেল-মার্কা হলে কী হবে, আসলে আমি একটি উৎকৃষ্ট হারামী। কার পেটে কী ধান্দা ঘুরছে মুখ দেখেই বলে দিতে পারি। মিস হ্যারিটের লজ্জা পাওয়া মুখ, গালের কালার পালটে যাওয়া—এ সবের মধ্যে কী ঝিলিক মারছে, আপনারাও জানেন, আমিও জানি। কিন্তু দেড় কুইন্ট্যাল ওয়েটের ঐ অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান লাশ যদি ভেবে থাকে আমাকে কাত করে ফেলবে তা হলে টেরিফিক ভুল করবে। আপনাদের কারো ইচ্ছে হলে এই মালটিকে আপনাদের ঘাড়ে সেট করে দিতে পারি।

যাক গে, সেই কম বয়েস থেকেই মার্ক করে আসছি মেয়েমানুষ, তা যে বয়েসেরই হোক

না, আমার গায়ে অ্যাডেসিভের মতো সেঁটে যেতে চায়। কিন্তু উইমেন ব্যাপারটা আমার ব্রেনে একেবারেই ঢোকে না। পঞ্চ 'ম'-কারের ভেতর মদ ছাড়া আর কিছুই বুঝি না। আমার একমাত্র সাধনা বা তপস্যা যা-ই বলুন না, সোনার বাংলা নিয়ে। তা মিস হ্যারিয়েট, যতই আমাকে চোখ মেরে যাও না, তোমার কঁ্যাচাকলে আমি পা লাগাচ্ছি না।

মিস হ্যারিয়েট বললেন, 'সুমনাকে আমার স্কুলে ভর্তি করে দিয়ে সেই যে আপনি ভ্যানিশ করে গেলেন, আর দেখাই পাই না। রোজই ভাবি, আজ বুঝি আসবেন, আজ বুঝি আসবেন। কিন্তু আসেন আর না। সুমনাকে জিজ্ঞেস করেও ঠিকমত কিছু জানতে পারি না। সে বলে আপনি নাকি আজ এখানে থাকেন, কাল ওখানে। আপনার হোয়ারঅ্যাবাউটসের ঠিক নেই।'

'ঠিকই বলে। আমার ভেরিয়াস টাইপের অ্যাসাইমেন্ট থাকে। সে সব ব্যাপারে নানা জায়গায় ঘুরতে হয়। এই যে আপনার সঙ্গে এখন বসে কথা বলছি, এক ঘণ্টা পর কোথায় ছুটতে হবে জানি না।'

'আপনার কাজের নেচারটা তো পিকিউলিয়ার।'

'রাইট।'

কী ধরনের কাজ কারবারের সঙ্গে আমি ইনভলভড, সেটা জিজ্ঞেস করতে গিয়েও থমকে গেলেন মিস হ্যারিয়েট। হয় তো ভাবলেন, এত তাড়াতাড়ি হুট করে এ জাতীয় প্রশ্ন করাটা অভদ্রতা। আমি আর মালটাকে এ ব্যাপারে কোনো কথা বলার চান্স না দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'এক্সকিউজ মি, আপনার ফিজ ঠিক মতো পেয়ে যাচ্ছেন তো?'

এরকম একটা প্রশ্ন আশা করেন নি মিস হ্যারিয়েট। তিনি প্রথমটা হকচকিয়ে গেলেন। তারপর তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। থ্যাঙ্ক য়ু মিস্টার হোড়।'

আমি উঠে পড়তে পড়তে বললাম, 'আজ তা হলে যাওয়া যাক মিস হ্যারিয়েট। আপনার অনেকখানি ভ্যালুয়েবল টাইম নষ্ট করে গেলাম।'

আচমকা কী মনে পড়তে টেরিফিক ব্যস্ত হয়ে পড়লেন মিস হ্যারিয়েট, 'ঐ দেখুন, আপনাকে এক কাপ কফিও খাওয়ানো হলো না। প্লিজ, দু মিনিট বসুন। আমি নিজের হাতে করে দিচ্ছি। এখানে চা-কফির সবরকম অ্যারেঞ্জমেন্ট রয়েছে।'

'মেনি থ্যাঙ্কস। কফিটা আজ থাক। ঠিক সাতটায় আমার একটা আর্জেন্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট রয়েছে। আরেক দিন এসে এক কাপের জায়গায় দু কাপ খেয়ে যাব।'

মিস হ্যারিয়েটের দু চোখে টুনি বাল্ব জ্বলে উঠল। গলে-পড়া গলায় বলে উঠলেন, 'কথা দিলেন কিন্তু, ওয়ার্ড অফ অনার।'

আমি দরজার দিকে পা বাড়িয়ে বললাম, 'ওয়ার্ড অফ অনার।'

'কবে আসবেন?' খুশিতে হ্যারিয়েটের গলায় রবিশংকরের সেতার বাজতে লাগল যেন।

মহাশয়গণ, এক ব্যাটেলিয়ানের মা, দেড় কুইন্ট্যালের মিস হ্যারিয়েটকে প্রেমিকা হিসেবে ভাবার মতো মারাত্মক সাহস আমার নেই। আমার মতো একটা থার্ড ক্লাস ফোরটোয়েন্টি যে কোনো কারণেই ঘাবড়ায় না, কোনো প্রবলেমই যাকে টলাতে পারে না, তার মাথার ভেতর এক সেকেণ্ডের জন্য একখানা চরকি ঘুরে গেল। তারপর ব্রেনটা স্লাইট নরম্যাল হলে বললাম,

'নেক্সট উইকে।'

হ্যারিয়েট এলিজাবেথ টেলরের মতো টেরিফিক একখানা হাসি আমার দিকে ছুঁড়ে বললেন, 'আমি কিন্তু ইগারলি ওয়েট করব মিস্টার হোড়।'

'ইট উড বি মাই গ্রেট প্লেজার টু মিট য়ু নেক্সড উইক।'

'থ্যাঙ্ক য়ু।'

রামায়ণ না মহাভারত, কোথায় যেন শবরী ফবরী কে একজন ছিল, সে আবার কার জন্যে যেন ওয়েট করেছিল বছরের পর বছর, তেমনি খজড়ী মেয়েছেলে আমার জন্য হোল লাইফ প্রতীক্ষা করে যাও। এই লাইফে আর দেখা ফেখা হবে না।

কিড স্ট্রিট থেকে বেরিয়ে চলে এলাম কলাকার স্ট্রিটে বদ্রীনারায়ণ চৌবের ফ্ল্যাটে। এখানে সপ্তাহে দু'দিন ভূপালের চোস্ত খানদানি হিন্দি শিখতে আসে সুমনা।

বদ্রীনারায়ণকে তাঁর ফ্ল্যাটেই পাওয়া গেল। তিনিও জানালেন, সুমনার মতো মেরিটোরিয়াস স্টুডেণ্ট লাইফে আর একটিও পান নি। যত ডিফিকাল্টই হোক, কোনো লেসন একবারের বেশি দু'বার তাকে দিতে হয় না। মেমরি ট্রিমেন্ডাস। একবার কিছু শুনলে, দেখলে বা পড়লে আর ভোলে না, ব্রেনের ভেতর সেটা ফোটোগ্রাফ হয়ে সেঁটে যায়। হিন্দি অ্যাকসেন্ট বদ্রীনারায়ণের গলা থেকে বেরুবার আগেই সে নিজের গলায় তুলে নেয়।

'কাজ চালাবার মতো তা হলে শিখে ফেলেছে সুমনা?'

বদ্রীনারায়ণ বললেন, 'মোর দ্যান এনাফ। কে বলবে সুমনা একটি বাঙালি মেয়ে আর মোটে দু মাস হিন্দি শিখছে!'

'বহুত সুক্রিয়া চৌবেজি। সবই আপনার পরিশ্রমের রেজাল্ট।'

'আমি খেটেছি ঠিকই কিন্তু স্টুডেন্ট ভাল না হলে কতদূর আর কী করা যেত! নাইনটি পারসেন্ট ক্রেডিট গোজ টু সুমনা।'

'এখন ওকে যদি হিন্দি ওয়ার্ল্ডে সেট করি, ওর কথা শুনে বাঙালি বলে ধরা পড়বে না তো?'

'নট অ্যাট অল। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

আরেক বার বদ্রীনারায়ণকে সুক্রিয়া জানিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার ফিজ ঠিক সময়ে পেয়ে যাচ্ছেন তো?'

'বেশখ।'

'আমি তা হলে এখন উঠি।'

'নমস্তে—'

'নমস্তে।'

কলাকার স্ট্রিট থেকে এবার আমার ফিয়াট চলে এল আলিপুরের মনপুরা স্টেটের এক্স দেওয়ান রামরতন উপাধ্যায়ের বাংলোয়। বাইরের লন-এ একটা বেতের সোফায় বসে কী

একটা বই পড়ছিলেন তিনি।

এতক্ষণ মিস হ্যারিয়েট এবং বদ্রীনারায়ণ চৌবের কাছ থেকে সুমনা সম্পর্কে যা রিপোর্ট পেয়েছি তা খুবই এনকারেজিং। এখন রামরতন উপাধ্যায় নামে মালটি যদি পাশপোর্ট দিয়ে দেয়, সুমনাকে হান্ড্রেড পারসেন্ট প্রিন্সেস বানিয়ে স্টেজে নেমে পড়ব।

রামরতন আমাকে চিনতে পারলেন। মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসিয়ে বললেন, 'মেয়েটিকে আমার হাতে দিয়ে আর তো এলেন না।'

মনে মনে দু-চারটি খিস্তি ঝেড়ে মুখে বললাম, 'আমি এসে আর কী করব? ফর নাথিং আপনার দামী টাইমের বারোটা বাজানো। আর আমি তো প্রিন্সেস হব না। যে হবে সে রেগুলার এলেই হল।'

'সুমনা রেগুলার আসছে। তবু আপনিই তো ওর গার্জেন অ্যাঞ্জেল। ওর ব্যবস্থা করে দিয়ে সেই যে চলে গেলেন, আর দেখা নেই। অন্তত আমার কাছে কিরকম ট্রেনিং নিচ্ছে তার খোঁজও তো নেবেন।'

আমি দাঁত বের করলাম, 'দু-চার দিন পর পর আপনার কাছে এসে ডিস্টার্ব করার মানে হয় না। ট্রেনিংয়ের জন্যে একটু টাইমের তো দরকার। তাই দু মাস বাদে এলাম। তা ছাড়া আপনার সঙ্গে কথা বলেই মনে হয়েছে আসল মাকড়া, আই মীন ট্রেনারের হাতে সুমনাকে তুলে দিয়েছি। এ নিয়ে আমার দুশ্চিন্তা ফিন্তা ছিল না।'

উপাধ্যায় হাসলেন।

সন্ধে হয়ে এসেছে। আলিপুরের এদিকটায় প্রচুর গাছপালা। হোল ডে দূরে দূরে খাবার দাবারের খোঁজে ঘোরাঘুরির পর কয়েক হাজার পাখি সেগুলোর মাথায় ফিরে এসে টেরিফিক চেঁচামেচি করে একখানা বিরাট কনফারেন্স বসিয়ে দিয়েছে।

সূর্যটাকে এখন আর দেখা যাচ্ছে না, আকাশের সেমি-সার্কুলার গা বেয়ে হড়কে নেমে যেতে যেতে হরাইজনের তলায় আজকের মতো ডুব দিয়েছে। বাইরের রাস্তায় কর্পোরেশনের টিউব ল্যাম্পগুলো জ্বলে উঠছে। উপাধ্যায়ের লন-এও একটা ইয়েলো কালারের হ্যালোজেন বাতি এই মাত্র কেউ জ্বালিয়ে দিল।

মহাশয়গণ, উপাধ্যায়ের বাংলো এবং লন ফন দেখলে মালুম পাওয়া যায় মাকড়া মনপুরা স্টেটকে ফাঁক করে মালকড়ি কতটা হাতিয়ে এনেছে।

উপাধ্যায় বললেন, 'মিস্টার হোড়, সান-ডাউন হয়ে গেল। এই সময়টা আমি ড্রিংক করে থাকি।'

মনে পড়ে গেল, সুমনার ব্যাপারে যেদিন ফার্স্ট এখানে আসি সেদিনও কথা বলতে বলতে সন্ধে হয়ে গিয়েছিল আর উপাধ্যায় ড্রিংকসের কথা বলেছিলেন। এই খজড়াটা একেবারেই পেট্রিয়ট না, কলোনিয়াল মেন্টালিটির লোক—ফরেনের চামচা। শ্লা'র বাড়িতে স্কচ হুইস্কি আছে কিন্তু খাঁটি সোনার বাংলা কি তাড়ি বা ঠাররা নেই। মহাশয়গণ, আপনারা তো জানেনই আমি একজন টেরিফিক দেশভক্ত। আমার বিশুদ্ধ স্টমাকটাকে পারতপক্ষে ফরেন মাল ঢুকিয়ে অপবিত্র করতে পারি না। অন্য দিক থেকে দুশ্চিন্তার একটা কারণ রয়েছে। সেটা হলো বেশিক্ষণ

এখানে বসে থাকলে মাকড়া আমাকে হয় স্কচ, না হলে কফি অফার করবে। দুটোর যে কোনো একটা আমার মেজাজ কিচাইন করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। কাজেই এখান থেকে কাজের কথাটা চুকিয়ে যত তাড়াতাড়ি সটকে পড়া যায় ততই ভাল। বললাম, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আপনার যখন হ্যাবিট তখন ড্রিংক তো করবেনই।'

'থ্যাঙ্কস। আপনাকে কী দিতে বলব?'

'কিচ্ছু না। আমার স্টমাকটা আজ আপসেট করেছে। আজ হোল ডে ফাস্টিংয়ে আছি।'

'ঠিক আছে, স্টমাকে যখন ট্রাবল তখন হট কিছু না খাওয়াই ভাল।' বলে একটা বেয়ারাকে ডেকে নিজের জন্য হুইস্কি আনতে বললেন।

আমি বললাম, 'মিস্টার উপাধ্যায়, আপনার ট্রেনিংয়ে সুমনা কতদূর এগুতে পেরেছে? আই মীন মিডল ক্লাস ফ্যামিলির একটা মেয়ের পক্ষে প্রিন্সেস হবার তালিম নেওয়া তো খুব ইজি ব্যাপার না।'

বেয়ারা ট্রে-তে করে হুইস্কি, বরফ, কাজুবাদাম, চীজ এটসেট্রা নিয়ে এসেছিল। হুইস্কির গেলাসে বরফের কিউব ফেলে আলতো করে একটা চুমুক দিয়ে গেলাসটা সামনের নিচু টেবলে নামিয়ে রাখলেন উপাধ্যায়। তারপর তিন চারটে কাজু বাদাম মুখে দিয়ে বললেন, 'শি ইজ আ জিনিয়াস। কোনো জিনিস দু'বার দেখাতে হয় না। আচ্ছা মিস্টার হোড়—'

'বলুন—'

'রিয়েলি সুমনা কি মিডল ক্লাস ফ্যামিলির মেয়ে? ওর যেরকম ইনটেলেক্ট তাতে কিন্তু তেমন মনে হয় না।'

উপাধ্যায়কে জানালাম, শুধু মিডল ক্লাস বললে কারেক্ট হবে না, মিডল ক্লাসের একেবারে লোয়েস্ট লেভেল বলতে যা বোঝায় সুমনারা সেই স্তরের মানুষ। পয়সার জন্য পার্ক স্ট্রিট এরিয়ার গোপন আনলাইসেন্সড ব্রথেলগুলোতে যে ওকে রেগুলার যেতে হত, সেটা আর উপাধ্যায়কে বললাম না।

মহাশয়গণ, আপনারা তো জানেনই আমি উপাধ্যায়ের এই বাংলোয় ঢুকেছিলাম ফিল্ম প্রডিউসার হিসেবে। আমার নতুন প্রোডাকশানে সুমনাকে রাজকুমারীর রোলে নামাব, সেই কারণে তাকে তালিম দিয়ে পারফেক্ট প্রিন্সেস করে তোলার জন্যই আমার এখানে আসা। জিজ্ঞেস করলাম, 'ওর ট্রেনিং কি শেষ হয়েছে?'

'সিওর।'

'প্রিন্সেসের আদব কায়দা চালচলন সব শিখে নিয়েছে?'

'ও যা শিখেছে আর যত তাড়াতাড়ি সব পিক-আপ করে নিয়েছে, ওয়ার্ল্ডের বেস্ট অ্যাকট্রেসরা দশ বছরেও তা পারবে না। সত্যিকারের একজন প্রিন্সেসের পাশে মেক-আপ দিয়ে ওকে দাঁড় করিয়ে দিলে কে আসল আর কে নকল, ধরা ইম্পসিবল।'

'তা হলে ওকে এখন প্রিন্সেসের রোলে নামানো যেতে পারে?'

'নিশ্চয়ই পারে। চোখ বুজে নামিয়ে দিন।'

'এক্সকিউজ মি, যদি কিছু মনে না করেন একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

'ওহ্ সিওর, একটা কেন, যে ক'টা ইচ্ছে জিজ্ঞেস করুন।'

'এখনই নামিয়ে দিলে কোনোরকম খুঁত ফুঁত থেকে যাবে না তো? বুঝতেই পারছেন আমার প্রোডাকশানটা মাল্টি-মিলিয়ন রুপিজের। স্টোরিটাও একজন ইণ্ডিয়ান প্রিন্সেসকে নিয়ে। সেখানে কোনোরকম গড়বড় থেকে গেলে আমার পুরো ইনভেস্টমেন্টটা জলে যাবে।'

'সুমনার দিক থেকে জলে যাবার ভয় নেই। তবে অন্য অ্যাক্টর অ্যাকট্রেসদের তো দেখিনি, গোলমাল যদি হয় তাদের দিক থেকে হতে পারে।'

'এক্সকিউজ মি, আপনার তবু যদি মনে হয় আরো কিছুদিন ট্রেনিং দিলে ভাল হয়, আই ডোন্ট মাইণ্ড। বুঝতেই পারছেন, আমি পারফেকসান চাই।'

যে তিন বার উপাধ্যায় মাকড়ার সঙ্গে দেখা করেছি তাতে মনে হয়েছে, মাকড়ার মেজাজটা খুব ঠাণ্ডা, হুট করে তিনি খচে যান না। কিন্তু এবার তিনি চটে গেলেন। গলাটা কয়েক পর্দা চড়িয়ে প্রায় চেঁচিয়েই উঠলেন, 'সুমনা যে পারফেশানে পৌঁছেছে, রিয়েল রাজকুমারীরাও সে লেভেলে উঠতে পারবে কিনা সন্দেহ। আর ট্রেনিং দেবার কিছু নেই। তা ছাড়া—'

'তা ছাড়া কী?'

'অকারণে আরো কিছুদিন ট্রেনিং দিয়ে এক্সট্রা টাকা নেবার ইচ্ছে আমার নেই। এসব আমি পছন্দ করি না।'

মহাশয়গণ, এ যে দেখছি যাজ্ঞবল্ক্য বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠদের লাইনের লোক—নিষ্কাম নির্লোভ পরম ব্রহ্ম। পাওনার বেশি এক পয়সাও বেশি নিতে চান না। অল রাইট বাবা, তুমি আমার কাছে ক্লিন ইমেজ নিয়েই থাকো। অগত্যা বলতেই হল, 'ঠিক আছে স্যার, আমার হেভি অন্যায় হয়ে গেছে। আপনি যখন বলছেন তখন ধরেই নিচ্ছি রাজকুমারীর রোলে সুমনা ঠিক ফিট করে যাবে। তা হলে 'মা' বলে নামিয়েই দিই।'

'দিতে পারেন।'

মহাশয়গণ, উপাধ্যায় খজড়াটা চুকচুক করে হুইস্কি টেনে যাচ্ছে। আর আমি কিনা বসে বসে তাই দেখছি। চোখের সামনে এরকম দৃশ্য দেখলে মেজাজটা কিচাইন হয়ে যাবার কথা। দেখতে দেখতে টের পেলাম, জিভের ডগা থেকে আলটাগরা পর্যন্ত শুকিয়ে একেবারে ডেজার্ট হয়ে গেছে। এখন সোনার বাংলা গলায় ঢালতে না পারলে আমি স্রেফ মরে যাব। বললাম, 'তা হলে আমি আজ উঠি।'

'উঠবেন? ঠিক আছে।' বলে হাত বাড়িয়ে দিলেন উপাধ্যায়।

আমি তাঁর সঙ্গে হাত মিলিয়ে সবে গেটের দিকে দুটো স্টেপ গেছি, উপাধ্যায় পেছন থেকে ডেকে উঠলেন, 'মিস্টার হোড়—'

ঘাড়টাকে কয়েক সেন্টিমিটার কাত করে জিজ্ঞেস করলাম, 'কিছু বলবেন মিস্টার উপাধ্যায়?'

'হ্যাঁ। সুমনা যে ছবিতে অভিনয় করবে সেটা রিলিজ করলে যেন জানতে পারি। অ্যাক্টিংটা কতদূর কী পারল, দেখার জন্যে আগ্রহ রইল।'

মনে মনে বললাম, কী রোলে সুমনাকে নামাবো তা আমিই জানি। প্রতাপরুদ্রগড়ের প্রিন্সেসের বিয়েতে তোমাকে নিয়ে গেলে আসল ক্যাটটা ব্যাগ থেকে বেরিয়ে আসবে। তখন হাজতে না কোথায় গিয়ে যে সবাইকে ল্যান্ড করতে হবে কে জানে। তোমাকে নেমন্তন্ন করে নিজের বারোটা বাজাবার মতো মাল আমি না। এই যে শ্লা বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছি, তোমার সঙ্গে হোল লাইফে আর দেখা হবে না। দেখা হলেও তোমাকে আর চিনতে পারব না। মুখে অবশ্য বললাম, 'মোস্ট সার্টেনলি স্যার, আপনি ঘষেমেজে ট্রেনিং দিয়ে যাকে রাজকুমারী বানিয়ে তুললেন তার অ্যাক্টিং দেখাতে নিয়ে যাব না, তাই কখনও হয়! প্রেস শো আর ডিনার পার্টিতে আপনি হবেন আমাদের গেস্ট অফ অনার।'

'থ্যাঙ্ক য়ু।'

'নো মেনশান প্লিজ।'

আমি আর দাঁড়ালাম না, গেটের দিকে এগিয়ে চললাম।

মহাশয়গণ, আপনারা তো জানেনেই, সান-ডাউনের পর গলায় সোনার বাংলা না পড়লে আমার পায়ের তলা থেকে চুলের ডগা পর্যন্ত বডির হোল সিস্টেমটার মেশিন ফেশিন গড়বড় হয়ে যায়। আপনাদের এটাও জানা আছে, এই ক্যালকাটা সিটির যেখানে যত বাংলা মালের ঠেক রয়েছে তার পুরো লিস্টটা আমার মুখস্থ।

উপাধ্যায়ের বাংলো থেকে বেরিয়ে দুর্গাপুর ব্রিজের তলায় এক বস্তি টাইপের জায়গায় ঘুপচি মতো ঘরে সোনার বাংলার দোকান আছে। দামি ফরেন ফিয়াটটা দোকানের সামনে দাঁড় করিয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকলাম, 'গৌরহরি, গৌরহরি—'

গৌরহরি বসাক এই বাংলা মালের দোকানটার প্রোপ্রাইটর। মহাশয়গণ, এই মেট্রোপলিসের সবগুলো মালের দোকানের মালিকই আমার ফ্রেন্ড— একেবারে জিগরি দোস্ত।

গৌরহরি তক্তাপোষে থেবড়ে বসে মাল বেচছিল। আমাকে দেখতে পেয়ে কাছা গুঁজতে গুঁজতে দৌড়ে এল। বলল, 'অনেকদিন পর আপনার দেখা পেলাম হোড় সাহেব। কোথায় ছিলেন অ্যাদ্দিন? ভাল আছেন তো?'

'আমার কথা পরে শুনিস মাকড়া। গলা শুকিয়ে ঝামা হয়ে গেছে। ঝট করে দু খোরা বাংলা নিয়ে আয়।' আমি একরকম খেঁকিয়েই উঠলাম!

'ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে।' কাছা গুঁজতে গুঁজতেই অ্যাবাউট টার্ন করে আবার দোকানে গিয়ে ঢুকল গৌরহরি। দু মিনিটের ভেতর পাঁচ শ গ্রামের দুটো মাটির ভাড় সোনার বাংলায় বোঝাই করে আবার ফিরে এল। আমার হাতে সে দুটো ধরিয়ে বলল,'আগে স্যার খেয়ে নিন। তারপর কথা হবে।'

চোঁ চোঁ করে একটা ভাঁড়ে চুমুক লাগালাম। জিভটা শুকনো ব্লটিং পেপারের মতো পাঁচশ গ্রাম মাল তিরিশ সেকেন্ডে শুয়ে নিল। গলা দিয়ে আরামের একটা আওয়াজ বের করে বললাম, 'এবার এক এক করে তোর কথার জবাব দিচ্ছি। এক নম্বর, ভাল আছি। দু নম্বর টেরিফিক একটা অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে আমেরিকা আর কানাডায় গিয়েছিলাম তাই দেখা পাস নি।'

'স্যার, এই নতুন গাড়িটা কিনলেন বুঝি?'

সেকেন্ড ভাঁড়টা স্টমাকে চালান করে দিতে নার্ভগুলো স্টেডি হয়ে গেল। অ্যাঞ্জেলমার্কা আমার সেই পেটেন্ট হাসিটি হেসে বললাম,'এরকম আরো দশটা লিমুজিন কিনেছি।' বলে একখানা একশ টাকার নোট গৌরহরির হাতে সেট করে দিলাম।

দশটা আর এই ফিয়াটটা—এগারটা ফরেন কারের কথা শুনে গৌরহরির মাথায় চরকি ঘুরে গেল। চোখদুটো পুরোপুরি সার্কল করে এবং ঠোঁট দুটো পাক্কা দশ সেন্টিমিটার ফাঁক করে আমার দিকে স্ট্যাচুর মতো তাকিয়ে রইল সে। আর আমি তার থুতনিতে একটা টুসকি মেরে গাড়িতে স্টার্ট দিলাম।

হঠাৎ কী মনে পড়ে যেতে গৌরহরি চেঁচিয়ে উঠল, 'স্যার, দাম কেটে বাকি টাকাটা ফেরত দিচ্ছি। এক মিনিট দাঁড়িয়ে যান—'

'দিতে হবে না।' আমি অ্যাকসিলারেটরে চাপ দিতেই গাড়িটায় ফিফটি মাইল স্পিড উঠে গেল।

মহাশয়গণ, এবার আমি চলে এলাম লোয়ার সার্কুলার রোডে সেই প্যালেসটায়, প্রতাপরুদ্রগড়ের প্রিন্সেসের জন্য যেটা লিজ নিয়েছি। অনেক দিন বাদে এখানে এসেছি। বাড়িটার দিকে তাকিয়ে আমার মতো হারামী, যে কোনো কারণেই অবাক হয় না, থ মেরে যায় না—সে পর্যন্ত সিনেমার ফ্রিজ শটের মতো ঝাড়া চার পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়ে রইল।

পেঁচো মাকড়া, মানে আগরপাড়ার পঞ্চানন রিয়ালি ম্যাজিক জানে। লাস্ট দু-আড়াই মাসে পড়ো ভাঙাচোরা বাড়িটার চেহারা হানড্রেড পারসেন্ট পাল্টে দিয়েছে। এখন এটা আসল প্যালেস বলে মনে হচ্ছে। রিপেয়ারের পর নতুন পেইন্ট ফেইন্ট লাগিয়ে এমন হাল করেছে, মনে হয়, সত্যিসত্যিই এখানে রাজা ফাজারা থাকে।

পঞ্চানন কাছাকাছি কোথাও ছিল, আমাকে দেখতে পেয়ে দৌড়ে এল। বলল, 'কতক্ষণ এসেছেন?'

বললাম,'বেশিক্ষণ না, কয়েক মিনিট।'

'এখানে দাঁড়িয়ে কেন, ভেতরে চলুন।'

পঞ্চাননের পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে গেট পেরিয়ে, বিরাট সবুজ কার্পেটের মতো লন পেছনে পেলে পোর্টিকোর তলায় চলে এলাম।

মহাশয়গণ, পেঁচো আগরপাড়ার লঝ্‌ঝড় ব্যারাক বাড়িতে থাকলে কী হয়, শ্লা'র পা থেকে মাথা পর্যন্ত একজন আর্টিস্ট। লনটা ভিক্টোরিয়ার আমলের গ্যাসবাতির মতো আলো আর গার্ডেন আমব্রেলা এবং কারুকাজ-করা বেতের ফ্যাশনেবল চেয়ার, সেন্টারটেবল ইত্যাদি দিয়ে সাজিয়েছে। একটা ফোয়ারা বসিয়েছে ঠিক মাঝখানে। গোটাকতক আধান্যাংটো পাথরের পরী যোগাড় করে এখানে ওখানে সেট করে দিয়েছে।

পোর্টিকোর সিলিং থেকে একটা শ্যান্ডেলিয়ার ঝুলছে। আমরা ঝাড়লণ্ঠনের তলা দিয়ে সাদা মার্বেলের এক ডজন সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতেই চার হাজার স্কোয়ার ফিটের প্রকাণ্ড ড্রইং

রুমটা আট ইঞ্চি পুরু দামি পার্সিয়ান কার্পেটে মোড়া। কম করে ভিক্টোরিয়ান স্টাইলের চার ডজন সোফা সেট, সেন্টার টেবল, ছোট সাইড টেবল ইত্যাদি টেরিফিক সাজিয়ে রাখা হয়েছে। এখানে সিলিংয়ে পঙ্খের কাজ রয়েছে। সেখান থেকে অ্যাট লিস্ট আটটা ঝাড়লণ্ঠন ঝুলছে। দেয়ালে রয়েছে নানা টাইপের ল্যাম্প শেড। একধারে জানালার তলা পর্যন্ত গোটা দেওয়াল জুড়ে অ্যাকুয়েরিয়াম।

সিলিং থেকে ঝাড়লণ্ঠনই শুধু না, ঝকঝকে দশটা নতুন ফ্যানও ঝুলছে। দুদিকের দেওয়াল কেটে বসানো হয়েছে চারটি এয়ার কুলার। তা ছাড়া চার দেওয়ালেই সেট করে দেওয়া হয়েছে পেতলের ফ্রেমে বাঁধানো পুরনো স্টাইলের ভিক্টোরিয়ান এজের অয়েল পেইন্টিং।

এরপর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পেঁচো গোটা তেতলা প্যালেসটা আমাকে দেখালো।

গ্রাউণ্ড ফ্লোরের মতো বাকি দুটো ফ্লোরেও রয়েছে আরো দুটো ড্রইং রুম। তা ছাড়া মোট তিনটে ফ্লোরে চব্বিশটা বেডরুম, চব্বিশটা বাথরুম, লবি। বাথরুম আর লবি ছাড়া গোটা বড়িটা পার্সিয়ান কার্পেটে মোড়া। প্রতিটি ঘরের ইন্টিরিয়র ডেকরেশন আলাদা, তবে ফার্নিচার সবই পুরনো স্টাইলের। ওল্ড রাজা-মহারাজাদের প্যালেসের পুরো অ্যাটমসফিয়ারটাই এখানে তুলে এনেছে পেঁচো। ঘুরতে ঘুরতে মনে হচ্ছিল, আমি ক্যালকাটায় নেই, নাইনটিনথ সেঞ্চুরির মধ্যপ্রদেশ কি রাজস্থানের কোনো মহারাজা কি নবাবের প্যালেসে ঢুকে পড়েছি।

শুধু প্যালেসই না, পেছন দিকে বাগান, বাগানের একধারে সার্ভেন্টস এবং শোফার্স কোয়ার্টার্স, কিচেন—এ সবও দেখাল পেঁচো। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কেমন দেখলেন স্যার?'

আমি পেঁচোর নাকে একটা টুসকি মেরে বললাম, 'তুমি শ্লা একটি টেরিফিক হারামী।'

আমার এই 'টেরিফিক হারামী'টা যে আগমার্কা বিশুদ্ধ প্রশংসা সেটা বুঝতে একেবারেই অসুবিধা হয় না পেঁচোর। হলদে হলদে ক্ষয়ে-যাওয়া দাঁতগুলো বের কবে সে বলল, 'কোথাও কোনো খুঁত থেকে গেল কি?'

'মনে তো হচ্ছে না। কত খরচ হল রেনোভেশানে আর ডেকরেশানে?'

চোখ কুঁচকে কয়েক সেকেণ্ড ভেবে টেবে পেঁচো বলল,'লাখ কুড়ি গেছে।'

'নেভার মাইণ্ড। আমি তো ভেবেছিলাম, মিনিমাম পঞ্চাশ লাখ লেগে যাব। তার হাফও তো খরচা করতে পারিস নি।' বলে চোখের কোণ দিয়ে পেঁচোকে দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করলাম, 'হ্যাঁ রে, এই বিশ লাখের ভেতর কিরকম ঝাড়তে পেরেছিস?'

হেঁচকি তোলার মতো আওয়াজ করে পেঁচো বলল, 'গুরু, এটা আপনার নিজের কাজ, এখান থেকে ঝাড়তে গেলে মহা পাপ হবে।'

মহাশয়গণ, পেঁচোও দেখছি যাজ্ঞবল্ক্য বশিষ্ঠদের লিস্টে নাম ঢোকাতে চায়। শ্লা, টাইমটা ব্যাক গিয়ারে কলিযুগ থেকে সত্যযুগে ফিরে যাচ্ছে নাকি? সে যাক গে, আমার কিন্তু মেজাজ একেবারে টকে ছানা কেটে গেল। মাকড়ার চুলের ঝুঁটি খামছে ধরে দাঁত ফাঁত খিঁচিয়ে বললাম, 'শ্লা অনেস্টি দেখাচ্ছ! মওকা করে দিলাম, আর বিশ লাখ থেকে একটা নয়া পয়সাও ঝাড়তে পারলি না! মরবার পর হেভেনে সাত ফুট স্পেস বুক করে রাখতে চাইছিস!'

মহাশয়গণ, আমার এরকম রিঅ্যাকশান হবে পেঁচো ভাবতেই পারে নি। সে দারুণ নার্ভাস

হয়ে তো তো করতে লাগল, 'না না, মানে—'

'মাকড়া, মানে আবার কী রে! জুতিয়ে তোর পাছার হাড় লুজ করে দেব। এ কাজ কি আমার ফাদারের কাজ, না এই টাকা আমার ফাদারের টাকা? এটা জনগণের কাজ, জনগণের ক্যাশ। ওয়ার্ল্ডে সব শ্লা লুটে পুটে ফাঁক করে দিয়েছে, আর উনি পর্বত মুনির বাচ্চা, হাতে এত ক্যাশ পেয়েও কিসসু করতে পারলেন না! তোর শ্লা সুইসাইড করে মরা উচিত।'

মহাশয়গণ, পেঁচো হেভি লজ্জা পেয়েছে, এমন মুখ করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

বললাম, 'যা হবার তা তো হয়েই গেছে। এবার থেকে চান্স পেলেই ক্যাশ ঝেড়ে দিবি। নইলে বাকি লাইফ আগরপাড়ার ওই 'হেল'-এ পচে মরবি। ব্লাডি বাগার কাঁহিকা।'

পেঁচো শপথ নেবার স্টাইলে বলে উঠল, 'এবার থেকে চান্স এলেই মালকড়ি ঝেড়ে দেব।'

'শ্লা ওথ নিলে কিন্তু। এই প্রতিজ্ঞাটি হোল লাইফে একবারও ভুলো না। মনে রোখো চান্স বার বার তোমার হাতে চলে আসবে না।'

'মনে রাখব স্যার।'

'ভেরি গুড।'

কয়েক সেকেণ্ড ভেবে পেঁচো এবার বলল, 'প্যালেসের রেনোভেশন তো হয়ে গেল। এবার কী করতে হবে?'

'চার পাঁচটা গোর্খা আর শিখ দারোয়ান সেট করে দে। তাদের চেহারা ফেহারা যেন টেরিফিক হয়। এইরকম প্যালেসের পক্ষে না মানালে চলবে না। ভাল দামি ইউনিফর্মের ব্যবস্থা করবি। সমাজপতিকে ধরে কয়েকটা রাইফেলের অ্যারেঞ্জমেন্ট করে দেব ওদের জন্যে। আর—'

'আর কী?'

'রাজবাড়ির আটমসফিয়ার তৈরি করার জন্যে বয়-বাবুর্চি থেকে স্টার্ট করে শোফার, এস্টেট ম্যানেজার, এমনি ভেরিয়াস টাইপের এমপ্লয়ি অ্যাপয়েন্ট করতে হবে।'

পেঁচো তক্ষুনি ঘাড় কাত করে সায় দিল, 'ঠিক বলেছেন স্যার, তা না হলে এটা আর প্যালেস হল কী করে?'

বললাম, 'বাইরে থেকে সব লোকজন নেবার দরকার নেই। ফর নাথিং গ্যাঞ্জাম বাধানো। আমাদের আগরপাড়ার ব্যারাক ফ্যারাক থেকেই বেশির ভাগ মালকে ট্রেনিং দিয়ে এখানে লাগিয়ে দেব। যারা এখানে ফিট করবে না, বাইরে থেকে তাদের নেওয়া হবে।'

'স্যার, দুটো কোশ্চেন আছে আমার।'

'বলে ফ্যাল।'

'ফার্স্ট, আগরপাড়ার স্লামে যে সব খজড়ারা রয়েছে তাদের কি প্যালেসে ফিট করা যায়?'

হে হে মহাশয়গণ, পঞ্চানন কারেক্ট বলেছে। বস্তির ওই মালেরা দিনরাত খিস্তি ফিস্তি ঝাড়ছে, বাংলা কি গাঁজা খাচ্ছে। দিনরাত কুকুরের মতো সেখানে খেয়োখেয়ি, হল্লা, ডিসিপ্লিন বলতে কিসসু নেই। প্যালেসে এদের ঢোকালে একেবারে কিচাইন হয়ে যাবে। এটা রিয়েল একটা প্রবলেম। কিন্তু মহাশয়গণ, আপনারা তো জানেনই, আমার কাছে প্রবলেম ফ্রবলেম

বলে কোনো কারবারনেই। ক্রাইসিস দেখা দিলে এক সেকেণ্ডের ভেতর সলিউসানও এসে যায়। এখনও এল। বস্তির যে ক'টা মাল এখানে ফিট করবে রামরতন উপাধ্যায়ের কাছ থেকে ফিল্মের কথা বলে তাদের ট্রেনিং দিয়ে নেওয়া হবে। দু উইকের কমপ্রিহেনসিভ একখানা তালিম দেওয়াতে পারলে শ্লা'রা ঠিক প্যালেসে অ্যাডজাস্ট করে নেবে। বললাম, 'ভাবিস না পেঁচো, ওটার অ্যারেঞ্জমেন্ট করে ফেলব।'

পেঁচো ফেঁচোর মতো মাকড়াদের কাছে আমি একেবারে অলমাইটি গড। ওদের ধারণা, ওয়ার্ল্ডে এমন কোনো কারবার নেই যা আমি পারি না। সব সমস্যা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে পারি। হেভি নিশ্চিন্ত হয়ে পেঁচো বলল, 'যাক, পয়লা ঝামেলাটা মিটল।'

'এবার তোর সেকেণ্ড ঝামেলাটার কথা বল।'

'দু-চারটে দামি গাড়ি ফাড়ি না থাকলে প্যালেস ঠিক মানায় না।'

'কোঈ চিন্তা নেহী। হাফ ডজন লিমুজিন মিলেগা। কবে চাই বলে ফ্যাল—'

'দিন দশেকের মধ্যে পেলে ভাল হয়।'

'ও.কে। পেয়ে যাবি।'

মহাশয়গণ, আপনারা তো জানেনই, নর্থ ক্যালকাটার সেই গ্যারাজওলার সঙ্গে আমার কিরকম দোস্তি। তার কাছ থেকে পাঁচখানা লিমুজিন দেড় দু মাসের জন্যে 'হায়ার' করে নিয়ে আসব। সেই সঙ্গে পাঁচজন শোফার। শোফারদের ভাল ইউনিফর্ম করিয়ে নিতে হবে।

তা ছাড়া, রামরতন উপাধ্যায়ের সঙ্গে কনফারেন্স করে আর কী কী টাইপের এমপ্লয়ি দরকার সব ব্যবস্থা করে ফেলব। মানে আগরপাড়ার মালেদের দিয়ে কাজ না চললে বাইরে থেকে তো লোক অ্যাপয়েন্ট করতে হবে। রামরতন যদি বলেন, নিউজ পেপারে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিয়ে লোক যোগাড় করতে হবে তা-ই করব। জিজ্ঞেস করলাম, 'আর কোনো প্রবলেম?'

একটু চিন্তা করে পেঁচো বলল, 'আপাতত আর কিছু মনে পড়ছে না। পড়লে বলব।'

'অল রাইট।'

'আমি তা হলে এখন যাই।'

'আচ্ছা—' আচমকা কী মনে পড়ে যেতে ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে পেঁচো আস্তে করে ডাকল, 'দাদা—'

আমি তার চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কিছু বলবি?'

'স্রেফ আরেকটা কথা—'

'বলে ফেল মানিক—'

'এত ক্যাশ খরচা করে প্যালেসটা সারালেন, ইনটিরিয়র ডেকরেটর দিয়ে ঘর ফর সাজানো হল, ফরেন কার-ফারও আসবে, অনেক লোকজনকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হবে—'

মাঝখানে তাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, 'তা তো হবে। এতে কিছু গড়বড় আছে?'

'না, মানে—' এখনও সমানে ঘাড় চুলকেই যাচ্ছে পেঁচো।

শ্লা কী বলতে চায়, এবার বুঝতে পারলাম। এত ক্যাশ খসিয়ে খসিয়ে এই বিরাট কারবারটা করার কী দরকার? তার কাঁধে আলতো করে চাপড় মারতে মারতে বললাম, 'আরে বাবা, এই

প্যালেসে একজন রাজকুমারী এসে থাকবে। এখানে তার বিয়ে হবে।'

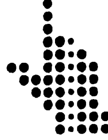
'রাজকুমারী! কোথাকার!'

'প্রতাপরুদ্রগড়ের।'

'সে শ্লা'র জায়গাটা কোথায় স্যার?'

'অত জেনে দরকার নেই। ব্রেনটাকে ফর নাথিং কতগুলো ইনফরমেশনের গোডাউন করে লাভ কী? কোঈ জরুরত নেহী।' বলে, গলায় একটু ব্রেক কষে ফের স্টার্ট করলাম, 'দু উইকের ভেতর প্রিন্সেস এখানে 'ইন' করবে। তখনই সব জানতে পারবি। এখন আর এ সব নিয়ে ভেবে রাতের ঘুমটা কিচাইন করিস না। ও.কে?'

পেঁচোকে আর কোনো কথা বলার চান্স না দিয়ে আমি সট করে হড়কে গেটের বাইরে বেরিয়ে ফিয়াটে উঠেই স্টার্ট দিলাম।



গাড়িটা গড়িয়াহাটের অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের গ্যারাজে পুরে দিয়ে আরো আড়াই শ গ্রাম ধ্যান্যেশ্বরী স্টমাকে স্টক করে এস-বাসে চড়ে স্ট্রেট চলে এলাম শিয়ালদায়। সেখান থেকে আগরপাড়া।

প্রথমেই কিন্তু ব্যারাকে গেলাম না, পবিত্র খালসা হোটেলে নগদ আড়াই টাকায় রোটি-তড়কার একখানা দুর্ধর্ষ প্রোলেটারিয়েট ডিনার চুকিয়ে তারপর গেলাম।

রাত খুব একটা বেশি হয় নি। দশটা পনের। নিজের ঘরে ঢুকে শার্ট-ট্রাউজার্স ছেড়ে বডিতে একটা লুঙ্গি চড়িয়ে আমার সেই পার্মানেন্ট অনন্তশয্যায় এসে পা ছড়িয়ে বসলাম।

ঘরের এক কর্নারে হেরিকেন জ্বলছে। ওটা সান-ডাউনের পর থেকেই জ্বলে। কনকচাঁপা কি সুমনা জ্বালিয়ে দিয়ে যায়।

বিছানার কাছেই একটা সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই পড়ে আছে। মহাশয়গণ আপনারা তো জানেনেই, সোনার বাংলা ছাড়া আমি আর কিছুরই তপস্যা করি না। নেশা বলতে আমার কাছে ওই একটাই। তবে আজ একটা সিগারেট খেতে ইচ্ছে হল। প্যাকেট থেকে একটা বার করে ধরিয়ে নিয়ে সবে একটি টান দিয়েছি, সুমনা ঘরে ঢুকল।

মহাশয়গণ, সুমনার জন্যই ওয়েট করছিলাম। আজ তার সঙ্গে একটা আর্জেন্ট কনফারেন্স রয়েছে। বিছানার একটা কোণ দেখিয়ে বললাম, 'বোসো।'

সুমনা তিন ফুটের মতো একটা ডিসটান্স রেখে আমার মুখোমুখি বসল। তার পরনে এই মোমেন্টে একটা অর্ডিনারি শাড়ি আর ব্লাউজ। তবু তাকে টেরিফিক দেখাচ্ছে। লাস্ট দু'মাসে নানা টাইপের ট্রেনিং নিয়ে সুমনার চেহারায় দারুণ একটা পালিশ এসে গেছে। এখন দেখলে কে বলবে, একদিন মাঝরাতে পুলিশের তাড়া খেয়ে পার্ক স্ট্রিটের পাশের এক গলিতে ভীতু

ইঁদুরের মতো সে দাঁড়িয়ে ছিল।

স্ট্রেট সুমনার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'তোমার ট্রেনিং কিরকম চলছে?'

মহায়গণ, কিরকম চলছে, সে খবর আপনারা জানেন। কারণ আজ হোল ক্যালকাটা ঘুরে ঘুরে এ ব্যাপারে আমি প্রচুর খোঁজ নিয়েছি। তবু কথাবার্তা বলতে গেলে একটা জায়গা থেকে তো স্টার্ট করতে হবে।

সুমনা আগে আমার সঙ্গে কথা বলার সময় দারুণ আড়ষ্ট হয়ে থাকত। ভয় লজ্জা নার্ভাসনেস সব মিলিয়ে থুতনি তুলে কথাই বলতে পারত না। কিন্তু এখন আর নার্ভাসনেস ফেস কিসসু নেই, দুর্ধর্ষ স্মার্ট হয়ে গেছে সে। আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'স্মুদলি। কিন্তু—'

'কী?'

'একটা ব্যাপার আমার মাথায় ঢুকছে না।'

'কী সেটা?'

'আমাকে প্রিন্সেস বানাতে চাইছেন কেন?'

'ওটা আমার একটা চ্যালেঞ্জ।' বলে ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে মিস্টিরিয়াস একটু হাসলাম।

মহাশয়গণ, আমার মাথায় প্ল্যানিং কমিশনের যে হেড কোয়ার্টার্স সব সময় চালু সেখানে সুমনাকে রাজকুমারী বানাবার পেছনে কী পারপাস আছে সেটা আপনাদের জানিয়েছি কিন্তু ছুকরি এখনও জানে না। তবে টাইম হয়ে গেছে, এবার আর না জানালেই নয়।

সুমনা জিজ্ঞেস করল, 'কিসের চ্যালেঞ্জ?'

'এখনই শুনতে চাও?'

'হ্যাঁ!

'তোমাকে রাজা-মহারাজাদের মতো ক্যাশওলা একটা ফ্যামিলিতে সেট করতে চাই।'

ঠোঁট দুটো আড়াই ইঞ্চি ফাঁক করে সুমনা তাকিয়ে রইল পাক্কা দু মিনিট। তারপর বলল, 'মানে?'

'আমি তোমাকে রয়াল ফ্যামিলির মতো একটা ফ্যামিলিতে বিয়ে দিতে চাই।'

টেরিফিক চমকে উঠল সুমনা, 'বিয়ে!'

'ইয়েস। সেই জন্যে একটু একটু করে তোমাকে তৈরি করছি।'

মহাশয়গণ, সুমনার মুখের ওপর দিয়ে নানা টাইপের কালার আর এক্সপ্রেসান ঢেউয়ের মতো খেলে যেতে লাগল। বলল, 'আমার বিয়ের জন্যে এত সব কাণ্ড করছেন?'

আমি ঘাড়টা কয়েক সেন্টিমিটার বাঁ দিকে হেলিয়ে দিলাম।

'কেন?'

'এই ওয়ার্ল্ডকে আমি একটা ম্যাজিক দেখাতে চাই।'

'কিসের ম্যাজিক?'

'যে কোনো মেয়ে রাজকুমারী আর যে কোনো ছেলে রাজকুমার হতে পারে। যে কেউ ওয়ার্ল্ডের একেবারে বটম থেকে টপমোস্ট প্লেসে উঠে আসতে পারে। শধু—'

'শুধু কী?'

'এথী দরকার।' বলে বুড়ো আঙুল আর তর্জনী দিয়ে টাকা বাজাবার ভঙ্গি করলাম,'আর যারা তোমাকে রাত্তির বেলা পার্ক স্ট্রিটের হেল-এ নিয়ে তুলেছিল তারা যাতে তোমাকে দেখলে স্যালুট করে তার অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে চেয়েছি।'

'আমি তা হলে একটা গিনিপিগ!' আমার চোখ থেকে চোখ সরাল না সুমনা, তাকিয়েই রইল।

মহাশয়গণ, আমি যে একটি থার্ড ক্লাস ফোরটোয়েন্টি, একজন উৎকৃষ্ট চীট—কেউ হাঁ করলে স্টমাকের বটম পর্যন্ত দেখতে পাই, সেই আমি পর্যন্ত কয়েক সেকেণ্ড থ হয়ে রইলাম, তারপর ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে বললাম, 'মানে?'

'দু হাতে টাকা খরচ করে আমাকে নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করতে চান? যেভাবে সায়েন্টিস্টরা ল্যাবরেটোরিতে করে?'

মার্ক করলাম, সুমনার গলা এতটুকু কাঁপছে না। স্টিলের তারে টোকা মারলে যেরকম হয় তার ভয়েসটা হুবহু সেইরকম টান টান আর শুদ্ধু বাংলায় যাকে তীব্র বলে তা-ই মনে হচ্ছে। সে কী বলতে চায়, এবার আমার কাছে ক্লিয়ার হয়ে গেছে। বললাম, 'ধরে নাও তা-ই। আমাকে তুমি একজন সোসাল সায়েন্টিস্ট ভাবতে পারো।'

'তা না হয় ভাবলাম। কিন্তু—'

'কী?'

'আপনি আমার এত বড় ক্ষতি করতে চাইছেন কেন?'

এতক্ষণ গলাটা টান টান শোনাচ্ছিল সুমনার। এবার সেটা কাঁপতে লাগল। প্রতিমা টাইপের টানা টানা চোখ দুটো আস্তে আস্তে জলে ভরে উঠছে তার।

মহাশয়গণ, আপনারা তো জানেনই, আমার মতো আরেকটি খজড়া আর কোথাও খুঁজে পাবেন না। ওয়ার্ল্ডের কোনো কিছুতে আমি ঘাবড়াই না, ভয় পাই না কিন্তু চোখের জল ফল দেখলে আমার পেটে ডিসেন্ট্রির পেইন শুরু হয়ে যায়। সেন্টিমেন্ট, ইমোশান—এই সব ব্যাপারগুলোর কোনো মিনিংই নেই আমার কাছে। টেরিফিক ভড়কে গিয়ে বললাম, 'অ্যাই অ্যাই, কাঁদছ কেন?'

সুমনা উত্তর দিল না, দুই ঠোঁটে স্টিকিং গাম লাগিয়ে চুপচাপ বসে রইল। বাটকখানা হেঁচড়ে হেঁচড়ে সুমনার দিকে এক ফুট এগিয়ে গেলাম, 'তোমার কোনো ক্ষতি আমি করি নি। যে বাড়িতে তোমার বিয়ের প্ল্যান করেছি তারা ফোর্ড রকফেলার টাইপের বড়লোক। হেভি সুখে থাকবে।'

আচমকা রিভোল্ট করে যেন বোমা ফাটালো সুমনা, 'সুখ চাই না, চাই না।' বলে দুই হাঁটুর ফাঁকে মুখ গুঁজে দিল।

মহাশয়গণ, মেয়েমানুষের কারবারে আমি কোনোদিনই নেই। যুবতী ছুকরিরা কান্নাকাটি বাধিয়ে দিলে কী করে শালীদের ট্যাকল করতে হয়, আমার জানা নেই। তবু একটা আন্দাজ ফান্দাজ করে তার মাথায় হাত বুলোতে বুলাতে বললাম, 'তোমার মতো মাল তো আগে দেখি নি। লোকে সুখের জন্যে শ্লা জান লড়িয়ে দিচ্ছে, আর তুমি তা চাও না!'

'না, চাই না, চাই না—' একবগ্‌গা বাচ্চা মেয়েদের মতো সমানে মাথা ঝাঁকাতে লাগল সুমনা।

'তবে কী চাও?'

সুমনা হাঁটুর ফাঁক থেকে মুখ না তুলে বলতে লাগল, 'এ বিয়ে আপনি ভেঙে দিন।'

বলে কী ছুকরি! এই বিয়েটা হল তিরিশ চল্লিশ লাখ টাকার একটা বিরাট প্রোজেক্ট। তার মধ্যে লাখ কুড়ি বাইশ অলরেডি খরচা হয়ে গেছে। তা ছাড়া এটা আমার একটা চ্যালেঞ্জও। সামতানি নামে যে হারামীটা সুমনাকে ব্রথেলে নামিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, আমি সেখান থেকে তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে সামতানির ঘরের গৃহলক্ষ্মী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে দিতে চাই। এখন ছুঁড়িটা ব্যাগোরবাঁই করলে আমার টোটাল প্ল্যানটাই আপসেট হয়ে যাবে। বললাম, 'এ সব বলতে নেই।'

'না না না—' গ্র্যান্ডফাদার ক্লকের পেণ্ডুলামের মতো সুমনার মাথাটা ডাইনে বাঁয়ে একটানা নড়তে লাগল।

মাল্টি-মিলিয়ন রুপিজের বিয়েটা ফাইনাল স্টেজে প্রায় চলে এসেছে। মহাশয়গণ, আপনারা তো জানেনই, কোনো একটা প্ল্যান করলে সেখান থেকে হড়কে বেরিয়ে যাওয়ার কথা আমি ভাবতে পারি না। বললাম, 'বিয়েটা ভাঙতে চাও কেন?'

এবার সট করে হাঁটুর ফাঁক থেকে মুখ তুলল সুমনা। তার দু চোখ দিয়ে উগ্রী ফলস বয়ে যাচ্ছে। সে ভারি স্যাঁতসেঁতে গলায় বলল, 'আপনি বোঝেন না, কী জন্যে ভাঙতে চাই—'

মহাশয়গণ, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, মালটা কী বলতে চায়। এর আগেও নানাভাবে এ ব্যাপারে সিগনাল দিয়েছে সে। কিন্তু আগেই তো আপনারা জেনে গেছেন 'ম' দিয়ে যে সব ওয়ার্ডের শুরু, তার ভেতর মেয়েমানুষটা থেকে আমি দেড় হাজার কিলোমিটার দূরে থাকি। কিন্তু এই মেয়েটা আমাকে অনেক দিন থেকেই ক্যাঁচাকলে ফেলতে চাইছে। কিন্তু তাতে পা ঢোকাবার মতো চীজই নাই আমি।

মহাশয়গণ, বিয়ের ব্যাপারে এখন যদি টানা-হেঁচড়া করতে যাই, সুমনা ডেফিনিটলি বিগড়ে যাবে। শুভ কাজে সবসময় একটা না একটা ঝামেলা জুটে যায়ই। তবে আমি পিটার স্বয়ম্ভু হোড়—একজন থার্ড ক্লাস চীট, একটি উৎকৃষ্ট খচ্চর—আমাকে রোখা কি এতই সোজা। মাখনের ভেতর দিয়ে যেভাবে ছুরি চলে যায় ঠিক সেইভাবে আমি কেটে বেরিয়ে যেতে পারি। এখন বিয়ে ফিয়ে নিয়ে ভ্যানভাড়া না করে অন্য লাইনে চলে যাওয়া ভাল। তারপর কিছু ট্যাকটিকস বার করে সামতানির ছেলের কাঁধে ওকে ঠিক সেট করে দেব।

মহাশয়গণ, আপনাদের এক লাখ সাতাশি হাজার বার জানিয়েছি, আমার ব্রেনে যে কম্পিউটরটা আছে, তাতে সারাক্ষণ ব্যাটারি চার্জ করা থাকে। কী করে সামতানির ছেলের সঙ্গে সুমনাকে জুড়ে দেব, সেটা ফ্ল্যাশ মেরে গেল। বললাম, 'ঠিক আছে, তুমি যখন চাও না তখন আর এ বিয়ে নিয়ে আমি এগুচ্ছি না।'

চোখ জলে বোঝাই, তার ভেতর তারাদুটো ঝিলিক দিয়ে উঠল। থুতনির তলা থেকে কপালের বাউণ্ডারি লাইন পর্যন্ত পুরো ম্যাপটায় লোড-শেডিংয়ের পর আলো ফুটে উঠল তার গালে। চোখের ঘন ম্যাজেন্টা কালার আচমকা হাই পাওয়ারের বাল্ব জ্বলার মতো টেরিফিক একখানা হাসি ছড়িয়ে গেল। তারপর ঘন ম্যাজেন্টা কালার ফুটে উঠল তার গালে। চোখের

কোণ দিয়ে আমাকে দেখতে দেখতে সুখে খুশিতে লজ্জায় যেন গলে গলে যেতে লাগল সুমনা। মহাশয়গণ, ওগুলো কিসের সিম্পটম আপনারা ভালই জানেন।

মেয়েমানুষের এই সব কারবার দেখলে আমার হার্টের প্যালপিটিশন দশ গুণ বেড়ে যায়। কিন্তু কী আর করা, এখন ভুল চাল ফাল দিলে আমার প্ল্যানটা কিচাইন হয়ে যাবে।

এদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ছুকরির বডিতে খুব সম্ভব কেমিক্যাল রিঅ্যাকশান হয়ে গেল। সট করে এগিয়ে এসে আমার বুকে মুখ গুঁজে ঘষতে ঘষতে গাঢ় গ্যারগেরে গলায় বলতে লাগল, 'অন্য জায়গায় বিয়ে হলে আমি মরে যাব।'

মহাশয়গণ, মেয়েমানুষের, বিশেষ করে ইয়াং গার্লদের ছোঁয়া যে এর আগে পাই নি তা নয়। কিন্তু এভাবে আমার চামড়ায় কেউ অ্যাডহেসিভের মতো লেপ্টে যায় নি। আমার প্রতিটি রোমকূপের গোড়া দিয়ে বিন বিন করে ঘাম ছুটতে লাগল। আপনারা জানেন, আমি ড্রাংকার্ড হতে পারি, চীট হতে পারি, ফোরটোয়েন্টি হতে পারি কিন্তু টোয়েন্টি-টু ক্যারেট গোল্ডের মতো ব্রহ্মচারী। বশিষ্ঠ জামদগ্নির লাইনের লোক। আমার গা থেকে ঠেলে ঠেলে সুমনাকে আলগা করে আবার তিন ফুট দূরে বসিয়ে দিতে দিতে বললাম, 'এভাবে আমার বডির ওপর ডাইভ দিও না। ভীষণ সুড়সুড়ি লাগে।'

আদুরে গলায় আস্তে করে সুমনা বলল, 'লাগুক।'

মহাশয়গণ, যে প্ল্যানটা এক মিনিট আগে আমার মাথায় ফ্ল্যাশ মেরেছে, এবার সেটা বলে ফেলা ভাল। কেননা আমার হাতে টাইম খুব বেশি নেই। সামতানির বাচ্চা লণ্ডন চলে যাবে। তার আগেই শুভকর্মটা চুকিয়ে ফেলা দরকার। বললাম, 'তোমাকে একটা আর্জেন্ট খবর দেওয়া হয় নি। একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম।'

'কী খবর?'

'আমি একটা ফিল্ম কোম্পানি স্টার্ট করেছি।'

টেরিফিক উৎসাহে সুমনা জিজ্ঞেস করল, 'তাই নাকি? কবে?'

বললাম, 'মাসখানেক হল।'

'সিনেমা তুলবেন?'

'ডেফিনিটলি।'

'হিন্দি ছবি?'

'ডাবল ভারসান।'

'আরে বাবা, দারুণ ব্যাপার তো।'

বললাম, 'আরো একটা দারুণ ব্যাপার আছে। সেটা তোমার জন্যে—' বলে ডিপ্লোম্যাটদের মতো হাসতে লাগলাম।

ঠোঁট দুটো কয়েক সেন্টিমিটার ফাঁক করে এবং চোখের পাতা একবারও না ফেলে আমার দিকে তাকিয়ে রইল সুমনা। ভীষণ অবাক হয়ে বলল, 'আমার জন্যে!'

'রাইট।'

'কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'এখুনি বুঝিয়ে দিচ্ছি। এই যে তোমাকে হিন্দি শেখাচ্ছি, স্পোকেন ইংলিশ শেখাচ্ছি, প্রিন্সেস হবার জন্যে রামরতন উপাধ্যায়ের কাছে তালিম নিতে পাঠাচ্ছি—এসবের পেছনে রিজনটা কী?'

আস্তে আস্তে মাথা ঝাঁকিয়ে হতভম্বের মতো সুমনা বলল, 'জানি না তো—'

'তোমাকে আমার ফার্স্ট পিকচারের হিরোইন করতে চাই।'

আমি যেন বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায় না, হিব্রু গ্রিক বা সোয়াহিলি ল্যাংগুয়েজে কথা বলছি, আর তার একটি অক্ষরও ব্রেনে ঢুকছে না, এমন ভবে তাকিয়ে রইল সুমনা।

আমি আবার বললাম, 'সেই জন্যেই তোমাকে তৈরি করে নিচ্ছি। আমার ছবির গল্পটা এক রাজকুমারীকে নিয়ে। সেই রোলে তোমাকে নামতে হবে।'

'আ-আ-মি, আ-আ-আ-মি—' তোতলাতে শুরু করে শেষ পর্যন্ত সামলে নিয়ে নরমাল গলায় সুমনা বলল, 'আমি কি কোনোদিন অ্যাক্টিং করেছি? ওসব আমি পারব না।'

'আরে বাবা—' আমি বলতে লাগলাম, 'কেউ কি মায়ের পেট থেকে মাটিতে ল্যাণ্ড করেই অ্যাক্টিং করতে শেখে! ওয়ার্ল্ডে এত এত ছুঁড়ি রোজ কয়েক শো ল্যাংগুয়েজে ফিল্মে অভিনয় করছে। তুমিও ঠিক পেরে যাবে। নার্ভাস হয়ো না।'

'কিন্তু—'

'কী?'

'রেখা শ্রীদেবী ডিম্পল মীনাক্ষী শাবানা—এই সব ফেমাস সুপার স্টাররা থাকতে আমার মতো একটা বস্তির মেয়েকে হিরোইন করতে চাইছেন কেন?'

'কেউ প্রথমেই ফেমাসও থাকে না, সুপার স্টারও হয় না। সবাই আননোন অবস্থায় স্টার্ট করে। তারপর চান্স পেয়ে পেয়ে, অ্যাক্টিং করতে করতে ফেমাস হয়ে যায়, মাটি ফুঁড়ে সুপাব স্টার গজায় না। আমার ধারণা—'

'কী?'

'তুমি যদি এ লাইনে স্টিকিং গামের মতো লেগে থাকো একদিন এলিজাবেথ টেলর, সেফিয়া লোরেন, ইনগ্রিড বার্গম্যানদের নাকে ঝামা ঘষে দিতে পারবে।' মহাশয়গণ, গলায় বাটার লাগিয়ে ডায়লগগুলো ঝেড়ে সুমনার রি অ্যাকশান মার্ক করতে লাগলাম।'

যা ভেবেছিলাম তা-ই, সুমনা কাত হয়ে গেল। হে হে মহাশয়গণ, সিনেমায় চান্স পাবার কথা শুনলে মর্গের ডেড বডিও লাফিয়ে উঠে পড়বে। সুমনা বলল, 'কোথায় সোফিয়া লোরেন, এলিজাবেথ টেলররা, আর কোথায় আমি! কী যে আপনি বলেন না!'

'একবার শুধু নেমে যাও, তারপর দেখা যাবে তুমি কোথায় আর ওরা কোথায়। ও. কে, তা হলে ওই কথাই রইল।'

'মনে রাখবেন আপনার টাকাগুলো কিন্তু স্রেফ জলে যাবে।'

'আমার টাকা! সবই জনগণের ক্যাশ। তুমি এ ব্যাপারে ভেবে ভেবে ব্রেনের বারোটা বাজিয়ে ফেলো না।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর সুমনা জিজ্ঞেস করল, 'ছবিটার ডাইরেকশান কে দেবে?'

নিজের বুকে আঙুল ঠেকিয়ে বললাম, 'এই পিটার স্বয়ম্ভু হোড়—'

'আপনি!'

'ইয়াস ম্যাডাম—'কুর্নিশ করার স্টাইলে মাথা ঝুঁকিয়ে বললাম, 'দেখো এই এক ছবিতে তুমি আমি দু'জনেই একসঙ্গে ওয়ার্ল্ড ফেমাস হয়ে যাব। কোনো শ্লা, আমাদের রুখতে পারবে না।'

স্লাইট ভেবে টেবে সুমনা জিজ্ঞেস করল, 'এখন তা হলে আমাকে কী করতে হবে?'

'ডে অ্যান্ড নাইট, চলতে-ফিরতে, উঠতে বসতে, খেতে-ঘুমোতে, এমন কি কুলকুচি করা, শাড়ি পাল্টানো, গায়ের ঘাম মোছা—সব ব্যাপারেই তোমাকে ভাবতে হবে, তুমি একজন প্রিন্সেস। এই ক্যারেক্টারটার ভেতর তোমাকে টোটালি 'ইন' করে যেতে হবে।'

'কিন্তু—'

সুমনা কী বলতে চায়, বুঝতে আমার একটি সেকেন্ডও লাগল না। হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, 'আগরপাড়ার এই থার্ড ক্লাস স্লামে থেকে নিজেকে প্রিন্সেস ভাবা যায় না—তাই তো?'

ঘাড় হেলিয়ে সুমনা বলল, 'হ্যাঁ।'

'তার জন্যে একটা অ্যাটমসফিয়ার দরকার?'

'হ্যাঁ।'

'সে অ্যারেঞ্জমেন্টও করে ফেলেছি।'

'কি রকম?'

'দু উইক পর তুমি একটা রিয়াল প্যালেসে গিয়ে থাকবে।'

'প্যালেস! সেটা কোথায়?'

মহাশয়গণ, খজড়ীটা বলে কি শুনুন! আপনারা তো জানেন, আমি স্রেফ হাওয়া দিয়ে একটা তাজমহল কি আইফেল টাওয়ার বানিয়ে ফেলতে পারি। আর একটা রাজপ্রাসাদ জোটাতে পারব না! মিস্টিরিয়াস হেসে টাকা বাজাবার মুদ্রা দেখিয়ে বললাম, 'এথী থাকলে প্যালেস তো কোনো ব্যাপারই না, আকাশ থেকে চাঁদ পেড়ে এনে দিতে পারি। সে যাক, কাল বিকেলে আমার সঙ্গে একটু বেরুতে হবে।'

'আচ্ছা—'বলেই কী ভেবে একটু চুপ করল সুমনা। তারপর ফের বলল, 'কিন্তু—'

'কী?'

'কাল আমার স্পোকেন হিন্দির ক্লাস আছে।'

'কাল হিন্দি বাদ দাও। আমি চৌবেজিকে ফোন করে জানিয়ে দেব। কাল চারটে দশের ট্রেন ধরে শিয়ালদা চলে যেও। এনকোয়ারি অফিসের সামনে ওয়েট করবো। ওখান থেকে তোমাকে ক্যাচ করে নেব।'

'আচ্ছা। কিছু দরকার আছে?'

'আছে। কালই তা জানতে পারবে।' বলে একটা হাই তুললাম। তারপর বাঁ হাতের কব্জিটা উল্টোতেই চোখে পড়ল, রাত এখন বারোটা। টেরিফিক ঘুম পাচ্ছে কিন্তু মার্ক করলাম, সুমনার

উঠবার লক্ষণ নেই। চোখের তারা দুটো মিস্টিরিয়াস করে, ঘাড় স্লাইট হেলিয়ে, আমার দিকে তাকিয়ে আছে সে। মহাশয়গণ, ছুকরির সিম্পটমগুলো খুব খারাপ। কথাবার্তা যা হবার তা তো হয়েই গেছে। এবার কোথায় চলে যাবে তা নয়। বাটকখানা আমার বিছানায় সেট করে বসেই আছে, বসেই আছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার ঘুম পাচ্ছে না?'

'না।'

'রাত বারোটা কিন্তু বাজে।'

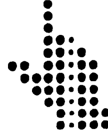
'বাজুক।' গলার স্বরটা কেমন যেন চাপা আর হাস্কি শোনালো সুমনার।

আর আমার বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা কয়েক সেকেন্ড ফ্রিজ হয়ে থেকে, তারপরেই দুর্দান্ত স্পিডে লাফাতে লাগল। শালীর ধান্দাটা কী? বাকি রাতটা এখানেই কাটাতে চায়? মহাশয়গণ, আমি চীট, ফোরটোয়েন্টি হতে পারি কিন্তু একজন উৎকৃষ্ট ব্রহ্মচারীও। সেটা আপনারা ডেফিনিটলি অ্যাডমিট করবেন। এই বয়সে আমার ক্যারেক্টারের বারোটা বাজলে, আমি আর বাঁচব না। নির্ঘাত ফিনিশ হয়ে যাব। বললাম, 'আমার কিন্তু ঘুম পাচ্ছে। এবার হড়কে যাও তো চাঁদু।'

জড়ানো চটচটে গলায় সুমনা বলল, 'আপনার সঙ্গে কথা বলার সময়ই হয় না। আজ যখন হয়েছে থাকি না আরেকটু—'

'আমি আর বসে থাকতে পারছি না। এখন নিজের ঘরে গিয়ে নিজের বেডে বডি ফেলে দাও গিয়ে। কাল বিকেলে তো দেখা হচ্ছেই, তখন চুটিয়ে প্রাণের কথা বলো। ওঠ—উঠে পড়—'

এর পর আর বসে থাকা যায় না। দারুণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও হাতে ভর দিয়ে বডিটা টেনে তুলে উঠে পড়ল সুমনা।



পরের দিন সারাটা সকাল বিছানাতেই কাটিয়ে দিলাম। মোড়ের দোকান থেকে চা-ফা দিয়ে গিয়েছিল। শুয়ে শুয়ে তা খেলাম।

তারপর বেলা চড়লে, সূর্য যখন স্ট্রেট মাথার ওপর চলে আসার তাল করছে সেই সময় বডিটা তুলে শেভ করে এবং স্নান ফান চুকিয়ে দুর্ধর্ষ একটি সাফারি স্যুট চড়িয়ে চলে গেলাম পবিত্র খালসা হোটেলে। সেখান থেকে লাঞ্চ খেয়ে গেলাম রেল স্টেশনে। টিকিটটা সবে কেটেছি, কলকাতার ট্রেন এসে গেল।

আমার যা রুটিন, শিয়ালদায় নেমে সোজা চলে এলাম গড়িয়াহাটার অ্যাপার্টমেন্টে। সেখানে 'ইন' করতে না করতেই ফোন বেজে উঠল। ধীরে সুস্থে সোফায় বসে ফোনটা তুলে কানে ঠেকিয়ে 'হ্যালো' বলতেই সমাজপতির ভয়েস ভেসে এল।

'কে, স্বয়ম্ভু?'

'হ্যাঁ, স্যার—'

'তোমাকে একটা জরুরি খবর দিচ্ছি—' সমাজপতির গলার স্বরটা চাপা, প্রায় ফিসফিসের মতো শোনালো।

জিজ্ঞেস করলাম, 'কী খবর স্যার?'

'সেই জিনিসগুলো বেলেঘাটার আশ্রমে সরিয়ে দিয়েছি।'

প্রথমটা বুঝতে পারলাম না কোন জিনিসগুলোর কথা বলছেন সমাজপতি। বললাম, 'কিসের কথা বলছেন?'

'ফোনে বলা ঠিক নয়। কেউ আড়ি পেতে টেপ করে নিচ্ছে কিনা গ্যারান্টি তো নেই।' সমাজপতির গলা আরো খাদে ঢুকে গেল, 'ওই যে কাল তোমাকে যেগুলোর কথা বললাম—'

এবার ক্যাচ করে ফেললাম। মাকড়া ব্ল্যাক মানির কথা বলছে। মহাশয়গণ, হারামীটা ইনকাম-ট্যাক্স রেইডের ভয়ে কিরকম ঘাবড়ে গেছে দেখুন। কাল আমার সঙ্গে কথা বলার পরই ক্যাশ সরিয়ে ফেলেছে। বললাম, 'কখন ওখানে পাচার করলেন?'

'মিড নাইটে।'

'ফাইন। কিভাবে সরালেন?'

'টিনের পেটিতে করে।'

'কত পেটি?'

'বাইশটা।'

'টোটাল মাল কিরকম হবে?

'আটাশের মতো?'

'লাখ?'

'না না লাখটা কোনো প্রবলেমই না। ক্রোর—'

আমার মাথায় বাইশটা গ্যাস টারবাইনের মেশিন একসঙ্গে পাক খেয়ে গেল। বললাম, 'এত মাল জমিয়ে রেখেছিলেন!'

গুজ গুজ করে একটু হাসলেন সমাজপতি, 'ওটা এমনই একটা ব্যাপার, শুধু জমতেই থাকে, জমতেই থাকে। দশ হাতে উড়িয়েও শেষ করা যায় না। হে-হে—'

আমিও হুবহু সমাজপতির ইমিটেশান করে 'হে-হে' করলাম। তারপর বললাম, 'আশ্রমের যে জায়গাটায় বলেছিলাম সেখানেই রেখেছেন তো?'

'অফ কোর্স।'

'এক ব্যাটেলিয়ান সন্ন্যাসী ওখানে বসে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স ভজন গায় না?'

'হ্যাঁ।'

'ভজনের স্ট্রেন্থ আরেকটু বাড়িয়ে দিন। ওটা দু ব্যাটেলিয়ান করে দিন। এক সেকেন্ডের জন্যেও যেন ভজন না থামে।'

'ঠিক আছে।'

'মালটা একেবারে স্বয়ং ভগবানের কাস্টোডিতে রয়ে গেল। ওটা নিয়ে আপনার আর ভাবনা

নেই। আবার নতুন এনার্জিতে ব্লাক মা—স্যরি—মাল জমাতে শুরু করুন। এখন তা হলে ফোনটা রাখি?'

'রাখবে? আচ্ছা রাখো।'

কিছুদিন ধরে মহাশয়গণ, আমার একটা ব্যাড হ্যাবিট হয়ে যাচ্ছে। দুপুরবেলা কাজকর্ম না থাকলে আগরপাড়া থেকে এসেই গড়িয়াহাটার এই ফ্ল্যাটে ঢুকে বডি ফেলে দিই, ঘন্টা দুই তিন তোফা একটা ঘুম লাগাই।

ফোনটা রেখে সাফারিটা বডি থেকে নামিয়ে ওয়ার্ডরোবে রেখে দিলাম। তারপর একখানা সিল্কের লুঙ্গি এবং গেঞ্জি চড়িয়ে বিছানায় টান হয়ে পড়লাম। এখন ঘড়িতে পৌনে দুটো। চারটে পর্যন্ত লম্বা একটি ঘুম লাগিয়ে শিয়ালদা যাব।

কিন্তু মহাশয়গণ, আমার এই মুহূর্তের প্ল্যানটা আপসেট হয়ে গেল। আবার শ্লা ফোনটা কুর কুর করে উঠল। টেরিফিক খচে গিয়ে শেষ পর্যন্ত ওটা তুলে নিয়ে বললাম, 'হ্যালো—'

ওধার থেকে আধ-চেনা একটা গলা শুনতে পেলাম, 'কে, পিটার স্বয়ম্ভু হোড় নাকি?'

'হ্যাঁ। আপনি?'

'আমি প্রভু জগৎপতি। বেলেঘাটা আশ্রম থেকে বলছি।'

জগৎপতি অনেকদিন পর আমাকে ফোন করলেন। মাকড়াকে ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট পাইয়ে দিয়েছি, তা ছাড়া ডোরাকে তার ওখান সেট করে ফেলেছি। ইন্ডিয়ান 'ইয়াগো' আর ধর্ম যে টেরিফিক সেলেবেল প্রোডাক্ট তার টেস্ট পেয়ে গেছে জগৎপতি। তার ফরেন শিষ্য ফিষ্যর সংখ্যা এখন কয়েক হাজার। ইওরোপ আমেরিকা ফার-ইস্ট কানাডা থেকে রোজই ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ তার আশ্রমে হানা দিচ্ছে এবং মাকড়া পটাপট তাদের শিষ্য বানিয়ে ফেলছে।

এতকাল যে সব ইন্ডিয়ান তান্ত্রিক ফান্ত্রিকরা ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট কবজা করে ফেলেছিল লর্ড জগৎপতি তাদের হেভি কমপিটিটর হয়ে উঠেছেন। আন্তর্জাতিক সুপারমার্কেটে আরো বিরাট আকারে 'ইন' করার জন্য আমি তাঁকে একটা ব্লু-প্রিন্ট করে দিয়েছি। বেলেঘাটা আশ্রমকে হেড কোয়ার্টার্স বানিয়ে ওয়ার্ল্ডের দিকে দিকে ভারতীয় ফিলজফি আর ইয়াগোর ব্রাঞ্চ খুলতে হবে। ঠিক করা আছে, অভ্যুদয়কে ইলেকশানটা পার করিয়ে দেবার পর জগৎপতির কেসটা হাতে নেব। হে হে মহাশয়গণ, ইলেকশান হয়ে যাবার পর আমি কোথায় থাকব আর জগৎপতিই বা কোথায় থাকবে, সেটা শুধু আমিই জানি। না না, এখন আপনারা কিউরিওসিটি দেখাবেন না। অ্যাডভান্স প্ল্যানিং যা করে রেখেছি, সেটা আপাতত জানাচ্ছি না। আপনারা শুধু মার্ক করে যান, আস্তে আস্তে সব জানতে পারবেন।

ফোনের গায়ে মুখ ঠেকিয়ে বললাম, 'বলুন প্রভু, আপনার জন্যে কী করতে পারি?'

জগৎপতি বললেন, 'আমি একটা প্রবলেমে পড়েছি।'

'কী?'

সমাজপতিরা তাঁর ওখানে যে কোটি কোটি ব্ল্যাক টাকা নিয়ে রেখে এসেছে সেই খবরটা দিয়ে জগৎপতি এবার বললেন, 'সি. বি, আই আর ইনকাম ট্যাক্সওলারা যদি এখানকার খবর পায় আই অ্যাম ফিনিশড। আমার মান-সম্মান সব ধ্বংস হয়ে যাবে।'

অভয় দিয়ে বললাম, 'কিস্‌সু হবে না।'

'কিন্তু যদি সত্যিসত্যিই ওরা এখানে হানা দেয়?'

'আর যদি ক্যাশ কড়ির খোঁজ পায়—এই তো?'

'হ্যাঁ।'

'পেলে বলবেন, এ সব প্রণামী—ভক্তরা দিয়েছে।'

'তা নয় বললাম, কিন্তু—'

'লর্ড, আপনি কি জানেন না, প্রণামীর ওপর ইনকাম ট্যাক্স হয় না।'

পাক্কা দেড় মিনিট লাইনের ওধার থেকে সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। তারপর স্টিম ইঞ্জিনের মতো হুস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে জগৎপতি বললেন, 'সেটাই তো উচিত স্বয়ম্ভু। কিন্তু পৃথিবী এ যুগে কলুষিত হয়ে গেছে। চারদিকে শুধু ভ্রষ্টাচার। গুরু, ঈশ্বর—এ সবের ওপর মানুষের আর সেরকম ভক্তি নেই।'

মহাশয়গণ, মাকড়ার কথাটা শুনলেন তো। মনে মনে দু-একটা উৎকৃষ্ট খিস্তি ঝেড়ে দার্শনিকের স্টাইলে বললাম, 'হ্যাঁ, মানুষ আজকাল খুব খারাপ হয়ে গেছে।'

'বুঝতেই পারছ, ধর্মস্থান আর গুরুর মহিমা না মেনে যদি সি. বি. আই আর ইনকাম ট্যাক্সের বাহিনী এখানে হানা দেয় তখন কী করা? আমি বলছি, সাবধানের তো মার নেই—এ ব্যাপারে কিছু একটা করা দরকার।'

'আপনি প্রিকশান নিতে চাইছেন?'

'কারেক্ট।'

'ঠিক আছে, তার অ্যারেঞ্জমেন্ট হচ্ছে। ঘাবড়াবেন না।'

'তুমি একবার কষ্ট করে আশ্রমে এলে ভাল হয়। মানে, মনে ভরসা পাই।'

'যাব লর্ড। এখন কয়েকটা দিন অন্য দু-একটা অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে ব্যস্ত আছি। সেগুলো চুকিয়েই আপনার শ্রীচরণ দর্শন করতে যাব।'

'যত তাড়াতাড়ি পার চলে এস।'

'সিওরলি প্রভু। আচ্ছা—'

'বল।'

'চরাচরপালিকা মা জননী আশ্রমে কিরকম কাজ করছেন?'

গ্যাদগেদে গলায় প্রায় চেঁচিয়েই উঠলেন জগৎপতি, 'চমৎকার, চমৎকার। ওর জন্যেই আজকাল আমার আশ্রমে ফরেন ভক্ত প্রচুর বেড়ে গেছে। এখন আমার নাম ফার-ইস্ট থেকে শুরু করে মেক্সিকো কলাম্বিয়া পর্যন্ত সবাই জানে।' বলতে বলতে গলাটা চটচটে হয়ে উঠতে লাগল, 'প্রোপাগান্ডা আর পাবলিক রিলেশানস কী করে করতে হয় সে জানে। আমার হাতে একটি রত্ন তুলে দিয়েছ স্বয়ম্ভু। তোমাকে কী বলে যে কৃতজ্ঞতা জানাব।'

বললাম, 'জানাতে হবে না লর্ড। আপনি যে একজন উপযুক্ত সাধন-সঙ্গিনী পেয়েছেন তাতেই আমি খুশি।'

'সেটা তোমার মহত্ত্ব। জানো, চরাচরপালিকা একটা ভাল প্ল্যান করেছে। তুমি মত দিলেই

সেটা শুরু করা হবে।'

'কিসের প্ল্যান?'

'ইংরেজিতে একটা আশ্রম বুলেটিন বার করার। মানে, অনেক ফরেনার আর নন-বেঙ্গলি রেগুলারলি আসছে তো। তাদের সুবিধার জন্যেই—'

'ভেরি গুড আইডিয়া। যত কুইক পারেন বের করে ফেলুন।'

'তোমার মত যখন পাওয়া গেছে তখন নেক্সট মানথ্ থেকেই ওটা চালু করে দেব।'

'ঠিক আছে, এবার তা হলে রাখি?'

'রাখবে? আচ্ছা তা হলে রাখ। কিন্তু সেই কথাটা মনে থাকে যেন। তোমার হাতের কাজ চুকিয়ে যত তাড়াতাড়ি পার, এখানে চলে আসবে।' জগৎপতি লাইন কেটে দিলেন।

আমি আর হাতের ফোনটাকে ঠিক জায়গায় বসালাম না, পাশে রেখে দিলাম। যেভাবে মাকড়ারা লাইন দিয়ে রিং করে যাচ্ছে তাতে দুপুরের ঘুমটা কিচাইন করে ছাড়বে। ঘন্টা দুয়েক ঘুমোবার পর ফোনটাকে আবার রাইট প্লেসে সেট করে দেব।



মহাশয়গণ, মহাভারতে ভীষ্ম না কার যেন ইচ্ছামৃত্যু হয়েছিল। আমিও সেই **লাইনের মাল**। যদি ইচ্ছা করি দু'ঘন্টা পাঁচ মিনিট ঘুমোব, তা হলে দু ঘন্টা পাঁচ মিনিটই ঘুমোব ; **এক সেকেন্ড** কমও না, এক সেকেন্ড বেশিও না। যদি ইচ্ছা হয়, আটচল্লিশ ঘন্টার ভেতর বিজনেসম্যান ঝাপড়মল রাজঘরিয়ার সব ক্যাশ হাতিয়ে নিয়ে খজড়াটাকে স্রেফ বিকিনি টাইপের কৌপিন পরিয়ে মনুমেন্টের তলায় বসিয়ে দেব, তা টার্গেটের চেয়ে এক মিনিটও বেশি সময় নেব না। নিজের ওপর আমার কনফিডেন্সটা এত বেশি যে একেক সময় মনে হয় ভীষ্মের মতো ইচ্ছামৃত্যুই হয়ত আমার ঘটবে।

সে যাক গে, ট্রেনে গড়বড় না হলে, আর তার-কাটাওলারা রেলের তার হাপিস না করলে সুমনা পৌনে পাঁচটায় শিয়ালদায় আসবে। তার আগেই আমাকে ওখানে পৌঁছুতে হবে।

মহাশয়গণ, আপনারা তো জানেনই শ্রীকৃষ্ণের এক শো আটটা নাম নিয়ে নানা ব্যাঙ্কের এক শো আটটা ব্র্যাঞ্চে অ্যাকাউন্ট খুলেছি, সেগুলোতে সমাজপতিদের দু কোটির মতো আন-অ্যাকা-উন্টেড মানি রয়েছে। পাঁচ মিনিটের ভেতর সাফারিটা আবার বডিতে চড়িয়ে তিন চারটে চেক-বই আর ডট পেন পকেটে পুরে নিচে নেমে এলাম। তারপর গ্যারেজ থেকে ফরেন ফিয়াটটা বার করে স্ট্রেট শিয়ালদায়।

ট্রেনে আজ ঝামেলা ছিল না। এনকোয়ারি অফিসে এসে এক সেকেন্ডও দাঁড়াতে হল না। চোখে পড়ল, প্ল্যাটফর্মের দিক থেকে এগিয়ে আসছে সুমনা। কাছাকাছি এলে বললাম, 'চল—'

সুমনা এক সেকেন্ড আমার দিকে তাকিয়ে পাশাপাশি হাঁটতে লাগল। মহাশয়গণ, আপনারা

তো জানেনই আমার ওপর এই ছুকরির টেরিফিক বিশ্বাস। আমি বললে স্ট্রেট নরক পর্যন্ত চলে যাবে, এবং তা নিয়ে একটা প্রশ্নও করবে না।

স্টেশনের বাইরে পার্কিং লটে এসে আমি গিয়ে শোফারের সিটে বসলাম, পাশের সিটটায় বসালাম সুমনাকে। তারপর এয়ার কুলার মেশিনটা চালিয়ে দিলাম।

বসার সঙ্গে সঙ্গে এক ফুট পুরু নরম গদিতে ডুবে গিয়েছিল সুমনা। এমন গাড়িতে তার ফোরটিন জেনারেশনের কেউ কোনোদিন বাটক ঠেকাবার চান্স পায় নি। চোখের তারা কপালে চড়িয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সে গাড়িটা সার্ভে করতে লাগল।

আর চোখের কোণ দিয়ে কান্নিক মেরে তাকে দেখতে দেখতে গাড়িটায় স্টার্ট দিলাম।

স্টেশনের বাইরে আসতেই সুমনা জিজ্ঞেস করল, 'এই গাড়িটা কার?'

বললাম, 'প্রিন্সেস অফ প্রতাপরুদ্রগড়ের।'

কয়েক সেকেন্ড হাঁ করে রইল সুমনা। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'সে কে?'

'তুমি।'

'আমি! রাজকুমারী!'

'ইয়াস ম্যাডাম। প্রতাপরুদ্রগড়ের প্রিন্সেসের রোলে যখন তোমাকে অ্যাক্টিং করতেই হবে তখন তুমি ছাড়া রাজকুমারীটা আর কে হতে পারে?'

এবার যেন ব্যাপারটা ব্রেনের ভেতর 'ইন' করল সুমনার। সে বলল, 'ও, আচ্ছা।'

আমি বলতে লাগলাম, 'রাজকুমারীদের এরকম একটা না, গন্ডা গন্ডা কার থাকে। তোমারও থাকবে।'

আমার দিকে তাকিয়ে রইল সুমনা, আর একটি কথাও জিজ্ঞেস করল না। আমিও আর কিছু বললাম না।

একসময় আমরা স্ট্রেট নিউ মার্কেটে একটা বিরাট ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে এসে সুমনার জন্য দু ডজন করে বেস্ট কোয়ালিটির লেডিজ শু, ব্রা, প্যান্টি, স্কার্ট, শাড়ি, পেটিকোট, থেকে শুরু করে ফরেন পারফিউম পর্যন্ত সব কিনে ফেললাম। টেলরের কাছে সুমনার মাপ দিয়ে ওখানেই তিন ডজন করে সালোয়ার-কামিজ আর ব্লাউজের অর্ডার দিলাম। সব মিলিয়ে বিল হল এক লাখ সাতাত্তর হাজার টাকার। চেক কেটে কাউন্টারে দিতে দিতে বললাম, 'এটা ব্যাঙ্কে জমা দেবেন, ক্যাশ হলে মালগুলো আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন।' বলে গড়িয়াহাট অ্যাপার্টমেন্টের ঠিকানা দিলাম। আপাতত এগুলো ওখানেই থাকবে, তারপর নিয়ে যাওয়া হবে সার্কুলার রোডের প্যালেসে।

মহাশয়গণ, বিলের ফিগার দেখে দম আটকে গিয়েছিল সুমনার। শুধু তাই না, তার ব্রেনের ভেতর চক্কর লেগে গিয়েছিল। আমার কাঁধের কাছ থেকে কাঁপা গলায় সে ফিসফিসিয়ে উঠল, 'এত টাকার জামাকাপড়, পারফিউম—'

আমি ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে তাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, 'বাইরে বেরিয়ে কথা হবে।'

মহাশয়গণ, আপনাদের ডেফিনিটলি মনে আছে অনেকদিন আগে বোদা আর আমি পার্ক

স্ট্রিটের এক ডিপার্টমেন্টাল স্টোর থেকে ফোরটোয়েন্টি করে কয়েক ডজন ট্রাউজার্স আর শার্ট হাপিস করে নিয়ে গিয়েছিলাম। নিউ মার্কেটের এই দোকানের ম্যানেজারকেও ম্যাজিক দেখিয়ে এক লাখ সাতাত্তর হাজার টাকার মাল সরিয়ে ফেলতে পারতাম কিন্তু এই সব ছোটোখাটো দোকানদারকে চোট দিয়ে কী হবে, এদের চেয়ে সোসাইটির বড় বড় মালেরা যখন আমার হাতে রয়েছে। ওই যে বাংলায় কী একটা ইডিয়ম যেন আছে—মেরে হাত গন্ধ করা, তার মানে হয় না। যদি আবার ব্যাড ডেজ আসে তখন দেখা যাবে।

চেক্‌টা দিয়ে নিউ মার্কেটের বাইরে এসে গাড়িতে উঠতে উঠতে বললাম, 'যে ফিল্মে তোমাকে হিরো-ইন করব সেটা দেড় কোটি টাকার প্রোজেক্ট। রাজকুমারীর ড্রেস, পারফিউম, গয়না-ফয়নার জন্যে ধরা আছে দশ লাখ টাকা।'

'দশ লাখ!' হিক্কা তোলার মতো একটা আওয়াজ করল সুমনা।

তার চোখমুখ দেখে মনে হল, ছুকরির ব্লাড প্রেসার কয়েক মিনিটের ভেতর আচমকা টেরিফিক একটা জায়গায় চড়ে গেছে।

আমি দাঁত বার করে হাসলাম।

নিউ মার্কেট থেকে এবার চলে এলাম পার্ক স্ট্রিটের একটা জুয়েলারি শপে। পাঁচ হাজার স্কোয়ার ফিটের মত বিশাল এই দোকানটার ভেতরে ঢুকতে তিনটে লোহার গ্রিল বসানো গেট পেরুতে হয়। প্রতিটি গেটে রাইফেলওলা একজন করে গার্ড।

এত বড় গয়নার দোকানে আগে কখনও ঢোকে নি সুমনা। সে বলে, 'এখানে নিয়ে এলেন কেন?'

বললাম, 'তোমার জন্যে গয়না কিনতে।'

'আমার জন্যে!'

'হ্যাঁ।'

'যেটা যেটা তোমার পছন্দ দেখিয়ে দাও। ওরা প্যাক করে রাখবে।'

সামনের শো-কেসটার দিকে এগুতে গিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল সুমনা। বলল, 'কোন একটা ফিল্ম ম্যাগাজিনে একটা লেখা পড়েছিলাম। তাতে ছিল—' বলতে বলতে আচমকা থেমে গেল সে।

বললাম, 'ব্রেক কষলে কেন? বলে যাও—'

সুমনা আবার স্টার্ট করল, 'সিনেমার হিরো-ইনরা যে সব গয়না পরে সেগুলো নকল—গিল্টি-করা সোনার আর ঝুটো পাথর-বসানো।'

'অন্য হিরো-ইনরা যা খুশি পরুক, আমি আমার হিরো-ইনকে আসল মালই পরাবো। কোনো দিকে স্লাইট ফাঁক থাকতে দেব না। এ নিয়ে তোমাকে মাথা-ফাথা ঘামাতে হবে না। নাও—বেছে ফেল—'

খানিকটা মেকানিক্যাল স্টাইলে আঙুল বাড়িয়ে সাত আটটা গয়না দেখিয়ে দিল সুমনা।

বললাম, 'তুমি তো বি.এ পর্যন্ত পড়েছিলে।'

'হ্যাঁ।'

'প্রিন্সেসদের কথা নিশ্চয়ই কিছু কিছু জানো। তাদের কি মোটে পাঁচ সাতটা অর্নামেন্ট থাকে? আরো বাছো—'

শেষ পর্যন্ত টিকলি, ঝাপটা থেকে পায়ের হীরে-বসানো পাঁয়জোর, শুদ্ধ ভাষায় যাকে বলে শিঞ্জিনী, পর্যন্ত সত্তর আশিটা আইটেম পছন্দ করিয়ে ছাড়লাম। সবগুলোর দাম জুড়ে বিল হল সাত লাখ বিরাশি হাজার সাতশো বারো টাকার।

কাউন্টারে চেক কেটে জমা দিয়ে বললাম, 'আপনাদের অ্যাকাউন্টে টাকা ট্রান্সফার হয়ে গেলে গয়নাগুলো আমার ঠিকানায় পাঠিয়ে দেবেন।' বলে গড়িয়াহাটের অ্যাড্রেসটা দিলাম।

একসঙ্গে এত বিরাট টাকার চেক পেয়ে মালিক ম্যানেজার সেলসগার্ল সেলসম্যান থেকে গার্ড পর্যন্ত সবাই তটস্থ। আমাদের নিয়ে তারা কী করবে, কিভাবে আমাদের বাটার লাগাবে ভেবে পাচ্ছে না।

স্বয়ং প্রোপ্রাইটরের জন্য একটা সেপারেট কাচের চেম্বার আছে। মাকড়া হেভি চেকের গন্ধ পেয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছে। দামি ফাইভ ফিফটি ফাইভের প্যাকেট, কোল্ড ড্রিংকের বোতল আর মশলাদার পানের খিলি আমাদের ধরাবার জন্য সে ঝুলোঝুলি করতে লাগল। আমি হাতজোড় করে জানালাম, অসময়ে কিছু খাওয়ার হ্যাবিট আমাদের নেই। বলতে বলতে তিনটে গেট পেরিয়ে বাইরের রাস্তায় বেরিয়ে এলাম। প্রোপ্রাইটার থেকে সেলসগার্ল পর্যন্ত সবাই প্রশেসান করে আমাদের গাড়িতে তুলে দিয়ে গেল।

স্টার্ট দিতেই ফরেন ফিয়েট পার্ক স্ট্রিটের ওপর দিয়ে তেলের মতো গড়িয়ে যেতে লাগল। এক মিনিটের ভেতর একটা টার্ন নিয়ে ক্যামাক স্ট্রিটে এসে পড়লাম।

সুমনা জানালার বাইরে তাকিয়ে ছিল। টের পাচ্ছি, আসলে সে কিছুই দেখছে না। ছুকরি এখন একটা ড্রিমের ঘোরে রয়েছে। তার জন্য এইমাত্র সমাজপতি অ্যান্ড কোম্পানির যে লাখ দশেকের মতো ক্যাশ খসিয়ে এলাম, সেটা যেন তার কাছে একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

আস্তে করে বললাম, 'এবার আমরা কোথায় যাচ্ছি বল তো?'

সুমনা স্লাইট চমকে আমার দিকে ফিরল, 'কোথায়?'

'তোমার প্যালেসে।'

'প্যালেস!'

'ইয়েস ম্যাডাম, যাকে বলে রাজপ্রাসাদ।'

'কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'তুমি তো এখন আর আগরপাড়ার স্লাম ডোয়েলার না, তুমি হচ্ছ প্রতাপরুদ্রগড়ের রাজকুমারী। প্যালেস তো চাইই।'

সুমনা চুপ করে রইল।

আমিও আর কিছু বললাম না। পাঁচ মিনিটের ভেতর চার পাঁচটা ট্রাফিক আইল্যান্ড পেরিয়ে আমরা সার্কুলার রোডের সেই প্যালেসে পৌঁছে গেলাম। গাড়ি থেকে সুমনাকে নামিয়ে ভেতরে ঢুকে বিরাট বাড়িটা ঘুরিয়ে দেখাতে দেখাতে বললাম, 'কি, পছন্দ তো? প্যালেস বলে মনে হচ্ছে?'

সুমনার চোখের তারা একেবারে ব্রহ্মতালুতে গিয়ে ঠেকেছিল। সে কিছুই বলতে পারছিল না। ইংরেজিতে একটা কথা আছে না—থান্ডারস্ট্রাক—ছুঁড়িটা বিলকুল তাই হয়ে গেছে।

আমি ফের বললাম, 'নেক্সট উইক থেকে তুমি এখানে এসে থাকবে।'

হেঁচকি তোলার মতো আওয়াজ করে একসঙ্গে দুটো প্রশ্ন ঝাড়ল সুমনা, 'এখানে? কেন?'

'আগর পাড়ার ব্যারাকে থাকলে কোনোদিনই নিজেকে তুমি প্রিন্সেস ভাবতে পারবে না। প্রিন্সেস হতে হলে তার অ্যাটমসফিয়ার চাই তো। তোমার জন্যে আমি সেটা ম্যানুফ্যাকচার করে দিয়েছি।'

ছুঁড়ির খুঁতখুঁতুনি তাতে গেল না। কি ভেবে বলল, 'কিন্তু—'

'কী?'

'সিনেমায় তো শুনেছি, কাঠ-ফাট দিয়ে জোড়াতালি মেরে সেট বানিয়ে নেয়। এ তো দেখছি রিয়েল রাজপ্রাসাদ!'

মহাশয়গণ, ভেতরে ভেতরে আমি স্লাইট থতিয়ে গেলাম। ছুকরি সিনেমা টিনেমা কী করে বানায় তার খবর জানে দেখছি। বললাম, 'ঐ সব ফাঁকি টাকি দিয়ে অডিয়েন্সকে বুদ্ধু বানাবার কারবারে আমি নেই। আমি রিয়েল মাল দিয়ে ফিল্ম করে ইন্ডিয়াকে দেখিয়ে দেব।'

সুমনার মনের খিঁচটা একেবারেই কাটছে না। সে বলল, 'কিন্তু—'

'আবার কী?'

'এতে তো অনেক টাকা খরচ হয়ে যাবে!'

'তাতে তোমারই বা কী আর আমারই বা কী। নাসিক প্রেস নোট ছাপছে, আমি সেটা খরচ করছি। আমার হাত দিয়ে কার্পেন্টার,পেইন্টার, রংওলা, কার্পেটওলা, মালী—সবাই কিছু কিছু ক্যাশ পেয়ে যাচ্ছে। আমি তো আর টাকা হাপিস করে ফরেন ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দিচ্ছি না। কান্ট্রির টাকা কান্ট্রিতেই থেকে যাচ্ছে। ফিল্ম মেকিংয়ের কনসেপসানটাই আমি পাল্টে দেব।'

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে কী ভেবে নিল সুমনা। তারপর বলল, 'আমাকে তো এখানে এসে থাকতে বললেন—'

'হ্যাঁ।'

'একা আমার পক্ষে এত বড় বাড়িতে থাকা কী করে সম্ভব? কিছুতেই আমি পারব না।'

'তোমাকে একলা থাকতে বলেছে কে? প্রিন্সেস কি একা থাকে? সোফার শেফ বয় বেয়ারা থেকে শুরু করে সব এখানে হাজির করে দেব।'

'শুটিংটা হবে কবে?'

'ভেরি সুন। এক মাসের ভেতর।'

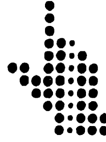
সুমনা এবার বলল, 'শুটিং হয়ে যাবার পর আবার আগরপাড়ায় ফিরে যাব তো?'

চোখ মটকে হাসলাম। মহাশয়গণ, আমার ধান্দাটা তো আপনাদের জানাই আছে। মাসখানেকের ভেতর সামতানির ঘাড়ে সুমনাকে সেট করে দিয়েই আমি এখানে থেকে হড়কে যাব। তারপর কোথায় থাকবে-সুমনা, কোথায় থাকবে এই প্যালেস আর আমিই বা থাকব কোথায়! কোনো মাকড়াই আমাকে তখন আর খুঁজে বার করতে পারবে না।

সুমনাকে বললাম, 'আগে শুটিংটা তো হয়ে যাক। তারপর দেখা যাবে তোমরা এখানেই থাকবে, না আবার আগরপাড়ায় ফিরে যাবে।' একটু থেমে ফের বললাম, 'ও সব ব্যাপার পরে ভাবা যাবে। ও.কে?'

সুমনা উত্তর দিল না।

প্যালেস ট্যালেস দেখিয়ে ঘণ্টাখানেক বাদে শিয়ালদায় গিয়ে সুমনাকে আগরপাড়ার ট্রেনে তুলে দিয়ে এলাম। আমার কলকাতায় কিছু কাজ ফাজ আছে। সে সব কমপ্লিট করার পর লাস্ট ট্রেনে আমি ফিরব।



সুমনাকে সামতানিদের বাড়িতে পবিত্র কুলবধূ হিসেবে 'ইন' করিয়ে দেবার আগে বেশ কয়েকটা দিন আমার হাতে থেকে গেছে। তার ভেতর অভ্যুদয় মিটারকে ইলেকশানের ব্যাপারে সেকেণ্ড টাইম মুর্গি-নাচ নাচিয়ে নেব। মহাশয়গণ, আমি কোনো ডিউটি ইনকমপ্লিট করে রাখতে চাই না।

শিয়ালদায় সুমনাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে গড়িয়াহাটের অ্যাপার্টমেন্টে চলে এলাম। এর মধ্যে অনেকক্ষণ আগেই সান-ডাউন হয়ে গেছে। টের পাচ্ছি, জিভের ডগা থেকে গলার ভেতর পর্যন্ত শুকিয়ে যাচ্ছে। ওখানে এখনই ইরিগেশন দরকার। বেয়ারাকে ডেকে সোনার বাংলা দিতে বললাম। সঙ্গে সঙ্গে দামী জাপানি প্লেটের ওপর মাটির খোরায় ধান্যেশ্বরী চলে এল। এক চুমুকে পুরোটা ফিনিশ করে ভেতরকার 'খরা' এলাকা ফ্লাডে ভাসিয়ে দিলাম। তারপর ফোনে অভ্যুদয় মিটারকে ক্যাচ করলাম।

অভ্যুদয় বললেন, 'কী খবর স্বয়ম্ভু?'

জানালাম, 'কাল থেকেই আমি ইলেকশানের ব্যাপারটা স্টার্ট করতে চাই।'

চোখে না দেখেও টের পেলাম, অভ্যুদয় টেরিফিক উৎসাহে চার ফিট লাফিয়ে উঠলেন। বললেন, 'ভেরি ভেরি ভেরি গুড নিউজ। আমিও কি তোমার সঙ্গে কাল পলাশডাঙা যাচ্ছি?'

'না স্যার, কাল না। আপনার জন্যে আগের বার গ্রাউন্ড তৈরি করে এসেছিলাম। এবার গিয়ে ফাউন্ডেশানটা আরো স্ট্রং করেই আপনাকে স্টেজে 'ইন' করিয়ে দেব। ও.কে?'

'কিন্তু'

গলা শুনে মনে হল, মাকড়া দমে গেছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'কিন্তু কী?'

'কদ্দিন পর তুমি আমাকে ওখানে নিয়ে যাবে?'

'দু উইকের ভেতর। ফিকর মাত কীজিয়ে—'

'ওয়ার্ড অফ অনার। দু উইকের ভেতরেই কিন্তু—'

'মোস্ট সার্টেনলি স্যার। টু উইকের পর এক সেকেণ্ড দেরি হলে আমাকে ন্যাংটো করে

হাতে প্যান্ট ফ্যান্ট ঝুলিয়ে হোল ক্যালকাটা ঘুরিয়ে দেবেন।'

'আরে না না, তোমার কথা কি আর আমি অবিশ্বাস করছি? বুঝতেই পারছ—'

অভ্যুদয়ের কথা শেষ হবার আগেই বলে উঠলাম, 'খুব টেনসানে রয়েছেন, তাই না?'

অভ্যুদয় বললেন 'রাইট। বুঝতেই পারছ, সেবার আগরপাড়ায় কী ঝামেলাটা হল!'

'এবার আর কিছু হবে না। আপনাকে ঐ যে কী যেন বলে—হ্যাঁ বৈতরণী, ঠিক বৈতরণী পার করিয়ে দেব। পাঁচ লাখ ক্যাশ তো আগেই দিয়েছেন। এখন দু সপ্তাহ নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে নিন। ফিল্ডে নামার আগে খানিকটা এনার্জি স্টোর করে রাখুন।'

'ঠিক আছে, তা হলে এখন ছাড়ি?'

'আচ্ছা।'

পরের দিন সকালে, মহাশয়গণ, বোদা এবং পেঁচো মাকড়া মানে পঞ্চাননকে কাঁধে ঝুলিয়ে আবার পলাশডাঙায় এসে হাজির হলাম। স্টেশনে নেমে স্ট্রেট চলে গেলাম গভর্নমেন্ট গেস্ট হাউসে।

কেয়ারটেকার চন্দ্রকিরণ এবং বয়-বেয়ারারা গার্ড অফ অনার দেবার স্টাইলে আমাকে স্যালুট ঝেড়ে বলল, 'আসুন স্যার, আসুন—'

বললাম, 'আপনাদের খবরটবর ভাল?'

'এই স্যার, আপনাদের আশীর্বাদে চলে যাচ্ছে।'

'চলে গেলেই হল। শুনুন, এবার আমরা বেশ কয়েকদিনের জন্যে এখানে বডি ফেলছি। ধরুন তের চোদ্দ দিন—'

'আপনারা থাকবেন, এ তো আমার সৌভাগ্য। যদ্দিন ইচ্ছে থেকে যান।' চন্দ্রকিরণ ঘাড় হেলিয়ে দাঁত বার করে হাসল। মহাশয়গণ, এটা মানতেই হবে, ছোকরার দাঁতের সেটিং চমৎকার। সাদা ধবধবে, যেন মুক্তোর লাইন।

সেই বেয়ারাটা, যার নাম হরে, এতক্ষণ কাছাকাছি কোথাও ছিল না। আচমকা মাটি ফুঁড়ে গজিয়ে উঠল। আমাদের দিকে স্যালুট ঝেড়ে চন্দ্রকিরণের মতো সে-ও দাঁত বের করল।

স্টেশন থেকে আমরা সাইকেল রিকশায় এসেছি। রিকশায় আমাদের দুটো সুটকেশ আর ব্যাগ রয়েছে।

চন্দ্রকিরণ হরেকে বলল, 'স্যারদের মালগুলো দক্ষিণ দিকের ঘরটায় দিয়ে এসো।'

অর্ডারটা খসতে না খসতেই ছোঁ মেরে মালপত্র নিয়ে চলে গেল হরে। আমরা এর আগে এসে যে ঘরটায় ছিলাম সেখানেই গিয়ে ঢুকল সে। এই গেস্ট হাউসে এটাই বেস্ট কম্পার্টমেন্ট।

আমরা প্রশেসান করে পেছনে পেছনে গেলাম।

আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রকিরণও চলে এসেছিল। সে বলল, 'স্যার, এখন সবে দশটা পাঁচ। লাঞ্চের তো দেরি আছে। তার আগে চা না কফি দেব?'

বললাম, 'চা। সেই সঙ্গে সলিড কিছু মাল। ভীষণ খিদে পেয়ে গেছে।'

চন্দ্রকিরণ টেরিফিক ব্যস্ত হয়ে পড়ল, 'নিশ্চয়ই স্যার, দশ মিনিটের ভেতর সব অ্যারেঞ্জমেন্ট

করে ফেলছি।' হরেকে সঙ্গে করে বেরিয়ে যেতে যেতে সট করে ঘুরে দাঁড়াল, 'স্যার, লাঞ্চে কী দেবো?'

বললাম, 'ভাল ভাল মাল যা আছে তা-ই দিয়ে যেও।'

'ঠিক আছে স্যার।'

চন্দ্রকিরণ আর হরে চলে গেল। আমরা সোফায় বডি ফেলে দিয়ে খানিকক্ষণ জিরোতে না জিরোতেই চা-ফা চলে এল। সে সব স্টমাকে চালান করতে করতে অভ্যুদয়ের ইলেকশানে নামার ব্যাপারে কনফারেন্স স্টার্ট করে দিলাম।

কী কারণে আমরা এই পলাশডাঙায় এসেছি, ট্রেনে উঠেই সেটা পঞ্চানন মানে পেঁচো মাকড়াকে জানিয়ে দিয়েছিলাম। এখন ডবল ডিমের অমলেটের হাফ একসঙ্গে মুখের ভেতর গুঁজে, চিবোতে চিবোতে সে বলল, 'একটা কথা বলব স্যার—'

'সার্টেনলি—' আমি পেঁচোর মুখের দিকে তাকালাম। শ্লা আবার কোন ফ্যাকড়া তুলে বসবে, কে জানে।

'লঙ্গরখানা তো খুলতে যাচ্ছেন। কিন্তু—'

'কী?'

'এখানকার মালেরা যদি না খেতে আসে? যদি ঝামেলা পাকায়?'

আমার হাতে চায়ের কাপ ছিল, সেটা টেবিলে নামিয়ে রেখে বললাম, 'খেতে আসবে না মানে? ওদের ফোরফাদার আসবে। শ্লাদের স্টমাক ফাটিয়ে গাদিয়ে গাদিয়ে খাওয়াব। তার পরও ঝামেলা পাকাবে?'

পঞ্চানন এবার যা বলল তা এইরকম। যে শ্লাদের পেটে ভাত নেই তাদের সাইকোলজি নাকি পিকুলিয়ার। মহাশয়গণ, তারা মনে করতে পারে, আমরা তাদের ভিখিরি ভেবে লঙ্গরখানা খুলেছি। এতে ওরা টেরিফিক ইনসাল্টেড ফিল করবে। আমাদের অ্যাটাকও করে বসতে পারে।

মহাশয়গণ, এদিকটা ভেবে দেখিনি। গরিব মাকড়াদের সাইকোলজি, মানে শুদ্ধ বাংলায় যাকে বলে মনস্তত্ত্ব, অদ্ভুত টাইপের। শ্লা, না খেতে পেয়ে মরবে তবু প্রেসটিজটা অ্যাডহেসিভের মতো গায়ে সেট করে রাখবে। পেঁচো মাকড়ার ব্রেনে ভাল একটা পয়েন্ট ফ্ল্যাশ করেছে। শ্লার ভেতর মাল আছে দেখছি। বললাম, 'তা হলে?'

পঞ্চানন ইউনাইটেড নেশানসের সেক্রেটারি জেনারেলের মতো মুখটা দারুণ গম্ভীর করে বলল, 'সেটাই বুঝতে পারছি না।'

মহাশয়গণ, আপনারা তো জানেন, কোনো ব্যাপারে আমি ঘাবড়াই না, কোনো প্রবলেমই আমাকে ক্যাঁচাকলে ফেলতে পারে না। পেঁচোর কথা শেষ হতে না হতেই আমার ব্রেনেও স্পার্ক মারল। বললাম, 'একটা কাজ করলে কেমন হয়?'

'কী?'

'যদি সাতদিন ধরে আমরা একটা যজ্ঞ ফজ্ঞর ব্যবস্থা করি আর চারদিকের ভিলেজে ভিলেজে লোক পাঠিয়ে মাইকে সবাইকে ইনভাইট করে বলি এখানে এক উইক ধরে রোজ দু-বেলা পেসাদ খাবে, তা হলে বোধ হয় কারো অবজেকসান থাকবে না। কী বলিস মাকড়া?

ধর্মের স্লাইট সেন্ট লাগিয়ে দিলে সব শুদ্ধু হয়ে যায়।'

পঞ্চানন প্রায় হাই জাম্প দিয়ে সোফা থেকে লাফিয়ে উঠল, 'আপনার জবাব নেই স্যার। পেসাদ বলে চালালে সব দোষ কেটে যাবে।'

বোদা এতক্ষণ অনবরত মুখের ভেতর টোস্ট অমলেট আপেল আঙুর কলা কর্নফ্লেকস গুঁজে যাচ্ছিল। এবার দাঁতের এক্সারসাইজ থামিয়ে বলল, 'শ্লা, এই কলিযুগে একেবারে সত্যযুগ নামিয়ে আনব আমরা।'

বোদাকে বললাম, 'যা বলেছিস।'

পঞ্চানন জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে কী করতে হবে, বলে দিন।'

বললাম, 'জায়গাটা সার্ভে করে যজ্ঞ ফজ্ঞ লাগিয়ে লঙ্গরখানা বসিয়ে দিতে হবে। টাইম ফরটিএইট আওয়ার্স।'

'অল রাইট স্যার।'

এবার আমি বোদার দিকে ফিরলাম। মহাশয়গণ, আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, আগের বার যখন আসি, লগাকে বলে গিয়েছিলাম দশ দিন বাদে এক রবিবার আবার এখানে ভিজিট করতে আসব। সে যেন স্টেশনে ওয়েট করে। কিন্তু সেদিন আসা হয় নি। ডেফিনিটলি মাকড়া আমাদের জন্য স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ছিল। সে যাক গে, ঐ মালটাকে আমাদের পাওয়া খুব দরকার। পলাশডাঙায় সে আমাদের পাবলিক রিলেশানস ম্যানেজার।

বোদা খেয়েই যাচ্ছিল। তাকে বললাম, 'স্টমাকে যা ঢোকাবার কুইক ঢুকিয়ে নে।'

বোদা খেতে খেতেই জড়ানো গলায় বলল, 'কোনো ডিউটি ফিউটি কাঁধে চাপাবে নাকি গুরু?'

'তোর কি মনে হয়, বিছানায় শুইয়ে রাখার জন্যে এখানে তোকে নিয়ে এসেছি? ফাইভ মিনিট সময় দিচ্ছি, তার ভেতর গো-ডাউনে মাল পুরে ফ্যাল।'

মহাশয়গণ, বুঝতেই পারছেন গো-ডাউন বলতে কী বোঝাচ্ছি—স্টমাক।

পাঁচ মিনিটও লাগল না, তার আগেই প্লেট ফ্লেটে যা ছিল, সব সাফ করে ফেলল বোদা। তারপর মুখ ফুখ ধুয়ে একটা বিড়ি ধরিয়ে বলল, 'গুরু, অর্ডার দাও—'

'তুই লগাদের গ্রামে চলে যা। ওকে ধরে নিয়ে আসবি।'

'ওদের গাঁ তো চিনি না গুরু।'

'আরে শ্লা, পলাশডাঙার ডান পাশের গাঁয়েই ওদের বাড়ি। লগা যা জিনিস, ওর নাম করলে ডেফিনিটলি কেউ না কেউ বাড়ি দেখিয়ে দেবে।'

'ঠিক হ্যায় গুরু। লেকেন—'

'আবার কী?

'ওকে যদি বাড়িতে না পাই?'

'খবর দিয়ে আসবি। ফিরলেই যেন গেস্ট হাউসে পাঠিয়ে দেয়।'

বোদা বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে বেরিয়ে গেল।

ঘন্টাখানেক বাদে লগাকে ক্যাচ করে নিয়ে এল বোদা। মাকড়াটা বোবা কালার মাইম অ্যাক্টিং করে আজ আর পয়সা রোজগারের ধান্দায় বেরোয় নি।

ঘরে ঢুকেই কিছু বুঝবার আগেই বডি থ্রো দিয়ে আমার পা থেকে ধুলো ফুলো নিয়ে জিভে আর মাথায় ঠেকাল লগা। তারপর বলল, 'স্যার, আপনার কথামতো রবিবার স্টেশনে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম।'

বললাম, 'তা তো জানিই। একটা ব্যাপারে ফেঁসে গিয়েছিলাম বলে আসতে পারি নি। এখন কী খাবি বল—'

'খানিকক্ষণ আগে ভাত খেয়েছি। এখন আর কিছু খাব না। বিকেলে যদিন খাওয়ান—'

'ও.কে, চল এবার বেরিয়ে পড়া যাক।'

লগাকে সঙ্গে করে আমরা গেস্ট হাউস থেকে সোজা রাস্তায় চলে এলাম। স্টেশনের দিকে যেতে যেতে এবার আমাদের এখানে আসার কারণটা জানিয়ে দিলাম তাকে।

চোখ দুটো পারফেক্ট সার্কেল বানিয়ে লগা বলল, 'যজ্ঞ করবেন! লঙ্গরখানা বসাবেন!'

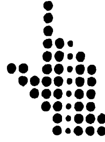
মাকড়ার মুখ দেখে মনে হল, আমার কথা যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না। বললাম, 'হ্যাঁ রে শ্লা, হ্যাঁ—'

'কেন?'

'পরে বুঝতে পারবি।' বলে এবার পঞ্চাননকে দেখিয়ে ফের শুরু করলাম, 'আমাদের তো আগেই দেখিয়েছিস, একে জায়গাটা ভাল করে দেখিয়ে দে।'

ঘণ্টাখানেক ঘোরাঘুরির পর স্টেশনের কাছেই বাজারের গা ঘেঁষে একটা সাইট সিলেকশান করে ফেললাম। এখানেই যজ্ঞের আসর বসবে, সেই সঙ্গে লঙ্গরখানাও। পুরো সাতদিন দুবেলা এখানে ফ্রি লাঞ্চ এবং ডিনারের ব্যবস্থা থাকবে।

সাইট সিলেকশানের পর আবার আমরা গেস্ট হাউসে ফিরে এলাম।



মহাশয়গণ, পাক্কা আটচল্লিশ ঘন্টার ভেতর আমাদের পছন্দ-করা সাইটে ডেকরেটরদের দিয়ে দুর্ধর্ষ একখানা প্যাণ্ডেল বানিয়ে ফেলল পঞ্চানন। তার এক কোণে এক ডজন রান্নার ঠাকুর এবং তাদের অ্যাসিস্টান্টদের এনে খিচুড়ি, তরকারি, বেগুনভাজা, বোঁদে, চাটনি তৈরির অ্যারেঞ্জমেন্টও করে ফেলেছে। সাত দিন ধরে ছ'টা উনুনের আগুন নিভবে না। ডে অ্যাণ্ড নাইট জ্বলতেই থকবে। প্যাণ্ডেলে যে-ই 'ইন' করুক, খিচুড়ি না খাইয়ে ছাড়া হবে না। সার্ভ করার জন্য লগা আর তার গ্যাং (মানে যারা ট্রেনে ট্রেনে প্যাসেঞ্জারদের স্রেফ বুদ্ধু বানিয়ে রোজগারের ধান্দা করে) কোমরে গামছা বেঁধে রেডি হয়ে আছে।

শুধু তাই না মহাশয়গণ, প্যান্ডলের ডান দিকে রান্না হচ্ছে, মাঝখানে চাটাইয়ের আসন পেতে কলাপাতায় খাওয়ার বন্দোবস্ত। আর একেবারে বাঁ দিকে বিষ্ণু যজ্ঞের আসর। বেছে বেছে পঞ্চানন এমন ক'জন পুরুত যোগাড় করে এনেছে যে তাদের দিকে তাকালে আপনাদের

চোখের তারা বিলকুল ফিক্সড হয়ে যাবে। মনে হবে অ্যানসিয়েন্ট ইন্ডিয়ার তপোবন ফপোবন থেকে বশিষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্য ঋষ্যশৃঙ্গ টাইপের মুনি-ঋষিদের স্ট্রেট তুলে এনে পলাশডাঙার এই প্যান্ডেলে সেট করে দেওয়া হয়েছে। তারা বিশাল চৌকো জায়গায় বালি বিছিয়ে তার ওপর চন্দন কাঠ জ্বালিয়ে, এবং সেই আগুনে কি একটা কোম্পানির আগ-মার্কা 'বিশুদ্ধ' গাওয়া ঘি ছিটোতে ছিটোতে 'ওঁ ওঁ বিষ্ণবে নমঃ' জাতীয় কী সব মন্ত্র যেন গলা ফাটিয়ে আউড়ে যাচ্ছে। আগুনের কুন্ডটার চারপাশে কলা-পাতায় প্রচুর আলোচাল, কলা, শশা, আপেল, আম ইত্যাদি ইত্যাদি ফল এবং সন্দেশ, বাতাসার নৈবেদ্য। দেখেশুনে মনে হচ্ছে, একালের এই সব বশিষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্যের গ্যাংটা ডেফিনিটলি আকাশ থেকে সত্যযুগ নামিয়ে নিয়ে আসবে।

মহাশয়গণ, এই সঙ্গে আরেকটা, যে কর্ম আমি করেছি তা এইরকম। কাল বোদার গলায় একখানা পোর্টেবল মাইক ঝুলিয়ে দিয়ে সাইকেল রিকশায় তুলে মিনিমাম দশ কিলোমিটার ঘুরিয়েছি। মাইকে কী বলতে হবে তা-ও জানিয়ে দিয়েছি। ঝাড়া দশ বারো ঘণ্টা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে সে বলেছে, 'ভাই অ্যান্ড বোনেরা, মা অ্যান্ড বাবারা, ঠাকুরদা অ্যান্ড ঠাকুরমায়েরা, কাকা অ্যান্ড কাকিরা, মামা অ্যান্ড মামিরা, পিসে অ্যান্ড পিসিরা, জেঠা অ্যান্ড জেঠিরা, বাচ্চা অ্যান্ড বুড়োরা, যুবক অ্যান্ড যুবতীরা, আপনাদের সবার স্টেশনের ধারে বিষ্ণুযজ্ঞে নেমতন্ন। সেই সঙ্গে পেট ভরে পেসাদ খেয়ে যাবেন। সাত দিন ধরে এই মহাযজ্ঞ চলবে।'

চিল্লিয়ে গলা ফাঁসিয়ে ফেলেছিল বোদা। তারপর রাত আটটায় গেস্ট হাউসে ফিরে পাক্কা দেড় ঘন্টা ফোটানো নুন-জল দিয়ে গার্গল করেছে। তার ফলে গলাটা স্লাইট ছেড়েছে।

আটচল্লিশ ঘন্টা পর এদিকের সব অ্যারেঞ্জমেন্ট হয়ে গেলে পলাশডাঙা থেকে পঞ্চাননকে রিলিজ করে দিলাম। সার্কুলার রোডের প্যালেসটা নিয়ে তার এখনও কিছু কাজ বাকি রয়েছে। সে সব কয়েক দিনের ভেতর কমপ্লিট করে ফেলতে হবে। আর পলাশডাঙার ঝামেলাটা চুকিয়ে ফেলেই আমাকে কলকাতায় ফিরতে হবে। সামতানির ছেলের ঘাড়ে সুমনাকে স্মুদলি চাপিয়ে দিতে পারলেই আমার বিশাল একটা ডিউটি সারা হয়। তারপর? তার পরের ব্যাপারটা এখনও ভাবি নি। মহাশয়গণ, আপনারা তো জানেনই, আমার লাইফে একটাই টেন্স, সেটা হল প্রেজেন্ট টেন্স। পাস্ট বা ফিউচার বলতে আমার কাছে কিছুই নেই। তিনটে বড় বড় প্রোজেক্ট এই মোমেন্টে আমার হাতে রয়েছে। সুমনার বিয়ে, সমাজপতি অ্যান্ড কোম্পানির ইনকাম ট্যাক্সের ক্রাইসিস আর অভ্যুদয় মিটারের এই পলিটিক্যাল কারবার—এই তিন প্রোজেক্ট আমার প্ল্যান মাফিক শেষ করে দিতে পারলে আপাতত আমি খুশি।

সকালে পঞ্চাননকে ছেড়ে দিয়েছিলাম। তারপর হেভি একখানা ব্রেকফাস্ট করে বোদাকে নিয়ে বিষ্ণুযজ্ঞের প্যান্ডেলে চলে এলাম।

রিয়ালি মহাশয়গণ, পেঁচো মাকড়ার তুলনা নেই। এমন জিনিয়াস আগে আর কখনও দেখিনি। এমনভাবে ছক কেটে সে সব করে রেখে গেছে যাতে কোনো খুঁত ধরার উপায় নেই। একদিকে খিচুড়ি ফিচুড়ি রান্না হচ্ছে, আরেক দিকে যজ্ঞের কাজ শুরু হয়ে গেছে। পেঁচো মাকড়া চার চারটে প্যান্ডেলের মাথার চার কোণে চারটে মাইক ফিট করে দিয়েছে। সেগুলো থেকে

অনবরত গাঁক গাঁক করে 'ওঁ বিষ্ণবে বিষ্ণবে' বেরিয়ে দশ বারো কিলোমিটার দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়ছে।

আরো একটা ব্যাপার চোখে পড়ল। কাল গলায় পোর্টেবল মাইক ঝুলিয়ে সেই যে বোদা চারপাশে নেমতন্ন করে এসেছিল তার নীট রেজাল্ট হয়েছে এই, ঝাঁকে ঝাঁকে লোকজন আসতে শুরু করেছে। বাচ্চা, বুড়ো, যুবক-যুবতী কেউ বাদ নেই। প্রতিটি ম্যারেড মেয়েমানুষের কোলে একটা করে বাচ্চা ঝুলছে। বোঝা যায়, বাড়িঘর ফাঁকা করে সবাই চলে আসছে।

সে যাক গে। মহাশয়গণ, আমি একবার কিচেন ঘুরে যজ্ঞের জায়গাটায় চলে এলাম। সেখানে খানিকক্ষণ ওঁ ফোং শোনার পর বাইরে এসে দাঁড়ালাম, কেননা ভেতরে জ্বলন্ত চন্দন কাঠ থেকে এত ধোঁয়া বেরুচ্ছে যে কার সাধ্যি দশ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকে। পুরুতগুলোর চোখ বোধ হয় স্মোক-প্রুফ। নইলে ঘন্টার পর ঘন্টা ধোঁয়ার ভেতর বসে আছে কী করে?

মহাশয়গণ, মিনিট পাঁচেক খোলা হাওয়ায় দাঁড়িয়ে থাকার পর চমকে উঠতে হল। আমাদের লঙ্গরখানা এবং যজ্ঞের আসরের ঠিক পেছনেই পলাশডাঙা স্টেশন। কলকাতার দিক থেকে একটা ডাউন ট্রেন একটু আগে সেখানে থেমেছে। গাড়িটা থেকে গল গল করে লোক নেমে আসছে।

আমি অন্যমনস্কর মতো তাদের দেখছিলাম। আচমকা চোখে পড়ল, ভিড় ঠেলে অভ্যুদয় মিটার স্টেশনের গেট পেরিয়ে এগিয়ে এলেন। মাকড়া যে বিনা নোটিশে দুম করে এখানে এসে হাজির হবে, ভাবতে পারি নি।

মহাশয়গণ, ব্যাপারটা একবার ভাল করে চিন্তা করুন। যে খজড়া এয়ারকন্ডিশানড ফরেন কার ছাড়া রাস্তায় বেরোয় না, সে কিনা শিয়ালদা সাউথের রদ্দি প্যাসেঞ্জার ট্রেনে হকার, চাষী, আনাজওলা, থার্ড ক্লাশ পাইকার, ফড়েদের সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে এতটা রাস্তা চলে এসেছে! তা ছাড়া অভ্যুদয়ের মতো মালেদের গায়ে আডহেসিভের মতো কিছু চামচা জুড়ে থাকে। তাদের একজনকেও দেখা যাচ্ছে না। মাল সবাইকে ঝেড়ে ফেলে একা একাই চলে এসেছে।

স্টেশনের বাইরে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন অভ্যুদয়, এধারে ওধারে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করছিলেন—ঠিক কোন দিকে যাবেন।

আমি আর দাঁড়িয়ে থাকলাম না, লম্বা লম্বা স্টেপে অভ্যুদয়ের দিকে এগিয়ে গেলাম। কাছে এসে বললাম, 'স্যার, আপনি হঠাৎ?'

অভ্যুদয় আমাকে দেখতে পেয়ে যেন হাতের মুঠোয় আকাশের চাঁদ পেয়ে গেলেন। হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, হঠাৎই চলে এলাম স্বয়ম্ভু। যাক, তোমাকে পেয়ে ভালই হল। নইলে কোথায় গিয়ে তোমাকে খুঁজতাম!' বলে বিরাট প্যান্ডেলটার দিকে আঙুল বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ওখানে কী হচ্ছে?'

চোখ মটকে বললাম, 'আপনি যাতে জিততে পারেন তার ফাউন্ডেশান তৈরি হচ্ছে।'

অভ্যুদয় একটু চিন্তা করে বললেন, 'ওটাই তোমার সেই লঙ্গরখানা নাকি?'

'রাইট স্যার, ঠিক ধরেছেন।'

'কিন্তু—'

'মাইকে ঐ সব মন্ত্র টন্ত্র আওড়াচ্ছে কেন?'

বিষ্ণুযজ্ঞের কারণটা জানিয়ে দিলাম।

অভ্যুদয়ের চোখে টুনি বাল্‌ব জ্বলে উঠল যেন, 'ইটস অ্যান একসেলেন্ট আইডিয়া। লঙ্গরখানার সঙ্গে ধর্মের যে টাচটা দিয়েছ তার তুলনা নেই। আমার মনে হচ্ছে, এবার নিশ্চয়ই ইলেকশানে জিতে যাব।'

'নিশ্চয়ই।'

'চল, তোমার বিষ্ণুযজ্ঞ আর লঙ্গরখানা দেখে যাই।'

মহাশয়গণ, অভ্যুদয় মাকড়ার আচমকা এখানে চলে আসার পেছনে যে সাইকোলজিটা রয়েছে তা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না। শ্লা দেখতে এসেছে তার কয়েক লাখ টাকা খসিয়ে আমি সত্যিই কিছু কাজের কাজ করছি কিনা। নাকি পুরো টাকাটাই জলে গেল! বললাম, 'আপনাকে ওখানে নিয়ে যেতে পারি, তবে এক কন্ডিশানে।'

অভ্যুদয় মিটার জিজ্ঞেস করলেন, 'কী কন্ডিশান?'

বললাম, 'আপনার পরিচয় এখন দেব না। আপনি স্রেফ মুখে ছিপি আটকে একটি আওয়াজ না করে, দু মিনিটের ভেতর সব দেখেশুনে প্যান্ডেল থেকে বেরিয়ে আসবেন।'

আমার কথায় অভ্যুদয় খুশি হলেন না। বললেন, 'কিন্তু স্বয়ম্ভু এই সুযোগটা আমাদের নেওয়া কি উচিত না?'

'কিসের সুযোগ?'

'এই যে দলে দলে লোকজন আসছে, তাদের সঙ্গে আমার পরিচয়টা তো করিয়ে দিতে পারতে—'

'স্যার, আমি আপনাকে এখানে ইনট্রোডিউস করে দেবার জন্যে অন্যকরম প্ল্যান করে রেখেছিলাম। আপনি আজ এসে সব কিচাইন করে দিলেন।'

'কী প্ল্যান?'

'আজই যজ্ঞ আর লঙ্গরখানা স্টার্ট দিলাম। সবে লোক আসতে শুরু করেছে। ভেবেছিলাম লাস্ট ডে-তে ডিক্লেয়ার করব, চারপাশের সবাই যেন লঙ্গরখানার সামনের মাঠটায় চলে আসে। ওখানে মিটিং-এর অ্যারেঞ্জমেন্ট করে টিভির কায়দায় 'এবারকার ইলেকশানে পিটার স্বয়ম্ভু হোড় প্রেজেন্টস, দানবীর মানব-প্রেমিক অভ্যুদয় মিটার' বলে আপনাকে পরিচয় করিয়ে দেব। স্যার, জানেন তো আম কাঁঠাল পাকাবার জন্যে টাইম দিতে হয়। কার্বাইড দিয়ে পাকাতে গেলে তার রেজাল্ট ভাল হয় না, দরকচা মেরে যায়। আপনার কেসটাও ঠিক সেই রকম।' লম্বা স্পিচ ঝাড়ার পর ফের বললাম, 'মাকড়া, আপনার আর তর সইছিল না—'বলেই আট ইঞ্চি জিভ কাটলাম, 'স্যরি, স্যরি, স্যরি ফর দ্য ব্লাডি 'মাকড়া'। আমার জিভটা একেবারে কাঁচা নর্দমা হয়ে—'

আমাকে থামিয়ে দিয়ে অভ্যুদয় মিটার বললেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। এর আগে পাঁচ হাজার বার মাকড়া বলেছ। আরেক বার বললে এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে? তুমি

কী বল, প্যান্ডেলে যাব না?'

'এতদূর যখন এসেই পড়েছেন তখন একবার নিজের চোখে দেখেই যান। তবে—'

'কী?'

'আমি আপনার সঙ্গে যাচ্ছি না। আমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকছি। আপনি কুইক ভিজিটটা সেরে চলে আসুন। কারো সঙ্গে কথা বলবেন না।'

'আচ্ছা।'

অভ্যুদয় সাত মিনিটের ভেতর ফিরে এলেন। জানালেন, কারো সঙ্গেই তিনি কথা বলেন নি। জিজ্ঞেস করলেন, 'এবার আমাকে কী করতে বল?'

বললাম, 'নেক্সট যে কলকাতার ট্রেনটা আসছে তাতে চড়ে হড়কে যান।'

'তারপর?'

'আজ সোমবার। বেস্পতিবার আপনার সঙ্গে কলকাতায় দেখা করব। সেদিন জানিয়ে দেব, আপনাকে কী করতে হবে। চলুন, স্টেশনে যাওয়া যাক।'

স্টেশনের দিকে যেতে যেতে আচমকা জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা স্যার—'

অভ্যুদয় আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কিছু বলবে?'

ঘাড়টা ডান দিকে পঁচিশ সেন্টিমিটার কাত করে বললাম, 'আপনি হয়ত ভেবেছিলেন, আপনার টাকা হাপিস করে আমি বোধ হয় হাওয়া হয়ে গেছি। তাই—'

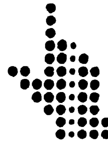
অভ্যুদয় দু হাত তুলে হাঁই হাঁই করে উঠলেন, 'তোমার মাথায় এরকম একটা বাজে ব্যাপার ঢোকালে কে? তোমাকে অবিশ্বাস করলে টাকাটা কি দিতাম? জানো, আমরা তোমাকে কতটা বিশ্বাস করি, তোমার ওপর কতটা ডিপেন্ড করে থাকি? আগেই তো বলেছি, স্রেফ কৌতূহলে এখানে চলে এসেছিলাম।'

স্টেশনে এসে টিকেট কাটতে না কাটতেই কলকাতার ট্রেন এসে গেল। একটা সেকেন্ড ক্লাস কামরায় অভ্যুদয় মিটারকে তুলে দিয়ে বললাম, 'ও.কে স্যার, ফির মিলেঙ্গে—'

অভ্যুদয় বললেন, 'বেস্পতিবার আসছ কিন্তু—'

'সার্টেনলি।'

একটু পর ইলেকট্রিক ট্রেন কলকাতার দিকে দৌড় শুরু করল। আমি ফাঁকা প্ল্যাটফর্ম থেকে আবার বিষ্ণুযজ্ঞের আসর অ্যান্ড লঙ্গরখানার দিকে আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগলাম।



কথামতো বৃহস্পতিবার কলকাতায় চলে এলাম।

মাঝখানের এই ক'টা দিন যজ্ঞ এবং লঙ্গরখানা পাল্লা দিয়ে চলেছে। আর এই ব্যাপারটা চারপাশের গ্রামগুলোতেই শুধু না, লোকের মুখে মুখে পাবলিসিটি পেয়ে অনেক দূরে দূরে

ছড়িয়ে পড়েছে। তার নীট রেজাল্ট দাঁড়িয়েছে এই, চল্লিশ পঞ্চাশ কিলোমিটার ডিসট্যান্স থেকে পঙ্গপালের মতো ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ আসছে। আর যে একবার আসছে, লঙ্গরখানার গায়ে ফেভিকলের মতো সেঁটে যাচ্ছে। এখান থেকে নড়বার কারো নাম নেই। দু বেলা গাওয়া ঘি, বাসমতী চাল আর সোনা মুগের ডাল দিয়ে তৈরি খিচুড়িতে গলা পর্যন্ত বোঝাই করে ওখানেই পড়ে থাকছে। কম করে দশ-বারো হাজার লোক বাড়িঘর ফেলে এখানে চলে এসেছে। মহাশয়গণ, যতদিন খিচুড়ি পাওয়া যাবে, ওরা এখানে বডি ফেলে রাখবে।

গড়িয়াহাটের অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছলাম বেলা দুটোয়। ঝাড়া দু ঘন্টা দিবানিদ্রা লাগিয়ে কাঁটায় কাঁটায় চারটেয় অভ্যুদয় মিটারের অফিসে ফোন করলাম, 'স্যার, কলকাত্তামে ম্যায় হাজির হুঁ—'

অভ্যুদয় খুশি গলায় বললেন, 'ফাইন। তোমার সঙ্গে আজই বসা দরকার।'

'কখন? কোথায়?'

'পাঁচটায় আমার আলিপুরের ফ্ল্যাটে চলে এসো।'

'অল রাইট স্যার—'

ঠিক পাঁচটাতেই আলিপুরে চলে এলাম। অভ্যুদয় মিটার আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। সমাজপতির স্যুইটের মতো এখানেও সোনার বাংলা এবং মাটির খোরা মজুত রয়েছে।

সোফায় অভ্যুদয়ের মুখোমুখি 'সামিট কনফারেন্স'-এ বসতে না বসতেই খোরাভর্তি বাংলা মাল আর অভ্যুদয়ের জন্য হুইস্কি এসে গেল। সেই সঙ্গে চিকেন কাবাব, ফিশ ফিঙ্গার, ফ্রায়েড প্রন আর কাজু বাদাম।

চুক চুক করে হুইস্কি সিপ করতে করতে অভ্যুদয় বললেন. 'তারপর ওদিকের খবর বল। তোমার যজ্ঞ আর লঙ্গরখানার ইমপ্যাক্ট কিরকম হচ্ছে?'

'একসেলেন্ট স্যার। হোল এরিয়ার লোক চিটেগুড়ের গায়ে মাছির মতো ওখানে ভিড়েছে। যদ্দিন লঙ্গরখানা খোলা থাকবে ওরা কেউ বাড়ি ফিরবে না।'

'সে তো বুঝলাম। আমাকে ভোটটা দেবে তো?'

'ডেফিনিটলি। ওদের ফোরটিন জেনারেশান দেবে। এবার যে ক্যাঁচাকল তৈরি করেছি তার বাইরে কারো যাবার উপায় নেই। আপনার জন্যে ঝেঁটিয়ে ভোট নিয়ে আসব।'

অভ্যুদয়ের মুখচোখ দেখে মনে হল. মাকড়া বেশ খুশিই হয়েছে।

'লঙ্গরখানা আর ক'দিন চালু থাকবে?'

বললাম, 'তিন দিন। আমাদের এক উইকের জন্যে ফুড অ্যান্ড যজ্ঞ ফর ভোট। আসছে রবিবার ওটা শেষ হচ্ছে।'

'ঐ দিনই তো আমাকে ভোটারদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে?'

'হ্যাঁ। সেই জন্যেই চলে এলাম। একটা মাস্টার প্ল্যান করে এনেছি। সেইভাবেই আপনাকে চলতে হবে।'

'তোমার মাস্টার প্ল্যানটা কী, শোনা যাক।'

মহাশয়গণ, খোরায় যে মালটুকু ছিল, গলায় চালান করে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে বেয়ারা আবার খোরাটা বোঝাই করে দিল।

বললাম, 'স্যার, সেদিন যেমন সেকেন্ড ক্লাসে কলকাতায় গিয়েছিলেন ঠিক সেইরকম রবিবার মর্নিং-এর দিকের ট্রেনে চলে যাবেন।'

অভ্যুদয় ঘাড় কাত করলেন, 'ঠিক আছে। আর কী করতে হবে?'

'সেদিনের মতো একা একাই যাবেন। সঙ্গে কোনো চামচা ফামচা নেবেন না। তা হলে প্ল্যান কিচাইন হয়ে যাবে।'

'তুমি যখন বলছ, কাউকে নেব না।'

'গুড। ওখানকার জন্যে দু সেট নতুন ইউনিফর্ম বানিয়ে নিয়ে যাবেন।'

অভ্যুদয়ের ভুরু কুঁচকে গেল। বললেন, 'ইউনিফর্ম! তার মানে!'

'রুরাল এরিয়ার লোকের কাছে যেতে হলে ইউনিফর্ম দরকার হয়। সস্তা লংক্লথ কিনে দুটো হাফ-হাতা পাঞ্জাবি, দুটো মিলের মোটা ধুতি আর এক জোড়া লক্কড়-মার্কা চটি কিনে নেবেন।' এক দমে কথাগুলো বলে ফের মাটির খোরায় চুমুক দিলাম।

মহাশয়গণ, কিছুক্ষণ চোখের তারা ফিক্সড করে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন অভ্যুদয়। মাকড়া টেরিফিক ঘাবড়ে গেছে।

আমি এবার বললাম, 'কি, বুঝতে পারছেন না?' একটু ঝুঁকে বম্বশেলের মতো আরেকটা প্রশ্ন ঝাড়লাম, 'খোপড়িতে কিছুই ঢুকছে না?'

অভ্যুদয় ডাইনে-বাঁয়ে মাথা ঝাকিয়ে বললেন, 'না।'

একটা উৎকৃষ্ট খিস্তি ঝাড়ার জন্য আমার জিভ সুড় সুড় করছিল। কোনো রকমে ব্রেক কষে বললাম, 'নিজের ড্রেসটার দিকে একবার তাকান।'

ঝট করে নিজের দামী সাফারি স্যুটটা একবার দেখে নিয়ে অভ্যুদয় বললেন, 'আমার ড্রেসে কী হয়েছে?'

'প্রোলেটারিয়েটদের কাছে ক্যাপিটালিস্টদের মতো ড্রেস গায়ে ঝুলিয়ে গেলে তার রেজাল্ট কী হবে বুঝতে পারছেন?'

অভ্যুদয়ের চোখ দুটো এবার ট্রাকের হেড-লাইটের মতো জ্বলে উঠল। ডান হাত এবং মাথাটা স্পিডে নাড়তে নাড়তে বললেন, 'বুঝেছি, বুঝেছি। তুমি একটি জিনিয়াস স্বয়ম্ভু।'

আমি দাঁত বার করলাম, 'স্যার এটা আমার ইলেকশান স্ট্র্যাটেজি। এমন রদ্দি মাল আপনার গায়ে চড়িয়ে ভোটারদের সামনে আপনাকে প্রেজেন্ট করব যাতে মনে হবে আপনি তাদেরই একজন। আপনার যে ব্যাঙ্কে কোটি কোটি টাকা আছে, পঁচিশ-তিরিশটা বেনামা লকারে কয়েক কেজি সোনা হীরে ফিরে আর ফাঁপা দেয়ালে কি বেলেঘাটায় জগৎপিতার কাছে বস্তা বস্তা ব্ল্যাক মানি রয়েছে—এসব কেউ টেরই পাবে না। গাধার পাল ক'দিন লঙ্গরখানায় খিচুড়ি মিচুড়ি খেয়ে লাইন দিয়ে আপনাকে ভোট দিয়ে আসবে।'

অভ্যুদয় একটুও চটলেন না। হাসতে হাসতে বললেন, 'যা বলেছ স্বয়ম্ভু। কিন্তু—'বলেই

হাসিটা থামিয়ে দিলেন।

'কী?'

'একটা মুশকিল হল যে ব্রাদার।'

'কিসের মুশকিল?'

'তুমি যে রকম স্পেসিফিকেসন দিলে তেমন টেলর আমার জানা নেই। কোথায় গেলে—'

অভ্যুদয়কে থামিয়ে দিয়ে বললাম, 'ডোন্ট ওরি স্যার। আপনার একটা জামা ফামা এখানে থাকলে দিয়ে দিন। ওটার মাপেই আপনার ইউনিফর্ম বানিয়ে নেব।'

অভ্যুদয় বললেন, 'দ্যাটস ফাইন। এক কাজ কর, ওর সঙ্গে ধুতি আর চটিও কিনে নিও। পায়ের মাপটা—'

'কিছু দরকার নেই স্যার। একটু ছোট বড় হলে কোনো ক্ষতি নেই, বরং গেইনই হবে। ভোটাররা ভাববে, এই লোকটার নিজের পোশাক ফোশাকের দিকে কোনো লক্ষ্যই নেই। এর লাইফ পিপল মানে জনগণের জন্যে সংরক্ষিত। ও ভাল কথা—'

'কী?'

'আপনার যা মাংস-মাখন খাওয়া চেহারা তাতে প্রোলেটারিয়েট ইউনিফর্ম পরলেও ভোটার মালেরা সন্দেহ করতে পারে। সত্যিই গালে মাছি বসলে পিছলে যাবে। এক কাজ করবেন স্যার, আজ থেকে আর শেভ করবেন না। ক'দিনের দাড়ি জমলে দুঃখী দুঃখী প্রোলেটারিয়েট ব্যাপারটা আরো খুলবে। ভোটার মাকড়ারা ভাববে আপনি তাদেরই লোক।'

'তোমার আইডিয়াটা চমৎকার।'

'থাঙ্ক ইউ স্যার।'

একটু ভেবে অভ্যুদয় এবার বললেন, 'আর কিছু বাকি রইল?'

প্রচুর সোনার বাংলা স্টমাকে স্টোর করা হয়েছে। মাথাটা ঝিম ঝিম করছে। বললাম, 'না। এবার তাহলে ওঠা যাক।'

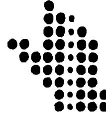
'এখনই উঠবে?'

'হ্যাঁ। অনেকগুলো কাজ সেরে আজই আমাকে পলাশডাঙায় ফিরতে হবে। আমি না ফিরলে ওদিকে ঝামেলা হয়ে যাবে।'

'তা হলে আর তোমাকে আটকে রাখব না।'

আমি উঠে পড়তে পড়তে বললাম, 'আরে আসল ব্যাপারটাই তো ভুলে যাচ্ছিলাম, একটা শার্ট ফার্ট দিন।'

'রাইট।' অভ্যুদয় ভেতরের ঘর থেকে একটা ফুল শার্ট এনে আমার হাতে দিলেন। আজই এটা পঞ্চাননের হাতে চালান করে দেব। সে এই মাপে টেলরকে দিয়ে স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী প্রোলেটারিয়েট পাঞ্জাবি বানিয়ে আনবে।



হে হে মহাশয়গণ, রাত ন'টা দশের ট্রেনে আমাকে পলাশডাঙায় ফিরতে হবে। অভ্যুদয়ের বাড়ি থেকে বেরিয়ে কবজি উল্টে দেখলাম পাঁচটা পঁয়তাল্লিশ। হাতে সোয়া দু ঘন্টার মতো টাইম রয়েছে। তার ভেতর দুটো ইমপর্টান্ট কাজ চুকিয়ে ফেলতে হবে।

মহাশয়গণ, প্রথমে যাওয়া যাক সার্কুলার রোডের সেই প্যালেসটায়। সেখানে পঞ্চানন ঘাঁটি আগলে পড়ে আছে।

কুড়ি মিনিটও লাগল না, সার্কুলার রোডে চলে এলাম। পেঁচোকে গেটের কাছেই পাওয়া গেল।

পঞ্চানন বলল, 'আসুন স্যার, আসুন।'

বললাম, 'ভেতরে যাব না। তোমার ঘাড়ে একটা ডিউটি চাপিয়ে আমাকে হড়কে যেতে হবে।'

'বলুন কী করতে হবে?'

মহাশয়গণ, পেঁচো শ্লার এই একটা টেরিফিক গুণ, আমার কোনো কথায় 'না' বলে না। আমার জন্য সে জান লড়িয়ে দিতে পারে। অভ্যুদয় মিটারের শার্টটা তাকে দিতে দিতে বললাম, 'এই মাপে রদ্দি লং ক্লথের দুটো হাফ হাতা পাঞ্জাবি আর সস্তা ঠেটি ধুতি একজোড়া কিনে নেবে। আর তোমার পায়ের মাপে ফুটপাথ থেকে একজোড়া চপ্পল কি স্লিপারও কিনো।'

'ও.কে স্যার।'

'আরেকটা ব্যাপার—'

'বলুন—'

'একটা টেপ-রেকর্ডার যোগাড় করো। ওটা যেন বেশ পাওয়ারফুল হয়।'

'ঠিক আছে স্যার।'

'মালগুলো নিয়ে রবিবার ফার্স্ট ট্রেনে পলাশডাঙায় চলে যাবে।'

'যাব স্যার।'

আমি আর ওয়েট করলাম না। যে ফরেন কার হাঁকিয়ে এসেছিলাম সেটায় উঠে স্ট্রেট এলগিন রোডে সামতানির 'ইমপোর্ট এক্সপোর্ট'-এর অফিসে চলে এলাম।

মহাশয়গণ, দেখুন দেখুন, সামতানির এয়ারকন্ডিশানড অফিসটা কিরকম জেল্লা মারছে। ইন্টেরিয়র ডেকরেটরদের দিয়ে দশ হাজার স্কোয়ার ফিটের গোটা একটা ফ্লোর দারুণ সাজিয়ে নিয়েছেন সামতানি। চারপাশে কাচের চেম্বারগুলো একজিকিউটিভদের জন্য সংরক্ষিত। এক ধারে কমপিউটার সেন্টার। সেটাও বিরাট একটা কাচের ঘর। দেখা যাচ্ছে প্রচুর মেয়ে ফেয়ে সেখানে কমপিউটারের সামনে বসে অনবরত টাইপ রাইটারের বোতাম টেপার মতো নানা

টাইপের 'কী' টিপে যাচ্ছে। মাঝখানে বিরাট হল। সেখানে কম করে পঞ্চাশ ষাটজন টাইপিস্ট আর ক্লার্ক টার্ক। একধারে সারি সারি টুলে ধবধবে উর্দি-পরা বেয়ারারা বসে আছে।

আরেক ধারে চেয়ারম্যান-কাম-ম্যানেজিং ডিরেক্টর সামতানির বিশাল চেম্বার। কাচের দেওয়ালের গায়ে ইলেকট্রনিকসে তাঁর নামটি জ্বলছে।

আগে আর কখনও এখানে আসি নি। সামতানিকে যেটুকু দেখেছি, সবই সমাজপতির থিয়েটার রোডের স্যুইটে কিংবা অভ্যুদয়ের বাড়ির পার্টি ফার্টিতে।

মহাশয়গণ, একটা ব্যাপার মার্ক করুন। সামতানি খজড়াটা মানুষের চোখের সামনে কিরকম ঝকঝকে বিউটিফুল একটি অফিস সাজিয়ে বসেছে। অথচ ভেতরে ভেতরে মাকড়া কী টেরিফিক চীজ! চারপাশের গ্রাম আর ক্যালকাটার আউটস্কার্ট থেকে মেয়ে ফেয়ে ধরে এনে ইমমরাল ট্র্যাফিকিং-এর কারবার চালিয়ে যাচ্ছে। এই সোয়াইনদের হাজারটা মুখ আর মুখোশ। এমনিতে তার পরিচয় হল, অনেস্ট রেসপেক্টেবল বিজনেসম্যান। কিন্তু রাতের অন্ধকারে শ্লাদের আরেকটা মারাত্মক চেহারা বেরিয়ে পড়ে।

ঠিক আছে শ্লা, তুমি যদি মহেশ সামতানি হও, আমিও পিটার স্বয়ম্ভু হোড়। তোমাকে আমি চরকিকলে ঘুরিয়ে ছাড়ব।

মাথাটা হানড্রেড অ্যান্ড টোয়েন্টি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ডান দিক থেকে বাঁয়ে ঘুরিয়ে পুরো অফিসটা একবার দেখে নিলাম। তারপর হল-এর ভেতর দিয়ে স্ট্রেট সামতানির চেম্বারের সামনে চলে এলাম। এখানে সেমি-সার্কুলার একটা খোপে ভিজিটরদের বসার ব্যবস্থা। একটা দুর্ধর্ষ চেহারার রিসেপসনিস্ট যুবতী সেখানে বসে আছে।

আমি 'সামতানি সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চাই'—বলতেই রিসেপসানিস্ট ছুকরি মেকানিক্যাল গলায় বলল, 'হী ইজ বিজি—'

'মাকড়াকে, আই অ্যাম স্যরি সামতানি সাহেবকে ফোনে বলুন পিটার স্বয়ম্ভু হোড় এসেছে। আপনার জন্য ওয়েট করছে।'

প্লাক-করা ভুরু দু সেন্টিমিটার ওপরে তুলে ছুকরি এবার বলল, 'আপনার নাম বললেই সামতানি সাহেব চিনতে পারবেন?'

'একবার বলেই দেখুন না—'

ছুকরি স্থির চোখে আমার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার পর থুতনি নামিয়ে কী যেন ভাবল। তারপর ইনটারকমের বোতাম টিপে সামতানি সাহেবের সঙ্গে আমার নাম বলল। সামতানি কী উত্তর দিলেন আমার পক্ষে শোনা সম্ভব নয়। তবে ছুকরির চোখ মুখের রি-অ্যাকশান দেখে বোঝা গেল, সামতানি আমাকে শুধু চেনেনই না, আমি এই অফিসে আসায় তাঁর ফোরটিন জেনারেশন উদ্ধার হয়ে গেছে।

ফোনটা নামিয়ে ঝট করে ছুকরি উঠে দাঁড়াল। টেরিফিক ব্যস্তভাবে এবার বলল, 'চলুন স্যার, আপনাকে সামতানি সাহেবের চেম্বারে নিয়ে যাই।'

মহাশয়গণ, মেয়েটার কথা শেষ হতে না হতেই সামতানি নিজেই তাঁর চেম্বার থেকে বেরিয়ে এসে আমার দু হাত ধরে বললেন, 'হোয়াট আ প্লেজান্ট সারপ্রাইজ! চল চল, আমার

চেম্বারে গিয়ে বসা যাক।'

আমাকে প্রায় টানতে টানতে সামনের চেম্বারে নিয়ে একটা বিশাল সেমি-সার্কুলার টেবলের সামনে বসিয়ে দিলেন সামতানি, তারপর নিজেও আমার মুখোমুখি বসলেন। টেবলের আরেক পাশে একটি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান স্টেনোগ্রাফার খাতা পেন্সিল নিয়ে বসে আছে। একটা খোলা পাতায় কিছু সাংকেতিক আঁকিবুকি দেখে বোঝা যায়, সামতানি তাকে কোনো ব্যাপারে নোট ফোট দিচ্ছিলেন।

সামতানি মেয়েটাকে বললেন, 'ডরোথি, তুমি এখন যাও। ঘন্টাখানেক পরে এসো।'

ডরোথি চলে গেল।

সামতানি এবার আমার দিকে ফিরলেন, 'তারপর স্বয়ম্ভু, সমাজপতি সাহেব, অভ্যুদয় মিটার—সবার অ্যাসাইনমেন্ট নিয়েই তো সব সময় ব্যস্ত থাকছ। আমার ছেলের বিয়ের ব্যাপারে কিছুই করলে না! রমেশ কাল লন্ডন থেকে এসে পৌঁছচ্ছে। একটু থেমে ফের বললেন, 'বিয়ের কথাটা নিশ্চয়ই ভুলে গেছ?'

'স্যার, কিছুই আমি ভুলি না।' নিজের মাথায় আঙুল ঠেকিয়ে সামতানিকে বললাম, 'এই খোপরির ভেতর একটা মেমরি ব্যাঙ্ক রয়েছে। একবার যা শুনি তা এখানকার সেফ ডিপোজিট ভলটে জমা হয়ে যায়। আর সমাজপতি আর মিটার সাহেবের অ্যাসাইনমেন্টের কথা বলছেন তো? তার ফাঁকে ফাঁকে আপনার ছেলের বিয়ের প্রিপারেশনও চালাচ্ছি। আর সেই ব্যাপারেই আজ আপনার কাছে চলে এলাম। দায়িত্ব যখন নিয়েছি তখন সেটা আমি করবই।'

'স্যরি স্বয়ম্ভু, কিছু মনে করো না।'

'আরে না না, মনে করব কেন? এবার কাজের কথাটা হয়ে যাক।'

'নিশ্চয়ই। তার আগে বল, কী আনব—চা, কফি না কোল্ড ড্রিংক?'

'স্যার, চা-ফা যে খাই না তা নয়। তবে কিনা ওসব প্রায় ছেড়েই দিয়েছি। জল বাদ দিলে আজকাল তরল পদার্থ আমি একটাই স্টমাকে চালান করে থাকি। সেটা হল—'

সামতানি আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন, 'বুঝেছি বুঝেছি—কান্ট্রি লিকার তো?'

'রাইট স্যার—' আমি হেসে হেসে, মাথাটা হেলিয়ে বললাম, 'ওভাবে জিনিসটার অসম্মান করবেন না। ওটা হল গিয়ে সোনার বাংলা।'

'অল রাইট, সোনার বাংলা ব্যাপারটা আমার মনে থাকবে। কিন্তু অফিসে, মানে এখানে সোনার বাংলা কোথায় পাই?'

'ডোন্ট ওরি স্যার। ও নিয়ে মাথা খারাপ করার দরকার নেই। কিস্‌সু আনাতে হবে না। আর্জেন্ট কথাটা শেষ করে ফেলা যাক। পরে আপনার বাড়ি গিয়ে স্টমাক বোঝাই করে সোনার বাংলা খেয়ে আসব।'

'ঠিক আছে। এবার শুরু কর।'

'স্যার, আপনার ছেলের জন্যে এক এক্স-মহারাজার মেয়েকে ঠিক করেছি।'

সামতানি মাকড়া মহারাজার মেয়ে, মানে প্রিন্সেসের নাম শুনে টেরিফিক উত্তেজিত হয়ে উঠল। এক ফুট পুরু গদির ভেতর নড়ে চড়ে বসে বলল, 'ইজ ইট?'

'ইয়েস স্যার।'

'কোথাকার মহারাজা?'

'প্রতাপরুদ্রগড়ের।'

মহাশয়গণ, সামতানির মুখ দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, খজড়াটা এরকম একটা বিদঘুটে নাম আগে আর কখনও শোনে নি। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'সেটা কোথায়?'

মহাশয়গণ, সেটা যে কোথায়, আমারও কি জানা আছে? কাকে কোত্থেকে তুলে এনে রাজকন্যা বানিয়েছি, সেটা তো আপনারা জানেনেই। আমার মুখের চামড়ায় একটুও ভাঁজ পড়ল না। বেমালুম মসৃণ গলায় বললাম, 'এম পি-তে।'

'মানে মধ্যপ্রদেশ?'

'কারেক্ট স্যার। ঐ গোয়ালিয়র ফোয়ালিয়রের কাছে হবে। তবে এঁরা কলকাতাতেই থাকেন। আপনার ছেলের সঙ্গে বিয়ে হলে আপনাদের সোসাল স্টেটাস দশ বিশ গুণ বেড়ে যাবে।'

'মোস্ট সার্টেনলি। নেটিভ স্টেট ফেট আজকাল না থাকলেও মহারাজা তো। রিয়ালি স্বয়ম্ভু, এর জন্য তোমার কাছে জেনারেশনের পর জেনারেশান আমরা কৃতজ্ঞ থাকব।'

মনে মনে ক'টা খিস্তি আউড়ে নিলাম। শালা হারামজাদা, রাজকন্যা বলে কাকে তোমার বাড়িতে সেট করে দিচ্ছি তা তো জানো না। যদি কোনোদিন জানতেও পার — না না, মহাশয়গণ, লাস্ট চ্যাপ্টারটা এখন জেনে দরকার নেই। তা ছাড়া যতই প্ল্যান প্রোগ্রাম করে এগিয়ে যাই না, মাঝখানে যদি বেগড়বাই কিছু ঘটে যায়, কনক্লুসানটা আমার এখনকার ছক অনুযায়ী হবে না, নতুন করে সেটা বানিয়ে নিতে হবে। তেলতেলে মুখে বললাম, 'কৃতজ্ঞ বলে লজ্জা দেবেন না স্যার। আপনার মতো বিজনেসম্যানের ঘরে প্রিন্সেস ছাড়া মানায় না। সে যাক, আপনার ছেলে তো কাল আসছে—'

'হ্যাঁ।'

'নেক্সট উইকে, এই ধরুন বুধবার টুধবার প্রিন্সেসের ফ্যামিলির সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেব। তবে একটা কণ্ডিশান আছে স্যার। সেটা কিন্তু মানতে হবে।'

'তুমি যা বলবে তাই করব। কী কণ্ডিশান বল—'

মহাশয়গণ মার্ক করুন, আমার মতো একটা থার্ড ক্লাস চিট, ফেরেববাজ, ফোরটোয়েন্টির ওপর এই শ্লা সামতানির কী টেরিফিক বিশ্বাস! মাকড়া তো জানে না, যে ছুকরিকে সে পার্ক স্টিটের ব্রথেলে তুলে দিয়েছিল, আমি তাকে তারই অন্দরমহলে সেট করে দিতে যাচ্ছি। বললাম, 'কন্ডিশানটা হল, আলাপের পর বিয়ের আগে পর্যন্ত তার সঙ্গে আর আপনাদের দেখা হবে না।'

একটু চুপ করে সামতানি কী ভাবলেন, তারপর বললেন, 'অল রাইট স্বয়ম্ভু,তাই হবে।'

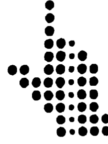
'তা হলে এখন ফোটা যাক—' বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালাম।

সামতানির আরো কিছুক্ষণ ছেলের বিয়ের ব্যাপারে জমিয়ে কথা বলার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ভ্যাজর ভ্যাজর করার মতো সময় বা এনার্জি কোনাটাই এখন আমার নেই। এখন গড়িয়াহাটের

অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে পুরো এক পাঁট সোনার বাংলা খেয়ে একটি ক্যাপটালিস্ট ডিনার খাব। তারপর ন'টা দশের ট্রেন ধরে স্ট্রেট পলাশডাঙা।

সামতানির চেম্বার থেকে বেরিয়ে পড়লাম। সামতানিও আমার গায়ের সঙ্গে অ্যাডহেসিভের মতো সেঁটে গিয়ে লিফ্‌ট পর্যন্ত চলে এলেন। নিজের হাতে লিফ্‌টের দরজা খুলে আমাকে ভেতরে ঢুকিয়ে ফের বন্ধ করে দিলেন। মহাশয়গণ, রাজকন্যার ফাদার- ইন-ল হতে পারবে, এটা ভেবে মাকড়া কিরকম গলে পড়েছে দেখুন ।

আমি বোতাম টিপতেই লিফট্‌টা হুড় হুড় করে পাতালের দিকে নেমে গেল।



মহাশয়গণ, কলকাতা থেকে ফেরার পর দুটো দিন সুপারসোনিক প্লেনের স্পিডে কেটে গেল। এই দু'দিন যজ্ঞ আর লঙ্গরখানা নিয়ে এত ফেঁসে ছিলাম যে অন্য কিছু ভাবার সময় ছিল না। যত দিন যাচ্ছে তত ভিড় বাড়ছে। পলাশডাঙা কনস্টিটিউয়েন্সির লোকজন তো আছেই , খিচুড়ি ফিচুড়ির খবর পেয়ে দূর দূর গাঁ ফাঁ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে মালেরা আসতে শুরু করেছে। লঙ্গরখানা চালু থাকা পর্যন্ত এই মাকড়ারা এখান থেকে নড়বে না।

আজ রবিবার, বিষ্ণুযজ্ঞের লাস্ট দিন। রাত দশটার পর লঙ্গরখানা বন্ধ হয়ে যাবে। আজ শ্লা টেরিফিক একখানা কারবার হবে। যে মালেরা এখানে জড়ো হয়েছে, দু বেলায় স্টমাকে তিন দিনের খিচুড়ি স্টক না করে আর উঠছে না।

ভোরে উঠে চা-ফা খেয়ে যজ্ঞের প্যাণ্ডেলে চলে গিয়েছিলাম। সেখানে বোদা লগা অ্যান্ড তার রেজিমেন্টকে কী কী করতে হবে, সব বুঝিয়ে আবার রেস্ট হাউসে ফিরে এসেছি। যতক্ষণ না অভ্যুদয় মিটার আসছেন, আমাকে এখানেই বডি ফেলে রাখতে হবে।

মহাশয়গণ, একটা ব্যাপারে আপনাদের জানানো দরকার। কাল সন্ধেবেলা পঞ্চানন অভ্যুদয়ের নতুন ইলেকশান ইউনিফর্ম অর্থাৎ ঠেটি ধুতি, চটি, টেপ-রেকর্ডার আর লংক্লথের পাঞ্জাবি দিয়ে গেছে।

বেশিক্ষণ রেস্ট হাউসে ওয়েট করতে হল না। অভ্যুদয় মিটার আটটা বাজার আগেই সাইকেল রিকশায় চড়ে হাজির হলেন।

আমি ছুটে গিয়ে খাতির করে তাঁকে ঘরে এনে একটা সোফায় বসালাম। বললাম, 'স্যার, ভোরে উঠে ট্রেন ধরে এখানে আসতে অসুবিধা হয়নি?'

অভ্যুদয় বললেন, 'ভোরে আমি রোজই উঠি, জগিং করি। আজ জগিং না করে একটা ট্যাক্সি ধরে বালিগঞ্জ স্টেশনে এসে ট্রেন ধরেছি।'

'আপনার জবাব নেই স্যার। যে এতটা করতে পারে তার এম. এল. এ হওয়া কোনো খজড়া

আটকাতে পারবে না।' বলে একটু থেমে আবার শুরু করলাম, 'আপনি ব্রেকফাস্ট করে এসেছেন?'

'না। সময় পাই নি।'

'ব্রেকফাস্ট দিতে বলি?'

'বল।'

বাইরে বেরিয়ে কেয়ারটেকারকে ডিম টোস্ট কলা কর্নফ্লেকস চা-ফা পাঠাতে বলে ফিরে এলাম।

মিনিট কুড়ির ভেতর ব্রেকফাস্টের পালা চুকিয়ে অভ্যুদয় মিটার জিজ্ঞেস করলেন, 'এবার আমাকে কী করতে হবে বল—'

'তেমন কিছুই করার নেই এখন। শুধু আপনার ইউনিফর্মটা একবার গায়ে চড়িয়ে দেখুন কেমন ফিট করে।'

'কিসের ইউনিফর্ম?'

কাল পঞ্চানন যে জামা-কাপড়ের প্যাকেটটা দিয়ে গিয়েছিল ওয়ার্ডরোব থেকে সেটা বার করে এনে খুলে ফেললাম। একটা ধুতি, একটা পাঞ্জাবি আর মোটা চমড়ার খেলো চটি অভ্যুদয়ের সামনে সেন্টার টেবলটায় রাখতে রাখতে বললাম, 'এই যে স্যার—'

মহাশয়গণ, নতুন জামাকাপড় দেখতে দেখতে অভ্যুদয় মিটারের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। চাপা খ্যাসখেসে গলায় বললেন,'এই সব পরিয়ে আমাকে সং সাজাতে চাও?'

'স্যার, আপনার পারমিসন নিয়েই কিন্তু এ সব কেনা হয়েছে।'

'তা হয়েছে। কিন্তু এগুলো যে এত বাজে জিনিস, ভাবতে পারি নি। এমন ভিখিরির ড্রেস আমার হোল চোদ্দ পুরুষের কেউ কোনোদিন গায়ে তোলে নি।'

মহাশয়গণ, জিভের ডগা ছুঁচলো করে কয়েক সেকেণ্ড চুক ·· . আওয়াজ করলাম। তারপর বললাম, 'আপনার মানসিক অবস্থাটা বুঝতে পারছি স্যার, কিন্তু মুশকিলটা হয়েছে কোথায় জানেন—'

অভ্যুদয় স্ট্রেট আমার চোখের দিকে তাকালেন, 'কোথায়?'

'বাংলায় একটা প্রোভার্ব আছে 'ভেক না ধরলে ভিখ মেলে না।' আপনার কেসটাও বিলকুল তাই ই।'

'এবার বুঝলাম, ভোটের জন্যে তুমি আমাকে ভিখিরির লেভেলে নামিয়ে আনতে চাইছ।'

আমি দু পাটির বত্রিশটা দাঁত বার করে বললাম, 'স্যার, আপনি বেকার কষ্ট পাচ্ছেন। হোল লাইফ তো আর এই ড্রেস চড়িয়ে থাকবেন না। এটা আমাদের ইলেকশানে জেতার স্ট্র্যাটেজি। ধরুন, অ্যাক্টিং করার জন্যে আপনি এই কস্টিউম পরেছেন। শো হয়ে যাবার পর এগুলো লাথি মেরে রাস্তায় ফেলে দেওয়া হবে। ওই যে ওখানে বাথরুম। ওখানে গিয়ে ওগুলো পরে আসুন—'

তক্ষুনি উঠলেন না অভ্যুদয় মিটার। অনেকক্ষণ ঘাড় গুঁজে গুম হয়ে বসে রইলেন। তারপর টেরিফিক অনিচ্ছায় বডিটাকে টেনে হিঁচড়ে খাড়া করে জামা ধুতি ফুতি নিয়ে বাথরুমে ঢুকে

পড়লেন। মিনিট দশেক পর যখন বেরিয়ে এলেন, কোন শ্লা বলবে অভ্যুদয় মিটার একজন বিরাট বিজনেস ম্যাগনেট, ক্যালকাটার এক টপমোস্ট ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট। মনে হচ্ছে, জন্মের পর থেকেই মাকড়া প্রোলেটারিয়েটদের জন্য জান লড়িয়ে বসে আছে। পভার্টি লাইনের নিচে যারা আছে তাদের কথা ভেবে ভেবে সেই ছেলেবেলা থেকে মাকড়ার ঘুম নেই। বললাম, 'ফার্স্ট কেলাস স্যার, এবার আপনাকে রিয়াল প্রোলেটারিয়েট লিডার মনে হচ্ছে।'

অভ্যুদয় মিটার এগিয়ে এসে আমার মুখোমুখি বসলেন। আগের সেই রাগ ফাগ এখন আর নেই। ইলেকশানে জিততে হলে এই ইউনিফর্মটাই যে গায়ে ঝুলিয়ে রাখতে হবে, সেটা তিনি ভাল করেই বুঝতে পেরেছেন।

অভ্যুদয় জিজ্ঞেস করলেন, 'সং তো সাজালে। এবার আমাকে কী করতে হবে বল—'

বললাম, 'স্যার, আপনাকে আজ ফার্স্ট ভোটারদের সামনে দাঁড় করাব। আপনার লাইফে এটা একটা রেড লেটার ডে। আজ আপনাকে এমন বক্তৃতা ঝাড়তে হবে যাতে জনগণের চোখের তারা বিলকুল ফিক্সড হয়ে যায়। এই বক্তৃতাখানার ওপর ইলেকশানের রেজাল্ট অনেকটা নির্ভর করছে।'

মুড়ি জলে দিলে যেমন মিইয়ে যায়, অভ্যুদয়ের মুখ হুবহু সেইরকম হয়ে গেল। কয়েকটা ঢোক গিলে বললেন, 'বক্তৃতা!'

'ইয়েস স্যার—'

'কিন্তু—'

'কী হল?'

'না, মানে—'

বলতে বলতে থেমে গেলেন অভ্যুদয় মিটার। চোখে পড়ল, মাকড়া গল গল করে ঘামতে শুরু করেছে। বললাম, 'অত নার্ভাস হচ্ছেন কেন স্যার?'

রুমাল দিয়ে ঘাম মুছতে মুছতে ফ্যাসফেসে গলায় অভ্যুদয় বললেন, 'ব্যাপারটা কী জানো, আমি লাইফে কোনোদিন বক্তৃতা দিই নি। মাইকের সামনে দাঁড় করিয়ে দিলে ভীষণ ঘাবড়ে যাব।'

মহাশয়গণ, খজড়াটা কী বলে শুনুন! বক্তৃতা দিতে পারবে না, এদিকে শ্লা এম.এল. এ হবার শখ! গলা দিয়ে তুবড়ি ছোটাতে না পারলে আজকাল কেউ নেতা হতে পারে! আর কিছু না, স্রেফ বাণী আর প্রতিশ্রুতি বিতরণ করে যেতে হবে। এই কাজটি যে যত পারফেক্টলি করতে পারবে সে তত বড় লিডার। বললাম, 'স্যার, আপনি তো কিচাইন করে দিলেন। জনগণের সামনে বাণী দিতে না পারলে আমার এত বড় মাস্টার প্ল্যানটার বারোটা বেজে যাবে।'

আরো ঘাবড়ে গেলেন অভ্যুদয়। বললেন, 'কী করা যায় বল তো?'

'বাণী আপনাকে দিতেই হবে। ওটা ছাড়া লিডার হওয়া ইমপসিবল।'

'কিন্তু—'

মহাশয়গণ, মাকড়ার যা অবস্থা তাতে মাইকের সামনে দাঁড় করিয়ে দিলে ডেফিনিটলি হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাবে। কাজেই আমাকে ভাবতে হল। আর চোখ বুজে পনের সেকেণ্ড চিন্তা করতে

না করতেই ব্রেনে স্পার্ক মারল। আস্তে আস্তে চোখের পাতা খুলে ঠোঁট কামড়ে বললাম, 'নতুন প্ল্যান এসে গেছে স্যার—'

অভ্যুদয় সেন্টার টেবলের ওপর দিয়ে এমনভাবে ঝুঁকলেন যাতে মনে হয়, আমার ঘাড়ের ওপর বুঝি ঝাঁপিয়ে পড়বেন। গলায় হাফ কেজি উত্তেজনা মিশিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী প্ল্যান স্বয়ম্ভু?'

'ভাবছি আপনার বক্তৃতাটা টেপ-রেকর্ডারে আগেই ক্যাচ করে রাখব। তারপর ডায়াসে টিমটিমে লাইট জ্বালিয়ে আপনাকে সন্ধেবেলায় ডায়াসে তুলে মাইকের সামনে দাঁড় করিয়ে দেব।'

'মাইকের সামনে?' একটু আগের উত্তেজনাটা মিইয়ে গেল অভ্যুদয় মিটারের।

'সার্টেনলি স্যার। আপনার থোবড়া ভোটারদের দেখাতেই হবে, বাণীও শোনাতে হবে।'

'কী ভাবে?'

মহাশয়গণ, আমার আগেই মনে হয়েছিল, অভ্যুদয় মাকড়া বক্তৃতার ব্যাপরে গড়বড় করে বসবে। তাই টেপ-রেকর্ডার আনিয়ে রেখেছিলাম। বললাম, 'মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে আপনি ঠোঁট ফোঁট নাড়িয়ে যাবেন। পেছনে টেপ-রেকর্ডারের সঙ্গে লাউড স্পিকার সেট করে বাজাতে থাকব। লোকে ভাববে নিপীড়িত জনগণের সেবক অভ্যুদয় মিটারের বাণী শুনছে।'

বাজ পাখির মতো ছোঁ মেরে আমার দুটো হাত তুলে নিয়ে বুকের ভেতর চেপে ধরলেন অভ্যুদয়। বললেন, 'দুর্দান্ত স্ট্র্যাটেজি করেছ স্বয়ম্ভু। ওয়ার্ল্ডে তোমার তুলনা নেই।'

'বলছেন?'

'এক হাজার বার।'

'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। তা হলে এবার আসল কাজটা সেরে নেওয়া যাক।'

অভ্যুদয় মিটার সোজাসুজি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী কাজ বল তো?'

একটা চামড়ার ব্যাগে টেপ রেকর্ডারটা পুরে কাল দিয়ে গিয়েছিল পঞ্চানন। সেটা বার করে এনে বললাম, 'আপনার ফার্স্ট পাবলিক অ্যাড্রেস।' বলে টেপ-রেকর্ডারটা সেন্টার টেবলে রেখে সুইচ বোর্ডে সেটার প্লাগ ঢুকিয়ে দিলাম, 'নিন, স্যার স্টার্ট করুন—'

অভ্যুদয় হকচকিয়ে গেলেন, 'কী বলব স্বয়ম্ভু?'

মনে মনে উৎকৃষ্ট কয়েকটি খিস্তি ঝেড়ে মুখে বললাম, 'স্যার, মনুমেন্টের তলায়, স্ট্রিট কর্নার মিটিংয়ে নেতাদের বক্তৃতা ফক্তৃতা কোনোদিন শোনেন নি? স্বাধীনতার পর থেকে ইন্ডিয়ায় রাস্তায় ঘাটে, হাটে বাজারে, মাঠে ময়দানে বক্তৃতা ঝেড়ে ঝেড়ে নেতারা হোল কান্ট্রিতে সাউন্ড পলিউশান ঘটিয়ে ছাড়ল, সে সব কিছুই আপনার কানে যায় নি কোনোদিন?'

'শুনব না কেন? কিন্তু সে সব ওদের বক্তৃতা, ওদের কথা। তা দিয়ে আমি কী করব?'

হেসে ফেললাম, 'স্যার, সব নেতার বক্তৃতাই এক। শুধু ভয়ে গুলো আলাদা আলাদা। ওখান থেকে ঝেড়ে দিয়ে বলতে থাকুন—'

অভ্যুদয়ের গাল ফাল চুপসে গেল যেন। বললেন, 'এখন যে কিছুই মনে পড়ছে না স্বয়ম্ভু।'

'এই তো ক্যাঁচাকলে ফেললেন স্যার—'

খানিকক্ষণ চুপচাপ। তারপর কী ভেবে ভয়ে ভয়ে অভ্যুদয় বললেন, 'একটা কথা বলব স্বয়ম্ভু?'

'কী?'

'তুমি এতটাই যখন করেছ তখন বক্তৃতাটা যদি লিখে দাও, টেপ চালিয়ে কাগজ দেখে দেখে পড়ব।'

দেখুন মহাশয়গণ, অভ্যুদয় মালটিকে ভাল করে একবার দেখে নিন। পাবলিসিটি থেকে শুরু করে স্পিট ফিচ পর্যন্ত সব কিছু পরের ঘাড়ে চাপিয়ে কেমন একখানা এম.এল.এ হয়ে বেরুবার ধান্দা করছে। ঠিক হ্যায় গুরু, তুমি কী করে শেষ পর্যন্ত স্টেট অ্যাসেম্বলিতে ল্যাণ্ড কর, সেটা আমি দেখে নেব।

মনে মনে যাই ভাবি না কেন, গলাখানা আগমার্খা মধুতে চুবিয়ে বললাম, 'দ্যাটস আ গুড আইডিয়া স্যার। মঞ্চে আপনাকে তোলার পর মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে আপনি হাত-পা মুখ-ফুখ নেড়ে বক্তৃতা ঝাড়ার মাইম অ্যাক্টিং করে যাবেন। পেছনে টেপে আপনার বক্তৃতা বাজতে থাকবে। লোকে ভাববে রিয়াল স্পিচ শুনছে।'

'তা হলে বক্তৃতাটা লিখে ফেল—'

'ও'.কে স্যার—' কাগজ কলম জুটিয়ে এনে মিনিট পনেরর ভেতর একখানা টেরিফিক জ্বালময়ী ভাষণ বানিয়ে অভ্যুদয়ের হাতে দিতে দিতে বললাম, 'মালটা কিরকম দাঁড়াল, দেখে নিন—'

পড়তে পড়তে অভ্যুদয়ের দু চোখ টুনি বাল্ব হয়ে জ্বলতে লাগল। একসময় পড়া শেষ করে বললেন, 'রিয়ালি স্বয়ম্ভু, তুমি একটা জিনিয়াস। আমি হোল লাইফ চেষ্টা করলেও এরকম স্পিচ লিখতে পারতাম না।'

'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। ওটা বার বার পড়ে জিভে সড়গড় করে নিন। টেপ করার সময় যেন আটকে ফাটকে না যায়। মালটাকে স্মুদলি গলা থেকে বার করে আনবেন।'

শ্লা, নামতা মুখস্থ করার মতো অভ্যুদয় মিটার স্পিচটা সাত-আটবার পড়ে ফেললেন। ছেলেবেলায় পরীক্ষার পড়াও বোধ হয় এভাবে এত মনোযোগ দিয়ে কখনও পড়েন নি। পুরো বক্তৃতাটা গলায় সেট করে নেবার পর বললেন, 'আমি রেডি, এবার টেপ করে নিতে পার।'

ঘরের এক কোণে থলের ভেতর ইলেকট্রিকের তার আর প্লাগ লাগানো টেপ রেকর্ডারটা রয়েছে। সেটা বার করে নিয়ে এলাম। ওটা সেন্টার টেবলে বসিয়ে প্লাগটা সুইচ বোর্ডে লাগিয়ে চালিয়ে দিলাম। বললাম, 'পড়ে যান স্যার—'

মহাশয়গণ, মার্ক করেছি পঞ্চাননকে যখন টেপ-রেকর্ডার যোগাড় করে দিতে বলেছিলাম, আপনাদের ভুরু কুঁচকে গিয়েছিল। ভেবেছিলেন খজড়াটা ফালতু একটা টেপ রেকর্ডার আনতে বলছে। কিন্তু আপনারা তো জানেন না, আমি ত্রিকালদর্শী টাইপের লোক, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান সবই চোখের সামনে আয়নার মতো দেখতে পাই। ইচ্ছে করলে মহাপুরুষের লেভেলে

উঠে যেতে পারি। আগেই লক্ষ করেছি, কথা ভাল বলতে পারেন না অভ্যুদয়। বক্তৃতা-ফক্তৃতা ঝাড়তে গেলে ডেফিনিটলি গড়বড় করে ফেলবেন। তাই টেপ-রেকর্ডারের অ্যারেঞ্জমেন্ট করে রেখেছিলাম, স্পিচটা এভাবে দেওয়াব বলে।

মহাশয়গণ, অভ্যুদয় মিটার পড়তে শুরু করলেন। গোড়া থেকেই জেট প্লেনের স্পিডে মুখস্থ বলে যেতে লাগলেন।

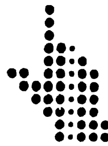
আমি তাঁকে থামিয়ে বললাম, 'উঁহু উঁহু, এভাবে নয়। থেমে থেমে ইমোশান দিয়ে বক্তৃতা ঝাড়ুন। নেতাদের মতো ইমপর্টান্ট জায়গাগুলোতে গলা একটু একটু কাঁপাবেন। মনে রাখবেন, পুরোটাই অ্যাক্টিং। অ্যাক্টিংটা যত জোরালো হবে ততই ক্ল্যাপ পাবেন, ততই ভোটাররা ভেড়ার পালের মতো আপনার দিকে লাইন দিয়ে এগিয়ে আসবে।'

আরো দু-তিনবার চেষ্টা করে অভ্যুদয় মিটার বললেন, 'হচ্ছে না স্বয়ম্ভু। তুমি একটু দেখিয়ে দাও—'

মহাশয়গণ, কীভাবে একটি এম. এল. এ তৈরির কারবার চলছে, দেখুন। যাই হোক, এক সঙ্গে শিশির ভাদুড়ি, অহীন্দ্র চৌধুরী, ছবি বিশ্বাস, উত্তমকুমার, দিলীপকুমার, মার্লোন ব্র্যান্ডোকে পাঞ্চ করে গলায় গ্যালন গ্যালন আবেগ ঢেলে বক্তৃতাটা পড়ে গেলাম। তারপর বললাম, 'এই ভাবে পড়ে যান।'

শুদ্ধ বাংলায় যাকে বলে বিমুগ্ধ হওয়া, তাই হয়ে গেলেন অভ্যুদয়। বললেন. 'সত্যি স্বয়ম্ভু. তোমার তুলনা নেই। পাবলিক স্টেজে নামলে তুমি অনেক নট-এভারেস্ট নট-কাঞ্চনজঙ্ঘার নাকে ঝামা ঘষে দিতে পারতে। দেখি তোমার মতো পড়তে পারি কিনা—'

বারকয়েক রিহার্সাল দেবার পর অভ্যুদয়ের স্পিচটা রেকর্ড করে নিলাম। এতক্ষণে ব্যাপারটা মোটামুটি দাঁড়িয়ে গেছে।



মহাশয়গণ, প্রচুর তালিমের পর অভ্যুদয়ের বক্তৃতা টেপে তুলতে দুপুর হয়ে গিয়েছিল। তারপর স্নান ফান করে একখানা উৎকৃষ্ট ক্যাপিটালিস্ট-মার্কা লাঞ্চ চুকিয়ে বললাম. 'স্যার, আপনি এখানে রেস্ট নিন। আমি যজ্ঞের প্যান্ডেলে যাচ্ছি। ওটার পাশে বক্তৃতার ডায়াস তৈরি করিয়ে সন্ধেবেলা ফিরব। তখন আপনাকে নিয়ে স্ট্রেট মঞ্চে তুলে দেব। তার আগে এখান থেকে কিন্তু বেরুবেন না।'

অভ্যুদয় ঘাড় কাত করলেন, 'আচ্ছা—'

প্যান্ডেলে এসে দেখি চারপাশে পনের কুড়ি হাজার মানুষের থিকথিকে ভিড়। লাইন দিয়ে অনেকেই খিচুড়ি খাচ্ছে, কারো কারো খাওয়া হয়ে গেছে। বাকি সবাই খাওয়ার জন্য ওয়েট করছে।

আজই যজ্ঞ আর লঙ্গরখানার আখরী দিন। মহাশয়গণ, মার্ক করুন, একেক শ্লা কী পরিমাণ

খিচুড়ি টানছে। নেক্সট সাত দিন যাতে আর কিছু খেতে না হয় এই ভাবে স্টমাকে ঠেসে যাচ্ছে। কয়েক দিনের ভেতর নির্ঘাৎ শ'খানেক মাকড়া ডাইরিয়া এবং কলেরায় দেহত্যাগ করবে। এ ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

লগা বোদা অ্যান্ড কোম্পানি খাওয়া দাওয়ার তদারক করছিল। আমি লগাকে ডেকে বাইরে নিয়ে এলাম। বললাম, 'একটা কাজ করতে হবে যে—'

লগা বলল, 'নিশ্চয়ই স্যার, কী করব বলুন—'

প্যান্ডেল থেকে পঞ্চাশ গজ তফাতে একটা বিরাট ডালপালাওয়ালা শিশু গাছের তলাটা দেখিয়ে লগাকে বললাম, ওখানে বিকেল চারটের ভেতর একটা ডায়াস করে দিতে হবে। আলো মাইক চেয়ার টেবল আর লাইটের ব্যবস্থা থাকা দরকার।

লগা বলল, 'সব হয়ে যাবে স্যার।' তারপর গলা নামিয়ে জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'যাত্রা ফাত্রা হবে নাকিন স্যার?'

আমি চোখ টিপে বললাম, 'যাত্রার চেয়ে অনেক বড় মাজাক হবে। বহুৎ বড়িয়া খেল।'

কিছুই বুঝতে না পেরে মুখটা পাক্কা চার ইঞ্চি ফাঁক করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল লগা।

মাকড়ার গালে আলতো করে টুসকি মারতে মারতে বললাম, 'কয়েক ঘণ্টা ওয়েট কর না। তারপর নিজের চোখে আর নিজের কানে সব দেখতে আর শুনতে পাবি। আগে বলে দিলে মজার বারোটা বেজে যাবে।'

লগা বলল, 'ঠিক আছে স্যার।'

ঘণ্টা দুয়েকের ভেতর লঙ্গরখানার প্যাণ্ডেলের ঠিক পাশেই আমার প্ল্যানমাফিক একটা ডায়াস বানানো হল। মাইক, চেয়ার-টেবল, ফুলের মালা, এটসেট্রা এটসেট্রা যোগাড় করে আনল লগা। তারপর একটা কম পাওয়ারের বাল্বও ঝুলিয়ে দেওয়া হল।

ডায়াসটার কেয়ার-টেকার করে লগার এক অ্যাসিস্টন্টাকে সেট করে দিলাম। তারপর ফিরে এলাম রেস্ট হাউসে।

অভ্যুদয় মিটার রাজনৈতিক ইউনিফর্মটি গায়ে চড়িয়ে সোফায় স্ট্যাচু হয়ে বসে আছেন। মহাশয়গণ, কারবারটা দেখুন, মাকড়া এম. এল. এ হবার জন্য কী টেরিফিক কষ্টটাই না করছে!

আমাকে দেখে অভ্যুদয় বললেন, 'তুমি আমাকে শেষ করে ফেলবে স্বয়ম্ভু।'

জিজ্ঞেসা করলাম, 'কেন, কী হয়েছে?'

'সং সাজিয়ে বসিয়ে রেখেছ। আর জিজ্ঞেস করছ কি হয়েছে!'

'স্যার, পাঁচ বছরের জন্যে এম. এল. এ হবেন, আর মোটে পাঁচটা ঘণ্টার জন্যে প্রোলেটারিয়েট মেক-আপ নিয়ে বসে থাকতে পারবেন না? এটুকু স্যাক্রিফাইস না করলে চলবে কী করে?'

অভ্যুদয় ঘাড় গোঁজ করে চাপা গলায় গজ গজ করতে করতে বললেন, 'ঠিক আছে, আমাকে কখন মিটিং-এ নিয়ে যাচ্ছ?'

মহাশয়গণ, বাইরে এখনও প্রচুর রোদ ফোদ রয়েছে। সন্ধে নামতে বেশ কিছুক্ষণ দেরি।

বললাম, 'আর ঘন্টাখানেক আপনাকে কষ্ট দেব। এতক্ষণ বসিয়ে রেখেছি। আর গুনে গুনে ষাটটা মিনিট। তার পরেই ডায়াসে চড়াব।'

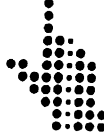
'আরো এক ঘণ্টা!' গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠলেন অভ্যুদয়।

'ওনলি স্যার। রাগারাগি করবেন না, পলিটিক্যাল লিডারদের ব্রেন ঠাণ্ডা রাখতে হয়। একটা ঘণ্টা দেখতে দেখতে কেটে যাবে।'

মহাশয়গণ, অভ্যুদয় মিটার একটা ঘ্যানঘেনে টাইপের মাল। কড়া গলায় বললেন, 'কেন, সন্ধে পর্যন্ত এখানে বসে থাকতে হবে কেন? তার আগে গেলে কী অসুবিধা?'

বললাম, 'সেটা তখনই বুঝতে পারবেন। বেকার আপনাকে বসিয়ে রেখে আমার তো কোনো প্রফিট নেই। সন্ধেবেলায় আপনাকে ডায়াসে তোলার পেছনে ডেফিনিটলি আমার একটা প্ল্যান আছে। সেটা এখন না-ই বা শুনলেন।'

অভ্যুদয় আর কিছু বললেন না।



পশ্চিম দিকের গাছপালার আড়ালে সূর্যটা সট করে নেমে যাবার পর রেস্ট হাউসের বেয়ারাকে দিয়ে একটা সাইকেল রিকশা ডাকিয়ে আনলাম। সেই টেপ রেকর্ডারটা খবরের কাগজে মুড়ে সঙ্গে নিলাম। তারপর অভ্যুদয়কে নিয়ে রিকশায় উঠে লঙ্গরখানার পাশের সেই ডায়াসটার সামনে পৌঁছতে মিনিট কুড়ি লাগল।

মহাশয়গণ, এতক্ষণে চারদিক অন্ধকারে ঝাপসা হয়ে গেছে। স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে মিটমিটে ক'টা আলো জ্বলে উঠেছে। উল্টোদিকের দোকানগুলোতে জ্বলছে হ্যাজাক। দু-একটায় অবশ্য বাল্বের আলোও দেখা যাচ্ছে। তারপর যতদূর চোখ যায় গাঢ় অন্ধকারের ব্যাকগ্রাউন্ড।

লগার অ্যাসিস্টান্ট হরা এতক্ষণ একটা চেয়ারে বসে ডায়াস পাহারা দিচ্ছিল। আমাদের দেখে কোমরে একটা টেরিফিক মোচড় দিয়ে স্ট্রেট দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর দৌড়ে এসে বলল, 'আসুন স্যারেরা, আসুন —'

অভ্যুদয়কে নিয়ে ডায়াসে উঠে এলাম এবং একটা চেয়ারে তাঁকে সেট করে দিয়ে হরাকে বললাম, 'লগা আর বোদাকে ডেকে নিয়ে আয়—'

হরা লম্বা লম্বা স্টেপে দৌড়ুতে দৌড়ুতে লঙ্গরখানার দিকে চলে গেল।

এবার ডায়াসটার আরেকটু ডেসক্রিপশান দেওয়া দরকার। এখানে ইলেকট্রিক তার ঝুলিয়ে চল্লিশ পাওয়ারের টিমটিমে একটা বাল্ব লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিকে টেবল-চেয়ার। পেছনেও ক'টা চেয়ার। ডান পাশে একটা মাইক, বাঁ পাশে আরেকটা।

ডায়াসটার সামনে অনেকটা ফাঁকা জায়গা। ওখানে হাজার পনের কুড়ি লোক বসতে পারবে। পঞ্চাশ গজ দূরে দূরে বাঁশ পুঁতে সেগুলোর গায়ে লাউড স্পিকারের চোঙা লাগিয়ে

দেওয়া হয়েছে।

মহাশয়গণ, এবার মাইক দুটো সম্পর্কে আপনাদের কিছু সিক্রেট খবর জানিয়ে দেওয়া দরকার। বাঁ পাশের মাইকটার সঙ্গে লুজ একটা তার আছে, সেটা টেপ রেকর্ডারের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হবে। তার ফলে শ্রোতারা অভ্যুদয় মিটারের স্পিচ শুনতে পাবে। যখন বক্তৃতা চলতে থাকবে সেই সময় অভ্যুদয় মিটার ডান পাশের মাইকটার সামনে দাঁড়িয়ে হাত-পা এবং মুখ নেড়ে মাইম অ্যাক্টিং করে যাবেন। লোকে মনে করবে, অভ্যুদয় নিজেই বক্তৃতা ঝাড়ছেন। এই প্ল্যানটা আগেই আপনাদের জানিয়ে দিলাম। কিন্তু এছাড়াও আমার ব্রেনে আরো কিছু প্ল্যান রয়েছে। মহাশয়গণ, সেটা কিন্তু অ্যাডভান্স আপনাদের জানাতে পারছি না, সে জন্য আপনাদের স্লাইট ধৈর্য ধরতে হবে। প্লিজ, একটু ওয়েট করুন।

মহাশয়গণ, লগা চলে যাবার পর আমিও কাজ শুরু করে দিলাম. টেপ-রেকর্ডারটা ডান ধারের মাইকের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে ওটার ওপর এমন ভাবে পুরনো কাগজ ফাগজ চাপা দিতে লাগলাম যাতে দূর থেকে শ্রোতারা যেন দেখতে না পায়।

মহাশয়গণ, অভ্যুদয় আমার কাজ-কারবার দারুণ মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করছিলেন। তারিফের গলায় এবার বললেন, 'রিয়ালি তোমার প্ল্যানের তুলনা হয় না।'

মনে মনে বাছা বাছা কিছু খিস্তি ঝেড়ে মুখে একটি ডিভাইন হাসি ফুটিয়ে তাঁর দিকে তাকালাম।

অভ্যুদয় এবার বললেন, 'আমাকে বক্তৃতার সময় কী করতে হবে?'

একটু আগে আপনাদের যা জানিয়েছি, অভ্যুদয়কেও তাই জানিয়ে দিলাম। অর্থাৎ কোথায় দাঁড়িয়ে তাঁকে কিভাবে মাইম অ্যাক্টিং করতে হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

অভ্যুদয় বললেন, 'ফাইন।' তারপর মিটমিটে বাল্বটা দেখিয়ে আবার শুরু করলেন, 'এই কম পাওয়ারের বাল্বটা কেন লাগিয়েছ, বুঝতে পারছি।'

'কেন বলুন তো?'

'যাতে অডিয়েন্স ধরতে না পারে যে আমি ফল্‌স মুখ নেড়ে যাচ্ছি।'

'আপনার ব্রেনে স্যার টেরিফিক ম্যাটার রয়েছে। ঠিক ধরে ফেলেছেন—'

অভ্যুদয় রাগ ফাগ করলেন না, দাঁত বার করে হাসলেন শুধু।

আমাদের এই টাইপের কথাবার্তা যখন চলছে তখন দৌড়ুতে দৌড়ুতে লগা বোদা হরা লঙ্গরখানা থেকে ডায়াসে চলে এল।

বোদাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললাম, 'এই যে তোরা এসে গেছিস, ভেরি গুড। এখানকার কাজ স্টার্ট করা যাক।'

বোদা বললে, 'কী করতে হবে, বলে ফেল গুরু—'

বোদাকে একধারে টেনে নিয়ে তার কানের ভেতর মুখ গুঁজে দিয়ে বললাম, 'তোকে টেপ-রেকর্ডারের চার্জ নিতে হবে।' তারপর গলাটা ঝপ করে অনেকখানি নামিয়ে ফিসফিস করে আরো কিছু পরামর্শ দিলাম।

শুনতে শুনতে বোদার চোখে ফ্ল্যাশ লাইট জ্বলে উঠল। মাকড়া বলল, 'তোমার জবাব নেই

গুরু।'

আমি আলতো করে বোদার নাকে টুসকি মেরে বললাম, 'দেখিস যেন টাইমিংটা ঠিক হয়। নইলে সব গড়বড় হয়ে যাবে।'

'ফিকর মাত কীজিয়ে গুরু। অ্যাদ্দিন তোমার কাছে অ্যাপ্রেনটিস খাটছি—সে কি এমনি এমনি? দেখবে মেশিনের মতো কাজ হয়ে যাবে।'

মহাশয়গণ, আপনাদের মুখচোখ দেখে মনে হচ্ছে, বোদাকে কী পরামর্শ দিলাম সেটা জানার জন্য আপনাদের আর তর সইছে না। কিন্তু যতই ছোঁক ছোঁক করুন, এ ব্যাপারটা কিছুতেই আগে জানাবো না।

আমি এবার ডান পাশের মাইকের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। মুখটা মাউথপিসের কাছে এনে এভাবে শুরু করলাম ঃ 'ভাই সব পলাশডাঙার ইতিহাসে আজকের দিনটা সোনার অক্ষরে লিখে রাখার মতো। আজ আপনাদের মানে পলাশডাঙাবাসীদের চোদ্দ পুরুষের পরম সৌভাগ্য যে অভ্যুদয় মিটার, মানে অভ্যুদয় মিত্র মশাই এখানে পায়ের ধুলো ঝাড়তে এসেছেন। আপনারা মানে মায়েরা বোনেরা বাবারা খুড়োরা জ্যাঠারা পিসেরা মেসোরা মাসিরা বুড়োরা বুড়িরা ছোঁড়ারা ছুঁড়িরা—যে যেখানে আছেন, ঝাঁকে ঝাঁকে পালে পালে এখানে চলে আসুন। অভ্যুদয় মিত্র মশাই আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন। আসুন, আসুন—'

বারকয়েক এই কথাগুলো আওড়াবার পর দেখা গেল, লঙ্গরখানার ভেতর এবং বাইরে থেকে গাদা গাদা লোক ডায়াসের সামনে লাইন দিয়ে বসে পড়তে লাগল। আধ ঘণ্টার ভেতব হাজার দশ বারো লোক জমে গেল।

মহাশয়গণ, আজকাল এই এক কারবার হয়েছে, মাইক নিয়ে গাঁক গাঁক করে কেউ কিছু বললেই তার চারপাশে ভিড় জমে যায়। ইন্ডিপেনডেন্সের পর কয়েক শ পার্টির হাজার হাজার লিডারের বাণী ফানি শোনার পরও জনগণের সাধ আর মেটে না। যেখানে মাইক, যেখানে ভাষণ, সেখানেই শ্লা থিকথিকে ক্রাউড।

ভিড়ের ভেতর বেশ গোলমাল হচ্ছিল। আগে নোটিশ ফোটিশ না দিয়ে দুম করে মিটিং ডাকা হয়েছে, এতে লোকজন রীতিমত অবাকই হয়ে গেছে।

দু হাত তুলে বললাম, 'শান্ত হোন, শান্ত হোন—'

বারকয়েক এভাবে অ্যাপিল করার পর জনগণ চুপ করল।

এবার বললাম, 'আপনারা আমাকে চেনেন নিশ্চয়ই।'

দশ বারো হাজার মানুষ এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, 'লিচ্চয়ই। আপনি আমাদের ভগবান—'

'আমার চেয়েও বড় ভগবান আজ এখানে হাজির হয়েছেন।'

'কে? কে?'

'অভ্যুদয় মিত্র।'

'এঁয়ারে তো আগে কখনও দেখি নি।'

আমি দাঁত বার করে হাসলাম। বললাম, 'ভগবান কি হুট করে দেখা দেন? অনেক ভাগ্য ফাগ্য করলে তবেই তাঁর দেখা মেলে। আপনাদের ওপর করুণা করে তিনি আজ এখানে চলে

এসেছেন।'

'কোথায় তিনি?'

ডায়াসের পেছন দিকে আবছা অন্ধকারে একা চেয়ারে ঘাপটি মেরে বসে ছিলেন অভ্যুদয় মিটার। তাঁর হাত ধরে সামনে নিয়ে এসে সেই হাতটা ওপরে তুলে বললাম, 'এই যে ইনি।'

বারো হাজার মানুষের চব্বিশ হাজার চোখ অভ্যুদয়ের মুখের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল যেন।

মহাশয়গণ, অভ্যুদয় কিরকম খলিফা, একবার লক্ষ করুন। প্রফেসানাল পলিটিক্যাল লিডারদের মতো মুখে তুরীয় লোকের একটি মধুর হাসি ফুটিয়ে হাতজোড় করলেন।

বললাম, 'আপনাদের তরফ থেকে মিত্র মশাইকে আমি বরণ করে নিচ্ছি—' বলে টেবলে যে মালাটা পড়ে ছিল সেটা অভ্যুদয়ের গলায় পরিয়ে বললাম, 'হাততালি দিন, হাততালি—'

চটর পটর করে কিছু কিছু হাততালি পড়ল। বোঝা গেল, অচেনা 'গড'টিকে সবাই মেনে নিতে পারছে না।

ভিড়ের ভেতর থেকে আচমকা একটা আখাম্বা ঢ্যাঙা টাইপের লোক খাড়া দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'ইনি আমাদের ভগবান হলেন ক্যামনে?'

মহাশয়গণ, মালটাকে দেখে মনে হল বেশ ঝামেলা পাকাবে। মাইকের কাছে এগিয়ে এসে বললাম, 'হারুণ অল রশিদের নাম শুনেছেন?'

লোকটা ভ্যাবাচাকা মেরে বলে উঠল, 'না। সে কে?'

'তিনি একজন বিরাট বাদশা, শাহেন শা। ছদ্মবেশে তিনি ঘুরে ঘুরে দেখতেন প্রজারা কে কেমন আছে। দুঃখী মানুষ দেখলে তাদের কষ্ট ফষ্ট দূর করার চেষ্টা করতেন। আমাদের মিত্র মশাই হচ্ছেন বিলকুল তা-ই। আপনারা টের পান নি, লুকিয়ে লুকিয়ে কখনও ভিখিরির ড্রেস বডিতে চড়িয়ে, কখনও মাদারী খেলোয়াড় সেজে, কখনও কাবলিওলার ইউনিফর্ম পরে এখানে একবছর ঘুরে গেছেন। আপনাদের দুঃখ ফুঃখ দেখে তাঁর বুক ফেটে যাচ্ছিল। অনেক মাথা খাটিয়ে, ভাবনা-চিন্তা করে তিনি নানা জায়গা থেকে ক্যাশ ট্যাশ জুটিয়ে এখানে লঙ্গরখানা খুলেছেন, বিষ্ণুযজ্ঞের ব্যবস্থা করেছেন। আপাতত একটা সপ্তাহের জন্যেও যদি আপনাদের মুখে স্লাইট হাসি ফোটানো যায় তার জন্যেই এই অ্যারেঞ্জমেন্ট।'

জনগণের মুখচোখের চেহারা এবার পুরোপুরি পালটে গেল। টেরিফিক মনোযোগ দিয়ে তারা অভ্যুদয় মিটারকে দেখতে লাগল।

মহাশয়গণ, এই মওকায় আমি ফের বলে উঠলাম, 'আমি বলব, অভ্যুদয় মিত্র। আপনারা সবাই গলা ফাটিয়ে বলবেন জিন্দাবাদ—'বলেই চেঁচিয়ে উঠলাম 'অভ্যুদয় মিত্র—'

মাকড়াগুলো কিন্তু জয়ধ্বনি দিল না। আসলে অভ্যুদয় মিটারকে আমার কথায় হুট করে মেনে নিতে চাইছে না এরা। আমি চোখের সিগনাল দিয়ে লগা অ্যাণ্ড তার গ্যাংকে জিন্দাবাদ বলতে বললাম। তারা চেঁচিয়ে উঠতেই ছোঁয়াচে ডিজিজের মতো সেটা সামনের শ্রোতাদের ভেতর ছড়িয়ে পড়ল। এবার তারা চেঁচিয়ে উঠল, 'জিন্দাবাদ—'

মহাশয়গণ, ভাল করে অভ্যুদয় মাকড়াকে লক্ষ করুন। কয়েক হাজার মানুষের জিন্দাবাদ শোনার পর তার মুখে মিনিমাম দুশো মেগাওয়াটের ইলেকট্রিসিটি জ্বলে উঠেছে। মনে মনে

বললাম, দাঁড়াও শ্লা, এই বিজলি আধঘণ্টার ভেতর বিলকুল নিভিয়ে দিচ্ছি।

আমি ফের শুরু করলাম, 'ভাইগণ বাবা-গণ মা-গণ, মিত্র মশাইকে দেখুন, কী সিম্পল পোশাক! ইনি ধান্দাবাজ পলিটিশিয়ান নন। আপনার আমার মতো অতি সিম্পল মানুষ। দেশের জনগণের দুঃখ কষ্ট দেখে দু বেলা দু'খানা করে চারখানা রুটি ছাড়া কিছু খান না, জামাকাপড় বলতে বছরে দু'খানা মোটা ধুতি আর লংক্লথের পাঞ্জাবি। ইনি পলাশডাঙার মানুষজন সম্পর্কে কী ভেবেছেন জানেন?'

সবাই কোরাসে জানতে চাইলো, 'কী? কী?'

'শুধু লঙ্গরখানা খুলে সাতদিনের জন্যে উনি আপনাদের আনন্দ দিতে চান না। এঁর টেরিফিক ইচ্ছে, আপনাদের মুখে পার্মানেন্ট হাসি ফুটুক। সেই জন্যেই আজ এখানে এসেছেন।'

'মাইরি আর কি! বলে কি চাঁদু! পার্মানেন্ট হাসি ফোটানো এতই সোজা!' ভিড়ের ভেতর থেকে খ্যাসখেসে গলায় একজন চেঁচিয়ে উঠল।

আরেক মাকড়া বলে উঠল, 'কী করে হাসি ফোটাবে গুরু?'

বললাম, 'একটাই মোটে ম্যাজিক আছে হাসি ফোটাবার। আর সেটা বিলকুল আপনাদের হাতে।'

'কী সেটা?' আবার সমবেত সঙ্গীত গাওয়ার মতো কয়েক হাজার লোক চেঁচিয়ে ওঠে। তার আওয়াজ হাওয়ায় হাওয়ায় কয়েক কিলোমিটার দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

চেল্লানি থামলে বললাম, 'বাবারা দাদারা মায়েরা বোনেরা, আপনাদের পার্মানেন্ট ভালোর জন্যে পরের ইলেকশানে অভ্যুদয় মিত্র মশাই এখান থেকে দাঁড়াবেন। আপনারা পালে পালে দলে দলে, সবান্ধবে সপরিবারে তাঁকে ভোট দিয়ে জেতান।'

জনতার ভেতর থেকে এক শ্লা খলিফা টাইপের মাল উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'এবার বুঝতে পারছি, ভোটের জন্যে তা হলে এনার এখানে আগমন। তাই বলি বিষ্টুযজ্ঞি আর খিচুড়ির এত বেবোস্থা কেন?'

আরেকটা লোক বাজখাঁই গলায় চেঁচায়, 'এতক্ষণে ঝুলি থেঙে (থেকে) আসল বেড়াল বেইরে (বেরিয়ে) পড়েছে গ।'

মহাশয়গণ, চোখের কোণে তারা দুটোকে এনে মার্ক করলাম, অভ্যুদয় মিটার গল গল করে ঘামতে শুরু করেছেন। কয়েক লাখ ক্যাশ খরচা হয়ে গেছে। তারপরও যদি এখানকার খজড়াগুলো বিগড়ে গিয়ে ভোট ফোট না দেয়!

যাক গে, আমি এবার এভাবে স্টার্ট করলাম, 'দেখুন মহাশয় আর মহাশয়াগণ, অভ্যুদয় মিত্তির মশাই নির্লোভি সাধুর লাইনের মানুষ। উনি কোনোভাবেই ভোটে নামতে চান নি। আমরাই টেনে হিঁচড়ে জবরদস্তি করে ওঁকে নামাতে চাইছি। এতে ওঁর কোনো গেইন নেই, সবটুকু প্রফিট আপনাদের। ভেবে দেখবেন, উনি এম.এল.এ হতে পারলে ডেফিনিটলি মিনিস্টার হবেন।'

একটা সিঁড়িঙ্গে গিঁট পাকানো চেহারার লোক সট করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'মিনিস্টার হলে আমরা কি সাপের পাঁচ পা দেখব? না, উনি স্বগ্‌গের সিঁড়ি আমাদের পায়ের কাছে এগিয়ে

এনে দেবেন?'

'উঁহু, সাপের পাঁচ পা-ও গজাবে না, স্বগ্‌গের সিঁড়িও মিত্র মশাই ম্যানুফ্যাকচার করে দেবেন না। ওঁকে সবাই যদি একটা করে ভোট দেন, এখানে বড় বড় কারখানা বসবে, হাসপাতাল হবে, আপনাদের ঘরের ছেলেমেয়েরা চাকরি বাকরি পাবে। ভেবে দেখুন, আপনাদের দিক থেকে একটা পয়সাও খরচা নেই, স্রেফ ভোটের কাগজে একখানা শীল মেরে দেবেন, তার বদলে কত কী পেয়ে যাচ্ছেন!'

'এর আগে কত সুম্মুন্দিই তো কত লম্বা লম্বা বাত ঝেইড়ে গেল। আমাকে ভোট দিলে এই হবে, সেই হবে। মেয়ের বিয়ে, বাপের ছেরাদ্দ, ছেলের পড়াশোনা —সব বেবোস্থা করে দেব। কিন্তু ভোটটি বাগিয়ে নিয়ে সেই যে শালোর ব্যাটার সরে পড়ল, পাঁচ বছর আর তাদের টিকি দেখার জো লেই গ বাবুমশায়—'

আমি দাঁত বার করে স্লাইট হেসে বললাম, 'আগে অনেককে ভোট দিয়ে তো ঠকেছেন। ধরুন, আরেক বার ঠকবেন। আপনাদের সেবা করার জন্যে মিত্র মশাই মুখিয়ে আছেন। ওঁকে ওনলি একবার চান্স দিয়ে দেখুন। নইলে এর পরেও তো ইলেকশান আছে। এক মাঘে শীত যায় না। কিছু রেজাল্ট না পেলে তিরিশ কিলোমিটারের ভেতর মিত্র মশাইকে 'ইন' করতে দেবেন না।'

লোকগুলো নিজেদের ভেতর ভ্যান ভ্যান করে কী সব পরামর্শ করে নিল। তারপর কয়েকজন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'তা কথাটা মোন্দ বলেন নি বাবুমশায়। কাউক্কে না কাউক্কে ভোট তো দিতেই হবে। তা এনাকেই না হয় একবার সুযুগ দেওয়া যাক—'

হে-হে মহাশয়গণ, আপনারা নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছেন, পলাশডাঙার মাকড়াদের প্রায় ভিজিয়ে এনেছি। চটপট বললাম, 'দাদারা বাবারা মায়েরা, এবার জনদরদী মিত্র মশাইয়ের মুখেই শুনুন, ভোট ফোট পেলে তিনি এখানে কী করবেন—'

'তা তো আপনিই বললেন।'

'আমার বলা আর এঁর বলায় অনেক তফাত। আমি আপনাদের ফল্‌স আশা ফাশা দিচ্ছি কিনা, সেটা আসল লোকের কাছ থেকে শুনে নেওয়া ভাল। তা ছাড়া আপনাদের যদি আরো কিছু চাওয়ার থাকে, এখনই তা চেয়ে নিন।' বলে অভ্যুদয় মিটারকে মাইকের সামনে এগিয়ে দিলাম। বললাম, 'স্টার্ট করুন স্যার—'

ডায়াসের ওধারে বোদা টেপ-রেকর্ডার নিয়ে বসে ছিল। আমি স্ট্রেট তার দিকে তাকিয়ে চোখ আর হাতের সিগনাল দিলাম। সে বুঝতেপারল এবার কী করতে হবে।

লগা অ্যাণ্ড হিজ রেজিমেন্ট দাঁড়িয়ে ছিল ডায়াসের পেছন দিকে। আমি লগার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম।

মহাশয়গণ, বাঁ পাশের মাইকের সঙ্গে সেই টেপ-রেকর্ডারটা জুড়ে রেখেছিলাম। বোদা এবার সেটা চালিয়ে দিল। ওধারে ডান পাশে মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে মাইম অ্যাক্টিং শুরু করে দিলেন অভ্যুদয়। লাউড স্পিকারে তাঁর টেপ-করা ভয়েস গাঁক গাঁক করে চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

'আমার পলাশডাঙার ভাইগণ এবং বোনগণ, প্রথমেই আপনাদের জানিয়ে রাখি, জগতে সব মানুষের কাছেই নিজের প্রাণ সব থেকে প্রিয়। কিন্তু তেত্রিশ কোটি দেবতার নামে শপথ করে বলছি আমি নিজের প্রাণের চেয়েও আপনাদের বেশি ভালবাসি।

'স্বয়ম্ভুর মুখে আপনারা শুনেছেন আমি মাঝে মাঝে কাউকে কিছু না জানিয়ে এখানে ঘুরে গেছি। আপনাদের দুঃখ-দুর্দশা দেখে আমার বুক ফেটে গেছে—'

মহাশয়গণ, অভ্যুদয়ের স্পিচের টেম্পো যখন চড়ছে, আমি সট করে লগাকে নিয়ে ডায়াসের পেছন দিয়ে নেমে, খানিকটা ঘুরে ফ্রন্টের দিকে এসে শ্রোতাদের ভেতর নিজেদের গুঁজে দিলাম।

অভ্যুদয়ের গলা ইমোশানে কাঁপতে কাঁপতে লাউড স্পিকারের ভেতর দিয়ে দশ বারো হাজার শ্রোতার কানে ঢুকে যাচ্ছিল।

'এতকাল যারা আপনাদের কাছে ভোট চাইতে এসেছে আমি সেই দলে পড়ি না। আমি খুবই সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষ। আপনাদের সঙ্গে আমার বিন্দুমাত্র তফাত নেই। আপনাদের সুখ আমার সুখ, আপনাদের দুঃখ আমার দুঃখ, আপনাদের কষ্ট আমার কষ্ট।

'আমি আপনাদের সত্যিকারের যে আপনজন সেটা বোঝাবার জন্যে একটা কথা জানাতে চাই। আমি একদিন আপনাদের মতোই ছোটখাটো দোকানদারি করেছি, ট্রেনে ট্রেনে হকারি করে পেটের ভাত জুটিয়েছি। ভাইয়েরা বোনেরা, আমি আপনাদেরই একজন। এমনও দিন গেছে যখন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মাটি কুপিয়েছি, জমিতে সোনার ধান ফলিয়েছি—'

অভ্যুদয়ের স্পিচ এই পর্যন্ত আসার জন্য ওয়েট করছিলাম। ঝট করে লগার কানে মুখ গুঁজে বললাম, 'অভ্যুদয়কে জিজ্ঞেস কর, আপনি তো এত কিছু করেছেন—তা কোনোদিন ডিম পেড়েছেন?'

লগা এক সেকেণ্ডেও দেরি করল না। সোজা পারপেণ্ডিক্লারের মতো খাড়-হয়ে যা শিখিয়ে দিয়েছিলাম, তাই জিজ্ঞেস করল। আগে থেকে বোদাকে ট্রেনিং দেওয়া ছিল, সে বোতাম টিপে ঠিক ক্রিটিক্যাল মোমেন্টে টেপ-রেকর্ডার বন্ধ করে দিল।

লগাকে আর একবার খুঁচিয়ে দিতে সে ফের চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল,'কী মশাই, বললেন না তো ডিম পেড়েছেন কিনা?'

লগার বলার স্টাইলটা এমনই মজাদার যে চারদিকের মানুষ খ্যাল খ্যাল করে হাসতে লাগল। মহাশয়গণ, আপনারা তো জানেনই হাসিটা হল একজিমা কি পাঁচড়ার মতো টেরিফিক ছোঁয়াচে টাইপের রোগ। সেটা ক্রমশ দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

এবার মহাশয়গণ, অভ্যুদয় মিটার মালটির দিকে তাকান। মাছ ফাছ যেভাবে খাবি খায়, শ্লার এখন বিলকুল সেই অবস্থা। ম্যালেরিয়ার পেশেন্টের মতো যেভাবে সে কাঁপছে তাতে মনে হয় এক সেকেন্ডও আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না, এক্ষুনি লাট খেয়ে পড়ে যাবে।

এদিকে ক্রাউড মজার গন্ধ পেয়ে কোরাসে চেঁচাতে লাগল, 'বলুন মশাই, বলুন—ডিম পেড়েছেন কখনো?'

অভ্যুদয় কী উত্তর দেবে, ভেবে না পেয়ে টেরিফিক ঘাবড়ে গিয়ে ডায়াসের পেছন দিকে

বার বার তাকাতে লাগলেন। মহাশয়গণ, নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পারছেন মাকড়া তার সেভিয়র মানে পরিত্রাতা অর্থাৎ আমাকেই খুঁজছে। কিন্তু কোথায় পাবে সে আমাকে ? আমি তো জনগণের মধ্যেই বসে বসে তার বারোটা বাজাবার প্ল্যান করছি।

এবার আমি যা যা শিখিয়ে দিলাম, বুলেটের মতো সেগুলো ঝেড়ে যেতে লাগল লগা।

'হ্যাঁ মশাই, আপনি তো এখানে ভিখিরির ড্রেস গায়ে চড়িয়ে ভোট চাইতে এসেছেন। তা আপনার নাকি কলকাতায় দামী দামী জায়গায় দশটা বাড়ি আর বারোটা ফ্ল্যাট আছে?'

'আপনি কি দশটা কারখানার মালিক?'

'আপনার নাকি সুইস ব্যাঙ্কে পঞ্চাশ কোটি ব্ল্যাক টাকা আছে?'

এই জাতীয় বুলেট একটার পর একটা ঝেড়ে যেতে লাগল লগা। ডায়াসের ওপর অভ্যুদয়কে মার্ক করুন মহাশয়গণ, শ্লার এক্ষুনি এক সঙ্গে করোনারি আর সেরিব্রাল দুটো অ্যাটাকই হয়ে যাবে।

পেছন দিকে বার বার তাকাতে তাকাতে মাইকের কাছে মুখ এনে মরিয়া হয়ে কিছু বলবার চেষ্টা করলেন অভ্যুদয় কিন্তু তাঁর গলা দিয়ে গোঙানি ছাড়া আর কোনো আওয়াজ বেরুল না। শ্লার যা অবস্থা , দুম করে হার্ট ফেল করে বসলে পুলিশ এসে ঝামেলা বাধিয়ে বসবে।

এদিকে ভিড়ের ভেতর টেরিফিক হল্লা শুরু হয়ে গেছে।

'ব্যাটাচ্ছেলে জোচ্চোর, আমাদের বুদ্ধু বানিয়ে ভোট হাতাবার তালে এসেছে। ঠাকুদ্দার বিয়ে দেখিয়ে ছাড়ব।'

'দে, শালার বদন বিগড়ে —'

'মার খচ্চরটাকে, মার —'

এর মধ্যে দু-চারটে আধলা ইট আর ছেঁড়া চটি ফ্লাইং সসারের মতো অভ্যুদয়ের দিকে উড়ে গেল।

আচমকা মাইকে অভ্যুদয়ের একটা বুক-ফাটানো চিৎকার শোনা গেল, 'বাঁচাও স্বয়ম্ভু, বাঁচাও। আমাকে এরা মেরে ফেলবে—'

মহাশয়গণ, জনতা যেভাবে ভায়োলেন্ট হয়ে উঠেছে তাতে আমার আর বসে থাকা ঠিক হবে না। স্প্রিংয়ের মতো লাফ দিয়ে উঠে ডায়াসের দিকে ছুটলাম, তার ভেতর আরো কিছু খোয়া আর জুতো ছুঁড়েছে জনগণ। দু-একটা টার্গেটে গিয়ে লেগেছেও। অভ্যুদয়ের কপাল আর গাল বেয়ে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসছে।

আমি ডায়াসে উঠে অভ্যুদয়কে মাইকের সামনে থেকে সরিয়ে দিয়ে জনতাকে বললাম, 'শান্ত হোন ভাইয়েরা বোনেরা, শান্ত হোন।' কিন্তু জনগণ শান্ত হল না, বরং আরো ক্ষেপে উঠল। সবাই একসঙ্গে গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে, ফলে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

ডায়াসে আসার সময় লগাকে একটা ব্যাপার শিখিয়ে এসেছিলাম। সবার ভয়েস ছাপিয়ে এবার তার গলা শোনা গেল, 'এ শালা অভ্যুদয় মিত্তিরের চামচা। আগে এসে যজ্ঞি ফজ্ঞির বেবোস্থা করে আজ অভ্যুদয়কে টেনে এনেছে। মার খচ্চরগুলোকে—'

আবার এক ঝাঁক ইট এসে পড়ল। বেশির ভাগই এধার ওধার দিয়ে উড়ে গেল। তিন চারটে

অবশ্য আমার কোমরে পেটে হাঁটুতে এসে লেগেছে।

মহাশয়গণ, বুঝতেই পারছেন, রিস্কটা স্লাইট বেশিই নিয়ে ফেলেছি। ডায়াসে দাঁড়িয়ে থাকাটা এখন আর কোনোভাবেই ঠিক হবে না। কোমরে মোচড় দিয়ে ঝট করে ঘুরে দাঁড়ালাম। তারপর অভ্যুদয়ের একটা হাত ধরে হ্যাঁচকা টানে ডায়াসের পেছন দিয়ে লং জাম্প মারতে মারতে বোদাকে চেঁচিয়ে বললাম, 'বোদা, টেপ রেকর্ডটা নিয়ে ফুটে যা।'

আমার কথা শেষ হতে না হতেই বোদা এক ঝটকায় টেপ রেকর্ডারের তার ফার খুলে নিয়ে আমাদের পেছন পেছন লং জাম্প মারল। তারপর তিনজন দম বন্ধ করে ঘন্টায় পঞ্চাশ মাইল স্পিডে সামনের দিকে দৌড় শুরু করলাম।

ছুটতে ছুটতেই টের পাওয়া গেল, পেছন থেকে কয়েক হাজার লোক আমাদের তাড়া করে আসছে। 'ধর শালাদের, ধর গুয়োর বেটার ছেলেদের।'

অভ্যুদয়ের হাতটা আমার মুঠোর ভেতর ধরা রয়েছে। মাকড়ার ননী-মাখন-হুইস্কি খাওয়া বডি। কোনোদিন এক সঙ্গে পঞ্চাশটা স্টেপ হেঁটেছে কিনা সন্দেহ। তাকেই কিনা ইলেকট্রিক ট্রেনের স্পিডে দৌড়তে হচ্ছে। মাঝে মাঝে পিছিয়ে পড়লে হ্যাঁচকা টানে তাকে পাঁচ ফুট সামনের দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছি।

ছুটতে ছুটতে অভ্যুদয় সমানে ঘ্যান ঘ্যান করে যাচ্ছেন, 'আমি ফেইন্ট হয়ে যাব স্বয়ম্ভু। আর পারছি না—'

বললাম, 'পারতেই হবে। ওরা ধরতে পারলে ফেইন্ট না, ডেফিনিটলি মার্ডার হয়ে যাবেন।'

মহাশয়গণ, এদিকটায় এখনও ইলেকট্রিসিটি আসে নি। পলাশডাঙা স্টেশন থেকে দু'শ গজ যাবার পর শুধু ধানখেত। ঘন অন্ধকারে চারদিক ঢেকে আছে। এই অন্ধকারটাই কাজে লেগে গেল। পেছনে তাড়া করে আসার পর জনতা একসময় হাল ফাল ছেড়ে দিল। বুঝল, আমরা তাদের আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে বেরিয়ে গেছি। আর আমাদের ধরা যাবে না।

জনতা আমাদের ছেড়ে দিলেও আমরা স্পিড কমাই নি। ফাঁকা মাঠের ওপর দিয়ে তিন চার কিলোমিটার ছুটবার পর একটা রেল স্টেশন পেয়ে গেলাম। টেনে হিঁচড়ে অভ্যুদয়কে যখন প্ল্যাটফর্মে এনে তুললাম, তার বডি থেকে প্রাণটা বেরিয়ে যেতে আর বেশি দেরি নেই। মাকড়াকে একটা ফাঁকা বেঞ্চিতে শুইয়ে দিলাম।

আধ ঘন্টা ওয়েট করার পব কলকাতার ট্রেন এসে গেল। ডাউন ট্রেনটায় এখন একেবারেই ভিড় নেই। বোদা আর আমি ধরাধরি করে অভ্যুদয় মাকড়াকে একটা কমপার্টমেন্টে তুলে ফের শুইয়ে দিলাম। চোখ বুজে লাট খেয়ে পড়ে রইল মালটা।

বোদা চোখের তারা ফিক্সড করে ফিসফিসিয়ে আমাকে বলল, 'মালের যা হাল, ফট হয়ে যাবে নাকি?'

মহাশয়গণ, আপনারা তো জানেনই, ওয়ার্ল্ডের কোনো ব্যাপারেই আমি ঘাবড়াই না, নির্বিকার পরম ব্রহ্মের মতো সব কিছু দেখে যাই। অভ্যুদয়ের হাল দেখে আমি পর্যন্ত ভেতরে ভেতরে ভড়কে গেলাম। মাকড়া যদি সত্যি সত্যি সামতানির ছেলের বিয়ের আগে দেহরক্ষা করে বসে আমার অনেকগুলো প্ল্যান বিলকুল কিচাইন হয়ে যাবে। আমি ঝট করে অভ্যুদয়ের

ডান হাতটা তুলে নাড়ি টিপলাম। দেড় ইঞ্চি চর্বির তলায় প্রথমে পালস্ তো খুঁজেই পাই না। মিনিট তিনেক হাতড়াবার পর টের পাওয়া গেল খুব আস্তে আস্তে সেটা নড়ছে। তার পরেই হাতটা অভ্যুদয়ের নাকের তলায় নিয়ে এলাম। দেখা গেল তির তির করে নিঃশ্বাস পড়ছে। তার মানে মাকড়া মরে যায় নি।

আমার স্লাইট যে নার্ভাসনেস ছিল সেটা কেটে গেল। অভ্যুদয়কে তাঁর বাড়িতে সেট করে দিতে পারলেই এখন আমার ছুটি। হে হে মহাশয়গণ, এরপর সেন্সটা ভাল করে ফিরলে অভ্যুদয় যে কী করবে আর কী বলবে তা আমার জানা আছে। আমি সেগুলো এক কান দিয়ে ঢুকিয়ে স্ট্রেট আরেক কান দিয়ে বার করে দেব। অবশ্য ভয়েসটা মধুতে চুবিয়ে একের পর এক প্রতিশ্রুতি-ফ্রুতি দিয়ে যাব।

বোদা বুকের ভেতর দম আটকে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। বলল, 'গুরু কিরকম বুঝছ?'

বললাম, 'মাল বেঁচে আছে। ডোন্ট ওরি—'

'যাক বাব্বা—' বলে হুস করে স্টিম ইঞ্জিনের মতো জোরে নিঃশ্বাস ছেড়ে বোদা পকেট থেকে চারমিনারের প্যাকেট আর দেশলাই বার করে ধরিয়ে নিল। তারপর প্যাকেটটা আমার দিকে বাড়িয়ে বলল, 'শ্লা আজ যা কারবার হল, লাইফে আর এ মাল এম. এল. এ হতে চাইবে না। দৌড়ুতে দৌড়ুতে মাকড়ার কোমরের বল বেয়ারিং ঢিলে হয়ে গেছে।'

ঠোঁটের ফাঁকে সিগারেট সেট করে দেশলাই জ্বেলে ধরিয়ে নিতে নিতে বললাম, 'চাঁদু, পলিটিকস এমন চীজ যে চিতেয় ল্যান্ড করার আগে কেউ ছাড়তে চায় না।'

মহাশয়গণ, আমার কথা শেষ হবার আগেই দুম করে বডিতে তিন চার বার মোচড় মেরে উঠে বসলেন অভ্যুদয় মিটার। বললেন, 'যা বলেছ স্বয়ম্ভু! পলিটিকস হচ্ছে ব্রাউন সুগারের মতো ব্যাপার। ধরলে আর ছাড়া যায় না। উঁ—উঁ—উঁ—' বলতে বলতে যন্ত্রণায় তাঁর মুখটা কালচে মেরে গেল। 'উঁ, কী ছোটাটাই না ছোটালে, আমার লাইফে এভাবে কখনও দৌড়ুতে হয় নি। হাড় পাঁজরা মনে হচ্ছে খসে যাবে।'

অভ্যুদয়ের যে টনটনে জ্ঞান ছিল আগে বুঝতে পারি নি। মনে মনে উৎকৃষ্ট কিছু খিস্তি ঝেড়ে, চোখেমুখে টেরিফিক উদ্বেগ ফুদ্বেগ ফুটিয়ে বললাম, 'আরে আরে, উঠে পড়লেন যে স্যার। আনেক কষ্ট হয়েছে, বেঞ্চে বডি ফেলে দিন।'

অভ্যুদয় শরীরটা সিকি মিটার হেলিয়ে বসলেন, 'না না, বডি ফেলতে হবে না। আমি এভাবেই বসে থাকি।'

মহাশয়গণ, সঙ্গগুণ বা সঙ্গদোষ কাকে বলে, একবার মার্ক করুন। অভ্যুদয় মিটারের মতো বিগ বিজনেসম্যান বিলকুল আমাদের মতো ফোরটোয়েন্টিদের ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলতে শুরু করেছেন।

আমি কিছু বলার আগে অভ্যুদয় আবার বললেন, 'বক্তৃতার টেপ বাজাতে বাজাতে ওরকম হঠাৎ আটকে গেল কেন?'

বোদার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে বললাম, 'কি রে, তুই তো টেপের কাছে বসে ছিলি, গড়বড় হল কেন?'

বোদা আমার ইঙ্গিতটা বুঝে বলল, 'ইলেকট্রিকের লাইন জড়িয়ে মড়িয়ে ঝামেলা পাকিয়ে গিয়েছিল। টানা-হ্যাঁচড়া করে ঠিক করতে গিয়ে লাইনটা খুলে এল। তারপর আর কিছুতেই শ্লাকে কায়দা করতে পারলাম না গুরু।'

'তুমি তো কায়দা করতে পারলে না। এদিকে আমার অবস্থাটা কী হল, একবার বুঝে দেখ। আই অ্যাম টোটালি ফিনিশড।' বলতে বলতে অভ্যুদয়ের গলার স্বর বুজে এল।

মহাশয়গণ, লক্ষ করে দেখুন, অভ্যুদয়ের চোখেমুখে বারোটা পুত্রশোকের কষ্ট ফুটে উঠেছে।

অভ্যুদয় বডিটা আরো অনেকখানি এলিয়ে দিয়ে বললেন, 'টেপটা বন্ধ হয়ে গেল বলেই আজ আমার এই অবস্থা। আমি এত নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম যে চোখের সামনে সব অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। তার ওপর—'বলতে বলতে আমার দিকে ফিরলেন, 'দেখলাম, তুমি ডায়াসে নেই। ওদিকে অডিয়েন্সের ভেতর থেকে এই রকম জঘন্য সব প্রশ্ন করা হচ্ছিল। সেই সঙ্গে ইটও পড়তে শুরু করেছিল। ভয়ে আমার হার্ট আর লাংস ফেটে যাবে মনে হচ্ছিল। কোথায় গিয়েছিলে তুমি?'

মহাশয়গণ, আপনারা তো জানেনই, এক সেকেন্ড না ভেবে যে কোনো প্রশ্নের উত্তর আমি দিয়ে যেতে পারি। বললাম, 'যারা ওই সব প্রশ্ন ফ্রশ্ন করে ঝামেলা পাকাচ্ছিল তাদের থামাবার জন্যে অডিয়েন্সের ভেতর চলে গিয়েছিলাম।'

'আই সী—'বলে কয়েক সেকেন্ড চুপ করে রইলেন অভ্যুদয়। তারপর একটু ভেবে বললেন, 'কারা ওভাবে ডিসটারব্যান্স ক্রিয়েট করছিল?'

'আমার মনে হয় স্যার—'এই পর্যন্ত বলে আচমকা চুপ করে গেলাম।

অভ্যুদয় চোখের তারা ফিক্সড করে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কী মনে হয়?'

'বিজনেস আর ইন্ডাস্ট্রিয়াল সার্কেলে ডেফিনিটলি আপনার কোনো পাওয়ারফুল এনিমি রয়েছে। তাদের কেউ এজেন্ট লাগিয়ে আপনার পলিটিক্যাল লিডার হওয়া আটকাতে চায়।'

শুনতে শুনতে অভ্যুদয়ের চোখ আর কপাল কুঁচকে যেতে লাগল। আস্তে আস্তে শিরদাঁড়াটা খাড়া করে বসে বললেন, 'হতে পারে স্বয়ম্ভু। এটা হওয়া খুবই সম্ভব। তা না হলে পলাশডাঙার অর্ডিনারি পিপল যারা আমাকে আগে কোনোদিন দেখে নি, আমার সম্বন্ধে এত সব খবর পেল কী করে?'

মহাশয়গণ, আপনারা তো জানেনই, পলাশডাঙার মাকড়ারা কিভাবে কোত্থেকে অত খবর ফবর পেয়েছে। আমি উত্তর দিলাম না।

পর পর তিন চারটে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে অভ্যুদয় ফের লাট খেয়ে পড়লেন, 'আমার আর স্টেট অ্যাসেমব্লিতে যাওয়া হল না স্বয়ম্ভু।'

মহাশয়গণ, আপনারা তো জানেনই, মাকড়া যাতে এম. এল. এ বা এম. পি না হতে পারে তার সব ব্যবস্থাই সুচারুভাবে আমি করে যাব। কিন্তু মুখে তা তো আর বলা যায় না। যা উত্তর দিলাম তা এইরকম, 'ফিকর মাত কীজিয়ে স্যার। পলাশডাঙায় আপনি ইনভেস্ট করে ফেলেছেন, ওখান থেকেই আপনাকে ইলেকশানে জিতিয়ে নিয়ে যাব। তা না হলে আমার একটা ঠ্যাং আর একটা কান নির্ঘাত কেটে নেবেন। ও. কে স্যার?'

অভ্যুদয় আমার প্রতিশ্রুতিতেও চাঙ্গা হলেন না। মিয়ানো গলায় বললেন, 'যেভাবে লোকগুলো আমাকে ইট মারল তাতে ইলেকশানে জেতার কি আর আশা আছে?'

'এরপর দেখবেন ওরা আপনাকে ইটের বদলে ফুলের মালা দিচ্ছে। নতুন প্ল্যানটা করতে আমাকে একটু সময় দিন।'

'কত সময় চাইছ?'

একটু ভেবে বললাম, 'ধরুন মাসখানেক। এখনও তো ইলেকশানের দেরি আছে।'

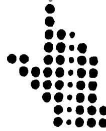
অভ্যুদয় মাকড়ার আর তর সইছে না। বললেন, 'এক মাস! এত দিন?'

'স্যার, আজ যে কারবার হয়ে গেল সেটা সামলাতে স্লাইট সময় তো দিতেই হবে। তা ছাড়া সামতানি সাহেবের ছেলের বিয়েটাও এসে পড়েছে। ওটা চুকে গেলেই নতুন এনার্জি নিয়ে আমরা পলাশডাঙায় ঝাঁপিয়ে পড়ব।'

'ঠিক আছে, তুমি যা বললে তা-ই হবে।'

এর পর আর বিশেষ কথাবার্তা হল না।

ঘন্টাখানেক বাদে ইলেকট্রিক ট্রেন আমাদের তিনজনকে কলকাতায় পৌঁছে দিল।



হে হে মহাশয়গণ, আপনারা বুঝতে পারছেন কিনা জানি না। পলাশডাঙা থেকে সেদিন ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে অভ্যুদয় মিটারের ব্যাপারে যবনিকা পতন ঘটে গেছে। তাঁর সম্পর্কে আমি আর কিছু ভাবছি না। জনগণের জন্য দু জায়গায়, মানে আগরপাড়া আর পলাশডাঙায় 'আই অপারেশন ক্যাম্প' আর লঙ্গলখানা-কাম-বিষ্ণু যজ্ঞের আসর বসিয়ে মিনিমাম বারো চোদ্দ লাখ টাকা খসিয়ে দিয়েছি। লেবু আর কচলাতে গেলে ধরা পড়ে যাবার সম্ভাবনা। মাকড়ার এম. এল. এ হওয়ার স্বপ্ন ফপ্ন ঝুলতে থাকুক। এক মাস ওঁর কাছ থেকে টাইম নিয়েছি। তার আগেই—না মহাশয়গণ, সিনেমার অন্তিম দৃশ্য আগে জানিয়ে দিতে চাই না। আপনারা ওয়েট করুন, দেখতে থাকুন। মোটে তো কয়েকটা দিন।

কলকাতায় ফেরার পর একটা দিন ফুল রেস্ট নিলাম। মানে বিছানায় শুয়ে শুয়েই টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স কেটে গেল। পরের দিন গড়িয়াহাটের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে সামতানির অফিসে ফোন করলাম। ফার্স্ট অ্যাটেমপ্টেই মাকড়াকে পাওয়া গেল।

সামতানি আমার গলা শুনে খুশিতে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আরে স্বয়ম্ভু, কবে ফিরলে পলাশডাঙা থেকে?'

'পরশু রাত্তিরে স্যার।'

'ওখানকার খবর কী?'

মহাশয়গণ, বুঝতে পারছি সামতানির সঙ্গে এর ভেতর অভ্যুদয় মিটারের দেখা ফেখা হয়

নি। তাই পলাশডাঙার খবর এখনও পান নি। দু-একদিনের ভেতর দেখা নিশ্চয়ই হয়ে যাবে। তখন ডেফিনিটলি সব কিছু জেনে যাবেন। একটু ভেবে বললাম, 'ওখানে স্যার স্লাইট আপসেট হয়ে গেছে।'

সামতানি যেন প্রথমটা বিশ্বাসই করতে পারলেন না। বললেন, 'তুমি থাকতে আপসেট হল!'

'হ্যাঁ স্যার। মিটার সাহেবের অনেক এনিমি রয়েছে। তারাই সাবোটাজ করেছে। তবে আপনি একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন স্যার—'

'কোন ব্যাপারে?'

'মিটার সাহেবকে আমি ওই পলাশডাঙা থেকেই জিতিয়ে অ্যাসেম্বলিতে 'ইন' করিয়ে ছাড়ব। এটা আমার চ্যালেঞ্জ।'

'তোমার ওপর সে কনফিডেন্স আমাদের আছে।'

'যাক গে, অভ্যুদয় স্যারের কেসটা এখন থাক। আপনার ব্যাপারটা আগে মিটিয়ে ফেলা যাক।'

'দ্যাটস ফাইন। বল, আমাকে কী করতে হবে।'

একটু ভেবে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার ছেলে লন্ডন থেকে কি চলে এসেছে?'

'হ্যাঁ।' সামতানি বললেন।

'ভালই হয়েছে। প্রতাপরুদ্রগড়ের প্রিন্সেসের সঙ্গে কবে আপনারা আলাপ করতে যাবেন?'

'তুমি যেদিন বলবে সেদিনই যাব।'

'আজ মঙ্গলবার। নেক্সট স্যাটারডে হলে অসুবিধা হবে?'

'নট অ্যাট অল। স্যাটারডে কখন?'

'ধরুন বিকেলে চারটে নাগাদ।'

'ঠিক আছে। কিন্তু আমরা তো ওঁদের চিনি না, ঠিকানাও জানি না। যাব কী করে?'

'আপনারা আপনার অফিসে রেডি হয়ে থাকবেন। আমি স[illegible] চারটেয় গিয়ে আপনাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাব।'

'দ্যাটস গুড।'

'তবে একটা কথা স্যার—'

'হ্যাঁ, বল।'

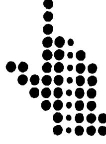
'ব্যাপারটা এখন যেন সিক্রেট থাকে। রাজকুমারীর ম্যারেজ বলে কথা। বেশি জানাজানি হয়ে গেলে ভাংচি পড়তে পারে। মানে আপনাদের ব্যাকগ্রাউন্ড তো ভাল না। নানা খারাপ রাস্তায় প্রচুর ব্ল্যাক মানি জমিয়েছেন। আপনাদের অনেক সিক্রেট এনিমি ফেনিমি থাকে তো, তারা সব কিচাইন করে দিতে পারে।'

'রাইট, রাইট। তুমি যেমন বলেছ তেমনটাই হবে।'

'প্রিন্সেসকে বেশি প্রশ্ন ফ্রশ্ন করবেন না।'

'না না, ফর নাথিং প্রশ্ন করার দরকারটা কী? আমাদের কাজ হলেই হল।'

'ফাইন। তা হলে ওই কথাই রইল স্যার।' বলে ঝট করে লাইন কেটে দিলাম।



হে হে মহাশয়গণ, এরপর কয়েকটা দিন টেরিফিক ব্যস্ততার মধ্যে কেটে গেল। আমার লাইফে এরকম বিজি আর কখনও থেকেছি বলে মনে হয় না।

পাক্কা তিন দিনের ভেতর দেওয়ান থেকে স্টার্ট করে শেফ শোফার বয় বেয়ারা মালী দারোয়ান ইত্যাদি ইত্যাদি প্রায় চার ডজন লোককে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হল। মহাশয়গণ, আপনারা তো জানেনেই, মালেদের কোত্থেকে কালেক্ট করা হয়েছে। আগরপাড়ার বস্তি থেকে সেই খজড়াগুলোকে তুলে এনে সার্কুলার রোডের প্যালেসে সেট করে দিয়েছি। ওরা ছাড়া পলাশডাঙার লগা অ্যান্ড কোম্পানি তো রয়েছেই।

মহাশয়গণ, মাকড়াগুলোকে চিনতে নিশ্চয় আপনাদের খুবই অসুবিধে হচ্ছে। তা তো হবেই। পঞ্চানন প্রত্যেকের ডেজিগনেশান অনুযায়ী লিন্ডসে স্ট্রিটের এক দামী টেলরের কাছ থেকে নতুন ড্রেস করিয়ে এনেছে। শ্লা ধবধবে ইউনিফর্ম, চকচকে বুট আর পাগড়ি ফাগড়ি থেকে জেল্লা যা মারছে!

চার পাঁচটা নতুন মডেলের ফরেন কার-ও ভাড়া করে আনা হয়েছে। আর এনেছি তিন চারটে ঝকমকে ফিটন। ফিটনগুলো টানার জন্যে দামী দামী ওয়েলার ঘোড়াও যোগাড় করেছে পঞ্চানন। সেগুলোর গা এত তেলতেলে যে মাছি বসলে স্লিপ কেটে পড়ে যাবে।

বাড়ির সামনের লন-এ চারটে ফোয়ারা অনবরত একশ'টা মুখ দিয়ে পিচকিরির মতো জল ছিটিয়ে যাচ্ছে। মালীরা চারদিকে নানা টাইপের রং বেরঙের ফুল তো ফুটিয়েছেই, তা ছাড়া শেকড়সুদ্ধু ঝাউ গাছ ফাছ এনে প্ল্যান করে বসিয়ে দিয়েছে. কোন শ্লা বলবে এটা রিয়েল প্যালেস নয়!

হাজারটা ঝামেলা মিটিয়ে কাল সুমনা আর তার ফ্যামিলিকে সার্কুলার রোডের প্যালেসে নিয়ে এসেছি। রাজপ্রাসাদ তো সুমনা আগেই দেখে গিয়েছিল। তার রি-অ্যাকশান ততটা হেভি হয় নি। কিন্তু তার মা, দিদি এবং দিদির লেণ্ডিগেণ্ডিরা এখানে পা দিয়ে এত ঘাবড়ে গিয়েছিল যে কোরাসে কান্না জুড়ে দিয়েছিল। বস্তি ফস্তি থেকে দুম করে কাউকে এরকম একটা জায়গায় তুলে আনলে কার না ভয় হয়! অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাদের ঠাণ্ডা করতে হয়েছে।

মহাশয়গণ এই তিন দিনে আরো একটা টেরিফিক কারবার আমাকে করতে হয়েছে। একটা লম্বা খাতায় চিত্রনাট্য লেখার স্টাইলে কিছু কিছু ডায়লগ লিখে রেখেছি। সেগুলো সুমনাকে দিয়ে অনেক বার পড়িয়ে পড়িয়ে স্টেজ রিহার্সাল করিয়ে রেখেছি যাতে ও বুঝতে পারে সত্যি সত্যি এটা বিয়ে নয়—সিনেমা। কিন্তু রিয়াল কারবারটা কী সেটা তো আপনারা জানেনেই।

সামতানির বাড়িতে গিয়েও তাঁদের হোল ফ্যামিলিকে রিহার্সাল করাতে হয়েছে। তবে ওখানে চিত্রনাট্যের খাতাটা নিয়ে যাই নি। মুখে মুখেই ডায়লগ বলিয়েছি। বুঝতেই পারছেন মহাশয়গণ, আমাকে দড়ির ওপর দিয়ে সার্কাসের খেলোয়াড়দের মতো হাঁটতে হচ্ছে. আমার শেখানো ডায়লগের বাইরে সামতানিরা অন্য কিছু বললে বা জানতে চাইলে সব ব্যাগোরবাই হয়ে যাবে। সুমনাকে নিয়ে যে মাস্টার প্ল্যানটা করেছি, মানে সামতানির বাড়িতে ওকে পুত্রবধূ হিসেবে সেট করে দেওয়া—সেটি কমপ্লিট না হওয়া পর্যন্ত মহাশয়গণ, আমার চোখে ঘুম ফুম নেই।

এই তিন দিনে আরো একটা ব্যাপার আমাকে করতে হয়েছে। মুভি ক্যামেরা ভাড়া করে প্যালেসে এনে রেখেছি। সেই সঙ্গে ক্যামেরাম্যান, সাউন্ড রেকর্ডিস্ট মিলিয়ে একটা পুরো সিনেমা ইউনিটের অ্যারেঞ্জমেন্ট করা হয়েছে। এমন ভাবে সব কিছু ক্যামোফ্লেজ করে রেখেছি যাতে সুমনা আমার প্ল্যানের কোনো কিছুই ধরতে পারবে না।

আগে থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা ছিল। সেই প্রোগ্রাম অনুযায়ী আজ বিকেলে কাঁটায় কাঁটায় চারটেয় সামতানির অফিসে চলে গেলাম। সেখানে সামতানি, তাঁর স্ত্রী. এক মেয়ে এবং ছেলে মহেশ আমার জন্য ওয়েট করছিল।

মহাশয়গণ, সামতানি আর তাঁর ছেলেকে মার্ক করুন। দুই মাকড়া মেয়ে দেখতে যাবার জন্য নতুন সাফারি স্যুট বানিয়েছে খুব সম্ভব। তাদের হাতে সোনার ব্যান্ডে টেরিফিক ফরেন ঘড়ি, পায়ে নতুন জুতো থেকে জেল্লা বেরুচ্ছে। চুল কেটে সারা গায়ে সেন্ট ফেন্ট লাগিয়ে বসে আছে দু'জনে। এবার সামতানির স্ত্রী এবং মেয়েকে দেখুন। মিসেস সামতানির বডিখানার ওয়েট কম করে দেড় কুইন্টাল। পাক্কা দু'ইঞ্চি চর্বির তলায় তাঁর মাংস হাড় ইত্যাদি। মহিলার ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস কম করে ৮০—৭০—৮০। তার ওপর [illegible]টকে লাল একখানা জরিফরি লাগানো বেনারসি। হোল বডিতে মুখ, হাত এবং পায়ের খানিকটা করে অংশ ছাড়া বাকি হীরে পান্না চুনি সোনা আর প্ল্যাটিনামে মোড়া। সামতানির মেয়েরও একই রকম মেক-আপ। তবে মায়ের মতো ছুকরির গায়ে অত চর্বি-ফর্বি নেই। দেখেশুনে মনে হচ্ছে, এখনও বিয়ে হয় নি। বয়সও কম, কুড়ি বাইশের ভেতর। তবে বডির যা মডেল তাতে মনে হয় কয়েক বছরের ভেতর ওয়েট মাকে ছাড়িয়ে যাবে। দু'জনের গা থেকেই ভুরভুর করে গন্ধ বেরুচ্ছে। মনে হচ্ছে আমি একটা পারফিউমের ফ্যাক্টরিতে ঢুকে পড়েছি।

মহাশয়গণ, এর আগে সামতানি ছাড়া তার ফ্যামিলির আর কাউকে দেখি নি। সামতানি আনুষ্ঠানিকভাবে সবার সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিলেন। রাজকুমারীকে ঘরের বউ করে তুলে আনতে পারবে, সেই জন্য সামতানির হোল ফ্যামিলি একেবারে স্বপ্নের ঘোরে রয়েছে। আমি যে এ বিয়ের অ্যারেঞ্জমেন্ট করে দিয়েছি, তারা সেটা ভাল করেই জানে। আমার নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে তাদের চোখে ফ্ল্যাশ লাইট জ্বলে উঠল।

গ্যাদগেদে গলায় মিসেস সামতানি বললেন, 'মিস্টার হোড় আপনি আমাদের জন্যে যা করেছেন তার তুলনা হয় না। রিয়েলি আপনি আমাদের ওয়েল-উইশার। আপনার জন্যে

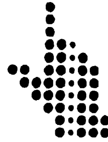
আমাদের স্টেটাস দশ গুণ বেড়ে যাচ্ছে। লাইফে আপনার ঋণ শোধ করতে পারব না।'

মহাশয়গণ, দেখুন দেখুন, রাজকুমারীর শাশুড়ি হতে পারবে বলে দেড় কুইন্টালের এই মালটি কিরকম টগবগে করে ফুটছে। চোখের কোণ দিয়ে কাল্লিক মেরে দেখলাম, সামতানির ছেলে মহেশের মুখে তেলতেলে খুশির দু ইঞ্চি পুরু একটা কোটিং পড়েছে। শ্লা, আনন্দে দম ফট না হয়ে যায়!

মিসেস সামতানির দিকে তাকিয়ে মনে মনে উৎকৃষ্ট খিস্তি ঝাড়লাম, তারপর মুখে বিনয়ের মাখন লাগিয়ে হাত কচলাতে কচলাতে বললাম, 'কী যে বলেন ম্যাডাম, আপনাদের স্টেটাস কি কোনো রাজা ফাজার চাইতে একটুও কম? আপনাদের ঘরে মেয়ে দিয়ে ওদের গেইনও কম না।'

মহাশয়গণ, সামতানি মাকড়ার আর তর সইছিল না। তিনি বললেন, 'স্বয়ম্ভু আর দেরি করা ঠিক হবে না। চারটেয় বেরুবার কথা। পাংচুয়ালিটিটা বিরাট ব্যাপার। এবার ওঠা যাক, না কি বল?'

'সিওর স্যার—'বলতে বলতে উঠে পড়লাম।



সামতানি অ্যান্ড কোম্পানিকে নিয়ে কয়েক মিনিটের ভেতর নিচে চলে এলাম। আমি একটা ফরেন ফিয়েট নিয়ে এসেছিলাম। সামতানিদের রয়েছে দুর্ধর্ষ চেহারার একখানা ইমপালা। মিস্টার, মিসেস অ্যান্ড মিস সামতানি তাতে উঠে বসলেন।

মহেশ বলল, ' আমি মিস্টার হোড়ের গাড়িতেই যাই। উনি একা একা যাচ্ছেন। ওঁকে কোম্পানি দেওয়া দরকার।'

মহাশয়গণ, সামতানির ছানাটি কিরকম খলিফা একবার ভেবে দেখুন। আমাকে কোম্পানি দেওয়াটা যে স্রেফ ধোঁকা, সেটা আপনাদের বুঝতে ডেফিনিটলি কোনোরকম অসুবিধা হচ্ছে না। আসলে মাকড়া প্রতাপরুদ্রগড়ের প্রিন্সেস সম্পর্কে অ্যাডভান্স কিছু খবর জানতে চায়। আমি তাকে ডেকে বললাম, 'আসুন আসুন। ইটস আ প্লেজার টু হ্যাভ ইওর কোম্পানি।'

মহেশ ফিয়েটে উঠে ফ্রন্ট সিটে আমার পাশাপাশি বসল। সঙ্গে সঙ্গে স্টার্ট দিলাম। ফিয়েটের পেছন পেছন ইমপালা দৌড় লাগাল।

মহাশয়গণ, তিরিশ সেকেণ্ড কাটতে না কাটতেই যা ভাবা গিয়েছিল তাই ঘটল। পাশ থেকে মহেশ বলে উঠল, 'হোড় সাহেব —'

এই ডাকটার জন্যই ওয়েট করছিলাম। সামনের রাস্তায় চোখ রেখে সাড়া দিলাম, 'কী?'

'আপনার কাছে আমার গ্রাটিচুডের শেষ নেই।'

মহাশয়গণ, কয়েক মিনিট আগে আপনারা নিজেদের চোখে দেখেছেন এবং নিজেদের কানে শুনেছেন সামতানির হোল ফ্যামিলি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমাকে নাজেহাল করে ফেলেছিল। আবার এই মহেশ মাকড়া নতুন করে স্টার্ট করল। কিন্তু কী আর করা যাবে, শুনে যেতেই হবে। আমি এবার আর উত্তর দিলাম না।

মহেশ ফের বলল, 'প্রিন্সেস বিয়ে করতে পারব, এ আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি। এটা শুধু আপনার জন্যেই সম্ভব হল। আপনার ঋণ কোনোদিন শোধ করতে পারব না।'

এবারও আমি চুপ।

ভয়েসটা অনেকখানি নামিয়ে মহেশ বলতে লাগল, 'আমি খুব নার্ভাস ফিল করছি মিস্টার হোড়।'

গাড়ির স্পিড কমিয়ে, ঘাড়টা কাত করে জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন?'

মহেশ অল্প অল্প ঘামছিল। সেই ঘামে কপাল আর গালের মেক-আপ কিচাইন হয়ে যাচ্ছে। সে বলল, 'লণ্ডনে অনেকদিন আছি, তা তো আপনি শুনেছেনই। হোল ইওরোপ আর আমেরিকা কতবার ঘুরেছি তার হিসেব নেই। কিন্তু কোনোদিন কোথাও রাজকুমারী দেখি নি।' পকেট থেকে রুমাল বার করে ঘাম মুছে নিয়ে একনাগাড়ে বলতে থাকে, অথচ আমি নিজের বিয়ের জন্য রাজকুমারীর সঙ্গে আলাপ করতে যাচ্ছি। এত ভয় হচ্ছে যে কী বলব!'

একটা হাত স্টিয়ারিং -এ রেখে, আরেক হাতে মহেশের নাকে আলতো করে টুসকি মেরে বললাম, 'ভয়ের কিসসু নেই মাকড়া। প্রিন্সেস ইজ অ্যান একসেলেন্ট লেডি—'

মহেশ বলল, 'কিন্তু কিভাবে রাজকুমারীদের সঙ্গে কথা বলতে হয়, জানি না।'

মহাশয়গণ, আমি সট করে মওকা বুঝে আপনি থেকে তুই-তে নেমে গেলাম।

আপনারা তো জানেনই, সামতানির এই ছানাটা এখন আমার মুঠোর ভেতর। তাকে যাই বলি না, খজড়া কোনো প্রোটেস্ট করবে না বা খচে যাবে না। বললাম, 'যেভাবে আমার সঙ্গে কথা বলছিস সেইভাবেই বলবি। তবে প্রথম দিনেই লদগালদগি করতে যেও না চাঁদু। রাজকুমারী বাটকে তিনখানা হাই কিক ঝেড়ে গেটের বাইরে ফেলে দেবে।'

মহাশয়গণ, আমার কথাগুলো উৎকৃষ্ট হিউমার ভেবে জুনিয়র সামতানি দাঁত বের করে হাসল। তারপর বলল, 'না না, আমি দু-একটার বেশি কথাই বলব না।'

'দ্যাটস লাইক আ গুড বয়।'

'আচ্ছা—'

'আবার কী?'

ঢোক গিলে মহেশ বলল, 'রাজকুমারী আমাকে পছন্দ করবেন তো?'

চোখের কোণ দিয়ে মহেশকে মার্ক করতে করতে বললাম, 'করবে রে করবে। তা না হলে কি হোল ফ্যামিলি সুদ্ধু তোকে নিয়ে যাচ্ছি!'

মহেশ হাসল। এমন হাসি হোল লাইফে আর একবারও হাসে নি সে।

কয়েক মিনিটের ভেতর আমরা সার্কুলার রোডের সেই প্যালেসটার সামনে চলে এলাম।

আর ইনি ত্রিপুরানারায়ণ সিং,—রাজকুমারীর পিসে। প্রিন্সেসের বাবা এবং মা দু'জনের কেউ বেঁচে নেই। তাঁরা আমাদের মধ্যে থাকলে আজকের এই শুভদিনে কি খুশিই না হতেন!' বলতে বলতে ভয়েসটা হেভি ইমোশানে ডুবিয়ে দিল পঞ্চানন।

মহাশয়গণ, পেঁচো মাকড়াকে কিরকম ট্রেনিংটা দেওয়া হয়েছে, একবার ভেবে দেখুন। কে বলবে খজড়াটা আগরপাড়ার ব্যারাকবাড়িতে লাইফের থার্টি ফাইভ ইয়ার্স কাটিয়ে এসেছে! কে বলবে সে রাজপ্রাসাদে জন্মায় নি! তার এটিকেট, কথা বলার স্টাইল—সব কিছুই একেবারে রাজকীয়।

পঞ্চানন থামে নি, 'রাজকুমারী নর্মদার ছেলেবেলায় আমার দাদা, মানে মহারাজা অফ প্রতাপরুদ্রগড় আর মহারানী রাজলক্ষ্মী মারা যাবার পর থেকে জগদীশ প্রসাদজি, ত্রিপুরানারায়ণজি আর আমি ওঁকে বড় করে তুলেছি। নর্মদা এখন সাবালিকা। রাজ এবং জমিদারি সিস্টেম অ্যাবোলিশনের পর প্রতাপরুদ্রগড়ের যেটুকু এখনও আছে তার সবটারই মালিক সে।'

মহাশয়গণ, লক্ষ করুন, মালিকানার কথা শুনে সামতানি অ্যাণ্ড কোম্পানির চোখে-মুখে কিরকম ফ্লাডলাইট জ্বলে উঠেছে। শ্লারা তো জানে না, এই প্যালেসের ডেকরেশন, ফার্নিচার, ফোয়ারা, গাড়ি ফাড়ি সব কিছুই হয়েছে তাদেরই ক্যাশে। মানে সামতানি সমাজপতিরা যে হিউজ ব্ল্যাক মানি আমার একশ' আটটা নামে ব্যাঙ্কে ব্যাঙ্কে ছড়িয়ে রেখেছে সেই টাকাতেই। এই খবরটা জানতে পারলে সামতানিদের রি-অ্যাকশানটা কী হবে, ভাবতে কী ভাল যে লাগছে!

সে যাক গে মহাশয়গণ, আমি যা সিনারিও বানিয়ে দিয়েছি সেই অনুযায়ী স্মুদলি কাজ চলছে। এটা রিয়াল ফিল্মের শুটিং হলে একবারেই ও.কে হয়ে যেত।

সামতানি আমার দিকে ফিরে এবার বললেন, 'আমাদের পরিচয়টা তুমিই দাও—'

সাউণ্ড ট্র্যাকে আমার ভয়েস যাতে ধরা না পড়ে সে জন্য ঠিক করেছি আমি স্রেফ মাইম অ্যাক্টিং করে যাব। ভুরু তুলে, গালে ঝাঁকি মেরে পঞ্চাননকে একটা সিগন্যাল দিলাম। তক্ষুনি পেঁচো শ্লা বুঝে গেল। দারুণ ব্যস্ত ফ্যস্ত হয়ে বলল, 'পরিচয় দিতে হবে না। স্বয়ম্ভুর কাছ থেকে আমরা আপনাদের সব খবরই জেনে গেছি সামতানি সাহেব।' তারপর একে একে দেড় কুইন্টালের সামতানি গিন্নী, তাঁর মেয়ে এবং ছেলেকে দেখতে দেখতে বলতে লাগল, 'ইনি নিশ্চয়ই মিসেস সামতানি, এ হল মিস সামতানি মানে মধুরা, আর এ হল মহেশ—আমাদের উড-বী দামাদ।'

সামতানির চোখ দুটো গোল্লা পাকিয়ে গিয়েছিল। খানিকটা দম নিয়ে তিনি বললেন, 'আমাদের না দেখেও এ সব জানলেন কী করে দেওয়ান সাহেব?'

পঞ্চানন বলল, 'সব ক্রেডিট স্বয়ম্ভুর। ও যা ভিভিড ডেসকৃপশান দিয়েছে তা থেকেই সব জেনে নিয়েছি।' মহেশের দিকে ফিরে বলল, 'তুমি তো এম. বি. এ করেছ?'

মহেশ বলল, 'হ্যাঁ। তার আগে চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্সিটাও কমপ্লিট করেছি।'

'ফাইন। একটা কথা জানতে ইচ্ছা করছে মহেশ—'

'বলুন—'

'তুমি দশ বছর লণ্ডনে আছ—'

'হ্যাঁ।'

'ওখানেই কি পার্মানেন্টলি সেটল করবে?'

একটু ভেবে মহেশ বলল, 'তেমন ইচ্ছা আমার নেই। ভাবছি, আর দু-একটা বছর ওখানে কাটিয়ে কলকাতাতেই চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সির একটা ফার্ম খুলব।'

পেঁচো তারিফ করার স্টাইলে আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বলল, 'গুড আইডিয়া মহেশ। সারা জীবন তো বিদেশে পড়ে থাকা যায় না।'

'তা ছাড়া আরো একটা দিক আছে। বাবার এখানে বিরাট বিজনেস। তিনি আর মা-ও খুব প্রেসার দিচ্ছেন, আমি যেন এসে সব বুঝে নিই। বয়েস হয়েছে, ব্যবসার নানা প্রেসার আর প্রবলেম সামলাতে একা একা বাবার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। তাই—'

'একসেলেন্ট। এটাই তো উপযুক্ত ছেলের মত কথা। আমি খুব খুশি হলাম মহেশ।'

মিসেস সামতানি বললেন, 'আমিও চাই না বিয়ের পর মহেশ লন্ডনে পড়ে থাকুক। আমাদের একটাই ছেলে। সে বিদেশে থাকলে কি ভাল লাগে!'

সামতানি আমার দিকে ফিরে বললেন, 'তুমি তো কিছুই বলছ না স্বয়ম্ভু।'

মহাশয়গণ, সাউন্ডের মেশিন টেশিনগুলো চালু রয়েছে। আমি কি গলা দিয়ে আওয়াজ বা করতে পারি! সারা মুখে টেরিফিক সুইট হাসি ফুটিয়ে আমি ইশারায় পেঁচো মাকড়াকে দেখিয়ে দিলাম। অর্থাৎ যা বলবার রাজকুমারীর চাচা সাহেব-কাম-এস্টেটের দেওয়ান মহেন্দ্রপ্রতাপ সিংই বলবে।

আমার ছকে দেওয়া সিনারিও অনুযায়ী আরো খানিকক্ষণ ভ্যানতাড়া করার পর পেঁচো বলল, 'কষ্ট করে আগে একটু মিষ্টিমুখ করে নিন। তারপর রাজকুমারীকে নিয়ে আসব।'

সমাতানি এবং মিসেস সামতানি গলা মিলিয়ে বলে উঠলেন 'মিষ্টিমুখ পরে হবে। আগে আমরা রাজকুমারীর সঙ্গে আলাপ করব।'

পঞ্চানন বলল, 'বেশ, আপনাদের যেমন ইচ্ছে—' তারপর একটা বেয়ারাকে ডেকে বলল, 'যাও, অন্দরে গিয়ে খবর দাও রাজকুমারীকে নিয়ে তাঁর চাচাজি যেন এখানে চলে আসেন।'

দশ মিনিটের ভেতর প্রতাপরুদ্রগড়ের প্রিন্সেস, মানে সুমনাকে সঙ্গে করে তার চাচিজি অর্থাৎ পেঁচো মাকড়ার বউ শিবানী এবং এক পাল সখি ড্রইং-রুমে চলে এল।

মহাশয়গণ, আপনাদের চোখমুখ দেখে মনে হচ্ছে হার্ট ফেল করে যাবে। সুমনাকে, শিবানীকে বা তার সখি ফখি হিসেবে আগরপাড়ার সেই ব্যারাকবাড়ি থেকে যে ছুকরিগুলোকে ধরে এনেছি তাদের চিনতে ডেফিনিটলি আপনাদের কষ্ট হচ্ছে। হবার কথাই। টালিগঞ্জের ফিল্ম স্টুডিও থেকে দুর্ধর্ষ একজন মেক-আপ-ম্যানকে ধরে নিয়ে এসেছিল পঞ্চানন। তারাই চুলের ডগা থেকে পা পর্যন্ত আগাপাশতলা সুমনাদের চেহারা পাল্টে দিয়েছে। তাদের পরনে এখন পিওর বেনারসি, হীরে মুক্তো চুনি পান্না, এটসেট্রা। কে বলবে এই মালেদের একটা বস্তি থেকে আমদানি করা হয়েছে।

মহাশয়গণ, আপনারা তো তবু চোখের তারা ফিক্সড করে তাকিয়ে আছেন। কিন্তু সামতানি

খজড়াগুলোর বোধ হয় থ্রম্বসিসই হয়ে গেছে।

কাছাকাছি এসে শিবানী বলল, 'এঁদের নমস্কার কর—'

মাথাটা অনেকখানি ঝুঁকিয়ে অত্যন্ত বিনীত ভঙ্গিতে হাতজোড় করে নমস্কার করল সুমনা।

সামতানিরা স্প্রিং-দেওয়া পুতুলের মতো ঝট করে উঠে দাঁড়িয়ে কোমর থেকে বডির ওপরের দিকটা আরো ঝুঁকিয়ে প্রতি-নমস্কার করল। মিসেস সামতানি এর পর সুমনার হাত ধরে প্রায় নিজের কোলের ওপর তাকে বসিয়ে গ্যাদগেদে গলায় বললেন, 'আমাদের কি সৌভাগ্য, তোমাকে ঘরের লছমী হিসেবে পাব।'

জুনিয়র সামতানি মানে মহেশের ডেসক্রিপশান দেওয়া এই মোমেন্টে আমার পক্ষে অসম্ভব। মাকড়া ঘাড়টা স্ট্রেট করে স্ট্যাচুর মতো সুমনার দিকে তাকিয়ে আছে। শুদ্ধ ভাষায় যাকে বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হওয়া বলে, তার হাল হয়েছে তাই।

এরপর সামতানি অ্যান্ড কোম্পানি প্রায় কোরাসে ধানাই পানাই করে একই কথা সুমনা, চাচিজি চাচাজি এবং ফুফাজিকে বলে গেল। সুমনাকে পেলে তাদের ফোরটিন জেনারেশান উদ্ধার হয়ে যাবে।

কথাবার্তার ফাঁকে পেঁচো শ্লার ইশারায় বেয়ারারা খাবারের প্লেট ফ্লেট এনে সবার সামনে সাজিয়ে দিল।

খাওয়া দাওয়ার পর সামতানি বললেন, 'তা হলে বিয়ের একটা ডেট ঠিক করে ফেলা যাক।'

পেঁচো বলল, 'আমাদের কুলগুরু কাল এসে পৌঁছুবেন। তিনি পঞ্জিকা দেখে যে তারিখ ঠিক করে দেবেন সেই তারিখেই বিয়ে হবে।'

'দয়া করে বেশি দেরি করবেন না। যত তাড়াতাড়ি হয়, মানে—'

মহাশয়গণ, সামতানির এই তাড়ার পেছনে কারণটা যে কী, নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পারছেন। দেরি হলে রাজকুমারী যদি তাদের হাতের আঙুল দিয়ে হড়কে বেরিয়ে যায় সেই জন্য মাকড়ার প্রাণে আর সুখ নেই।

পঞ্চানন ডিপ্লোম্যাটিক স্টাইলে হেসে বলল, 'পঞ্জিকায় প্রথম যে ডেটটা পাওয়া যাবে সেই ডেটেই বিয়ে হবে। আমরাও শুভ কাজটা চুকিয়ে ফেলার জন্য অস্থির হয়ে আছি।'

এরপর আরো কিছুক্ষণ ভ্যানতাড়া চলল। তারপর পেঁচো বলল, 'আপনারা অনুমতি দিলে রাজকুমারীকে অন্দরে নিয়ে যাবে।'

'অবশ্যই।' সামতানি শ্বাসটানা গলায় শশব্যস্তে বলে উঠলেন।

পঞ্চাননের ইশারায় এবার শিবানী এবং রাজকুমারীর যে সখিরা একটু দূরে স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে ছিল, সুমনাকে নিয়ে তারা ভেতরে চলে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে ক্যামেরাম্যান আর সাউন্ড ট্র্যাকের লোকেদের হাত তুলে সিগনাল দিলাম। তক্ষুনি তারা কাজ বন্ধ করে দিল। মহাশয়গণ, আপনারা তো জানেনই, এতক্ষণ ক্যামেরা লেন্স ফেন্সের বাইরে একেবারে বোবা হয়ে বসে ছিলাম। এবার সামনের দিকে এগিয়ে এলাম।

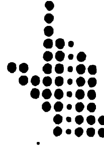
সামতানি এতক্ষণে আমার সম্বন্ধে সচেতন হলেন। রাজকুমারী আর তার গ্যাং আসার পর মাকড়ার কোনোদিকে হুঁশ ছিল না। বললেন, 'রাজকুমারী এলেন। আমরা এত কথা বললাম।

তুমি কিন্তু একেবারে চুপ করে রইলে। অথচ তুমিই এ বিয়ের সব কিছু। ব্যাপারটা কী?'

আমি বত্রিশটা দাঁত বের করে বললাম, 'যতক্ষণ কথা বলার দরকার ছিল বলেছি। একটু আগে যা ঘটল তাতে আমার রোল হল শ্রোতা আর দর্শকের। সেখানে আমার কিছুই করার বা বলার ছিল না স্যার।'

সামতানি আমার কথায় সায় দিয়ে ঘাড় কাত করলেন, 'তা যা বলেছ।'

মহাশয়গণ, আমার সিনারিও অনুযায়ী এখন পর্যন্ত সমস্ত কিছু বেশ পারফেক্টলি এগিয়ে চলেছে, না কি বলেন?



তিন দিনের মধ্যে আগরপাড়া থেকে আরেক তুখোড় মালকে ধরে দুর্ধর্ষ মেক-আপ দিয়ে তাকে প্রতাপরুদ্রগড়ের কুলগুরু হিসেবে তালিম দেওয়া হল। তারপর স্ট্রেট এনে তোলা হল সার্কুলার রোডের প্যালেসে। লোকটার নাম নিবারণ চট্টরাজ। রাজবাড়ির কুলগুরু হবার পর নাম পালটে গেছে। এখন সে যাজ্ঞবল্ক্য মিশ্র। তাকে দেখলে কে বলবে হারামীটা আগরপাড়ার রাস্তার ধারে এক লক্কড় চায়ের দোকানের মালিক।

নিবারণ পাঁজিফাঁজি হাঁটকে ঠিক পাঁচদিন পর একটা বিয়ের ডেট বের করে ফেলল। পঞ্চানন সেই ডেটটা আনুষ্ঠানিকভাবে সামতানিদের জানিয়ে দিয়ে এল।

তারপর মহাশয়গণ, হোল ক্যালকাটা তোলপাড় করে একটা হুলস্থূল কারবার শুরু হয়ে গেল। রাজকুমারীর শাড়ি গয়না ফয়না আগেই কেনা হয়ে গিয়েছিল। পার্ক স্ট্রিটের এক বিরাট ক্যাবিনেট মেকারের শো-রুমে গিয়ে বাছা বাছা ফার্নিচারের অর্ডার দিলাম। তারপর ফ্রিজ, একান্ন ইঞ্চি স্ক্রিনের প্রকাণ্ড কালার টিভি, এয়ার কুলার, নানারকম পারফিউম ইত্যাদি হাজার টাইপের জিনিস কেনাকাটা করতে ঝাড়া দুটো দিন বেরিয়ে গেল। এক ফাঁকে একটা ফাইভ-স্টার হোটেলে গিয়ে ক্যাটারিং-এর ব্যবস্থাও করে ফেললাম।

পঞ্চানন, বোদা আর তার গ্যাংকে ডেকরেটরদের দিয়ে প্যাণ্ডেল বানানো এবং বিয়ের অ্যারেঞ্জমেন্ট করার কমপ্লিট দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিন দিনের ভেতর তারা রাজপ্রাসাদের সামনে 'লন'-এ হেভি একখানা প্যান্ডেল খাড়া করে ফেলল। সেটার একদিকে উঁচু ডায়াস বানিয়ে বিয়ের ব্যবস্থা। নিচে নিমন্ত্রিতদের জন্য অগুনতি সোফা সাজানো। প্যাণ্ডেলের আরেক দিকে শ্বেত পাথরের টেবলে ধবধবে চাদর পেতে খাওয়ার আয়োজন করা হয়েছে। তার পেছন দিকে ক্যাটারারদের প্যানট্রি এবং স্টোর। সেখানে একটা টেম্পোরারি 'বার'-ও বসানো হবে। এ সব ছাড়া মুভি ক্যামেরা ট্যামেরা তো আছেই।

বিয়ের দিন সুমনাকে স্পেশাল মেক-আপ দিতে নাম-করা বিউটি পার্লারের লোকজনকে নিয়ে আসার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। আমাদের দিকে নিমন্ত্রিত বলতে আগরপাড়ার বাছা বাছা

কিছু লোকজন। তাদের কাউকে এক্স রাজা, মহারাজা, নবাব ইত্যাদি বানানো হয়েছে। সেই মতো তাদের একটা কনডেন্সড কোর্সে ট্রেনিংও দেওয়া হয়েছিল। হে হে মহাশয়গণ, এক্স-রাজকুমারীর বিয়েতে এক্স রাজা-মহারাজা নবাব-বাদশারা না এলে কখনও জমে, না সেটা বিশ্বাসযোগ্য হয়? আমার মতো একটা ফোরটোয়েন্টিকে কত দিকে নজর রেখে এগুতে হচ্ছে দেখুন।

আজ বিয়ে।

মেয়ে দেখার দিন থেকে সেই যে সানাই বাজতে শুরু করেছিল আজ তার টেম্পো ক্রমশ চড়ছে। হোল ডে অ্যান্ড নাইট এক সেকেন্ডের জন্য এই সানাই আর থামবে না।

মহাশয়গণ, রাজবাড়ির বিয়েতে যা হয়, ভোর থেকে চারদিক সরগরম। ধবধবে ইউনিফর্ম বডিতে চড়িয়ে বয়-বেয়ারারা ছোটাছুটি করছে। ক্যাটারারদের প্যানট্রি থেকে বিরিয়ানি ফিরিয়ানির গন্ধ ভেসে আসছে।

নানা কোম্পানিকে নানারকম অর্ডার দেওয়া হয়েছিল। তাদের কেউ ভ্যানে করে টি ভি সেট, ফ্রিজ বা ফার্নিচার নিয়ে আসছে, কেউ আনছে পেটি পেটি হুইস্কি আর কার্টন কার্টন ইমপোর্টেড সিগারেট।

মহাশয়গণ, আপনারা তো জানেনই, এই বিয়ের রিয়েল প্ল্যানটা কার? কাজেই আমার পক্ষে চুপচাপ হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা অসম্ভব। ঘুরে ঘুরে সব কিছু সুপারভাইজ করে যাচ্ছি। আফটার অল নকল রাজা ফাজারা আসবে। ফল্স হলেও রাজা-বাদশা তো। আর সামতানিদের সঙ্গে আসবে রিয়েল ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট আর বিজনেস ম্যাগনেটরা। সবাইকে যাতে প্রচুর খাতির যত্ন করা হয়, সেদিকে আমাকেই নজর রাখতে হবে। মহাশয়গণ, আপনারা তো জানেনই আমার কারবারে কোনোরকম ফাঁকি নেই।

প্যালেসের একতলা থেকে তেতলা পর্যন্ত ওঠানামা করতে করতে দুম করে একবার সুমনার সামনে পড়ে গেলাম। মহাশয়গণ, সামতানিরা সেই যে রাজকন্যা দেখতে এসেছিল তারপর থেকে সুমনার ধারে কাছে ঘেঁষছিলাম না। ছুকরিটা অবশ্য আমাকে ক্যাচ করার জন্য অনেক চেষ্টা ফেস্টা করেছে, আমি কেটে বেরিয়ে গেছি। কিন্তু এবার আর পারা গেল না।

আমাকে একটা ঘরে টেনে নিয়ে গিয়ে সুমনা স্ট্রেট আমার চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এসব কী হচ্ছে?'

আমার মতো একটা থার্ড ক্লাস চিট এবং উৎকৃষ্ট ফোরটোয়েন্টি কয়েক সেকেন্ড থতমত খেয়ে গেল। তারপর দারুণ স্মার্ট ভয়েসে বললাম, 'তুমি তো জানোই। সেই সিনেমাটা—মানে রাজকুমারীর বিয়ে—তার জন্যেই এসব ব্যবস্থা করা হয়েছে—'

আমার চোখ থেকে চোখ সরাল না সুমনা। আগের স্বরেই বলল, 'আমার মনে হচ্ছে, আপনার অন্য কোনো মতলব আছে।'

ছুঁড়িটা টেরিফিক শাহেনশা। আমার প্ল্যানটা ধরে ফেলল নাকি? উড়িয়ে দেবার স্টাইলে হাত ফাত নেড়ে বললাম, 'ধুস, কিসের আবার মতলব? এটা সিনেমা। রাজকন্যার বিয়ে দেখে

কেউ যাতে ধরতে না পারে এটা রিয়েল বিয়ে নয় তাই এত সব অ্যারেঞ্জমেন্ট করা হয়েছে। মানে ফরেনে ছবিটা বেচতে হবে তো। ওখানকার অডিয়েন্সের যাতে তাক লেগে যায় সে জন্যে কোনোরকম ফাঁক রাখতে চাই না।'

'এ সব কথা অনেক বার বলেছেন কিন্তু আমার কেন যেন বিশ্বাস হচ্ছে না।'

'ধ্যাৎ, কী যে সব ভাবো তার ঠিক নেই। এটা যদি ফল্‌স বিয়ে না হয়, ক্যামেরাম্যান, সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার—এদের আনা হল কেন?'

সুমনা আর কোনো প্রশ্ন করল না।

মহাশয়গণ, বুঝতেই পারছেন ছুকরির মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। ও তো আর গবেট-মার্কা মেয়ে নয়, মাথার ভেতর স্লাইট গ্রে ম্যাটার রয়েছে। তার সামনাসামনি দাঁড়িয়ে উল্টো পাল্টা কথা বললে ঠিক ধরা পড়ে যাব। কাজেই হড়কে বেরিয়ে এলাম।

সন্ধের পর থেকেই লাল-নীল সবুজ-হলুদ আলোর ফোয়ারায় গোটা প্যালেসটা একেবারে ড্রিমল্যাণ্ড হয়ে উঠল।

নকল রাজা-বাদশাদের বিয়ের আসরে দামী দামী সোফা সেট করে দেওয়া হয়েছে। টেরিফিক চেহারার সব ছুকরিরা মাঝে মাঝে রুপোর পিচকিরি দিয়ে গোলাপ জল ছিটোচ্ছে, ছড়াচ্ছে ফুলের পাপড়ি। বেয়ারারা ট্রে-তে নানারকম সরবত আর কোল্ড ড্রিংকের গেলাস সাজিয়ে ব্যস্তভাবে ঘোরাফেরা করছে। রাজকন্যার চাচাজি এবং ফুফাজি অর্থাৎ পঞ্চানন আর প্রাণতোষ মাথায় পাগড়ি ফাগড়ি চড়িয়ে জোড়হাতে রাজা-বাদশাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে।

প্যান্ডেলের ভেতর উঁচু ডায়াসে কুলগুরু যাজ্ঞবল্ক্য মিশ্র ওরফে নিবারণ চট্টরাজ এক ডজন ব্রহ্মচারী টাইপের অ্যাসিস্টান্ট নিয়ে যজ্ঞকুন্ড বানিয়ে হোমের অ্যারেঞ্জমেন্ট করছে।

এরই মধ্যে বিয়ের বরাত এসে গেল। সিন্ধি সামতানিরা মেবার চিতোরগড়ের স্টাইলে বরকে ঘোড়ায় চড়িয়ে নিয়ে এসেছে। ঘোড়ার সামনে তিনটে ব্যান্ড পার্টি আর অগুনতি খোলা ভ্যানে নানা আলোর সাজ। ঘোড়ার পেছনে দু'ডজন ইমপোর্টেড কার-এ বরযাত্রীর দল। তাদের পেছনে আবার তিনটে ব্যান্ড পার্টি। প্রতাপরুদ্রগড়ের দেওয়ান অর্থাৎ আমাদের পেঁচো মাকড়া তার এক ডিভিসন সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে গেটের কাছে সামতানিদের রাজকীয় স্টাইলে রিসিভ করে প্যান্ডেলের ভেতর নিয়ে বসাল। সেন্টেড গোলাপ জলের ফোয়ারা ছুটিয়ে দিল রাজপ্রাসাদের ডজন ডজন সুন্দরীরা, বৃষ্টির মতো ছড়াতে লাগল টাটকা গোলাপের পাপড়ি।

সানাইয়ের এবং ছ ছ'টা ব্যান্ডপার্টির আওয়াজে গোটা প্যালেস সরগরম হয়ে উঠল।

হে হে মহাশয়গণ, এ কি আপনাদের মেয়ের বিয়ে! এ হ'ল রাজকুমারীর বিয়ে। এতে এরকম টেরিফিক কারবার তো হবেই।

এদিকে মুভি ক্যামেরা আর সাউন্ড ট্র্যাক চলছেই। আমি ক্যামেরা লেন্সের বাইরে থেকে ফিলোজফারের মতো সব কিছু দেখে এবং শুনে যাচ্ছি।

সামতানিদের সঙ্গে কলকাতার বেশ কয়েকজন টপ বিজনেসম্যান আর ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টও বরযাত্রী হয়ে এসেছেন। তাঁদেরও খাতির করে বসানো হয়েছে। তবে এঁদের মধ্যে সমাজপতি,

অভ্যুদয় অ্যান্ড কোম্পানির অনেকেই নেই। তাঁরা রাতের দিকে আসবেন।

বিয়ের লগ্ন সাড়ে সাতটায়। রাজকুমারীর চাচিজি মানে পেঁচো মাকড়ার বউ এবং তার গ্যাং একসময় রাজকুমারী সুমনাকে বিয়ের আসরে নিয়ে এল। এই গ্যাং-য়ে কারা কারা আছে, আপনাদের চিনতে অসুবিধা হচ্ছে না মহাশয়েরা। বেনারসি ফেনারসি দিয়ে মুড়ে দিলে কী হবে, এরা যে আগরপাড়ার সেই ব্যারাকের মাল, তা আর আপনাদের অজানা নেই।

সুমনাকে আজ আর চেনাই যাচ্ছে না। মেয়ে দেখার দিন তাকে যা সাজানো হয়েছিল আজ তার বডিতে দশগুণ বেশি মেক-আপ চড়ানো হয়েছে। হীরে পান্না সোনা ফোনা এবং দল হাজার টাকা দামের বেনারসি থেকে আড়াই শো মেগাওয়াটের বিজলি চমকাচ্ছে। তার বডি থেকে টেরিফিক সেন্টের গন্ধ বেরিয়ে তিন কিলোমিটার পর্যন্ত বাতাস একেবারে মাত করে রেখেছে। ওর দিকে তাকালে যে কোনো ব্রহ্মচারীরও স্ট্রোক হয়ে যাবে।

মহাশয়গণ, ছুঁড়িটাকে ভাল করে মার্ক করুন। চনমন করে সে প্যাণ্ডেলের চারদিকে তাকাচ্ছে। আমাকেই যে খুঁজছে, আর কেউ টের না পেলেও আমি ঠিকই জানি। কিন্তু বিয়েটা কমপ্লিট না হওয়া পর্যন্ত আমি ছুকরির ত্রিসীমানায় ঘেঁষছি না। মহাশয়গণ, আপনারা তো জানেনই, এখন যদি ওর কাছে যাই, সুমনা কিছু একটা গড়বড় করে ফেলতে পারে।

বিয়ের আসরে সামতানির ছেলে মহেশের মুখোমুখি যখন সুমনাকে বসানো হয়েছে, সেই সময় বোদা ভিড় ফিড়ের ভেতর দিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে এসে হাজির। তার চোখ মুখ দেখে মনে হচ্ছে টেরিফিক উত্তেজিত হয়ে আছে। বললাম, 'কী ব্যাপার রে?'

বোদা আমাকে টেনে একধারে নিয়ে গেল। তার মুখটা আমার কানে গুঁজে দিয়ে চাপা খ্যাসখেসে গলায় বলল, 'বহুৎ ঝামেলা হয়ে গেছে গুরু—'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হয়েছে?'

'সমাজপতি তোমাকে ফোন করেছে। বলছে খুব আর্জেন্ট ব্যাপার। গলা শুনে মনে হল মাকড়া হেভি প্যাঁচে পড়ে গেছে। এক্ষুনি চল—'

মহাশয়গণ, পঞ্চানন ক্যালকাটা টেলিফোনের কর্তাদের ধরে এই প্যালেসে পাঁচটা ফোন বসিয়ে দিয়েছিল। বললাম, 'চল—'

বোদা আমাকে দোতলার কোণের দিকের একটা ঘরে নিয়ে এল। ঘরটা একেবারে ফাঁকা। এ বাড়ির কেউ আর দোতলা বা তেতলার কোনো কামরায় নেই, সবাই সামনের 'লন'-এ বিয়ের প্যাণ্ডেলে জড়ো হয়েছে।

ফোনটা একধারে নামিয়ে রেখে বোদা আমাকে ডাকতে গিয়েছিল। সেটা তুলে নিয়ে কানে সেট করে বললাম, 'হ্যালো—'

লাইনের ওধার থেকে সমাজপতির গলা ভেসে এল, 'কে—স্বয়ম্ভু?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'তোমার সঙ্গে খুব আর্জেন্ট কথা আছে। আশেপাশে আর কেউ নেই তো?'

'আমার পার্টনার বোদা ছাড়া আর কেউ নেই।'

'গুড।' সমাজপতি চাপা গলায় কথা বলছিলেন। ভয়েসটা ঝপ করে কয়েক পর্দা নামিয়ে

দিলেন এবার, 'ভীষণ বিপদ স্বয়ম্ভু—' তাঁর গলা কাঁপতে লাগল।

বললাম, 'কিসের বিপদ স্যার?'

'এইমাত্র একটা সিক্রেট সোর্স থেকে খবর পেলাম, ইনকাম ট্যাক্স আর সি. বি. আই বেলেঘাটায় প্রভু জগৎপতির আশ্রমের খোঁজ পেয়ে গেছে। কেউ জানিয়ে দিয়েছে, ওখানে আমাদের কিছু টাকা রয়েছে। ঘণ্টাখানেকের ভেতর পুলিশ নিয়ে ওরা ওখানে রেইড করবে। কয়েক কোটির ব্যাপার। কী যে হবে, বুঝতে পারছি না। মাথাটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে।'

মহাশয়গণ, আপনারা তো জানেনই আমি একটা থার্ড ক্লাস ফোরটোয়েন্টি, ওয়ার্ল্ডের কোনো ব্যাপরেই ঘাবড়াই না, ভয় পাই না। আমার নার্ভ অ্যান্টার্টিকার বরফের মতো ঠাণ্ডা। বললাম, 'আমি তো আছি স্যার, অত ভাবছেন কেন? সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। ফিকর্ মাত কীজিয়ে—বিলকুল ডোন্ট ওরি।'

'কী করবে তুমি? অত টাকা!'

'আমার ওপর আপনার কি আর ভরসা নেই?'

'এ তুমি কি বলছ স্বয়ম্ভু! তোমার ওপর ভরসা না থাকলে কি এই ফোনটা করতাম?'

'তা হলে ব্রেন থেকে সব দুশ্চিন্তা আউট করে দিন। এক ঘণ্টা সময় যখন পাওয়া যাচ্ছে তখন আপনাদের ঐ কয়েক কোটি ব্ল্যাক মানি কেন, ইণ্ডিয়া গভর্নমেন্টের মিন্ট এখন পর্যন্ত যত নোট ছেপেছে সব হাপিস করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সরিয়ে দিতে পারি।'

সামাজপতি মাকড়ার চিন্তা তবু কাটে না। বললেন, 'টাকাগুলো সেফ প্লেসে নিয়ে যেতে পারবে তো?'

'ডেফিনিটলি স্যার।' গলায় অনেকখানি জোর দিয়ে বললাম, 'এমন জায়গায় আমাদের ব্ল্যাক মানি রাখব, ওয়ার্ল্ডের কেউ তা খুঁজে বার করতে পারবে না।'

'থ্যাঙ্ক ইউ স্বয়ম্ভু, মেনি মেনি থ্যাঙ্কস।'

হে হে মহাশয়গণ, মনে মনে উৎকৃষ্ট ক'টি খিস্তি ঝেড়ে বললাম, 'শ্লা, এখন খুব থ্যাঙ্ক ইউ চালাচ্ছ। এরপর হোল লাইফ 'বাটকে' আর কপালে চাপড় মেরে কাটিয়ে দিতে হবে।' মহাশয়গণ, আপনাদের মুখচোখ দেখে মনে হচ্ছে, সমাজপতির কপাল ফপাল চাপড়ানোর কারণটা জানার জন্য মুখিয়ে আছেন। কিন্তু নাটকের শেষ অ্যাক্টের লাস্ট সিনটা আগেই জানিয়ে দেবার মানে হয় না। ওয়েট করুন মহাশয়েরা, থোড়েসে ইন্তেজার কীজিয়ে।

সমাজপতি এবার বললেন, 'সামতানিরা এতক্ষণে নিশ্চয় ওখানে পৌঁছে গেছে।'

'হাঁ স্যার।'

'বিয়ের কতদূর?'

'স্টার্ট হয়ে গেছে। বর-কনেকে ছাঁদনাতলায় ফেস টু ফেস বসিয়ে পুরুত মন্তর পড়ছে।'

'সামতানি ছাড়া আমাদের গ্রুপের আর কেউ কি বরযাত্রীদের সঙ্গে এসেছে?'

'না স্যার।'

'সামতানিকে একবার ডেকে দাও।'

কী মতলবে সামতানিকে সামজপতি ডাকতে বলছেন, বুঝতে অসুবিধা হল না। বললাম,

'আপনি কি সি.বি.আই রেইডের কথা সামতানি সাহেবকে বলবেন?'

সামজপতি বললেন, 'হ্যা। ওঁরও তো টাকা রয়েছে।'

'একটা শুভ কাজ চলছে। বেকার রেইডের কথা জানিয়ে সামতানি সাহেবের মেজাজটা কিচাইন করে দেবেন কেন? মৌজসে ছেলের বিয়ে দেখছে। তাই দেখতে দিন। তাছাড়া ওঁকে জানিয়ে তো কোনো ফায়দা নেই। ফর নাথিং টেনসান বাড়িয়ে তোলা।'

সামজপতি আস্তে আস্তে এবার বললেন, 'তা অবশ্য কারেক্ট বলেছ। ঠিক আছে, তুমি যা ভাল বোঝ—কর।' একটু থেমে ফের শুরু করলেন, 'সামতানিকে না হয় জানাবো না। অন্য ফ্রেণ্ডদের, মানে জানোই তো অনেকেরই টাকা ওখানে রয়েছে—'

'কাউকেই কিছু জানাবার দরকার নেই। বেশি জানাজানি হলে ঝামেলা হয়ে যাবে। তাতে সবাই বিপদে পড়ে যাবেন। চুপচাপ অপারেশনটা করে ফেলি। তারপর সবাইকে জানাবেন।'

'দ্যাটস আ গুড আইডিয়া।'

'আপনি বিয়েবাড়িতে কখন আসছেন?'

'এত বড় একটা ডেঞ্জার মাথায় নিয়ে যাব? আনন্দ টানন্দ তো করতে পারব না।'

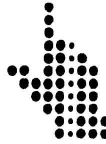
'নিশ্চয়ই পারবেন। ডেফিনিটলি বিয়েবাড়িতে আপনাকে আসতে হবে। অপারেশানটা করতে আমার ঘণ্টাখানেক লাগবে। আপনি এর ভেতর বিয়েবাড়ি চলে আসুন। আপনাদের ক্যাশের অ্যারেঞ্জমেন্ট করে স্ট্রেট প্যালেসে এসে রিপোর্ট করব।'

'অল রাইট, তুমি যখন অ্যাসুয়েরেন্স দিচ্ছ, বিয়ে বাড়ি যাচ্ছি। কিন্তু —'

'আবার কী?'

'সময় কিন্তু আর বেশি হাতে নেই। অপারেশানটা এখনই স্টার্ট করতে হবে।'

'মোস্ট সার্টেনলি। আমি এক মিনিটের ভেতর বেরিয়ে পড়ছি।' বলেই টেলিফোনের লাইন কেটে দিলাম।



ঠিক কুড়ি মিনিটের ভেতর একটা বিরাট ভ্যানে করে বোদা আর লগাকে নিয়ে আমি বেলেঘাটায় প্রভু জগৎপতির অশ্রমে 'ইন' করলাম।

আশ্রমে এখন লন্ডভণ্ড অবস্থা। বোঝা গেল, রেইডের খবরটা এখানে পৌঁছে গেছে।

গেটের পর যে ফাঁকা কমপাউন্ডে ডে অ্যান্ড নাইট নন-স্টপ সংকীর্তন হয়, সেখানে লর্ড জগৎপতি আর চরাচরপালিকা জননী দাঁড়িয়ে আছেন। দু'জনেরই চোখেমুখে টেরিফিক আতঙ্ক। আমাকে দেখে মাকড়াদুটো যেন হাতের তেলোতে আকাশের চাঁদ পেয়ে গেল। জগৎপতি বললেন,'একটু আগে সমাজপতি ফোন করে আমাদের সব জানিয়ে দিয়েছেন। বললেন, তুমি আসছ। তাতে একটু ভরসা পেলাম। কিন্তু—'

'কী?'

'বিপদ হবে না তো স্বয়ম্ভু?'

'তা হলে আমি আর এলাম কেন এখানে?' সমাজপতিকে যেভাবে ভরসা দিয়েছিলাম হুবহু সেই ভাবেই জগৎপতি এবং জননী চরাচরপালিকাকেও অভয় দিলাম, 'ডোন্ট ওরি প্রভু অ্যান্ড মাদার—'

জগৎপতিরা উত্তর দিলেন না।

আমি ফের বললাম, 'এবার তা হলে অপারেশান স্টার্ট করা যাক। তার আগে আপনাদের একটা কাজ করতে হবে।'

জগৎপতি বললেন, 'বল—'

'আশ্রমের ব্রহ্মচারী আর সন্ন্যাসী ছাড়া বাইরের সব মালকে, মানে আপনাদের ভক্ত ফক্তদের সব বাইরে বের করে দিতে হবে।'

জগৎপতি মালটি যে উৎকৃষ্ট খলিফা, নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পারছেন। এবং দুর্ধর্ষ প্র্যাকটিক্যালও। আনসিন স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ডের সঙ্গেই তিনি শুধু কানেকশান রাখেন না, এই মর্তলোকের ঝুট-ঝামেলা এবং প্রবলেম সম্পর্কেও খুবই হুঁশিয়ার। বললাম, 'ফাইন।'

মহাশয়গণ, আপনারা তো জানেন যেখানে অষ্টপ্রহর কীর্তন হয় ঠিক তার তলায় মাটির নিচে ঢাউস ঢাউস বারোটা ট্রাঙ্কে তিন চার কোটি টাকার কারেন্সি নোট রাখা আছে। খানিকটা জায়গা সিমেন্ট বাঁধিয়ে একটা ম্যানহোলের মতো গোল লোহার ঢাকনি বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। শাবলের চাড় দিয়ে সেটা খুলে লগা আর একটা অ্যাপ্রেন্টিস ব্রহ্মচারীকে তার ভেতর নামিয়ে দেওয়া হল। দুই মাকড়া ধরাধরি করে লোহার ট্রাঙ্কগুলোকে ওপরে তুলে দিতে লাগল। বোদা আর আমি অন্য ব্রহ্মচারীদের হেল্প নিয়ে ট্রাঙ্কগুলো ভ্যানে [illegible]তে লাগলাম।

বারোটা ট্রাঙ্ক তোলা হলে জগৎপতিদের গুড-বাই জানিয়ে বোদা, লগা আর আমি ভ্যানে উঠে পড়লাম।

কিন্তু মহাশয়গণ, গেট থেকে বেরুতে না বেরুতেই সি.বি.আই আর ইনকাম ট্যাক্সের স্কোয়াড এসে হানা দিল। ওরা কী করে যেন গন্ধ পেয়ে যায়!

আমাদের ভ্যানটাকে ওরা চার্জ করল। কে একজন অফিসার চিৎকার করে বলল, 'স্টপ, স্টপ—'

আমি ড্রাইভারকে বললাম, 'একদম থামবি না। ফুল স্পিডে চালিয়ে যা। কুইক—'

আমার মুখ থেকে অর্ডারটা স্লিপ করে বেরুতে না বেরুতেই ড্রাইভার স্পিড তুলে দিল। আর হিন্দি ফিল্মের আখরী সিনের মতো পুলিশ, ইনকাম ট্যাক্স আর সি.বি.আই আমাদের চেজ করতে শুরু করল।

হেভি ট্রাক নিয়ে বেশিক্ষণ পাল্লা দেওয়া মুশকিল। তা ছাড়া কলকাতার রাস্তা ফাস্তার কারবার তো আপনারা ভাল করেই জানেন। যেদিকেই যাবেন ঠেলা রিকশা বাস ট্রাম মিনি আর অটোতে জ্যাম হয়ে আছে।

মিনিট পনের বাদে যখন পুলিশের ভ্যানগুলো আমাদের প্রায় ক্যাচ করে ফেলেছে, চিৎকার

করে বললাম, 'বোদা লগা, ট্রাঙ্ক খুলে নোট ফোট বের করে হরির লুট দে—'

বোদা এবং লগা প্রথমটা গাঁইগুই করতে লাগল। ধমকে আর খিস্তিতে তাদের থামিয়ে দিয়ে বললাম, 'যা বলছি তাই কর খজড়ারা—'

বোদারা আর আপত্তি করল না। ট্রাঙ্ক খুলে দু'হাতে নোট ছড়াতে লাগল।

যারা চেজ করছিল প্রথমটা তারা হকচকিয়ে গেল। তারপর গাড়ি থেকে নেমে কারেন্সি নোট ধরার জন্য পাগলের মতো ছোটাছুটি শুরু করে দিল।

কলকাতার হাওয়ায় হাওয়ায় লাখ লাখ টাকার নোট উড়ছে। এমন দৃশ্য ফৃশ্য শুধু ড্রিমেই দেখা যায়। কিছুক্ষণ চোখের তারা ফিক্সড করে চারপাশের মানুষজন তা দেখল। তারপর হিস্টিরিয়ার ঘোরে স্কুটার বাস মিনি ট্রাম রিকশা, এমনকি দু'ধারের বাড়িঘর থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে পালে পালে মানুষ বেরিয়ে এসে নোট ধরার জন্য দৌড়োদৌড়ি খামচাখামচি কামড়াকামড়ি রক্তারক্তি বাধিয়ে দিল। হোল ক্যালকাটা যেন উন্মাদ হয়ে গেছে।

মহাশয়গণ, তিন চার কোটি টাকার নোট উড়িয়ে দেবার নিট রেজাল্ট হল এই, আমাদের দিকে কারো নজর নেই। সেই ফাঁকে আমরা হড়কে বেরিয়ে গেলাম।

ঘণ্টা-দেড়েক বাদে আবার যখন প্যালেসে ফিরে এলাম, বিয়ে কমপ্লিট হয়ে গেছে। সুমনা আর মহেশকে নিয়ে প্রশেসান করে আড়াই ডজন ছুকরি বাসর ঘরের দিকে যাচ্ছে। আমি আর ওদের কাছে ঘেঁষলাম না। হে হে মহাশয়গণ, ওখানে গেলেই বেকার ঝামেলা।

এদিকে বরযাত্রীদের ভেতর সমাজপতি এবং অভ্যুদয়কে দেখা গেল। দুই খজড়াই, বিশেষ করে সমাজপতি টেরিফিক টেন্স হয়ে আছেন। আমাকে দেখেই হার্ডল রেস দেবার স্টাইলে তিনটে চেয়ার টপকে কাছে চলে এলেন। বললেন, 'অপারেশান সাকসেসফুল তো?'

'হানড্রেড পারসেন্ট স্যার।' মুখে একখানা স্বর্গীয় হাসি ফুটিয়ে বললাম, 'আপনাদের ক্যাশ একেবারে সেফ কাস্টডিতে রেখে এসেছি। সেখান থেকে কোনো মাকড়াকে আর বের করে আনতে হবে না। এবার ফুর্তিফার্তা করে খানাপিনা স্টার্ট করে দিন।'

'থ্যাঙ্ক ইউ স্বয়ম্ভু, মেনি থ্যাঙ্কস। কী বলে যে তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানাবো!' আমার হাতদুটো ধরে সমাজপতি মাকড়াটা এমন ঝাঁকাতে লাগল যেন সে দুটো খসে পড়বে।

কিছু না বলে আমি শুধু হাসলাম।

হে হে মহাশয়গণ, আপনারা বুঝতেই পারছেন, নাসিক প্রেস নোট ছাপিয়েছে। এ সবই তো জনগণের টাকা। জনগণের টাকা তাদের কাছে জমা দিয়েছি। এবার আমার ছুটি।

সানাই আর ব্যান্ড পার্টি এখন টেরিফিক স্পিডে বেজে চলেছে। হুইস্কির ফোয়ারা ছুটছে প্যান্ডেলের ভেতর। হৈচৈ হুল্লোড়ে বিয়েবাড়ি এখন রিয়াল জমজমাট।

মহাশয়গণ, এই হল গোল্ডেন চান্স। আমি আস্তে আস্তে ভিড় ফিড় কাটিয়ে গেটের দিকে চলে গেলাম। সেখান থেকে রাস্তায় বেরুতে দু মিনিটও লাগল না।

খানিকটা দূরে গিয়ে রাজপ্রাসাদের দিকে তাকিয়ে অ্যাটেনশানের স্টাইলে একটা স্যালুট

হাঁকিয়ে বললাম, 'গুড বাই—'

মহাশয়গণ, টুনিকে মনে আছে? সেই যে বেলেঘাটায় প্যান্ট-শার্ট পরে পুরুষ সেজে যে সিনেমার টিকেট ব্ল্যাক করে আর রাত্তিরে সি.এম. ডি. এ-র বাহাত্তর ইঞ্চি পাইপের ভেতর থাকে? আজকের রাতটা তার কাছেই থাকব। তারপর কাল ভোরে ইন্ডিয়ার আশি কোটি মানুষের ভেতর বিলকুল হারিয়ে যাব। বিদায় মহাশয়গণ, বিদায়। আর কোনোদিন আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে না।

শেষ